2923

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days .

5.10.72	13.1.75	5.12.79
9.1.73	21.1.75	21.12.79
15.1.73	6.8.75	25.2.80.
29.3.73	21.9.76	26.3.80
3.4.73	8.3.77	
23.8.73	4.8.77	
25.9.73	12.8.77	
18.1.74	19.8.77	
6.3.74	26.8.77	
13.3.74	14.9.77	
20.3.74	10.10.77	
27.8.74	19.12.77	
2.9.74	14.8.78	
17.9.74	23.8.78	
1.11.74	8.9.78	
2.12.74	29.9.78	
12.12.74	24.11.78	
23.12.74	24.8.79	
	31.8.79	

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

370.15
Guha

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
2923
Dept. of Extension
SERVICE
25. 3. 71
CALCUTTA-27

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ এম. এ.

প্রাক্তন অধ্যাপক আশুতোষ কলেজ ফর উইমেন্, কলিকাতা ;
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও শিলচর গুরুচরণ কলেজ

শ্রীমতী শান্তি দত্ত এম. এ., টি. ডি. (লণ্ডন) ;
এম. এ. এড্, (লণ্ডন)
অধ্যাপিকা ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব্ ট্রেণিং ফর উইমেন্, হেষ্টিংস্ হাউস্, কলিকাতা
পূর্বে ডেভিড্ হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, কলিকাতা

ন লে জ হো ম

৫৯, বিধান সরণি কলিকাতা-৬

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৬৭

প্রকাশক :
শান্তিকুমার মজুমদার
নলেজ হোম
৫৯, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

দাম : প্রথম খণ্ড, নয় টাকা ; দ্বিতীয় খণ্ড, নয় টাকা ;
উভয় খণ্ড একত্রে সতের টাকা ।

মুদ্রক :
১ হইতে ১৭ ফর্মা
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স
১১৭।১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ও
১৮ হইতে ৩১ ফর্মা
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম্. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগার লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

কিছুদিন যাবৎই 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা'র নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম। বিশেষতঃ শিক্ষক শিক্ষণ (বি. টি.) স্তরের পাঠ্যসূচী পরিবর্তিত হওয়াতে এবং স্নাতক স্তরে (বি. এ.) শিক্ষা একটি বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে প্রকাশক এ বিষয়ে কিছু তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু 'মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার' গ্রন্থখানা প্রণয়নে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নাই।

ভগবানের অনুগ্রহে 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এক হিসাবে, ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা গ্রন্থ। পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (**Mental Hygiene**), শিশুজীবনের নানা সমস্যা (**Problems of children**), অনুবর্তন ও নির্দেশনা (**child guidance**) শিশুর জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন স্তরের নানা সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি অধ্যায় সংযোজিত হইল। অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি দত্ত এম, এ, টি ডি, এম এড্ (লণ্ডন) পরিসংখ্যান সম্বন্ধে অধ্যায়টি বর্ধিত আকারে, বহু অংক এবং তাহাদের সমাধান সহ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের আধুনিকতম আলোচনা ও গবেষণার আলোকে সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হইল। 'মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া' এবং 'কল্পনা' এ দুটি অধ্যায় মূলতঃ জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ এম এ, ডিপ, এড্ (সিডনী), এম এড্ (মাদ্রাজ) দ্বারা লিখিত। বলাই নিষ্প্রয়োজন বিভিন্ন বিজ্ঞজনের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম এবং পুস্তকে যথাস্থানে তাঁহাদের নিকট ঋণ অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করিয়াছি। বহু চিত্র, নক্শা ও লেখ তাঁহাদের পুস্তকের অনুসরণেই প্রস্তুত হইয়াছে।

নূতন সংযোজন সংশোধনের ফলে পুস্তকখানার আয়তন পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। আমরা চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যাহাতে শিক্ষার্থীরা একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারে। শুধু তথ্য পরিবেশন নয়, যাহাতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ছাত্রদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়, যাহাতে তাহারা এ বিষয় আলোচনায় রস ও আনন্দ লাভ করিতে পারে

সে বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াছি। পাঠ্য বিষয় নিতান্তই নীরস হইতে হইবে এবং তোতাপাখীর মত "সংক্ষিপ্ত তৈরী উত্তর" গলাধঃকরণ এবং পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করিয়া পরীক্ষা বৈতরণী উত্তীর্ণ করানো বিষয়ে কৃতিত্বই শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তকের একমাত্র মাপ কাঠি, সবিনয়ে এবং সমস্ত অন্তরের সঙ্গে এই মতকে অস্বীকার করিতেছি। যে আয়ত্ত বিদ্যা শিক্ষার্থীর অন্তরঙ্গ ও আনন্দের বিষয় হইয়া উঠিল না তাহা 'পরীক্ষা পাশে' সহায়ক হইলেও তাহা ব্যর্থ ও মূল্যহীন।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিব কিনা, সে বিষয়ে নিজের মনে সন্দেহ ছিল। ভগবান সে শক্তি দিয়াছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যে বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে বই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের কাছে ঋণ স্বীকার করিতেছি। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিধুভূষণ ঘোষ, অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা প্রতিভা আচার্য, অধ্যাপিকা সুব্রতা বসু, শ্রীমান্ সুপ্রিয় দাশ গুপ্ত, শ্রীমতী জয়ন্তী দাশ গুপ্ত, শ্রীমান্ বিমান কুমার বসু, ইহাদের নিকট আমার ঋণ সর্বাধিক। শ্রীমতী রাধারাণী সেন, শ্রীমতী মমতা ঘোষ, অধ্যাপিকা প্রতিভা আচার্য, শ্রীমতী সুমিত্রা বসু, অধ্যাপিকা অপরাজিতা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শীশ রায়, শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ, শ্রীমতী দীপা রায় ও শ্রীমতী কমলা মুখার্জির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজের ধারণাগুলিকে যাচাই করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিয়াছি। শিক্ষক সম্পাদক অগ্রজোপম অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী, ডাঃ বি, এন, রায়, শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য, শ্রীমান্ জগদীশ দাশ এবং শ্রীমতী সুরুচি দাসের নিকট সর্বদা যে উৎসাহ ও সদুপদেশ পাইয়াছি তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশেষ ভাবে অধ্যক্ষ শ্রী কে. কে. মুখার্জী, অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা নলিনী দাস, অধ্যাপিকা সুনিলা গুহ ও অধ্যাপিকা অনুপমা বসুর নিকট হইতে মাঝে মাঝে যে উৎসাহবাক্য পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই। ভিতরের কয়েকটি ফটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছেন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ দিলীপ গুহ।

পূর্ব পূর্ব সংস্করণে যে সব অধ্যাপক অধ্যাপিকা পুস্তিকাখানার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়া আমাদের উপকৃত করিয়াছেন, এবারও তাঁহাদের সহযোগীতা ও সুপরামর্শ কামনা করি।

বিনয়াবনত—

বিভুরঞ্জন গুহ

৭ জে, এস্ আর দাশ রোড্, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৮৯৩৯

২৪ আগষ্ট, ১৯৬৬

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান : ১—২১

মনুষ্যেতর প্রাণীর শাবক ও মনুষ্য সন্তানে প্রভেদ—বিধিবদ্ধ শিক্ষা—আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন শিক্ষার ভ্রান্তি—রুসো ও পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি—শিশুর মনকে জানতে হবে—শিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনটি মত—শিক্ষার ভিত্তি হবে মনোবিদ্যা—শিক্ষার আদর্শ ও মনোবিদ্যা—শিক্ষায় শাসনের স্থান—শিক্ষার উদ্দেশ্য—মনোবিদ্যার নতুন মর্যাদালাভ—শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানে মনোবিদ্যা—শিক্ষা-মনোবিদ্যা কি ?—শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়—শিক্ষা-মনোবিদ্যার পরিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়—মনোবিদ্যার ক্রমবিকাশ : ২২—৬২

মন সম্পর্কে ধারণার ক্রম বিকাশ—মনোবিদ্যায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা—সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্যা—নতুন মনোবিদ্যা সক্রিয়তাবাদী ও ক্রমবিকাশবাদী—আধুনিক মনোবিদ্যা সমাজকেন্দ্রিক—আধুনিক মনোবিদ্যায় নির্জ্ঞান মনের গুরুত্ব—মনোবিদ্যার নতুন পরিধি বিস্তার—মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু—মনোবিদ্যার পদ্ধতি—অন্তর্দর্শন ও পরিদর্শন-পদ্ধতি—অন্তর্দর্শনের অসুবিধা এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ—জীবনেতিহাস সংগ্রহ প্রণালী—পরীক্ষণ—উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি—পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি—শারীর-ভিত্তিকমনোবিদ্যা—পরীক্ষণ ভিত্তিক মনোবিদ্যা—শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা—আধুনিককালে মনোবিদ্যার মর্য্যাদা—মনোবিদ্যার উপযোগিতা—ব্যক্তিগত ও সমাজগত—শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ব্যবহার—শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ব্যবহার—চিকিৎসা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়—মানুষের মৌলিক প্রয়োজন : ৬৩—৯০

ব্যবহারের পশ্চাতে আগ্রহ—শিক্ষা ও আগ্রহ—আগ্রহ ও আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়ক—জৈব তাড়না—তাদের শ্রেণী বিভাগ—জৈব-তাড়নার মধ্যে কোনটি মৌলিক ?—মানুষের মৌল

প্রয়োজন—জন্মগত আগ্রহ ও অর্জিত-আগ্রহ—দৈহিক প্রবৃত্তি—দৈহিক প্রয়োজনগত তাড়না বা আগ্রহ—দৈহিক তাড়না ও আগ্রহ—সামাজিক আগ্রহ—শিশুর প্রভুত্ব-বোধের তাৎপর্য্য—ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা আগ্রহ—রুচি দৃষ্টিভঙ্গী ভাব ইত্যাদি অর্জিত আগ্রহ—স্থায়ী ঔৎসুক্য—প্রবৃত্তি ও সমাজ-প্রয়োজনের যোগ—পুরানো ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভেদ—শিক্ষায় বিফলতার কারণ—আগ্রহের অতৃপ্তি জনিত মানসিক বিকার।

চতুর্থ অধ্যায়—সহজ সংস্কার : ৯১—১১৬

সহজ সংস্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ—সহজ সংস্কারের কতকগুলি উদাহরণ—সহজ সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত—সহজ-সংস্কারের পশ্চাতে স্নায়বিক গঠন—সহজ ক্রিয়া কি অন্ধ ?—বুদ্ধি ও সহজ সংস্কার—মানুষের সহজ সংস্কার আছে কি ?—সহজ সংস্কার ও অভ্যাস—সহজসংস্কার ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া—সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভ—সংস্কারের শ্রেণী বিভাগ—শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজ সংস্কারগুলির প্রয়োগ।

পঞ্চম অধ্যায়—অনুভূতি ও প্রক্ষোভ : ১১৭—১৬৯

অনুভূতির কয়েকটি উদাহরণ—অনুভূতির শ্রেণী বিভাগ—ভূণ্ড-এর মতবাদ—প্রক্ষোভের চরিত্র—প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি অঙ্গাঙ্গী—প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক প্রকাশ—প্রক্ষোভের ক্রমবিবর্তন—প্রক্ষোভ ও ভাবপ্রকাশ সম্পর্ক সম্বন্ধে জেমস্ ল্যাং-এর সূত্র—সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ—প্রক্ষোভ-পূর্ব অনুভূতি, স্থায়ীধাত ও রস বা বিশুদ্ধি অনুভূতি—প্রক্ষোভ ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া—প্রক্ষোভ ও স্নায়ুতন্ত্র—প্রক্ষোভ ও মস্তিষ্ক—প্রক্ষোভ ও রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া—জেমস্ ও ক্যানন্-বার্ড মতবাদের তুলনা—প্রক্ষোভের প্রকাশ কি সর্বদা সুনির্দিষ্ট ?—প্রক্ষোভের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ—প্রক্ষোভের আরো দুটি দৈহিক পরিবর্তনের মাপ—পর্য্যবেক্ষণ ও মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা প্রক্ষোভের পরিমাপ—একটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ—শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব এবং তাদের কাজে লাগাবার বা পরিবর্তন করার উপায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মানস-জীবনের দৈহিক আধার : ১৭০—২৩২

স্নায়বিক মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ—নিউরনের গঠন ও ক্রিয়া, সন্ধিস্থান—স্বতঃক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল—নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র—স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল—সুষুম্নাকাণ্ড—মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও তাদের ক্রিয়া—মস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থান ও ক্রিয়া নির্দেশ —গঠন ও ক্রিয়া—সংবেদ কেন্দ্র—মস্তিষ্কে চেষ্টা কেন্দ্র—সংযোগ কেন্দ্র—উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ—'Reaction time' সম্বন্ধে একটি সহজ পরীক্ষা—প্রতিক্রিয়া কাল—ক্যাটেলের পরীক্ষা ও মতামত—প্রতিবর্ত ক্রিয়া—অনালী রসক্ষরা গ্রন্থি—প্যাভলভের পরীক্ষা—দেহ ও মনের সম্বন্ধ—পরস্পর প্রতিক্রিয়া মতবাদ—সমান্তরালবাদ।

সপ্তম অধ্যায়—সংবেদন ও ইন্দ্রিয়াদি : ২৩৩—২৬

বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের ক্রিয়া—চক্ষুর গঠন, বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া—রংয়ের মিশ্রনের নিয়ম—ইয়ং হেলমহোলৎজ ও হেরিং-এর মতবাদ—ল্যাড্ ফ্রাংকলিনএর মতবাদ—বর্ণান্ধতা—অনুবেদন—দৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা—শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন—শব্দ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—ত্বকের বিভিন্ন সংবেদন।

অষ্টম অধ্যায়—প্রত্যক্ষণ : ২৬১—৩০২

প্রত্যক্ষণ ও সংবেদন—প্রত্যক্ষণ অভ্যাস নির্ভর—প্রত্যক্ষণ ও অর্থ আবিষ্কার—প্রত্যক্ষণে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ—নিরীক্ষণ ব্যবহার-বাদীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষণ—প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গেষ্টল্ট বা সমগ্রতা-বাদীদের মত—প্রত্যক্ষণ, অধ্যাস, মায়া—প্রত্যক্ষণের ভ্রম নিবারণের উপায়—বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ—অমূল প্রত্যক্ষ—স্থান প্রত্যক্ষণ—ঘনত্ব ও দূরত্ব প্রত্যক্ষণ—গতিবোধ—সময় বোধ —সংপ্রত্যক্ষ—ওয়েবার ফেকনার বিধি।

নবম অধ্যায়—মনোযোগ : ৩০৩—৩৩২

মনোযোগের প্রকৃতি—মনোযোগের বস্তু—মনোযোগ, অ-মনোযোগ —মনোযোগ ও অনুভূতি—মনোযোগ ও চেতনা—মনোযোগের বিস্তার—মনোযোগের সহায়ক অবস্থা—একাগ্র মনোযোগ—মনোযোগের স্থায়িত্ব—মনোযোগের দৈহিক ও স্নায়বিক অনুসঙ্গ

—মনোযোগের ফল—মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ—মনোযোগের হেতু—মনোযোগ ও আগ্রহ—মনোযোগ ও অভ্যাস—শিক্ষায় সংক্রামণ মতবাদ—ঔৎসুক্য ও মনোযোগ—প্রতিভা ও মনোযোগ—শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের ব্যবহার।

দশম অধ্যায়—বংশগতি ও পরিবেশ : ৩৩৩—৩৬৯

বংশগতি কি—পরিবেশ কি—বংশগতি বড় না পরিবেশ বড় —বংশগতির কলাকৌশল—মেণ্ডেলের সূত্র—বৈসাদৃশ্য ও অর্জিত গুণ—বংশগতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষয়—শিক্ষাবিদের কাছে এর তাৎপর্য—বংশগতির বিভিন্ন উপাদান—নারী ও পুরুষের জন্মগত প্রভেদ—বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা—শেষ সিদ্ধান্ত।

একাদশ অধ্যায়—মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া : ৩৭০—৪০২

স্মৃতির ছবি ও কল্পনার ছবি—স্মৃতির সংজ্ঞা—অনুবন্ধ সম্বন্ধে সূত্র —সংরক্ষণ—সংরক্ষণের সহায়ক অবস্থা—মনে ফিরিয়ে আনা—মনেপড়া বা পরিচিতি—স্মৃতি শক্তি বাড়ানো যায় কিনা ?—ভুলি কেমনে ?—স্মৃতিলোপ, স্মৃতিভ্রংশ, অতিস্মৃতি—একসঙ্গে কতটা মনে রাখা যায়—স্মৃতি ও বিস্মৃতি বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা —এবিংহজের পরীক্ষা—ক্রুগারের পরীক্ষা—স্পিটজারের পরীক্ষা —মেরী এ্যালেনের পরীক্ষা—কেটোনার পরীক্ষা—বার্টলেটের পরীক্ষা—মনে রাখবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—অসাধারণ স্মৃতিশক্তি—আইডেন্টিক্ ইম্যেজ—সাইনেস্থেসিয়া।

দ্বাদশ অধ্যায়—কল্পনা : ৪০৩—৪৩৯

স্মৃতি ও কল্পনা—বিম্বের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ—বিম্বের বৈশিষ্ট্য —বিভিন্ন প্রকারের বিম্ব—কল্পনার শ্রেণী বিভাগ—স্বপ্ন ও স্বপ্নের কারণ অনুসন্ধান—ফ্রএডের ব্যাখ্যা—দিবা স্বপ্ন ও ইগো-ডিফেন্স্ মেকানিজম্স্—শিশুর ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান—কয়েকটি মানসিক বিকার ও তাদের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—কাজশেখা—পড়াশেখা : ৪৪০-৪৮৩

শেখার মানে কি—শিক্ষার সংজ্ঞা—থর্নডাইকের শিক্ষার তিনটি সূত্র—ফল লাভের সূত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় সূচী

চতুর্দশ অধ্যায়—শিক্ষায় সংক্রমণ ৪৮৫-৫০৩

শিক্ষায় সংক্রমণ কি? —৪৮৫, সংক্রমণ তত্ত্বে প্রাচীনদের আস্থা—৪৮৬, সংক্রমণ কি ভাবে ঘটে?—৪৮৬, শিক্ষায় সংক্রমণ সম্বন্ধে পরীক্ষা—৪৯০, কোন্ কোন্ অবস্থা সর্বাধিক পরিমাণ সংক্রমণের অনুকূল?—৪৯৬, সংক্রমণ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির তুলনামূলক মূল্য বিচার—৪৯৭, আধুনিক পরীক্ষানীতির উপর সংক্রমণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল—৫০০, শিক্ষার সংক্রমণ সম্বন্ধে ডিউইর মত—৫০২।

পঞ্চদশ অধ্যায়—অভ্যাস ৫০৪-৫১৭

অভ্যাসের সংজ্ঞা—৫০৫, অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তি—৫০৬, সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস—৫০৮, অভ্যাসের সুফল ও কুফল—৫১১, কু-অভ্যাস বিদূরণ সম্পর্কে জেম্‌সের মত—৫১২, ডান্‌লাপের পরীক্ষা—৫১৪, ডিউইর মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল্য—৫১৫।

ষোড়শ অধ্যায়—অনুকরণ ৫১৮-৫২৭

অনুকরণের প্রকৃতি—৫১৮, অনুকরণের বিভিন্নরূপ—৫২১, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের উপযোগিতা—৫২৩, শিক্ষা ও অভিভাবন (Suggestion)—৫২৫।

সপ্তদশ অধ্যায়—বুদ্ধির প্রকৃতি ও বুদ্ধির কাল ৫২৮-৫৪৩

বুদ্ধি কি কাজ করে?—৫২৮, বুদ্ধির সংজ্ঞা—৫৩০, বিভিন্ন সংজ্ঞার তুলনামূলক বিচার—৫৩৩, স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two-factor theory), —৫৩৬, বুদ্ধির জোট-বাঁধা মতবাদ (Group factor theory)—৫৩৮, একাধিক উপাদান তত্ত্ব (Multi-factor theory)—৫৪০, বুদ্ধি পরিমাপের গুরুত্ব—৫৪১, বুদ্ধির অভীক্ষার সূত্রপাত—৫৪২।

অষ্টাদশ অধ্যায়—বুদ্ধির পরিমাপ (Tests of Intelligence) ৫৪৪-৫৯৩

বুদ্ধি পরিমাপের নানা চেষ্টা—৫৪৪, সাইমন-বিনের বুদ্ধির মাপ—৫৪৫, কিভাবে বিনের বুদ্ধির মাপ (অভীক্ষা) প্রয়োগ করা হয়?—৫৫৭, বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) নির্ধারক অভীক্ষার (tests) গুরুত্ব—৫৫৮, নানা ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা—৫৬১, কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির মাপ (Performance Tests)—৫৬৩, দলগত পরীক্ষা (Group Tests)—৫৬৬, সামর্থ্য বা পারদর্শিতার মাপ (Achievement Tests)—৫৬৭, রুচি ও প্রবণতা বিষয়ে অভীক্ষা (Special Aptitude Tests)—৫৬৮, যন্ত্র ব্যবহারে প্রবণতা মাপের অভীক্ষা (Tests for Mechanical Aptitude)—৫৬৯, শিল্পকর্মে রুচি

বিষয়ক অভীক্ষা—(Tests for Artistic Aptitude) ৫৭০, দৈহিক শক্তি পরিমাপের অভীক্ষা, বিভিন্ন ব্যবসায় বা জীবিকা বিষয়ক কর্মে কুশলতা পরীক্ষা (Trade Tests, etc)—৫৭১, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে অভীক্ষা (Prognosis Tests)—৫৭২, প্রস্তুতি বিষয়ে অভীক্ষা (Readiness Tests)—৫৭৩, অভীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ মান নির্ণয় (Standardization of Tests)—৫৭৪, বুদ্ধির স্তর বিভাগ (Levels of intelligence)—৫৭৭, বুদ্ধির অপরিবর্তনীয়তা (Constancy of I. Q.)—৫৭৮, বুদ্ধির দুরকমের বৃদ্ধি (Vertical and Horizontal growth in intelligence) ৫৭৯, বুদ্ধির উন্নতির সীমা—৫৮০, বুদ্ধি কিভাবে ছড়িয়ে আছে (Distribution of Intelligence)—৫৮২, বুদ্ধি ও পেশা (Intelligence & occupation)—৫৮৩, বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা—৫৮৫, বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির সীমা ও ত্রুটি (Limitations and defects of Intelligence Tests)—৫৮৭, বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রজ্ঞা,—৫৮৯, তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান ছাত্র—৫৯০, বুদ্ধ্যঙ্ক বংশগতি-নির্ভর না পরিবেশ-নির্ভর ?—৫৯১ ।

ঊনবিংশ অধ্যায়—অবসাদ ও বিরক্তি ৫৯৪-৬০৯

অবসাদের প্রকৃতি—৫৯৪, বিরক্তির প্রকৃতি এবং বিরক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ—৫৯৪, অবসাদের তিনটি মূল কারণ—৫৯৫, অবসাদের শ্রেণী বিভাগ—৫৯৮, পেশী ও মনের অবসাদ পরিমাপের যন্ত্র ও উপায়—৫৯৯, বিদ্যালয়ের কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ—৬০৩, অবসাদ দূরীকরণের উপায়—৬০৪, অবসাদের কুফল—৬০৪, শিক্ষকের অবসাদের কুফল ও তার প্রতিকার—৬০৫, অবসাদের প্রয়োজনীয়তা—৬০৬, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অবসাদ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য—৬০৭ ।

বিংশ অধ্যায়—খেলা ৬১০-৬২২

খেলা সমস্ত শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়া—৬১০, খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন মত শিলার, স্পেনসার, গ্রূস্ স্বল, ব্র্যাড্‌লে, ফ্রয়েড্, ক্লীন্—৬১১, খেলা ও কাজ—৬১৬, খেলার ক্রমবিকাশ—৬১৮, শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা—৬১৯, খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা—৬২০, স্বাধীনতা ও নিয়ম শৃঙ্খলা—৬২০, খেলা সম্বন্ধে বারট্রাণ্ড্ রাসেল্—৬২১ ।

একবিংশ অধ্যায়—ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ৬২৩-৬৪৭

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা—৬২৩, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব—৬২৪, ব্যক্তিত্বের গুণ বা traits—৬২৫, ব্যক্তিত্বের type—৬২৬, ব্যক্তিত্ব নিরূপণের উপায়—৬২৮,

কেস্ হিস্ট্রী, রেটিং স্কেল, পারফরমেন্স টেস্ট, ইন্টারভ্যু, সাইকোঅ্যানালিসিস, প্রোজেকটিভ টেকনিক, প্রোফিসিয়েন্সি, ইত্যাদি, টি.এ.টি—৬২৯, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ—৬৩৪, ব্যক্তির গঠনের দৈহিক ভিত্তি—৬৩৫, ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের প্রভাব-গৃহ, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী—৬৩৭, ব্যক্তির গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব—৬৩৯, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কি ?—৬৩৯, ব্যক্তিত্বের পরিচয়—মেজাজে (Temperament)—৬৪১, দেহের গড়ন ও মেজাজ—৬৪১, ব্যক্তিত্বের পরিচয়—দৃষ্টিভঙ্গীতে (Attitudes) —৬৪৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ৬৪৮-৬৬৫

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের ভিত্তি-দৈহিক, মানসিক, নৈতিক—৬৫০, Type অনুযায়ী মানুষের ভাগ—৬৫০, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ—জাতিগত, বংশগত ও লিঙ্গগত—৬৫১, শারীরিক পরিণতি ও মানসিক বিকাশ—৬৫৬, শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভেদের তাৎপর্য—৬৫৭, ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তিতে প্রভেদ—৬৬২, ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিমাপের পদ্ধতি—৬৬৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—শিক্ষা ও পরিসংখ্যান (Statistics) ৬৬৬-৭৩৩

পরিসংখ্যান কি, শিক্ষায় পরিসংখ্যান কেন ?—৬৬৬, সাধারণ মাপ (Measurements in general), সারিবিন্যাস (Rank order), Score, Scale—৬৬৭, Variables (continuous and discrete), score in continuous series—৬৬৭, Frequency distribution, Range, Class-intervals—৬৭০, Graphical Representation—৬৭০, Frequency Polygon, Polygon আঁকার পদ্ধতি, Histogram—৬৭৫, Measures of Central Tendency—৬৮৩, Mean, Median, Mode—৬৮৫, Deviation from Central tendency, Range, Mean Deviation, Standard Deviation, Quartile Deviation—৬৮৯, Normal Probability Curve—৭০০, Skewness, Kurtosis—৭০৮, Cumulative Frequency Curve—৭১২, Percentile—৭১৪, Ogive or Cumulative Percentage Curve—৭১৮, Other graphical methods —line graph, bar diagram—৭২৩, Correlation, Co-efficient of correlation, Scatter diagram—৭২৫।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—ব্যক্তির বিকাশ ৭৩৪-৭৩৯

ব্যক্তির ক্রমবিকাশের লক্ষণ—৭৩৪, ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সাধারণ নিয়ম—৭৩৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা ৭৪০-৭৫০

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের শুরু—৭৪০, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধারণ সূত্র—৭৪১, বিকাশের দুইটি উপাদান, স্বাভাবিক পরিণতি ও শিক্ষা (Maturity and Learning)—৭৪৫, কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত—৭৪৮।

ষড়বিংশ অধ্যায়—জীবন-পরিক্রমা ৭৫১-৭৯৭

শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর—৭৫১, শৈশব—প্রথম স্তর (০-২ বৎসর)—৭৫৩, শৈশব—দ্বিতীয় স্তর (২-৪ বৎসর)—৭৫৮, বাল্যকাল (৪-৭) বৎসর)—৭৬০। কৈশোর (৭-১১ বৎসর)—৭৬২ উত্তর কৈশোর বা যৌবনাগম, (Adolescence), বয়ঃসন্ধিকালের (Puberty) তাৎপর্য সম্বন্ধে হল্, মীড্, কোলবার্ট, ক্রাম্পটন, ডিয়ারবর্ণ এবং রথ্‌নী ইত্যাদির মতামত—৭৬৫, বয়ঃসন্ধি-কালে দৈহিক পরিবর্তন—৭৬৯, বুদ্ধির বিকাশ—৭৭৪, অনুভূতি ও সামাজিক চেতনার বিকাশ—৭৭৬, যৌন চেতনার বিকাশ—৭৭৭, আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, আত্মসচেতনতা ও আদর্শবাদ—৭৮০, বয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত ?—৭৮৪, অপরাধপ্রবণতা, অপরাধপ্রবণতার হেতু, অপরাধ-প্রবণতার শ্রেণী বিভাগ—৭৮৯।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—শিশুদের দৈহিক বিকাশের ধারা ৭৯৮-৮০০

দৈহিক বৃদ্ধির ছন্দ—৭৯৮।

অষ্টবিংশ অধ্যায়—শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ ৮০১-৮১৭

শিশুর মানসিক বিকাশ, মানসিক বিকাশের ধারার সাধারণ লক্ষণ, ভাষা শিক্ষা, অর্থবোধ, অবাধ চিন্তা—৮০২, বুদ্ধি, মনোযোগ, কৌতূহলের বিকাশ—৮০৭, শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ, খেলা, কল্পনা, নির্বস্তুক চিন্তা—৮০৮, শিশুর জীবনে কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন, পিয়াজের মত ও তার সমালোচনা—৮১৪, শিশুর জীবনে কল্পনা ও খেলার তাৎপর্য—৮১৬।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—শিশুর অনুভূতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ ৮১৮-৮২৫

শিশুর জীবনে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের তাৎপর্য—৮১৮, প্রক্ষোভের ক্রম-বিকাশ ও পরিবর্তন—৮২০, মৌলিক প্রক্ষোভ কয়টির ক্রমবিকাশের ধারা—৮২১।

ত্রিংশ অধ্যায়—শিশুর সমাজজীবন বিকাশ ৮২৬-৮৪৭

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে সমাজ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, feral cases—৮২৬, শিশুর সমাজ চেতনার সাধারণ ধারা, সমাজ জীবনের উন্মেষ ও সামাজিক ব্যবহার ক্রমপরিণতি, কৈশোরের উপযুক্ত সমাজপরিবেশ—৮২৮, যৌবনাগম ও সামাজিক চেতনা—৮৩৫, যৌনজীবন সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—৮৩৭, বয়ঃসন্ধিকালের সমাজ জীবন সম্পর্কে আরো কিছু কথা ৮৩৯—নেতি-বাচক ও ইতিবাচক সামাজিক ব্যবহার, সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব-গুণের প্রয়োজনীয়তা—৮৪২।

একত্রিংশ অধ্যায়—ব্যতিক্রমের বিপদ—দৈহিক ৮৪৮-৮৬১

ব্যতিক্রম কারা? সাধারণের (normal) সংজ্ঞা—৮৪৮, দৈহিকত্রুটিজনিত সমস্যা, বধির ও প্রায়-বধিরদের সমস্যা—৮৪৯, অন্ধ বা প্রায়ান্ধদের সমস্যা—৮৫৩, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গদের সমস্যা—৮৫৫ বাক্য উচ্চারণ ব্যাপারে ত্রুটি—৮৫৯,

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—ব্যতিক্রমের বিপদ—মানসিক ৮৬২-৮৭৯

মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, ন্যূনতা ও বিকৃতি—৮৬২, ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধির সমস্যা—৮৬৬, একেবারে নির্বোধের সমস্যা—৮৬৮, তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা—৮৬৯।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়—মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৮৮০-৮৮৮

দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য—৮৮০, সুস্থতা ও সুসঙ্গতি (adjustment) —৮৮০, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য—৮৮১, দৈহিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধির উৎকর্ষ, নৈতিক আদর্শ, সুনাগরিকত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য—৮৮২, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সূচনা—৮৮৪।

চতুঃত্রিংশ অধ্যায়—মানসিক সুস্থতা ৮৮৯-৮৯৪

মানসিক সুস্থতার লক্ষণ—৮৯০, মানসিক সুস্থতার ভিত্তি—৮৯২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—মানসিক অসুস্থতা ও অব্যবস্থিতা ৮৯৫-৯২৫

মনোদৌর্বল্য (psychaesthenia), অকারণ প্রবল ভয় (phobiss), অবসেশন্ ও কম্‌পালশন্ (obsessions & compulsions), অঙ্গের অনিয়ন্ত্রিত কম্পন, হিষ্টিরিয়া—৯০২, গুরুতর মানসিক রোগের প্রকার ভেদ—ফাংশনাল সাইকোসিস্, সিজোফ্রেনিয়ার বিভিন্ন রূপ—৯০৬ ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্, প্যারানোয়িয়া—৯০৭, মানসিক রোগ চিকিৎসার বাহ্য পদ্ধতি—৯০৮, মানসিক চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, সাইকোথেরাপী—৯০৯, মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাজ, সংবেশন (hypnosis), অভিভাবন (suggestion)—৯১৩, মনঃ-সমীক্ষণ (psycho-analysis), সাইকো-এ্যানালিসিস কথার বিভিন্ন অর্থ, সাইকো-এ্যানালিসিস্-এর তত্ত্বগতি ভিত্তি—৯১৫, সাইকো-এ্যানালিসিস্ চিকিৎসা পদ্ধতি, মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (free association method), সাইকোএ্যানালিসিস্ পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ—৯১৬, কাজ ও খেলার মধ্য দিয়া চিকিৎসা (play and occupational therapy), সম্মিলিত চিকিৎসা (group therapy), অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা (psycho-drama), ছবি আঁকা, ছবি দেখার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা, (Goolenough's man-drawing test, Thematic Apperception Test, Rorsach Ink-blot Test)—৯১৮,—মনঃ সমীক্ষণের মূল্যায়ণ—৯২২।

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়—শিশুর অব্যবস্থিততা ৯২৬-৯৩১

শিশুর অব্যবস্থিততা ও মানসিক রোগ, শিশুর অব্যবস্থিততার কারণ—৯২৬, অব্যবস্থিততার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠনের সম্বন্ধ, য়্যুঙ্গ্, রোজানফ্, শেল্ডন্ ও আইজেন্‌ক্-এর টাইপ বিভাগ—৯২৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—যেসব শিশুদের নিয়ে মহা সমস্যা (Problem children) ৯৩২-৯৪৮

প্রোব্‌লেম্ চাইল্ড কথার মানে কি? ইহাদের শ্রেণীবিভাগ—৯৩২, ক্ষীণ বুদ্ধি ও জড়বুদ্ধি শিশু—৯৩৩, পশ্চাদপদ শিশু (Retarded children), পিছিয়ে পড়ার কারণ, পিতামাতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব—৯৩৭, দুরন্ত ছেলে, দুরন্তপনার কারণ, পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য—৯৪৩।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—অনুবর্তনের মূল সূত্র ৯৪৯-৯৫৬

অনুবর্তনের প্রয়োজনীয়তা—৯৪৯, পরিচালকের জ্ঞাতব্য বিষয়—৯৫১।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়—বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অনুবর্তন ৯৫৭-৯৬৪

আধুনিক শিক্ষার কয়েকটি মূল সূত্র—৯৫৭, বিষয়ের বৈচিত্রীকরণের প্রয়োনীয়তা—৯৫৮, গাইডেন্স বা কেরিয়ার মাষ্টারের যোগ্যতা—৯৫৯, কি ভাবে শিক্ষার বিষয় নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনে সাহায্য করা যায়—৯৫৯, আধুনিক অনুবর্তন ও উপদেশের ভিত্তি—বুদ্ধির তারতম্য ও লেখাপড়ায় সফলতা, বুদ্ধি ও বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরস্পর ইতিবাচক সম্বন্ধ—৯৬১।

চত্বারিংশ অধ্যায়—জীবিকা বিষয়ে নির্দেশনা বা অনুবর্তন— ৯৬৫-৯৭৬

জীবিকা নির্বাচনে বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—৯৬৫, বুদ্ধির দুই উপাদান—'g' ও 's', কোন্ কাজে কোন্ উপাদানের প্রয়োজন—৯৬৬, এ্যাচীভ্‌মেণ্ট টেষ্টের নমুনা—৯৬৭, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা (Aptitude or Interest Tests)—৯৬৮, ডায়াগ্‌নোষ্টিক টেষ্ট, জেনারেল এচীভ্‌মেণ্ট ব্যাটারী অব টেষ্টস্—৯৬৯, বিদ্যালয়ে ছাত্রের সমস্ত বিষয়ে সামগ্রিক পরিচয় (Cumulative Record card) জীবিকা সম্পর্কে নির্দেশ বা পরামর্শের উপযোগী পরীক্ষা—৯৭০, বিভিন্ন কাজের অঙ্গ বিশ্লেষণ (Job analysis)—৯৭৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায়—মানসিক রোগ ও বিকৃতি বিষয়ে নির্দেশনা— ৯৭৭-৯৮২

মানসিক রোগ বিষয়ে নির্দেশনার প্রয়োজন—৯৭৭, শিশুর মানসিক রোগ ও তাহার কারণ—৯৭৮, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকের সংগঠন ও কাজ—৯৭৯, রোগ নির্ণয়, পরামর্শ ও চিকিৎসা, চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বিধি—৯৮১।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

অ্যামেরিকান কবি হুইট্‌ম্যান্-এর একটি কবিতা আছে, তাতে তিনি পশুদের প্রশস্তিগান করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন পশুরা সম্পূর্ণ শান্ত, আত্মসন্তুষ্ট, স্বচ্ছন্দচারী। তারা নিজ অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় না, তারা অতীত পাপের অনুশোচনায় মুহ্যমান হয় না—ভবিষ্যৎ উন্নতির দুরাকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হয় না; তাদের 'ভদ্র' হবার জন্যে কোন মোহ নেই; নতিস্বীকার করে মতলব হাসিল করবার দুষ্ট বুদ্ধি নেই, ইত্যাদি।[১] কিন্তু পশুর এই স্বাচ্ছন্দ্য, নির্বিকার সন্তুষ্টি, ভদ্রতাহীন স্বাভাবিক জীবন সত্যিই কি মানুষের কাম্য হতে পারে? এই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয় যে সে বিধাতার সদা-অশান্ত বিদ্রোহী সন্তান? সে তার পরিবেশকে মেনে নিতে, অন্ধভাবে প্রকৃতির নির্দেশে চলতে ইচ্ছুক নয়।[২] এর কারণ মানুষ অশিক্ষিত সংস্কার-তাড়িত

---

১ I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contained.

I stand and look at them long and long,
They do not sweat and whine about their condition;
They do not lie awake in the dark and weep for their sins;
They do not make me sick discussing their duty to God;
Not one is dissatisfied—not one is demented with the mania of owning things;
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of year ago;

Not one is respectable or industrious over the whole earth. Walt Whitman—Animals ; from Song of Myself.

২ This is my loftiest greatness
To have been born so low,
Greater than Thou, The Ungrowing
Am I that forever grow.
From glory to rise unto glory
Is mine, who have risen from gloom
I doubt if Thou knew'est at my making
How near to Thy throne I should climb
Over the mountainous slopes of the ages
And the conquered peaks of time. Watson—The Dream of Man.

Also: Rather I prize the doubt
Low kinds exist without,
Finished and finite clods,
Untroubled by spark. Browning.

জীব নয় ; সে বিচারবুদ্ধি -দ্বারা, নিজ চেষ্টা -দ্বারা তার পরিবেশকে পরিবর্তন করতে চায়, অন্যকে বশ করতে চায়, সে নিজেকে জানতে চায়, অন্যকে বুঝতে চায়, নতুন করে তার স্বপ্নের জগৎ গড়তে চায়। সে বাধাকে ভয় পায় না, মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে সে অগ্রাহ্য করে, সে ভাগ্যের কাছে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত নয়।[৩] সে বলে, সন্তুষ্ট শূকরের জীবন আমার জন্য নয়, অসন্তুষ্ট সক্রেটিস্ই আমার আদর্শ।[৪]

অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব এইখানেই যে মানুষ শিক্ষা -দ্বারা নিজের ও সন্তানদের উৎকর্ষসাধনে সমর্থ। পশুশাবকেরা শারীরিক শক্তি এবং প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় মানুষের শিশু অপেক্ষা অনেক বেশী আত্মরক্ষায় সমর্থ। পশুশাবকেরা নখর, দশন, শৃঙ্গ, বিষাক্ত ফণা, হুল ইত্যাদি প্রকৃতিদত্ত আয়ুধে জন্মাবধি সজ্জিত, প্রকৃতিদত্ত অন্ধ সংস্কার তাদের জৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি জীবন-সংগ্রামে মানুষই পশুর ওপর আধিপত্য লাভ করেছে, তার কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে যে অসম্পূর্ণ শক্তি সে জন্মসূত্রে পেয়েছে তাকে সে প্রায় অন্তহীনভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানবশিশুর শিক্ষা -দ্বারা নিজেকে উন্নত করবার যে প্রায়-অসীম ক্ষমতা আছে (almost limitless educability), পশুর তুলনায় তা এতই বেশী যে তাদের মধ্যে তুলনাই হতে পারে না। অবশ্য পশুরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে, শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মানুষ যে প্রাণীশ্রেষ্ঠ তার কারণ তার শিক্ষাগ্রহণ -দ্বারা নিজেকে উন্নত করবার প্রায়-অন্তহীন ক্ষমতা আছে। এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে শিক্ষা -দ্বারাই মানবশিশু তার অসহায় বাল্যকাল থেকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হয়। জন্মকালেই সে বেড়ে ওঠবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসে, কিন্তু সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ও তার গতি নির্দিষ্ট হয় পরবর্তী শিক্ষা -দ্বারা। এ কথা মনে করা নিতান্ত ভুল হবে যে শিশু-মানবক পূর্ণ বিকশিত মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। মানুষের যে বৃদ্ধি তা শুধু পরিমাণগত নয়। শিক্ষা -দ্বারা শিশুমনের যে বিকাশ হয় তা

---

৩ Ah Love ! could thou and I with fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits and then
Remould it nearer to the Heart's Desire ? FitzGerald—Omar Khayya'm

৪ It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied. Mill—Utilitarianism.

বহুলাংশে শিক্ষা-নির্ভর এবং পরিণত মানুষ গুণগতভাবেই শিশু অপেক্ষা পৃথক। এই গুণগত পরিবর্তন শুধুমাত্র শিক্ষা -দ্বারাই সম্ভব, শিক্ষা -দ্বারাই মানুষ চেষ্টা করে প্রকৃতির সম্ভাবনাকে নতুন করে বিকশিত করে তুলতে।

শিক্ষা মানে কি? মানুষ চিরকাল এ কথা বিশ্বাস করে এসেছে যে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে গড়ে তোলবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিক্ষা। প্রকৃতি যে স্বল্প মূলধন দিয়ে মানবশিশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে বহুগুণে তা বিকশিত করবার, তাকে নতুন পথে চালনা করবার আশায় মানুষ যুগ যুগ ধরে সচেতন ভাবে যে-সব পন্থা অবলম্বন করেছে, যে-সব প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে, তাকেই বলা যায় শিক্ষা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবশিশু সমাজজীবনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।[৫]

বিধিবদ্ধ শিক্ষা

স্কুল-কলেজ বই-পত্তরের মাধ্যমে বিধিমত শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা তাকে বলে বিধিবদ্ধ বা আকারগত শিক্ষা (Formal education)। এ শিক্ষার নির্দিষ্ট আকার আছে—পাঠ্যসূচী আছে, রুটিন আছে, নিয়মকানুন আছে। সাধারণত আমরা শিক্ষা বলতে এই বিধিবদ্ধ শিক্ষার কথাই ভাবি। 'আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করছে' একথার মানে হচ্ছে তারা ইস্কুল-কলেজে খাতাপত্তর নিয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখাপড়া শিখছে। অবশ্য লেখাপড়াই শুধু নয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কাজের কৌশল শেখা, নিপুণতা অর্জন করাও বিধিবদ্ধ শিক্ষা। এ শিক্ষা হল হস্তপদের পেশী ইত্যাদির

---

৫ Education has always had, as its main purpose, the promotion and guidance of human growth or development. ...A nobler view of education is that... growth or development must always mean a kind of nurture which would allow that which was present from the beginning to grow or to develop and thus achieve adult form. Baldwin—Mental Development, Chap. I Also: The history of education is full of a point of view which describes education as a type of discipline or training. Such discipline...of course leads to growth. But the word 'growth' when used in biology has a different sense. When an object simply becomes larger in size or more complex in form it has grown; but the changes in it are to be measured quantitatively rather than qualitatively. The biological notion of growth, however, means not only change in size but actual change in form and function. This concept of growth, instead of being measured in quantitative terms, must be described for what it is, viz, a constantly emerging series of new forms and functions most of which could not have been predicted at any stage prior to this actual appearance. Modern theories of education incline towards this biological view of growth. Jenning—The Biological Basis of Human Nature.

সুশৃঙ্খল চালনা -দ্বারা হাতিয়ার বা যন্ত্র ঠিক ঠিক মতন ব্যবহার করে কিছু তৈরি করতে শেখা।[৬] এই দুই জাতীয় বিধিবদ্ধ শিক্ষার জন্যই চাই শিক্ষক, উপযুক্ত পরিচালনা, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী বা কর্মসূচী। এ-শিক্ষা অবশ্যই সচেতনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যাভিমুখী।

কিন্তু শিক্ষার আর একটা মস্ত অংশ আছে। সেটা কোন নির্দিষ্ট বিধি বা পদ্ধতি বা উপাদানের মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে দেওয়া হয় না। কিন্তু এই শিক্ষারও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজজীবনের উপযুক্ত করে শিশুকে গড়ে তোলা। এই শিক্ষাদানের জন্যে একটি মাত্রই নির্দিষ্ট পথ নেই এবং শিক্ষক এই শিক্ষা সচেতনভাবে ক্লাসের পড়ার মতো দেন না। এই শিক্ষায় শিক্ষক কোন একজন ব্যক্তি নয়। এ শিক্ষা হল যা শিশু অস্পষ্টভাবে, অচেতনভাবে তার চারপাশের সমাজ-পরিবেশ থেকে আহরণ করে। এ শিক্ষাকে বলা যেতে পারে অ-বিধি-বদ্ধ শিক্ষা (informal education)। শিশু যে তার বিশেষ নীতিবোধ, ধর্মীয় আচার, জীবন -সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করে, তা হচ্ছে এই অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষা। উৎসব অনুষ্ঠান পূজা-পার্বণ সভাসমিতি সংবাদপত্র রেডিও ছায়াচিত্র এরা হচ্ছে এই অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রধান উপাদান। সহজেই বোঝা যায় এই অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার সামাজিক মূল্য সামান্য নয়। বরঞ্চ আধুনিক যুগে সমস্ত রাষ্ট্রই শিশুর এ অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষা নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক আদর্শের পোষক হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে।[৭]

---

৬ Activity, or self-activity, has long been a fundamental principle in learning. Dewey emphasizes four types of activity as providing educative interests. Physical activity (including mental), intellectual activity, social activity and the use of tools work. He makes the point that it is the discovery and use of extra-organic tools which has made possible, both in the history of the race and of the individual complicated activities of a long duration—that is, with results that are long postponed. F. Keller—The Principles of Vocational Education, p. 116

৭ Formal education means that multiplied numbers of men have described a large number of exact learning situations together with the psychological traits that are known to grow under the influence of these situations. When such information as this is available, it is possible to group similar learning situations together in a single course and then to create as many courses as there are different classes of things to be learned. Each of these courses, including as it does a variety of learning situations of the same general character, makes up what one may call a single unit in the curriculum.

Informal education, on the contrary, ...depending as it does upon general environmental situations, leads most frequently to the development of the more general traits and dispositions. Informal education describes, therefore, all of those ways of promoting and guiding human development which are un-intentional or undefined. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, pp. 361-62

আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বিধিবদ্ধ শিক্ষা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও পরিচালনা -সাপেক্ষ। আধুনিক যুগের শিক্ষার এ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে শিক্ষা দিতে গেলেই শিক্ষককে জানতে হবে শিশুর মনকে, বুঝতে হবে শিশু-প্রকৃতি, তার বিকাশের বিভিন্ন স্তর, তার বিকাশের সাধারণ বিধি ; বুঝতে হবে শিশুর রুচি ও আগ্রহ কিসে ; কোন্ বিষয়, মানসিক-বিকাশ ও -প্রস্তুতির কোন্ অবস্থায়, শিশুর সামনে পরিবেশন করতে হবে। সুশিক্ষক হতে হলে জানতে হবে, মনোযোগের গতি ও প্রকৃতি, জানতে হবে মনোযোগ-আকর্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি। সাধারণ ভাবে শিশু-মনোবিদ্যা জানলেই শুধু চলবে না—তাঁকে জানতে হবে প্রত্যেকটি শিশুর বৈশিষ্ট্য, তার বুদ্ধি মেজাজ, প্রস্তুতির স্তর, তার আবেগজীবনের সংঘাত, তার সৃজনস্পৃহার মতিগতি। প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধি রুচি প্রবণতা গ্রহণযোগ্যতা না বিচার করে যান্ত্রিক ভাবে শিক্ষাদান করলে, শিক্ষকের চেষ্টা অনেকখানিই নিষ্ফল হবার আশঙ্কা থাকে। এতে শিক্ষকের উদ্যমের যেমন অপচয় ঘটে তেমনি শিশুর মনে অযথা ভয় নিরাশা ও আত্মধিক্কারের কারণ ঘটে।

প্রাচীন শিক্ষার ভ্রান্তি

অবশ্য শিক্ষা -সম্বন্ধে এসব কথা স্পষ্টভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে, খুব বেশীদিনের কথা নয়। আবহমানকাল থেকে, মানবজাতির শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের শিক্ষার চেষ্টা চলেছে ; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিভাবে শিক্ষা দিলে সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমস্ত চিন্তা ও আলোচনা নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত এবং অ-বিশ্লেষিত সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক, অস্পষ্ট এবং বিনা-প্রমাণে-মেনে নেওয়া কতকগুলি মূলনীতি থেকে শিথিলভাবে অনুসৃত (carelessly derived from certain dogmatic assumptions)। এক কথায় বলা যেতে পারে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং অ-নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এর মানে এ নয় যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সবটাই ভ্রান্ত ছিল এবং এর মধ্যে সত্য বা মূল্যবান কিছু ছিল না। দেশে দেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী গড়ে উঠেছে প্রত্যেক জাতির বহু-যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ওপর এবং এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবার মতো জিনিস নয়। তবে এর মধ্যে অনেক মূঢ়তা, অনেক ভ্রান্তিই ছিল। যেমন, প্রাচীনেরা মনে করতেন শিক্ষা ব্যাপারটাই

শিক্ষার্থীর পক্ষে বিরক্তিকর হতে বাধ্য; শিশু-প্রকৃতিই হল শিক্ষা-গ্রহণের বিরোধী; দুষ্টামীটাই তাদের স্বভাব—কাজেই শাস্তি তাড়না বেত্রাঘাত ব্যতীত শিক্ষকের কর্তব্য-সম্পাদন অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে সব দেশের শিক্ষার ইতিহাসই শিশুর ক্রন্দনমুখরিত,—অশ্রুসিক্ত শিশুসম্প্রদায়ের অভিশাপে কলঙ্কিত। ডেভিড্ কপারফিল্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের শিশুবিদ্যালয়-গুলির নির্মম নৃশংস পরিবেশের পরিচয় আমরা পাই। আমাদের দেশের পুরাতনকালের পাঠশালার গুরুমশাইদেরও ছাত্রপীড়নের ও দণ্ডদানের নিষ্ঠুর উপায় কিছু কম জানা ছিল না। তেমনি, কি করে কোন শিক্ষা দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা যেতে পারে, তা নিয়ে সব শিক্ষকেরই ধারণা ছিল, পুনঃপুনঃ অনুশীলনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। বর্তমান যুগে মনোবিদ্যা ওপরের দুটো ধারণাই অসম্পূর্ণ অ-নির্ভরযোগ্য এবং বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে।

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা-চিন্তার প্রধান ত্রুটি হল, তা মনোবিদ্যার দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আধুনিক যুগ একথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রতিষ্ঠিত মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই শিক্ষার ইমারত গড়তে হবে।

রুসো ও পেস্তালৎসি-র শিক্ষানীতি

ইয়োরোপের শিক্ষা-ইতিহাসে রুসো-ই প্রথম সবলে ও স্পষ্ট ভাষায় একথা প্রচার করলেন যে শিক্ষাকে শিশু-মনোবিদ্যার ভিত্তিতে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। না হলে তা ব্যর্থ হবে।

শিশুর মন একটা জীবন্ত বাড়ন্ত চারা গাছের মতো, তা জড় আধারমাত্র নয়। প্রত্যেক শিশু একটি বিশিষ্ট সত্তা। কাজেই প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য -অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে—তবেই না প্রত্যেকটি চারা গাছ তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণতায় বেড়ে উঠে মহীরুহের সার্থকতা লাভ করবে। পেস্তালৎসি (Pestalozzi—1746-1827) বলেছিলেন, "সমস্ত সার্থক শিক্ষার মূল ছাত্রের মনে জন্মকালেই বিদ্যমান এবং শিক্ষাটা ছাত্রের ভেতর থেকেই আকর্ষণ করতে হবে।"[৮]

---

৮ All true and educative instruction must be drawn out of the pupils themselves, and must be born with them. Corrie Gordon—Essays on the Child and his Education: Pestalozzi.

পেস্তালৎসি শিক্ষায় যে নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন তা ক্রমেই পুষ্টিলাভ করছে। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু গৌণ নয়। তাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার সার্থকতা। স্যার জন অ্যাডামস্ বলেছিলেন, শিক্ষা-ক্রিয়ার দুটি কর্ম আছে, একটি হচ্ছে ছাত্র, আর একটি হচ্ছে বিষয়বস্তু। শিক্ষক জন্-কে ল্যাটিন ভাষা শেখাবেন। শিক্ষকের তাই ল্যাটিন ভাষায় যেমন বুৎপত্তি থাকা চাই, জন্-এর মনটিকেও তেমনি জানা চাই।[৯] পেস্তালৎসি-র শিক্ষাপদ্ধতির এটি একটি মৌলিক বিশেষত্ব যে তা শিশুকে মর্যাদা দিয়েছে। ফ্রোএবেল্ (Froebel—1782-1852) এবং মন্তেসরী-র (Montessori—1870-1962) শিক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্য আরো বেশী প্রকট।

শিশুর মনকে জানতে হবে

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে মতই আমরা গ্রহণ করি না কেন, শিশুর মনকে জানতে হবে এবং সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই গড়ে তুলতে হবে, এ কথা নিঃসন্দেহ। "শিশুশিক্ষায় যিনি আগ্রহশীল তাঁর কাছে শিশুর ব্যবহার জানা তার শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথাটা এতই স্পষ্ট যে শিশু-শিক্ষাকে শিশু-মনোবিদ্যার ওপর স্থাপন করবার প্রশংসা প্রথম রুসো-রই প্রাপ্য এটাই বেশী বিস্ময়ের কথা, না রুসো-র এ পরীক্ষা তাঁর কালের তুলনায় অতিশয় অগ্রসর বিবেচিত হয়েছিল, এটাই বেশী আশ্চর্য, তা জানি না।"[১০]

পেস্তালৎসি রুসো-র কাছ থেকেই তাঁর শিক্ষানীতির মূলসূত্র গ্রহণ করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদের পক্ষে মনোবিদ্যা অপরিহার্য। কথাটা একটু আলোচনা করা যাক্।

শিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনটি মত

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আছে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ তাদের

৯। Verbs of teaching govern two accusatives, one, of the person, another, of the thing; as Magister Johannem Latinum docuit—the Master taught John Latin. Adams—Herbertian Psychology Primer on Teaching.

১০। ...the fundamental importance of a knowledge of children's way to any one who aspires to teach them, is so obvious, that one knows not whether to be more surprised that Rousseau should be credited with having been the first to base education entirely on the child to be educated, or that in doing so he was so much before his time. W. Drummond—The Child, p. 8

তিনটি দলে ভাগ করেছেন এবং হাল্‌কাভাবে উপমার সাহায্যে তাদের স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম পদ্ধতিকে তিনি নাম দিয়েছেন **বড় জলপাত্র ও ছোট জলপাত্র মতবাদ** ('Jug and mug' theory)। দ্বিতীয় হচ্ছে **কুম্ভকার ও মৃত্তিকা মতবাদ** ('Potter and the clay' theory)। তৃতীয়ের নামকরণ করেছেন **মালী ও চারাগাছ মতবাদ** ('Gardener and the plant' theory)।

প্রথম মত হচ্ছে, শিশুর মন একটি শূন্য নিষ্ক্রিয় আধার। মাপেও সে আধার ছোট। শিক্ষকের মন হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড, সে জ্ঞানভাণ্ডার উপুড় করে শিক্ষক ছাত্রদের মনকে ভরে তুলবেন। শিক্ষক হচ্ছেন বৃহৎ ভাণ্ড (Jug), আর শিশুমন হচ্ছে ক্ষুদ্র পাত্র (Mug), আর শিক্ষার কাজটা হচ্ছে—ঢালাঢালির ব্যাপার (pouring in)।

দ্বিতীয় মতটা হচ্ছে, শিশুর মন নিষ্ক্রিয় নরম কাদার তাল, শিক্ষক তাকে নিজ আদর্শ- ও রুচি-অনুযায়ী রূপ দেবেন।

তৃতীয় মত হচ্ছে, শিশুর মন বাড়ন্ত চারাগাছ—তার প্রকৃতি-অনুযায়ী তার প্রয়োজন-অনুসারে, তার সার্থক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষক তাকে লালন করবেন, যত্ন করবেন, প্রয়োজনবোধে ছাঁটাই করবেন, আলোর দিকে তার বাড়তির স্বাভাবিক গতির পথে বাধা যথাসাধ্য অপসারণ করে তাকে নিজ স্বকীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন।[১]

[১] The child is the mug (I speak in metaphors!) and the teacher is the jug. The jug tips its contents into the mug and that's that. What was in the teacher's mind is now in the child's or rather, in ninetynine cases out of a hundred, it is not.

The teacher is the potter and the child the clay. The potter has decided what he wants the clay to become, and he moulds it and shapes it to his own particular pattern, and eventually the clay becomes what the potter wants it to be. The difficulty here is that the potters have some queer ideas about design, they are not always very skilled at their job, and the clay—if it could speak—might want to be something quite different.

The teacher is the gardener and the child the plant. The plant has certain common characteristics with all other plants, some peculiar to its own species, and some quite individual to itself. Moreover it is growing, whether the gardener likes it or not, according to the laws of its being. The job of the gardener is to water when necessary, manure when necessary, prune when necessary, transplant when necessary, or in other words to help the plant to grow, but not to try and turn it into something else or to interfere with its normal and proper development. J. W. Newsom—The Child at School, p. 6

শিক্ষার ভিত্তি হবে মনোবিদ্যা

এখন এই প্রত্যেকটি মতের পেছনেই রয়েছে শিশুমনের স্বরূপ সম্বন্ধে এক একটা ধারণা, এবং আমরা যদি বলি তৃতীয় মতটি নিঃসন্দেহে সত্য, তাহলে তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়েই।

শিক্ষার আদর্শের প্রশ্ন মনোবিদ্যার অন্তর্গত নয়—অন্তত প্রত্যক্ষভাবে নয়। কারণ মনস্তত্ত্ব হচ্ছে সদর্থক বিজ্ঞান (positive science)। সে আলোচনা করে মানুষের মনের উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলো কি, এবং কেমন ভাবে তাদের পরিণতি ঘটে। এ বিজ্ঞানের কাছে কি ঘটে ও কি ঘটে না, এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়, কিন্তু কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। কাজেই শিক্ষার আদর্শের প্রশ্ন, নৈতিক মূল্যের প্রশ্ন মনোবিদ্যার অন্তর্গত নয়। কিন্তু আদর্শ যদি মূল্যহীন এবং অসম্ভব না হতে হয়, তবে তার বাস্তব ভিত্তি হবে মানুষের, বিশেষ করে, শিশুমনের স্বরূপ -সম্বন্ধে মনোবিদ্যার সুচিন্তিত মত। বাঘের স্বরূপ যদি হয় সে মাংস খাবেই, তবে তার জন্য বৈষ্ণব নিরামিষ আদর্শ অর্থহীন। প্রকৃতি-অনুযায়ী বিকশিত করাই তো শিক্ষার আদর্শ। "বাঘের বাচ্চারে, বাঘ না করিনু যদি, কি শিখানু তারে?" রবীন্দ্রনাথের 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় গুরু গোবিন্দ শিক্ষার মূল কথাটাই প্রকাশ করেছেন।[১২]

শিক্ষার আদর্শ ও মনোবিদ্যা

রস্ (Ross) ঠিকই বলেছেন, "যদিও মনোবিদ্যা শিক্ষার আদর্শ বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে না তথাপি যে মনোবিদ্যার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি তা আমাদের তৎক্ষণাৎ বলে দেয় শিক্ষার কোন বিশেষ আদর্শ নিতান্তই অবাস্তব আকাশকুসুমবৎ, অথবা তার রূপায়ণ সম্ভব।"[১৩]

কোন শিক্ষার আদর্শ সত্য কিনা, তার পরীক্ষা করতে হলে তা মনস্তত্ত্বানুযায়ী কিনা, এ প্রশ্ন নিরর্থক নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মধ্যযুগীয় নিরানন্দ কঠোর নির্মম শিক্ষাপদ্ধতির নিগড় থেকে প্রথম শিশুকে মুক্তি দিয়েছেন রুসো। এ জন্যে শিক্ষার জগতে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

---

১২ রবীন্দ্রনাথ—শেষ শিক্ষা

১৩ Although psychology cannot formulate the aim of education, a reliable psychology will tell us at once whether an aim is hopelessly in the clouds or whether it is possible of achievement. Ross—Groundwork of Educational Psychology, p. 5

মধ্যযুগীয় শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে ছিল এই ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব যে, মানব-শিশু স্বভাবতই দুষ্ট-প্রকৃতি অলস অমনোযোগী, তাই শিক্ষার আদর্শ ছিল মানুষের মনের এই স্বাভাবিক বিকৃতিকে শাসন দিয়ে শোধন করা। শিক্ষার অর্থই ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধতার—শাসন-সংযম এবং সম্ভব হলে, তার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন। রুসো প্রচার করলেন, শিশু স্বভাবত সরল নিষ্পাপ ও জ্ঞান-পিপাসু। আমাদের পাপপঙ্কিল সমাজ ও পারিবারিক পরিবেশ তার মনকে বিকারগ্রস্ত করে, তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে তাকে তার "স্বভাবে" প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা নয় ("to work with nature and not against nature")। রুসো বলছেন, "প্রকৃতির হস্ত থেকে যা আসে তাই কল্যাণকর ("whatever proceeds from the hand of nature is good")। শিক্ষকের কাছে তাই তাঁর হৃদয়স্পর্শী আবেদন, "শৈশবের প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও; শিশুর প্রতি সদয় হও। এ তোমার প্রধান কর্তব্য; শৈশবকে ভালবাসো, তার ক্রীড়া, তার আনন্দ, তার শুভ প্রবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত কর।"[১৪]

ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের ভিত্তির ওপর স্থাপিত মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিল রুসো-র সহৃদয় মতবাদের কাছে। ফ্রেডেরিকা ম্যাকডোনাল্ড লিখেছেন, "সারা ইয়োরোপ জুড়ে রুসো-র দৃপ্ত কণ্ঠ মানুষের অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তার চেয়েও অশান্ত বাগ্মিতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন শিশুর অধিকার। মধ্যযুগে মানুষ আদিম ও মজ্জাগত পাপে বিশ্বাস করত এবং এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে নির্মম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার অবসান ঘটল।"[১৫]

শিক্ষায় শাসনের স্থান

কিন্তু রুসো-র মতবাদও অভ্রান্ত ছিল না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তিনিও ভুল করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, শিশু স্বভাবতই সরল ও

---

১৪ Encourage childhood; O men, be humane; it is your foremost duty; love childhood, encourage its sports, its pleasures, its amiable instincts. John Morley—Rousseau, Vol.II

১৫ Throughout Europe Rousseau's voice went proclaiming with even more restless eloquence than it had proclaimed the rights of man, the rights of childhood. Harsh systems founded on the old mediaeval doctrine of innate depravity were overthrown. F. MacDonald —Rousseau. p. 21

নিষ্পাপ, এবং প্রকৃতির নির্দেশ-অনুযায়ী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পরবর্তীকালে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু শয়তানের বাচ্চাও নয়, দেবশিশুও নয়। ভালো ও মন্দ দুই-এর বীজই রয়েছে শিশুর আদিম প্রকৃতির মধ্যে। তাই রুসো-র মহৎ আদর্শও শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ভালবাসা, শুধু মাধুর্যই যথেষ্ট নয়। তাতে শাসন এবং কঠোরতারও স্থান আছে। গিলবার্ট হাইএট্ ঠিকই বলেছেন, "শিশুকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়েও নির্বোধ এবং জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হবার অনুপযুক্ত করে তোলা যায়।"[১৬]

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় খেলা, আর শিশুর মন-ভোলানো ছড়া ও ছবির অনেকখানি স্থান আছে, কেননা তা মনস্তত্ত্ব-সম্মত। কিন্তু এটা শিশু-মনস্তত্ত্বের একটা দিক। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সফল হয়েছে ততখানিই, যতখানি এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই "মন-ভোলানো শিক্ষারও" বিপদ আছে। একে অব্রে দ্য সেলঁক্যুর (Aubrey de Selincourt) ঠাট্টা করে বলেছেন, মোয়া দিয়ে ছেলেভুলানো ("Sugarplum habits")। এর বিপদ হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় শিশুর মনের একটা তথ্যের ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই সেলঁক্যুর বলেছেন, "ছোট শিশুর পক্ষে মিষ্টি মোয়া ভালই ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির পরিমাণটা কমিয়ে আনা দরকার, যাতে স্কুল ছাড়বার আগে সে তার বিদ্যার ভোজে স্বাস্থ্যপ্রদ তিক্ত ও ঝাল আস্বাদেও রস পায়।"[১৭]

যাক্, শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ বিচার করবার স্থান এ নয়। আমরা এ কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি যে মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করে বা উপেক্ষা করে শিক্ষার কোন আদর্শই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষা মনোবিদ্যা -অনুযায়ী হতেই হবে। কোন আদর্শের সত্যতা শুধু মাত্র তার "মহত্ত্ব"র ওপর নির্ভর করে না। শিশুর ক্ষমতার সঙ্গে মিল না রেখে যে শিক্ষাদর্শ রচিত হয়, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

---

১৬ You can give a child so much love as it can absorb and still make it an idiot unfit to face the world. Gilbert Highet—The Art of Teaching, p. 10

১৭ Sugarplums are well enough for infants; but the sugar must be diminished in quantity as the children grow, and before they leave school they must be able to relish a wholesome asperity and bitterness in their intellectual diet. Aubrey de Selincourt—The School-master, p. 8

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার পদ্ধতি- ও আদর্শ-নির্ধারণ করতে মনোবিদ্যার ওপর নির্ভর করতেই হবে। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও পদে পদে মনোবিদ্যার সাহায্য দরকার।

কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনটি :

(১) **শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করা**। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার সুষম ও সম্পূর্ণ বিকাশ শিক্ষা-সাপেক্ষ। এটা আপনা থেকেই হয় না। শিক্ষাই তার ভেতরের শুভ সংস্কারগুলিকে তার নিজের ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে এবং তার অন্যায় হিংস্র প্রবৃত্তি ও সংস্কারগুলিকে লজ্জা দিয়ে, শাস্তি দিয়ে দমন করতে পারে।

(২) শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে **শিশুকে তার সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধে যুক্ত হতে সাহায্য করা**। এ কাজে বিধিবদ্ধ শিক্ষার চেয়ে অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার দাম অনেক বেশী—যদিও অনেক সময় একথা আমরা ভুলে যাই এবং বইপুস্তকের সাহায্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলে আমরা মনে করে থাকি।[১৮] প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিই তার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তার সন্তানদের কাছে নিজ নিজ ঐতিহ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসগুলি পৌঁছে দেয়। কম্যুনিস্ট দেশগুলি কম্যুনিজ্‌মের আদর্শেই যাতে সে দেশের ছেলেমেয়েরা গড়ে ওঠে এর জন্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যামেরিকাও তার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এ চেষ্টা করে যাতে দেশের সমস্ত শিশু অ্যামেরিকান জীবনাদর্শে (American way of life) বিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে।[১৯] সমাজের

---

১৮ Almost by common consent we act as though the growth products of the schoolroom were the more important...We take for granted that the informal environment costs nothing and yet it is easy to see that an uncontrolled environment which surrounds the child living today is immensely more costly than the uncontrolled environment which surrounds a child in a very primitive society. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 362

১৯ এ চেষ্টা কত দূর সঙ্গত তা নিয়ে অবশ্য বারট্রাণ্ড রাসেল্‌-এর মত অনেক মনীষী আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে যা মনকে মুক্ত করবে, যা ব্যক্তিকে তার সমাজের মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে 'স্বাধীন' হতে সাহায্য করবে।

A recent writer has said, for example, that an educated man is one who can place himself above, rather than remain within the domain of his own beliefs and ideals. Martin—The Meaning of a Liberal Education, pp. vii—viii

একজন উপযুক্ত সভ্য ও সেবকরূপে শিশু প্রস্তুত হয়ে উঠুক এটা শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য, এতে সন্দেহ নেই।

(৩) শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে **শিক্ষার্থীর সৃজনী-প্রতিভা ও উদ্যমকে মুক্ত করা।** অবশ্যই এই উদ্দেশ্য প্রথম দুই উদ্দেশ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সামাজিক আধারেই সম্ভবপর। দশজনের সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি নিজেকে জানে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে এবং অপরের সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থানটি খুঁজে নেয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র অতীতের সঙ্গে যুক্ত করা নয়, নতুন ভবিষ্যতে সৃজনের শক্তিতে তাকে বিশ্বাসী করাও বটে। কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতকে অস্বীকার করে, এমন কি ধ্বংস করে নতুনকে গড়বার ক্ষমতাও শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশু অর্জন করে। শিক্ষাপুষ্ট মানবমনের সৃজনী-শক্তির প্রয়োগেই সমাজ সতত অগ্রসর হয়ে চলে।

মনোবিদ্যার নতুন মর্যাদালাভ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ -দ্বারা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কার- ও উন্নতি-সাধনে আধুনিক মানুষ চেষ্টিত। মনোবিদ্যা তাই আধুনিক মানুষের কাছে নতুন মর্যাদালাভ করেছে। সমাজ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিদ্যাই আজ মনোবিদ্যা-আশ্রয়ী। মানুষের মনকে ভালো করে জানলে বুঝলে তবেই তো তাকে উদ্দিষ্ট পথে চালনা করা যায়। তাই যুদ্ধ ও শান্তি, শিল্প ও বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আনন্দবিতরণ সমস্ত ব্যাপারেই সুপরামর্শ দেবার জন্যে আজ মনোবিদ্যাবিশারদের ডাক পড়ে। বিশেষ করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপরই সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। বিশেষত তিনটি দিকে **শিক্ষার মনোবিদ্যার ব্যবহার** অপরিহার্য—(১) **শিশুর প্রকৃতি জানা**; (২) **আমাদের নিজেকে জানা**; এবং (৩) **শিশুশিক্ষার সফল পদ্ধতি-নির্ধারণ এবং শিশুকে পরিচালনার জন্য ঠিক উপায়টি উদ্ভাবন।**

শিক্ষা-ক্রিয়ায় রয়েছে তিনটি সম্বন্ধ: (১) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ; (২) শিক্ষার্থী ও সমাজের সম্বন্ধ এবং (৩) শিক্ষার্থী ও শিক্ষার বিষয়ের সম্বন্ধ। এই তিনটি সম্বন্ধই যাতে সুষ্ঠু ও সফল হতে পারে, ঠিক দিকে বিকশিত হতে পারে সে জন্যে মনোবিদ্যার আশ্রয় নিতেই হবে।[২০] বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক

২০ Ryburn—Introduction to Educational Psychology, pp. 1-6

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে মনোবিদ্যাশ্রয়ী। **শিক্ষার আশ্রয় মনোবিদ্যা, মনোবিদ্যার আশ্রয় শিক্ষা নয়। কাজেই 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা' কথাটি বিভ্রান্তিকর।**

শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানে মনোবিদ্যা

কি করে মনঃসংযোগ হয়, কিসে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, কেন আমরা ভুলে যাই, শিশুর মানসিক বিকাশের স্তরগুলি কি, প্রত্যেক স্তরের কি বিশেষত্ব, কোন্ স্তরে কোন্ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, বুদ্ধির প্রকৃতি কি, তার পরিমাপ কি করে হতে পারে, শিশুর অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলি কি, কি করে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনা ও আবেগের কি স্থান, জড়বুদ্ধি, অতিবুদ্ধিমান, শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যযুক্ত শিশুদের শিক্ষা কি করে দিতে হবে, শিক্ষায় শাস্তি ও পুরস্কারের তাৎপর্য ও প্রভাব কতটা, ক্লান্তি ও অবসাদ কেন আসে, তাদের প্রতিকার কি—এ প্রকারের সহস্র বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রত্যেক শিক্ষককে। কিন্তু এ প্রশ্নগুলির সদুত্তর ও সুমীমাংসা মনোবিদ্যার কাছেই কেবল পাওয়া যেতে পারে।

আধুনিক যুগে শিক্ষা একটা আন্দাজী ব্যাপার নয়। প্রযুক্ত মনোবিদ্যা (Applied Psychology) তার দৃঢ় ভিত্তি। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নিয়ে শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা ও গবেষণা করছেন। সমস্ত অগ্রসর দেশে শিক্ষা সে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত দিয়ে উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষা-ক্রিয়ায় কি করে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করা যায়, সে কথা জেনে তার সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যা কি ?

শিক্ষককে মনোবিদ্যা জানতেই হবে। কিন্তু সে মনোবিদ্যা হচ্ছে 'কেজো' জিনিস। শুদ্ধ (abstract) মনোবিদ্যার আলোচনা শিক্ষকের কাছে ততটুকুই প্রয়োজন, যতটুকু শিক্ষা-কর্মে তাঁকে সহায়তা করে। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational Psychology) পরিধি সাধারণ মনোবিদ্যা (General Psychology) অপেক্ষা সংকীর্ণ। তাই স্যাণ্ডিফোর্ড শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিচ্ছেন, **"শিক্ষা-মনোবিদ্যা হচ্ছে প্রযুক্ত মনোবিদ্যার অন্তর্গত একটি প্রধান বিষয়। এ শুধু মনোবিদ্যার নীতিগুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে**

ব্যবহার করে। এর বিষয় হচ্ছে যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে (শিক্ষার্থী) তাদের ব্যবহার। সাধারণত বলা যেতে পারে শিশু কিশোর ও যুবকদের নিয়েই এই বিদ্যার কারবার—বৃদ্ধদের নিয়ে ততটা নয়। এর বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষাগ্রহণরূপ কার্য চলেছে এবং এ কার্যের সঙ্গে যুক্ত নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাইরের বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে এর ততটা কারবার নয়।[২১]

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে শিক্ষা-মনোবিদ্যা শুদ্ধ মনোবিদ্যার প্রযুক্তি -বিষয়ক একটি বিশেষ শাখা। কিন্তু **শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষারূপ বিশেষ ক্ষেত্রে শুদ্ধ মনোবিদ্যার প্রয়োগ মাত্র, একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক হবে না।** শিক্ষার প্রতি ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণার ফলে শিক্ষা-মনোবিদ্যা আজ মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ একটি স্বাধীন বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার পথে চলেছে। এ সম্বন্ধে গেটস্ (Gates) বলেছেন, "শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ মনোবিদ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করে, তাদের সত্যতা-নির্ধারণই কেবল মাত্র করে থাকে, একথা মনে করা ঠিক নয়। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষা ও শিক্ষণের নানা ক্ষেত্রে এমন সব নানা সমস্যার সুপরিকল্পিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, যা নিয়ে শুদ্ধ মনোবিদ্যা কোনরূপ বিশদ আলোচনা করে না। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান -বিষয়ে অথবা আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক নতুন রকম প্রকল্প (projects) বা ক্রিয়ার অবতারণা করা হচ্ছে: শিক্ষাদানের কাজে নানা অসুবিধা ও বাধা দেখা দেয়, কি তাদের মূল কারণ এবং কি ভাবে সে সব ত্রুটি সংশোধন করা যাবে; শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি-পরিমাপের যে নতুন পরীক্ষা হচ্ছে, তাদের মূল্যায়ন; নার্সারী বিদ্যালয়, বয়স্কদের শিক্ষা, অথবা শিক্ষার ব্যাপারে পথনির্দেশ (guidance)—এ সমস্ত শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ সমস্যা বিষয়ে

---

[২১] Educational Psychology is a major branch or sub-division of applied psychology. It utilizes the laws and principles discovered by 'pure' psychology. Its subject matter is the behaviour of human beings undergoing the process of education. Generally speaking, it deals with the young rather than with the old, and the learning situation of the school rather than those of the wider environment. Peter Sandiford—Educational Psychology, p. 9

অনুসন্ধানের অল্প কয়েকটি উদাহরণ। এ সব বিষয়ে আলোচনা শুদ্ধ বা সাধারণ মনোবিদ্যায় অত্যন্ত সামান্যই পাওয়া যাবে।"[২২]

রস্-ও শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কি তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন, "যিনি বাস্তবিক শিক্ষকতা করেছেন, বা যিনি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান, তিনি শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাছে প্রথমত এ দাবি করেন যে তা শিক্ষক ও ছাত্রের প্রকৃতি -সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে।…দ্বিতীয়ত তিনি এ বিদ্যার কাছ থেকে একথাটি জানবার আশা রাখেন কি করে একজনের ব্যক্তিত্ব -দ্বারা অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারা যায়, কি করে সমষ্টিজীবন ব্যক্তি-জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে।…তৃতীয়ত তিনি নিশ্চিতই আশা করবেন যে এ বিদ্যা শিক্ষাদানরূপ প্রাচীন কর্ম-সম্বন্ধে পথনির্দেশ করতে পারবে।"[২৩]

এক অর্থে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা কল্পনা করি, যা আমরা অনুভব করি, যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, যা আমরা চিন্তা করি, যা আমরা অনুমান করি, সবই তো মনের ব্যাপার—তাই মনোবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু শিক্ষক শুধু মনোবিদ্যার সেই অংশ -সম্পর্কেই উৎসাহী যা তাঁর শিক্ষার সহায়ক হবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ এবং এর মধ্য দিয়ে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ কি করে হবে, মনোবিদ্যার সে সব সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যই মূলত শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

শিশুর মন কি, তার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নটি আলোচনা করতে গেলেই বংশগতি

---

২২ Educational psychology is, however, not confined to the verification or applications of principles to education. It has built up in several areas programs of study of educational problems which general psychology does not deal with in any comprehensive way. Such areas as the teaching of the school subjects, and especially the conducting of the newer types of activity program and projects: diagnosis and remediation of educational difficulties: the newer types of evaluation of eduacational attainments: the improvement of practices in nursery school, adult education and educational guidance —these are examples of fields of specialization for educational psychologists. These are fields that general psychology touches in only a limited way. Gates, Jersild & Others—Educational Psychology (3rd Ed.), p. 4

২৩ J. S. Ross—Groundwork of Educational Psychology p. 9

(Heredity) এবং পরিবেশ (Environment) -সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। শিশু তার দেহ যেমন পায় পিতামাতার থেকে, তার মনের গড়নও কতকটা পায় সেই সূত্রেই। সৎ ও বুদ্ধিমান পিতামাতার সন্তান মোটামুটি সৎ ও বুদ্ধিমানই হয়। "বাপ্ কা বেটা,"—আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হয়, কাঁঠাল গাছ হয় না। কাজেই বংশগতি জিনিসটা কি, কি করে পিতামাতার গুণাগুণ শিশুতে সংক্রামিত হয়, সে কথাটা আমাদের জানা দরকার।

কিন্তু বীজই সব নয়। বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত যত্ন পেলে, উপযুক্ত পরিবেশেই বেড়ে ওঠে। কাজেই পরিবেশের প্রভাব সামান্য নয়। "ভাল ঘরের ছেলে", "ভাল বংশের মেয়ে" হলেই কি শিক্ষা ভাল হবে? তা হলে তো শিক্ষকের কাজ অনেকটা সহজ হত। তাঁর কাজ হত ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে বাছাই করে স্কুল গড়া। কিন্তু তা তো নয়। শিশুর মন শুধু পিতামাতার থেকে বংশগতির সূত্রে যা পায়, তাই নয়। তার ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, তার সমাজ, তার গৃহ ও প্রতিবেশী, তার খেলাধুলার সঙ্গীসাথী, তার শিক্ষক ও উপদেষ্টা,—তার সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক পরিবেশও তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে—তার মনকে প্রসারিত করে, বিকশিত করে, তার গতি-নির্ধারণ করে, অথবা বাধা দেয়, বিকৃত করে, পঙ্গু করে। তাই শিশুর মনের ওপর তার পরিবেশের প্রভাব বংশগতির প্রভাবের চেয়ে কম নয়। শিশুর বংশগতির ব্যতিক্রম করা শিক্ষকের সাধ্যের ওপর নির্ভর করে না, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিবর্তনেরও ক্ষমতা শিক্ষকের নেই—তথাপি তার নৈতিক চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা শিক্ষকের কতকটা আছে। অন্তত, এটা একটা মূল প্রশ্ন, বংশগতি বা পরিবেশ, কার প্রভাব কতটা—তাদের সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তা নির্ভর করবে। উডওয়ার্থ প্রশ্ন করেছেন, "ভাল ফল পেতে হলে মালি কিসের ওপর বেশী নির্ভর করবে? জমি, সযত্নে চাষ ও সারের ওপরে, না ভালো বীজ বাছাইয়ের ওপরে?"[২৪]

মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে গেলে দেহের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধও বুঝতে হয়, কারণ দেহমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির

[২৪] Shall the gardener pin his hope on careful cultivation of the soil or on selection of the best seed? Woodworth—Psychology, p. 154

মধ্যে দেহের যে যে অঙ্গ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাদের কথা মোটামুটিভাবে জানা দরকার। তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকেন্দ্র স্নায়ুমণ্ডলী মেরুদণ্ড পেশী শিরা গ্রন্থি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই আমাদের **কতকগুলি বৃত্তি জন্মগত** (instinctive), **কতকগুলি আয়াসলব্ধ** (acquired)। সুতরাং জন্মগত বৃত্তিগুলির স্বরূপ, তাদের ব্যাপকতা, শিক্ষার কাজে এ বৃত্তিগুলিকে কতটা ভিত্তি করা যায়, বুদ্ধি, অনুভূতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ,—এই সব কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার প্রধান প্রধান পথ ইন্দ্রিয়গুলি। তারা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জ্ঞান অবিভাজ্য হলেও যুক্তির দিক থেকে তাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।[২৫]

শিক্ষালাভের আর একটা পথ স্মৃতি। মনে-রাখা ও ভুলে-যাওয়া কি করে হয়, কি করে অর্জিত শিক্ষাকে মন সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সে কথা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। তার **শিক্ষায় কল্পনার স্থান** সামান্য নয়। কাজেই তার স্বরূপ ও বিকাশ বোঝা দরকার।

মনঃসংযোগ না হলে শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষককে জানতে হবে মনঃসংযোগ-আকর্ষণের নীতি ও তথ্যগুলি।

বস্তুবিবর্জিত জ্ঞান, যুক্তির ব্যবহার, একেবারে শিশুদের পক্ষে সচেতন ভাবে সম্ভব নয়। তথাপি এ জ্ঞানের অঙ্কুর শিশুর মনেও প্রত্যক্ষ করা যায়; কি করে ক্রমে ক্রমে সচেতনভাবে শিশু যুক্তির ব্যবহার করতে শেখে তা আমাদের বুঝতে হবে। এই সম্বন্ধেই জানতে হবে শিশুর ভাষাজ্ঞান কি ভাবে বিকশিত হয়।

জানা (learning) কি করে সুষ্ঠুভাবে আয়াসের অপব্যয় না ঘটিয়ে হতে পারে, তা আমাদের আলোচনা করতে হবে। কি করে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী হতে পারে এ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বহু হয়েছে, তার ফলাফল-গুলি এবং **জানার মূলনীতিগুলি (Laws of Learning)** আমাদের বুঝতে হবে। জ্ঞানচর্চার ফলে অবসাদ (fatigue) আসতে পারে। তাতে শিক্ষার কাজ ব্যাহত হয়। বিরক্তিও (boredom) শিক্ষালাভের পথে বাধা। অবসাদ ও বিরক্তির স্বরূপ এবং তা বিদূরণের বা প্রশমনের উপায় শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়।

---

২৫ Ward—Psychological Principles, p. 6

শিক্ষার ক্ষেত্রে **বুদ্ধির বিভিন্নতা** স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধি জিনিসটা কি,তার মাপ কি করে হতে পারে, তা কি ভাবে বাড়ানো যায়, কতটা বাড়ানো যায়, সেটা শিক্ষকের পক্ষে জানা দরকার। বুদ্ধির মাপে যারা অসাধারণ **প্রতিভাশালী শিশু** (exceptionally gifted) এবং একেবারে **বুদ্ধিহীন** (idiots) তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন হতে হবে। শিক্ষককে সে কথাও জানতে হবে। যাদের মন **বিকারগ্রস্ত যারা দুষ্ট** (abnormal or delinquent) তাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। শুধু বুদ্ধি নয়, মানসিক ও দৈহিক সমস্ত গুণ ও দোষ সকলের এক রকমের নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ প্রভেদ-নিয়ে নানা আলোচনা করছেন। এ বিভেদগুলি পরিমাপের নানা উপায় ও পদ্ধতিও আমাদের জানতে হবে।

শিশুর জীবনে **অনুভূতির** (emotions) স্থান সামান্য নয়, তাই শিশুর অনুভূতির স্বরূপ জানতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিকূল ও অনুকূল প্রভাব বিবেচনা করে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

চঞ্চলতা, কর্মমুখরতা শিশুর ধর্ম। খেলার মধ্য দিয়ে সে শেখে, বেড়ে ওঠে, ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ খোঁজে। সে অনুকরণ করে। একটু পরিণত হলে সে বিবেচনা করে কাজ করতে শেখে। তার মনের এই দিকটাও তাই বুঝতে হবে। শৃঙ্খলা ও শাসন কি উপায়ে তার চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায় হতে পারে, শিক্ষককে তা ভাল করে জানতে হবে। মনের বিকারের সমস্যা শিক্ষকের বিশেষ বিবেচ্য। কেন এই বিকার ঘটে, কি করে এর নিরাময় সম্ভব, এ সব কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা শিক্ষা-মনোবিদ্যার এ মূল প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব।

শিক্ষা-মনোবিদ্যার পরিধি—শিক্ষা-মনোবিদ্যা দ্রুত বাড়ন্ত এক বিজ্ঞান, কাজেই এর পরিধিও ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে নানা নতুন নতুন পরীক্ষা হচ্ছে, সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গী ও মত বদলে যাচ্ছে—শিক্ষা-মনোবিদ্যা নানা নতুন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে শুরু করেছে। তাই এই বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট সীমানির্দেশ করা অসম্ভব। এটা কোন দোষের কথা নয়। সমস্ত জীবন্ত বাড়ন্ত বিজ্ঞানেরই এটা বৈশিষ্ট্য।

ম্যাককীন্ ক্যাটেল্ (J. Mackeen Cattell) মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—মনোবিজ্ঞানীরা যে কাজে একে লাগান তাই হচ্ছে মনোবিদ্যা (Psychology is what psychologists do)। 'এ ইঙ্গিত অনুসরণ করে

আমরা প্রশ্ন করতে পারি—শিক্ষা-মনোবিদ্ এই বিজ্ঞানকে কি কাজে লাগান? এর উত্তর হচ্ছে শিক্ষাকর্মের কাজেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রয়োগ। এ সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিদ্ যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন তাদের চারটি প্রধান দলে ভাগ করা যেতে পারে—

১। শৈশব থেকে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর **মানসিক, দৈহিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের (mental, physical and emotional development) ধারা-অনুসরণ**।

২। **শিক্ষাগ্রহণ-ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত মানসিক ক্রিয়া**—যথা প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, চিন্তন, যুক্তিবিচার ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, প্রকৃতিনির্ণয় ও তাদের নিয়মগুলি আবিষ্কার। আবার অন্যদিকে **শিক্ষাদান ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিষয়**—যেমন শ্রেণীসংগঠন, পাঠ্যসূচী-নির্মাণ, মনোযোগ-আকর্ষণ, আগ্রহসৃষ্টি, তিরস্কার ও পুরস্কার-সংক্রান্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৩। **শিক্ষার্থীর বুদ্ধি প্রবণতা কুশলতা ইত্যাদি বিবিধ শক্তির পরিমাপ**—শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিমাপ। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার। শিক্ষার উন্নতি-অবনতির মূল্যায়ন। শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-নীতি (system of examination) -নির্ধারণ।

৪। **বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরস্পরের সঙ্গে সহজ মেলামেশা, সঙ্গতি বা বিরোধ -সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান**। যারা স্বল্পবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি অথবা অতিরিক্ত প্রতিভাসম্পন্ন অথচ দৈহিক বা মানসিক দিক থেকে রুগ্ণ তাদের লক্ষণ-নির্ণয় এবং সংশোধনের ব্যবস্থা।[২৬] শিক্ষা-মনোবিদ্যার পরিধি অথবা বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নাইট্ দম্পতির মতও গেট্সের মতের অনুরূপ। তাঁদের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা -দ্বারা শিক্ষকেরা অনেক মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সত্য আবিষ্কার করেন যেগুলি শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে। শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ হচ্ছে শিক্ষকদের এই সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক আলোচনা। শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়গুলিকে তাঁরা পাঁচটি দলে ভাগ করেছেন : (১) মানুষের বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষমতা (abilities) কি করে বিকাশলাভ করে এবং কি করে তাদের পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। (২) শারীরিক-স্নায়বিক যে সব অবস্থার ওপর শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাব্যতা ও পার্থক্য

---

২৬ Gates, Jersild etc.—Educational Psychology, pp. 8-9

নির্ভর করে (physiological factors that affect educability) সে সম্পর্কে আলোচনা। (৩) যে সমস্ত মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ শিক্ষণ স্মৃতি বিচার সৃজনাত্মক চিন্তা ও রুচি নির্ভর করে সেগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। (৫) বুদ্ধি, আবেগ ও ব্যবহারের ন্যূনতা এবং রুগ্‌ণতার প্রকৃতি- ও কারণ-নির্ণয় এবং তাদের সংশোধন বা চিকিৎসার উপায়-নির্দেশ।

এছাড়াও শিক্ষাবিষয়ে ছাত্রদের পথনির্দেশ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর উপদেশদান শিক্ষা-মনোবিদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।[২৭]

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
2923
Dept. of Extension
SERVICE
25.3.71
CALCUTTA-27

[২৭] Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 257-8

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবিদ্যার ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে লেখা আছে, নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের অপরাধে মানবের আদিম পিতামাতা স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এ কথাটা কতদূর সত্য তার ঐতিহাসিক বিচার সম্ভব নয় ; তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফলে যে মানুষের রুচি আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ বিধাতার অশান্ত সন্তান। সে অন্যান্য প্রাণীর মতো তার জীবন ও পরিবেশ মেনে নেয় নি। তাই কেবলই তার প্রশ্ন—কি, কেন, কে, কবে, কোথায় ? অন্যান্য প্রাণীও তার পরিবেশ -সম্বন্ধে কতকটা সচেতন। কিন্তু সে চেতনার পরিধি বিস্তীর্ণ নয়। জীবধর্মের আশু প্রয়োজনে বাহ্যপরিবেশকে যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই ইতর প্রাণীরা জানে। 'পার্সোনালিটি অব অ্যানিম্যালস্' বইয়ে লেখক লিখেছেন, এই বাহ্যবস্তু জানা -সম্বন্ধে মানুষের ও পশুর মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। মানুষ একটা জিনিসকে তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একই জিনিস বলে জানে। কিন্তু পশু সম্ভবত একটা জিনিসকে সব সময় একই জিনিস বলে জানে না। বেড়ালের কাছে ইঁদুরছানা চুপ করে বসে থাকলে সে কিছু বলে না, কিন্তু ইঁদুরছানা দৌড়ে পালালেই বেড়াল তাকে খাবার জন্যে থাবার আঘাত করে। অর্থাৎ পলায়মান মূষিককেই সে খাদ্য-হিসাবে জানে, মূষিকশাবক মাত্রকেই সে খাদ্য মনে করে না।[১]

বাহ্যপরিবেশ জানার মধ্যে তবু অন্য প্রাণীতে ও মানুষে মিল আছে। কিন্তু অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ অনেকখানি তফাত এই বিষয়ে যে মানুষ তার মানস-পরিবেশকেও জানতে চায়। এই মন জানতে চাওয়ার আগ্রহ আছে বলেই মানুষের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, নীতি-বোধ আছে, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য আছে। বাইরের পরিবেশকে জানবার চেয়েও বুঝি বেশী প্রয়োজন মানুষের নিজের মনকে ও পরের মনকে জানবার। বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, বাহ্যপরিবেশ -সম্পর্কে মানুষের নিবিড় আগ্রহের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষের নিজ সম্পর্কে

১ Munro Fox—Personality of Animals

জ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় সামান্য। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে, বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অপরিমেয় লোভের প্রতিযোগিতায় যে দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা কারণ মানুষ বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট অজ্ঞ থাকায় নিজেকে সে শাসন ও সংযত করতে পারছে না, তাই তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ না করে সে মানুষের সর্বনাশের কাজেই নিয়োগ করছে। তাই ডীন ইঞ্জ্ (Dean Inge) পরামর্শ দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানচর্চা কিছুদিন বন্ধ থাকাই ভালো (Science should take a holiday)। এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন, কাজেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের মন জানার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই, এবং গত শতাব্দীতে এ সম্পর্কে বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

জড়জগতের সঙ্গে মনোজগতের তফাতটা সহজেই চোখে পড়ে। ইট, কাঠ,পাথর জড়পদার্থ—এরা অনড়। আবার গাড়ীর চাকা, আকাশে-ওড়া ঘুড়ি, সূর্য, চন্দ্র, তারাও জড়পদার্থ—কিন্তু তারা সচল। তারা প্রাণহীন, অচেতন। আর মানুষ? তার প্রাণ আছে, চেতনাও আছে। মানুষ অন্যান্য জড়পদার্থের মতো শুধু স্থান অধিকার করেই থাকে না, তার ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, ভালবাসা আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে, অভিনিবেশ আছে, সংকল্প আছে। এ জন্যে আমরা বলি, মানুষের মন আছে।

কিন্তু মন বলতে কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু সহজ নয়। অত্যন্ত প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আমরা দেখতে পাই।

প্রাচীন গ্রীসদেশে মন বা আত্মা (nous) বলতে তাঁরা বুঝতেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে অজড় জ্যোতির্ময় আশ্চর্য কোন সত্তা, যা মানুষের দেহকে চালিত করে, সঞ্জীবিত রাখে, যা তার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত জীবন ও চেতনার মূলীভূত। এ আশ্চর্য পদার্থ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ; মৃত্যুতে সে হয় বিদেহী, 'ছায়া কালো কালো' ভূত বা প্রেতাত্মা। জীবিত অবস্থায়ও আত্মা কখনো কখনো দেহকে ছেড়ে বাইরে আসে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আত্মার এই অভিনব বিচরণকেই মানুষ বলে স্বপ্ন।

ম্যাক্‌ডুগাল্‌ (McDougall) লিখেছেন, "অতি প্রাচীনকালে আত্মাকে সাধারণত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলেই বিবেচনা করা হত।···যদিও এ পদার্থ দেহের প্রত্যেক অংশই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তথাপি এর দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে। দেহের মৃত্যুর পরেও এ আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে অন্যত্র বিচরণ করতে পারে, যেমন ঘটে স্বপ্নে বা মোহাবিষ্ট অবস্থায়।"[২]

প্লেটো (Plato 427 B.C.-347 B.C.) ভূত বা প্রেতাত্মা বিশ্বাস না করলেও মানবাত্মাকে (soul) রহস্যময়, ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিন্তু বুদ্ধিগম্য পদার্থ বলে মনে করেছেন এবং তিনিও মানুষের চেতনার কারণ ও মূল হিসাবে এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কাজেই মানুষের মনের বিচিত্র লীলা বুঝতে গেলে আমাদের এই আত্মার স্বরূপকেই জানতে হবে; এই ছিল সেকালে মনোবিদ্যা-সম্বন্ধে ধারণা। অ্যারিস্টটল্‌-ই (Aristotle) প্রথম প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিকভাবে মনোবিদ্যার আলোচনা শুরু করেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ডি এনিমা' (De Anima)-তে মনকে বুঝতে গেলে তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (process) বিশ্লেষণ ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। মানুষের মনকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ বলে মনে করেছেন। প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের মূলত সাদৃশ্য আছে, মানুষের মনকে বুঝতে গেলে ইতর প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করে তার স্বরূপ বুঝতে হবে, একথা তিনিই বলেন। বিভিন্ন প্রাণীর আত্মার বিকাশের স্তরবিভাগ তিনি স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত প্রকৃতিতে (সুতরাং মানব-প্রকৃতিতেও) একটা উদ্দেশ্যমুখীন গতি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। কাজেই মনোবিদ্যাকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসার অংশ বলেই মনে করেছেন।[৩]

অ্যারিস্টটল (Aristole—384 B.C.-322 B.C.) মনকে একটা দ্রব্য হিসাবে দেখেন নি, দেখেছেন কতকগুলি প্রক্রিয়া হিসাবে। "আত্মা এমন একটা অদ্ভুতপদার্থ নয়, যেটা দেহে প্রবেশ করে, আবার দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। বাস্তবিক মন একটা পদার্থ নয়। মন হচ্ছে কতকগুলি প্রক্রিয়া।"[৪]

---

২ McDougall—Psychology, p. 13

৩ Cushman—A Beginner's History of Philosophy, pp. 196-97

৪ The soul is not a thing which comes into the body and goes out of it. It is not a thing at all. It is a function. Stace—A Critical History of Greek Philosophy, p. 302

মধ্যযুগেও মনোবিদ্যার কাজ এই আত্মারূপ পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়েই পর্যবসিত ছিল। তাঁরাও আত্মাকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ, অথচ অজড় অবিনশ্বর পদার্থ হিসাবেই গণ্য করতেন, এবং মানুষের শুভবুদ্ধিসূচক সমস্ত মনের ক্রিয়াই এই আত্মা-দ্বারা পরিচালিত একথা তাঁরা মনে করতেন। লোভ, ভয়, কাম ইত্যাদি নিকৃষ্টবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিতান্ত স্থূল দৈহিক ব্যাপার। আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কাজেই মনোবিদ্যা বুদ্ধির নানা প্রক্রিয়ার আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ রইল এবং মনের প্রক্রিয়াগুলিকে নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে উঁচু-নিচু ভাগ করা হল, এবং নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে স্থূল দৈহিক ব্যাপার বলে মনের অধিকাংশ প্রক্রিয়া অপাংক্তেয় হয়ে রইল। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হওয়ার ফলে, মধ্যযুগ বহির্জগৎ সম্বন্ধে বীতরাগ, তাই তা বিজ্ঞানচর্চার বিরোধী ছিল।[৫]

বৈজ্ঞানিক-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উঠল, যে আত্মা যদি ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময় অজ্ঞাত তত্ত্বমাত্র হয়, তবে তা আমাদের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারে কিনা। অজানাকে জানা দিয়ে ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত, জানাকে অজানা দিয়ে ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিপরীত। কাজেই মনোবিদ্যা গড়ে তুলতে গেলে রহস্যময় আত্মাকে ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে পরিত্যাগ করতে হয়।

বর্তমান যুগের গোড়াতে দেকার্তে (Descartes 1596-1650 A.D.) সমস্ত বিশ্বজগৎকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করলেন: একটা জড়জগৎ আর একটা মনোজগৎ। এই দুই জগতের মূলে দুটি মূল পদার্থ তিনি স্বীকার করলেন, জড় (matter) এবং মন (mind)। জড়ের ধর্ম হচ্ছে স্থান অধিকার করে থাকা (extension), আর মনের ধর্ম হচ্ছে চেতনা (consciousness)। এর মধ্যে অস্পষ্টতা বা রহস্য কিছু নেই। এই দুটি জগৎই নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়ম (mechanical laws) অনুসারে চলে।

দেকার্তে আত্মাকে অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আমাদের জ্ঞানের মূলে কতকগুলি জন্মগত সংস্কার (innate ideas) রয়েছে, সেগুলিকে মেনে নিতেই হবে। ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এ রকম জন্মগত সংস্কার। কিন্তু মনোবিদ্যার মূল তত্ত্ব হিসাবে তিনি আত্মার পরিবর্তে

৫ B. Russell—A History of Western Philosophy, p. 329

মনকে (mind) গ্রহণ করলেন। সুতরাং মনোবিদ্যার একটা নতুন সংজ্ঞা পাওয়া গেল—মনোবিদ্যা হচ্ছে মানুষের মন -সম্বন্ধে আলোচনা। এই মনেরই বিভিন্ন প্রকাশ হচ্ছে বুদ্ধি ইচ্ছা ভালবাসা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি। দেকার্তে কিন্তু তাঁর দর্শনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (observation) ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল অবরোহানুমান (deductive), কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনকে একটা জটিল যন্ত্র হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মধ্যে রইল ভবিষ্যৎ জড়বাদের (materialism) ইঙ্গিত। অবশ্য দেকার্তে-র পূর্বেই বেকন্ (Bacon) এবং হবস্ (Hobbes) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আরোহানুমান (induction) এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির ব্যবহার আমরা হবস্, লক্ (Locke), বার্কলে (Berkeley) ও হিউম্ (Hume)-এ দেখি। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে, তাদের স্বরূপ বোঝবার অধিকতর আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। লক্ (১৬৩২-১৭০৫) মানুষের জ্ঞান বিশ্লেষণ করে বললেন, মানুষের মন জন্ম-সময়ে একটা অ-লেখা শ্লেটের মতো (tabula rasa), তাতে অভিজ্ঞতার কোন দাগ পড়ে নি। ইন্দ্রিয়গুলির রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে মনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। তিনি দেকার্তে-র জন্মগত সংস্কারবাদ অস্বীকার করে বললেন, মন কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায় না। এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) নামে খ্যাত। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অতঃপর অভিজ্ঞতাবাদীরা এই দাবি করেছিলেন যে, এই বিজ্ঞানের বিষয় হবে 'মন'। মন নামক পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় নয়, মনের বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি- ও সম্বন্ধ-নির্ণয়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটা বদলে হল "মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু আলোচনা" (Psychology is the science of consciousness)। অবশ্য এটা অনেক পরের কথা। লক্ তাঁর মতবাদের চূড়ান্ত ও যুক্তিসম্পন্ন পরিণতিতে পৌঁছতে পারেন নি। তিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আশ্রয় নিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের। অভিজ্ঞতাবাদ জড়বাদের পথ প্রশস্ত করে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের বিচলিত করল। লক্-এর পর বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে জড়বাদকে ধ্বংস করতে চাইলেন এবং প্রমাণ করলেন যে জড়ের অস্তিত্বই নেই। যা আছে, তার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ যে তারা আছে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়

(esse est percipi)। হিউম্ (১৭১১-১৭৭৬) কিন্তু এই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথেই এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, যে মন বা আত্মা বলে কোন পদার্থের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। এটা নিতান্তই একটা প্রাচীন যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার মাত্র; কাজেই হিউম্-এ এসে য়ুরোপীয় দর্শন একটা শূন্য নাস্তিক্যবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। এই অজ্ঞেয়বাদ অবস্থা সম্বন্ধে উইল ডুরান্ট্ বলেছেন,—"ফলটা দাঁড়াল এই যে বার্কলে যেমন জড়ের অনস্তিত্ব প্রমাণ করলেন, হিউম্ তেমনি নিশ্চিতভাবেই মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। তাতে হল এই যে কিছুরই আর অস্তিত্ব রইল না। দর্শন নিজের যুক্তি দিয়েই নিজের ধ্বংস ডেকে আনল। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে একজন রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন—'বেশ হল, আর কোন তর্কের দরকার নেই, সব ল্যাঠা চুকেছে—জড়ও নেই, ভাবনাও নেই।"[৬]

য়ুরোপীয় দর্শনে ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিলেন কাণ্ট্ (Kant—1724-1804)। তিনিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, যে বস্তুজগৎ (things-in-themselves) আছে, তারা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে জ্ঞানের উপাদান (materials of knowledge) আমাদের পৌঁছে দেয়, কিন্তু মানুষের মন তাদের 'স্বরূপে' জানতে পারে না, কেন না মানুষের মনে কতকগুলো নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছাঁচ রয়েছে (forms of knowledge), তাতে ঢালাই না করে সে জানতেই পারে না।[৭]

যাক, কাণ্ট্-এর দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু মনোবিদ্যার স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁর মতটা আমাদের কাজে লাগবে। আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি বললেন,

---

৬ The result appeared to be that Hume had as effectually destroyed mind as Berkeley had destroyed matter. Nothing was left: and philosophy found itself in the midst of ruins of its own making. No wonder that a wit advised the abandonment of the controversy: "No matter, never mind." Will Durant—A Story of Philosophy, p. 19

৭ What we call the world of nature or the Physical world is, then, but the appearance to us of some reality of whose real nature we can form no idea, because the nature of these appearances or phenomena is determined so largely by the constitution of our own minds. McDougall—Psychology: The Study of Behaviour, p. 15

মনপদার্থকে প্রত্যক্ষভাবে জানাবার পথ নেই। তার যে প্রকাশ তাই আমরা জানতে পারি, তাই হবে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।[৮-৯]

কাজেই মনোবিদ্যা মন-পদার্থকে জানবার চেষ্টা নয়, মনের প্রকাশমান প্রক্রিয়াগুলির প্রকৃতি, সম্বন্ধ ও তাদের মূল নিয়মগুলি জানবার সুসংবদ্ধ আগ্রহ। কাণ্ট্ মনের প্রক্রিয়াগুলিকে জ্ঞান (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (willing) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন। তিনি আরও বললেন, মন নিষ্ক্রিয় (passive) পদার্থ নয়, মনের ক্রিয়া হচ্ছে বিচ্ছিন্নকে একীকরণ। কাণ্ট্-এর পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশই অভিজ্ঞতামূলক (empirical) এবং বিশ্লেষণধর্মী (analytical) হতে থাকে। জড়বাদের প্রভাবে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে স্বপ্রধান এবং বিচ্ছিন্ন (separate and independent) বলে মনে করা হতে থাকল, কোন আত্মাবস্তু তাদের একতার সূত্রে বাঁধছে এ কথা অস্বীকৃত হল। মনোবিদ্যার এই গতির (tendency) স্পষ্ট রূপ আমরা দেখি হার্টলে-র অনুষঙ্গ মতবাদে (associationism)। অনুষঙ্গবাদ বলে, মন বলে কোন দ্রব্য নেই, মন হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সমষ্টিমাত্র। এই প্রক্রিয়াগুলি স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন, মনের কোন নিজস্ব গতি নেই যা দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সংযুক্ত হয়। সংযোগের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম -অনুসারে সহজতম মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্রমশ অধিকতর জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া -দ্বারা বিভিন্ন উপাদান যেমন কতকগুলি মৌলিক পদার্থ হতে উৎপন্ন হয় তেমনি মৌলিক কতকগুলি মানসিক অবস্থার (states) সংযোগ ও বিন্যাস দ্বারা মনের জটিলতর প্রক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়।[১০] সে জন্য একে মানসিক রসায়ন (Mental

৮ It is legitimate to conclude that there can be no knowledge unless there is a subject, self or soul, but we have no right to infer that this knower is a self-existent, simple, indecomposable, self-identical substance. Thilly—History of Philosophy, p. 410

৯ He argued that our minds also are inaccessible to our direct observation and that we have direct knowledge only of mental phenomena or appearance. McDougall—Psychology, p. 15

১০ Hartley accepted Locke's conception of compound ideas. A group of revived sensations might cohere so as to form a mental product. But this mental product was to be conceived as a parallel to a physical product, a group of nerve-excitations. He delighted in reducing complex experiences to the elementary sensations which by association constituted them. Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, p. 25

Chemistry) বলা হয়েছে। হবস্ এই মতের সূত্রপাত করেন। তবে হার্টলে প্রথম একে সম্পূর্ণ রূপ দেন।[১১]

আধুনিককালের গেস্টল্ট (Gestalt) মতের মনোবিজ্ঞানীরা উপহাস করে একে নাম দিয়েছেন 'ইট ও সুরকী' মতবাদ ('Brick and Mortar' theory)। দালান যেমন গড়ে ওঠে ইটের পর ইট গেঁথে, মনোবিদ্যাও তেমনি মনের ইমারত গড়ে তোলে সহজতম মানসিক ক্রিয়া, সংবেদন (sensation) এবং কল্প বা প্রতিরূপের (image) ইট দিয়ে দিয়ে।[১২]

কান্ট্ মনের প্রক্রিয়াগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করেছিলেন—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা (thinking, feeling and willing) তাঁর পূর্বে বিশ্লেষণ-ধর্মী মনোবিজ্ঞানীরা মনকে কতকগুলি শক্তিতে (faculty) ভাগ করেছিলেন। মনের এই মৌলিক কয়টি ক্ষমতা ও সম্ভাবনা দিয়েই তাঁরা সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করতেন। যেমন, আমরা চোখে দেখি কেন? যেহেতু প্রত্যক্ষ করবার 'ক্ষমতা' মনের আছে। উলফ্ (১৬৭৯-১৭৫৪) তাঁর "র‍্যাশন্যাল সাইকলজী" গ্রন্থে এই মতকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। এই মতবাদকে 'ফ্যাকাল্টি সাইকলজী' বলা হয়।[১৩]

এতে আপাতত একটা সুবিধা আছে সত্য, কারণ, কোন মানসিক প্রক্রিয়ার

---

১১ The wonderful achievement of chemistry led to the idea of a 'mental chemistry' which should analyse mental compounds into their elements. The term 'association' was stretched to cover all sorts of combinations, the notion of an analytical psychology that should take its cue from chemistry and work out elements and compounds in the mental sphere, took firm hold at that time. Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, p. 6

১২ The Gestalt psychologist called this a brick and mortar psychology, with emphasis on the brick, because the trouble was to find the mortar. The mortar problem had been a serious one for the associationists. Some of them had seen no problem, and others had appeared satisfied with the mere word 'association' as an answer to the question "what holds the elements together ?" Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, p. 101

১৩ For this school a faculty was the capacity of the soul to carry out a certain activity. This gives us a double enumeration of all mental processes; there is not only the specific process of remembering, but the power of remembering. Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, p. 30

ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলেই বলা চলত মনের অমুক শক্তির (faculty) জন্যে এটা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এতে মেলে না। জড়বাদের প্রভাবে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শারীরবিদ্যা ও প্রাণী-বিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার নিবিড় সম্বন্ধ আছে, একথা মনোবিজ্ঞানীরা অনুভব করতে লাগলেন এবং বিশেষ করে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের (brain) মধ্যে নানা পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এটা তাঁরা বুঝলেন। দেকার্তে এই তথ্য -সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং যদিও তিনি মন ও দেহকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু বলে মতপ্রচার করেছিলেন, তথাপি দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থিতে (Pineal gland) যোগাযোগ রক্ষা করে (Interactionism), এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এটা অবশ্য একটা গোঁজামিল ছিল, এবং তাঁর পরবর্তীরা দেহ ও মনের সম্পর্ককে অধিকতর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করবার নানা চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে লাইব্‌নিৎস্‌-এর (১৬৩৬-১৭১৬) 'পূর্বকৃত সমন্বয়' (Pre-established harmony) মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, দেহ ও মন দুটি বিভিন্ন ঘড়ির মতো, কিন্তু স্বষ্টিকর্তা গোড়ার থেকেই এই দুটি ঘড়িতে এমন মিল করে দিয়েছেন যে একটিতে কোন পরিবর্তন হলে অন্যটিতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটবে। এটাও অবশ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে সন্তোষজনক নয়। গল্‌ (Goll) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে আবিষ্কার করলেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত। পুরানো 'ফ্যাকাল্‌টি মনোবিদ্যা' (Faculty Psychology) এতে আরো জোর পেলো। মস্তিষ্কবিজ্ঞান (Phrenology) বলে একটা ভূয়া বিজ্ঞান গড়ে উঠল, এবং মানুষের মনের গতি ও মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তার মস্তিষ্কের গড়ন দেখেই বলে দেওয়ার চেষ্টা হল। অর্থাৎ মনোবিদ্যা পুরোপুরিভাবে জড়বাদী ও দেহবিজ্ঞানে পরিণত হতে চলল। গল্‌-এর অনুমান ছিল যে কোন নির্দিষ্ট মানসশক্তির ক্রিয়া নির্ভর করে মস্তিষ্কে সে শক্তির একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের বিকাশের ওপরে। মস্তিষ্কে এরূপ কেন্দ্রের বিকাশের ফলে সে স্থানে করোটিতে (skull) চাপ লাগতে থাকে, তাতে এ জায়গাটা ফুলে ওঠে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন করোটি আঙ্গুল -দ্বারা স্পর্শ করে, কোন্‌ কোন্‌ কেন্দ্র বিশেষ কোন্‌ মানসিক শক্তির কেন্দ্র, তা অনুভব করা যায় এবং তা থেকে ব্যক্তির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করা যায়।[১৪]

---

১৪ Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, p. 55

মনোবিদ্যার যতই উন্নতি হতে লাগল ততই তা পরীক্ষামূলক ও ব্যবহারিক হতে থাকল। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষাকে (Observation and Experiment) জ্ঞান-আহরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। মনোবিদ্যা যতই দর্শনশাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবি করতে শুরু করল, ততই তাতে পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) এবং তার কারণ বা উত্তেজকের (stimulus) পরিমাণগত (quantitative) সম্বন্ধ-নির্ণয়। এ পরীক্ষা করেছিলেন ভেবার এবং ফেক্‌নার এবং যে নিয়মটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা তাঁদের সম্মিলিত নামবহন করছে (Weber-Fechner Law)।

পূর্বেই বলা হয়েছে মনোবিদ্যা আত্মা- বা মন-পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, এ সংজ্ঞা ছেড়ে, চেতন প্রক্রিয়াসমূহের (conscious states and process) সম্বন্ধ- ও পরিণতি-নির্ণয়, এ সংজ্ঞাতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এ সংজ্ঞা সম্বন্ধে আপত্তি দুদিক থেকে উত্থিত হল। এঁদের একদল হলেন ফ্রএড্ ও তাঁর অনুগামী মনঃসমীক্ষণবাদীদের (Psychoanalyst) দল, আর একদল হলেন ওয়াট্‌সন্ (Watson)-এর মতাবলম্বী ব্যবহারবাদীদের (Behaviourist) দল।

জিগ্‌মুণ্ড ফ্রএড্ ছিলেন ডাক্তার। হিস্টিরিয়া, উন্মাদরোগ ইত্যাদির চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন এ ব্যাধিগুলি শুধুমাত্র শরীর-যন্ত্রের বৈকল্য বা বিকৃতি থেকে ঘটে না। এগুলির মূলে রয়েছে রোগীর মনে বিস্মৃত কতকগুলি গোলযোগ। তার চেতন মনে তার ফলটা মাত্র দেখা যায়। অর্থাৎ তিনি বুঝলেন মনের সামান্য অংশই চেতনার আলোকে সুস্পষ্ট, তার অধিকাংশই রয়েছে প্রায়ান্ধকার অবচেতনায়। যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের বাইরে চলে যায়, তা সুস্পষ্ট চেতনায় থাকে না বটে তবু মনের মধ্যেই থাকে। তাকে চেষ্টা করলে স্মৃতির পথে, মনের সামনে আবার হাজির করা চলে। তিনি বহু শত রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, এমন অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা বা লজ্জাকর অসামাজিক ইচ্ছা আছে যাকে মানুষ স্বীকার করতে চায় না, তাদের ঠেলে দেয় স্মৃতির অতলতলে, মনের গভীর অন্ধকারে। এগুলি আমাদের মনেরই অঙ্গ, তবু আমাদের চেতন মন তাদের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কও স্বীকার করতে চায় না। তারা হচ্ছে মনের রাজ্যের

বনবাসিনী দুয়োরাণী। তাদের চেতন মনের সামনে ডেকে আনতে গিয়ে আমাদের সামাজিক নৈতিক বুদ্ধি-রূপ সুয়োরাণীর (super-ego) চোখ-রাঙানী সইতে হয়। সাদা কথায় বলি, ফ্রএড্-এর মতে মনের তিনটে স্তর ; একটাকে তিনি বলেছেন চেতন স্তর (conscious), সেটা মনের সামনে রয়েছে ; দ্বিতীয়কে তিনি বলেছেন প্রাক্‌চেতন স্তর (pre-conscious), যেটা রয়েছে স্মৃতির অস্পষ্টতায় ; তৃতীয়কে তিনি বলেছেন অবচেতন স্তর (unconscious), যা মনের গোপন গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।[১৫] বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে তার চেতন মনে নয়, সেটা মানুষের "পোশাকী" রূপ ; তার প্রকৃত পরিচয় তার 'অবচেতন' আদিম বর্বর মনে। কাজেই তিনি বললেন, মনোবিদ্যা এতদিন মানুষের পোশাকী মন নিয়ে শৌখীনভাবে নাড়াচাড়া করেছে, সে বিজ্ঞান তাই অবাস্তব। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা তাই বদলানো দরকার, গোটা মানুষটার মন বুঝতে গেলে, 'অবচেতন'-এর কাদায় নামতে হবে—"সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ!" বর্তমান যুগের মনোবিদ্যা ফ্রয়েড্-এর মনোবিকলন মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত।

ব্যবহারবাদীদের (Behaviourist) আক্রমণ এল আর একদিক থেকে। ওয়াট্‌সন্ বললেন, মনের পরিচয় পাই কতকগুলি শারীরক্রিয়ায়, প্রাণীর ব্যবহারে (behaviour)। এটা বস্তুগত (objective) প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু আমরা যখন বলি অন্তরের প্রক্রিয়াগুলিই মন, তখন মন জিনিসটা হয় নিতান্তই ব্যক্তিগত (subjective), এর একমাত্র পরিচয় থাকে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, তার অন্তর্দর্শনে (introspection)। আমার 'মনে' কি হচ্ছে, তা কেবল আমিই জানি, অন্যের 'মন' প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। সেটা আন্দাজ করি, তার ব্যবহার দিয়ে। কাজেই মনোবিদ্যা যদি বিজ্ঞানই হয়, তবে তাকে বস্তুগত ভিত্তির ওপরই দাঁড় করাতে হবে। মানুষের ব্যবহারটাই (behaviour) যখন একমাত্র বস্তুগত ঘটনা (objective fact) তখন তার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ-নির্ণয়ই তো মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (subjective experiences)—যাকে বৈজ্ঞানিক কোন মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না—তা পরিত্যাগ করাই তো

১৫ Hart—Psychology of Insanity

বুদ্ধিমানের কাজ। রাগ হলে পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়, এগুলি 'প্রত্যক্ষ' ব্যাপার। এ পরিবর্তনগুলি আমরা মাপতে পারি, কাজেই এদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব। তাই কেন হোক্ না? আমরা বলব, 'রাগ মানে হচ্ছে মানুষের সে রকম ব্যবহার, যখন তার পেশীগুলি দ্রুত সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়, স্বর উচ্চ হয়, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়, যখন সে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হয়'। এখানে 'মন' 'চেতনা' এ সব অবাস্তব সত্তা না স্বীকার করলেও তো চলে। বাস্তবিক ব্যবহারবাদীরা সে দাবিই করলেন এবং মনোবিদ্যার নতুন সংজ্ঞা দিলেন, "মনোবিদ্যা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের সম্যক আলোচনা"।[১৬] ওয়াট্‌সন্ বলেছেন, "ব্যবহারবাদীর চোখে মনোবিদ্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, যা শুদ্ধ বস্তুগত ও পরীক্ষাগত। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের ব্যবহার কি অবস্থায় কি হবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা, এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শনের কোন মূল্য নেই। এ বিজ্ঞান এখন এমন স্তরে পৌঁছেচে যে, মনোবিদ্যার পক্ষে 'চেতনা' শব্দটি পরিত্যাগ করতে হবে। এখন মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ও মনোবিদ্যার সম্বন্ধে আলোচনা, 'চেতনা' 'মানসিক ক্রিয়া' 'মন' 'অন্তঃকরণ' 'ইচ্ছা' 'কল্পনা' এবং অনুরূপ কথাগুলি বাদ দিয়েও করা যেতে পারে।...এ বিজ্ঞানের আলোচনা এখন উদ্দীপক (stimulus) এবং প্রতিক্রিয়া (response), অভ্যাস-গঠন, অভ্যাস-সংযোগ ইত্যাদি কথা দিয়েই করা যেতে পারে।"[১৭] ওয়াট্‌সন্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিলস্‌ব্যেরী (Pillsbury) বললেন, "মনোবিদ্যার প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে এ চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান, অথবা ব্যক্তির অনুভূত অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা। এ সংজ্ঞাগুলির সুবিধে থাকলেও এরা ত্রুটিশূন্য নয়। 'মনকে' আমরা জানি মানুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কাজেই মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, 'মানুষের ব্যবহার -সম্বন্ধে বিজ্ঞান' দিলে সঙ্গত হয়।···অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মতো মানুষকে বাইরের দিক থেকে বস্তুগত ভাবে আলোচনা করা যায়। সে কি অবস্থায় কি করে, এ কথা আলোচনা করলেই তাকে আমরা বুঝতে পারি। এদিক থেকে

---

১৬ Watson—Behaviourism, p. 5

১৭ Watson—Behaviour: An Introduction to Comparative Psychology, p.11

দেখলে মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমস্ত কর্ম ও ব্যবহারকে বুঝতে চেষ্টা করা।"[১৮]

ক্যাটেল (Cattell), টিচ্নার (Titchener), ম্যাকডুগ্যাল্ (McDougall), থর্নডাইক্ (Thorndike), স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford), ল্যাস্‌লে (Lashley), উডওয়ার্থ (Woodworth)—অর্থাৎ বর্তমান যুগের প্রধান মনোবিজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর ব্যবহারবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা যাকে মনের প্রক্রিয়া বলি, সেগুলি জীবনধর্মেরই রূপ। জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগিতার পথে জীবদেহের বোঝাপড়া (adjustment to the environment)। কাজেই মানুষের মনের সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে তার দেহের বাহ্য ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া এবং পরিবর্তনগুলি বোঝা নিতান্ত দরকার। কিন্তু তা বলে দৈহিক প্রতিক্রিয়া আর মানসিক প্রক্রিয়া কি একই জিনিস? দেহবিদ্যা আর মনোবিদ্যার কোন তফাত নেই? এই জড়বাদী ও যান্ত্রিক সিদ্ধান্তই কি সকলে মেনে নিয়েছেন? যখন আমি রাগ করি, তখন আমার পেশী, রক্তসঞ্চালন, দেহের উত্তাপ ইত্যাদির পরিবর্তন সব যদি বিবৃত করা হয়, তবেই কি আমার 'রাগ' জিনিসটার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে গেল? আমি প্রত্যক্ষভাবে যা অনুভব করি, যা বোধ করি, সেটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না বলেই কি তা মিথ্যে? বাস্তবিকপক্ষে গোঁড়া ব্যবহারবাদীরা এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। 'মন' এবং 'চেতনা'কে মনোবিদ্যা থেকে বাদ দেবার উৎসাহে তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকেও অস্বীকার করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠতম মননক্রিয়া হচ্ছে বস্তুবিরহিত চিন্তা (abstract thinking), তাকেও তাঁরা উড়িয়ে দিলেন 'বাগযন্ত্রের অস্ফুট কণ্ডুয়ন' বলে (thought is but subvocal speech)। জেমস্ (James) 'মনোবিদ্যা মন-বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়' এ মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং অনুভূতির (emotion) ব্যাখ্যাও শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিবর্তন-সাপেক্ষ, এমন মত সবলে প্রচার করেছিলেন। কাজেই, তিনি মূলত ব্যবহার-বাদীদের সমধর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই একথা মেনে নিতে পারেন নি যে মন একটা জড়বস্তু, এবং মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে নিজস্ব বেগে সংযুক্ত হয়। চেতনাকে তিনি তুলনা করেছেন বহমান

১৮ Pillsbury—Essentials of Psychology, p.3

স্রোতস্বতীর সঙ্গে। তিনি বলেছেন, চেতনার স্রোত (stream of consciousness)। মনকে তিনি কর্মগতিবহুল ও জীবন্ত বলেই স্বীকার করেছেন। মনে পড়ে আমাদের অ্যারিস্টটল্-এর কথা, 'মন একটা পদার্থ নয়, মন হচ্ছে কতগুলি প্রতিক্রিয়া'। বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহারবাদীরাও এক ধরনের অনুষঙ্গবাদী। তাঁদের কাছে মন হচ্ছে কতগুলি উদ্দীপক (stimulus) এবং প্রতিক্রিয়ার (reaction) সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে সংযোগসাধন কি করে হয়? একটা সংযোগের জীবন্ত সূত্র না থাকলে মানুষের মন তো অর্থহীন। একজন জীবন্ত ইচ্ছাসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তির ক্রিয়া হিসাবেই ব্যবহারগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। একথাটাই ওয়ার্ড (Ward) বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন 'মনোবিদ্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক' (The science of psychology is individualistic)।[১৯] ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখ আশা ইচ্ছার কোন মানে হয় না। তার অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করেই তার বর্তমানের কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা বুঝতে পারি। জেম্স্ এ কথাটা বলেছিলেন এ ভাবে, "প্রত্যেকটি চেতনক্রিয়াই আপেক্ষিক, একদিকে তা অপেক্ষা রাখে একজন ব্যক্তির, অন্যদিকে অপেক্ষা রাখে তা অন্য আর একটি চেতন-ক্রিয়ার।"[২০] ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ একজন পাকা ব্যবহারবাদী, কিন্তু তিনিও ওয়াট্‌সন-এর উগ্র ব্যবহারবাদকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন, ব্যবহার একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়—জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহার আর জড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াকে ঠিক একভাবে দেখা যেতে পারে না। প্রাণীর ব্যবহারের এটাই বিশেষ লক্ষণ যে তা উদ্দেশ্যমুখী (purposeful), কাজেই তিনি মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিলেন, "মনোবিদ্যা হচ্ছে উদ্দেশ্যমুখী ব্যবহারের শাস্ত্র"—"ব্যবহারের চিহ্ন হচ্ছে যে তাতে উদ্দেশ্যের লক্ষণ, অথবা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আগ্রহ বা চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাবে। আর জীবিত প্রাণীরই এটা ধর্ম যে তার 'ব্যবহার' (behaviour) আছে।"[২১] তিনি জড়বস্তু আর জীবিত প্রাণীর

---

১৯ Ward—Psychological Principles

২০ All states of consciousness are relative,—relative to a subject and relative also to other states of consciousness. Wm. James—Principles of Psychology, Vol. 3

২১ Psychology is the science of purposeful behaviour. .....The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is,, then, the mark of behaviour; and behaviour is the characteristic of living things. McDougall—Psychology, p. 13

ব্যবহারে পার্থক্য খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। "বিলিয়ার্ড খেলার একটা গোলক পকেট থেকে তুলে টেবিলের ওপর রাখা যাক্। গোলকটি সেখানেই থাকবে, যতক্ষণ না বাইরের থেকে কোন শক্তি তার ওপর ক্রিয়া করে। যদি কোন দিকে গোলকটিকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেটা গড়াতেই থাকবে, যতক্ষণ না ধাক্কার শক্তিটা ফুরিয়ে যায়, অথবা টেবিলের ধারের কুশনে লেগে অন্যদিকে সেটা না যায়। গোলকের গতিপথ বাইরের শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। এটা হচ্ছে জড়ের যান্ত্রিক ক্রিয়ার লক্ষণ। এর সঙ্গে এবার জীবিত প্রাণীর ব্যবহারের তুলনা করা যাক্।...ধরা যাক্, একজন মানুষ যে তার দেশকে ভালবাসে, জীবিকার্জনের জন্যে তাঁকে দূর দেশে চাকুরি নিতে হয়েছে।...তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজের একটি বাড়ী তৈরি করবার মতো যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করা ; তাঁর সমগ্র কর্ম একটি উদ্দেশ্য -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"২২

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। "এ ব্যক্তির ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই সন্তোষজনক হতে পারে না। এ ব্যাখ্যায় মানুষের প্রাণবন্ত ব্যবহার বোঝবার সাহায্য হয় না এবং তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না।"

ওয়াট্‌সন্ মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শনের (introspection) পন্থা সম্পূর্ণ পরিহারের পক্ষপাতী। তাঁর পূর্বে ভ্যুণ্ড (Wundt) এবং টিচ্‌নার প্রভৃতি অন্তর্দর্শনের নানা অসুবিধার কথা আলোচনা করেছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ পন্থায় যে মালমশলা পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক সময় সন্দেহজনক, এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু তথাপি এ পন্থায়ই মনের খবর সোজাসুজি পাওয়া যেতে পারে তাই মনোবিদ্যায় এ পন্থা অপরিহার্য, এটা বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ একেবারেই এ পন্থাকে বাতিল করে দিলেন। বর্তমানে মনোবিদেরা ব্যবহারবাদে বিশ্বাসী হলেও এবং বস্তুগত অভিজ্ঞতা পরীক্ষণের ওপর জোর দিলেও অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেছিলেন, "মনোবিদ্যা শুধু চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান এই সংকীর্ণ ও অফলপ্রসূ ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থেকে মনোবিজ্ঞানীকে সাহস করে এ দাবি করতে হবে যে মনোবিদ্যা মনের সম্যক আলোচনা ; এ আলোচনা করবে মনের সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া।"২৩

২২ McDougall—Psychology, pp. 21-23
২৩ McDougall—Psychology, p. 25

এই "সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া" বলতে তিনি অন্তর্দর্শন দিয়ে যে মালমশলা পাওয়া যায়, তা বাদ দেন নি। অনুরূপভাবে উড্‌ওয়ার্থ মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন, "ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার সম্যক্‌ আলোচনা" (the science of the activities of the individual in relation to his environment)। এবং তার পরেই 'ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া' কথাটাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "এতে শুধু তার বিভিন্ন শারীরক্রিয়া, যেমন হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদিই বোঝায় না, তার জ্ঞান বা বোধের বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, দেখা, শোনা, মনে রাখা, চিন্তা করা, এবং অনুভূতির বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, হাসি, কান্না, সুখী হওয়া, দুঃখিত হওয়াও বোঝায়।"[২৪]

মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা

মনোবিদ্যা শুধু মাত্র শারীরবিদ্যা নয়। মনের আলাদা একটা সত্তা আছে, এ কথাও উড্‌ওয়ার্থ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "আমরা যদি মনোবিদ্যায় মানুষের 'ব্যবহার'-এর ব্যাখ্যা খুঁজি, তবে কি এ বিষয়ে যতটা জানা সম্ভব, তা আমরা শারীরবিদ্যার (Physiology) কাছ থেকেই পেতে পারি না? যদি ব্যক্তির ক্রিয়াগুলিকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে আলোচনার আর প্রয়োজন কি? এর উত্তর হচ্ছে, শারীরবিদ্যা আমরা যা জানতে চাই তার একটা অংশের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দেয় মাত্র। আমরা জানতে চাই সমগ্র ব্যক্তিকে। এ ব্যক্তি ভালবাসে, ঘৃণা করে, সাফল্যলাভ করে বা অকৃতকার্য হয়, এ ব্যক্তি অপর দশ জনের সঙ্গে নানা কর্মের দ্বারা যুক্ত হয়, মোটামুটিভাবে সুখ ও সাফল্যের সহিত তার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে। তার চারপাশে যে জগৎ আছে, তার সঙ্গে সমগ্রভাবে ব্যক্তিটি বিবিধ ও বিচিত্র সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে যুক্ত, এই ব্যক্তিটির এই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান -সাপেক্ষ। মনোবিদ্যা এই বিশেষ দায়িত্বটি গ্রহণ করে। তার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত সম্পর্কের আলোচনা।" অন্তর্দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শন মানে নিজের নানা সাংসারিক অশান্তি নিয়ে একা বসে চিন্তা করা নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা দুশ্চিন্তা ভোগ করাও নয়। এমন কি, এর উদ্দেশ্য নিজের

---

২৪ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 4

কৃতকর্মের একটা সুব্যবস্থা করবার চেষ্টাও নয়। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের একটা বিশিষ্ট রূপ।"[২৫]

কাজেই দেখা যাচ্ছে—মনোবিদ্যার সংজ্ঞা প্রথম ছিল 'আত্মা-বস্তুর সন্ধান', তারপর হল 'মনের স্বরূপ-নির্ণয়', তারও পরে হল 'চেতন প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা'। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞাটার ঝোঁক হচ্ছে মানুষের 'ব্যবহারের' আলোচনার দিকে, কিন্তু সে সংজ্ঞাও সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না।

মনোবিদ্যার গতির যে ধারার বিবরণ দেওয়া হল তাকে একটি পরিহাস-রসপূর্ণ ছত্রে এক মনোবিজ্ঞানী প্রকাশ করেছেন—"প্রথম মনোবিদ্যা হারাল তার আত্মা, তারপর হারাল তার মন, তার পর চেতনা ; তবে এখন পর্যন্ত তার 'ব্যবহার'টা রয়ে গেছে।"[২৬]

সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্যা

বর্তমান যুগের মনোবিদ্যার ধারার আলোচনায় আর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এ হচ্ছে গেস্টল্ট বা সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্যা (Gestalt Psychology)। সমগ্রতাবাদ প্রচলিত অনুষঙ্গ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মন কতকগুলি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র, এ মত তাঁরা একেবারেই গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে মনের ধর্ম হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমগ্রতাকে খোঁজা—খণ্ড-সমগ্রতার থেকে বৃহত্তর সমগ্রতার দিকে তার গতি। গতিপরায়ণতা এবং অখণ্ড সমগ্রমুখীনতা হচ্ছে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ। "সমগ্রতাবাদীরা অনুষঙ্গবাদীদের পরম বিরোধী। এঁদের মতে খণ্ড খণ্ড চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনার সমগ্রতাকেই কেবল আমরা জানি। চেতনার খণ্ডাংশগুলির কোন অস্তিত্ব নেই, আর যদিই বা থাকে, যে সমগ্রের তারা অংশ, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সংযুক্ত হয়েই তাদের তাৎপর্য।"[২৭] সুতরাং মনোবিদ্যার কাজ হচ্ছে, মনের এই ধর্মের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা।

---

২৫ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 4

২৬ First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind; then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind. Quoted by Woodworth —Psychology.

২৭ Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, p. 192

নতুন মনোবিদ্যা সক্রিয়তাবাদী ও ক্রমবিকাশবাদী

ডারুইন্-এর বিবর্তনবাদের প্রতিক্রিয়া মনোবিদ্যায়ও দেখা দিল, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে। উইলিয়ম জেমস্ বললেন, চেতনা একটি গঠন-সম্পন্ন নির্দিষ্ট বস্তু নয়, তা জীবন্ত স্রোতোধারা (the stream of consciousness)। তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌল উপাদানে ভাগ করা যায় না। চেতনা অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া, যা জীবনের প্রয়োজনে নানা রূপে বিকাশলাভ করেছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন মনোবিজ্ঞানীদের নাম হল **ক্রিয়াবাদী (Functionalists)**। এঁরা বললেন বিভিন্ন মানসক্রিয়া, যথা প্রত্যক্ষণ (perception) স্মৃতি (memory) কল্পনা (imagination) বুদ্ধি চিন্তা আবেগ ইচ্ছা সবই প্রাণীর কোন না কোন প্রয়োজনসাধন করে। প্রাণীদেহ যাতে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে চলতে পারে (adjustment of the organism to the environment), সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই এদের উৎপত্তি ও বিকাশ। এই প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট ও অচল নয়, এদের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন আছে। ক্রিয়াবাদীদের মতে মনোবিজ্ঞানের কাজ চেতনার এই ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে মানুষের মনের ক্রিয়াকে বোঝা।

ক্রিয়াবাদী মনোবিদেরা এই বিজ্ঞানের আলোচনায় একটি নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কিন্তু "এই মনোবিদ্যা চেতন-ক্রিয়ার স্বরূপ কি, সে -সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অগ্রসর করে নি,—এমন কি চেতনা কি কাজ করে, সে -সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান খুব বেশী বর্ধিত করে নি। অবশ্য মনোবিদ্যার নতুন অগ্রগমনের পক্ষে এই মতবাদ প্রভূত সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিভাবে চেতনক্রিয়া ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যীকরণে সহায়ক হয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনোবিদেরা শিক্ষা-ক্রিয়ার (learning process) স্বরূপ -সম্বন্ধে আলোচনা করতে বাধ্য হলেন। এই আলোচনার ফলে ক্রমশ তাঁরা চেতনক্রিয়া অপেক্ষা সফল শিক্ষার (efficient learning) পরিবেশগত এবং দেহগত কারণগুলির (environmental and organic conditions) দিকে বেশী মনোযোগ দিতে থাকলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে, পূর্বে যে মনোবিদ্যা চেতন-ক্রিয়ার বিজ্ঞান ছিল তা প্রাণীর ব্যবহারের বিদ্যা (Science of behaviour) হয়ে দাঁড়াল।"[২৮] অর্থাৎ আধুনিক মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র মানুষের

২৮ N.L. Munn—Psychology, p. 7

চেতনক্রিয়ার আলোচনাই নয়, বিভিন্ন চেতনক্রিয়ার অনুষঙ্গী দেহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যঙ্গাদির বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও মনোবিদ্যার আলোচনার বিষয়ীভূত। মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় কি প্রকার ব্যবহার করে,—রাগ, ভয় ইত্যাদি অনুভব করে, কি ভাবে নাড়ীস্পন্দন, রক্তচাপ, দেহের উত্তাপ, বিবর্ণতা পেশীর সক্রিয়তার পরিবর্তন করে, তার বৈজ্ঞানিক ও সঠিক আলোচনাও মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি বুঝতে মনোবিদ্‌কে সাহায্য করে। এ আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে শক্তি, রুচি, ব্যবহার, প্রকাশ ও ক্রমপরিণতির গতির প্রচুর বিভিন্নতা আছে। এবং এই প্রভেদ ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-নিরূপণ আধুনিক মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আধুনিক মনোবিদ্যা বিবর্তনবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং শৈশব থেকে পেশীর শক্তি, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা, বিচারক্ষমতা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছা কিভাবে ক্রমে ক্রমে পরিণতিলাভ করে, এ আলোচনা মনোবিদ্যার একটি মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন সম্বন্ধে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানীকে শিশু ও ইতরপ্রাণীর ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। থর্নডাইক (Thorndike), পাভ্‌লভ্ (Pavlov) এবং কোহ্‌ল্যের (Kohler) দেখিয়েছেন, যে শিক্ষার মূল প্রণালীগুলিতে মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ নেই।

আধুনিক মনোবিদ্যা সমাজকেন্দ্রিক

মানুষের মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় চেতনক্রিয়ার বিশ্লেষণে, তেমন কিছু পরিচয় মেলে মানুষের ভাষা, শিল্পকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি-আচারের মধ্য দিয়েও। বর্তমানে সমস্ত মানবিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীই সামাজিক। কাজেই মনোবিদ্যায়ও মানুষের মনের ওপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব -সম্বন্ধে আলোচনা গুরুত্ব লাভ করেছে। শিশুর শিক্ষার অনেকখানিই অনুকরণগত। শিশুর ভাষাশিক্ষা, রুচিগঠন, নৈতিক আদর্শ কি করে সমাজের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বর্তমান মনোবিদেরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করেন।

আধুনিক মনোবিদ্যায় নির্জ্ঞান মনের গুরুত্ব

ফ্রএড্ ও তাঁর অনুগামীদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে, মনোবিদ্যার

পরিধির বিপুল প্রসার ঘটেছে। ফ্রএড্ দেখিয়েছেন যে সচেতন প্রক্রিয়াগুলি (conscious processes) মানুষের মন-রূপ গভীর সাগরের উপরিস্থিত বীচিভঙ্গ মাত্র; সচেতন প্রক্রিয়ার গভীরে রয়েছে অবচেতন ও নির্জ্ঞান (subconscious and the unconscious) মনের রহস্যময় বিস্তার। তিনি আরও দেখিয়েছেন,—ভুল, ত্রুটি (slips) আপাত-কারণহীন ভয় (phobias), স্বপ্ন, অর্থহীন বিদ্বেষ বা আকর্ষণ ইত্যাদির মূল রয়েছে, নির্জ্ঞান মনের অতল তলে। সেখানেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি। সুতরাং মনোবিদ্‌দের মধ্যে মস্ত এক শক্তিশালী দল নির্জ্ঞান মনের রহস্য আবিষ্কারে রত আছেন। এর সঙ্গেই যুক্ত, মানুষের মনের বিভিন্ন বিকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা। সহৃদয় ফরাসী চিকিৎসক পিনেল-ই (Pinel) প্রথম উন্মাদের সমস্যা ও চিকিৎসা -সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তন করেন।

তাঁর পর থেকে বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনের নানা বিকারের আলোচনা ও তাদের সুচিকিৎসা -সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন। এই আলোচনার ফলে সুস্থ মানুষের মনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রিয়ার সম্পর্কে জ্ঞানের বহু বিস্তার সাধিত হয়েছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে মানসিক বিকার কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়, এবং সুস্থ ও বিকৃত মনের মধ্যে অলঙ্ঘ্য কোন প্রাচীর নেই। সুস্থ ও বিকৃত মনের সমস্ত ক্রিয়াই স্বাভাবিক নিয়ম (natural laws) -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মনোবিদ্যার নতুন পরিধি-বিস্তার—রাইন্

মনোবিদ্যার পরিধি আর এক নতুন দিকে বিস্তারিত করেছেন রাইন্ (Rhine) ও তাঁর ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা। এঁরা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে মনের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। মনোবিদ্যার এই নতুন ধারার নাম দেওয়া হয়েছে Para-psychology। পরীক্ষার ফলে তাঁরা প্রমাণ করতে চাইছেন, যে দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে এক মানুষের মন অন্য মানুষের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে, তাকে প্রভাবিত করতে পারে, তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এমন কি জড়বস্তুর ওপরও অনুরূপভাবে মন তার প্রভাববিস্তারে সমর্থ। পরিণত বয়সে ডঃ য়্যুঙ্গ-ও (Jung) একথা বিজ্ঞানসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন।

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, মন যা কিছুকে স্পর্শ করে, রঞ্জিত করে, প্রভাবিত করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, তা সমস্তই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু বলে গণ্য হবার যোগ্য। মানুষের মন ও দেহ অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত, তাই মানুষের মনের আলোচনায় তার দৈহিক অনুষঙ্গকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। ক্রম-বিবর্তনের সূত্রে মানুষ সমস্ত জীব-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাই মনোবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর জীবেরাও ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব ; সমাজদেহ থেকে সে পুষ্টি আহরণ করে—সমাজ-পরিবেশেই তার জীবন-মন গঠিত। কাজেই মনোবিদ্যার আলোচনায় ভাষা আচার নীতি ধর্ম কিছুকেই বাদ দেওয়া যায় না। বর্তমান মনোবিদ্যা শুদ্ধ তত্ত্ব-আহরণেই তৃপ্ত নয়। বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কি করে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সুফল লাভ করা যায়, এ বিষয়েও আধুনিক মনোবিদ্ আগ্রহী। তাই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে, শ্রম ও শিল্পের ক্ষেত্রে, অপরাধীদের সংশোধন ও মনোবিকারের চিকিৎসা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার অধিকার বিস্তৃত হয়েছে। মনোবিদ্যার এই পরিধি-বিস্তারের ফলে তার বিভিন্ন বিভাগও অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

মনোবিদ্যার পদ্ধতি

মনোবিদ্যার আলোচনার বিষয়, মানুষের মন। এই মনকে ভিতর ও বাহির দুই দিক থেকেই দেখা সম্ভব। এবং এই দুই পদ্ধতিই মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্তর্দর্শন- ও পরিদর্শন-পদ্ধতি

আমার মনের খবর আমি নিজেই সবচেয়ে বেশী সহজে জানতে পারি। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় রাগ লোভ অভিমান ইচ্ছা ইত্যাদির খবর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে জানতে পারি। এ যেন মনের চক্ষুকে মনের নিজ অন্দরমহলে চর হিসাবে প্রেরণ করা। তাই এ পদ্ধতির নাম **অন্তদর্শন** (Introspection)। **এই উপায়ে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মনে কি**

ঘটছে, তা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে। কিন্তু অন্য মানুষের মনের খবর এ রকম প্রত্যক্ষ ভাবে জানা সম্ভব নয়। তা জানা যায় অপ্রত্যক্ষভাবে,— অন্য মানুষের হাব-ভাব-ভঙ্গী, কথার মধ্য দিয়ে। আমার নিজের যখন খিদে পায়, তখন তা আমার পাকস্থলী সহজেই আমাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু বাট্টুর মা ছেলের শুক্‌নো মুখ দেখে প্রশ্ন করেন, "কিরে বাট্টু, খিদে পেয়েছে বুঝি? মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!" অথবা কৃষ্ণা এসে হয়তো বলে, "জানো মা, ওকে সেদিন গানের জলসায় নিয়ে যাই নি বলে, নিবেদিতা খুব রাগ করেছে। ওদের বাড়ী গেলুম, ও মুখভার করে বসে রইল, আমার সঙ্গে আলাপই করল না।" এই যে **পরের মনকে কতকগুলি বাহ্য লক্ষণের সাহায্যে জানা, একেই বলা যায় পরিদর্শন** (Inspection)। সহজেই বোঝা যায় মানসিক প্রক্রিয়ার সঠিক জ্ঞান পেতে হলে অন্তর্দর্শন সহজতর ও অধিক নির্ভরযোগ্য উপায়। আমাদের সমস্ত মানসক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ নেই। তা ছাড়া যাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, বা যার ওপর আমার জাতক্রোধ বর্তমান, তাকেও ভদ্রতার খাতিরে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে অভ্যর্থনা করি, "আছেন তো ভালো?" বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মনের আবেগ-অনুভূতিকে গোপন করা। অন্যের মনকে জানা তাই সহজ নয়, এবং মানুষের মন-সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান পেতে হলে, বহু মন পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং সতর্কভাবে বিশ্লেষণ ও তুলনা -দ্বারাই কেবলমাত্র বিভিন্ন মনের প্রকাশের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। আবার, অন্তর্দর্শন -দ্বারা শুধু নিজের মনটির খবরই জানতে পারি, কিন্তু মনোবিদ্যা গড়ে তুলতে হলে অন্যের মনের পরিচয়ও পাওয়া চাই। তাই পরিদর্শন ও অন্তর্দর্শন এই দুই পদ্ধতিরই ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু অন্তর্দর্শন-পদ্ধতিতে অনেক অসুবিধাও আছে, এর বিরুদ্ধে গুরুতর কয়েকটি অভিযোগও আছে।

অন্তর্দর্শনের অসুবিধা এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

"এ পদ্ধতি অনুসারে মন নিজেই দ্রষ্টা (observer) ও দৃশ্য (observed)। এতে মনকে যুগপৎ মনের প্রক্রিয়া (process) ও মনের বিষয় (object) এই দুই ভাগেই ভাগ করতে হয়।" মানসিক ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেকে মনে করেন এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু স্টাউট (Stout) সিদ্ধান্ত করেছেন, "যদিও অন্তর্দর্শন-পদ্ধতি

কঠিন, কিন্তু তা অসম্ভব নয়, এবং এর ত্রুটিগুলি দুরারোগ্য নয়।"[২৯] অন্তর্দর্শন-পদ্ধতির সুষ্ঠু ব্যবহার সহজ নয়। ক্যাল্‌কিনস্ (Calkins) সত্যই বলেছেন, "আমাদের চেতনায় কি ঘটছে তার সঠিক বিবরণ দেওয়া খুবই সহজ মনে হয়। সুতরাং অনেক সময় অন্তর্দর্শন-পদ্ধতির সুব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন আছে, একথা আমরা ভুলে যাই। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এই প্রণালীর অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব।"[৩০]

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ মনোবিদদের প্রত্যক্ষণ-নির্ভর কোন ঘটনার বিবরণও যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য না হতে পারে, তা নিচের কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ থেকে বেশ বোঝা যাইবে। "গোটিন্‌জেন্ শহরে মনোবিদ্যা মহাসভার (Psychological Congress) অধিবেশন চলেছে। হঠাৎ একটি ক্লাউন্ সভাগৃহের মধ্যে দৌড়ে প্রবেশ করল, এবং ঠিক তার পিছে পিছেই ছুটে এল একজন নিগ্রো। নিগ্রোটি ক্লাউন্‌কে ধরে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল, এবং তাকে মেঝেতে চেপে ধরল। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল, এবং একটি পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ধ্বস্তাধ্বস্তি তখন শেষ হয়েছে। এর পর ক্লাউনটি মেঝে থেকে উঠে ঘর থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল, তার পিছে পিছে নিগ্রোটিও ছুটল। এই সমস্ত ঘটনাটিই আগে থেকে শেখানো ছিল, এবং তার ফটোও আগেই তোলা ছিল। ঘটনাটি ঘটতে বিশ সেকেণ্ডেরও কম সময় লেগেছিল। সভাপতি এবার বিস্মিত মনোবিজ্ঞানীদের জানালেন, যে ঘটনা-সম্পর্কে ফৌজদারী মামলা করা প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং তাঁরা যেন প্রত্যেকে ঘটনাটির লিখিত বিবরণ তাঁকে পাঠান।

"চল্লিশটি বিবরণ পাওয়া গেল। এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিবরণী পাওয়া গেল, যাতে মূল ঘটনা-সম্বন্ধে শতকরা কুড়িটির কম ভুল আছে। চৌদ্দটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা, শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ। তেরোটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের বেশী। চব্বিশটিতে শতকরা দশটি এমন ঘটনার উল্লেখ ছিল যা নিতান্তই কাল্পনিক।"[৩১] প্রত্যক্ষ-নির্ভর ঘটনার বিবরণই যদি এত অ-নির্ভরযোগ্য হয়, তা হলে অন্তর্দর্শন-প্রণালী-নির্ভর বিবরণ আরো বেশী অ-নির্ভরযোগ্য, তা সহজেই বোঝা যায়।

---

২৯ Stout—Manual of Psychology, p. 44

৩০ Calkins—A First Book in Psychology, p. 7

৩১ Walter Lippman—Public Opinion

অন্তর্দর্শনের সম্বন্ধে আর একটি মারাত্মক অভিযোগ: কোন মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য তার দিকে মন দিতে গেলে তার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্যালকিন্‌স্ উদাহরণ দিয়েছেন, "খুব মজা পেয়ে যখন উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ছি, তখন যদি নিজেকে প্রশ্ন করি 'এই আমোদ-বোধের স্বরূপটি কি?' তখনি দেখা যাবে আমাদের সে অনুভূতিটি অন্তর্হিত হয়েছে এবং পরিবর্তে মনে একটি গম্ভীর সতর্কভাব এসেছে।"[৩২] জেমস্ (James) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চমৎকার ভাষায় বলেছেন, "এ সব ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শনের বিশ্লেষণ হল একটা ঘুরন্ত লাট্টুর ঘুরনটা কেমন, তা দেখবার জন্য হাতে করে সেটা তুলে নেওয়ার মতো; অথবা অন্ধকারটা কেমন তা দেখবার জন্য টপ্ করে আলোটা জ্বেলে দেওয়ার মতো।"[৩৩] "এজন্য অনেক মনোবিদ্ মনে করেন মানসিক প্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়; তবে **ঘটনাটি ঘটবার পরে আমরা স্মৃতির সাহায্যে তার রোমন্থন** (retrospection) করে থাকি।

অন্তর্দর্শন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অ-নির্ভরশীল,—ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ এই বলে একে পরিত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে 'মন' 'চেতনা' 'অন্তর' ইত্যাদি অপ্রমাণিত ও অনির্দিষ্ট (unproved and undefined) ধারণা বাদ দিয়ে মনোবিদ্যাকে অন্য বিজ্ঞানের মতোই বাহ্যপ্রত্যক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষণের (experiment) ওপরই নির্ভর করতে হবে। অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের উপাদান ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, এবং সর্বজন-সম্পত্তি (public)। মনোবিদ্যার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ আপত্তি অধিকাংশ মনোবিদ্‌ই গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন, ব্যবহারবাদীরা মনোবিদ্যার বিশিষ্ট লক্ষণই বিস্মৃত হচ্ছেন। ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে মনোবিদ্যা অর্থহীন। মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যাকে এক করে দেখা উচিত নয়। তাই তাঁরা বলেন মনোবিদ্যায় বাহ্যপ্রত্যক্ষণ ও অন্তর্দর্শন এই দুই প্রক্রিয়ারই স্থান আছে। তবে অবশ্যই যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে অন্তর্দর্শন-পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব্যক্তিগত ধারণামুক্ত (free from personal bias) হতে হবে। তা হয় না বলেই অন্তর্দর্শনভিত্তিক মনোবিজ্ঞান অ-নির্ভরযোগ্য হয়। জোড্ (Joad) তাই বলেছেন, "যিনি মনোবিশ্লেষণে যত পটু, ততই

৩২ Calkins—A First book in Psychology, p. 7
৩৩ Wm. James—Principles of Psychology, Vol. 1

তিনি যে মত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক, তার অনুকূল তথ্যই অন্তর্দর্শনের পদ্ধতির দ্বারা সংগ্রহ করে থাকেন। এভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত নয়।"[৩৪]

জীবনেতিহাস সংগ্রহ-প্রণালী

বহু ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরণের সুনিয়ন্ত্রিত পরিদর্শনের ফলে আধুনিক মনোবিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৮৮২ সালে শারীরবিজ্ঞানী প্রেয়ার (Preyer) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি মাইণ্ড্ অব্ দি চাইল্ড' প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে বাল্যাবস্থা অবধি প্রত্যেকটি দিনে শিশুর আবর্ত-ক্রিয়া (reflexes), বিভিন্ন পেশী-সঞ্চালন, অনুকরণ, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিকাশ, অনুভূতি, আবেগ, বিচার, ইচ্ছা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করে, তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পর থেকে ক্রমেই এ পদ্ধতি অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যামেরিকার গেসেল্ ইনস্টিট্যুট (Gessell Institute) শিশুর বুদ্ধি ও ব্যবহারের বিকাশের সূত্র আবিষ্কারকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহস্র সহস্র শিশুর জীবনেতিহাস সংগ্রহ করে তাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। এই **জীবনেতিহাস সংগ্রহ-দ্বারা মনের গতি ও পরিণতি জানবার পদ্ধতিকে** ইংরেজীতে **Case-history Method** বলা হয়। বুদ্ধিমত্তা কি পরিমাণে বংশগত, এবং অনুরূপ বহু প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সদুত্তর পাওয়ার জন্য এ পদ্ধতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে। শিশু কোন্ বয়স থেকে প্রথম কথা বলতে শেখে, তিন বছরের শিশুর ভাষায় (vocabulary) বিশেষ্য পদ না ক্রিয়া পদের ব্যবহার বেশী, পাঁচ বছরের শিশুর রাগের প্রকাশ কি রূপ?—এ সমস্ত প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর এই রকম নিয়ন্ত্রিত পরিদর্শন (controlled observation) -পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারাই পাওয়া গিয়েছে।[৩৫] বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনের আর একটি পদ্ধতিও সম্প্রতিকালে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার নাম **Longitudinal Studies** অথবা **Follow-up Method**। এ পদ্ধতি -অনুযায়ী শিশুর

---

৩৪ Joad—The Mind and its workings, p. 29

৩৫ D. McCarthy—The Language Development of the Pre-School Child also, F. Goodenough—Anger in Young Children

কোন একটি গুণ, দোষ বা ক্ষমতা কি ভাবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় বা পরিণতি লাভ করে, তা লক্ষ্য করবার জন্ম শিশুটির একান্ত শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত, মাঝে মাঝেই তাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়ে থাকে। যেমন, তিন বছর বয়সে একটি বালকের আসামান্ত বুদ্ধি অথবা স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। সতর্কভাবে লক্ষ্য করে তার ব্যবহারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা হল। আবার পাঁচ বছর বয়সে সে যখন প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করল, তখন অন্যান্ম সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে তার উৎকর্ষ কতটা, লক্ষ্য করা হল। এ রকম করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে, পরে কলেজে, তার পরে য়্যানিভার্সিটিতে এবং উত্তরকালে সংসারে প্রবেশ করলে, তার প্রতিভা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করল তা লক্ষ্য করার ব্যবস্থা করলে, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তির স্বরূপ, বিকাশের ধারা ও মূল্য -সম্বন্ধে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করা যায়।

পরীক্ষণ

আধুনিক যুগে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পদ্ধতির ব্যবহার একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ভ্যুণ্ড-ই (Wundt) প্রথম চেতনার বিশ্লেষণের কাজে সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-প্রণালী ব্যবহার করেন, এবং মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন। পরীক্ষা -দ্বারাই জানা যায়, যে কোন উদ্দীপক (stimulus) ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা জাগে না, চেতনা জাগতে সামান্ত কিছুকাল বিলম্ব হয় (reaction time)। তেমনই আবার পরীক্ষা -দ্বারা ভেবোর ও ফেক্‌নার (Weber and Fechner) প্রমাণ করলেন যে উদ্দীপকের তীব্রতা (intensity) যত তাড়াতাড়ি বর্ধিত হয় (increased), চেতনার তীব্রতা তত শীঘ্র বর্ধিত হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় মনোবিদ্যার পরীক্ষণের ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু ক্রমশ মানুষের মনের জটিলতর প্রক্রিয়াগুলির বেলায়ও পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে লাগল। গ্যালটন্ (Galton) ও ক্যাটেল্ (Cattell) মানুষে-মানুষে নানা বিষয়ে পার্থক্য -সম্পর্কে মূল্যবান পরীক্ষা -দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্মৃতিশক্তি -সম্বন্ধে এবিংহজ (Ebbinghaus), শিক্ষণ -সম্বন্ধে থর্নডাইক্ (Thorndike), কোহ্‌ল্যের (Kohler) ও পাভলভ্ (Pavlov); বুদ্ধির পরিমাপ সম্পর্কে বিনে (Binet), টার্‌মান (Terman); অনুভূতি ও প্রক্ষোভের প্রকাশ -সম্বন্ধে শেরিংটন (Sherrington), ও ফেলেকি (Feleki) প্রমুখের সফল পরীক্ষার সিদ্ধান্ত মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য

করেছে। ক্রমশই মনোবিদ্যা অধিকতর পরীক্ষণ-ভিত্তিক হয়ে উঠছে। কিন্তু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষা অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কারণ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তখনই সফল হয়, যখন সমস্ত অবস্থা (conditions) পরীক্ষকের আয়ত্তাধীন। কিন্তু মানুষের জীবন ও মন অত্যন্ত জটিল, এবং বহু অজানিত অবস্থা সেখানে ক্রিয়া করে। "প্রাণীদেহ (organism) তার পরিবেশ ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক (significant relations) আবিষ্কার করতে হলে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাগুলি যথাসম্ভব কঠোর শাসনাধীনে (rigid control) আনা প্রয়োজন। অর্থাৎ, অবস্থাগুলি এমন হওয়া চাই, যেন পরীক্ষক তাদের আলাদা আলাদা ভাবে ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে (independent variation) পারেন। কাজেই যাঁরা স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেন, তাঁরা এ অবস্থাগুলির আপনা থেকে পরিবর্তনের (spontaneous variations) ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে রত, তাঁকে নিজস্ব চেষ্টায় এ পরিবর্তনগুলি ঘটাতে হয়।" যেমন আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে-কমিয়ে (অন্য সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে) পরীক্ষক মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন। এমন পরীক্ষায় দেখা যায়, ক্ষীণ আলোকে মানুষের মন বিষণ্ণ হয়, পড়াশুনা বা কাজ করতে কষ্ট হয় ; আবার উজ্জ্বল আলোকে মন উৎফুল্ল করে, তা পড়াশুনা ও কাজে উৎসাহ সঞ্চার করে, ফল তাতে ভাল হয়। কিন্তু আবার দেখা যায়, অতি তীব্র আলো অস্বস্তিকর, তা চোখকে পীড়া দেয়, মাথা গরম করে।

"মানসিক অবস্থার পরিবর্তন অনেকগুলি অবস্থার ওপর নির্ভর করে, যথা (১) প্রাণীদেহের প্রকৃতি—তা মানুষ, না ইতর প্রাণী, শিশু না পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, (২) পূর্বে যে শক্তি আয়ত্ত হয়েছে—নিপুণতা জ্ঞান ইত্যাদি (৩) জীবদেহের (organism) বর্তমান অবস্থা — সুস্থ বা অসুস্থ, ক্লান্ত না সতেজ, ক্ষুধার্ত না তৃপ্ত, এবং (৪) উদ্দীপক (stimuli)—আলো, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি,—যা প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক **পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ সব অবস্থার কয়েকটি মাত্র পরিবর্তন করে (এবং অন্য সব কটি অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে), তার ফলাফল সযত্নে লক্ষ্য করা হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়।**"[৩৬] সহজেই বোঝা যায় উচ্চতর জটিল

৩৬ N. L. Munn—Psychology, p. 18

মানসিক প্রক্রিয়া (বিমূর্ত চিন্তা, রস) ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতি খুব সফল ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

যে অবস্থাটি পরিবর্তন করে ফলাফল লক্ষ্য করা হয়, (এক সঙ্গে একটি মাত্র অবস্থাই কেবল পরিবর্তন করা চলবে) তাকে পরীক্ষার independent variable বলা হয়। যেমন, পূর্বের দৃষ্টান্তে আলোটি independent variable। বিজ্ঞানী এ অবস্থাকে স্বাধীন ভাবে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু এ অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় (responses) যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে dependent variable বলে। যেমন আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে যদি দেখা যায় ব্যক্তির কর্মে নিপুণতা বেড়েছে, তা হলে প্রথম অবস্থাটিই দ্বিতীয় অবস্থার কারণ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে। কখনো কখনো পরীক্ষার সফলতার জন্য পরীক্ষিত ব্যক্তিদের দুই বা ততোধিক দলে ভাগ করতে হয়। "যেমন পরীক্ষক জানতে চান, যে শিশুদের পেশী-বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনে দক্ষতা (motor skills)—স্বাভাবিক ভাবে তাদের এ সব দক্ষতালাভের সুযোগ দেওয়া অপেক্ষা, এ বিষয়ে অত্যন্ত বাল্য-কালে শিক্ষা দিলেই বেশী শীঘ্র বাড়ে কিনা। তাঁকে তা হলে দুটি দল শিশু নিতে হবে (যারা সর্বাংশে এক প্রকার)। তার একটি দল হল, যাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (trained) এবং আর একদল নিতে হবে যাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি (untrained); এবং তা অবশ্যই এমন হতে হবে যারা স্বাভাবিক ভাবে (অর্থাৎ, কোন শিক্ষা না দেওয়া হলে) একই হারে অগ্রসর হত। এই অগ্রগতির হার কিন্তু বংশগতি (heredity) -দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই দুটি দলের শিশুদের বংশগতি ঠিক একই হওয়া চাই, তা হলেই কেবল পরীক্ষাটি সফল হতে পারে।[৩৭] যে দলটিকে শিক্ষা দেওয়া হল, তাকে Experimental group বলা হয়, কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই দলটিকে সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগে (যথা, শিক্ষা -দ্বারা) পরিবর্তিত করার প্রয়াস করা হল, এবং এ সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগের ফল, আর একটি দলের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হল। দ্বিতীয় দলটিকে তাই Control group বলা হয়। এ পরীক্ষা -দ্বারা দেখা যায় যে শিক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের অবসানে, গোড়ার দিকে শিক্ষিত দলের শিশুরা অশিক্ষিত দলের শিশুদের চেয়ে বেশী নৈপুণ্য দেখায়; কিন্তু অল্প কিছুদিন বাদেই দেখা যায়, অশিক্ষিত দলের নৈপুণ্য, শিক্ষিত দলের

৩৭ Munn—Psychology, p. 111

সমানই হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা বোঝা যায়, শিশুদের দিগ্‌গজ করবার আশায় যে পিতামাতা অতি শিশুকাল থেকেই তাড়া লাগান, তাঁদের অতিরিক্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। শিশুর দেহমন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিকাশলাভ করলে, তবেই শিক্ষার কাজ সুফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু সহজেই বোঝা যাবে এমন পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। কারণ এ পরীক্ষার জন্য এমন দুটি শিশুর দল সংগ্রহ করা চাই যারা বয়সে, দেহে, মনের শক্তি ও নৈপুণ্যে সর্বাংশে সমান। এরকম দুটি দল সংগ্রহ করা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব। বড় জোর কয়েক জোড়া যমজ শিশু (Identical twins) নিয়ে তাদের দুটি সমান দলে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এমন কয়জোড়া যমজ সন্তান পরীক্ষার জন্যে একত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কাজেই মোটামুটি একই সমাজের, একই অবস্থার (similar social and economic status), একই বয়সের, সমান বুদ্ধিমান দুই দল ছেলে নিয়ে এ পরীক্ষা চালাতে হয়। সহজেই অনুমেয় যে কঠোর বৈজ্ঞানিক শাসনাধীন পরীক্ষার ব্যবস্থা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কত কঠিন। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কুচিত। সুতরাং, মনোবিদ্যার যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পরীক্ষণের ভিত্তিতে এ বিজ্ঞানকে স্থাপিত করার আশা করা যায় না।

উৎপত্তি- ও ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি (Genetic method)—পূর্বেই বলা হয়েছে, বর্তমানের ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতেরা মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ (isolated and independent) বলে মনে করেন না। তাঁরা তাই এইসব ক্রিয়ার **উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ** করতে উৎসুক। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে, শিশুমনের সরলতর প্রক্রিয়া, এমন কি ইতর প্রাণীর সহজ ব্যবহার বুঝতে হবে। এই-ই Genetic method। "যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তা মনোবিদের দৃষ্টিতে আলোচনা করলে আমরা বারে-বারেই এমন ঘটনার সাক্ষাৎ পাই, যার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তাদের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেই শুধু বোঝা যায়। কাজেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে শিশুমনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করা। কিন্তু যদিও এজন্যে আমাদের **তুলনামূলক মনোবিদ্যার (Comparative Psychology)** নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, কিন্তু তথাপি আমরা প্রাণী-মনোবিদ্যার মূল সূত্রগুলি সোজাসুজি আমাদের আলোচিত বিজ্ঞানে ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকব না। তার পরিবর্তে আমাদের

এ সমস্ত সূত্রের মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং সে সূত্রগুলি (শিশুর মন বুঝবার ক্ষেত্রে) ব্যবহার কালে প্রয়োজনমতো পরিবর্তনও করতে হবে।[৩৮] প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোহ্‌ল্যের (Kohler) প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সম্পর্কে অনুসন্ধানের উপযোগী পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং সে পদ্ধতি বানর-জাতীয় প্রাণীদের (anthropoid apes and chimpanzees) ব্যবহার-ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন। এ পদ্ধতিগুলি বিশেষ পরিবর্তন না করেই শিশুর ব্যবহার ও মন বোঝবার কাজে সহজেই ব্যবহার করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে কোহ্‌ল্যের শিশুদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার -দ্বারা পরীক্ষায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন এবং বুহ্‌ল্যের (Buhler) ও তাঁর পরে আরো কেউ কেউও এ পথ অনুসরণ করেছেন।" বাস্তবিক পক্ষে এ পদ্ধতি মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ক্রমশই অধিকতর গুরুত্বলাভ করছে।

পরিসংখ্যানভিত্তিক-পদ্ধতি (Statistical procedures)—"বর্তমান-কালে এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করছে। বিশেষত, সমস্ত মানবসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে যেখানে **সম্ভাব্যতার পরিমাণ** (calculation of probabilities) ও **গড়-নির্ধারণের** (determination of averages) প্রশ্ন গুরুতর, সেখানে এ পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।" এই রীতি-ব্যবহারের দ্বারা মনোবিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষার ধরন (design of his experiments) এবং তার ফলাফলগুলি অঙ্কের রীতি-অনুযায়ী সাজিয়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার **গতি কোন্‌দিকে (trends)** এবং তাদের **তাৎপর্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্বন্ধ (Correlation)** -বিষয়ে বহু গুরুতর সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন। মনোবিদেরা প্রথমত ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদনির্ণয়ের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এখন কিন্তু এ পদ্ধতির ব্যবহার মনোবিদ্যার বহু ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক। বুদ্ধির সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার সম্পর্ক কি? ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি কতটা পরিমাণে স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক? যাঁরা আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা কতজন শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন? বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে নাস্তিকতার সম্পর্ক কি?—এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেতে হলে পরিসংখ্যান-পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য। তেমনি, "বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ

৩৮ Koffka—The Growth of the Mind, p. 433

মান-নির্ণয় (standardisation), ব্যক্তিত্বের এবং আরও অন্যান্য মানসিক শক্তি, বৃত্তি, রুচির পরীক্ষায়ও এ রীতির ব্যবহার অপারিহার্য। কারণ এ পদ্ধতি -দ্বারা পরীক্ষিত ব্যক্তিদের সাফল্য-অসাফল্য-সূচক অঙ্ক (test score) এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই বুঝতে পারা যায়।"[৩৯]

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে অন্তর্দর্শন-পদ্ধতি মনোবিদ্যার প্রধান পদ্ধতি হলেও, এটা একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়। অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমশই অধিকতর মর্যাদালাভ করছে। বাস্তবিক পক্ষে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন একটি পদ্ধতির ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। উপরিউক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেই মনোবিদ্যা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা (Branches of Psychology)—মনোবিদ্যার পরিধি আজ বহুবিস্তৃত। বিভিন্ন দিকে মনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হচ্ছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সে জন্য বর্তমানে মনোবিদ্যা অন্যান্য অগ্রসর বিজ্ঞানের মতো বহু শাখায় বিভক্ত। এর প্রধান কয়েকটি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক :

সাধারণ মনোবিদ্যা (General Psychology)—এর উদ্দেশ্য পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিবরণ ও তাদের সাধারণ-বিধি (general laws) -আবিষ্কার। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অন্তর্দর্শন, পরীক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা যে সব সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

বিশ্লেষণাত্মক মনোবিদ্যা (Analytical Psychology)—এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন মানসক্রিয়ার বিশ্লেষণ -দ্বারা তাদের স্বরূপ-নির্ণয়। বিভিন্ন মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ এবং পরিণতি -সম্বন্ধে এ শাখা আলোচনা করে। এই শাখা মানুষের মনকে অন্তরের দিক থেকেই বিচার করে।

ব্যবহার-বর্ণনাত্মক মনোবিদ্যা (Behaviouristic Psychology)—এ শাখায় মানুষের মনকে তার বাইরের ব্যবহার -দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করা হয়। উগ্র ব্যবহারবাদীরা মনের অন্তরের দিক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একে মনোবিদ্যার এক শাখা না বলে মনোবিদ্যায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বলা উচিত।

---

৩৯ Munn—Psychology, p. 25

উৎপত্তি-অনুসন্ধানী মনোবিদ্যা (Genetic Psychology)—এ শাখায় মানুষের মনকে তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

শিশু-মনোবিদ্যা (Child Psychology)—এ শাখা শিশুমন নিয়ে আলোচনা করে। শিশুমন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মনের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র নয়। শিশুর কল্পনা বিচার অনুভূতি বিশ্বাস ইত্যাদি প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তা ঔৎসুক্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। তা ছাড়া, কি করে শিশুর মন ক্রমশ পরিণতবয়স্ক মনে বিকশিত হয়, তার আলোচনা বহু বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করেছে। বর্তমান জগতে শিশুর মূল্য ও মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ওপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, এ বিশ্বাস আজ বদ্ধমূল। সুতরাং শিশু মনোবিদ্যা আজ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

তুলনামূলক মনোবিদ্যা (Comparative Psychology)—মানুষের মন, শিশুমন এমন কি ইতরপ্রাণীর মনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত; তাই তাদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব। পূর্বেই বলা হয়েছে থর্নডাইক্, কোহ্‌ল্যের প্রমুখ পণ্ডিতেরা পশুপক্ষীদের শিক্ষার মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করে তা দ্বারাই মানুষের শিক্ষারূপ জটিল ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology)—মানুষ সামাজিক জীব। তার মনের গঠন ও পুষ্টি সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ঘটে থাকে। তাই মানুষের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-কৃষ্টি মানুষের মনের পরিচয়-বহন করে। সে জন্য মনোবিদ্যার এ শাখা ক্রমশই অধিকতর মর্যাদালাভ করছে। এমনও অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁদের মতে সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে মনোবিদ্যার আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাছাড়া জনতা এবং একক মানুষের ব্যবহারে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং জনতার মনের আলোচনা (the crowd mind) মনোবিদ্যার একটি নতুন দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিকারগ্রস্ত মনের বিজ্ঞান (Abnormal Psychology)—সুস্থ মানুষের মন যেমন মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, রুগ্‌ণ মনও তেমনই সযত্ন আলোচনার যোগ্য। সুস্থ ও রুগ্‌ণ মনের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর

নেই। বর্তমানের কৃত্রিম জটিল এবং অতি দ্রুততায় বিশ্বাসী সভ্যতার যুগে অধিকাংশ মানুষই অল্পবিস্তর বিকৃতমনা। বাতুলতা (insanity) ও অমূল-প্রত্যক্ষই (hallucination) কেবল মাত্র রুগ্‌ণ মনের পরিচয় নয়; অধ্যাস (illusion), বিভ্রম (delusion), মিথ্যা ভয় (phobia), বাতিক (mania), হঠাৎ স্মৃতিলোপ (aphasia), স্বপ্ন ইত্যাদিও রুগ্‌ণ মনের মানসিকতার অন্তর্গত। ফ্রএড্ ও তাঁর অনুগামীরাই এই শতাব্দীতে বিকৃত মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে সচেতন মনের গভীরে আছে নির্জ্ঞান মন এবং এই গভীরতলে পৌঁছতে না পারলে সচেতন মনের অনেক ক্রিয়াও অব্যাখ্যাত থেকে যায়।[৪০] এ নির্জ্ঞান মনের সন্ধান সাধারণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী দ্বারা পাওয়া যায় না। এই গভীর অবচেতনের সঠিক সংবাদ পাবার জন্য তাঁরা এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন—তার নাম মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) অথবা মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (free association)। ফ্রএড্-এর আজীবন সাধনার ফলে মনোবিদ্যার এই নতুন শাখা-প্রবর্তনকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন।

এই নতুন ক্ষেত্রে গবেষণার মূল্য বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ (theoretical knowledge) মাত্রই নয়। এই জ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করে **মানসিক রোগের চিকিৎসার (Psychiatry)** এক নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিছুদিন পূর্বেও সাধারণ চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসা-পদ্ধতিকে অত্যন্ত অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু বর্তমানে এটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে। তবে এ চিকিৎসা-পদ্ধতি এখনও নতুন, এবং বহু উন্নতির অপেক্ষা রাখে।

শারীরবৃত্ত-ভিত্তিক মনোবিদ্যা (Physiological Psychology)—সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গী, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়ের বাহ্য, বা রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ইত্যাদি আভ্যন্তরিক কোন না কোন পরিবর্তন। ক্রমশই মনোবিদ্যার আলোচনায় চেতন-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্যবহারের (behaviour) আলোচনার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা

৪০ Freud—Psychopathology of Everyday life

এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা মানুষের মনকে দেহের পরিবর্তনের দিক থেকেই ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

পরীক্ষণ-ভিত্তিক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology)—যতই মনোবিদ্যার আলোচনা অগ্রসর হচ্ছে, ততই তা অধিকতর পরীক্ষণ-ভিত্তিক হচ্ছে। ইন্দ্রিয় পেশী গ্রন্থি ইত্যাদির ক্রিয়া, এদের শক্তি সূক্ষ্মতা ও অনুষঙ্গী মানসিক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, বুদ্ধি স্মৃতি শিক্ষণ অনুভূতি বিচার চিন্তা ইত্যাদি উচ্চতর জটিল মানসিক ক্রিয়া -সম্বন্ধেও বহু পরীক্ষা হয়েছে ও হচ্ছে, এবং এর ফলে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা ক্রমশই সমৃদ্ধতর হচ্ছে। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার পরিমাপের (Psychometry) ব্যবস্থা হয়েছে।

শিক্ষা- ও শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Educational and Industrial Psychology)—ইংরেজীতে বলে জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power)। বাস্তবিক পক্ষে বহুদিন পূর্ব থেকেই মনোবিদ্যার সূত্রগুলি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। রুসো (Rousseau) প্রথম স্পষ্ট করে বলেন, শিক্ষা সফল হতে হলে, তা শিশুর মানসপ্রকৃতির পরিণতির স্বাভাবিক ধারাকে অনুসরণ করবে, এবং তিনি শিশুর মানসিক বিকাশের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তরনির্দেশ করে, এক অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর স্পষ্ট নির্দেশ দেন। তিনি শাসনপীড়ন-ভিত্তিক প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন। রুসো-র মনোবিদ্যায় অধিকার যথেষ্ট ছিল না, এবং তাঁর ধারণার মধ্যে বহু ভ্রান্তি অতিকথন এবং স্বতঃবিরোধিতাও ছিল। কিন্তু তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, শিক্ষা সফল হতে গেলে, তা মনোবিদ্যাভিত্তিক হতে হবে। রুসো-র পরবর্তী পেস্তালৎসী ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, "আমি শিক্ষণ ব্যাপারকে মনোবিদ্যার ভিত্তিতে স্থাপন করতে চাই।" ('I wish to psychologise education')। তার পর থেকে মনোবিদ্যার বিভিন্ন সূত্র ক্রমশ অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কি করে শিক্ষণ-ক্রিয়ায় শিশুর মন সর্বাধিক আকৃষ্ট করা যায়? কি করে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা যায়? তাকে অধিকতর কার্যকরী করা যায়? শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাব শুভ, না অশুভ? উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-পদ্ধতি (system of examination) কোন্‌টি? রাগ ভয় লজ্জা ইত্যাদি জন্মগত সংস্কারকে কি করে শিক্ষার কাজে

লাগানো যায়? বুদ্ধি রুচি দক্ষতার পরিমাণ কি করে পরিমাপ করা যায়? যারা ক্ষীণবুদ্ধি বা বিকলাঙ্গ তাদের উপযুক্ত শিক্ষার উপায় কি? এরূপ সহস্র গুরুতর প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে, অথবা সুমীমাংসা করতে হলে, মনোবিদ্যার ব্যবহার অপরিহার্য। **মনোবিদ্যার যে শাখা এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যাপৃত তাকে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বলা হয়।**

অনুরূপভাবে বর্তমানে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যা সাফল্যের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কি উপায়ে কর্মীরা কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করতে পারে? কি করে উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়ান যায়, কি করে কর্মীদের শ্রম-অপনোদন করা যায়? কি ভাবে তাদের উৎসাহ ও নতুন আবিষ্কারের আগ্রহ বাড়ানো যায়? শ্রমিক-মালিক-সম্বন্ধের উন্নতি কি ভাবে সম্ভব? কি করে উৎপন্ন পণ্যক্রয়ে ক্রেতাকে লুব্ধ করা যায়? **—এ জাতীয় সমস্ত 'কেজো' প্রশ্নের উত্তর মনোবিদ্যার যে শাখা আলোচনা করে তার নাম শিল্প-মনোবিদ্যা (Industrial Psychology)।**

আধুনিক মনোবিদ্যার মর্যাদা

বর্তমান যুগ যেমন মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে, আধুনিক মনোবিদ্যাও তেমনি মানুষের মনকে মর্যাদা দিয়েছে। সে অসীম শ্রদ্ধাভরে অপরিসীম ঔৎসুক্য নিয়ে মানুষের শিশুকাল, তার গতি ও পরিণতি জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে। সে পাপী বলে চোরকে ঘৃণা করে না, উন্মাদ বলে অপ্রকৃতিস্থকে দূরে রাখে না। স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, শিশু ও বয়স্ক, চেতন ও অবচেতন মনের সমস্ত অবস্থাকেই সে সমান আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সে বিশ্বাসী, তাই কত সহস্র রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে মানুষের মন নিয়ে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। তার ফলে, গত পঞ্চাশ বছরে এই বিজ্ঞানে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, তা বিগত দুই হাজার বছরেও হয় নি। যত নতুন পরীক্ষা ও আলোচনা হচ্ছে ততই এ বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক আবিষ্কৃত হচ্ছে, নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এ যুগ অহঙ্কার করে বলে নি, "সব জানা হয়ে গেছে।" বরং পূর্বের চেয়ে যতই জ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই সে জানছে আরো অনেক অজানা রয়ে গেল। বিভিন্ন বিজ্ঞান যথা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গে এই বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কের কথা

ক্রমেই অধিকতর বোঝা যাচ্ছে, আর বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশই জটিলতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। এ যুগ ক্রমবিবর্তনবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে। শুধু বিশ্লেষণ নয়, বিকাশ ও পরিণতির গতি লক্ষ্য করার দিকে ঝোঁক এসেছে। মনোবিদ্যাকে এ যুগ কেবল মাত্র তথ্য-আহরণের দিক থেকে বাড়িয়ে তোলে নি, এর ব্যবহারিক মূল্য ও মর্যাদা -সম্পর্কেও মনোবিজ্ঞানী সচেতন হয়ে উঠেছেন।

মনোবিদ্যার উপযোগিতা: ব্যক্তিগত ও সমাজগত (Utility of Psychology for the individual and the Society)—মনোবিদ্যা শুধু মাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান (theoretical) নয়। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জীবন্ত মানুষের আলোচনা, এবং এর সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জীবনের সমস্যা-সমাধানে সমর্থ। ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য ও সুখশান্তির উদ্দেশ্যে যেমন এ বিজ্ঞান সহায়ক হতে পারে, তেমনি সমাজগত জীবনে বিরোধ-মীমাংসার দ্বারা কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সন্তুষ্টিবিধানও মনোবিদ্যার যথোচিত ব্যবহার -দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

কি করে পরীক্ষার পড়া মনে রাখা যায়? কি করে কোন কঠিন বিষয় সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত করা যায়? শ্রান্তি ও বিরক্তির মূল কারণগুলি কি? কি করেই বা তাদের দূর করা যায়?—এ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং মনোবিদ্যা-সম্মত উপায় অবলম্বন করে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা (efficiency) বৃদ্ধি করা যায়। অনেক প্রাচীন শিক্ষক মনে করেন, ছাত্ররা কোন একটি শিক্ষিতব্য বিষয় যত বারে বারে অবিরাম মুখস্থ করবে, ততই তা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসবে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়, তোতাপাখীর মতো অর্থ না বুঝে মুখস্থ করলে, বিষয়টি আয়ত্ত হয় না, বহু সময়ের অপচয় ঘটে। আবার পরীক্ষার ফলে জানা যায়, একটানা বারে বারে পড়লে, পাঠ্যবস্তু যতটা সময়ে আয়ত্ত হয়, তার চেয়ে কম আয়াসে এবং মোট কম সময়ে, সেই বিষয় আয়ত্ত হয়, যদি মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে পড়া যায়। কেন আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যথাকালে ভুলে যাই? কি করে তা নিবারণ করা যেতে পারে?—এ সমস্ত ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সমস্যার সুসমাধানের জন্য মনোবিদ্যাসম্মত জ্ঞান বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

ব্যক্তির সুখ শান্তি আনন্দ উদ্যমের শ্রেষ্ঠ উৎস, প্রেম বা ভালবাসা

মন পেতে হলে মন জানা চাই। অন্ধ প্রবৃত্তির বশে বর্বরের মতো কেড়ে ভোগ করতে গেলে প্রিয়পাত্র বা প্রিয়পাত্রীকে হারাতে হয়। তাই 'যোগাযোগে' স্থূল, দাম্ভিক মধুসূদন কুমুদিনীকে পেয়েও পেল না, যদিও কুমুর মন পূজার ফুলের মতো অপেনাকে স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বামীদেবতার পায়ে উৎসর্গ করবার জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল! কাব্যের নায়ক হাহাকার করে বলছে—

মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।

এ নির্বোধ জানল না, সবসময় নিজেকে অবমাননা করে চরণে লোটালেই প্রিয়াকে পাওয়া যায় না। বর্তমান কালে কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় মানুষের বিচিত্র মন; আমরা এখন পূর্বের মতো ঘটনা-বহুল উপন্যাস পছন্দ করি না, আমরা খুঁজি মানুষের জটিল মনের কুটিল কাহিনী—লেখকের নিকট দাবি করি, স্বৈরিণী মনের নিপুণ বিশ্লেষণ। সংসারের কোন কাহিনী তখনই আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়, যখন তা মনোবিদ্যাসম্মত। যিনি মনোবিদ্যার রসিক, তিনি বুঝতে পারেন, কেন 'পল্লীসমাজে'র রমা রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল, কেনই বা দেবদাস তার আদরের পারুর সুন্দর মুখখানা ছিপের তীক্ষ্ণ কঠিন আঘাতে রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত করে দিল। কাব্যজগৎ ছেড়ে বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি, আমাদের পারিবারিক জীবনের অসুখ ও অশান্তির মূলে অনেক সময় রয়েছে ভুল-বোঝাবুঝি মানসিক সংঘাত ও বৈপরীত্য। হয়তো অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী এ সব অশান্তি দূর করতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন,—শান্ত মনে, সমস্ত অবস্থার বিশ্লেষণান্তে, সদুপদেশ -দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে প্রতি শহরে বহু পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, এসব পারিবারিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেন (Counselling bureaus)। অনেক সংবাদপত্রেও মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত বিভাগ আছে। সেখানে গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠি লিখে, বা দেখা করে, ব্যক্তি- বা পরিবার-গত সমস্যা -সম্পর্কে সুপরামর্শ পেতে পারেন। অনুরূপভাবে শিশুদের মেজাজ, মর্জি, খামখেয়ালীপনা, কুপ্রবৃত্তি, অপরাধ-প্রবণতা সংশোধনকল্পে অনেক বিদ্যালয় ও শিশু-চিকিৎসালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনোবিদ্যায় পারদর্শী বিশেষজ্ঞ থাকেন। অনেক মনোবিজ্ঞানী এ রকম পরামর্শ দেবার দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে রত আছেন। এঁদের মধ্যে

অনেক বুজরুকও আছে, তথাপি এত সংখ্যায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যখন এই পরামর্শদানের কাজে রত আছেন, তখন বোঝা যায়, মনোবিদ্যা আমাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যা-সমাধানে সহায়ক হতে পারে, এই ধারণা অন্তত পাশ্চাত্যদেশে বদ্ধমূল।

শিক্ষা শিল্প ও চিকিৎসা এই তিন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার সার্থক ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং মনোবিদ্যার উপযোগিতা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নানা বাস্তব সমস্যা-সমাধানে এর কার্যকারিতা, অবশ্যই স্বীকার্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ব্যবহার (Uses of Psychology in Education)—বর্তমান যুগের শিক্ষানীতি মনোবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত। শিক্ষাপ্রণালী -সম্বন্ধে সমস্ত পরীক্ষাও মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক। বর্তমানের শিক্ষক এ কথা জানেন, যে শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি ও বিকাশ অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত (the organismic view), এবং শিক্ষার ধারা এ পরিণতি ও বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করলে তবেই তা সার্থক হতে পারে। এ কথাও শিক্ষক জানেন, শিশুর জীবন ও মনের বিকাশের নির্দিষ্ট ক্রম- ও স্তর-বিভাগ থাকলেও, প্রত্যেক শিশুর পরিণতির ছন্দ বিভিন্ন। তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একশ্রেণীর সমস্ত শিশুকে একই অনড় ছাঁচে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলে বহু অপচয় ঘটে, বহু মনস্তাপের কারণ ঘটে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি রুচি শক্তি ও প্রবণতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করে, প্রত্যেকের প্রয়োজন -অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তুর তারতম্য করা হয়। মনোবিদ্যাশিক্ষিত আধুনিক শিক্ষক জানেন, শুষ্ক বইপুস্তক উপদেশের চেয়ে, শিশুর পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের সকৌতূহল স্বাধীন ব্যবহার, অনেক বেশী কার্যকরী। শিশু গড়তে ভালবাসে; দশজনে মিলে উদ্যম তার পক্ষে সুখকর ও স্বাভাবিক। তাই নতুন যুগের শিক্ষক অঙ্কন হস্তশিল্প খেলা নাচ অভিনয় গঠনমূলক প্রকল্পের (project) মধ্য দিয়ে শিক্ষার পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন। পাশ্চাত্য দেশের কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী প্রণালী, প্রজেক্ট ও হুয়রিস্টিক মেথড্ এবং আমাদের দেশে সার্জেন্ট পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়, গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা, সমস্তই ক্রিয়া-কেন্দ্রিক (activity-centred) ও আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত।

শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ব্যবহার (Uses of Psychology in Industry)—শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্যের দুটি

মাপকাঠি—লাভ (profit) এবং উপযোগিতা (utility)। যিনি উৎপাদন পরিচালনা করেন, তাঁর চিন্তা, কি উপায়ে তাঁর অধীন কর্মীদের দিয়ে স্বল্পতম সময়ে অধিকতম উৎকৃষ্ট পণ্য-উৎপাদন করা যায়, এবং কি করে উৎপন্ন পণ্য ক্রেতাদের পক্ষে আকর্ষণীয় করে সব চেয়ে বেশী বিক্রী করা যায়। এ সমস্ত বিষয়েই মনোবিদ্যার কাছ থেকে মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত পণ্যের অনেকগুলি দ্রব্যই কিছু না কিছু খুঁতযুক্ত বা ভাঙ্গা অবস্থায় ফ্যাক্টরী থেকে পাওয়া যেতে লাগল। কর্মকর্তারা স্থির করলেন শ্রমিকদের অসাবধানতার জন্যই এ রকম ঘটছে। এবং প্রতিকারকল্পে তাঁরা শ্রমিকদের জরিমানার ব্যবস্থা করলেন। ছয় মাস পরে দেখা গেল পণ্যদ্রব্যের খুঁত ও ভাঙ্গাচোরা পূর্বাপেক্ষা বরং বেড়েই গেছে। অনুরূপ অবস্থায় আর একটি প্রতিষ্ঠান বিব্রত হয়ে কজেকজন বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা উৎপাদন-কর্মে রত কর্মীদের অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব ও উপদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করলেন। এসব সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে, সেই প্রতিষ্ঠানে পণ্যদ্রব্যের খুঁত ও ভাঙ্গাচোরা শতকরা ৫৩ ভাগ কমে গেল।[৪১] আজকাল শিল্পবিষয়ে অগ্রসর প্রত্যেক দেশেই বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থাকে। তাঁরা প্রত্যেক শিল্পের বিশেষ অবস্থা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া কি ভাবে শ্রমিকদের মনে প্রভাব বিস্তার করে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে, কি ভাবে তাদের সন্তুষ্ট রেখে কর্মোদ্যম- ও উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং পণ্যের উৎকর্ষ-সাধন করতে হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। যেমন, দেখা যায়, কারখানা-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট আলোবাতাসযুক্ত হলে দুর্ঘটনাই শুধু কমে না, পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, লাভের অঙ্ক মোটা হয়। তেমনি, কর্মীদের জন্য কয়েক ঘণ্টা একটানা কাজের পর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি, এবং তখন বিনামূল্যে চা ও হাল্কা জলখাবারের ব্যবস্থা করলে, এবং অবসর বিনোদনের জন্য রেডিও, টি. ভি., অভিনয়, পিং পং খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করলে, প্রথমত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কিছু খরচ হলেও, পরিণামে যে লাভ হয়, তাতে যে টাকা এ সব ব্যবস্থার জন্য খরচ হয়, তার বহুগুণ উঠে আসে। অর্থাৎ যেখানেই কর্মীরা বুঝতে পারে, তাদের সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সচেতন, তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে দাম আছে,

৪১ C. S. Myers—Industry in Great Britain

সেখানেই ভাল কাজ ও বেশী কাজ পাওয়া যায়। যে সব বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজের বহু বিভাগ আছে এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত হয় সেখানে কর্মীদের বুদ্ধি রুচি শক্তি ও প্রবণতা মনোবিছা-সম্মত পরীক্ষার (Intelligence tests, vocational aptitude tests, mechanical aptitude tests) সাহায্যে বাছাই করে কর্মীদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করলে, বহু সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়, এবং প্রত্যেক কর্মীর শক্তি -অনুযায়ী সব চেয়ে বেশী কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সৈন্যবিভাগে যখন সহস্র সহস্র লোক নেওয়া হয়, তখন প্রধান ও প্রথম সমস্যা দাঁড়ায়, কাজ অনুযায়ী লোক-বাছাই, এবং লোক অনুযায়ী কাজ-বাছাই (fitting the man to the job, and fitting the job to the man)। এ জরুরী সমস্যা-সমাধানের জন্যই প্রথম ব্যাপকভাবে বুদ্ধি প্রবণতা শক্তি ইত্যাদির মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়, এবং তাদের উপযোগিতা -সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাকাশ-বিহারী গ্যাগারিন, টিটভ, শেপার্ড প্রমুখ অসীম-সাহসী বীরদের নাম আজ সকলের মুখে মুখে প্রচারিত। কিন্তু এঁরা আকস্মিক ব্যতিক্রম মাত্র নন। এঁদের কীর্তির পেছনে রয়েছে মনোবৈজ্ঞানিক কঠোর পরীক্ষা -অনুযায়ী বাছাই, ও মনোবিছা-সম্মত-পদ্ধতি অনুসারে দীর্ঘকাল কঠিন শিক্ষা (rigorous psychological training)।[৪২] আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক উচ্চ পরীক্ষায় (U. P. S. C.) প্রার্থী-নির্বাচনে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে মনোবিছা (Uses of Psychology in Medicine)—বর্তমান কালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনোবিছার ব্যবহার ক্রমশই প্রসারলাভ করছে। তেতো বা বিস্বাদ ওষুধও আকর্ষণীয় রংয়ে বা আবরণে রোগীকে দেওয়া হয়, কঠিন অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগী যাতে অতিরিক্ত ভয় না পায়, সে ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে বাতুলতা

---

৪২ H. E. Burt—Psychology and Industrial Efficiency
W. V. N. Bingham—Aptitudes and Aptitude Testing
E. G. Boring—Psychology for the Armed Services
F. W. Taylor—Principles of Scientific Management
P. E. Vernon and J. B. Barry—Personnel Selection in the British Forces

(insanity), হিস্টিরিয়া, অমূল-প্রত্যক্ষ (hallucination) ইত্যাদি যে সব মানসিক রোগ পূর্বে দুশ্চিকিৎস্য বলে মনে করা হত, সে সব ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা-সম্মত চিকিৎসায় অনেক সময় সুফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম যুগে মানসিক পদ্ধতি-ব্যবহারে রোগ-আরোগ্যের একটি কাহিনী দিয়েছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্। "প্রথম মহাযুদ্ধে একটি ক্যানেডিয়ান্ সৈন্য স্মৃতিলোপ বিষম দুর্বলতা ইত্যাদি কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠানো হল, এবং তাকে ম্যাক্‌ডুগাল-এর চিকিৎসাধীনে রাখা হল। তার পূর্বজীবনের অনেক ঘটনা -সম্পর্কেই তার স্মৃতিলোপ ঘটেছিল, এমন কি, সে বিবাহিত কি না, তা-ও সে স্মরণ করতে পারত না—যদিও সে বলল তার পকেটে রক্ষিত একটি মেয়ের ফোটো তার স্ত্রীর। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ অনেকবার তাকে সম্মোহিত করে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলতে বললেন, কিন্তু দেখলেন তার অতীত জীবনকাহিনী স্মরণ -সম্পর্কে তীব্র কোন মানসিক বাধা ক্রিয়া করছে; বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কথাই স্মরণ করতে তার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল। বহুদিন চেষ্টার পর ম্যাকডুগ্যাল্ রোগীর এই মানসিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। মোহাবস্থায় রোগীর মুখ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, এবং তার পূর্বে তার পারিবারিক জীবনের দুঃখময় অশান্তির কথা জানা গেল। আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন তার পূর্বজীবনের স্মৃতি এই মোহাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল, এবং তা বলে ফেলে সে শান্তি পেল, তার অব্যবহিতকাল পরেই তার শারীরিক দুর্বলতাও দূর হয়ে সে সুস্থ হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে ডাইনামো-মিটার যন্ত্রে তার বল-পরিমাপক ক্ষমতা ৩০ কিলো ছাড়িয়ে যেত না, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে তা ৯০ কিলো চিহ্নের মাত্রা স্পর্শ করল।"[৪৩]

মানুষের সকল সুখশান্তির মূলে রয়েছে প্রজ্ঞা (wisdom)। প্রজ্ঞার মূল কথা হল আত্মশাসন ও পরের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে মিলন। তা তখনই সম্ভব হয়, যখন আমরা নিজেকে সত্য করে জানি, এবং পরের মনকেও যথার্থভাবে বুঝি। মনোবিদ্যা এই দুই বিষয়েই আমাদের প্রভূত সহায়তা করতে পারে।

---

৪৩ H. Crichton Miller – Ed. Functional Nerve Disease, p. 191

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন

(Motives)

আধুনিক মনোবিদের কাছে মানুষকে বুঝতে গেলে, তাকে চালাতে গেলে, তার বাহ্য ব্যবহারটাই (behaviour) জ্ঞাতব্য। তার মনটার চেহারা, তার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক আলোচনায় তাঁর উৎসাহ নেই। মানুষের প্রত্যক্ষণ শিক্ষণ প্রক্ষোভ কৌতূহল উদ্যম—এগুলি মানুষের ব্যবহার। এ দিয়েই মানুষের পরিচয়। পরস্পরের পার্থক্য এই ব্যবহারেই।

ব্যবহারের পশ্চাতে আগ্রহ

কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ব্যবহার, তার নানা ক্রিয়া উদ্যম এ সবের পিছনে চাড় (motivation) বা ধাক্কাটা (push or drive) কিসের থেকে? প্রাণীর ব্যবহারগুলি কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায়। একটা কুকুর হেঁসেলের দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। আমরা বলব ওর মতলবটা হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে খাদ্যসংগ্রহ।

ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে—
ওই সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
কী আছে দেখিই-না সব-তাতে এই তার লোভ।[১]

এখানে আমরা বলি ছেলেটার পেছনে আছে অদম্য কৌতূহল—'কী আছে দেখিই-না, সব-তাতে এই তার লোভ'। কৌতূহলই এখানে ছেলেটার কর্মের তাড়না।

মণিকা বহুক্ষণ ধরেই অঙ্গসজ্জায় ব্যস্ত—ঘরময় শাড়ী, জামা, অঙ্গবাস ছড়ানো, আর আয়নার কাছে স্তূপীকৃত অলঙ্করণ ও প্রসাধনের নানা সামগ্রী। কত পোশাক সে ছাড়ল, নতুন করে পরলে, আয়নার সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মুখখানা দেখল। তোমার কাছে ওর এই কর্ম নিতান্তই হাস্যকর বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশী তরুণীর কাছে আজ বিশেষ সংকটময় দিন—আজ ওর একটি বিশেষ মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়া চাই-ই চাই।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছেলেটা

শিক্ষা ও আগ্রহ

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হলেও ওদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। লেখাপড়া ওদের জীবনের কোন জরুরী বা দূরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, এ বিশ্বাস যতক্ষণ ওদের মনে সৃষ্টি করা না যাবে, ততক্ষণ পড়াশোনায় ওদের মন টেনে আনা যাবে না।

শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষককে বুঝতে হবে শিশুর প্রয়োজনগুলি (needs) কি, কিসে তার আগ্রহ। সেই আগ্রহকে অবলম্বন করেই শিক্ষাকর্মে তাকে প্রবৃত্ত করতে হবে।

শিক্ষকের পক্ষে এটা জানা বিষম দরকার। লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েরা কেন মন দেয় না—কি করেই বা তাদের মন পাওয়া যেতে পারে। হালে লেখা, জর্জ জি. টম্পসন তাঁর 'চাইল্ড্ সাইকোলজী'তে লিখছেন, "সেকেলে মাস্টার মশাই বা পিতামাতা যাকে বলেন 'অলস ছেলে' তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং যে সব ছেলে মস্তিষ্ক বা পেশীর ব্যবহারে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে তার নিম্নলিখিত কোন না কোন অসুবিধা ঘটছে যার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন : (১) দৈহিক শক্তির ক্ষীণতা যার কারণ হয়তো খাদ্যে পুষ্টির অভাব বা রসগ্রন্থির ক্ষরণের অপ্রাচুর্য, (২) মানসিক দ্বন্দ্ব—যার ফলে তার কোন বিষয়ে স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, (৩) আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব।

"যে ছেলের সামনে এমন কাজ এসেছে যার জন্যে তার মানসিক পরিণতি অযথেষ্ট, কাজেই কি করে কাজটা সুসম্পন্ন করতে হবে তা সে বুঝে উঠতে পারছে না, সে ছেলে কাজে স্বভাবতই উৎসাহ পাবে না, আর তা সম্পন্ন করবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না—তাতে তার গরজ থাকবে না—এটা বোঝা কঠিন নয়। গরজ-আগ্রহ যেখানে থাকে না, শেখাটা সেখানে নিতান্তই দায়সারা-গোছের হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষক বা পিতামাতা নানা ভাবে মাথা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন শিশুর বর্তমান আগ্রহ কিসে এবং তারপর চেষ্টা করেন শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চালনা করতে।"[২]

ম্যাক্গিয়োক্ (McGeoch) শিক্ষা ব্যাপারটাকেই এই আগ্রহ বা গরজের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে চেয়েছেন, তাই তিনি 'শেখা'র সংজ্ঞা দিচ্ছেন : "অভ্যাসের ফল হিসাবে কোন ক্রিয়ার পরিবর্তন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,

২ G. G. Thompson—Child Psychology, pp. 13-14

হয়তো বা সব ক্ষেত্রেই, এ পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।"[৩]

আগ্রহ ও আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়ক

গরজ বা আগ্রহ (motivation) একটা মানসিক ব্যাপার। এই আগ্রহ যে দ্রব্যকে অবলম্বন করে—অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্তে এ আগ্রহ—সেটা বাইরের জিনিস হতে পারে। সেটা 'আগ্রহ' নয়—সেটা আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়ক। আগ্রহকে ইংরেজীতে বলে motive আর আগ্রহের বস্তুকে বলি incentive। উড্ওয়ার্থ (Woodworth) বলেছেন, "আগ্রহটা হচ্ছে ব্যক্তির ভেতরে আর দ্রব্যটা হচ্ছে তার বাইরে। আগ্রহের বস্তু (incentive) হচ্ছে যা আগ্রহকে (motive) আকর্ষণ করে।"[৪]

আগ্রহ ও উদ্দীপক (stimulus) এক কথা নয়। উদ্দীপক অনেক সময় বাইরের, কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে মনের। তা ছাড়া উদ্দীপক যা বর্তমান মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীকে নাড়া দিচ্ছে (যেমন আলো এসে চোখে লাগল), কিন্তু আগ্রহটা বর্তমান মুহূর্তের ব্যাপার নয়। মনের:মধ্যে অনেক অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে ও সংশ্লিষ্ট হয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্তমান মুহূর্তে কোন দ্রব্য বা অবস্থাকে অবলম্বন করে আগ্রহ প্রকাশলাভ করতে পারে—যেমন নতুন ডিজাইনের পাড়ওয়ালা শাড়ীখানা দেখে তোমার কিনতে আগ্রহ হল। কিন্তু এই মুহূর্তের উত্তেজকই আগ্রহকে জন্ম দেয় নি। উদ্দীপক উপস্থিত হওয়ার আগেই আগ্রহের বীজ মনের মধ্যে ছিল। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রশংসালাভের প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের মধ্যে ছিল। বর্তমান উদ্দীপক তাকে প্রকাশ করেছে এই মাত্র।

আগ্রহ বা গরজ শারীরিক অর্থে একটা শক্তি (energy) নয়। 'ক্ষুধা' হচ্ছে খাদ্যের জন্য আগ্রহ, কিন্তু এটা বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তি নয়—বরঞ্চ, শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন যে, হয়েছে এ হচ্ছে তার পাগলা ঘণ্টা। ক্ষুধা এ তাড়া লাগায় যে দেহদেবতার যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ-সঞ্চারের প্রয়োজন হয়েছে। আগ্রহ হ'চ্ছে শক্তির দিগ্দর্শন যন্ত্র। এ শক্তির নিয়ামক।[৫]

আগ্রহ বা গরজ সব সময়েই সচেতন ইচ্ছাসম্ভূত নয়। বরং জীবজগতের

---

৩ McGeoch—The Psychology of Human Learning, p. 19

৪ Woodworth—Psychology, p. 363

৫ Woodworth—Psychology, p. 362

মস্ত অংশ অচেতন এবং প্রকৃতিদত্ত আগ্রহ -দ্বারা চালিত। এই আগ্রহগুলিকে সাধারণত সহজ প্রবৃত্তি বলা হয়। বর্তমান কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ইনস্‌টিংট্‌ এ নামের পরিবর্তে "আন্‌লার্নড মোটিভস্‌" বা "অশিক্ষিত আগ্রহ", "ইন্নেট্‌ মোটিভস্‌" বা "প্রকৃতিগত আগ্রহ" নাম-ব্যবহারের পক্ষপাতী। প্রকৃতি নিজেই জীবের মধ্যে এ অচেতন আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টিরক্ষা ও সৃষ্টিবিস্তারের প্রয়োজনে। প্রাণীজগতের এই আদিম আগ্রহকে বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী বলেন **"অ্যানিমাল ড্রাইভস্‌" (Animal drives)** বা জৈব তাড়না।[৬]

জৈব তাড়না—তাদের শ্রেণীবিভাগ

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এ তাড়নাগুলি বিদ্যমান, তাই এদের জন্মগত ও আদিম বলে মনে করা হয়।

এ তাড়নাগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে। উড্‌ওয়ার্থ এদের তিনটি প্রধান দলে ভাগ করবার পক্ষপাতী—নিরাপত্তা আনন্দ ও কর্তৃত্ব (Security, pleasure and achievement)।

প্রাণীজীবনের পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক শক্তি ও দ্রব্য আছে যা তার পক্ষে হানিকর, বিরক্তিকর, বিপজ্জনক। প্রাণীর সহজ আদিম প্রবৃত্তি হচ্ছে এসব দ্রব্য বা অবস্থাকে এড়িয়ে চলা। ছোট কুকুরছানা বা মানুষের বাচ্চা হঠাৎ তীব্র শব্দ শুন্‌লে চকিতে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়—সে নিরাপত্তা খোঁজে।

কিন্তু বেঁচে থাকা একটা নেতিবাচক প্রক্রিয়া নয়। তাই প্রাণী, যা বিরক্তিকর তাকে শুধু এড়ায় না, যা সুখকর তাকে সে খোঁজে। গরম মায়ের কোল শিশু খোঁজে—বেড়াল গরম লণ্ঠনের গা ঘেঁষে শোয়। এ হচ্ছে সুখ বা আনন্দের স্বাভাবিক তাড়না। শিশু মিষ্টি খাবার জন্য বায়না ধরে, লাল রং-এর ছবি চায়।

আবার এমন দ্রব্য বা অবস্থা আছে যা হানিকরও নয়, সুখকরও নয়। তাদের সম্পর্কে প্রাণীর ঔৎসুক্য আছে নেড়েচেড়ে দেখবার (exploration), তাদের জানবার (acquaintance), বাধা দূর করে তাদের আয়ত্ত করবার (mastery)। একেই বলা যেতে পারে কর্তৃত্ব (achievement)।[৭]

---

৬ J. S. Ross—Basic Psychology, p. 30

৭ Woodworth—Psychology, pp. 382-83

রস্ (J. S. Ross) আবার এ তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে : (১) আত্মরক্ষা-মূলক (Self motives) (২) বংশ- বা জাতিরক্ষা-মূলক (Race motives) ও (৩) দলরক্ষা-মূলক (Herd motives)। এ তাড়নাগুলি অবশ্যই পরস্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নয়।

জৈব-তাড়নার মধ্যে কোনটি মৌলিক ?

সব তাড়না সব প্রাণীর সমান প্রবল নয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে জাতিতে-জাতিতে প্রভেদ আছে। এবং একই প্রাণীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন তাড়না অধিক প্রবল নয়। তথাপি তাড়নাগুলির মধ্যেও আবার কোন্‌টি বেশী মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং কিছু পরীক্ষাও হয়েছে। সাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে। দুরকম খাঁচা-বাক্স দিয়ে এ পরীক্ষা করা হয়। প্রথম হচ্ছে একটা ঘুরন্ত খাঁচা (activity cage)—ইঁদুর যত অস্থির হয় ততই খাঁচাটা ঘোরে বেশী। কতবার ঘুরল তা বোঝবার জন্যে একটি ঘড়ির কাঁটা আছে। স্বাভাবিক সন্তুষ্ট অবস্থায় (যখন সে কোন তাড়নার বশবর্তী নয়) ইঁদুর কতটা নড়াচড়া করে তার গড়টা (average) আগে দেখা হয়। তারপর বিভিন্ন তাড়নার বশবর্তী হয়ে ইঁদুরটা কতবার নড়াচড়া করে তা দেখা হয়। এ কয়টি তাড়না নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে : (১) বাৎসল্য, (২) তৃষ্ণা, (৩) ক্ষুধা, (৪) সঙ্গমেচ্ছা, (৫) খুঁটে খুঁটে দেখা, বা নড়েচড়ে বেড়ানো (exploratory drive)। যে ইঁদুরের সদ্য বাচ্চা হয়েছে তাকে বাচ্চার থেকে বারে বারে সরিয়ে দেখা হয়, কতবার সে বাচ্চার কাছে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়। তেমনি তৃষ্ণার্ত ইঁদুরকে অল্প একটু জল খেতে দিয়ে সরিয়ে এনে দেখা হয় কতবার সে জলের নিকটবর্তী হবার জন্যে অস্থির হয়। ক্ষুধা ও সঙ্গমেচ্ছায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য ঠিক তেমনি করেই মাপা হয়। যে তাড়নায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য যত বেশী, সে তাড়না তার পক্ষে তত প্রবল এ কথা মনে করা হয়।

আবার অন্য রকম পরীক্ষা হচ্ছে একটা তিন কোঠাওয়ালা বাক্স দিয়ে (obstruction box)। প্রথম কোঠায় তাড়নাপীড়িত ইঁদুরকে রাখা হয়; দ্বিতীয় কোঠাটি খালি কিন্তু তার নিচে সূক্ষ্ম খোলা বৈদ্যুতিক তার আছে যাতে এ কোঠা পার হতে ইঁদুরকে মৃদু বৈদ্যুতিক 'শক্' খেতে হয়; তৃতীয় কোঠাতে আছে ইঁদুরের ঈপ্সিত দ্রব্য (তার ছানা, জল বা খাদ্য, সঙ্গমেচ্ছু অন্য ইঁদুর, বা কাঠ, ন্যাকড়া, করাতের গুঁড়া ইত্যাদি)। ঈপ্সিত দ্রব্যকে পেতে

গেলে তার 'শক্' খেতে হয়। তাড়না কতটা প্রবল তা মাপা যায় এ 'শক্' সত্ত্বেও ইঁদুর কতবার ঈপ্সিত দ্রব্যের সম্মুখীন হয় তা দিয়ে। সি. জে. ওয়ার্ডেন এ পরীক্ষাগুলি থেকে এ ফল পেয়েছেন (সময় কুড়ি মিনিট) :[৮]

তাড়না	ইঁদুর কতবার দ্বিতীয় কোঠা পার হল
বাৎসল্য	২২·৪
তৃষ্ণা	২০·৪
ক্ষুধা	১৮·২
সঙ্গমেচ্ছা	১৩·৮
নড়াচড়া করা	৬·০
কোন তাড়না না থাকলে	৩·৫

এ দুটি পরীক্ষারই সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইঁদুরের পক্ষে বাৎসল্য সর্বাপেক্ষা প্রব তাড়না। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফল কিন্তু এক নয়। ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে জীবনের মৌলিক তাড়না হচ্ছে 'কাম' (Sex)। ওয়ার্ডেন্-এর পরীক্ষার ফ ফ্রএড্-এর মতের প্রতিকূল।

আদিম তাড়নাগুলির সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীদের মধ্য দিয়ে তার অভিপ্রা পূর্ণ করে নিচ্ছে। এ তাড়না না থাকলে সৃষ্টি অচল হত।

এই তাড়না, আগ্রহ বা চাড় যাদের বলা হল তারা প্রাণীর জীবনে গভীর কোন প্রয়োজন মেটায়। এ তাড়নাগুলি অনেক সময় বাইরে উদ্দীপক থেকে এসেছে, আবার নিম্নতর প্রাণীর পক্ষে বিশেষত অধিকাং ক্ষেত্রে এদের মূল আছে তারই অন্তরে। মানুষের পক্ষে এ তাড়নাগুলি অনেক ক্ষেত্রে সচেতন ইচ্ছা-সঞ্জাত (conscious motives), কিন্তু নিম্নত প্রাণীদের বেলায় এগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতার অভাব। বাহ্যই হো আর আন্তরিকই হোক্, সচেতনই হোক্ আর অচেতনই হোক্ যা কাজে প্রবৃত্ত করায় তাকে মনোবিজ্ঞানীরা তাড়নার অঙ্কুশ বা motive কি driv বলেন।[৯]

---

[৮] C. J. Warden—Animal Motivation, p. 64

[৯] The term motive in ordinary usage suggests a conscious purpos whereas the psychologist includes under this term all basic tendencies t action, or 'drives', whether we are conscious of them or not. He includ in it everything that drives towards action. Murphy—A Briefer Genera Psychology, p. 54

পশুর জীবনের প্রধান মৌলিক প্রয়োজনগুলি (basic needs) কি তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এবার এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে হবে—মানুষের জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলি কি? মানুষও তো প্রাণী, কাজেই অন্যান্য নিম্নপ্রাণীর মতো মৌল প্রয়োজন—যেমন ক্ষুধার তৃপ্তি, আত্মরক্ষা, যৌনকামনার তৃপ্তি,—তারও অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষ পশু অপেক্ষা উন্নততর—'সভ্য' প্রাণী। আর সভ্য বলেই তার জীবনে এমন কতকগুলি প্রয়োজন আছে যা পশুর মধ্যে নেই। অলপোর্ট (Allport) বলেন, কর্মের তাড়নাগুলি জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রমবিকাশের ধারায় জীবনের ক্রমশ অধিক জটিলতার সঙ্গে তাড়নাগুলিরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান প্রেরণাগুলি জন্মগত হলেও মানুষের অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার ফলে তারা পরিবর্তনীয়। তাড়না ও আগ্রহগুলি নানা প্রকারের, এরা প্রত্যেকেই যেন স্বপ্রধান এবং এরা বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিপোষক। যদিও অতীত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া থেকেই এদের জন্ম, তথাপি এদের ক্রিয়াশীলতা অতীতের বন্ধনমুক্ত হতে পারে।[১০]

মানুষের মৌল প্রয়োজন

মানুষের মৌল প্রয়োজন কি কি, তা নিয়ে মতভেদ আছে এবং এদের শ্রেণীবিভাগও নানা জনে নানাভাবে করেছেন। মারে (Murray) মানুষের জীবনের এই মূল চাহিদাগুলির এক বিরাট তালিকা দিয়েছেন সে তালিকা ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর সহজ প্রবৃত্তির (instinct) তালিকার চেয়ে ঢের বড়।[১১] ডাবলিউ. আই. টমাস্ একটি রিপোর্টে মানুষের চারটি মূল চাহিদার (fundamental needs) কথা বলছেন—

(১) নতুন অভিজ্ঞতা ও বিপজ্জনক কার্যের প্রতি আগ্রহ

(২) নিরাপত্তার জন্যে আগ্রহ

(৩) সক্রিয় সহযোগিতার আগ্রহ

(৪) অন্যের দ্বারা নিজমূল্য-স্বীকৃতির জন্য আগ্রহ।[১২]

---

১০ Allport—Attitudes, Handbook of Social Psychology (Ed. C. Murchison), p. 20

১১ H. A. Murray—Explorations in Personality, p. 43

১২ W. I. Thomas—The Unadjusted Girl, p. 9

জন্মগত আগ্রহ ও অর্জিত আগ্রহ

সাধারণভাবে মানুষের সমস্ত মূল প্রয়োজন (needs) এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত আগ্রহকে (motives) দুইটি দলে ভাগ করা যায়—(১) **আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত ও জন্মগত (unlearned or innate motives)** প্রবৃত্তি, আগ্রহ বা চাড়। এগুলি শিক্ষাসাপেক্ষ নয়। যেমন, ক্ষুধা তৃষ্ণা সঙ্গম ইত্যাদি। আবার (২) **অর্জিত আগ্রহ (learned motives)**—এগুলি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল—যেমন অন্যের প্রশংসার জন্যে আগ্রহ ইত্যাদি। আবার অন্যভাবে এই প্রয়োজন ও আগ্রহগুলিকে (১) দৈহিক প্রবৃত্তি (Physiological drive or Organic needs), (২) সামাজিক প্রবৃত্তি (Social motives), (৩) ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি (Personal motives) এবং (৪) অচেতন প্রবৃত্তি (Unconscious Motives)—এই ক'দলেও ভাগ করা হয়েছে।

দৈহিক প্রবৃত্তি (Organic needs)

পশুর জীবনের সমস্ত আগ্রহই তার দৈহিক। প্রয়োজনের দ্বারা নির্দিষ্ট বহুক্ষেত্রেই এই আগ্রহগুলি অচেতন। এই তাড়নাগুলি অন্ধ প্রকৃতির দান। পশু এই আকাঙ্ক্ষাগুলি স্থূলভাবে, সোজাসুজিভাবে, নির্লজ্জ ভাবেই তৃপ্তির জন্যে চেষ্টিত হয়। কিন্তু মানুষ অনেক জটিল প্রাণী। সে সামাজিক জীব। সুতরাং তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘোরালো পথে—তার পরিতৃপ্তির পথে বহু লজ্জা আবরণ গোপনতা আছে। সামাজিক রীতিনীতি, অভ্যাস ও শিক্ষা তার প্রয়োজন ও আগ্রহকে এমন ভাবে পরিবর্তিত করে যে তাদের আদিম স্থূলরূপ আর প্রায় চেনাই যায় না। এরই নাম সভ্যতা শিষ্টতা ভদ্রতা। ভদ্র মানুষ কাঁটা-চামচ দিয়ে চেয়ার টেবিলে বসে, সুপক্ব, সুপরিবেশিত খাদ্য শিষ্ট রুচিসঙ্গত উপায়ে গ্রহণ করে। পশুর মতো ক্ষিধে পেলেই কাড়াকাড়ি করে কাঁচা মাংস খায় না। সুতরাং মানুষের ক্রিয়ার পশ্চাতের চাড় বা আগ্রহের অনেকগুলিই হচ্ছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত। তাদের মূল দৈহিক ও অচেতন আগ্রহ হলেও তাদের প্রকাশ অনেক মার্জিত।[১৩]

[১৩] Initially our motivation is like that of other organisms and it has the physico-chemical foundations. We share with them such physiological needs as hunger, thrist, sex. We are aroused as much as they are when such needs ar'se and are not satisfied. Like them we are driven to activity.

দৈহিক প্রয়োজনগত তাড়না বা আগ্রহ (Biological drives) প্রাণী মাত্রকেই দেহরক্ষা করতে হলে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে, জলপান করতে হবে, মলমূত্রাদি দেহমধ্যস্থ আবর্জনা ত্যাগ করতে হবে। জীবকে বাঁচতে হলে, যা জীবদের পক্ষে বিশেষ হানিকর তা থেকে দূরে থাকতে হবে। আবার বংশরক্ষার জন্যে এবং সম্ভবত বয়স্ক জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতার জন্যে প্রয়োজন যৌন-সঙ্গম। শ্রান্ত হলে বিশ্রাম চাই, নির্দিষ্ট সময়ে এ জন্যে নিদ্রা চাই। দেহের সুস্থ বিকাশের জন্যে নির্মল বায়ু না হলে চলে না। আবার প্রাণী মাত্রের পক্ষেই কিছুটা অঙ্গ-সঞ্চালন, গমনাগমন অবশ্য প্রয়োজন। এগুলিকেই বলা হয়ে থাকে দৈহিক প্রয়োজনগত তাড়না (biological drives)।[১৪] এই প্রয়োজন যেখানে সহজভাবে মেটে না, সেখানেই প্রাণীর অশান্তি (tension) সৃষ্টি হয় আর স্বাভাবিক ভাবে এ প্রয়োজনগুলি মিটলে এই তাড়নাগুলি সেই কালের জন্য শ্রান্ত হয় (drive-reduction)। এ সম্বন্ধে একটি ধারণা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়ারই সমতায় পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। সুস্থ জীবনের জন্যে দেহের প্রত্যেক কোষের

There is, however, an important difference between animal and human expressions of such needs. Animals satisfy them more directly. When hungry, they seek food where they have learned to find it. At appropriate seasons, they seek mates. When excretory needs arise, they satisfy them immediately. When animals are friustrated by others, they fight, sometimes killing their opponents. Men on the other hand, satisfy their needs indirectly and in ways decreed only in part by nature and the immedtate situation. They behave as men do; this is because much of human motivation, even though it stems from the so called "animal needs" is influenced by human mores—by customs, traditions, or man-made laws. Munn—Psychology, p. 82

১৪ The following are some of the most important and basic biological drives:

- (i) The hunger drive.
- (ii) The thirst drive.
- (iii) The sex drive.
- (iv) The need for oxygen or the air-hunger.
- (v) The need for rest and sleep.
- (vi) The need to avoid or seek relief from pain.
- (vii) The need for activity.
- (viii) The elimination needs.

Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 90

মধ্যে এই স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকে। তাই অশান্তিকর কোন উত্তেজনা ঘটলেই তা উপশমের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই আর একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। একেই বলা হয় homeostasis।[১৫]

দৈহিক তাড়না ও আগ্রহ

কখনো কখনো দৈহিক তাড়না (drives) এবং আগ্রহ বা চাড় (motive) এর মধ্যে প্রভেদ করা হয়। মৌলিক দৈহিক তাড়না (drives) থেকে যে ক্রিয়ার উৎপত্তি সেগুলি অন্ধ, সেগুলি 'দেহের অভ্যন্তর থেকে তাড়া লাগায়', কিন্তু পথ দেখায় না। কিন্তু যাদের বলা হল আগ্রহ বা চাড় (motive) তারা একটা নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়াকে পরিচালনা করে।[১৬]

ক্ষুধা—খাদ্যগ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে পাকস্থলীর আবরণে যে আক্ষেপ বা সঙ্কোচনের ক্রিয়া দেখা দেয় তাকেই বলে ক্ষুধা। এ ক্ষুধার তাড়না উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ণবয়স্ক প্রাণী বা মানুষ তখন নির্দিষ্ট উপায়ে নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্য-অন্বেষণ করে। পূর্বের শিক্ষার দ্বারা প্রাণী জানে কোথায় খাদ্য মিলবে।

নিম্নপ্রাণীর মধ্যে এই ক্রিয়ার পরিধি সংকীর্ণ। এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি-রূপ প্রতিক্রিয়ার গঠনটা (the pattern of re-action) অনেকটা একই ধরনের (stereotyped)। কিন্তু মানুষের মধ্যে খাদ্য-অন্বেষণ ক্রিয়ার সঙ্গে নানা বস্তু ও অবস্থা, অভিজ্ঞতার সূত্রে যুক্ত হয়ে যায়। এমন কি, এ-ও সম্ভব যে, খাদ্যবস্তু-গ্রহণ বা -দর্শনের সঙ্গে সেই ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। অশোক সারাদিন চাকুরিতে খেটেখুটে এসে রাত্রিতে A. M. I. E. পরীক্ষার জন্যে পড়তে যায়। এটাও ক্ষুধার তাড়না থেকেই সঞ্জাত, কিন্তু ভদ্র, অর্জিত, 'মানবিক' প্রতিক্রিয়া।

---

১৫ The living being is an agency of such sort that each disturbing influence induces by itself the calling forth of compensatory activity to neutralise or repair the disturbance. Frederiqs—Quoted by Cannon, The Wisdom of the Body, p. 21.

See also "Homeostasis" in S. S. Stevens' Handbook of Experimental Psychology.

১৬ Activity aroused by physiological drives, as such, hunger, thirst etc. may be blind, whereas activity aroused by motives has direction. Thus drives provide only "push from within", whereas motives involve a "push in some relevant direction". Munn—Psychology, p. 84

কাম—তৃষ্ণা ও সঙ্গম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাণীর পূর্ণ পরিণতি ঘটলে তার যৌনগ্রন্থিগুলি পরিপুষ্ট ও সক্রিয় হয়, রক্তের মধ্যে হর্মোন্ নামে উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ করে। এই উত্তেজক পদার্থগুলি প্রাণী-দেহের গৌণ যৌনভিত্তিক পরিবর্তনগুলির (পুরুষের বেলায় লিঙ্গমূলে রোমোদ্‌গম এবং নারীর বেলায় স্তনোন্নয়ন ইত্যাদি) জন্মেই শুধু দায়ী নয়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের জন্মেও দায়ী। নিম্ন প্রাণীদের বেলায় কামের তাড়নাজনিত ক্রিয়ার রূপ মোটেই জটিল নয়, তা একান্তই নগ্ন। কিন্তু মানুষের বেলায় এই কামক্রিয়ার প্রকাশ-শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, শিষ্টতা, রুচি-দ্বারা মার্জিত এবং সাহিত্য শিল্পের মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষারই শোভন প্রকাশ। মানুষের মধ্যে এই তাড়না **উদ্গতির** (sublimation) ফলে ভদ্র ও সভ্য আকার নিয়েছে।[১৭]

সামাজিক আগ্রহ (Social motives)

মানুষের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে যে সমাজবদ্ধ জীব। প্রাণীদেরও সম্ভবত সমাজ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এত দৃঢ় নয়। কিন্তু মানুষের ব্যবহারের অনেকখানি তার সামাজিক সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়, অন্য মানুষের স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি চায়; অন্য মানুষের দুঃখে সে কাতর হয়। আবার বিপরীত ভাবে, মানুষ অন্য মানুষকে অবিশ্বাস করে, নানা কারণে অন্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়। মানুষের অন্য একটি বিশেষত্ব হচ্ছে অন্যের ওপর প্রভাববিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের চেয়ে বড় হবার ইচ্ছা।

মানুষের এই বিশেষত্বের জন্মেই তার কতকগুলি প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া-প্রবণতা দেখতে পাই। এগুলি মানুষের সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাবার উপায়। এদের মধ্যে প্রধান ক'টি আগ্রহ বা ক্রিয়াপ্রবণতা হচ্ছে:

(ক) **যূথবদ্ধতা (gregariousness)**—সঙ্গ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অনেক সময় আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সহকর্মীদের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে আমরা 'বনে পালিয়ে যেতে চাই'। কিন্তু এ বিরাগ সময়িক। ছুটির দিনে সব ছেড়ে-ছুড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ি। তখনো সঙ্গে নিই বই, পত্রিকা, ট্র্যানজিস্টার

[১৭] Cannon—Hunger & Thirst, Foundations of Psychology

Also Harvey—The Scientific Study of Human Sexual Behaviour, J. Soc. Psychol., 1923, 3,pp. 161-188

রেডিও—এরাও তো সমাজজীবনেরই প্রতিনিধি! আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠান খেলাধুলা সিনেমা-থিয়েটার এই গভীর সামাজিক প্রয়োজনই মেটায়। রাজনৈতিক দলাদলি, ব্যবসায়গত প্রতিযোগিতা, টেস্ট ম্যাচ, অলিম্পিক গেমস্—এই সামাজিক প্রয়োজনের আরেক দিক। এগুলির অভাবে জীবন বিস্বাদ মনে হয়।

মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা, শিষ্টতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মীয় বিশ্বাস—এ গুলির মূল আছে সমাজজীবনে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বিশিষ্ট অভ্যাস (বাঙালীর মাছ-ভাত, পাঞ্জাবীর রুটি-মাংস, মাদ্রাজীর ধোসা, বিহারীর ছাতু-দহি-বড়া), পোশাকের 'ফ্যাশান্' আমাদের সমাজজীবনেরই ফল। প্রত্যেকেই আমরা সাধারণত নিজ নিজ সমাজের রীতিনীতি মেনে নিই। **আমরা সবাই চাই সমাজের একজন একটি দল কর্তৃক আদৃত হতে।** নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যেও যূথবদ্ধতা দেখা যায়, কিন্তু তার প্রকাশ স্থূল ও বৈচিত্র্য-হীন। নিতান্ত বাঁচবার প্রয়োজনেই পশুপাখী দল বেঁধে থাকে। এমনি করে দল বেঁধে থেকে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। খাদ্যসংগ্রহের জন্যও এই দল বেঁধে বিচরণ প্রয়োজন। আদিম অসভ্য মানুষও একই কারণে ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করত। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে এই যূথচরতা তার উন্নত সমাজবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিচিত্র ও সংস্কৃত রূপ নিয়েছে। নিতান্ত জীবনরক্ষার জন্যে আজ আর মানুষের দল বেঁধে থাকবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিকাশের জন্য এই যূথচরতার পূর্বোল্লিখিত নানা রূপ মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক। খাওয়া-পরার স্থূল প্রয়োজনের চেয়েও এই সামাজিক প্রয়োজনের তৃপ্তি সভ্য মানুষের কাছে বেশী মূল্যবান।

(খ) অন্যের ওপর প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা—একদিকে যেমন আমরা সমাজের অন্য দশজনের মতো হতে চাই, একটা দলের দ্বারা গৃহীত হতে চাই (to be accepted by a group), **অন্যদিকে আমরা অন্য দশজনের চেয়ে বড়ও হতে চাই।** কোন না কোন ক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারলে তবেই আমাদের 'অহং'বোধ তৃপ্তিলাভ করে। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ বাইরের কোন বস্তু সম্পর্কেও হতে পারে, আবার অন্য প্রাণী বা মানুষের সম্পর্কেও হতে পারে। আমরা যখন ফুটবল খেলি, ভারোত্তোলন করি, মোটর বা এরোপ্লেন চালাই, তখন যে গভীর তৃপ্তিবোধ করি, তার মধ্যে আছে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব-

বোধের আকাঙ্ক্ষার তোষণ। মেয়েরা বড় অ্যাল্‌সেসিয়ান পোষে, সেখানেও ওই একই প্রভুত্ববোধের পরিতৃপ্তি। অক্ষম শিশুর এই প্রভুত্ব-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার এক উপায় হচ্ছে মেজাজমর্জি করা (Temper-tantrums)। এ দিয়ে সে তার নিজের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। মেজাজমর্জি করলে, অবাধ্যতা করলে, বড়রা বিব্রত হয়, এ দিয়ে তার মতলব হাসিল হয়—কাজেই তার অবচেতনায় সে খুশী হয়ে ভাবে আমি সামান্য নই—ফেল্‌না নই।

এই প্রবৃত্তিরই আরেকটা দিক হচ্ছে জিনিষের ওপর মালিকানা-বোধ (the acquisitive motive)। বাড়ী ঘর সম্পত্তি আয়ত্ত করেছি নিজ পরিশ্রমে, নিজ বুদ্ধির জোরে। ওগুলির ওপর আমার বিশেষ দাবি আছে, ওদের ওপর 'প্রভুত্ব-বোধ' স্বাভাবিক।

শিশুর প্রভুত্ব-বোধের তাৎপর্য

শিশুর জীবনেও এই সামাজিক প্রয়োজনের মূল্য সামান্য নয়। প্রত্যেক শিশুই কিছু না কিছু খেলনা, ফুল, পাথরের নুড়ি, রঙীন কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে ভালবাসে। এই সংগ্রহের ক্রিয়ায় তার জীবনের একটি গভীর প্রয়োজন মেটে। এতে ঘটে অহং-এর স্বাভাবিক এবং প্রীতিপ্রদ বিস্তার। "'আমার ঘুড়ি', 'আমার মার্বেল', 'আমার খেলনা—তোমরা কেউ তা ধরবে না।" শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে সব শিশুর বাল্যকালে তাদের সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের পুতুল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের ছেঁড়া রঙ্গীন কাগজের টুকরো, আধখানা-খাওয়া পেয়ারা, পাখীর পালকের 'মূল্যবান্' সংগ্রহ ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, 'অহং'-এর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়েছে তারাই হয়তো বড় হয়ে অকারণে চুরি করে। অন্যের ওপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করে। এপ্রকার নানা রকম মানসিক বিকৃতি ও অবাধ্যতা (delinquency) তাদের মধ্যে দেখা দেয়।[১৮] রাশিয়াতে শিশুদের এ ভাবে 'অবহেলা' করা হয় না। সেখানে প্রত্যেক পাড়ায় তো বটেই প্রত্যেক বাড়ীতেও একটি কোণ থাকবে যা নিজস্ব করে শিশুদের আপনার—সেখানে সে যা খুশী সংগ্রহ করতে পারে, যা খুশী তৈরি করতে পারে ; সেই নিজের কোণটিতে সে প্রভু। পিতামাতা শুধু তাদের শেখান, যাতে ঘরবাড়ী তারা নোংরা না করে, জিনিস নষ্ট না করে।

১৮ এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের 'অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রতিযোগিতায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার আকাঙ্ক্ষায়ই ব্যক্তি ও জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। কর্মের তাড়না হিসাবে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্কুশ। মানুষের মনে "আমি হার মানব না"—তাই সে বড় হয়। অবশ্যই এই প্রবৃত্তি উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে তার স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করলে কু-অভ্যাসে পরিণত হয়। এই প্রবৃত্তির বিকারেই সৃষ্টি হয় কৃপণের, চোরা মজুতদারের (hoarders)। সমস্ত প্রবৃত্তি বা আগ্রহের সম্পর্কেই এ কথা সত্য যে তাদের স্বাভাবিক পরিমিত তৃপ্তির পথ না থাকলে ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তেমনি এ কথাও আবার সত্য এই প্রবৃত্তিগুলি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হলে তাদের ফল অশুভ ও নিন্দনীয়। এখানেই তো শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষক ও পিতামাতার মস্ত দায়িত্ব।[১৯]

কৌতূহল—সর্বদেশে সর্বকালে **বাড়ন্ত শিশুর একটি প্রধান প্রবৃত্তি হচ্ছে কৌতূহল**। সে কেবলই জানতে চায়, প্রশ্ন করে কি? কে? কোথায়? কেন? কবে? এই কৌতূহলবশত সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে, নানাভাবে পরীক্ষা করে। বইয়ের পাতা ছেঁড়ে, দোয়াত উল্টে ফেলে, কলমের নিব ভাঙ্গে, মেঝেতে গর্ত করে, উপরে ছুঁড়ে মারে, বাড়ী ছেড়ে বনের রহস্যময় পথে পা বাড়ায়। পশুর মধ্যেও এ প্রবৃত্তির প্রকাশ চঞ্চল হয়ে ঘোরাঘুরি -রূপ (exploratory moves) ক্রিয়ার। এই প্রবৃত্তি শিক্ষাক্রিয়ায় সব চেয়ে মূল্যবান হাতিয়ার। এই প্রবৃত্তির যতক্ষণ তৃপ্তি হয় ততক্ষণই শিক্ষাক্রিয়া শিশু কাছে প্রীতিপদ। যেখানে শিশুর কৌতূহল জাগ্রত হয় না সেখানে শেখাটা হয় বিরক্তিকর তাড়না। শিক্ষকের কাছে এ হচ্ছে তার কাজের সহায়ক শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এ হাতিয়ার সফল ভাবে ব্যবহার করতে পারার মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব। শিশুর কৌতূহলকে শিক্ষার দিক থেকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে পারলেই শিক্ষা সফল হয়।

নিরাপত্তা-বোধ—শিশুর জীবনে এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রকৃতিই মার প্রাণে স্নেহ দিয়েছেন—শিশুকে বুকে জড়িয়ে সব বিপদ থেকে রক্ষা করার আন্তরিক আগ্রহ দিয়েছেন। এই মাতৃস্নেহ না থাকলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত। অসহায় শাবক পিতামাতা (বিশেষ করে মাতার) স্নেহ -দ্বারাই শৈশবে রক্ষিত হয়। পাখী পশু নিম্নশ্রেণীর সমস্ত প্রাণীর বেলায়ই শাবকের শৈশব

১৯ Makarenko—Letters to the Parents

কাল অল্পদিনের। শীগগীরই তারা বেড়ে উঠে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। মাতাপিতা তখন তাদের ছেড়ে দেয় স্বাধীন জীবনযাপন করবার জন্যে। এর ফলে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে না। তাই পশুদের সত্যিকারের সমাজ নেই। কিন্তু মনুষ্যশিশু বহুদিন যাবৎ পিতামাতা আত্মীয়জনের স্নেহ-ভালবাসার ওপর নির্ভর করে। যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে নিজের ভার নিজে নিতে পারে না। সেই **জন্যই মানবশিশুর জীবনে নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন সর্বাধিক**। পিতামাতার দ্বারা সে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষিত হবে, তার সমস্ত জৈব প্রয়োজন তাঁরাই মেটাবেন, এ কথা প্রত্যেক শিশু বিনা বিচারে বিশ্বাস করে। অবশ্যই শৈশবে এই বিশ্বাস সচেতন বিচার-সাপেক্ষ নয়। কিন্তু শিশুর অবচেতন মনে এই দাবি অত্যন্ত প্রবল। তাই বাবা-মা অনাদর করলে শিশুর এত অভিমান, তিরস্কার করলে সে ভাবে, পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয় সে হারাল বুঝি! এমন কি বড় হয়েও এই নিরাপত্তাবোধের জন্য দাবি মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন। অবশ্য তখন এই মৌলপ্রবৃত্তির রূপ পরিবর্তিত হয়। আমরা সবাই আত্মীয় বন্ধু স্বজন প্রতিবেশীর প্রীতি ও প্রশংসা চাই। তা না পেলে অস্বস্তি বোধ করি, অ-নিরাপদ বোধ করি। তাই বিদেশে গিয়ে স্বস্তি হয় না। আশেপাশে সবাইর সঙ্গে যতক্ষণ আন্তরিকভাবে মিশতে না পারা যায়, ততক্ষণই অহং সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয়। বর্তমানে সব দেশেই রাজনৈতিক সংখ্যালঘুরা কম বেশী অ-নিরাপদ বোধ করে। তেমনি আধুনিক যুগের মানুষের মস্ত একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে জীবিকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধ যেখানে বিঘ্নিত সেখানেই মানুষের সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশ বিঘ্নিত হয়।[২০] মানুষের এই প্রয়োজন যেখানে সন্তোষজনক ভাবে মেটে না, সেখানেই নানা শারীরিক বৈকল্য ও মানসিক বিকারের আশঙ্কা থাকে। বর্তমান সভ্য জগতে মানসিক বিকার এবং পেপ্‌টিক আল্‌সার্‌

২০ An individual needs to feel secure economically and emotionally, to feel secure in the affection of another or believe that he is in favour with his parents, relatives, neighbours, teachers, class fellows and associates—he has a desire to belong to somebody, he has need to be secure against the loss of status, friends, loved ones, property, misfortune and income. A feeling of insecurity which follows the non-satisfaction of this motive may lead to a variety of emotional disturbances and maladjustments. Fleming—Social Psychology, p. 24

জাতীয় আন্ত্রিক ব্যাধি যে বেড়ে চলেছে, তার প্রধান কারণ, আমাদের প্রাচীন সমাজের নিবিড় গঠন ও পারস্পরিক স্নেহপ্রীতি সহানুভূতির দ্বারা নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা ছিল তা ভেঙ্গে পড়েছে। এখন এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সভ্যতায় প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গে নির্মম প্রতিযোগিতায় রত—প্রত্যেকে নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় উদ্বিগ্ন। চিন্তাশীল মানুষেরা তাই এই প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক যে সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তির দ্বারা ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত, এই জটিল নির্মম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সরল সহজ প্রীতি সহানুভূতিপূর্ণ সমবেত গ্রাম্য জীবনে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।[২১]

ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা আগ্রহ (Personal motives)

দৈহিক প্রবৃত্তি বা তাড়না সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই প্রবল। কিন্তু প্রবৃত্তিগুলির প্রাবল্য এবং প্রকাশ সব প্রাণীতে সমান নয়। এমন কি একই শ্রেণীর প্রাণীর ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। সেই রকম সামাজিক প্রবৃত্তি বা আগ্রহ সব মানুষের মধ্যেই বর্তমান, কিন্তু এ বিষয়েও মানুষে-মানুষে প্রচুর প্রভেদ। কিন্তু এই প্রভেদ সত্ত্বেও দৈহিক বা সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি সার্বজনীন—তারা সর্বজীবের প্রয়োজন (universal needs)।

ব্যক্তিগত আগ্রহ বা প্রবৃত্তি (personal motives) যাদের বলা হয়, তারা **বিশেষভাবেই ব্যক্তিগত**। অবশ্যই তারা দৈহিক বা সামাজিক প্রবৃত্তি -রূপ সামান্য প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তারা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই নির্দিষ্ট। কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি কোন একভাবে ক্রিয়া করবার জন্যে ঐ বিশেষ আগ্রহের চাড় অনুভব করে, অন্যেরা আবার অন্যদিকে বেড়ে ওঠবার আগ্রহ বোধ করে।[২২] একটি ছেলের জীবনের উদ্দেশ্য হল সে ডাক্তার হবে। সেই ছেলে ঐ ভাবেই ভাবিত এবং এই ভাবনা তাকে এক বিশেষ ধরনের পড়াশুনা বা ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করায়। আর এক ছেলের ঝোঁক হল সে বিখ্যাত বৈমানিক হবে—কাজেই তার সমস্ত আগ্রহ চিন্তা কর্ম ঐ একটি বিশেষ দিকে তাকে চালিত করে। কাজেই ঐ জাতীয় আগ্রহ বা প্রবৃত্তিকে ব্যক্তিগত আগ্রহ বলা হয়। প্রত্যেক মানুষের পৃথক

---

২১ Vide Russell—The World as it could be made. Also Gandhi—Socialism of My Conception, Chs. LXX, CXIX etc.

২২ Munn—The Motivation of Behaviour, Psychology, p. 103.

পৃথক জীবনের আদর্শ (life goals) ও জীবিকা -বিষয়ে রুচি (vocational aims) আছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমান উঁচু নয়। কেউ হয়তো মাসে দু'শ টাকা পেলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু অন্য মানুষ আছে, যার কাছে মাসে পাঁচ হাজার টাকাও 'ভদ্রভাবে বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্তর (level of aspiration) অনেক বেশী উঁচু। যে স্বল্প-সন্তুষ্ট, সে অর্থোপার্জনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে না, কিন্তু যার আছে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে দৃঢ়পণ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে যাবে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, জীবনে সাফল্য-অর্জন করতে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। কিন্তু একথাও সত্য যে আমাদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যতটা প্রত্যাশা করি, ততটা সাফল্য-অর্জন করতে পারি না। যেখানে বারে বারে আমাদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় সেখানে প্রায়ই আসে গভীর নিরাশা।[২৩]

অভ্যাসের শক্তি—আমরা কোন কাজ বারে বারে করলে, সে কাজ আমাদের কাছে সহজসাধ্য হয়ে যায়। একেই বলা হয় অভ্যাসগঠন। এতে চিন্তা ও পরিশ্রম বাঁচে। কাজেই জীবনে সু-অভ্যাস-গঠনের যথেষ্ট মূল্য আছে। উইলিয়ম্ জেমস-এর মতে সুশিক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হচ্ছে শিশুর-সুঅভ্যাস গঠন।

অভ্যাস আমাদের খাদ্য পোশাক জীবিকা আনন্দ রুচি দৃষ্টিভঙ্গি এককথায়—আমাদের ব্যবহার (behaviour) গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অভ্যাসের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য যথেষ্ট, কারণ অভ্যাস হচ্ছে আমাদের কর্ম ও ব্যবহারের একটি শক্তিশালী নিয়ামক। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের কাছেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সু-অভ্যাস-গঠন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সু-অভ্যাস যেমন সুশিক্ষা ও সুস্থ জীবনের সহায়ক কু-অভ্যাস তেমনি মস্ত বাধা।

রুচি দৃষ্টিভঙ্গী ভাব ইত্যাদি অর্জিত আগ্রহ

(Interests, Attitudes & Sentiments)

জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটায় যে প্রবৃত্তিগুলি, সেগুলি মানুষের মধ্যেও আছে এবং তাদের মূল্য -সম্বন্ধেও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমরা পূর্বেও বলেছি মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে জন্মগত দৈহিক প্রবৃত্তির চেয়ে

[২৩] Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 99

বেশী মূল্যবান, তার অর্জিত আগ্রহগুলি। কোন কোন মনোবিদ্ মানুষের অর্জিত আগ্রহগুলিকে একটি বা অল্প কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তি থেকে অনুস্যূত করে পেতে চেয়েছেন। ফ্রএড্ বলেছেন জীবনের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে আছে—কাম। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ চৌদ্দটি আদিম প্রবৃত্তি (instincts) থেকে সমস্ত মানবিক বৃত্তিগুলিকে ন্যায়সূত্রের নিয়মানুসারে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থ যে মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঙ্গত। তিনি বলেছেন, "আমাদের এটা ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং ধরে নেওয়া উচিতও হবে না যে পরিণত মানুষের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কয়েকটি মাত্র আদিম তাড়না থেকেই বিভিন্ন পরিবর্তন বা মিশ্রণ -দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে অথবা আরো ঠিক করে বললে, মানুষ তার পরিবেশকে যে ভাবে ব্যবহার করে, তার থেকে—সম্পূর্ণ নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য মৌলিক তাড়নাগুলি তার জীবনে প্রভাববিস্তার করতে থাকবেই, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা -দ্বারা তারা নানাভাবে পরিবর্তিত হবে। আদিম প্রবৃত্তিটা একই থাকছে, কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবহারের প্রভূত পরিবর্তন ঘটছে।"[২৪]

আদিম তাড়নাকে মানুষ তার সচেতন উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে কাজে লাগায়।

মানুষের মধ্যে শুধু আদিম জৈব তাড়না নয়, তার মধ্যে থাকে উন্নততর, অভিজ্ঞতাপুষ্ট, অর্জিত আগ্রহ (acquired motives)। আদিম জৈব আগ্রহ প্রাণীর সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন। এরা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। রস্ তাই বলছেন, "সাধারণ সুস্থ মানুষের ব্যবহারের ধারা কেবলমাত্র জৈব তাড়না (যথা সংগ্রাম, নিরাপত্তা, আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, ঔৎসুক্য ইত্যাদি) -দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তার ব্যবহারের পেছনে জৈব তাড়নার ভিত্তিতে গঠিত জটিলতর আগ্রহ থাকে যা তার পরিবেশের প্রভাব -দ্বারা নিয়মিত। আদিম তাড়নাগুলি সমস্ত মনুষ্যত্বের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং তারা প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার জটিল ঐক্যের দ্বারা সংবদ্ধ।"[২৫]

এই অর্জিত আগ্রহগুলি সচেতন ও ক্ষণস্থায়ী নয়। এরা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের

২৪ Woodworth—Psychology, p. 383

২৫ J. S. Ross—Basic Psychology

স্থায়ী অচেতন মূল যার দ্বারা তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিয়মিত হয়। এগুলিকে বলতে পারি ব্যক্তির স্থায়ী কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী (attitudes),* ঔৎসুক্য (interests) ও আদর্শ (purposes)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সুনন্দার শখ (hobby) হচ্ছে বাগানের। এ সখের জন্যে সে জমানো পয়সা চা বা সিনেমায় খরচ করে না। সে রথের মেলায় কেওড়াতলার মোড়ে, শেয়ালদার মোড়ে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফুলের গাছ সংগ্রহ করে। যাদের এ শখ আছে তাদের সঙ্গে নানা ফুলের গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করে। তাদের সঙ্গে তার বিষম প্রতিযোগিতা। একবেলা খাওয়া না হলে তার তেমন দুঃখ নেই, কিন্তু তার একটি গাছ যদি কেউ নষ্ট করে তা হলে তাকে সে আস্ত রাখে না। অর্থাৎ এ শখ তার জীবনের অনেকগুলি কর্ম সুখ দুঃখের কেন্দ্র। এ শখ আদিম জৈব প্রেরণা নয়। এটা অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ। এটা ক্ষণিক একটা উত্তেজনা নয়। এটা তার বহু অভিজ্ঞতা-অনুভূতির ফল। এটা তার জীবনের একটা স্থায়ী শক্তি ও অনুভূতির উৎস। প্রতি মুহূর্তেই সে কিন্তু বাগান ও ফুলগাছের কথা ভাবছে না। কিন্তু ফুলগাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তার প্রতি গভীর আকর্ষণ আছে! এতে তার জীবনদর্শন বা রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এ পুষ্পময় জগৎটি তার নিজস্ব সৃষ্টি।

এই যে **অনুভূতির অবচেতন স্থায়ী উৎস এদের আমরা বলেছি ভাব (Sentiments)**। এই ভাবকে কেন্দ্র করে, বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির আদিম সুখদুঃখের অনুভূতি জড়িত। রস্ বলছেন, "ভাব (Sentiment) যেন সৌরজগৎ—সেই ভাবের উদ্দেশ্যবস্তু (end-object) হচ্ছে কেন্দ্রস্থ সূর্য, তার চতুর্দিকে বেষ্টন করে আদিম জৈব আগ্রহগুলি আবর্তিত হচ্ছে।"[২৬] এই ভাবের উৎপত্তি নিম্ন প্রাণীজগতে সম্ভব নয়। পরিণত মানবিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলেই শুধু এর উৎপত্তি সম্ভব। কাজেই রস্ ঠিকই বলছেন, "পরিণত ভাব কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সম্ভব।"[২৭]

স্থায়ী ঔৎসুক্য

আমরা যাকে বলি মানুষের অনুরাগ-বিরাগ (loves and hates),

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে 'ব্যক্তিত্ব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২৬ J. S. Ross—Basic Psychology, p. 49

২৭ J. S. Ross—Basic Psychlogy, p. 149

তার স্থায়ী ঔৎসুক্য (interests), অভ্যাস ও রুচির সবই হচ্ছে অর্জিত আগ্রহ। যা আমাদের এই স্থায়ী প্রেরণার উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তা আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে না। আগ্রহ হচ্ছে মনোজগতের সেতু—তা প্রসুপ্ত মনোযোগকে আকর্ষণ করে—আর যেখানে মনোযোগ ঘটেছে, সেখানে আগ্রহ কর্মের দিকে ধাবিত হল। তাই ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বললেন, "Interest is latent attention and attention is interest in action."

অ-চেতন প্রবৃত্তি (Unconscious Motivation)—মানুষের ক্রিয়ার পশ্চাতে যে সব প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে, তাদের অনেকগুলির সম্বন্ধেই সে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। আদিম জৈব প্রবৃত্তিগুলি জন্মগত, এবং বহুল পরিমাণে অন্ধ হলেও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাদের বিচার-বিশ্লেষণ -দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে, কখনো বা সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে।

মানুষের মন অত্যন্ত জটিল। মনের ক্রিয়ার সবটাই আমরা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারি না। কেন আমরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হই, কেন কোন জিনিস আমাদের ভালো লাগে বা মন্দ লাগে, তার কারণ অনেক সময় আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কেন আমরা কোন একটি বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্ত হলাম, তা আমরা নিজেরাই জানি না—বিচার-বিশ্লেষণ -দ্বারা তার সুব্যাখ্যা করতে পারি না। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তার কোন অভাব থাকবার কথা নয়। বাবা অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়াতে তাকে হস্টেলে ভর্তি করা হল। কিছুদিন পরে সে অন্য ছেলের পেন্সিল কলম চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল। সে নিজের অপরাধ অস্বীকার করল না এবং নিজ কর্মের জন্যে লজ্জাও প্রকাশ করল, কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কেন সে এমন সামান্য জিনিস চুরি করেছে, তখন সে কোন সদুত্তর দিতে পারল না। শুধু বলল, সে চুরি না করে থাকতে পারে নি। বিজ্ঞান বলে, কোন কাজই 'অকারণে' ঘটে না। ফ্রএড্ এবং তাঁর অনুষঙ্গীরা মনের এই আপাত-অসম্ভব নানা বিকার ও দুষ্কৃতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমাদের অনেক আদিম ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দিত বলে, আমরা তাদের প্রকাশ্যে আসতে দিই না, জোর করেই তাদের অবদমন (repression) করি। তাদের আমরা যেন মনের গভীর তলায় অন্ধকার গুহায় নির্বাসন দিই। কিন্তু তারা

মরে না। বিপুল তাদের বেগ। তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ঘুমের মধ্যে আমাদের সামাজিক চেতনার প্রহরা যখন শিথিল হয়, তখন এই বন্দী আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশে আত্মতৃপ্তির পথ খোঁজে। যেখানে অবদমনের বাধা অতিরিক্ত প্রবল সেখানে এ প্রবৃত্তিগুলি মানসিক ছোট-বড় নানা বিকার ঘটায়। হঠাৎ ভুলে যাওয়া (amnesia), লেখায় বা উচ্চারণে কোন শব্দ ফেলে যাওয়া (slips of the pen or the tongue), আপাত অকারণ ভয় বা বিদ্বেষ (phobias & aversions), দীর্ঘকাল মাথা ধরে থাকা, হজমের গোলমাল, দুঃস্বপ্ন ইত্যাদির মূলে বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকে সঞ্জাত মানসিক বিকার। এর আগে যে ছেলেটার কথা বলা হল, তার চুরির ব্যাপারটা ফ্রএডীয় মনোবিদ্ অবদমনজনিত মানসিক বিকারের ফল বলে ব্যাখ্যা করেন। এ জাতীয় কর্মের প্রবৃত্তিকেই অচেতন প্রবৃত্তি (unconscious motivation) বলা হয়। মনোবিকার এবং তার ফ্রএডীয় ব্যাখ্যা এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসা -সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করব।

তবে এখানে আমরা এটুকুই বলব যে সুশিক্ষককে অ-চেতন প্রবৃত্তির স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে হবে এবং মোটামুটি এও তাঁকে বুঝতে হবে,কি করে এই অ-চেতন প্রবৃত্তিগুলিকে মনের চেতন মুক্ত আঙ্গিনায় আসতে দিয়ে তাদের বিপুল শক্তিকে সুস্থ মানুষ ও সমাজ গড়ে তুলবার কাজে লাগানো যায়।[২৮]

প্রবৃত্তি বা আগ্রহগুলির সমন্বয়-সাধন (Integration of motives)
পশুদের বেলায় প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। যখন যে প্রবৃত্তি তাকে তাড়না করে তখন তা তৃপ্তির উপায় সে খোঁজে। পশুর বিচার-বিবেচনার বালাই নেই বলেই তার জীবনে ব্যক্তিত্বের ঐক্যকেন্দ্র নেই। পশু নিতান্তই কতকগুলি প্রবৃত্তির সমষ্টি। কিন্তু মানুষ অনেক উচ্চতর জীব। তার প্রবৃত্তি-গুলির গুণাগুণ সে বিচার করে, কোন্ প্রবৃত্তির তৃপ্তি পূর্বে হওয়া প্রয়োজন (determining priorities), কোন্ প্রবৃত্তি তার সমগ্র স্বার্থের বিরোধী সুতরাং অবাঞ্ছনীয়, কোন্ প্রবৃত্তির সংশোধন প্রয়োজন, তা স্থির করে তবেই সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্ধভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ সে করে না। কখনো কখনো তার ব্যক্তিগত আগ্রহ গভীরতর সামাজিক প্রয়োজনের (social needs) বিরোধী। সে ক্ষেত্রে সে ধীর ভাবে চিন্তা করে (deliberation)। কর্ম কিছুকালের জন্য

২৮ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 18

স্থগিত রাখে (postponement of action), তার পর বিচার-বিবেচনা অন্তে সে স্থির সিদ্ধান্ত করে কোন্ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সে খুঁজবে। ব্যক্তি শিক্ষা -দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে বিভিন্ন (এবং কখনো কখনো বিরোধী) প্রবৃত্তি বা আগ্রহের সমন্বয়-সাধক ভাবকেন্দ্র (sentiments) গড়ে তোলে। এইখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারাই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক।[২৯]

প্রবৃত্তি বা আগ্রহগুলির সমন্বয় বৃহৎ ব্যক্তিত্বের সূচক—প্রত্যেক মানুষেরই কয়েকটি প্রধান আগ্রহ বা দাবি থাকে সন্দেহ নেই। সকলের কাছে সব আগ্রহ সমান দামী নয়। এখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এ দাবিগুলি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে, এবং দাবিগুলির পরস্পরের মধ্যে খুব একটা গভীর ঐক্যের বন্ধন না-ও থাকতে পারে। যে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আগ্রহগুলি যত বৃহৎ কেন্দ্র ও আদর্শের দ্বারা সংহত ও সজীব, সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তত প্রকট। তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ। তাঁরা তাঁদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষণিক প্রবৃত্তি -দ্বারা বাত্যাতাড়িত হাল-মাস্তলহীন নৌকার মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে চালিত হন না। অল্প কয়টি বৃহৎ ও দৃঢ় আদর্শ তাদের জীবনকে ঐক্য ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। যেমন গান্ধীজীর সমগ্র জীবন সত্য ও অহিংসার আদর্শ -দ্বারা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁকে বোঝা সহজ। এ জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের মতো বহুবিভক্ত ও স্বতঃবিরোধ -দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।

আমরা সবাই জীবনকে এমনভাবে একটি বৃহৎ কেন্দ্রে সংহত করি না। তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই সমস্ত আগ্রহের একটি কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে আত্মতৃপ্তি। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় বলতে পারি, অহঙ্কার। আমাদের আগ্রহগুলোর নিজস্ব কোন দাম নেই, কোন শক্তি নেই; যদি না তারা 'অহং'-এর

---

২৯ At birth there is little or no integration of the different motives of the individual. Hence we speak of the child as being impulsive. His activity at a given moment tends to be determined by a single motive. At one time he is unrestrainedly angry, at another he is unashamedly afraid, at still another he is embarrassingly curious. But under the influence of environmental agencies and of his intellective processes (perceiving, remembering, thinking and imagining), his different motives tend to become integrated or organised into motive-systems or sentiments. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 22

সমর্থন পায়। পুরানো অভিজ্ঞতাবাদীরা ভাবতেন ইচ্ছা- আকাঙ্ক্ষাগুলো স্বাধীন শক্তি, তারা ব্যক্তিকে চালায়। যেখানে বিপরীত দুটো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, সেখানে প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা জয়ী হয়ে ব্যক্তিকে চালনা করে, এটা নিতান্ত ভুল কথা। 'অহং' কোন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বলেই তার জোর। আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা সেটা দ্বারাই ব্যক্তি সর্বদা চালিত হয় না। অনেক সময় দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেই বরং কাজ করছে। তার কারণ 'অহং' নিজেকে সংযুক্ত করেছে দুর্বল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। তাতেই দুর্বল আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে জয়ী হল। বাস্তবিক পক্ষে আকাঙ্ক্ষা প্রবল বা দুর্বল হয় অহং-এর সমর্থনে বা অসমর্থনের ফলে। তাই দেখা যায় জৈব আদিম তাড়নার থেকে সভ্য মানুষের কাছে উচ্চতর সামাজিক অবস্থার মূল্য বেশী।[৩০]

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলির প্রয়োগ—প্রবৃত্তিগুলিই ব্যক্তিকে কর্মে প্ররোচিত করে। কাজেই এই প্রবৃত্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জীবনে সর্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকের কাছে তাই এদের মূল্য অপরিসীম। প্রবৃত্তিগুলিই আগ্রহ মনোযোগ উদ্যমের মূল। তাই শিক্ষক মনোবিদের কাছে এ কথা জানতে চান, কি করে শিশুর জীবনের উৎসাহের এই মূলে পৌঁছতে হবে। প্রবৃত্তির অসম (uneven) বা অতি-বিকাশ (over-development of motives) যেমন জীবনের পক্ষে হানিকর, তেমনি এদের পরিণতিতে বাধাসৃষ্টি (repression of motives) জীবনে অতৃপ্তির সৃষ্টি করে—তা সুস্থ জীবনের প্রতিকূল।

মনোবিদ্ শিক্ষক একথাও জানেন যে, মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি অন্ধ শক্তি নয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ সংযমন দিক-পরিবর্তন উদ্বর্তন এবং সর্বোপরি সুসমন্বয় করা সম্ভবপর। ব্যক্তিত্বগঠনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা শিক্ষকের হাতে নেই সত্য, তথাপি শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তিনি গভীরভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, শিশুর প্রবৃত্তিগুলির সুনিয়ন্ত্রণে তিনি সাহায্য করতে পারেন। কি ভাবে তিনি তা করতে পারেন?

৩০ তাকেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলা যাবে, যার মধ্যে ঘটেছে বিভিন্ন প্রবৃত্তির সুসমন্বয়। যে প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তিস্বার্থের পোষক, আর যে প্রবৃত্তিগুলি জাতিস্বার্থের পোষক (racial motive) তাদের যেখানে সমন্বয় ঘটে, সেখানেই ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি সফল উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। এই হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। Ibid—p. 23

(১) নেতিবাচক ভাবে তিনি শিশুর ভয় লোভ ক্রোধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ—যেগুলি তার জীবনের আদিম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত—তাদের প্রশমনের পথ শিশুকে বলে দিতে পারেন। এই প্রবৃত্তিগুলির অসম এবং অতি-বিকাশে বাধা দিতে তিনি শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন।

(২) ইতিবাচক ভাবে তিনি শিশুর কৌতূহল সৃজনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিকে কল্যাণময় উদ্দেশ্যাভিমুখী করতে শিক্ষা দিতে পারেন।

(৩) বিরুদ্ধ ও বিপরীত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কি করে সমন্বয়সাধন করতে হয় এবং সহযোগী প্রবৃত্তিগুলি কি করে সংযুক্ত করতে হয় তা তিনি শিক্ষা দিতে পারেন এবং এভাবে তাদের শক্তি শিক্ষার গঠনাত্মক কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

(৪) কাম-রূপ প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনের উচ্চতর আদর্শসাধনের উপায় হিসাবে নতুন পথে চালিত করবার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। একেই ফ্রএডীয় মনোবিদ্‌রা বলেন প্রবৃত্তির উদ্বর্তন বা উদ্গতি (sublimation of desires)। উদ্গতির দ্বারা প্রবৃত্তির অশুভ শক্তি স্বভাবের পথে ছাড়া পেয়ে সুফলপ্রসূ হয়ে ওঠে, কিন্তু জোর করে তাদের রুদ্ধ করবার চেষ্টা করলে, অবরুদ্ধ শক্তি অবচেতন মনে নানা জটিল সংঘর্ষের সৃষ্টি করে মানসিক বিকার জন্মাতে পারে।

(৫) শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হল তাঁর ছাত্রদের নিজ নিজ প্রকৃতিকে বুঝতে শেখা। প্রবৃত্তিগুলির প্রকৃতি সত্য করে শিক্ষার্থী যখন বুঝতে পারবে তখনই সে সাহসের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারবে। এরই নাম আত্মশাসন। চরিত্র- ও মনুষ্যত্ব-গঠনের এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়।[৩১]

প্রবৃত্তি ও সমাজ-প্রয়োজনের যোগ

অধ্যাপক কায়রভ্‌ ১৯৪০ সালে কম্যুনিস্ট শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন,

---

৩১ Everyone should be helped to understand and face his or her instincts, should be led to realise what they are, and how they can be used. One of the fundamental tasks of teachers is to help their children, to understand themselves, as they grow up and before they are old enough to do that, to help them to solve their conflicts by sublimating their desires instead of repressing them. Ryburn—Introduction to Educational Psychology, p. 30

"কম্যুনিস্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ। এই সর্বাত্মক বিকাশের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, দৈহিক পরিশ্রম, নীতি, সৌন্দর্যবোধ ও দেহচর্চা -সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা।"[৩২] ব্যক্তির আগ্রহকে এই কাজে লাগাবার জন্যে রাশিয়া জোর দিচ্ছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সাম্যের ওপর। বিয়েত্রিস কিং লিখেছেন, "কাজেই এটাই আশা করা যায়, সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্যে, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই আন্তরিক চেষ্টা হবে। এটা করা হচ্ছে সমস্ত শিশুর জন্যে শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়ে,—এতে জাতি, ধর্ম, পিতামাতার সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি কিছুই বিচার করা হচ্ছে না।"[৩৩]

আমেরিকাতে ডিউই শিক্ষাকে সমাজজীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেছেন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহকে বাস্তব সমাজ-প্রয়োজন-অভিমুখী করার কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন।

পুরানো ও নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভেদ

পুরানো ধরনের প্রচলিত শিক্ষায় বাস্তব আগ্রহের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় পুঁথিমাফিক ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে শিক্ষায় ছাত্রদের উৎসাহ-সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব, এবং তাদের শিক্ষা প্রাণহীন হতে বাধ্য। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার প্রভেদ আলোচনা করে তিনি বলেছেন, "ওপর থেকে চাপানো শাসনের পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিত্বের চর্চা ও প্রকাশে উৎসাহদান; স্বাভাবিক গতিচঞ্চলতা রুদ্ধ করার পরিবর্তে এখানে আছে স্বাধীন কর্মোদ্যম; পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিগত চেষ্টা -দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা; প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা বিভিন্ন কতকগুলি তথ্য বা কৌশল আয়ত্ত করার পরিবর্তে আছে এমন সংহত ও জীবন্ত উদ্দেশ্যসাধন, যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক আগ্রহ কাজে লাগবে; একটা দূর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতির পরিবর্তে বর্তমান অবস্থার সুষ্ঠু সুযোগ-গ্রহণ; কতকগুলি অনড়, অচল,

---

৩২ Kairov—Soviet System of Education
৩৩ Beatrice King—Russia Goes to School

অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তে আছে সদা-পরিবর্তনশীল জগৎ ও অবস্থার সঙ্গে প্রাণপূর্ণ পরিচিতি।"৩৪

শিক্ষায় বিফলতার কারণ

আমাদের দেশের শিক্ষার বিফলতার একটি মূল কারণ হচ্ছে, এ শিক্ষা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ শিক্ষা নিতান্তই পুঁথিগত—অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্। একথা রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল করে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে তিনি নতুন ধরনের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের আগ্রহ রুচি ও স্বাধীনতা -ব্যবহারের বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে শিক্ষাকে সফল ও আনন্দময় করতে তিনি চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে, এক সুরে, সেটা ক্লাস নাম-ধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ, আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ, প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।" শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হবে সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচিতি, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল ও শ্রদ্ধা এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নের আগ্রহ-সৃষ্টি, এটাও তিনি বুঝেছিলেন।

ব্যক্তির আগ্রহকে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে কার্যকরী করে তুলতে গেলে, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুইই প্রয়োজন আছে। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পৌরুষ জাগ্রত হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্তব্য- ও সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সংগঠন-উৎসাহ বাড়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটিরই প্রয়োজন আছে। আমেরিকায় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার দ্বারা ব্যক্তির উৎকর্ষ-সাধনের ওপর বেশী জোর, আর রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সুশিক্ষক জানেন, ছাত্রের আগ্রহকে এই দুই পথেই চালনা করে এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে।

৩৪ John Dewey—Experience and Education, p. 83

আগ্রহের অতৃপ্তিজনিত মানসিক বিকার

যেখানে আগ্রহ তার বিষয়লাভে সমর্থ হয় সেখানে আসে তৃপ্তি। এটা মানসিক সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতা-পূর্ণ বর্তমান অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের বহু আগ্রহ পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয় না। সুস্থ সাধারণ মানুষ জানে, যে আমাদের "সাধ ছিল যত, সাধ্য ছিল না"—এই পৃথিবীর নিয়ম। তাই এ ক্ষোভ যথাসম্ভব সহজভাবেই সে নিতে চেষ্টা করে। কখনো বা আগ্রহকে সে স্তিমিত করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায় (substitution)। মানুষের অভিমান যেখানে আহত হয়, সেখানে সে উপায় খোঁজে সে আঘাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে। এর সুফল কুফল দুই-ই আছে। যে ছেলে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেল না, সে হয় তো ভালো খেলোয়াড় হিসাবেই নাম কিনল; তার আগ্রহকে সে স্থানান্তরিত করল। এ এক ধরনের ক্ষতি-পূরণ (compensation)। তার মন বলল, "নাকের বদলে নরুন পেলুম, টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।" কিন্তু এমনও হতে পারে যে পত্রিকার সম্পাদক তার লেখা ফেরত পাঠিয়েছেন। সে তার শোধ তুলল, ছোট ভাইয়ের অঙ্কের খাতা ছিঁড়ে ফেলে যেহেতু সে অঙ্ক ভুল করেছে, অথবা সম্পাদকরা নিতান্তই পক্ষপাত-দোষদুষ্ট, এ রকম কুৎসা রটনা করে। যেখানে কোন ছেলে বা মেয়ের স্বাভাবিক বহু আগ্রহ পরিতৃপ্ত হওয়ার পথে বাধা আছে, তার নিজ অক্ষমতার মধ্যে অথবা সমাজের অসাম্যকর ব্যবস্থার জন্যে, সেখানে তার মনে হতাশার (frustration) সৃষ্টি হয়। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের গ্লানি তাকে তিক্ত করে তোলে, এবং তা গঠনাত্মক পথে চালিত না হয়ে সমাজ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে নিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি খোঁজে। কলকাতায় ট্রাম-বাস পোড়ানো আর পাকিস্তানে নানা হাঙ্গামায় ছেলের দল বারে বারে লিপ্ত হচ্ছে এটা সমাজের পক্ষে বিষম কুলক্ষণ। যেখানে দেখা যায় শিক্ষকেরা পর্যন্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে জবরদস্তি করে পরীক্ষা বন্ধ করতে উদ্যত, সেখানে বুঝতে হবে দেশের যুব-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ সুস্থ স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ পাচ্ছে না। এবং এ রোগ বিস্তারলাভ করছে যুবকদের যাঁরা গড়ে তুলবেন তাঁদের মধ্যেও। শুধু শাস্তি দিয়ে, নিন্দা করে, এ রোগের চিকিৎসা হবে না। দেশের শিক্ষাবিদ্ ও সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের যুবকদের স্বাভাবিক আগ্রহের সুষ্ঠু পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, যাতে তাদের উচ্ছৃঙ্খল আগ্রহ কল্যাণ-উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

শিক্ষকের পক্ষে তাই সমস্যা, শুধু ছাত্রদের আগ্রহ-সৃষ্টি নয় আগ্রহের

স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি, এবং বিচ্ছিন্ন আগ্রহগুলিকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীকরণ। জৈব আদিম আগ্রহকে সংযত করার প্রয়োজন আছে। তার জন্যে দরকার বিচারবুদ্ধির বিকাশ। সেই জন্যেই উপদেশ, হঠকারী হয়ে প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্ষণিক আগ্রহের বশবর্তী না হয়ে, কিছুকালের জন্যে কর্ম স্থগিত রাখা (postponement of action)। শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে সুষ্ঠু সংহত শান্ত অথচ উৎসাহশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সুখ ও বৃহত্তম কর্মক্ষমতা তখনই আসতে পারে যখন ব্যক্তি আত্মদ্বন্দ্বে দুর্বল নয়, যখন তার অসংযমী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সে বহুধাবিভক্ত নয়। ফ্রএড্-ও তাই বলেছেন, মানসিক বিকারের চিকিৎসা তখনই সফল হবে, যখন ব্যক্তি তার বিচ্ছিন্ন কামনাগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের মীমাংসা ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন করতে পারবে। ভারতীয় দর্শনে এই আত্ম-সংহতিকে বলা হয় যোগ। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা বলেছে, এই যোগ হচ্ছে 'কর্মসু কৌশলম্'। এই কৌশলটি জানতে হবে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন আর সকলের চেয়ে দরকারী কাজ সুস্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সৃষ্টি। সে কঠিন কাজটির ভার আছে শিক্ষকের ওপর।

চতুর্থ অধ্যায়

সহজ সংস্কার

(Instincts)

আগের অধ্যায়ে আমরা বলেছি প্রত্যেক প্রাণীর কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন আছে, সেগুলি মেটাবার জন্যে আছে উপযুক্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি বা আগ্রহ। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে আমরা দৈহিক প্রবৃত্তি বলেছি —যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ইত্যাদি। এগুলি জীবনের আদিম দাবি। এ দাবি যথোচিতভাবে না মিটলে কোন প্রাণীই সুস্থভাবে দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে না। এ দাবিগুলি প্রাণীর জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এদের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন আছে। জীবনের এই মৌলিক দাবিগুলি এবং এদের সঙ্গে যুক্ত প্রবৃত্তি বা প্রেরণা পশুর সমগ্র জীবনকেই প্রায় পরিচালনা করে। আক্ষরিক অর্থেই এ কথা সত্য যে, মনুষ্যেতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির দাস। এই আদিম জন্মগত প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা বলব সহজ সংস্কার (Instinct)।

সহজ সংস্কারের প্রকৃতি -সম্বন্ধে মতভেদ

এই সহজ সংস্কারগুলি -সম্বন্ধে মনোবিদ্‌রা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বহু চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। কিন্তু সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হয়েছে বলা যায়। এই সহজ সংস্কারগুলি বিচিত্র ধরনের। এদের সকলের সম্বন্ধে কোন কথা সাধারণ ভাবে বলা শক্ত। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিদের সিদ্ধান্ত এতই বিভিন্ন যে, সহজ সংস্কারের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞার্থ দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, কাকে সহজ সংস্কার বলা হবে তা নিয়েই মনোবিদ্‌দের মধ্যে বিষম মতভেদ। সহজ সংস্কার বলতে কি কতকগুলি অন্ধ প্রকৃতিকে বোঝাবে, না নির্দিষ্ট, প্রায়- অপরিবর্তনীয় জটিল ক্রিয়া বা ক্রিয়াশৃঙ্খলকেও বোঝাবে, এ নিয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়া না হওয়ায় এ আলোচনায় নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, আর একটা মস্ত বিভ্রান্তির কারণ মানুষের মধ্যে এই সহজ সংস্কারের প্রকাশ নিয়ে। পশুরা সহজ সংস্কার -দ্বারা চালিত, কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষে বিশুদ্ধ সহজ সংস্কার দেখতেই পাওয়া যায় না। তাই কেউ কেউ বলেছেন, মানুষে সহজ সংস্কার

বলে কিছু নেই। অথচ প্রাণী হিসাবে অবশ্যই মানুষেরও আদিম জৈব প্রয়োজন আছে, এবং তাদের তৃপ্তির জন্যে প্রবৃত্তিও নিশ্চয়ই আছে—যদিও শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে তাদের চেহারা এতই পরিবর্তিত হয়েছে যে, পশু এবং মানুষ দুই-এর মধ্যের সহজ সংস্কারকে একই সংজ্ঞার্থ -দ্বারা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এটা স্বীকার করা ভালো যে সহজ সংস্কারের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর আছে।[১]

সহজ সংস্কারের কতকগুলি উদাহরণ

প্রথমে আমরা কতকগুলি সাধারণ পরিচিত এবং কতকগুলি অসাধারণ ও অদ্ভুত সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথম দিকের উদাহরণগুলি পশুপাখীর জীবনের, আর শেষটি মানবশিশুর জীবনের :

মাছরাঙা ঝুপ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

শামুক ভয় পেলে নিজ খোলের মধ্যে ঢুকে টুপ্ করে ডুবে যায়। সজারু ভয় পেলে একসঙ্গে সবগুলি কাঁটা খাড়া করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

ছানা কেড়ে নিলে মাদী-কুকুর হিংস্রভাবে কামড়ে দেয়, বেড়ালও তাই করে।

পাখী ডিম পাড়বার আগে খড়খুটো সংগ্রহ করে বাসা বাঁধে। ডিম হলে তাদের তা দেয়। চোখ না ফোটা পর্যন্ত, নানা জায়গা থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে নিয়ে অসহায় বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। বাচ্চাগুলো বড় হয়, ডানা বেরোয়, হঠাৎ একদিন মার সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে ওরা আকাশে ওড়ে—প্রথমে অল্প দূর, ক্রমে দূরত্ব বাড়ে,—তারপর নিজ খুশীমত যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। আবার হাঁসের বাচ্চা একটু বড় হলে, মার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামে, প্রথমটা কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে,—তারপর স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটে।

ইউরোপের নদী-খাল-বিলের সমস্ত ঈল্ মাছ দশ বছর বয়স হলে ডিম পাড়তে যায় দুস্তর আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে।

এক রকম কাঁকড়া আছে তারা সমুদ্রের অগভীর জলে থাকে। তারা এক মাইল দেড় মাইল সমুদ্রতীর অতিক্রম করে নারকেল গাছ বেয়ে ওঠে। তারপর নারকেলের চোখগুলি যেদিকে থাকে, দাঁড়া দিয়ে সেই মুখের ছোবড়াগুলি

---

১ Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p.17

ছাড়িয়ে ফেলে। সেই চোখগুলির অপেক্ষাকৃত নরম জায়গা দিয়ে দাঁড়া ঢুকিয়ে ভেতরের জল ও শাঁস খায়।

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মাতৃস্তন থেকে নিজ স্বাভাবিক খাদ্য সংগ্রহ করে।

'ইন্‌স্টিংট্' কথাটা অনেক সময় বড় শিথিলভাবে ব্যবহার করা হয়,—যেমন আমরা বলি দক্ষ পিয়ানোবাদকের হাতের আঙুলটি ঠিক সময়ে ঠিক খাটটিই টিপে দেয় সম্পূর্ণ অজান্তে, ইন্‌স্টিংটিভ্‌লী (instinctively)।[২] অথবা একটা বিলিতি খেলাধুলার কাগজে লিখছে, "কুকুরের স্বাভাবিক সহজ সংস্কারই হচ্ছে মানুষের সেবা করা" (The natural instinct of dogs is to be of service to men)।[৩] যথেষ্ট বিচার-বিবেচনাহীন অভ্যস্ত কাজকে সহজ সংস্কার বা instinct বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সহজ সংস্কার কি, এ নিয়ে এত মতভেদ আছে যে চট্ করে এর চূড়ান্ত একটা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া ইন্‌স্টিংট্ বললে সাধারণত একটা অদ্ভুত, অপ্রাকৃত শক্তি, এ রকম ধারণা জন্মায়। এই কারণে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী, যেমন মান্, মাক্‌ফি, উডওয়ার্থ, জন্‌সন্ প্রমুখ ইন্‌স্টিংট্ কথাটা বাদ দিয়ে—অশিক্ষিত আগ্রহ (unlearned motives) কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী।[৪] যে উদাহরণগুলো ওপরে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে সহজ সংস্কারের সাধারণ লক্ষণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

(১) প্রথমেই দেখা যায়, সহজ সংস্কার শিক্ষার ফল নয়। মাছরাঙাকে ঝুপ্ করে মাছ ধরতে, শিশুকে মায়ের বুকে খাদ্য সংগ্রহ করতে, পাখীকে বাসা তৈরি করতে কেউ কি শিখিয়েছে? **সহজ সংস্কার হচ্ছে অশিক্ষিত পটুত্ব।** "প্রত্যেকটি অশিক্ষিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে সহজ সংস্কার: যা আমরা জন্মেই করতে পারি যেমন, চোখের পাতা খোলা-বন্ধ করা, স্তনপান করা ইত্যাদি।"[৫] সহজ সংস্কার যে শিক্ষালব্ধ নয় এটা খুব ভাল করে বোঝা যায়, যখন দেখি, কোন কোন প্রাণীর জীবনে এই কাজটি একটিবারই মাত্র সম্পন্ন হয়। কেউ তাদের শেখায় না। যেমন শুঁয়াপোকা নিজের চারিদিকে গুটি

---

২ Ross—Educational Psychology, p. 55

৩ H, M. Fox—The Personality of Animals, p. 114

৪ Woodworth—Psychology, p. 368

৫ West—Education and Psychology, p. 194.

তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়। প্রথমবারেই বিশেষ ধরনের গুটিটি তারা নির্ভুলভাবে তৈরি করে।[৬]

হয়তো বলা যেতে পারে বাচ্চা-পাখী উড়তে শেখে, বাচ্চা-হাঁস জলে সাঁতার কাটতে শেখে, মাকে দেখে। কিন্তু এ প্রবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চয়ই সহজাত। সাঁতার কাটবার প্রবৃত্তি, আকাশে ওড়বার প্রবৃত্তি আর অনুকরণের প্রবৃত্তি নিয়ে চিলের ছানা বা হাঁসের বাচ্চা জন্মেছে; এটা শিক্ষার ফল নয়। **এ প্রবৃত্তিটাকে—এই ক্ষমতাকেই বলি সহজ সংস্কার।** এই প্রবৃত্তির থেকে যে ক্রিয়া তাকে বলা যেতে পারে সহজ ক্রিয়া।[৭] এ কাজগুলোর সম্পূর্ণরূপ কখনো কখনো অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভর করতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তিগুলি সহজাত।[৮]

(২) এ কথাটা যে সত্য তা আমরা আর একটা দিক বিবেচনা করে বুঝতে পারি। **প্রত্যেক সহজ সংস্কারের পিছনেই একটা নির্দিষ্ট দৈহিক গঠন রয়েছে।** এই গঠনের ভিন্নতার ওপরেই সহজ সংস্কারগুলির প্রকাশও ভিন্ন হয়। কাকের বাচ্চার গড়ন আর হাঁসের বাচ্চার গড়ন ভিন্ন ভিন্ন; তাই কাকের বাচ্চা বড় হলে আকাশে ওড়ে, আর হাঁসের বাচ্চা জলে সাঁতার কাটে। তাদের গঠনের ভিন্নতা জন্মগত।

"এ কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত হেতু আছে, যে বিভিন্ন প্রাণীর সহজ সংস্কারের মূলে আছে তাদের বিভিন্ন শারীরিক গঠন।[৯] প্রত্যেক প্রাণীর গঠনের সঙ্গে তার সহজ সংস্কারের যোগ আছে। কুকুরে তাড়া করলে বেড়াল ওড়ে না বা ডুব দেয় না, হাঁস তাড়া খেয়ে গাছ বেয়ে ওঠে না বা নখ দিয়ে যুদ্ধ করে না। কচ্ছপ বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে না, অথবা

---

৬ H. M. Fox—The Personality of Animals, p. 106

৭ Drever—Dictionary of Psychology

৮ There must be certain innate dispositions or engram-complexes, behind these modes of behaviour.…We might say that *an instinct is an innate or inherited mode of behaviour*. For example, in a dangerous situation, we instinctively seek safety, and we might therefore talk of the instinct of escape. The chief objection to such a mode of definition is simply that the behaviour does not always take place. *It would be better*, since we have power of inhibiting the behaviour itself, *to define an instinct as an impulse toward a certain mode of behaviour*. Ross—Educational Psychology, p. 56

৯ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 35

খরগোস আত্মরক্ষার জন্যে নিজের চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে যায় না। গোরুর দাঁত ও পাকস্থলীর গড়ন ঘাস খাবার সহজ প্রবৃত্তির উপযোগী, তেমনি সিংহের শারীরিক গড়ন মাংস খাবার উপযোগী করে তৈরী।"[১০]

(৩) **সহজ সংস্কার শুধু জন্মগত নয়, বংশানুক্রমিকও বটে।** লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেড়াল ইঁদুর শিকার করে, মৌমাছি চাক তৈরি করে তাতে মধু-সঞ্চয় করে।

(৪) বংশগতির ধারায় একই প্রকার দৈহিক গঠন চলে আসছে বলে **এক জাতীয় সমস্ত প্রাণীর সহজ ক্রিয়াগুলিও একই প্রকারের (uniform)।** সব হাঁস একই ভাবে সাঁতার কাটে। সব চড়ুই পাখী একই ধরনের বাসা বানায়।

(৫) **সহজ ক্রিয়াগুলি অধিকাংশ সময়ই অপরিবর্তনীয়।** একই অবস্থায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। এক রকমের বোলতা আছে, তারা বাসা বানায় না। তারা মাটির নিচে গর্ত করে সেখানে বাচ্চা পাড়ে। বাচ্চা পাড়বার আগে বোলতা একটি ফড়িংকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান করে তার লম্বা শুঁড় (antennae) ধরে টেনে গর্তের ভেতরে আনে। তারপর ফড়িংএর গায়ে ডিম পেড়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ওই ফড়িংএর দেহ থেকে খাদ্য-আহরণ করে। এখন এই ফড়িংএর শুঁড়টা কেটে দিলে, কিছুতেই আর বোলতা সেই ফড়িংকে টেনে নিতে পারে না, যদিও এতটুকু বুদ্ধি থাকলে ফড়িংএর পা ধরেই বোলতা তাকে গর্তে টেনে নিতে পারত। মৌমাছি যে চাক বানায় তার গঠন সর্বদাই একই রকম। এর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় না। সে জন্যে ব্যবহারবাদীরা (Behaviourists) (যাঁরা মন বা মানসিক বৃত্তি বা প্রক্রিয়া অস্বীকার করেন, তাঁরা) সহজ সংস্কারকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক একটা জটিল প্রক্রিয়া বলেই মনে করেন। যখন কোন প্রাণী একটা জরুরী উদ্দীপকের (stimulus) সম্মুখীন হয়, তখন বিচার-বিবেচনা না করে তার দেহযন্ত্রে তৎক্ষণাৎ কতকগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাকে বলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex)। যেমন, গরম লোহায় অ-খেয়ালে হাত লাগলে তৎক্ষণাৎ আমরা হাত সরিয়ে নিই। এখানে কোন বুদ্ধি-বিবেচনার স্থান নেই। এটা সহজ এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। এ রকম একটার পর একটা প্রতিবর্তকে জাগিয়ে তুলে যদি একটা শৃঙ্খল তৈরী হয়, তবে তাকে বলে

---

১০ Ibid– Fundamentals of Child Study, p. 34

সহজ সংস্কার। তাই সহজাত সংস্কারকে তাঁরা বলেন 'প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল' (a chain of reflexes)। সহজ সংস্কার হচ্ছে অনেক দাঁতওয়ালা এক চাবি, যেটা টিপলে একটার পর একটা লিভার (lever) খুলে যায়। এ একটা সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি। নান্ (Nunn) বলছেন, "পূর্বে একথা মনে করা হত যে সহজ সংস্কার হচ্ছে, একটা জটিল স্নায়ু ও পেশীর যান্ত্রিক সমাবেশ। কোন নির্দিষ্ট একটি উদ্দীপকের ধাক্কায় এ যন্ত্র-সমাবেশ-গঠন -দ্বারা নির্দিষ্ট একটার পর একটা ক্রিয়া সৃষ্টি করবে।"[১১] লোয়েব্ (Loeb) এই মত প্রবর্তন করেন। এ মত আমরা গ্রহণ করি না, এবং পরে এসম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। সহজ সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া এ কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) **সহজ সংস্কার মূলত বুদ্ধিচালিত নয়।** যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, সেখানেই দ্বিধা ও বিলম্ব। কিন্তু জীবনের নিম্নতর স্তরে এই দ্বিধা ও বিলম্বের স্থান নেই। প্রকৃতি তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে জীবদেহে কতকগুলি যান্ত্রিক গঠন দিয়েছে যাতে তার উদ্দেশ্য সহজ এবং অব্যর্থভাবে সিদ্ধ হতে পারে। কাজেই অধিকাংশ সহজ ক্রিয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য সম্পূর্ণতা ও অব্যর্থতা আছে। "নির্দিষ্ট সহজ সংস্কারগুলি··· প্রায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়া করে। এসব ক্রিয়া চেতনা -দ্বারা চালিত নয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বিনা বাধায় সম্পন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ কোন চেতনার উদ্ভব হয় না, হলেও অতি সামান্যই হয়। যেখানে একই জাতীয় ক্রিয়াই বারে বারেই একই উদ্দীপকের ফলে সম্পন্ন হয়, সেখানে চেতনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"[১২]

বহু উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে, আর একটিও দিচ্ছি। মান্‌রো ফক্স একপ্রকার বন্য হাঁসের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। হাঁসের একটি বাচ্চা একা প্রতিপালিত হয়েছিল। প্রথম যখন তাকে একটি নদীতে সাঁতার দেবার জন্যে নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন হঠাৎ একটা কুকুর দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। তক্ষুনি সে জলে মাথা ডুবিয়ে দিল, আর ডুব-সাঁতার কেটে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। সে জীবনে অন্য হাঁসকেও ডুব দিতে আগে দেখে নি।[১৩]

১১ Nunn—Education, p. 171
১২ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 37
১৩ H. Munro Fox—The Personality of Animals, p. 105

(১) এর জন্তেই দেখা যায় **সহজ সংস্কারগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের এক আশ্চর্য সমন্বয়।** পাখী বাসা বানায়, কাঁকড়া গাছে উঠে নারকেল ছুলে খায়, মৌমাছি চাকে মধুসঞ্চয় করে; এর প্রত্যেকটি ক্রিয়া এমন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় যে, মনে হয় যে কাজগুলি বুদ্ধি-বিবেচনা করে, যেমনটি যেখানে দরকার তেমনি করা হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্তে প্রকৃতির এ এক পরম বিস্ময়কর পরীক্ষা। কখনো কখনো এ-ও মনে হতে পারে—প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্যই বুঝি ছিল, সহজ ক্রিয়ার ক্ষিপ্র কার্যকারিতার পথে জীবনকে সম্পূর্ণ চালনা করা। হয়তো এ রাজ্যে হঠাৎ চেতনা বা চিন্তার আকস্মিক আবির্ভাব প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনের পরিকল্পনা কেমন করে বানচাল করে দিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? চেতনা ও চিন্তাই তো দিয়েছে জীবনের অন্ধ আবেগকে মুক্তি ও দৃষ্টি। আঁরি বের্গসঁ (Henry Bergson) সত্যই বলেছেন, প্রকৃতির মূল আবেগ, এলান্ ভিতাল্ (Elan vital) -এর উল্লেখযোগ্য শৃঙ্খল-মুক্তি ঘটল যখন সহজ সংস্কারের অন্ধ জাল ছিন্ন করে, সে অনিশ্চিত পরীক্ষা ও বিবেচনার পথে মোড় নিল।[১৪] এতে দুঃখ করার কারণ নেই,—আনন্দ করবার কারণ আছে। বাস্তবিক পক্ষে সহজ ক্রিয়ার গণ্ডী বড় সংকীর্ণ। জীবনের শৈশবে এ সংকীর্ণ গণ্ডীই উপযোগী। কিন্তু জীবন-বিহঙ্গম ডানা মেলে আকাশের অনিশ্চিত বিস্তারে দুঃসাহসিক অভিযান যদি না করত, তবে পৃথিবীর বুকে মানুষেরই আবির্ভাব ঘটত না। তা ছাড়া যে সংকীর্ণ নির্ভয় গণ্ডীর মধ্যে সহজ ক্রিয়া অভ্রান্ত অব্যর্থতায় আমাদের বিস্মিত করে, সেই সহজ ক্রিয়ার হাস্যকর অ-কার্যকরতা ধরা পড়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে। "**সহজ সংস্কারচালিত কীট-পতঙ্গের জীবন তাদের স্বাভাবিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে আশ্চর্যজনকভাবে উপযোগী,** কিন্তু ফেবার (Fabre) ঠিকই বলেছেন **স্বাভাবিক জরুরী অবস্থার মুখোমুখি এ সংস্কারগুলির মধ্যে দেখা যায় সীমাহীন মূর্খতা।** সহজ সংস্কারগুলি নিম্নতম জীবনযাত্রার চিন্তাহীন, অভ্যস্ত ক্রিয়ার পক্ষেই উপযোগী।" সহজ সংস্কারের শোচনীয় ও হাস্যকর ব্যর্থতার উদাহরণ দিচ্ছি। একজাতীয় শুঁয়োপোকার স্বভাব হল তারা দল বেঁধে একটির পিছনে আর একটি চলে, লম্বা লাইনে। এই দলবদ্ধতায় তাদের জোর,

১৪ H. Bergson—Creative Evolution

আর এভাবে একেবারে লাগালাগি পিছে পিছে চললে তাদের পথ হারাবার ভয় থাকে না। এখন এ রকম একটা মস্ত দলকে চেষ্টা করে একটা বৃত্তাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল। তারা চলতে শুরু করল অবিরামভাবে, ওই একই চক্রে পুরো একটি সপ্তাহ ধরে।[১৫]

(৮) **সহজাত সংস্কার যদিও উদ্দেশ্য-চালিত নয়,—তবু সেগুলি জৈব প্রয়োজন মেটাবার মূল উপায়।** সহজ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবের আত্মরক্ষা, আত্মতৃপ্তি ও বংশরক্ষার প্রধান কাজগুলি সাধিত হয়। বাঘের থাবা, গোরুর শিং, সজারুর কাঁটা, কচ্ছপের খোল, এগুলোর ব্যবহার সহজাত। এরা প্রাণীর আত্মরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। সঞ্চয় ও সংগ্রহের আদিম প্রবৃত্তি এই জীবনের বিস্তৃতির প্রধান উপায়। স্ত্রী-পুরুষের প্রতি স্বভাবজ আকর্ষণ, নীড় বাঁধবার প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি স্নেহমমতা এই সব সহজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে বংশরক্ষা হয়। এখানে প্রেষণা ও উদ্দেশ্য (motive and purpose), এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা যেতে পারে। যেখানে ক্রিয়া কোন নিকট লক্ষ্যাভিমুখী তাকেই আমরা প্রেষণা (motive) বলতে পারি আর, উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর কোন লক্ষ্য-অনুসারী ক্রিয়া। শিশুর ক্রিয়া নিকট তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যানুসারী, মানুষের ক্রিয়া সাধারণত খুব উদ্দেশ্যাভিমুখী।[১৬]

(৯) **প্রত্যেকটি সহজ ক্রিয়াই যথানির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয়।** শেষ হয়ে গেলে তারা লুপ্ত হয়ে যায়। কতকগুলি সহজ সংস্কার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়, আমৃত্যু তারা বর্তমান থাকে,—যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। কতকগুলি প্রবৃত্তি জীবের কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির ওপর নির্ভর করে,—যেমন পাকস্থলীর এক বিশেষ অবস্থায় জাগে খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি, পাখীর ডানা ভালো করে গজালে, তখন জাগে আকাশে ওড়বার সাধ। রক্তে

---

১৫ H. Munro Fox—The Personality of Animals, p. 106

১৬ All goal-directed behaviour is said to be conative (from Latin *conari*—to strive). But there is a difference between behaviour that is directed towards immediate goals (as when a baby crawls towards an attractive toy, or pushes away food that he does not want) and behaviour that is directed towards goals that are distant in time or space (e.g. when we book accommodation in February for a holiday in July). Only the second type of behaviour is normally described as purposive. It clearly involves symbolic functioning. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 197

কতকগুলি হর্মোন (hormone) যুক্ত হলে পরিণত পশুর মনে জাগে সঙ্গমের প্রবৃত্তি। আবার প্রয়োজন ফুরালে প্রবৃত্তিও লোপ পায়। যেমন স্তন্যপানের প্রবৃত্তি।

(১০) **সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির নিবিড় যোগ আছে।**[১৭] যেমন মাদী কুকুরের বাচ্চা ছিনিয়ে নিলে অথবা ক্ষুধার্ত কুকুরের খাদ্য কেড়ে নিলে সে খেপে কামড়ে দেয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির প্রকৃত সম্বন্ধ কি, এ নিয়ে আলাদা আলোচনা পরে আমরা করব।

১৮৯৬ সালে লয়েড্ মর্গান্ সহজ সংস্কার ক্রিয়ার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করে চারটি লক্ষণ উল্লেখ করেছিলেন।[১৮] ওপরের আলোচনার সঙ্গে এর মিল আছে।

সহজ সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত (Biological and Psychological View of Instinct)—কোন কোন বিজ্ঞানী সহজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ দেহগত যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মতপ্রকাশ করেছেন। এ কথা পূর্বেই আমরা দেখেছি। তাঁরা সহজ সংস্কারকে জৈব প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়, এ পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজী আছেন। এ দলে আছেন ব্যবহার-বাদীরা। জেম্স্ ও থ্যার্ণডাইক মোটামুটি এই মতেরই পোষক। জেমস্ ক্রিয়াকে বলেছেন, কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি (a bundle of reactions)। কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সহজ সংস্কারকে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখবার পক্ষপাতী। এ দলের মধ্যে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্, স্টাউট্, এঞ্জেল্ এবং শিক্ষাব্রতী নান্ ও রস্-এর নাম করা যেতে পারে। সহজ ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং চেতনার সঙ্গে তার সংযোগ রয়েছে, এই তাঁদের মত। নান্ বলছেন, "সহজ সংস্কার হচ্ছে জন্মগত কোন নির্দিষ্ট ক্রিয়ার দিকে ঝোঁক। এ সংস্কার বা ঝোঁক থেকে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট

---

১৭ Any definition of instinct, then, which omits this essential element of emotional experiences is bound to be incomplete. Ross—Educational Psychology

১৮ In the classic definition of Lloyd Morgan, instinctive behaviour involves: (i) The performance of complex trains of activity, engaging the whole organism, which (ii) are of biological value to the species, (iii) are similarly performed by all members of the species and (iv) do not have to be learned—they are performed perfectly (or at least adequately) at first attempt. Lloyd Morgan—Habit and instinct

বুদ্ধি ও সহজ সংস্কার—সহজ ক্রিয়া যদি অন্ধ অচেতন প্রক্রিয়া না হয়, তবে তার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ কি? পূর্বে এ কথাই মনে করা হত, যে সহজ সংস্কার ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ চালিত হয় বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা, আর পশুরা চালিত হয় সহজ সংস্কার -দ্বারা। কিন্তু বর্তমান কালে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সংস্কার ও বুদ্ধির মধ্যে সীমারেখাটা পাকা নয়। খিদে পেলে খাদ্যসংগ্রহ সহজ সংস্কার, কিন্তু এই খাদ্যসংগ্রহ প্রাণী নির্বিচারে করে না, তাতে গ্রহণ-বর্জন অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ আছে। স্টাউট্ বলেন, সহজ ক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্ধ আবেগ বা যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এটা সত্য, সহজ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য -সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতা প্রাণীর থাকে না। এ দিক থেকে তাকে কিছুটা অন্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু খুব নিকট ভবিষ্যৎ, অন্তত পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা প্রাণীদের আছে,—তাদের ব্যবহারে এ কথা অনুমান করা যায়। পাখী বাসা গড়তে খড়কুটো সংগ্রহ করে। নিশ্চয়ই এতটা বিবেচনা তার ক্রিয়ার পেছনে নেই যে ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু খড়কুটো তার কাজের উপযুক্ত মশলা, এ অস্পষ্ট জ্ঞান তার আছে। তারপর সব খড়কুটোই সে গ্রহণ করে না, সে বাছাই করে। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে সে কিছুটা স্মরণ রাখে এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়ার পরিবর্তন করে। দেখা যায় মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়ে সামনে পোকামাকড়, ইটের টুকরো সবই নির্বিচারে ঠোঁট দিয়ে ঠোকে (pecking), কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় সে ইটের টুকরো বা পাথর ঠোকে না। একরকম শুঁয়াপোকা আছে তাদের নাম সিনাবার ক্যাটরপিলার্স (cinnabar caterpillars), এগুলি মুরগীর খাদ্য নয়। প্রথমবার মুরগীর বাচ্চা এই শুঁয়াপোকাকেও ঠোঁট দিয়ে ঠুকে মুখে তোলে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দেয় আর ভবিষ্যতে কখনও এরকম শুঁয়াপোকাতে তারা মুখ দেয় না।

---

plastic, so that these may be ready adaptation to changes in environment. In past ages it was universally advantageous for fish to take all worms and grasshoppers dropping into the stream; but when man came on the scene with hooks, the instinct often had bad results. Probably the native instinct to snap at every worm has been destroyed; but the more intelligent fish have the instinct modified, by experience, as many fisherman can testify. Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 43

ইতর প্রাণীরাও 'শেখে'। অবস্থার পরিবর্তনে সহজ ক্রিয়াও অনেক সময় পরিবর্তন হয়। জৈব প্রয়োজনের তাগিদে এরকমটা হতে বাধ্য। যে প্রাণী এ রকম পরিবর্তন করতে পারে না তার ধ্বংস অনিবার্য। বাস্তবিক পক্ষে এ রকম ঘটনা জীবজগতের ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে, তার সাক্ষ্য ভূগর্ভস্থ স্তরে অধুনা-বিলুপ্ত বহু জাতির আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পেরেছি। কাজেই তারা সম্পূর্ণ সহজ সংস্কারচালিত এবং সহজ সংস্কার সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনার লেশশূন্য এ কথা সত্য বলে মনে হয় না।[২৩]

বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজ সংস্কারকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে—কথনো কথনো তাকে লুপ্ত বা রুদ্ধ করে দেয়। যে সমস্ত প্রাণী শিকার ধরে, যেমন সিংহ, তারা তাদের বাচ্চাদের শেখায়। তারা আহত জন্তু বাড়ী নিয়ে আসে এবং তাদের ওপর বাচ্চারা দাঁত ও নখ ব্যবহার করতে শেখে। সিংহশাবক আরও বড় হলে বাবা-মা ওদের শিকার-অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যায়। তারা তখন অনুকরণ আর অভ্যাসের দ্বারা শেখে।[২৪]

মানুষে সহজ সংস্কার আছে কি?—প্রাচীন মনোবিদ্‌রা মনে করতেন পশু ও মানুষের মধ্যে একটা পাকাপাকি বিভেদ আছে। মানুষ পশুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জগতের প্রাণী। পশু অন্ধ সহজ সংস্কার -দ্বারা চালিত আর মানুষ বিচারের ক্ষমতাযুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণী—তার সমস্ত ক্রিয়া স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকডুগ্যাল তাঁর 'সোশ্যাল্ সাইকোলজী' গ্রন্থে প্রথম স্পষ্টভাবে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন মানুষ ও পশুতে মূলত কোন প্রভেদ নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম আত্মরক্ষা ইত্যাদি আদিম জৈব প্রবৃত্তি পশুতে যেমন আছে, মানুষের তেমনি আছে। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ক অনেক বেশী বিকাশ- ও জটিলতা-লাভ করেছে। মানুষের বিকশিত বুদ্ধি এই ক্রমবিবর্তনের ফল। এর জন্যই মানুষের আদিম সংস্কারগুলির আদিম স্থূলরূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এত পরিবর্তন যে এখন তাদের আর প্রায় চেনাই যায় না। মানুষ শিক্ষা ও অভ্যাস -দ্বারা সংস্কারগুলির প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণতর করতে পারে—কথনো কথনো সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়া বন্ধ করতে পারে।

---

২৩ Stout—Manual of Psychology, p. 148

২৪ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study

ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে স্থূল অবাঞ্ছনীয় আদিম কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝা-পড়া করে তাকে সূক্ষ্ম কল্যাণকর সৃজনকর্মে (fine aesthetic creation) পরিণত করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম।

ইতিপূর্বে আমরা সহজ সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানসম্মত এবং মনোবিদ্যা-সম্মত দুটি পৃথক ব্যাখ্যার উল্লেখ করছি। ম্যাগডুগ্যাল্‌ যখন মানুষে সহজ সংস্কারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তখন তিনি মনোবিদ্যাসম্মত মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সহজ সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নয়—সহজ সংস্কার-জনিত ক্রিয়ার বুদ্ধি আবেগ ইচ্ছা এই তিনটি মন-স্তাত্ত্বিক উপাদানই উপস্থিত থাকে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের সহজ সংস্কার কটি তা নিয়েও বহু মতভেদ। ফ্রএড্‌পন্থীরা বলবেন, এক আদিম কামই সমস্ত সংস্কারের মূল। ম্যাগডুগ্যাল বলেছেন, জীবনের চোদ্দটি মৌল প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত চোদ্দটি প্রধান সংস্কার। উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ মানুষের সহজ সংস্কারের এক লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। তাঁর মতে পরিচ্ছন্নতার আকাঙ্ক্ষাও একটি মানবিক সংস্কার।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মতের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা আছে—(১) এতে পুরাতন 'ফ্যাকাল্‌টি সাইকোলজী'র গন্ধ পাওয়া যায়, (২) তাঁর বর্ণিত সহজ সংস্কারগুলিতে যে প্রবণতা আছে তারা এত বিভিন্ন যে তাদের একই দলে ভুক্ত করা অনুচিত, (৩) শিশুদের যে ক্রিয়াগুলিকে তিনি সহজ সংস্কার-জনিত ও আন্তরিক (instinctive and innate) বলেছেন, সেগুলি শৈশবে অনুকরণ-দ্বারা শিক্ষালব্ধ এও হতে পারে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ অনেক সময় অসতর্কভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তিনি সংস্কারগুলিকে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন শক্তি বলে মনে করেন নি। শিশুর অনেক ক্রিয়ায় শিক্ষার প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে মানুষে কোন আদিম সংস্কার সহজাত নয় একথা বলা চলে না।

শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা সহজ ক্রিয়ারূপ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ই যে শুধু পরিবর্তন হয় তা নয়—তার উদ্দেশ্যও (goals) পরিবর্তিত হয়। নিম্নতর প্রাণীতে যে উদ্দেশ্যগুলি জীবনের আদিম প্রয়োজন-নির্দেশ করে, মানুষের বুদ্ধি শিক্ষা অভ্যাস সেই উদ্দেশ্যের বিকল্প সৃষ্টি করে নেয়।[২৫] এমনি

[২৫] Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 186

করেই মানুষের জীবন পশুর জীবনের চেয়ে সমৃদ্ধতর এবং বিকাশের অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধি শিক্ষা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে আদিম সংস্কারগুলি একদিকে যেমন উচ্চতর সূক্ষ্মতর স্তরে উদ্গতি লাভ করে, তেমনি দুর্বুদ্ধির তাড়নায় তা আবার নানা অদ্ভুত বিকৃতির রূপও নিতে পারে।[২৬]

মানুষের সহজ সংস্কার—মানুষও প্রাণী, কাজেই অন্যান্য প্রাণীদের মতো তারও জীবনের মূল উৎস হচ্ছে সহজ সংস্কার। কিন্তু বুদ্ধির পরশ-পাথরের ছোঁয়া লেগে তাদের এমনি রূপ পরিবর্তন ঘটে যে তাদের আর চেনাই যায় না। মানুষের সহজ সংস্কারের এই আত্মগোপন ও অলংকরণকেই বলে সভ্যতা। অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষের ক্ষুধা আছে, তার পরিতৃপ্তিও স্বভাবতই সে খোঁজে, কিন্তু এই তৃপ্তিকে সে শোভন করেছে নানা সামাজিক রীতি ও আচারে। মানুষের সঙ্গমেচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে মানুষ বুদ্ধি লজ্জার আবরণ দিয়ে, কাব্যের অলঙ্কার দিয়ে সুন্দর করে। একেই ফ্রয়েড্‌পন্থীরা বলেন উদ্গতি (sublimation)।

সহজ সংস্কার ও অভ্যাস—বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজ ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে, তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসে পরিণত করে। লয়েড মর্গ্যান্ বলেছেন যে সমস্ত মাছ বাইরে থেকে খাওয়ানোতে অভ্যস্ত, তারা পুকুরের কাছে কেউ এলেই ভেসে ওঠে আর খাবার ঠুকরে খেতে তৈরি থাকে।[২৭]

উইলিয়ম জেম্‌স্ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজ সংস্কারকে সদভ্যাসে পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ উপলক্ষে একটিকে তিনি বলেছেন, সহজ সংস্কারের অনিত্যতা (The law of transitoriness of instincts) যথা, স্তন্যপান-প্রবৃত্তি একটা বয়সের পরে আপনিই চলে যায়। আর একটিকে বলেছেন,

---

২৬ There are many reasons to believe that human instincts, in general, though based on reflex activities, are moulded by experience to a large degree. The tragedy of sex perversions or misdirected maternal feelings shows how, under conditions of human civilization, not only preparatory but even consummatory responses may get attached to stimuli other than those which represent the best biological adaptation.···The prparatory responses are much more affected by learning than the consummatory ones are. For example, we learn to eat with knife and fork, but the stomach does not have to learn to digest. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 64

২৭ Lloyd Morgan—Habit and Instinct, p. 96

অভ্যাস -দ্বারা সহজ ক্রিয়ার রোধ (The law of inhibition of instincts by habits)। তাঁর মতে সহজ ক্রিয়াকে অভ্যাস -দ্বারা রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা যায়।[২৮] স্তন্যপান মানবসন্তানের স্বাভাবিক সহজ সংস্কার। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এ সংস্কারকে সংযত বা বৃদ্ধি করা যায়।

সহজ সংস্কার ও প্রতিবর্ত (Instincts and Reflexes)—কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সহজ সংস্কারকে অন্ধ এবং জটিল প্রতিবর্ত বলে মনে করেন। পূর্বেই বলেছি প্রতিবর্ত হচ্ছে জরুরী অবস্থায় বাহ্য উদ্দীপকের ফলে প্রাণীর দেহযন্ত্রের ক্ষিপ্র ও বিবেচনাহীন প্রতিক্রিয়া। নাকে নস্য দিলে তৎক্ষণাৎ হাঁচির উদ্রেক হয়।

যদি সহজ ক্রিয়া সম্পর্কে "যে কোন অশিক্ষিত ক্রিয়া" (any unlearned activity) এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় তাহলে প্রতিবর্তকেও সহজ বলতে হয়। দুইএর তফাত শুধু জটিলতার পরিমাণে, এবং সহজ ক্রিয়াকে বলা যায় "প্রতিবর্ত শৃঙ্খল" (a chain of reflexes)। ওয়াটসন্ সহজ সংস্কারের অর্থ করেছেন, "জন্মগত ও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, যা উপযুক্ত উদ্দীপকের আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান।"[২৯] এ মত সকলে গ্রহণ করেন নি। কোন কোন বিজ্ঞানী প্রতিবর্ত ও সহজ ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদগুলি লক্ষ্য করেছেন :

১। প্রতিবর্ত সর্বদা নির্ভর করে বাহ্য উদ্দীপকের (external stimulus) ওপর। সহজ ক্রিয়ার বেলায় বাহ্য উত্তেজক উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আভ্যন্তরিক অস্বস্তিও (an internal uneasiness) বর্তমান থাকে। যদিও এ ক্রিয়াগুলি যথাযথ বাহ্য উত্তেজক থেকেই শুরু হয়, তথাপি এগুলি আভ্যন্তরিক কতকগুলি অবস্থা বা উত্তেজকের ওপর নির্ভরশীল।[৩০]

২। প্রতিবর্ত দেহযন্ত্রের সামান্য একটা অংশের উত্তেজনার ফল, কিন্তু সহজ ক্রিয়ার সঙ্গে সমগ্র দেহযন্ত্র, অন্তত তার একটা বৃহৎ অংশের সম্বন্ধ আছে।

৩। প্রতিবর্তের প্রক্রিয়াগুলি সরল ও মৌলিক এবং তাদের পরিবর্তন বড় ঘটে না। কিন্তু সহজ ক্রিয়া জটিল এবং যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার ক্রিয়াগুলিও অপরিবর্তনীয়,—সব ক্ষেত্রে তা নয়।

২৮ Wm. James—Principles of Psychology, Vol. II, p. 394
২৯ Watson—Psychology from the Standpoint of a Behaviourist, p. 231
৩০ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study

৪। প্রতিবর্ত দেহযন্ত্রের একটা সামান্য অংশের মঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সহজ সংস্কারের ওপর সমগ্র জীবদেহের মঙ্গল নির্ভর করে। "ধুলো পড়তে থাকলে চোখ বোজা বা হাতের ওপর গরম জল পড়লে তৎক্ষণাৎ হাত ঝাঁকুনী দেওয়া, শুধুমাত্র চোখ বা হাতটিকেই রক্ষা করে, কিন্তু খাদ্য-গ্রহণে শুধু মুখেরই উপকার নয়, সমস্ত দেহেরই উপকার; তেমনি বিপদ থেকে পলায়ন শুধু পা দুটিকেই রক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণীকেই রক্ষা করে।"[৩১]

সহজ সংস্কার এবং প্রকৃতির প্রতিবর্ত জীবরক্ষায় উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান ও মৌলিক অস্ত্র এবং দুইই সাধারণত জীবনের সরল অবস্থায় অত্যন্ত উপযোগী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভ (Instinct and Emotion)—জৈব প্রয়োজনসাধনে সহজ সংস্কারের উপযোগিতার কথা অনেকবার বলা হয়েছে। সহজ সংস্কারকে বুদ্ধি বা অনুভূতি বা মনের অন্য প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য (adjustment to the environment)। সহজ ক্রিয়া এই মূল উদ্দেশ্যসাধনের একটি প্রধান উপায় সত্য কিন্তু একমাত্র উপায় নয়, এবং এই উদ্দেশ্য-সাধন অনুভূতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে হতে পারে না। ম্যাকডুগ্যাল্-এর মতে অনুভূতিই সহজ ক্রিয়ার প্রাণ। অনুভূতি ও প্রক্ষোভই সহজ ক্রিয়ার গতি- ও প্রকৃতি-নির্দেশ করে দেয়। "সহজ সংস্কার মনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শক্তি নয়, এরা হচ্ছে প্রাণীর পক্ষে তার পরিবেশকে বুঝতে পারার সাধারণ ক্ষমতা, যা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন, আর তার পরিবেশের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে সক্রিয়।"[৩২] মাইকেল ওয়েস্ট বলেছেন, "সহজ সংস্কার হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবার মৌলিক ক্ষমতা।"[৩৩] রস্ বলেছেন, "ম্যাকডুগ্যাল-এর যুক্তির বিশেষ কথাটি হচ্ছে তাঁর এ বিষয়ের ওপর জোর যে, প্রত্যেক সহজ ক্রিয়ার অপরিবর্তনীয় মূল কেন্দ্র হচ্ছে বিশেষ একটি প্রক্ষোভ।"[৩৪]

সংস্কারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Instincts)—ম্যাক্-ডুগ্যাল্-এর যুক্তি অনুসারে সহজ সংস্কারগুলি হচ্ছে জীবনের অপরিবর্তনীয়

---

৩১ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 34

৩২ Nunn—Education, p. 157

৩৩ M. West—Education Psychology, p. 192

৩৪ Ross—Educational Psychology, p. 63

মৌলিক অনুভূতিগুলির অঙ্গাঙ্গিভূত প্রকাশ। এক একটি প্রধান আবেগের সঙ্গে এক একটি সহজ ক্রিয়া তাই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তিনি চৌদ্দটি প্রধান প্রক্ষোভ এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত এক একটি সহজ ক্রিয়ার নাম দিয়েছেন। এই আবেগগুলিকে তিনি বলেছেন মৌলিক প্রক্ষোভ। আবার একাধিক অনুভূতি যেখানে মিশ্রিত হয়েছে সেখানে একাধিক সহজ ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হবে তাদের প্রকাশ। এই প্রকার মিশ্র অনুভূতিকে তিনি বলেছেন মধ্যম পর্যায়ের প্রক্ষোভ (secondary emotions)। তিনি সহজ ক্রিয়া ও প্রক্ষোভের সম্বন্ধসূচক যে পরিচ্ছন্ন তালিকাটি দিয়েছেন তা নিচে দেওয়া হল :

সহজ সংস্কার (Instincts)	সহজ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভ (Emotional qualities accompanying the instinctive activities)
পলায়ন (Escape)	ভয় (Fear)
যুযুৎসা (Combativeness)	ক্রোধ (Anger)
ঘৃণা, বিকর্ষণ (Repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
বাৎসল্য (Parental)	স্নেহমমতা (Tender Emotion)
অনুনয় (Appeal)	দুঃখ (Distress)
যৌনতা (Mating)	কাম (Lust)
কৌতূহল (Curiosity)	বিস্ময় (Wonder)
বশ্যতা, আনুগত্য (Submission)	হীনমন্যতা, আত্মাবমাননা (Negative self-feeling)
আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self-assertion)	আত্মগৌরব-বোধ (Positive self-feeling)
যূথচরতা (Gregariousness)	একাকিত্ব-বোধ (Feeling of loneliness)
খাদ্যান্বেষণ (Food-seeking)	ক্ষুধা, আস্বাদন (Gusto)
সঞ্চয় (Acquisition)	স্বাধিকার-বোধ (Feeling of ownership)
নির্মাণ বা গঠন (Construction)	সৃজনীস্পৃহা (Feeling of creativeness)
হাস্য (Laughter)	আনন্দ (Amusement)[৩৫]

৩৫ McDougall—An Outline of Psychology, p. 324

সহজ সংস্কার হচ্ছে জীবনের মূল উৎস—তাই সহজ ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞান প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা (Cognition, Emotion and Conation) এই তিন চিহ্ন বর্তমান। তাই সহজ সংস্কারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌, "সহজ সংস্কার হচ্ছে প্রাণীর মজ্জাগত গঠন, যার ফলে তার এক শ্রেণীর দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সে দ্রব্যের উপস্থিতিতে সে প্রক্ষোভের উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাতে কোন বিশেষ ধরনের কর্মপ্রবৃত্তি জাগে। এর প্রকাশ হয় সে দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর ব্যবহারের বিশেষ ধরনে।"[৩৬] প্রক্ষোভ ও সহজ ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাকডুগ্যাল-এর মত সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, ড্রেভার (Drever) এ কথা অস্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে সহজ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রক্ষোভের নিয়মিত সম্পর্ক নেই। যেখানে সহজ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেই প্রক্ষোভ দেখা দেয়। যেখানে যুযুৎসা (combativeness) সেখানে ক্রোধ (anger), এটা ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মত। কিন্তু যুযুৎসা থাকলেও ক্রোধ না থাকতে পারে। খাবার কেড়ে নিলে কুকুর রেগে যায়। এখানে সহজ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে অনুভূতি দেখা দিল। কিন্তু যেখানে কুকুর ক্ষুধার্ত নয়, সেখানে তার সামনে থেকে খাদ্য সরিয়ে নিলে কুকুরের ক্রোধের সঞ্চার হয় না। "যেমন ক্রোধের সঙ্গে যুযুৎসার সম্বন্ধ অনিবার্য নয়, তেমনি ভয়ের সঙ্গে পলায়নের সম্বন্ধও নিত্যনিয়ত নয়—এ-সম্বন্ধ অনিয়মিত।"[৩৭] হেড্‌ (Head) এবং মায়ার্স (Myers) -এর মতে মনের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে সহজ সংস্কারের আগে প্রক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তাই তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ আছে এ কথা সত্য নয়, যদিও অনেক সময়ই তাদের একত্র দেখা যায়।[৩৮] উইলিয়ম জেম্‌স্‌ সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভের প্রভেদ সম্বন্ধে লিখেছেন, "প্রক্ষোভ হচ্ছে বিশেষ ধরনের অনুভব, আর সহজ ক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের ক্রিয়া।" আরও বলেছেন, "প্রক্ষোভ সহজ ক্রিয়ার

---

৩৬ ...an innate dis-position which determines the organism to perceive (pay attention to) any object of a certain class, and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which finds expression in a specific mode of behaviour in relation to that object. McDougall—An Outline of Psychology, p. 11

৩৭ Nunn—Education, p. 176

৩৮ C. S. Myers—An Introduction to Experimental Psychology

তুলনায় পশ্চাদ্‌বর্তী, কারণ প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া প্রাণীর নিজ দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সহজ ক্রিয়া আরো দূরপ্রসারী, কারণ তা উত্তেজনার বিষয় যে দ্রব্য, তার সঙ্গে নানা 'কেজো' ভাবে সংযুক্ত।"৩৯

সহজ সংস্কারের সঙ্গে প্রক্ষোভের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলেও ম্যাকডুগ্যাল্ যেভাবে সহজ ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা অনেক মনোবিজ্ঞানীর মনঃপূত নয়। কেউ কেউ বলেছেন ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে ম্যাকডুগ্যাল্-এর শ্রেণীবিভাগ অতিমাত্রায় সরল। অনুভূতি ও সহজ সংস্কারের জটিল মূল জীবনের সর্বপ্রক্রিয়ার মধ্যে এমন সুদূরপ্রসারী যে তাদের এত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া যে পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক ছক্ কেটে তিনি মৌলিক প্রক্ষোভ থেকে মধ্যম পর্যায়ের প্রক্ষোভ এবং তাদের জোড় দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের প্রক্ষোভের তালিকা তৈরি করেছেন, তাতে অনেকে পুরানো 'ক্যাকাল্টি' মতবাদের গন্ধ পেয়েছেন। ম্যাকডুগ্যাল্ প্রথম সাতটি সহজ সংস্কার ও সাতটি মৌলিক প্রক্ষোভ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে করেন চৌদ্দ। কিন্তু তাঁর এই "চৌদ্দ-দফা দাবির" বিরুদ্ধে চুদিক্ থেকে অভিযোগ এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহজ সংস্কার বলতে ম্যাকডুগ্যাল্ যখন কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া দুইই ধরছেন তখন সহজ সংস্কারের সংখ্যা অনেক বেশী। আমরা পূর্বেই দেখেছি উইলিয়ম জেম্‌স্ সহজ ক্রিয়াকে অভ্যাসের দাস বলে মনে করেছেন এবং সহজ ক্রিয়াগুলোকে বলেছেন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অভ্যাস, এবং তাঁর মতে সহজ ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতার আকাঙ্ক্ষাও একটা সহজ সংস্কার। প্রেয়ার-ও সহজ ক্রিয়ার এক লম্বা তালিকা দিয়েছেন। "প্রেয়ার সহজ সংস্কারের তালিকায় পাঁচমিশেলী নানা ক্রিয়ার যে ফর্দ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত থেকে পৃথক করা মুশকিল। আবার তিনি এমন ক্রিয়ারও নাম দিয়েছেন যেগুলি মূলত সহজ হলেও তাদের সম্পূর্ণ প্রকাশের পেছনে বুদ্ধির সহযোগিতা প্রয়োজন।"৪০

---

৩৯ An emotion is a tendency to feel and an instinct is a tendency to act. আরও বলেছেন,—Emotions fall short of instincts in that the emotional reaction usually terminates in the subject's own body, whilst the instinctive reaction is apt to go farther and enter into practical relations with the exciting objects. W. James—Principles of Psychology, Vol. II, p. 442

৪০ Drummond—The Child

আবার এক বিপরীত দিকে আমরা দেখি ফ্রয়েড একটি মাত্র মূল সংস্কার স্বীকার করেছেন, এবং সে হচ্ছে আদিম কাম (Libido or Sex-instinct)।

আমরা পূর্বেই বলেছি, সহজ সংস্কারগুলোকে কতকগুলি বিভিন্ন শক্তি বলে আমরা মনে করি না। এরা হচ্ছে জীবনের প্রয়োজন মেটাবার কতকগুলি মূল উপায়। তাই এটা বিশ্বাস করা সহজ যে ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহজ সংস্কারেরও ক্রমবিকাশ আছে। প্রথম প্রাণের বিকাশ দেখা দিয়েছে অত্যন্ত সরল এক কোষবিশিষ্ট প্রাণকণা অ্যামিবাতে (amoeba)। তাদের না আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ, না আছে অনুভূতি বা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য। সেই আদিম প্রাণীর মধ্যে সহজ দুটি ক্রিয়া বা সংস্কার আমরা দেখি, সে হচ্ছে গ্রহণ ও বর্জন। তখন সম্ভবত স্পর্শ ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় ছিল না,—মস্তিষ্কের বিকাশ তখন হয় নি, কাজেই তাতে ছিল না বুদ্ধির দীপ্তি,—ছিল না বিচার-বিবেচনা। ছিল কেবল জীবনের আদিম প্রয়োজনে জীবনরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি। কিন্তু ক্রমবিকাশের গতিতে জীবনেরও জটিলতর হল। এল বহুপ্রাণের অনুভূতি, সঙ্গে সঙ্গে মূল সহজ সংস্কারগুলিও এই ডালো-পালা মেলা অনুভূতির জালে জড়িয়ে জটিল ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করল। ক্রমে এল দেহযন্ত্রের আরো জটিলতা, হল মস্তিষ্কের বিকাশ—বুদ্ধির বিকাশ। সহজ সংস্কারের সংখ্যা ও জটিলতা তাই বেড়ে গেল। কারণ যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই বিচার (choice), সেখানেই ব্যক্তির পৃথকত্ব বিশেষত্ব (personality, separateness, variety)। কাজেই ম্যাকডুগাল্-এর পরবর্তী যুগে অনেকেই কতকগুলি বাঁধাধরা সহজ প্রবৃত্তির ছকে মানুষের জীবনকে ফেলে দেখতে অস্বীকার করেছেন। অলপোর্ট (Allport) বলেন, "কতকগুলি প্রেরণা (motive) আছে, যাদের বিকাশ বা স্ফুরণের পেছনে হয়তো কতকগুলি আদিম জন্মগত সংস্কার আছে, কিন্তু তাদের থেকে পরবর্তী এই প্রেরণাগুলি স্বাধীনভাবে ও নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে, তারা মানুষের চেষ্টার ফলে পরিবর্তনীয়। প্রেরণা বা আগ্রহগুলি নানা প্রকারের, স্বপ্রধান ও বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিপোষক। কিন্তু যদিও অতীত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার থেকেই এদের জন্ম, তথাপি এদের ক্রিয়াশীলতা অতীতের বন্ধনমুক্ত হতে পারে।"[৪১]

---

৪১ G. W. Allport—Attitudes, Handbook of Social Psychology. (Ed. C. Marchison)

মানুষ সহজ প্রবৃত্তির বশে কাজ করে,এ কথা না বলে কতকগুলি মূলচাহিদার প্রেরণায় কাজ করে, সেগুলি অপরিবর্তনীয় নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের ওপর সমাজের প্রভাবকে অনেকটাই মেনে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ পার্সি নান্ (Percy Nunn) ও মনস্তত্ত্ববিদ্ সিরিল বার্ট (Cyril Burt) মানুষের জীবনের মূল চাহিদাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু এঁদের মতে এই চাহিদাগুলিও জন্মগত, যদিও তাদের পরিবর্তন সম্ভব।[৪২] পৃথিবীর সন্তান মানুষ কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায়। হয়তো তাদের ঠিক পরিচ্ছন্ন একটা ছকে ফেলা যায় না, যেমন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ ফেলেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি ও শিক্ষার ফলে ঐ সংস্কারগুলি পরিবর্তিত হলেও তাদের প্রভাব মানুষের জীবনে অসীম।

সহজ সংস্কার ও শিক্ষা (Instinct and Education)—পূর্বে 'শিক্ষা' বলতে বোঝা যেত শুধু বুদ্ধির চর্চা। অর্থাৎ মানবমনের এই বৃত্তিটিকে জীবনের অন্য সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন করে তার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টাই ছিল শিক্ষকের কর্তব্য। কিন্তু ধীরে ধীরে এ মতের পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষকরা বুঝতে পেরেছেন মনের বৃত্তিগুলির কতকগুলিকে প্রয়োজনীয় আর কতকগুলিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে বিভিন্ন কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের যে মূল উপাদান তাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাটা হাওয়ার ওপর দুর্গ তৈরির মতো নিষ্ফলা। বিশেষ করে, ক্রমবিকাশবাদ মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এ বোধ যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে 'শুধু' বুদ্ধি তার কৌলিন্য হারিয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিতান্ত অপাঙক্তেয় সহজ সংস্কার ও অনুভূতি উত্তরোত্তর মর্যাদালাভ করেছে। ফ্রএড্-এর যুগান্তকারী আবিষ্কার—অবচেতন মনই চেতনমানস ও ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি—শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবমনের আদিম বৃত্তিগুলির দিকে শিক্ষাবিদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অতীতের শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার ও অপূর্ণতার একটি প্রধান কারণ শিক্ষার উপায় সম্পর্কে এই ভুল ধারণা। রুসো বলেছিলেন, শিক্ষা হতে হবে স্বভাব-অনুযায়ী। কাজেই মানুষের স্বভাবের যা মূল ভিত্তি তা শিক্ষারও মূল উপাদান। তাই তো শিক্ষকের জানা চাই মানুষের মধ্যে কি সহজ সংস্কার আছে, তাদের স্বরূপ কি, কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগাতে

৪২ C.Burt—the Case for Human Instincts, British Journal of Educational Psychology, 1941, pp. 155-72.

পারি। "এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিক্ষাবিদের কাছে মানুষের সহজ সংস্কারগুলির স্বরূপ জানা একান্ত দরকার, কারণ সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি।"[৪৩]

ব্যবহারের আলোচনায় সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভগুলির খুবই গুরুত্ব রয়েছে; কাজেই শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার ব্যবহার-নির্ধারণে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। "চরিত্র-গঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি, সুতরাং শিক্ষকের প্রতি কাজেই এদের ব্যবহার করতে হয়···কাঠ পালিশ করতে যেমন কাঠের রগের উল্টোদিকে কাজ করা যায় না তেমনি শিক্ষককেও কাজ করতে হয় সহজ সংস্কারগুলির সহযোগিতায়, বিপরীত পথে নয়।" (The educator must work with the grain, not against it.)[৪৪]

বাল্যকালে মানবশিশু অন্যান্য ইতর পশুপ্রাণীর শাবকের চেয়ে অনেক বেশী অসহায়, কারণ তার ইন্দ্রিয়াদি অপরিণত, তার শক্তি অপরিস্ফুট, তার সহজ সংস্কার অনেক কম বিকশিত। কিন্তু ইতর প্রাণীর শাবকেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কার্যকরী সহজ সংস্কার ও শক্তি নিয়ে জন্মায়। প্রকৃতি তাদের হয়ে লড়াই করে। তাদের পরিবেশ অনেক কম জটিল, তাদের কাছে 'সমস্যা' খুব বেশী নেই, তাদের পরিবেশের উপযুক্ত দৈহিক গঠন ও শক্তি দিয়েই প্রকৃতি তাদের পৃথিবীতে পাঠায়। কিন্তু এতে মনে হতে পারে সুবিধাটা বুঝি পশুদেরই। কিন্তু ফলত দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রাণীশ্রেষ্ঠ। তার কারণ তার শক্তিগুলি অপূর্ণ হলেও অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। তার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং বিচার-বিবেচনা -দ্বারা সে নতুন অবস্থার মধ্যে নতুন পথ তৈরি করে নিতে শেখে। **"ক্যাঙ্গারু-শাবকের মতো মানবশিশুর অসহায়তা শুধু অ-পরিণতির ফল নয়।** এটা মানবশিশুর আর একটি গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে গুণটি খুব চমকপ্রদ নয়, কিন্তু তার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর—সে গুণটি হচ্ছে **শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা।**"[৪৫]

মানবশিশুর সংস্কারগুলি নমনীয় (plastic)। শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই সংস্কারগুলিকে নির্দিষ্ট গতি দেওয়া, সীমাবদ্ধ করা, উন্মেষিত ও

---

৪৩ Ross—Educational Psychology, p. 56

৪৪ Ibid, pp. 68-69

৪৫ Ibid, p. 59

উৎসাহিত করা এবং কখনো কখনো, প্রয়োজনবোধে, রুদ্ধ করা। শিশুর বিচারবুদ্ধি বিকশিত নয়, সুতরাং শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। শিশু চুরি করেছে। তাকে নীতিকথার উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা বৃথা। কারণ তার নীতিবোধই তখনো জাগরিত হয় নি। সেখানে তার ভয়ের সংস্কার, লজ্জার সংস্কারের সাহায্যেই তাকে শাসন করে, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে। শিক্ষককে এটা বুঝতে হবে যে "শিশু কাজ করে সহজ প্রবৃত্তির বশে এবং শিশুর সমস্ত কর্মের পিছনের প্রবলতম বেগ—বলা যেতে পারে, একমাত্র আগ্রহ—হচ্ছে এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি। শিশুকে দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টায় সাফল্যলাভ করতে হলে শিক্ষককে এই প্রবৃত্তিগুলির দুয়ারেই হাত পাততে হবে। শিশুর ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণে নীতিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া নিরর্থক, কারণ নীতিজ্ঞান শিশুতে তো বিকশিত হয় নি; বরং তার প্রবৃত্তি,—যেমন, ঘৃণা পলায়ন আত্মপ্রতিষ্ঠা বশ্যতা—এদের সাহায্য নিতে হবে।"[৪৬]

শিশুমনের একটা প্রধান সহজ সংস্কার হচ্ছে কৌতূহল (curiosity)। এ সংস্কার শিক্ষকের একটি প্রধান সহায়। তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে হলে প্রথম অবস্থায় এ অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তাকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করে দিতে হবে। হয়তো অনেক প্রশ্ন শিশু করবে যা নিরর্থক, যা বিরক্তিকর, যা হয়তো বড়দের কাছে মনে হবে অসভ্যতা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক শিশুর প্রশ্নের মধ্যে জানবার ইচ্ছাই থাকে। সে স্বাভাবিক বৃত্তিকে অন্যায়ভাবে রুদ্ধ করলে শিশুর বাড়ন্ত মনকে পঙ্গুই করে দেওয়া হয়। বাস্তবিক অসঙ্গত, অশ্লীল, অসভ্য প্রশ্ন শিশু করে না—কারণ সে বোধই তার নেই। বড়রাই তাদের অসঙ্গত ইঙ্গিত, এবং অকারণ গোপনতা বা এড়াবার চেষ্টা দিয়ে তাদের মনে অন্যায় কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। কাজেই সুশিক্ষক যিনি তিনি একদিকে যেমন শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে উৎসাহ দেবেন, তেমনি তিনি সাবধানে লক্ষ্য করবেন যাতে শিশুর কৌতূহল অনভিপ্রেত বিষয়ে লিপ্ত না হয়। তা করবার প্রধান উপায় প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি এবং শিক্ষকের নিজ চরিত্রের প্রভাব। কখনো কখনো শিক্ষককে কঠোর হতেও হবে—শিশুকে জানতে দিতে হবে কতকগুলি সীমালঙ্ঘন লজ্জাকর, শাস্তিযোগ্য, সুতরাং অন্যায়। প্রথমত শিশুর অনুসন্ধিৎসার নির্দিষ্ট একীভূত কোন উদ্দেশ্য

৪৬ Ross—Educational Psychology, p. 69

যা লক্ষ্য থাকে না। তার প্রথম প্রশ্নগুলি যে কোন দ্রব্য, যে কোন ঘটনা -সম্বন্ধে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা—দ্রব্য ও ঘটনা -সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা একতার অনুসন্ধানে পরিণত করা। "শিশুর কৌতূহলের এ বিপদ আছে যে তা অলস কৌতূহল মাত্র হবে, কারণ শিশুর ক্রিয়াগুলি এখন তো অনির্দিষ্ট; শিশুর স্বভাব হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারেই নাক গলানো। তার অনুসন্ধিৎসার বিষয়ও বিচিত্র, তাই তাকে উৎসাহিত করতে হবে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়মিতভাবে শিখতে, কখনো যদি তাতে আবেগের বাহুল্য থাকে তাতে ক্ষতি নেই। তার শিক্ষার আর একটা দিক হচ্ছে বাস্তব জীবনের সমস্যা-নিরূপণে বিভিন্ন ঘটনা ও দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য-নির্ধারণ,—এতেও তাকে উৎসাহ দিতে হবে।"[৪৭]

শিশুর আর একটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি হচ্ছে গড়ে-তোলা (constructiveness)—সে বালু দিয়ে পাহাড় গড়ে, নদী-গুহা বানায়, কাদা দিয়ে পাখী-মানুষ তৈরি করে। রং-তুলি বা স্লেট-পেনসিল পেলে সে আঁকে ফুল মানুষ ঘোড়া। তার গড়া ঘরবাড়ী, তার আঁকা ছবি আমাদের বয়স্কদের কাছে মনে হতে পারে উদ্ভট অসম্ভব হাস্যকর; কিন্তু শিশুর কাছে সেগুলি ভয়ঙ্করভাবে সত্য, নিখুঁত সুন্দর। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শিক্ষকের আর একটি প্রধান সহায়। শিশুর এই গঠন-প্রবৃত্তিকে শিক্ষক উৎসাহিত করে তার ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করবেন, তাকে সমাজের একজন মূল্যবান কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন। এখানেও প্রথম অবস্থায় দেখা যাবে শিশু যা সৃষ্টি করছে তা খেয়ালী ও উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর এই বৃত্তিকে কার্যকরী উদ্দেশ্যমুখীন করে তোলা, তার গঠনের আবেগকে স্বার্থের ক্ষুদ্র কেন্দ্র থেকে মুক্ত করে সমাজসেবার কাজে লাগানো। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় তাই হাতের কাজের ওপর এত জোর দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ ও মন দুইই বিকশিত ও সুষম হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর আর একটি আনন্দময় সংস্কার—খেলা। শিশু খেলতে ভালবাসে, খেলা দেখতে ভালবাসে, খেলার কথা শুনতে ভালবাসে। বড়দের চোখে খেলা হচ্ছে কাজের বিপরীত—কাজ ফাঁকি দেওয়া। তাই প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষক শুধুই বলেন, "বাঁদর ছেলে, সারাদিন কেবল

---

৪৭ Michael West—Educational Psychology, p. 223

খেলা আর খেলা, আরে মানুষ হতে চাস্ তো খেলা ছেড়ে পড়, আরো পড়। বৃথা সময় নষ্ট করিস্ নি।" এ মূল্যবান্ উপদেশ যাঁরা দেন, তাঁরা ভুলে যান শিশুর কাছে খেলা 'খেলা' নয়, এটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, সবচেয়ে দরকারী কাজ, এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাঞ্চল্য যেমন সহজ আনন্দে উৎসারিত হয়, তাতে কোন শিক্ষক একে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুললে তাকে নিতান্ত অন্ধ ও কল্পনাশক্তিবিহীন বলতে হবে। প্রাচীনেরা বড় জোর খেলাকে শিশুর বাহুল্য-শক্তির প্রকাশের পথ বলে মনে করেছেন এবং নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়, বড় ভয়ে ভয়ে, বড় সাবধানে 'পড়া' ও 'কাজ'-এর ফাঁকে সামান্য কিছু সময় অপচয় করতে রাজী হয়েছেন খেলার জন্যে। শিক্ষার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্যে খেলাকে তাঁরা স্বীকার করেছেন—কারণ নাকি "শুধু কাজ আর কাজ—আর খেলা বারণ—এতে ছেলে ভোঁতা হয়ে যায়" (All work and no play makes Jack a dull boy)। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রায় দুশো বছর আগে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) প্রথম এক অদ্ভুত কথা বললেন যে ছোট শিশুদের স্বচ্ছন্দ আনন্দ ও চঞ্চলতা রুদ্ধ করে দিয়ে বই-পত্র দিয়ে ক্লাসে বসিয়ে বই পড়ানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিশু শিখুক, তার স্বাভাবিক আনন্দের মধ্য দিয়ে। তারপর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনয়ন করলেন মন্তেসরী (Montessori) খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্র করে। খেলাটা শিক্ষার পরিপূরক নয়—খেলাই হওয়া উচিত শিশুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। খেলার মধ্যে শিশুমনের প্রধান ক'টি সংস্কার এসে মিশেছে,—এতে আছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা (self-assertion), যূথচরতা (gregariousness), যুদ্ধেচ্ছা (pugnacity), বাধ্যতা (self-abasement), অনুকরণ (imitation), গঠন (construction), অঙ্গ-সঞ্চালন (locomotion), প্রশংসালাভ ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিকাশ। এ বৃত্তিগুলির সম্যক ও সুষম বিকাশেই তো চরিত্রগঠন। তাই উদার-পন্থী আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা খেলার মধ্য দিয়ে শেখাকেই (play-way in education) সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে স্থায়ী শিক্ষা বলে মনে করেছেন। এ-পরীক্ষা কতদূর সার্থক, ভবিষ্যৎ কাল এর চূড়ান্ত বিচার করবে, তবে এ কাল পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে তাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষা-ব্রতীদের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ আছে।

শিশুর অন্য সমস্ত সহজ সংস্কারকেও শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে পারে। বাহুল্যবোধে সে আলোচনা থেকে বিরত হওয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুভূতি ও প্রক্ষোভ

(Feelings & Emotions)

জীবনের অবিশ্রান্ত ধূসরিমায় প্রক্ষোভ সেই রূপালী আলোর পাড়, যা অকস্মাৎ ঝলসে উঠে নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। প্রক্ষোভহীন জীবন অকল্পনীয়; বোধ হয় অসহনীয়।

প্রক্ষোভের কয়েকটি প্রাত্যহিক উদাহরণ দেওয়া যাক্। "খুকু দেখো—বাবা আমাদের জন্ম কি সুন্দর ছবির বই এনেছে।" হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, অশোক খুকুকে ডেকে আনতে ছুটল। **খুশীতে** আনন্দে উচ্ছল শিশুর রূপ।

"মাগো, বাবাগো, খেয়ে ফেল্লে গো" হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে, দেবযানী মার কাছে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। মা গায়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন মেয়েকে। খেলার মাঠে ষাঁড়ের তাড়ায় বিষম **ভয়** পেয়েছে মেয়ে।

"বাবা, শিগ্‌গির ওঠো, ছাখো আকাশে কেমন এক তারা উঠেছে, তার পেছনে যেন বাঁকানো, মস্ত এক ঝাঁটা বাঁধা।" সিড্‌নীর চোখ দুটী **বিস্ময়ে** বিস্ফারিত। "মা আজ দাদাকে আমি খুন করব। আমার নতুন স্যাণ্ডেল জোড়া পরে বেরিয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করে আনবে। আমার কোন ভাল জিনিস কেনবার জো নেই, এই আহ্লুরে বুড়ো ছেলের যন্ত্রণায়।" **রাগে** গর্জন করে ওঠে সুনন্দা, আলনা থেকে দাদার আমেরিকান কাফ্ সার্টটা টেনে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিল। "সখী রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা! বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শোনে কাহারো কথা।" **প্রেমে** জর্জর বিরহ-বিধুর রাধিকার মনের অবস্থার কাব্যিক বর্ণনা।

ক'টি প্রধান অনুভূতির সাধারণ ও অতি-পরিচিত উদাহরণ। গোড়াতেই উল্লেখ করেছি প্রক্ষোভ আমাদের জীবনের বৈচিত্র্যের আস্বাদ, অচিন্তনীয়তার চমক, "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী" এক মানস-ক্রিয়া। কিন্তু শুধু মানস-ক্রিয়া বলেও এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এর দৈহিক প্রকাশও অঙ্গাঙ্গিভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। প্রক্ষোভের সংজ্ঞা-নির্দেশ করা বাস্তবিকই দুরূহ। ক্ল্যাপারীড (Claparede)

যথার্থই বলেছেন, "প্রক্ষোভের মনস্তত্ত্ব সমস্ত মনোবিদ্যার মধ্যে বেশী জটিল, মনোবিজ্ঞানীরা এর সংজ্ঞা-নির্দেশনে ঘোরতরভাবে মতান্তরিত।"[১]

অথচ প্রক্ষোভ নিয়ে আলোচনা অবহেলা করবার উপায় নেই, কারণ মানুষের জীবনে অনুভূতির মূল্য সামান্য নয়। "ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে বাদ দিলে ঘটনার সবচেয়ে মূল্যবান দিকটাই বাদ দেওয়া হল। মনোবিদ্যা থেকে অনুভূতি ও প্রক্ষোভ বাদ দিলে, যেন মনে হয়, বহু বাদ্যযন্ত্রসম্বলিত সঙ্গীত নাট্যের একটি দৃশ্যচিত্র—সুরহীন এবং অবাস্তব।"[২]

ড্রেভার-এর একটি সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, "প্রক্ষোভ একটি জটিল মানসিক অবস্থা, যাতে বিবিধ প্রকারের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে (নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, নাড়ীর গতিতে, অনালী গ্রন্থির রসক্ষরণে) এবং মনে একটি জোরালো মনোবৃত্তি উদয় হয় যার ফলে বিশেষ কিছু করবার ইচ্ছা জাগে। এই অনুভূতি খুব তীব্র হলে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, এবং অসতর্কভাবে কোন কিছু করবার প্রবৃত্তি হয়।"[৩]

প্রক্ষোভ অনুভূতির সামগ্রিক ও উত্তাল অবস্থা। এ শুধু একটি মনের ভাবের বা শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় না। এর প্রভাব মানুষের সমগ্র সত্তার ওপর। একটু আগে উদ্ধৃত দেবযানীর ভয় পাওয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সে ভয়ে হাঁপাচ্ছে ও কাঁদছে, তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছে, তার মুখ নীল—অভ্যন্তরেও তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে, রসক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ হয়েছে, তার মনের ভাব-পরিবর্তনও জটিল। সে ভীতার্ত, সে ভয়ের বস্তুটির কাছ থেকে পালিয়ে দূরে যেতে চায়, মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয় তার লক্ষ্য ইত্যাদি।

প্রক্ষোভ-এর (emotion) সঙ্গে অনুভূতি-র (feeling) তফাত করা হয়। প্রক্ষোভের একটি অংশ মানসিক অনুভূতিটুকু। যেমন রাগ নামে প্রক্ষোভের মধ্যে শারীরিক উত্তেজনার অংশ অনেকখানি আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষুব্ধতার অংশও কম নয়। ব্যক্তির এই আন্তরিক অবস্থাটিকে (subjective state) বলি অনুভূতি। অনুভূতি কোন শারীরিক পরিবর্তন-নিরপেক্ষ। যেমন একটি ছবি দেখে আমার মনে খুশী বোধ করলাম, এই ভালো লাগাটুকু নিতান্তই

১ Hilman Routlege & Kegan Paul—Emotion, p. 5
২ Woodworth—Psychology, p. 365
৩ Drever—Dictionary of Psychology, pp. 80-81

ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা। প্রক্ষোভে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নির্দিষ্ট শারীরিক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আনন্দে আমরা দন্তবিকাশ করে হাসি, কখনো বা হাততালি দিয়ে উঠি। রসক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে ক্ষরণ হয়—শরীরের পেশীতে চঞ্চলতা জাগে। ভালো-লাগার অনুভূতিতে (feeling) এই দৈহিক পরিবর্তনের অংশটি অনুপস্থিত।

প্রক্ষোভ ও অনুভূতির প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন অনুভূতি সীমান্ত-উদ্ভূত (peripherally excited), কিন্তু প্রক্ষোভ কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী-উদ্ভূত (centrally excited)। অনুভূতির মূলে থাকে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (perception)। যেমন মখমল-মোড়া, গদীতে বসলাম, আরাম অনুভব হল। এটি স্পর্শ থেকে উদ্‌গত অনুভূতি। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখে খুশী হয়ে চীৎকার করে উঠলাম, এ প্রক্ষোভ। এর পেছনে বুদ্ধি বিবেচনা চিন্তা রয়েছে, কাজেই মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুজালকে এ আলোড়িত করে।

প্রাণীর সামগ্রিক শুভাশুভের সঙ্গে প্রক্ষোভের যোগ অনেক বেশী নিবিড়। ক্যানন্ এই কথাটির দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছেন যে প্রক্ষোভগুলি প্রাণীদের পক্ষে জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবার উপযোগী, দেহের, বিশেষত আন্তর যন্ত্রগুলির সামগ্রিক বিষম প্রতিক্রিয়া (emergency reaction)।[৪] সামান্য ভালো-লাগা মন্দ-লাগার মধ্যে এই জরুরী তাগিদ নেই। প্রক্ষোভগুলি দেহের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলিকে সেই সময়ের জন্য স্তব্ধ করে দেয়, বিপর্যস্ত করে দেয় এবং দেহের যে আন্তর ক্রিয়াগুলি (organic responses) সেই জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার পক্ষে উপযোগী তাদের সক্রিয় করে তোলে।[৫]

অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of feelings)—অনুভূতিগুলি এত বিচিত্র আর এদের মধ্যে এত সূক্ষ্ম প্রভেদ বর্তমান, যে এদের শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ ব্যাপার। উডওয়ার্থ-এর অনুসরণে খুব মোটামুটি একটি শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করা যায় :

১। আনন্দ, সুখ, হর্ষ, উচ্ছ্বাস।

২। নিরানন্দ, দুঃখ, বেদনা, বিষাদ, মুষড়ে পড়া।

---

৪ Boring, Langfeld, Weld—Fundamentals of Psychology, p. 94

৫ Attended by great feelings of excitement they disorganise and disrupt other behaviour patterns at the moment. We speak of being 'engulfed', 'overwhelmed' or 'swept away' by emotion. Ibid, p. 94

৩। কৌতুক, মজা, স্ফূর্তি।

৪। উত্তেজনা, আলোড়ন।

৫। শান্তি, সন্তুষ্টি, চুপটি-করা ভাব, নিস্পৃহতা, ক্লান্তি।

৬। সংশয়, সলজ্জতা, অপ্রস্তুত-বোধ, উদ্বেগ, চিন্তা, ভয়, ভীতি।

৭। বিস্ময়, আশ্চর্যবোধ, স্বস্তি, হতাশা।

৮। তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা, ইচ্ছা, চাওয়া, ভালোবাসা।

৯। বিরক্তি, বিদ্বেষ, ঘৃণা।

১০। ক্রোধ, রাগ, গুমরে থাকা, জ্বলে ওঠা ইত্যাদি।

ভুণ্ড-এর মতবাদ—বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড (Wundt) অনুভূতির **তিনটি গুণের (dimension) উল্লেখ করেছেন**। প্রথম গুণ হচ্ছে, ভালো-লাগা মন্দ-লাগা (pleasant-unpleasant), দ্বিতীয়, উত্তেজনা-প্রশান্তি (excitement-calm), তৃতীয় হচ্ছে, প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষার অবসান (expectancy-release)।[৬] বিভিন্ন অনুভূতি এই তিন গুণের বিভিন্ন সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ফল। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের শ্রেণীবিভাগের চেয়ে ভুণ্ড-এর শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সন্তোষজনক হলেও তাকে সম্পূর্ণ বলা চলে না। যেমন অনুভূতির আরেকটা গুণ সহজেই উল্লেখ করা যায়, পরিচিত-অপরিচিত বোধ (familiarity-strangeness)।[৭] তা ছাড়া ফ্যাকাল্টি সাইকোলজির মানসিক রসায়নতত্ত্ব (mental chemistry) -রূপ ভূতের ছায়াও এ শ্রেণীবিভাগে লক্ষিত হয়। এ অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন বিভাগকে টিচ্‌নার (Titchener) গ্রহণ করেন নি। কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর এ বিভাগ স্থাপিত নয়।[৮]

ম্যাক্‌ডুগাল অবশ্য অনুভূতিগুলিকে অল্প কয়েকটি মূল উপাদানে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "রংয়ের বেলায় আমরা দেখি হাজারো রং আছে। তাদের মধ্যে, অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানেই, লক্ষণীয় বিভিন্নতা অনুভূত হয়। তবুও তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক্ বিবেচনা না করে, আমরা তাদের অল্প কয়েকটি রংয়ের সংযোগ-সমন্বয়ে কি করে পাওয়া যেতে পারে

৬ Woodworth—Psychology, p. 404

৭ Ibid, p. 405

৮ Titchener—Textbook of Psychology, p. 155

তা বোঝবার চেষ্টা করি। প্রক্ষোভগুলির বেলায়ও ঠিক সে পথ অবলম্বন করলে দোষ কি ?"

"বর্ণবোধের বেলায় যেমন প্রক্ষোভের বেলায়ও তেমনি দেখি, নানা গুণগত প্রভেদ। এক রং অল্প অল্প করে বদলে গিয়ে অজান্তে অন্য রংয়ে পরিবর্তিত হয় ; তা বলে এ অসংখ্য সামান্য সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ-দ্বারা, অল্প কয়টি মূল গুণে বিভাগ করে নিতে বাধা নেই। এই মূল কয়েকটি গুণ থেকে বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রণের দ্বারা অন্য সবগুলি পাওয়া যেতে পারে। এ কথাগুলি প্রক্ষোভের বেলায়ও প্রযোজ্য।"[৯] ম্যাকডুগাল-এর মতে চৌদ্দটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি বা instinct আছে এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত এক-একটি বিশেষ অনুভূতি থাকে। এদের ম্যাকডুগ্যাল বলেন মৌলিক প্রক্ষোভ। প্রত্যেকটি সহজ প্রবৃত্তি কিছু আবেগের উত্তেজনা সৃষ্টি করে বা বিশেষ একটি গুণসম্পন্ন, এবং প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত তার বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশকে মৌলিক প্রক্ষোভ বলা যেতে পারে।

প্রক্ষোভের চরিত্র (Characteristics of an emotion)—কিছু পূর্বে উল্লেখ করেছি প্রক্ষোভের মধ্যে একটি উত্তেজনা, অন্ধতা ও আলোড়ন আছে। ভুণ্ড-এর ত্রিমাত্রিক গুণ-সীমার মধ্যে প্রক্ষোভকে পাওয়া যায়, কিন্তু ওর দ্বারা প্রক্ষোভের পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। প্রক্ষোভে একই সঙ্গে আন্তর অবস্থা ও দৈহিক অবস্থা উদিত হয়। ভয় পেলে ভয়ের বস্তু থেকে পলায়ন করতে ইচ্ছা হয়, আনন্দিত হলে হাসতে ইচ্ছা করে, রাগে কাউকে আঘাত করতে উদ্যত হই। শুধু ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগার অনুভূতির মধ্যে এই দৈহিক প্রস্তুতিগুলি নেই। উডওয়ার্থ প্রক্ষোভের চরিত্র এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "কোন বিশেষ উত্তেজক এক রকম অবস্থায় মানুষে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়, সেই সাড়া-জাগানো অবস্থাই প্রক্ষোভ। যেমন বিপদের মুখে আমাদের স্বাভাবিক সাড়া ভয় ; বাধাবদ্ধ-অবস্থায় আমাদের সম্ভাব্য সাড়া বিরক্তি। যে যে অবস্থায় সাড়াগুলি উপস্থিত হয়, সে সূত্র ধরেই আমরা প্রক্ষোভগুলিকে চিহ্নিত করতে ও আখ্যাত করতে পারি।"[১০]

প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ আছে—এ সাড়া-দেওয়া আমরা বুঝি কি করে ? বুঝি এ কারণে যে প্রক্ষোভ অনুভূতির একটি অত্যন্ত

---

৯ McDougall—Social Psychology, p. 37

১০ Woodworth—Psychology, p. 411

প্রকাশমান অবস্থা; নানা নির্দিষ্ট দৈহিক প্রকাশের সঙ্গে এ আত্মঘোষণা করে, যেমন, রাগ হলে চীৎকার করে কথা বলা, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা ইত্যাদি।

সুতরাং **"প্রক্ষোভ রাগ আনন্দ কৌতুহল দুঃখ ও বিরক্তি ইত্যাদি সমস্ত অনুভূতির প্রকাশমান অবস্থা—যেখানে ব্যক্তি বিচলিত ও উত্তেজিত হয়েছে"**।[১১]

যেখানে অনুভূতির মেঘ জমছে, কিন্তু তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে উপলক্ষ্য করে তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে নি, তাকে প্রক্ষোভ (emotion) বলব না, বলব **প্রক্ষোভ-পূর্ব অবস্থা (emotional mood)**। যখন সুনন্দা রাগে 'ফেটে পড়ল' তখন অনুভূতির এই স্পষ্ট প্রকাশমান অবস্থাকে বলা যাবে প্রক্ষোভ।

প্রক্ষোভগুলির মধ্যে একটা অশান্ততা আছে। তারা শান্ত যুক্তিবিরোধী। রাগের মাথায় মানুষ খুন করতে পারে।

বিভিন্ন কারণে একই প্রক্ষোভ অথবা একই কারণে বিভিন্ন প্রক্ষোভ উৎপাদিত হতে পারে। অথবা একই ব্যাপারে দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্ষোভ উদ্ভূত হতে পারে। যেমন মোহনবাগানের গোলপোস্টের মধ্যে বল প্রবেশ করতে দেখলে, বিরোধী পক্ষে সমুচ্ছ্বসিত জয়োল্লাস এবং মোহনবাগান-অনুরাগী দলের সমুদ্বেল দুঃখ। তাই প্রক্ষোভকে কোন নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। এর মধ্যে অনেকটা অনির্দেশ্যতা আছে। ধরা যাক্, অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত এক ব্যক্তির পক্ষ হয়ে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমি ঝগড়া করে এলাম, এতে সে ব্যক্তিটি যে খুশী হবে আশা করা অন্যায়। সে হয়তো আমার কাজকে ঔদ্ধত্য মনে করে ভয়ানক বিরক্ত হবে। কিন্তু অন্য একজন ব্যক্তি হয়তো আমার এই কাজের জন্য আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। সুতরাং কোন প্রক্ষোভকে বুঝতে গেলে, ব্যক্তি ও তার সম্পূর্ণ পরিবেশ ভালো করে জানা দরকার। প্রক্ষোভগুলি বিশেষভাবেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

প্রক্ষোভের পরগাছা স্বভাব (Parasitical character of emotions)—স্টাউট প্রক্ষোভের মানসিক লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি

১১ Gates & Jersild—Educational Psychology, p. 82

গুণের কথা বলেছেন। প্রক্ষোভগুলি পরভৃতিকাবৎ। এরা কতকগুলি প্রবল প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রেরণার ওপর নির্ভর করে। যেমন, মাদীকুকুর ছানা কেড়ে নিলে খেপে কামড়ে দেয়। এখানে কুকুরের রাগ—এই অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে অত্যন্ত প্রবল প্রবৃত্তি (instinct)—মাতৃ-স্নেহ।

প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি অঙ্গাঙ্গী—"প্রক্ষোভের প্রকৃতি হচ্ছে যে তারা পরনির্ভর। প্রক্ষোভের পশ্চাতে তার ভিত্তি হিসাবে প্রবল কর্মপ্রবৃত্তি থাকতে হবে।"[১২]

প্রক্ষোভ ও সহজ প্রবৃত্তির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাকডুগাল-এর মত পূর্বে বলা হয়েছে। এই সঙ্গেই বলা যায় প্রক্ষোভের সঙ্গে কর্মের বা কর্মপ্রবৃত্তির একটা নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। রাগ করলে আমরা আঘাত করতে চাই। ভয় পেলে ভয়ের বস্তু থেকে দূরে পালিয়ে যাই। "এও প্রক্ষোভের একটি লক্ষণ যে এ মনের একটা সমগ্র অবস্থা যার অন্তর্গত হচ্ছে কোন কর্ম বা বিশেষ কোন কর্মপ্রবৃত্তি।"[১৩]

তাড়না বা প্রবৃত্তি প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রয়োজনের (specific needs) অভিমুখে তাকে তাড়িত করে। কিন্তু প্রাণী যখন তার প্রয়োজন মেটাবার পথে হঠাৎ বাধা পায় তখন যে আকস্মিক উত্তাল অস্বস্তিকর মানসিক অনুভূতির অবস্থা প্রাণীকে অস্থির করে, তাদেরই বলা হয় প্রক্ষোভ।[১৪]

প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক প্রকাশ—প্রক্ষোভ দৃশ্যমান মানসিক উত্তেজনা, যার ঢেউ সমস্ত অবয়বে লাগে। বিষম রাগের একটি চমৎকার বিবরণ ডারউইন বহু বৎসর পূর্বে দিয়েছেন। এটি আজও মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। "রাগের প্রকাশ নানাভাবে হয়ে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তচলাচলের ক্রিয়া সর্বদাই আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনো বা বেগুনী রং হয়। বুকটা ঘন ঘন ফুলে ওঠে এবং বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র কম্পিত হতে থাকে। উত্তেজিত মস্তিষ্ক পেশীগুলিতে বলসঞ্চার করে, এবং ইচ্ছাশক্তিকে প্রদীপ্ত করে তোলে। মুখ সাধারণত দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়; দাঁতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায়, কখনো

---

১২ Stout—Manual of Psychology, p. 365

১৩ Thouless—General and Social Psychology, p. 74

১৪ When an activity involves overcoming an obstacle, and especially when the overcoming of the obstacle includes a frustrating experience, emotion is likely to arise. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 4

কখনো দাঁতে দাঁত ঘসা হয়। ক্রোধে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা, বা এই জাতীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ। বাস্তবিক পক্ষে আঘাত করবার আকাঙ্ক্ষা কখনো এমন অদম্যভাবে প্রবল হয়, যে জিনিসপত্রে মুষ্ট্যাঘাত করা অথবা সবেগে ভূমিতে আছাড় দিয়ে ফেলা হয়। বিষম ক্রোধের ফলে কম্পন প্রায়ই দেখা যায়, গলার স্বর যেন কণ্ঠে রুদ্ধ হয়। অথবা স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ ও অসঙ্গত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপাল স্পষ্ট ভ্রূকুটিতে আকুঞ্চিত হয়,…চোখগুলি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। অথবা হোমার যেমন বলেছেন, যেন তারা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। কখনো ঠোঁটগুলি বাইরে প্রসারিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোঁট বরং আকুঞ্চিত হয়, এবং তার ফাঁক দিয়ে বিকট হাস্যে বিস্ফারিত দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতগুলি দেখা যায়।"[১৫]

প্রাণীর ক্রমবিবর্তন এবং প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ—প্রক্ষোভের প্রকাশভঙ্গীগুলি জৈব প্রয়োজনসাধনের উপযোগী, এবং ক্রমবিকাশের ধারায় বংশানুক্রমে চলে এসেছে এ কথাটা প্রথম স্পষ্ট করে বলেন ডারউইন। রাগের প্রকাশ—দাঁতখিঁচুনী, গর্জন, আক্রমণ জীবের আত্মরক্ষার সহায়ক। শত্রুকে ভয় দেখাতে বা ধ্বংস করতে এগুলি কাজে লাগে। তেমনি, ভয়ে লুকিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, প্রবলতর শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায়। সভ্য মানুষের কাছে আদিম প্রয়োজনগুলি আজ আর নেই, কিন্তু সেই দাঁতখিঁচুনীটা রয়েই গিয়েছে তার আদিম বংশপরিচয়টা দেবার জন্যে। "ডারউইন-এর মতে ঘৃণা- ও তাচ্ছিল্য-প্রকাশে যে আমরা দাঁত ভেংচাই তার উৎপত্তি প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাক্-মানবযুগে। এ ক্রিয়াটি প্রাণীর জীবনরক্ষার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। প্রাণীর মধ্যে দাঁতখিঁচুনী হচ্ছে কামড়ে দেবার পূর্বের অবস্থা ; এতেই অনেক সময় শত্রুকে যথেষ্ট ভয় পাইয়ে দেওয়া হত ; বাস্তবিক আক্রমণ আর প্রয়োজন হত না। ডারউইন-এর মতে যদিও দাঁত দিয়ে যুদ্ধ করার যুগ প্রায় গত হয়েছে, তথাপি দাঁতখিঁচুনীর ক্রিয়া আজও রয়ে গিয়েছে।"[১৬] মোটামুটি ভাবে প্রক্ষোভ এবং তার অনুসঙ্গী দৈহিক ও আন্তর যন্ত্রের পরিবর্তন সেই উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হলেও, কখনো

১৫ Darwin—The Expression of the Emotions in Man & Animal, p. 111 & 374

১৬ Woodworth—Psychology, p. 421

কখনো দেখা যায়, প্রক্ষোভের অতিরিক্ত বিক্ষেপ আধুনিক জটিল সভ্যতায় মানুষের সুসঙ্গতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রক্তে অ্যাড্রিনিনের অতিরিক্ত মোক্ষণ একদিকে যেমন ডোরাকাটা প্রধান পেশীগুলিকে সক্রিয় করে, অন্যদিকে পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মায়। আধুনিক সব মানুষের পক্ষে পেশীর স্থূল এবং প্রবল সক্রিয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রয়োজন এবং প্রক্ষোভের খোলাখুলি প্রকাশও নিতান্ত 'অসভ্যতা' বলেই বিবেচিত হয়। প্রক্ষোভের পুনঃ পুনঃ অবদমনের ফলে মস্তিষ্কের কেন্দ্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয় এবং পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া সুস্থভাবে হতে পারে না। পেপ্‌টিক্ আলসার্ বা অন্ত্রের ক্ষত এবং মানসিক নানা বিকার আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার একটি প্রত্যক্ষ ফল।[১৭]

প্রক্ষোভ ও ভাবপ্রকাশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জেমস্‌-ল্যাং-এর সূত্র (James Lange theory of emotions)—প্রক্ষোভের সঙ্গে তাদের দৈহিক প্রকাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-বিষয়ে এক বৈপ্লবিক মত জেমস্‌ ও ল্যাং-এর। প্রাচীন-কালে আবেগের মানসিক দিক নিয়েই যত কল্পনা ও আলোচনা হয়েছে। কি ভাব (idea) থেকে ভয় উদ্ভব হয়, এ কথাই তাঁরা আলোচনা করেছেন। বড় জোর এ কথা তাঁরা বলেছেন, যে ভয়-রূপ অনুভূতির ফলে, চোখমুখ শুকিয়ে যায়, গা কাঁপে, কান্না পায়, পালাতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গীকে

---

১৭ All this complicated physical mechanism has been developed in relation to the needs of animals which have to be able to mobilize energy quickly and put up a vigorous struggle. This does not mean that nature has provided perfect adaptations to all possible situations, but in the long run animals equipped with these nerve fibers and glands are able to struggle, fight, defend themselves and run away, with a degree of success not attained by animals which are not so equipped. Experimental removal of one of the adrenal glands results in a great reduction in the length of time during which an animal can put up such a struggle. But in many cases this mechanism is not so useful to the complicated needs of the modern civilized man. Civilized man, to whom violent struggle is often an annoyance rather than a help, who loses his temper or becomes frightened in such a way as to interfere with the carrying out of a skilled act which may save his life, may suffer severely from the primitiveness of his whole autonomic nervous system. Not only excessive increase in bloodpressure but even the complete stopping of digestion may result from the irritation and frictions of a business day. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 75

প্রক্ষোভের একটা বাহ্য ও অপ্রধান অঙ্গ বলেই তাঁরা গণ্য করতেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। তাঁরা প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশকে গৌণ বা অপ্রধান বলে মনে করেন না। এ সম্বন্ধে আমেরিকার উইলিয়াম্ জেমস্-এর (James) মতবাদ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক চমক সৃষ্টি করে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই দিনেমার আর একজন দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ল্যাং (Lange) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেন। তাঁদের মতবাদের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে, এবং তাই অনুভূতি এবং তার দৈহিক প্রকাশভঙ্গী-সম্পর্কে নতুন মতবাদ, তাঁদের যুক্ত নাম বহন করে "জেমস্-ল্যাং থিয়োরী অব ইমোসন্স" নামে পরিচিত হয়ে আছে।

কেউ রাগ করলে, চীৎকার করে জিনিসপত্র ভেঙ্গে-চুরে নিজের প্রক্ষোভ প্রকাশ করে। জেমস্ কিন্তু বলেন, অনুভূতির এই বিশ্লেষণটা একেবারে ভুল। অনুভূতিগুলি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে—অভিভূত করে ফেলে। তখন বিচার-বিবেচনার অবসর নেই। উদ্দীপক অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করা মাত্রই, তৎক্ষণাৎ দৈহিক পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়, এবং এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে বাদ দিলে অনুভূতির কিছুই বাকি থাকে না। অনুভূতিগুলি হচ্ছে অন্ধ আবেগের তড়িৎস্ফূরণ, তারা "মানে না মানা"। তারা অনিবার্য উদ্দীপক অবস্থার দেহযন্ত্রের যান্ত্রিক ও চিন্তাহীন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কাজেই রাগ করি বলে চীৎকার করি, এ কথাটা সত্য নয়। বরং বলা উচিত, চীৎকার করি বলেই, রেগে যাই। দৈহিক পরিবর্তনটা অনুভূতির পরিণাম নয়, অনুভূতির পূর্বাবস্থা এবং তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। উইলিয়াম জেমস্ বলেন, "এই স্থূল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা এই যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়,—যাকে আমরা বলি প্রক্ষোভ, এবং এই মানসিক প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক প্রকাশের কারণ। **আমার মত হচ্ছে বিপরীত। তা হচ্ছে যে উদ্দীপক ঘটনার প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে (বাহ্য ও আন্তর) শারীরিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় এবং এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে যে অনুভূতি, তাকে বলা হয় প্রক্ষোভ।** সাধারণ বুদ্ধি বলে বিত্তনাশ হলে আমরা দুঃখিত হই ও অশ্রুবিসর্জন করি। হঠাৎ একটি ভল্লুক দেখলে ভয় পেয়ে পালাই, প্রতিদ্বন্দ্বী আমাকে অপমান করে, এবং তাতে ক্রোধ জন্মে, তাকে আঘাত করি। কিন্তু যে মত আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাতে ঘটনার এ পারম্পর্য ভুল। বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা

বলা উচিত যে, একটি মানসিক ক্রিয়া, আর একটির পর তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না। এ দুয়ের মাঝখানে দৈহিক পরিবর্তনগুলি দেখা দেয় এবং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত উক্তি হচ্ছে, আমরা অশ্রুবিসর্জন করি বলেই দুঃখবোধ করি। কাঁপি বলেই ভয় পাই। দুঃখিত হই বলেই কাঁদি, রাগ করি বলেই আঘাত করি, ভয় পাই বলেই কাঁপি, এ কথাগুলি ঠিক নয়।"

"শরীরের প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তা সে যাই হোক, যে মুহূর্তে ঘটে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আমরা বোধ করি। যদি কোন তীব্র প্রক্ষোভের কথা কল্পনা করি, এবং আমাদের এ কল্পনা থেকে দৈহিক লক্ষণগুলির সমস্ত বোধ যদি বিচ্ছিন্ন করে নিই তা হলে দেখি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—থাকে না এমন কোন মানসিক পদার্থ বা উপাদান, যা থেকে প্রক্ষোভগুলি তৈরী হতে পারে। প্রক্ষোভ থেকে দৈহিক পরিবর্তনের বোধ বাদ দিলে থাকে নিতান্ত উত্তাপহীন বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মাত্র।···(অতএব) যদি দৈহিক দিক দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যাই, তা হলে তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম সমস্ত অনুভূতির জগৎ থেকেই শুধু আমাদের চিরনির্বাসন ঘটবে এবং আমরা শুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নীরস অস্তিত্বই শুধু বহন করে চলব।"[১৮]

ল্যাং বলেন, "আমাদের সমগ্র প্রক্ষোভের অনুভূতি, আমাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তগুলির জন্যে দায়ী দেহের নাড়ী ও সক্রিয় পেশীমণ্ডলী (vaso-motor system)। যদি দেহের এ যন্ত্রমণ্ডলীকে আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুসমুদয় ক্রিয়মান করে না তুলতে পারত, তা হলে সমস্ত জীবনটাই আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর ছায়া ফেলে, অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট ও জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করত, এ পর্যন্তই। কিন্তু আমরা আনন্দে বা ক্রোধে বিচলিত হতাম না, দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়তাম না, বা ভয়ে দিশেহারাও হতাম না।"[১৯]

জেম্‌স-এর নতুন মতপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই সমস্ত সাময়িক সমালোচনায় যতটা উত্তাপ ছিল, ততটা আলো ছিল না। আজ এতদিন পর, এবং নানা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের নিরিখে, জেমস-এর মতবাদের প্রকাশের মধ্যে কিছুটা অতিভাষণ রয়েছে তা জোর করে বলা যায়। প্রক্ষোভের পেছনে কোন ভাব (idea) থাকে না, এবং প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক প্রকাশ (organic and visceral sensations)

---

১৮ W. James—Principles of Psychology, Vol. II, p. 440

১৯ Titchener—A Textbook of Psychology, p. 475

অভিন্ন,—তাঁর মতবাদের এই দু'টি মূল কথাই অপ্রমাণিত রয়ে গেছে। অনুভূতির সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনগুলির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, তাঁর এ কথাটা না মেনে উপায় নেই। প্রক্ষোভের মধ্যে একটা আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতা রয়েছে, এ-ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। জেমস-এর মতের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করে দেখা যাক।

১। জেমস-এর একটা প্রধান যুক্তি এই যে, প্রক্ষোভগুলিকে তাদের দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারা যায় না, কাজেই তারা অভিন্ন। এটি খুব সুযুক্তি নয়। একটা আমকে তার ওজন বাদ দিয়ে কল্পনা করতে পারি না, তাই বলে প্রমাণ হয় না, যে আম আর তার ওজন একই জিনিস। স্টাউট্ ঠিকই বলেছেন, "একটা পাথরের টুকরা ঢেউ সৃষ্টি না করে, জলে পড়তে পারে না—কিন্তু তা বলে ঢেউ আর পাথর এক নয়।"[২]

২। জেম্স-এর মতে প্রক্ষোভের পেছনে কোন ভাব বা কল্পনা (ideas or images) থাকে না। একটা বিশেষ অবস্থায় দেহে তাৎক্ষণিক কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। দেহযন্ত্র যেন একটা সুরে-বাঁধা অনেকগুলি তারওয়ালা বীণা (জেমস্ তাকে বলেন, sounding board)। অন্য যন্ত্রে বিশেষ একটা সুর উঠলে তাতে যেমন আপনিই অনুরূপ একটা সুর বেজে ওঠে, তেমনি ছমছমে অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে হঠাৎ গা শিউরে ওঠে, জিভ শুকিয়ে আসে; তাই ভয়। ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় হয় না। ভাবটা যদি আসে, সেটা আসে অনুভূতির পর। তিনি বলেন, জ্বরবিকার অবস্থায় কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও রোগী ভয় পায়। এটা এই জন্যে হয় যে, ভয়ের সঙ্গে যুক্ত দৈহিক পরিবর্তনগুলি উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কথাটা ঠিক নয়। নির্জন অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে আসতে গেলে কতকগুলি ভাব বা কল্পনা মনে আসে বলেই ভয় হয়। যদি না জানা থাকে জায়গাটা শ্মশান, তবে তো অমন ভয় হয় না। গলায় শেকল বাঁধা ভালুক দেখতে আমোদ লাগে, কিন্তু খোলা অবস্থায় সে ভালুকই মনে ভয় জাগায়। তা হলে দৈহিক পরিবর্তনগুলি কি ভাব-নিরপেক্ষ এবং যান্ত্রিক-ভাবে হচ্ছে? তা তো নয়। ওয়ার্ড তাই ঠাট্টা করে বললেন, জেমস সাহেবকে যদি একবার খাঁচায় বন্দী ভালুকের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং তিনি যদি

২০ Stout—Manual of Psychology, p. 366

মুক্ত বন্য ভালুকের সামনে পড়েন, তবে প্রথম ক্ষেত্রে তিনি হয়তো ভালুকটিকে একটি মিষ্টি রুটি উপহার দেবেন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখাবেন দ্রুত পলায়মান চরণযুগল।[২১]

৩। জেম্স বলেন, কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের উদ্ভব হয়। অভিনেতারা কখনো কখনো সত্যি সত্যি প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া মদ খেলে লোক দুঃখ ভুলে যায়। খুব খুশীমেজাজ হয়। ভাং খেলেও কেবল হাসি পায়, লোক দুঃখ ভুলে যায় ও মনটা হালকা লাগে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ভাবের ওপর প্রক্ষোভ নির্ভর করে না। মদখোর পুত্রশোক ভুলে হৈ-হল্লা করে।

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অনেক সময় সত্য মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, মদ-খোর বা ভাং-খোর যখন আনন্দপ্রকাশ করে, সেই অনুভূতির অনুকূল কয়েকটি ভাব তার মনে আসে। অভিনেতা দুঃখের অভিনয়ে যখন কেঁদে আকুল হন, তখন শোক ও দুঃখের উপযোগী ভাবও তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তা ছাড়া অভিনেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুভূতির দৈহিক প্রকাশকে যখন রূপ দেন, তখন নিজে সে আবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। তিনি সচেতন থাকেন যে তিনি অভিনয়ই করছেন। সুস্থ দেহে স্ট্রিক্নিন্ বা অ্যাড্রিনালিন ইন্‌জেক্শন করার পর অনেক সময় আবেগের ভাব দেখা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে, যাদের ইন্‌জেকশন দেওয়া হল, তারা বলে, "কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।" **এটাকে বলি ইমোশ্যনাল মুড (emotional mood), এটা ঠিক emotion বা প্রক্ষোভ নয়।** তবে এই ওষুধ বা নেশাগুলি প্রক্ষোভ-সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। যাদের স্ট্রিক্নিন্ ইন্‌জেক্শন দেওয়া হল, তাদের "মনটা কেমন যেন ভারী লাগে, কান্না পায়।" যদি ইন্‌জেকশন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে দুঃখ ও শোকের গল্প বলা যায়, তখন তারা অনেক সময়ই আকুল শোকে ভেঙ্গে পড়ে। মানুষের ওপর অ্যাড্রিনালিন্ প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে, কতকগুলি নির্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণ, যথা নাড়ীর দ্রুতগতি, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হাত-পা-গলার স্বরের কম্পন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এ রকম ব্যক্তিরা সাধারণত বলে, তারা "নার্ভাস্"-বোধ করছে, কেমন যেন অস্বস্তি-বোধ করছে অথবা উত্তেজনা-বোধ করছে, কিছু একটা যেন ঘটবে এমন বোধ করছে; আবার কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয় বলে, তারা যেন বোধ করছে খুব একটা বড়

২১ Ward – Psychological Principles

আনন্দ আসবে, অথবা যেন তাদের কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কেন, তা তারা জানে না। তারা স্বীকার করে, যে তাদের একটা "যেন-যেন" অনুভূতি হচ্ছে, যেটা সত্যিকারের প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু যতক্ষণ এই অ্যাড্রিনালিনের প্রভাব থাকছে, ততক্ষণ সাধারণ অবস্থার চেয়ে সহজে ভয় পায়।[২২]

৪। যদি অনুভূতির প্রকাশক দৈহিক পরিবর্তনগুলি, কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করা যায়, তা হলে অনুভূতিও লোপ পায়। যে বেশী চীৎকার করছে তাকে অজান্তে পেছন থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তার রাগও "জল" হয়ে যাবে। ছোট খুকী ভয়ে কাঁদছে। মা তাকে জড়িয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে কাঁপুনী থামালেন, তার ভয়ও উবে গেল। কিন্তু এখানে তো শুধু দৈহিক প্রকাশটাই বন্ধ করা হচ্ছে না, ভাবটাও সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে বলেই প্রক্ষোভও বদলাচ্ছে। মার কোলে বসে খুকু ভাবছে যে সে নিরাপদ, তাই না তার ভয় ভাঙ্গল!

জেম্‌স্ তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, তার প্রধান কয়েকটি আমরা আলোচনা করেছি। তা ছাড়াও জেমস্-এর মতের বিরুদ্ধে আরো নানা যুক্তি ও পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জেম্‌স্-এর প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নতুন মতবাদের মূল কথাটি এই যে, প্রক্ষোভের সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক সামগ্রিক পরিবর্তন (mass of organic changes) অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এটা সমর্থন করলেও, ম্যাক্‌ডুগাল তিনটি বিষয়ে জেম্‌স্-এর সমালোচনা করেছেন। (১) জেম্‌স্ বলেছেন, কোন উত্তেজক ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ কতকগুলি দৈহিক (বিশেষত আন্ত্রিক) পরিবর্তন ঘটে, এবং সেই পরিবর্তনের অনুভূতিই হচ্ছে প্রক্ষোভ। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করতে হবে এমন কথা নেই, তার স্মৃতি ও কল্পনাও প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। দৈহিক পরিবর্তন ব্যতীত, এবং তার পূর্বেও কোন স্মৃতি বা কল্পনা মনে আসতে পারে, এবং তা প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। (২) ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করা মাত্রই যান্ত্রিক দৈহিক পরিবর্তন শুরু হবে এ ঠিক নয়। সে ঘটনা বা বস্তু মনে কোন ভাব (ideas) না জাগালে প্রক্ষোভ আপনি আসতে পারে না। ঘটনার তাৎপর্য-বোধ হওয়া চাই, তবেই প্রক্ষোভ হতে পারে। (৩) জেম্‌স্-এর মতের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে যে প্রক্ষোভের মূল যে সহজাত কর্মমুখীনতা (strong conative tendency), এ কথাটা জেম্‌স্ ধরতে পারেন নি। বাঘ দেখে ভয় পাই, তার কারণ বাঘ দেখাটা পলায়নের প্রবৃত্তিকে

২২ Woodworth—Psychology, p. 522

(instinct of escape) জাগ্রত করে, তাই তার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত যে প্রক্ষোভ—ভয়—তা দেখা দেয়।

স্টাউট অনুরূপ অভিযোগ করেছেন, "জেম্‌স্‌-এর মতবাদে যে অবস্থায় প্রক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে, তার সঙ্গে, প্রক্ষোভের পেছনে যে সুস্পষ্ট সহজাত কর্মমুখীনতা আছে, তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটির কথা উপেক্ষা করা হয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী মা-বেড়ালের কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নেয়া হচ্ছে দেখাটাই মা-বেড়ালের ক্রোধ-উদ্রেকের কারণ। মাতৃস্নেহের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু স্পষ্টতই, এখানে এই প্রক্ষোভের অবস্থার মূল কারণ এই যে, মাতৃস্নেহরূপ সহজ প্রবৃত্তি এখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।"[২৩]

জেম্‌স্‌ আবেগ ও ছড়ানো সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তনকে (diffused organic sensations) অভিন্ন মনে করেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। ক্ষুধা পেটব্যথা ইত্যাদিতেও ছড়ানো সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তারা প্রক্ষোভ নয়। আবার জেম্‌স্‌-এর মত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রক্ষোভের মূল কতকগুলি নির্দিষ্ট ও সামগ্রিক দৈহিক এবং আভ্যন্তরিক অন্ত্রাদির আলোড়ন (organic and visceral disturbances)। কিন্তু দেখা যায়, ভয়ে কান্না পায়, রাগেও কখনো চোখে জল আসে, দুঃখে তো আসেই। রাগ ও ভয়ে দৈহিক ও আন্ত্রিক আলোড়ন (organic and visceral disturbances) অনেকটা একই রকম; কিন্তু প্রক্ষোভগুলি মোটেই এক নয়। ক্যানন্‌ দেখিয়েছেন, লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থি ও অন্ত্রের পরিবর্তন আর ভীত মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন একই রকমের।

জেম্‌স্‌-এর মতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি এসেছে, শেরিংটন-এর (Sherrington) কতকগুলি পরীক্ষা থেকে। শেরিংটন একটা কুকুরের মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করে সমবেদীতন্ত্রের (sympathetic system) স্নায়ু ইত্যাদির (যা দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তচলাচল, পরিপাকক্রিয়া, অন্ত্রাদির পরিবর্তন ইত্যাদি চালিত হয়) সঙ্গে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের (যা দ্বারা বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়া সম্ভব হয়) সংযোগ ছিন্ন করে দিলেন। জেম্‌স্‌-এর মত সত্য হলে এ জীবটির অনুভূতিগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, এই কুকুরটি আগের মতোই রাগ আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশে সক্ষম। এ থেকে শেরিংটন সিদ্ধান্ত করেছেন, "জেম্‌স্‌-এর সঙ্গে এ মত গ্রহণ করতে

২৩ Stout—A Manual of Psychology, p. 308

পারি, যে দেহের সামগ্রিক সংবেদন (organic sensations) ও দেহাভ্যন্তরস্থ আন্ত্রিক পরিবর্তন, এবং সেগুলির স্মৃতি ও সংযোগগুলি, মৌলিক প্রক্ষোভ-সৃষ্টির সহায়ক, এবং প্রক্ষোভগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করে (re-inforcing), কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এগুলি প্রক্ষোভ-সৃষ্টি করে না।"[২৪] অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন-গুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তারা অনুভূতির মূল কারণও নয়, অনুভূতির সঙ্গে অভিন্নও নয়। প্রক্ষোভ হচ্ছে, "অনুভূতি"র প্রকাশ, তাকে দেহের সামগ্রিক সংবেদন (organic sensation) মনে করলে ভুল করা হবে।

"জেম্স্-এর মতের মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এতে প্রক্ষোভগুলিকে জটিল দৈহিক পরিবর্তন মাত্র বলে মনে করা হয়; কিন্তু প্রক্ষোভ হচ্ছে তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রকাশ। প্রক্ষোভ কেবল বাইরে থেকে বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ মাত্র নয়, প্রক্ষোভ হচ্ছে বাইরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া।"[২৫] জেম্স্ ও ল্যাং যখন মনে করেছেন, অভ্যন্তরীণ অন্ত্রাদি ও পেশী ইত্যাদি থেকে বহির্গামী নাড়ীবাহিত (afferent nerves) আলোড়ন, প্রক্ষোভ-সৃষ্টির প্রধান উপাদান, তখন তাঁরা ভুল করেন নি। কিন্তু যখন তাঁরা বললেন, এগুলিই প্রক্ষোভের যথেষ্ট এবং একমাত্র কারণ, তখন স্পষ্টতই তাঁরা ভুল করলেন। প্রক্ষোভ হচ্ছে একজাতীয় প্রতিক্রিয়া যাতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল ও দেহের উপান্তবর্তী অন্যান্য অংশ সমান অংশগ্রহণ করে থাকে।[২৬]

শেরিংটন ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের সমালোচনা বিবেচনা করে এবং নিজেও নানা পরীক্ষা করে ক্যানন্ জেম্স্-এর মতের পরিবর্তে আর একটি মত প্রবর্তন করলেন। ক্যানন্-এর মতে, অন্ত্র ও ভ্যাসো-মোটরমণ্ডলীর পরিবর্তনকে জেম্স্ প্রক্ষোভের কারণ বলছেন, তা ঠিক নয়। মধ্য-মস্তিষ্কের মধ্যে, অতিপুষ্পাক্ষের (hyperthalamus) প্রভাবই প্রক্ষোভের প্রকৃত কারণ। এ মতবাদ জেম্স্-এর মতবাদের কতকগুলি ত্রুটি-নিবারণে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। অতিপুষ্পাক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলির ক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর। অথচ প্রক্ষোভ-সৃষ্টি হয় তড়িৎগতিতে। তা ছাড়া প্রক্ষোভ-সৃষ্টিতে ঊর্ধ্ব মস্তিষ্কের দায়িত্ব আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রক্ষোভ একটা অন্ধ জৈবক্রিয়া নয়।

---

২৪ Sherrington—The Integrative Action of the Nervous System, pp. 259-61

২৫ Sandiford—Educational Psychology, p. 132

২৬ Thouless—General & Social Psychology, p. 88

সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ—প্রক্ষোভের সঙ্গে সহজ প্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা পূর্বে কিছু আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এদের বৈষম্যও যথেষ্ট। জেম্‌স্‌-এর মতে প্রক্ষোভে মানসিক অনুভূতির প্রাধান্য, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে ক্রিয়ার ভাবটি প্রবল। তা ছাড়া প্রক্ষোভে আভ্যন্তরিক পরিবর্তন হয় খুব বেশী; সহজ প্রবৃত্তিতে পরিবর্তনটা ঘটানোর চেষ্টা হয় বহির্পরিবেশে—এটি বহির্মুখী। প্রক্ষোভ যেন একটা কোন কর্মের প্রস্তুতি-পর্ব, সহজ প্রবৃত্তি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিযুক্ত কর্মাবলী,—যেমন বাসা বাঁধবার জন্যে পাখীর খড়কুটা জোগাড় করা।

প্রক্ষোভে আভ্যন্তরিক পেশী, গ্রন্থি বা অন্ত্রাদির যে রকম পরিবর্তন লক্ষণীয় সহজ প্রবৃত্তির বেলায় ততটা নয়,—"সহজ প্রবৃত্তির বেলায় যেমন, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রধান, তেমন প্রক্ষোভের বেলায় স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomous nervous system) ক্রিয়া প্রধান; এবং এ ক্রিয়ার প্রভাব হচ্ছে, মসৃণ পেশী ও গ্রন্থির ওপর। প্রক্ষোভের প্রকাশের সঙ্গে রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণের নিবিড় যোগ আছে।"[২৭]

তা ছাড়া প্রক্ষোভের প্রকাশগুলি অনেকটা বিশৃঙ্খল ও অগোছাল, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াগুলি সুসম্বদ্ধ। প্রক্ষোভ হঠাৎ দেখা দেয়। সহজ প্রবৃত্তিগুলি তা নয়। তবে সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এ দুইয়ের পেছনেই দেহযন্ত্রের ব্যবস্থা জন্মগত; এবং দুই-ই ব্যক্তি- বা জাতি-রক্ষার উদ্দেশ্য-সাধন করে।

প্রক্ষোভ-পূর্ব অনুভূতি, স্থায়ী ধাত ও রস বা বিশুদ্ধ অনুভূতি (Emotional mood, disposition or temperament and sentiment)

প্রক্ষোভের শেষ হয়ে গেলেও প্রক্ষোভের রেশটি মন থেকে তৎক্ষণাৎ মুছে যায় না। সুসংবাদ পেয়ে খুশী হলে তার গুঞ্জরণ সমস্ত দিনের কাজকে সুধায় ভরে রাখে, পরীক্ষার খাতা দেখতে বসে ভালো নম্বর দিই। এই যে অনুভূতির মেঘ-জমা-অবস্থা একে বলি মুড্, বা প্রক্ষোভের ভাব। প্রক্ষোভের ফেটে পড়বার পূর্বেও এই অবস্থা হয়। বিরক্তির মেঘ জমেছে, এখনো কোন উপলক্ষ্য করে তা ফেটে পড়ে নি, এ অবস্থা কিংবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পাতলা হয়ে যায় নি, সে অবস্থাকে বলা হয় mood।

---

২৭ Sandiford—Educational Psychology, p. 139

এ অবস্থা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু স্থায়ী ধাত বা disposition হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক অনেকটা স্থায়ী অনুভূতির অবস্থা, যেমন, আমরা বলি উনি 'রাগী' ধাতের মানুষ, কবিরা হল 'প্রেমিক' ধাতের মানুষ। অর্থ এই নয়, যে উনি সর্বদা রাগ করেই আছেন, অথবা কবিরা সারাক্ষণ শুধু প্রেম করেই বেড়ান। এর অর্থ উনি অন্যের তুলনায় রাগ করেন সহজে, বা কবিরা সাধারণের চেয়ে বেশী প্রেম-প্রবণ।

বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস (Sentiment)—এ কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। রিবো (Ribot) 'সেন্টিমেণ্ট' কথাটা সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের উচ্চস্তরের ভাব (highly developed abstract ideas) সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন 'সেন্টিমেণ্ট'। কাজেই উচ্চ চিন্তায় (conceptual thinking) অসমর্থ শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রসের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন না। সেন্টিমেণ্টগুলি ব্যক্তির স্বার্থের সম্পর্কশূন্য (disinterested), প্রক্ষোভগুলি কিন্তু তা নয়। রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতিতে তা নয়। প্রক্ষোভ অনুভূতির উত্তপ্ত উত্তাল অবস্থা। বিশুদ্ধ অনুভূতি কিন্তু শান্ত। মনের তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অনুসারে বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলিকে বুদ্ধিগত অনুভূতি (**intellectual sentiments**), সৌন্দর্যানুভূতি (**aestheic sentiments**) ও নৈতিক অনুভূতি (**moral sentiments**) এই তিন দলে ভাগ করা যায়। বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতিতে (যেমন, বিদ্যানুরাগে) মানুষের বিচার-বুদ্ধির (logical thinking) নির্বাধ ব্যবহার, সেখানে শিক্ষিত মানুষ গভীর আনন্দ পায়। সৌন্দর্যানুভূতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্জিত রুচি বা সৌন্দর্যবুদ্ধির তৃপ্তি। যেমন, সেন্টিমেণ্ট অব দি সাবলাইম্ (**sentiment of the sublime**) এবং সেন্টিমেণ্ট অব দি লুডিক্রাস্ (**sentiment of the ludicrous**) বা বিরাট মহানের সম্মুখে মানুষের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশান্ত আনন্দ, তাকে বলা হয় সেন্টিমেণ্ট অব দি সাবলাইম্। আর এর বিপরীত হচ্ছে, সেন্টিমেণ্ট অব দি লুডিক্রাস, কিম্ভূতকিমাকার, হাস্যকর দ্রব্য বা অবস্থার সামনে আমাদের যে অনুভূতি, যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি হচ্ছে নীতি-বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, মহতের প্রতি আকর্ষণ এবং

নীচতার প্রতি বিরূপতা। আবার আছে, রিলিজিয়স্ সেন্টিমেন্ট (**religious sentiment**) বা ঈশ্বরানুভূতি, বা ধর্মজীবনের ভিত্তি। বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অনুভূতির মিশ্রণ।

বর্তমানে সেন্টিমেন্ট কথাটা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। **বস্তুকেন্দ্র ভাবপুষ্ট, উন্নত অনুভূতির স্থায়ী অবস্থাকে বলা হয় সেন্টিমেন্ট। সেন্টিমেন্টের প্রকাশ হয়, কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী প্রক্ষোভে।** কতকগুলি ভাবসম্পদ-পুষ্ট বস্তু বা অবস্থা, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্ষোভ-সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, মায়ের মনে শিশুকে ঘিরে বিচিত্র ভাব-সংশ্লিষ্ট স্থায়ী অনুভূতির কেন্দ্র বর্তমান। মাতৃস্নেহ হচ্ছে, শিশুর সম্বন্ধে মার বিশুদ্ধ অনুভূতি বা sentiment। শ্যাণ্ড (Shand) তাই বলছেন, "প্রক্ষোভ হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাবজীবনের চমকপ্রদ ঘটনা।"[২৮]

প্রক্ষোভ ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া—প্রক্ষোভের সঙ্গে আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপের (organic disturbances) নিবিড় সম্পর্ক আছে সেটা সহজেই লক্ষণীয়। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড যকৃৎ ইত্যাদি আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া নিঃশব্দে দৃষ্টির অন্তরালে চলে। এ ক্রিয়াগুলি দৃষ্টি-আকর্ষণ করে না। কিন্তু ভয় ক্রোধ ও তীব্র বেদনা -রূপ প্রক্ষোভগুলিতে সাধারণ আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি বেড়াল খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত হয়ে শুয়ে আছে। এক্স-রে দিয়ে তার পরিপাক-যন্ত্রের ছবি নিলে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে তার পরিপাক-ক্রিয়া নিঃশব্দে চলছে। এমন সময় একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে এল। তৎক্ষণাৎ বেড়াল লাফিয়ে উঠল, তার লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল, সে তার পিঠটা বাঁকিয়ে, পায়ের থাবা থেকে ধারাল নখ বের করে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে গর্জন করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। বেড়ালের সেই মুহূর্তের এক্স-রে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা যাবে, তার রক্ত-প্রবাহ দেহের অন্য সব অংশ থেকে প্রত্যাহত হয়ে তার পায়ের পেশীতে দ্রুত চলাচল করছে, হৃদযন্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, প্রধান রক্তবহা নাড়ীগুলিতে রক্তচাপ বেড়ে গেছে, গাত্রত্বকের নিচের ক্ষুদ্র পেশীগুলি উত্তেজিত হয়েছে, কোন কোন গ্রন্থি থেকে রসক্ষরণ দ্রুততর হয়েছে আবার লালা-নিঃসারক গ্রন্থির কাজ মন্দীভূত হয়েছে ইত্যাদি আন্তর যন্ত্রের নানাবিধ বিক্ষেপের অবস্থা। এ জন্যেই

২৮ Shand—The Foundation of Character

অধ্যাপক কার্ বলেছেন যে প্রক্ষোভ মাত্রকেই আমরা বলতে পারি প্রাণীর আন্তর যন্ত্রের একটা অশান্ত অবস্থা।[২৯]

প্রক্ষোভের সঙ্গে আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ারযে নিবিড় সম্বন্ধ আছে তা প্রাচীনেরাও জানতেন; তারা বলতেন প্রেম-ভালবাসা হচ্ছে হৃদয়ঘটিত উত্তেজনা, রাগ হচ্ছে পিত্তরসের অতিরিক্ত ক্ষরণ, ভয়ের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে পাকস্থলীর নিম্ন দেশ, দয়াকরুণার স্থান হচ্ছে উদরাভ্যন্তর ইত্যাদি।

উইলিয়ম্ জেমস্-ই প্রথম অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় প্রক্ষোভ এবং আন্তর যন্ত্রের অশান্ত অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বললেন, আন্তর যন্ত্রের অশান্ত অবস্থা বাদ দিয়ে প্রক্ষোভকে বোঝাই যায় না। কোন উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তৎক্ষণাৎ আন্তর যন্ত্রের কতকগুলি বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সেই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় চেতনাই হচ্ছে প্রক্ষোভ।[৩০]

জেমস্-ল্যাং-এর প্রক্ষোভ সম্পর্কে মতবাদ আমরা পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি। জেম্স্-এর পরে এ বিষয় নিয়ে আরো বহু পরীক্ষা হয়েছে। তাতে কোন কোন দিকে যে তাঁদের মতবাদ ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মতবাদের মধ্যে এই সত্যটি মূল্যবান যে আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপ বাদ দিয়ে প্রক্ষোভের প্রকৃতি বোঝা যায় না।

আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া মাত্রই কি প্রক্ষোভ?—প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গেই যুক্ত থাকে কোন না কোন আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া। কিন্তু সমস্ত আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়াই প্রক্ষোভের কারণ, এ কথা সত্য নয়। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তচলাচল, পরিপাক-ক্রিয়া শান্ত নির্দিষ্ট ছন্দে নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু যখন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সমগ্র দেহযন্ত্র বিপন্ন

---

২৯ An emotion may well be called an organic commotion. Carr —Psychology, p. 285

৩০ The emotion as we experience it is simply our experience of the vital organs and muscles. We feel the heart beat, the sinking sensation in the stomach, the trembling of the limbs, the parching of the throat. If we could describe faithfully how we feel as a direct result of a pounding heart, dry throat, flushed face, tense muscles etc., the total result would simply be a description of the emotion. There would be no emotion above and beyond the awareness of these physical changes. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 77

হয়ে ওঠে, তখন এই আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ায় উথাল-পাথাল ঝড় ওঠে। তখনই আমরা সেই অশান্ত অবস্থাকে বলি প্রক্ষোভ।[৩১]

জেমস্-এর মতো কার্এবং ম্যাক্ডুগ্যাল্-ও আন্তরযন্ত্রের বিক্ষিপ্ত অশান্ত অবস্থাকে প্রক্ষোভের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু ম্যাক্ডুগ্যাল্ ঠিকই বলেছেন যে আন্তর যন্ত্রগুলিতে তখনই এমন অশান্ত অবস্থা দেখা যায় যখন দেহযন্ত্র কোন বিভ্রান্তিকর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমতা হারিয়ে ফেলেছে। যখন প্রাণীর দেহ ও মন চিন্তা ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে তার প্রতিক্রিয়াগুলি সংযত ও সুসংহতভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে নিয়োগ করতে পারে, তখন আন্তর যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সত্বেও প্রক্ষোভ দেখা দেয় না। প্রক্ষোভ প্রাণীর দিশাহারা অবস্থায় আন্তর যন্ত্রের বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া। অবশ্য প্রক্ষোভ সম্পূর্ণ অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয়; সেখানেও প্রাণীর তার পরিবেশ সম্পর্কে অস্পষ্ট অবিশ্লেষিত চেতনা থাকে। কিন্তু সেখানে বুদ্ধির প্রাধান্য নয়—বরঞ্চ বুদ্ধি সেখানে বিভ্রান্ত—প্রাণী সেখানে স্পষ্ট করে পথ দেখতে পাচ্ছে না এবং নিজের ওপর ব্যক্তি তখন শাসন-সংযমের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।[৩২]

---

৩১ All situations may be classified as normal and emergency situations or as peaceful and warlike situations. The normal and peaceful situations give rise to such functions as breathing, circulating, secreting, digesting and so on. The "simpler motives"...come under this head. In contrast with these are those situations in which the organism must struggle in a relatively vigorous or even violent reaction to the environment through a great range of such violent responses might be listed, we may for convenience classify these as involving fear, rage, and intense pain. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 71

৩২ If, on any occasion when some propensity is strongly excited within you, the situation is a familiar one with which you can deal by some well-directed activity. Your energy flows out in such activity, you vigorously act or plan to act. Such overt outwardly-directed activity, involving well-defined cognition and well-directed striving, seems to drain off into these channels, the greater part of the energy released, and, in consequence, the emotional disturbances of the internal organs and their reflex effects on consciousness are proportionately slight. On the other hand, if there is no obvious line of effective action, nothing to be done about it, the liberated energy of the impulse finds its way more freely into the internal organs, producing greater disturbance of their functioning; hence, under such conditions, the emotional quality of the experience is more prominent. McDougall—The Energies of Man, p. 150

প্রক্ষোভ ও স্নায়ুতন্ত্র—প্রক্ষোভ সম্পর্কে আলোচন কালে শারীর-বিজ্ঞানীরা প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়াগুলির গুরুত্ব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু যাঁরা স্নায়ুতন্ত্রবিদ (neurologist), তাঁরা বলেন 'এহো বাহ্য'—হৃদযন্ত্র, পরিপাক-যন্ত্র, মূত্রাশয়, বিভিন্ন গ্রন্থির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকে অ-ডোরাকাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী। এবং বৃহৎ পেশীগুলির (skeletal muscles) শাসন-পরিচালনার ভার আছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন চেষ্টা-কেন্দ্রের (motor centres) ; কিন্তু অ-ডোরাকাটা পেশীগুলি (যাদের সঙ্গে প্রধান আন্তর যন্ত্রগুলি যুক্ত, এবং প্রক্ষোভের প্রকাশে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে) তাদের চালায় স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system), মূল মস্তিষ্কের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই।[৩৩] মেরুদণ্ডের দুই পাশে সমান্তরালভাবে স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এগুলি থেকে স্নায়ুসূত্র দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্র ও ডোরাকাটা পেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের তিনটি ভাগ—(১) করোটিক (cranial), (২) সমবেদী (sympathetic) ও (৩) ত্রিকাস্থিভিত্তিক (sacral)।

করোটিক ও ত্রিকাস্থিভিত্তিক স্নায়ুতন্ত্র সাধারণত একযোগে কাজ করে। করোটিকগুলি করোটির নিম্নভাগে মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বাংশে অবস্থিত। এখান থেকে স্নায়ুসূত্র কনীনিকার সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী (ciliary muscles), লালাগ্রন্থি (salivary glands), অশ্রুগ্রন্থি (tear glands) এবং মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য যন্ত্রকে শাসন-পরিচালনা করে। অবশ্য এই কেন্দ্র থেকে স্নায়ুসূত্র স্বরযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, পরিপাক-যন্ত্রেও প্রসারিত। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে অবস্থিত ত্রিকাস্থি-ভিত্তিক স্নায়ুকেন্দ্র থেকে স্নায়ুসূত্র মূত্রাশয়, জননযন্ত্র ও মলত্যাগ-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। এ সমস্ত কেন্দ্রের সম্মিলিত কাজ হচ্ছে দেহের সুস্থ স্বাভাবিক বিপাক (metal-bolism)-এর কাজটি সুনিয়ন্ত্রিত করা। এটা সহজেই বোঝা যায় যে যে-আন্তর যন্ত্রগুলির উল্লেখ করা হল, দেহের সামগ্রিক সুস্থতার পক্ষে তাদের সুসমঞ্জস সুনিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশকে অনু-সমবেদীতন্ত্র (parasympathetic system) বলা হয়।

---

৩৩ The inner adjustments made by the unstriped muscles, which are so important in the release of emotions are controlled by the sympathetic division of the autonomic nervous system. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 72

এ হল দেহের সুস্থ শান্ত স্বাভাবিক অবস্থার কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে দেহের জরুরী যুদ্ধাবস্থায় (emergency conditions) আন্তর যন্ত্রগুলিতে থাকে অশান্ত অস্থির বিক্ষেপ। এই জরুরী অবস্থায় দেহযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমবেদী স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (sympathetic autonomic system)। এই স্নায়ুমণ্ডলীর এই অংশের সঙ্গেই প্রক্ষোভগুলির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। সমবেদী (sympathetic) স্নায়ুতন্ত্র ও অনুসমবেদী (parasympathetic) স্নায়ুতন্ত্র এই দুই অংশে অবস্থিত কর্মকেন্দ্র থেকেই স্নায়ুসূত্র প্রত্যেকটি আন্তর যন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই দুই তন্ত্রের ক্রিয়া ও প্রভাব বিপরীত; অনুসমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া দেহের শান্তির অবস্থার উপযোগী আর সমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া যুদ্ধাবস্থার উপযোগী। এই আন্তর যন্ত্রের ওপর এই দুই তন্ত্রের প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত যেমন, অনুসমবেদীতন্ত্রের কাজ হল নাড়ীর গতিকে শ্লথ করে দেওয়া, আর সমবেদীতন্ত্রের কাজ হল নাড়ীর গতিকে দ্রুত, চঞ্চল করে তোলা। এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া এই দুই তন্ত্রের ক্রিয়ার সুস্থিরতা বা প্রতিমানের (balance) ওপর নির্ভর করে। তেমনি পরিপাক-যন্ত্রের ওপর অনুসমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া হচ্ছে পরিপাক-ক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, আর সমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া হচ্ছে পরিপাক-ক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়া। ভয় ও ক্রোধের ফলে কাম ও অপত্যস্নেহের ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।[৩৪]

---

৩৪ স্বতঃক্রিয়তন্ত্রে সমবেদী এবং অনুসমবেদী এই দুইয়ের বিপরীত ক্রিয়া কোন্ কোন্ আন্তর যন্ত্রের বেলায় কি রকম, তা নিচে দেখান হল:

Functions of the Autonomic Nervous System

Organ	*Sympathetic function*	*Parasympathetic System*
Heart	Speeded up	Slowed down
Surface arteries	Dilated; more blood	Constricted; less blood
Visceral Arteries	Constricted; less blood	Dilated; more blood
Pupil of eye	Dilated; more light	Contracted; less light
Sweat glands	Sweat secreted	
Hairs on skin	Hairs erected	
Adrenal glands	Adrenalin secreted	
Liver	Sugar liberated into blood	Insulin liberated; blood sugar reduced.
Salivary glands	Salivation stopped	Salivation increased
Stomach	Contraction and secretion stopped	Contraction and secretion increased
Intestines	Contraction and secretion stopped	Contraction and secretion increased
Rectum	Defecation inhibited	Faeces expelled
Bladder	Urination inhibited	Urine expelled
Genital organs	Seminal vesicle contracted	Erection induced

Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 95

প্রক্ষোভ ও মস্তিষ্ক—প্রক্ষোভ বুদ্ধি-দ্বারা-পরিচালিত মানসিক ক্রিয়া নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে প্রক্ষোভ বুদ্ধি-আচ্ছন্নকারী প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রক্ষোভ সম্পূর্ণ অন্ধ প্রতিক্রিয়াও নয়। জেমস্ বলেছিলেন, আন্তর যন্ত্রগুলির ক্রিয়া -সম্পর্কে সচেতনতা আর প্রক্ষোভ অভিন্ন। আর সমস্ত চেতন ক্রিয়ার সঙ্গেই মস্তিষ্কের কোন না কোন অঙ্গের যোগ থাকেই। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, প্রক্ষোভের সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ কেন্দ্রের যোগ আছে? অবশ্য পূর্বে বলা হয়েছে যে মেরুদণ্ডের সমান্তরালে অবস্থিত স্বতঃক্রিয় কেন্দ্রগুলিই প্রক্ষোভের জন্যে দায়ী। কিন্তু স্বতঃক্রিয় কেন্দ্রগুলি মোটামুটি ভাবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত ক্রিয়া করলেও তাদের ওপর মস্তিষ্কের কোন প্রভাব নেই এ কথা বলা চলে না। স্নায়ুক্রিয়াবিদেরা মস্তিষ্কের কোন্ কেন্দ্র প্রক্ষোভ-পরিচালনকারী স্বতঃক্রিয় কেন্দ্রগুলিকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে মধ্যমস্তিষ্কের পুষ্পাক্ষের (thalamus) দুই পিণ্ডের সঙ্গে প্রক্ষোভের সম্বন্ধ আছে। ক্যানন্ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে পুষ্পাক্ষের কৃত্রিম উত্তেজনা দ্বারা প্রক্ষোভ-সৃষ্টি সম্ভবপর। এটাও দেখা গিয়েছে পুষ্পাক্ষের উর্ধ্বর্বর্তী অংশের গুরু মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ ছেদ করলেও বিড়ালের মধ্যে ক্রোধ ইত্যাদির লক্ষণ লুপ্ত হয় না, কিন্তু পুষ্পাক্ষ ছেদ করলে প্রক্ষোভের সমস্ত প্রক্রিয়া লোপ পায়।[৩৫] ইতিপূর্বে শেরিংটন্-ও কুকুরের মেরুদণ্ড থেকে বহির্গত বোধদা স্নায়ুসূত্রগুলির সঙ্গে আন্তর যন্ত্রের যোগ ছিন্ন করে দেখিয়েছিলেন যে তাতেও কুকুরের প্রক্ষোভের প্রকাশ পূর্বের মতোই থাকে। এ পরীক্ষা দ্বারা শেরিংটন্ জেম্স্-এর 'আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার বোধই প্রক্ষোভ' এই মত অপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য জেম্স্-এর সমর্থকেরা বলেছিলেন যে প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং প্রক্ষোভের অনুভূতি এক না-ও হতে পারে এবং যে কুকুরগুলির ওপর অস্ত্রোপচার করা হল তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশ লুপ্ত না হলেও, সম্ভবত তাদের প্রক্ষোভের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে ছিল। হেরিক্ কিন্তু পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পুষ্পাক্ষ শুধুমাত্র প্রক্ষোভের প্রকাশ নয়, প্রক্ষোভের অনুভূতিও শাসন-নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাঁর মতে, পুষ্পাক্ষ হচ্ছে বোধদা স্নায়ুসূত্রগুলির আগমন-নির্গমনের পথ এবং পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রগুলি

---

৩৫ Cannon—Again the James-Lange and the Thalamic Theories of Emotion, pp. 281-95

প্রক্ষোভের প্রকাশ শুধু নয়, তার অনুভবও নিয়ন্ত্রণ করে।[৩৬] কিন্তু ক্যানন্ বলেন, পুষ্পাক্ষ প্রক্ষোভের প্রকাশ-নিয়ন্ত্রণ করলেও প্রক্ষোভের অনুভূতি হতে গেলে পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রের সঙ্গে গুরুমস্তিষ্কের যোগাযোগ থাকতে হবে।[৩৭]

বার্ড-ও ক্যানন্-এর সঙ্গে একমত। হেরিক্ মনে করেন, পুষ্পাক্ষে-স্থিত কেন্দ্রের ক্রিয়া -দ্বারাই প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর। তাঁর মতে, সমস্ত চেতনার সঙ্গেই মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রের যোগ থাকতে হবে, একথা সত্য নয়। সামান্য প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং প্রক্ষোভের যে সব প্রতিক্রিয়ায় সুস্পষ্ট চেতনা যুক্ত আছে, সে সব অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রের সক্রিয়তা দেখা যায় না। এ সমস্ত প্রতিক্রিয়াই পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রের ক্রিয়ারই ফল, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে। বার্ড-ও ক্যানন্-এর মতো মনে করেন, যে-প্রক্ষোভে আন্তর যন্ত্রের যে বিক্ষেপ দেখা যায় প্রত্যক্ষ ভাবে তা পুষ্পাক্ষের কেন্দ্র ও তার সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুসূত্রের ক্রিয়া -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এটা সত্য। কিন্তু **পুষ্পাক্ষের সঙ্গে গুরু মস্তিষ্কের দ্বিমুখী সম্বন্ধ আছে। পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রগুলি গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্র -দ্বারা প্রভাবিত হয়।** অনুসমবেদী ও সমবেদী স্বতঃক্রিয়-তন্ত্রের বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে মস্তিষ্কস্থিত কেন্দ্র। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির ক্রিয়া শান্ত, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-অভিমুখী, ততক্ষণ গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্রেরই প্রাধান্য, আর যেখানে ব্যক্তি দিশাহারা, যেখানে সমস্যার সমাধানে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তখন মধ্যমস্তিষ্কস্থিত পুষ্পাক্ষ- কেন্দ্রের প্রাধান্য। প্রক্ষোভের বেলা দ্বিতীয় অবস্থাই সূচিত হয়, কিন্তু পুষ্পাক্ষকেন্দ্র গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত

---

৩৬ Herrick—Brains of Rats & Men, p. 268.

৩৭ Cannon stated that thalamic processes can give rise to emotional expression, but the "experience" of emotion depends upon thalamo-cortical integration. Of the many findings which Cannon cites for this integration between the thalamus and the cortex, the following are stressed: (1) When the cerebrum anterior to the thalamus is removed, anger reactions persist and disappear when the thalamus is removed. (2) A tumour affecting one side of the thalamus causes unilateral laughter. (3) Cortical impairment may cause prolonged weeping or laughter. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 3

স্বাধীন, এ কথা সত্য নয়।[৩৮] ল্যাশলের (Lashley) মতও ক্যানন্‌-বার্ড-এর মতের সমর্থক।

প্রক্ষোভ ও রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া—ভয়, রাগ ও বিষম বেদনা এই তিনটি তীব্র অনুভূতির আন্তর বিক্ষেপে অনেক বিষয়ে মিল আছে। বিশেষ করে অ্যাড্রিনাল-রূপ রসক্ষরা গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত ক্ষরণ প্রধান তিনটি প্রক্ষোভেরই সাধারণ লক্ষণ। অন্য সমস্ত গ্রন্থির সঙ্গে সমবেদী ও অনুসমবেদী এই দুই প্রকার স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়ুসূত্রেরই যোগ আছে। এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি। এই গ্রন্থি কেবলমাত্র সমবেদীতন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত। পূর্বেই বলেছি ক্যানন্‌-এর মতে প্রক্ষোভগুলি হচ্ছে দেহের জরুরী অবস্থায় প্রতিক্রিয়া। দেহের জরুরী অবস্থায় দুটি প্রধান প্রতিক্রিয়া—যুদ্ধ বা পলায়ন (fight or flight)। এই দুই অবস্থায় জন্যেই পেশীগুলির অতিরিক্ত সক্রিয়তা প্রয়োজন এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তীব্র রাসায়নিক ভেষজ পদার্থ অ্যাড্রিনিন সেই অতিরিক্ত শক্তির যোগান দেয়। রক্তে অ্যাড্রিনিনের মিশ্রণ ঘটলে নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যকৃৎ থেকে কিছু রসক্ষরণের ফলে রক্তশর্করার পরিমাণ বাড়ে এবং তা রক্তে অতিরিক্ত সচেষ্টতার ইন্ধন সরবরাহ করে। রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে রক্তের ঘন হয়ে চাপ বাঁধার (clotting) শক্তিও বেড়ে যায়, যাতে যুদ্ধকালে আঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণে প্রাণী না বিপন্ন হয়। এই যে জটিল দৈহিক-স্নায়বিক-রাসায়নিক গঠন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীর শ্রেয় স্বার্থরক্ষা।

জেমস্‌ ও ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদের তুলনা—জেম্‌স্‌-এর পর থেকে সমস্ত বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মনোবিদ্‌ই একথা স্বীকার করছেন যে, প্রক্ষোভের সঙ্গে

---

৩৮ The experimental evidence is certainly against the peripheral theory of emotion and therefore in favour of a central theory. The organic state normally present in emotion, is directly under the control of the autonomic nerves and of their centre in the inter-brain. This centre has two way connextions with the cortex; it can influence the cortex and be influenced by it something like this may be true: when the cortex dominates, behaviour is relatively calm, practical and goal-directed; but when the inter-brain dominates, behaviour is disturbed, diffused and emotional. When the individual 'loses his head' the inter-brain takes control; but so long as he keeps his head, the cortex is master. Bard—The Neuro-humoral Basis of Emotional Reactions, Handbook of General & Experimental Psychology, pp. 264-311

আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপের নিবিড় সম্পর্ক আছে। জেমস্ বলছেন, আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপই প্রক্ষোভের কারণ, আবার একথাও বলছেন আন্তর যন্ত্রের বিক্ষেপের চেতনা ও প্রক্ষোভ অভিন্ন। দেহের বাহ্য (যেমন, পেশী) ও আন্তর (যেমন হৃদযন্ত্র) নানা অঙ্গ বা যন্ত্রের আলোড়নের অনুভূতি বাদ দিলে প্রক্ষোভের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আগে আমাদের মনে প্রক্ষোভ জাগে, পরে তার বাহ্য প্রকাশ হয় দেহের বাইরে ও ভেতরে নানা পরিবর্তনে, একথা সত্য নয়। ব্যক্তি কোন উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া মাত্র তার দেহের বাহ্য ও আন্তর যন্ত্রে নানা বিক্ষেপ তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায় এবং এই বিক্ষেপের অনুভূতিকেই প্রক্ষোভ বলা হয়।

জেমস্-এর এই মতে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের ক্রিয়া বাদ দিয়েই প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে, তাই একে প্রান্তিক মতবাদ (**peripheral theory**) বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু ক্যানন্ ও বার্ড বলেন যে, শুধুমাত্র বাহ্য ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া দিয়েই প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ক্যানন্ ও বার্ড কুকুর বেড়াল ইত্যাদি জন্তুর ওপর অস্ত্রোপচার-ভিত্তিক পরীক্ষা দিয়ে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রক্ষোভের সঙ্গে মধ্যমস্তিষ্কের অন্তর্গত অনুপুষ্পাক্ষের (hypothalamus) নিশ্চিত যোগ আছে। প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ বাহ্য ও আন্তর এ দুই-ই যুগপৎ অনুপুষ্পাক্ষ -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীতও প্রক্ষোভ থাকতে পারে। যে কুকুরের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত দেহের অভ্যন্তর থেকে আগত সমস্ত স্নায়ুশিরা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, সেই কুকুরের রাগ ভয় ইত্যাদির প্রকাশ সুস্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। এমন কি সে সময় প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং অতি প্রবলভাবে দেখা যায়। তার কারণ ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের সংযম ও শাসন তখন অবর্তমান। কিন্তু মধ্যমস্তিষ্কের অনুপুষ্পাক্ষের সঙ্গে সমস্ত আন্তর যন্ত্র ও পেশীর স্নায়ুসূত্র ছিন্ন করে দিলে প্রক্ষোভের প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। রোগের ফলে বা অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা পুষ্পাক্ষের অর্ধাংশ নষ্ট হয়ে গেলে দেহের বিপরীত অর্ধেই কেবল প্রক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়।

কাজেই মস্তিষ্কের সঙ্গে প্রক্ষোভের সম্পর্ক নেই একথা বলা চলে না। বরঞ্চ স্পষ্ট করেই বলা চলে মধ্যমস্তিষ্কেই প্রক্ষোভের কেন্দ্র অবস্থিত, এই মতকে কেন্দ্র-মতবাদ (**central theory**) বলা হয়। ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের সঙ্গে পুষ্পাক্ষ ও

আন্তর যন্ত্রগুলি সংযোগহীন নয়। সম্ভবত একথাই সত্য যে ঊর্ধ্বমস্তিষ্ক পুষ্পাক্ষ বা মধ্যমস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে সংযত করে, তারা প্রক্ষোভের রাশ টেনে ধরে।[৩৯]

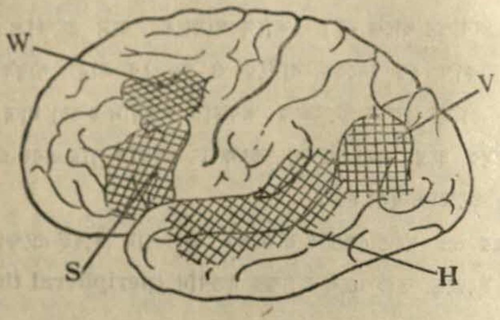

প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত মধ্যমস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্র

W = Words ; S = Sight ; H = Hearing ; V = Verbal memory স্তন্যপায়ী জীবের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে কল্পিত অংশ।

[P. Bard-এর the Foundations of Experimental Psychology. (ed–Murchison)–Clark University Press. অংশত পরিবর্তিত।]

জেমস্ ও ক্যানন্‌বার্ড মতের তুলনা—

উইলিয়ম্ জেম্‌স বলেছিলেন যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া

৩৯ The removal of the cerebral hemispheres not only fails to deprive the animal of emotion; on the contrary it seems to increase it....But the removal of the brain-stem is followed by the cease of emotional disturbance. This rather small region in the thalamus, seems therefore to be the seat of the emotion. As long as this emotional centre remains stimuli which ordinarily arouse rage continue to produce the same rage. They may even produce an increased rage when parts of the brain lying further forward are removed, provided this emotional centre is not damaged. The exaggeration of the emotion···is attributed to the fact that emotion is characteristically held in check by the activities of the cerebral hemispheres. Cannon and his collaborators have definitely concluded that emotion is therefore a function of a particular part of the brain-stem rather than an experience depending on the sensations from the vital organs and muscles. This is called a "central theory" as contrasted with a "peripheral" theory like the one offered by James & Lange. Murphy—A Briefer General Psychology, pp. 82-83

মাত্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রাহকযন্ত্র সেই উদ্দীপক স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে আন্তর যন্ত্র (viscera) এবং পেশীগুলিতে প্রেরণ করে এবং সেখানে তীব্র বিক্ষেপ দেখা দেয়। এই বিক্ষেপগুলি আন্তর যন্ত্র ও পেশীগুলি থেকে স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে বিপরীত দিকে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে চেতনা জাগায়। **সমগ্র দেহযন্ত্রের বিক্ষেপের এই চেতনাই হচ্ছে প্রক্ষোভ।** তিনি প্রক্ষোভের ব্যাপারে পুষ্পাক্ষের কোন ক্রিয়ার কথা বলেন নি। পুষ্পাক্ষের পার্শ্ববর্তী অনুপুষ্পাক্ষের কোন কেন্দ্র প্রক্ষোভ-নিয়ন্ত্রণ করে, একথা তাঁর মতের মধ্যে নেই। মস্তিষ্কের কেন্দ্রের ক্রিয়াও নিতান্ত গৌণ। শেরিংটন কতকগুলি কুকুরের দেহে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের সঙ্গে আন্তর যন্ত্রের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে দেখলেন, সেই কুকুরের দেহে রাগরূপ তীব্র প্রক্ষোভের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, জেম্‌স-এর এই দাবি যে, "আন্তর যন্ত্র ও পেশীর বিক্ষেপের সমগ্র অনুভবই হচ্ছে প্রক্ষোভ", এ কথা সত্য নয়। তার কারণ যে-কুকুরগুলির মেরুদণ্ডের ওপর দিকে আন্তর যন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে বাহিত স্নায়ুশিরা অস্ত্রোপচার করে ছেদ করা হয়েছে, জেম্‌স-এর মত সত্য হলে তাদের অনুভূতির সম্ভাবনাই দূর করা হয়েছে। তা ছাড়া কোন কোন স্নায়বিক রোগে হাসি কান্না ইত্যাদি প্রক্ষোভের বাহ্য প্রকাশ থাকলেও প্রক্ষোভের কোন অনুভূতি থাকে না। এতেও জেম্‌স-এর মত অপ্রমাণিত হয়।

ক্যানন্‌ এবং বার্ড পরীক্ষাকালে এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলেন যে, আন্তর যন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকে আন্তর যন্ত্রে স্নায়ুসূত্রগুলির ঊর্ধ্বগমন ও নিম্নাবতরণের (incoming and outgoing nerves) পথ হচ্ছে পুষ্পাক্ষের (thalamus) ভেতর দিয়ে, অথবা অনুপুষ্পাক্ষের (hypothalamus) গা ঘেঁষে এবং **তাঁরা দেখলেন অনুপুষ্পাক্ষেই কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে এই কেন্দ্রগুলিই হচ্ছে প্রক্ষোভ এবং তার অনুভূতি-নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র।** প্রক্ষোভ সম্পর্কে তাঁদের মত হল যে বাইরের উদ্দীপক দেহের গ্রাহকযন্ত্রকে উত্তেজিত করে। সেই উদ্দীপনা তৎক্ষণাৎ আন্তর যন্ত্র ও পেশীতে প্রত্যাবর্তক্রিয়া হিসাবে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া জাগায়, একথা ঠিক নয় (জেম্‌স এ কথাই বলেছিলেন)। তাঁদের মতে, গ্রাহকযন্ত্র থেকে উদ্দীপনা পুষ্পাক্ষের ভেতরে অনুপুষ্পাক্ষের কোন কোন

কেন্দ্রকে উদ্রিক্ত করে। সেখান থেকে যুগপৎ সে উদ্দীপনা একদিকে আন্তর যন্ত্র ও পেশীতে এবং উর্ধ্বদিকে মস্তিষ্কের দিকে বাহিত হয়।[৪০]

নিচে ছবি দিয়ে দুই মতের প্রভেদ বোঝানো হচ্ছে।

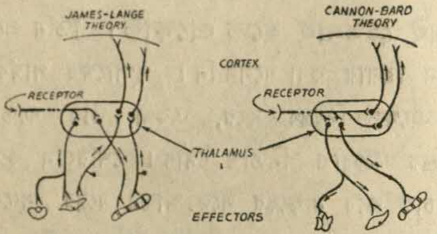

ল্যাং-জেমস্ মতে উদ্দীপক তৎক্ষণাৎ সমবেদীতন্ত্রকে আলোড়িত করে। সমবেদীতন্ত্রের উত্তেজনা স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বমস্তিষ্কে পৌঁছলে যে চেতনা জাগে তা-ই প্রক্ষোভ। গ্রাহক-ইন্দ্রিয় (receptor) থেকে গ্রাহক-স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে পুষ্পাক্ষের মধ্য দিয়ে সমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়াশীল পেশী (effectors) ও আন্তর যন্ত্রে (viscera) উত্তেজনা চালিত হয়। এই পেশী ও আন্তর যন্ত্রে উত্তেজনা আবার বিপরীত পথে পুষ্পাক্ষের মধ্য দিয়েই উর্ধ্ব-মস্তিষ্কে চালিত হয়ে প্রক্ষোভের চেতনা জাগায়।

ক্যানন-বার্ড মতে প্রক্ষোভের চেতনা এবং আন্তর যন্ত্রে বিক্ষেপ এই দুইই যুগপৎ অনুপুষ্পাক্ষের কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত। গ্রাহক-ইন্দ্রিয় যন্ত্র (receptor) থেকে উদ্দীপক অনুপুষ্পাক্ষে পৌঁছে। সেই কেন্দ্র থেকে যুগপৎ উর্ধ্বমস্তিষ্কে ও নিম্নে আন্তর যন্ত্রের সক্রিয় পেশীতে চালিত হয়। প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া অভিন্ন নয়। আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার অনুষঙ্গী হিসাবে প্রক্ষোভের অনুভূতি জাগে। যদিও ছবিতে পুষ্পাক্ষের মধ্যে অনুপুষ্পাক্ষ পৃথক করে দেখানো হয় নি, ক্যানন-বার্ড মতে অনুপুষ্পাক্ষ প্রক্ষোভের প্রকৃত কেন্দ্র।

[C. T. Morgan-এর Physiological Psychology অনুসরণে]

প্রক্ষোভের ব্যাপারে বিশেষত প্রক্ষোভের প্রকাশের ব্যাপারে, অনু-পুষ্পাক্ষের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যানন্-বার্ড-এর মতও সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে সমর্থ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। অনুপুষ্পাক্ষ নিশ্চিতভাবেই প্রক্ষোভের প্রকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, কিন্তু প্রক্ষোভের বোধ বা অনুভূতি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ভিন্ন সম্পূর্ণ

৪০ The theory gives a key position to the hypothalamus. It assumes that when stimuli are emotion-provoking, the hypothalamus is activated by the incoming impulses. This in turn relays such impulses to the cerebral cortex. These, according to the theory, arouse feelings. Simultaneously the hypothalamus sends impulses to our viscera (giving us "butterflies" or nausea) and to our skeletal muscles (making us tremble, run, or go through facial expressions of emotions). Munn—Psychology, pp. 121-22

ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্তঃপুষ্পাকের কেন্দ্রগুলিকে বৈদ্যুৎশক্তি দ্বারা কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে প্রক্ষোভের বাহ্য প্রকাশ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাতে প্রক্ষোভের প্রাণ যে অনুভূতি তা পাওয়া যায় না।[৪১]

প্রক্ষোভের প্রকাশ কি সর্বদা সুনির্দিষ্ট?—প্রবল প্রক্ষোভ—যেমন রাগ ও ভয়—তাদের প্রকাশ সুস্পষ্ট। দেহে, মুখভঙ্গীতে, পেশীক্রিয়ায়, রক্তচাপের বৃদ্ধি ও হ্রাসে প্রক্ষোভের নিজস্ব পরিচয় মেলে। ওয়াট্সন প্রমুখ ব্যবহারবাদীরা মন বা অন্তঃকরণ বলে কিছু স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা তাই প্রক্ষোভকে দেহযন্ত্রের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন -দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টিত। ওয়াট্সন্-এর মতে যদিও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এ বিষয়ে প্রভেদ আছে তবুও প্রত্যেক নির্দিষ্ট প্রক্ষোভের কতকগুলি সাধারণ প্রতিক্রিয়া আছে, যা দিয়ে সেই প্রক্ষোভটিকে অন্য প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়া যায়। প্রক্ষোভের এই দৈহিক প্রকাশের ক্ষমতা জন্মগত এবং তাদের খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। ভয়ের বেলায় যে সাধারণ দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায়, সেগুলি রাগের বেলার প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষাও হয়েছে। বীক্ষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভয়-উৎপাদন করে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, রক্তচাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সব ব্যক্তির মধ্যেই একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ওয়াটসন্ একবছরের নিচের কয়েকটি বিভিন্ন বয়সের শিশুকে নিয়ে পরীক্ষা করে

---

৪১ ম্যাসারম্যান্ এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করেছেন—Nobody has yet shown that the hypothalamus activates full emotional experience or behaviour. There is, however, clear evidence that it activates overt expression resembling those which occur in emotion. When the hypothalamus is electrically stimulated in a cat, for example, the animal retracts its ears, crouches, growls, raises its back, lashes its tails and shows other reactions resembling those which occur in emotion. But these reactions can be turned on and off, as it were by the experimenter. The animal is reacting more like a puppet than a living organism. Its activity is mechanical, diffuse, stereotyped, stimulus-bound and seems to carry no more emotional connotation than would the contraction of skeletal muscle induced by stimulation of an efferent (motor) nerve. On these phenomenological grounds alone...pseudo-affective reactions differ significantly from those in motivationally determined emotional states. Masserman—Behaviour & Neurosis, p. 35

দেখেছেন যে একটি ধাতুদণ্ডে অকস্মাৎ জোরে আঘাত করে যে কর্কশ শব্দ উৎপন্ন হয়; তাতে সব কটি শিশুই ভয় পায়। সেই ভয়ের প্রকাশ (কান্না, কাঁপা, হাত-পা ছোঁড়া, জড়িয়ে ধরার চেষ্টা) সব শিশুতেই প্রায় একই রকম। আবার

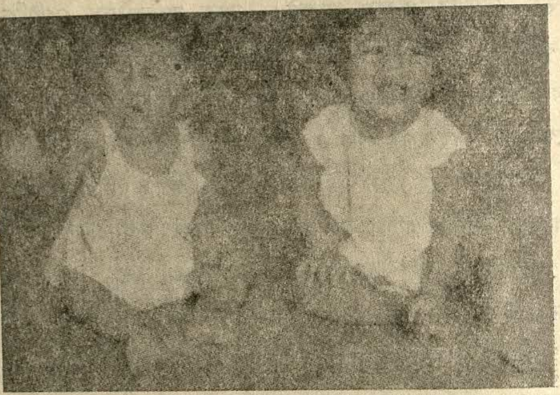

(১) ভয়ে কান্না [ফটো—শ্রীকল্যাণ গুহ]

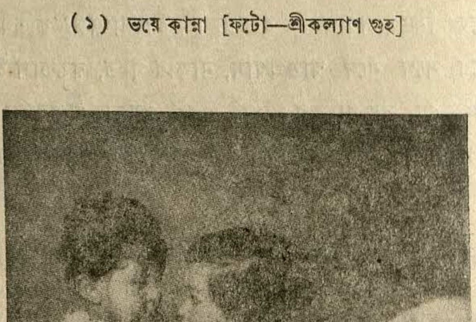

(২) ষড়যন্ত্রে উৎসুক্য [ফটো—শ্রীদিলীপ গুহ]

কিছু উঁচু থেকে হঠাৎ অন্য কোন ব্যক্তির প্রসারিত হাতের ওপর ফেলে দিলে অথবা জলের টবে হঠাৎ ডুবিয়ে দিলে সব শিশুতেই মোটামুটি একই প্রকার ভয়ের দৈহিক প্রকাশ দেখা যায়। আবার শিশুর হাত-পা ছোঁড়া, জোর করে বাধা দিলে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মুখ থেকে দুধের বোতল কেড়ে নিলে, সব শিশুই

রেগে যায় এবং এই রাগের প্রকাশ সব শিশুর বেলায়ই মোটামুটিভাবে একই রকম। এবং রাগের দৈহিক প্রকাশ সুস্পষ্টভাবেই ভয়ের প্রকাশের থেকে পৃথক।[৪২]

(৩) আনন্দের হাসি [ফটো—শ্রীদিলীপ গুহ]

বড়দেরও পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভয়-উৎপাদন করে তার প্রকাশ বৈজ্ঞানিক রীতিতে লক্ষ্য করে দেখা হয়েছে। আগে কিছু না বলে ব্যক্তিকে একটি বিশেষ চেয়ারে বসানো হয়। পরীক্ষক তার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন, তার নাড়ীর গতি, রক্তচাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করতে থাকেন এবং হঠাৎ চেয়ারটি পিছন দিকে চিৎ হয়ে দ্রুত পড়ে যেতে থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই হঠাৎ ৬০° ডিগ্রী হেলে থেমে যায়। এই চেয়ারের পড়ে যাওয়া এবং চিৎ হতে হতে থেমে যাওয়া, সবই আগে থেকে যান্ত্রিক উপায়ে স্থির করা আছে,এবং এতে পরীক্ষিত ব্যক্তির বাস্তবিক কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনানেই। কিন্তু হঠাৎ এ রকম চিৎ হয়ে পড়ে যেতে থাকলে ভয় যেটা হয়, সেটা অকৃত্রিম। এই প্রকার পরীক্ষা পৃথক পৃথক ভাবে অনেক ব্যক্তির ওপর করে দেখা যায় যে হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হওয়া, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি দৈহিক

---

৪২ Watson found, in contrast to the fear response, a rather well-defined rage response shown in a characteristic cry, a catching of the breath, struggling, stiffening of the body, thrashing of the arms, and kicking, for the most part, movements aroused by something which restrained the infant's free use of his limbs. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 88

পরিবর্তনগুলি সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি একই রকম। এমন কি, যে সব ব্যক্তির এই পরীক্ষা-বিষয়ে পূর্ব-অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের বেলায়ও আবার এই পরীক্ষার সময়, প্রথম বারের মতো না হলেও, মোটামুটি একই ধরনের দৈহিক চাঞ্চল্য দেখা যায়। অর্থাৎ সেই পরীক্ষাতেও দেখা যায় যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের বেলাতেও ভয়ের প্রকাশের মোটামুটি একই রকম প্যাটার্ন আছে।

কিন্তু ক্যানন্ তাঁর পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা ওয়াট্সন্-এর সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভয় ক্রোধ এবং কঠিন বেদনা এই তিনের বেলাতেই দৈহিক প্রকাশ ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ায় কতকগুলি মিল আছে, তিনের বেলাতেই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অধিকতর সক্রিয়তার ফলে রক্তস্রোতে অধিক পরিমাণে অ্যাড্রিনিন্ ক্ষরিত হয়। সে জন্যে কোন ব্যক্তির প্রক্ষোভকালে মুখমণ্ডলের পরিবর্তনের ছবি থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় না, এতে রাগ ভয় বা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

গুডেনাফ্ শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রক্ষোভ-প্রকাশক বহু ছবি সংগ্রহ করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

(১) একেবারে শৈশবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সঙ্গে সমস্ত দেহযন্ত্রেরই অ-বিশ্লেষিত ও অস্পষ্ট বিক্ষেপ দেখা দেয়। শিশুর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র তখনো স্পষ্ট করে গড়ে ওঠে নি এবং সেই জন্যে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকাশও অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। কিন্তু ওয়াটসন্-এর মতো তিনিও স্বীকার করেন যে ছোট শিশুর মধ্যেও রাগ ভয় কৌতূহলের প্রভেদ কিছু না কিছু থাকেই।

(২) কোন্ প্রক্ষোভ প্রীতিকর এবং কোন্টা অপ্রীতিকর তা নিশ্চিতই স্পষ্টভাবেই শৈশবেও পৃথক করা যায়।

(৩) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ও আন্তর যন্ত্রগুলির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের প্রকাশভঙ্গীরও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বড় হলে ভয় ও ক্রোধের অসঙ্কোচ প্রকাশ অনেকটা সংযত হয়। আবার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়। পূর্বে যা ভয়ের বস্তু ছিল তা আর ভীতি-উৎপাদন করে না সত্য, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচের ভয়, পরীক্ষায় ফেলের ভয় ইত্যাদি নতুন ভয়ের বস্তু তাদের স্থান অধিকার করে। তা ছাড়া, প্রক্ষোভগুলি সাধারণ, অবিশ্লেষিত অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া থেকে, তাদের মধ্যে নানা স্তরবিভেদ ও প্রকাশভঙ্গীতে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা দেয়। সমাজজীবনের

প্রক্ষোভের বিভিন্ন অভিব্যক্তি

অভিজ্ঞতাও এই পরিবর্তন সম্মার্জন সংশোধনের সহায়ক হয়। কাজেই প্রক্ষোভের প্রকাশ সম্পূর্ণই জন্মগত, অপরিবর্তনীয় এবং জন্মকালেই সুনির্দিষ্ট এমন নয়।[৪৩]

একথা সহজেই বোঝা যায় যে বড়দের বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশ অনেকটা সুস্পষ্ট। সামাজিক শিক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশের বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে যায়। তা থেকে কোন্ মুখের ভাব কোন্ প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তা বুঝে নেওয়া খুব কঠিন হয় না। অভিনেতারা এই কথাটি বিশেষভাবেই জানেন এবং তাঁরা সেই মুখের ভাব বা অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দর্শকদের সামনে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হন। কিন্তু এটা দেখা যায় যে বিষম উত্তেজনাকর অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষার দ্বারা আহৃত প্রক্ষোভের সুচিহ্নিত মুখোশ খসে পড়ে এবং তার প্রক্ষোভের প্রকাশগুলি শিশুর প্রক্ষোভের প্রকাশের মতোই স্থূল, অমার্জিত ও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ল্যাণ্ডিস্ কয়েকজন শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন প্রক্ষোভ-উদ্রেককারী অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তার পর তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া আর পাওয়া

---

৪৩ Goodenough thinks that the case is strong for believing that the different emotional patterns arise through maturation. They differentiate gradually step by step, from the original diffuse mass response which might be called "emotion in general". It is quite likely that this maturation process may go on for years. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 89

ক্যাথারিন্ ব্রীজেস্ প্রক্ষোভের ক্রমবিবর্তনের এক বিস্তৃত ছক্ তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করেছেন। তাঁর মতে জন্মকাল থেকে দু'মাস পর্যন্ত শিশুর সাধারণ উত্তেজনা (general excitement) শুধু লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু স্পষ্ট কোন প্রক্ষোভের প্রকাশ থাকে না। তিন মাস বয়সে বিরক্তি (distress) ও আনন্দের (delight) স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। ছ মাস বয়সে ভয় ঘৃণা বিরক্তি রাগ ও আনন্দ স্পষ্ট বোঝা যায়। এক বছর বয়স হলে আনন্দের স্তরভেদ ও বড়দের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ স্পষ্ট হয়। ১৮ মাসে ঈর্ষা, বড়দের প্রতি ভালোবাসা ও ছোটদের প্রতি ভালোবাসার পার্থক্য বোঝা যায়। দু বছর বয়স হলে কৌতূহল বিস্ময় আমোদ ইত্যাদি সূক্ষ্মতর প্রভেদ দেখা দেয়। এ বিষয়ে আরো আলোচনার জন্যে "জীবন পরিক্রমা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে বিশেষত্ববর্জিত অনির্দিষ্ট সাধারণ অস্বস্তি ও উদ্বেগের প্রকাশ।[৪৪]

মার্ফি-র মতে প্রক্ষোভের প্রকাশের দু'টি উপাদান আছে—(১) সাধারণ ও (২) বিশেষ। অতিমৃদু প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অথবা অতিতীব্র প্রক্ষোভের বেলায় প্রক্ষোভ প্রকাশের সাধারণ অনির্দিষ্ট উপাদানই আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু কোন প্রক্ষোভ অতিমৃদু বা অতিতীব্র না হলে তখন প্রক্ষোভের নির্দিষ্ট বিশেষ উপাদান দেখা দেয়। অতিমৃদু প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হয় না এবং অতিতীব্র প্রক্ষোভের বেলায় প্রাণীর-দেহযন্ত্র প্রতিক্রিয়া ব্যাপারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ মার্ফি-র মতে ব্যক্তির বয়স ও দেহযন্ত্রের পরিণতির ওপর নির্ভরশীল। বাল্যে প্রক্ষোভের প্রকাশে যে স্তরবিভাগ ও সূক্ষ্মতা দেখা যায়, তার জন্যে শুধু দৈহিক মানসিক পরিণতিই নয়, সমাজজীবনের শিক্ষাও অনেকখানি দায়ী।[৪৫]

প্রক্ষোভের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ—জেম্স-এর পর থেকেই প্রক্ষোভের সঙ্গে আন্তর যন্ত্র এবং স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বিশেষত সমবেদীতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা মনোবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং স্নায়ুমণ্ডলীর অন্যান্য পরিবর্তনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে প্রক্ষোভের পরিমাপের চেষ্টা দেখা যায়। রাগে ভয়ে দুঃখে আনন্দে আন্তর যন্ত্রের এই পরিবর্তনগুলি সুস্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক পরিমাপযোগ্য। কিন্তু কেবলমাত্র প্রক্ষোভের ফলেই এই পরিবর্তনগুলি ঘটে এমন নয়। এই পরিবর্তন ব্যক্তির

৪৪ Under these conditions, the emotions were found not to be distinguishable from one another. There was no consistent external pattern of expression corresponding to any specific emotion or to any specific situation. There was not even a characteristic happy expression and a characteristic pain or distress expression. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 44

৪৫ We would point out that specific emotional patterns are absent in little infants but that they are fairly clear among adults if the emotion is not too intense. The development of specific emotional patterns during childhood seems to be the result of both maturation and of the learning process in social situations. On the whole, maturation seems to explain the main outlines of the different expressive patterns, fear, rage, disgust, joy, etc. But social factors give richness and subtlety to all emotional expressions. Ibid, p. 45

নানা অবস্থার ওপর নির্ভর করে, সুতরাং এই পরিমাপ সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য এমন কথা জোর করে বলা যায় না।[৪৬]

রক্তচাপের পরিবর্তনের সাহায্যে প্রক্ষোভের পরিমাপ—দেহের রক্তচাপ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে। হৃদযন্ত্র এবং রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া ও অবস্থার উপর কোন মুহূর্তের রক্তচাপ নির্ভর করে। হৃদযন্ত্র যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন রক্ত দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং রক্তবহা নাড়ীগুলির (arteries) ওপর সর্বপেক্ষা অধিক চাপ পড়ে। এটাকে বলে systolic pressure। আর রক্ত যখন হৃদযন্ত্রে ফিরে যায়, হৃদযন্ত্র রক্তে পূর্ণ হয়, তখন রক্তবহা নাড়ীর ওপর চাপ থাকে সবচেয়ে কম। একে বলে diastolic pressure। এই দুই চাপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তি সুস্থ স্বাভাবিক ও শান্ত। হৃদযন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপের লেখ (graph) Electro cardiograph যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। প্রক্ষোভের অশান্ত অবস্থায় উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপের সম্বন্ধের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার লেখের মধ্যেও তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। প্রক্ষোভের উত্তাল অবস্থায় রক্তবহা নাড়ীতে রক্তচাপের আধিক্যজনিত হস্তপদ বিভিন্ন অঙ্গ স্ফীত হয় এবং এই পরিবর্তন Plethysmograph যন্ত্রে স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়ে। এই বিভিন্ন পরিমাপযন্ত্র ব্যবহার দ্বারা বীক্ষণাগারে একই অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রক্ষোভগত পার্থক্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মোটামুটি-ভাবে পরিমাপ করা যায়। বীক্ষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভয় রাগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে এই সব যন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্তির বিভিন্ন প্রক্ষোভকালে রক্তচাপের লেখের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতির পার্থক্যের মোটামুটি একটা মাপকাঠি পাওয়া যায়।[৪৭]

---

[৪৬] The participation of the autonomic nervous system with its attendant changes in pulse rate, blood pressure, breathing has held out to psychologists the hope that measures of such bodily changes might give a clear measure of emotion. Such hopes have not been fully realised. The autonomic nervous system is not exclusively concerned with emotion, and its complex organization adds further to the difficulty. Still measures of bodily processes are our best indicators of emotion. Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 105

[৪৭] During emotional reaction the distribution of blood in the limbs, is greatly altered. Often the variation in the amount of the blood present in the hand and forearm are sufficiently great to make possible the direct measurement of such changes by means of a plethysmograph. Because of the activity of the heart and blood vessels, many emotional responses can be measured by this device, but only roughly.

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপাতের সাহায্যে প্রক্ষোভের পরিমাপ— সুস্থ সাধারণ মানুষের নিশ্বাস গ্রহণের সময় এবং প্রশ্বাস পরিত্যাগের সময়ের মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধ হচ্ছে ১ : ৪ ; কিন্তু প্রক্ষোভের অশান্ত অবস্থায় ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং পূর্বোল্লিখিত অনুপাত বেড়ে ১ : ২ এমন কি, ১ : ১ও হতে পারে। কোন কোন মনোবিদের মতে অন্যায় কাজ করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি কাজের সময় যে মানসিক চাঞ্চল্য ঘটে তা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ের অনুপাত দিয়ে বেশ ধরতে পারা যায়। ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা তা ধরবার এই (**Lie-detectors**) এই ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে। তবে তার ফল সম্পূর্ণ নির্ভুল এমন দাবি করা যায় না। হয়তো ঝানু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা বলবার কালে কোন চাঞ্চল্যই মনে জাগে না। তার বজ্জাতি তো যন্ত্রে ধরা পড়বে না।[৪৮]

প্রক্ষোভের আরো দুটি দৈহিক পরিবর্তনের মাপ (G. S. R. and E. E. G.)—প্রক্ষোভের বেলায় আন্তর পরিবর্তনের জন্যে স্বেদগ্রন্থিগুলি উদ্রিক্ত হয়, তাই ভয়ে কালঘাম দেখা দেয়। তাতে গাত্রচর্মের বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। এটা যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়। গাত্রচর্মের এই পরিবর্তনকে বলা হয় **Galvanic skin reflex** (সংক্ষেপে GSR)। মস্তিষ্কের ওপরে কয়েকটি জায়গায় তড়িদ্দ্বার (electrodes) লাগিয়ে মস্তিষ্কের ভেতরে বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি ও ছন্দ পরিমাপ করা যায়। সুস্থ শান্ত অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে অনেকটা নিয়মিত ছন্দে সেকেণ্ডে প্রায় দশবার ছোট ছোট বৈদ্যুৎতরঙ্গ-সমন্বিত প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এগুলিকে Alpha waves বলা হয়। কিন্তু চোখ খুলে কোন বিষয়ে মনোযোগ করলে এই তরঙ্গগুলি তখন আর দেখা যায় না। তখন মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের ক্রিয়া শুরু হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গের ক্ষুদ্র উত্থানপতন তখন বিঘ্নিত হয়। গভীর ঘুমের মধ্যে আবার আর এক প্রকার

---

৪৮ The ratio between the time taken to inhale and the time taken to exhale (including the quiet period before a new inhalation) is usually about 1 : 4; but during in tense emotion it may rise as high as 1 to 2 or even 1 to 1. Because of this fact, some experimenters have thought that a lie-detecting devise could be devised for cross-examination purposes. Murphy—A Briefer General Psychology. p. 105.

—তুলনায় আর একটু বড় বড় ও ধীরগতি—ছন্দায়িত তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করা যায়, এগুলিকে **Delta waves** বলা যায়। একেবারে শিশুদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের বৈদ্যুৎতরঙ্গের লেখে **Delta wave**-এর আধিক্য দেখা যায়। বড়দের মস্তিষ্কের বৈদ্যুৎতরঙ্গের লেখে আর এক প্রকার তরঙ্গের আধিক্য

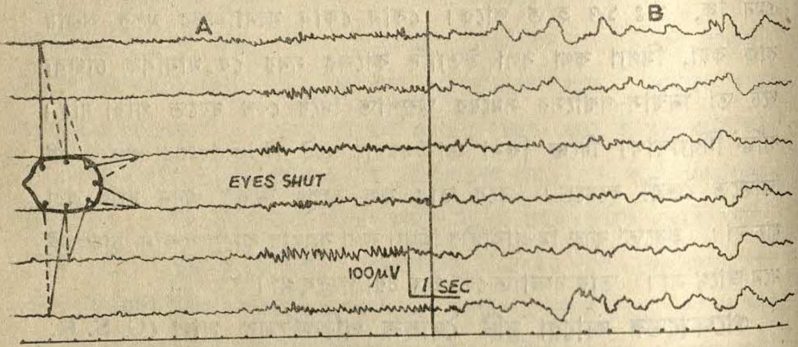

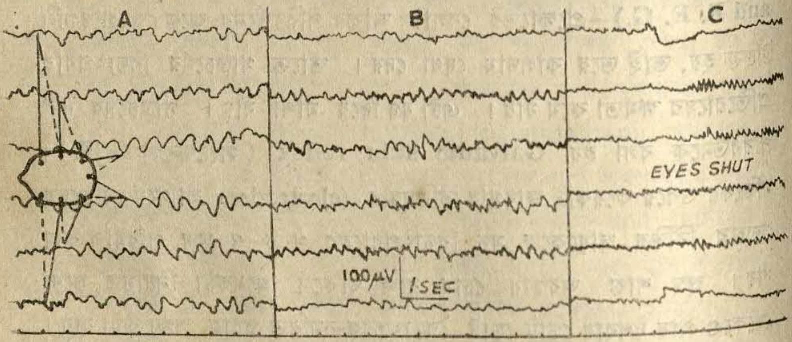

I. EEG of Adult : A. Awake (i) eyes open (ii) eyes B. Asleep, delta waves.

II. EEG of children: A. Age 6 months-delta waves, B. Age 4 years. Theta waves, C. Age 8 years (i) eyes open (ii) eyes shut-alpha waves.

শান্ত ও অশান্ত অবস্থার তরঙ্গগুলির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

[Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology অনুসরণে]

দেখা যায়, এগুলিকে বলে Theta waves। প্রক্ষোভের উত্তেজনায় সময় মস্তিষ্কের Alpha waves-এর লেখ অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং অসমান ও বিশৃঙ্খল Theta waves-এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত মানসিক বিকারেই প্রক্ষোভের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা থাকে। এবং এ সমস্ত রোগীর মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির

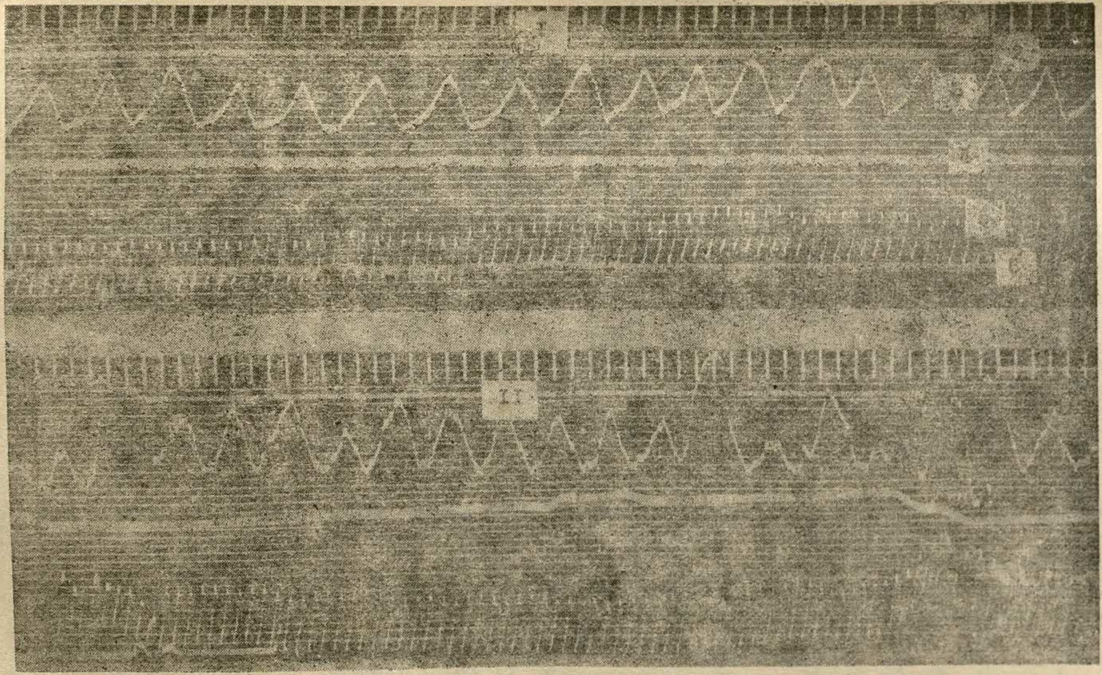

I. দশ বছরের একটি ছেলের—যার প্রক্ষোভ সুস্থিত।
II. অস্থিত-প্রক্ষোভ এগারো বছরের একটি ছেলের। এই ছেলেটি উদ্বেগ-উন্মায়ুগ্রস্ত বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।
1. সময়-রেখা। 2. দেহের নাড়াচাড়া। 3. শ্বাসপ্রশ্বাস। 4. G. S. R. 5. রক্তচাপ। 6. হাতের কাঁপুনি।
উন্মায়ুগ্রস্ত ছেলেটির শ্বাসপ্রশ্বাসের অনিয়মিত রেখ, রক্তচাপের পরিবর্তন এবং G. S. R.-এর রেখাগুলির পরিবর্তন লক্ষণীয়।
[Sherman—Basic Problems of Behaviour অনুসরণে]

I

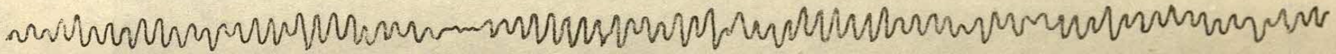

II

I. দশ বছরের সুস্থিত একটি ছেলের E.E.G.

II. এগারো বছরের একটি ছেলের E.E.G—ছেলেটি প্রক্ষোভের দিক থেকে অত্যন্ত অব্যবস্থিত। লেখের মধ্যে Alpha waves-এর আকারে অনিয়মিততা লক্ষণীয়।

[Sherman—Basic Probelms of Behaviour অনুসরণে]

বৈদ্যুৎতরঙ্গের লেখে (**Eletro-Encephalogram সংক্ষেপে EEG**) Theta তরঙ্গের আতিরিক্ত আধিক্য। কাজেই শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ীর চঞ্চলতা ও মস্তিষ্কের বৈদ্যুৎতরঙ্গের লেখের সাহায্যে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অনুমান (diagnosis) করা যায়।[৫০]

রেটিং স্কেল—বীক্ষণাগারে নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রধান কয়েকটি প্রক্ষোভ সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্যক্তির সেই প্রক্ষোভের প্রকাশ এক সঙ্গে কয়েকজন পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করে, খুব বেশী, বেশী, মধ্যম, কম, খুব কম—এই পাঁচ প্রকার দলে চিহ্নিত করেন। এভাবে বহু ব্যক্তিকে একই প্রক্ষোভ-বিষয়ে পূর্বানুরূপ স্কেলে (five-point scale) চিহ্নিত করে পরস্পর তুলনা করা চলে। পর্যবেক্ষকেরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্ভবত একই ভাবে চিহ্নিত করবেন না। তাই তাঁদের বিচারের একটা গড়-নির্ধারণ দ্বারা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বের করে কোন্ প্রক্ষোভ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্থান কোথায় তা নির্ধারণ করে তার প্রক্ষোভ-জীবনের একটা তুলনামূলক ধারণা করা সম্ভব হয়।

পর্যবেক্ষণ ও মনোবিকলন-পদ্ধতি ব্যবহার-দ্বারা প্রক্ষোভের পরিমাপ—সুশিক্ষিত কয়েকজন পর্যবেক্ষক নির্দিষ্ট একদল ছেলেকে ক্লাস, খেলার মাঠ, সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা, শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি নানা অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের প্রক্ষোভের বিভিন্ন প্রকাশ দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করে, পূর্বের ন্যায় এক স্কেলে চিহ্নিত করেন। এখানেও পূর্বপদ্ধতিতে গড়-নির্ণয় করে কোন ব্যক্তির প্রক্ষোভ-জীবনের একটি তুলনামূলক চিত্র মোটামুটি পাওয়া যেতে পারে। স্বভাবতই এই পদ্ধতি ছোটদের বেলায়ই ব্যবহারের উপযোগী।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রক্ষোভ-জীবনের অশান্তি-অবদমনের সন্ধান পাওয়া যাবার পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রএডীয় মনোবিকলন। ব্যক্তি শান্তভাবে আরামে ইজিচেয়ারে শুয়ে তার মনে যা আসে বিনা বাধায় তা অনর্গল বলে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে ব্যক্তি এই বলে যাওয়া ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত

---

৫০ In an older child or an adult, theta waves are frequently present with no obvious cause, this is a strong indication of emotional instability. In a group of sixty-six aggressive psychopaths, fortythree (65 p.c.) were found to have an abnormally high proportion of theta waves, as against only 10—15 p. c. of the general population. Rex & Margaret Knight.

হয়, থেমে যায়। আর কিছু বলতে অনিচ্ছুক হয়। অভিজ্ঞ মনোবিকলক এই বাধাগুলি (barrier) বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যক্তির প্রক্ষোভ-জীবনে কোথায় অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব আছে, তা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন।

প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি (Questionnaire Method)—এই পদ্ধতির একটি পরিচিত রূপ হচ্ছে Pressey. X.—O. test. Form B। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষিত ব্যক্তির সামনে তিনটি শব্দতালিকা উপস্থাপিত করা হয়। ব্যক্তিকে বলা হয়, প্রথম তালিকায় যে-যে শব্দগুলি গর্হিত বা আপত্তিকর বলে মনে করে, সেগুলি সে কেটে দেবে। দ্বিতীয় তালিকার শব্দগুলি তার পক্ষে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ-উৎপাদক সেই শব্দগুলির চারদিকে বৃত্ত অঙ্কন করে চিহ্নিত করবে; আর তৃতীয় তালিকায় যে শব্দগুলি এমন দ্রব্য বা অবস্থা বোঝায়, যেগুলি তার আগ্রহ বা আনন্দ-উৎপাদন করে, সেগুলিকে সে চিহ্নিত করবে। এবার এই তিনটি তালিকায় চিহ্নিত শব্দ-গুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে গর্হিত, সবচেয়ে উদ্বেগকর, অথবা সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার মনে হয়, সেগুলিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। এই চিহ্নিত শব্দগুলির মোট সংখ্যাকে সেই ব্যক্তির **score of emotionality** বলা হয়। কারণ, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্যক্তির কাছে যা গর্হিত, উদ্বেগকর অথবা আকর্ষণীয়, তার সঙ্গে ব্যক্তির প্রক্ষোভের অবশ্য যোগ আছে। বহু পরীক্ষার পর এটা দেখা গেছে যে, একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ যে শব্দগুলিকে বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করে, তাদের একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে। এটাকে standard score বা সাধারণ মান বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এই সাধারণ মান থেকে যতটা কম বা বেশী, তা দিয়ে ব্যক্তির **score of idiosyncracy** নির্দিষ্ট হয়। নানা পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে সব ছেলেমেয়ের score of emotionality এবং score of idiosyncracy সাধারণের চেয়ে অনেকখানি বেশী, তাদের বিদ্যালয়ে নানা প্রক্ষোভ বিষয়ক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ-জনিত অশান্তিও বেশী।[৫১]

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভপূর্ব অনুভূতি, বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস, ইমোশনাল্ ডিস্‌পোজিশ্যান, টেম্পারামেণ্ট

৫১। Murphy—A Briefer General Psychology, pp 104-105

(Sense-feelings, Emotions, Emotional moods, Sentiments, Emotional dispositions, Temperaments)

অনুভূতি বোঝাতে নানা রকম নাম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে নামগুলির অর্থ অনেক সময় সুনির্দিষ্ট নয়। সাধারণত অনুভূতির নানা স্তর বোঝাতে যে নামগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি (Sense-feeling)—টক্‌টকে লাল রং দেখে শিশু খুশী হয়, তেতো কুইনিন খেলে বিরক্ত হয়। এ রকম প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত যে অনুভূতি, তাদের বলা হয় ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। এরা হচ্ছে সব চেয়ে নিচু জাতের অনুভূতি। এরা ভাব বা কল্পনা-দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়।

প্রক্ষোভ (Emotion)—ভাব বা কল্পনা-দ্বারা প্রভাবান্বিত, উদ্দীপক অবস্থার সম্মুখীন, কোন দ্রব্য বা ঘটনাকে উপলক্ষ করে অনুভূতির অত্যন্ত প্রকাশমান অবস্থা, যাকে বলেছি প্রক্ষোভ, যেমন রাগ ভয় ইত্যাদি। এ অবস্থাগুলি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী।

প্রক্ষোভ-পূর্ব অনুভূতি (Emotional mood)—অনুভূতির অস্পষ্ট অবস্থা যেখানে তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুভূতি দানা বেঁধে ওঠে নি, তাকে বলা হয় 'ইমোশ্যনাল্ মুড' (emotional mood)। বিরক্তির মেঘ জমছে, এখনো কোন উপলক্ষ করে তা ফেটে পড়ে নি, এ অবস্থা, অথবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পাতলা হয়ে যায় নি, সে অবস্থাকে বলা হয় মুড্; এ অবস্থা সাধারণত প্রক্ষোভের চেয়ে দীর্ঘতর কাল স্থায়ী।

বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস (Sentiment)—কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। রিবো (Ribot) সেন্টিমেন্ট কথাটাকে সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের উচ্চস্তরের ভাব (highly developed abstract ideas) -সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন সেন্টিমেণ্ট। কাজেই উচ্চ চিন্তায় (conceptual thinking) অসমর্থ শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রসের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন না। সেন্টিমেণ্ট বা রস ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্কশূন্য। প্রক্ষোভগুলি তা নয়। রাগ ভয় এগুলি প্রক্ষোভ। এদের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতিতে তা নয়।

প্রক্ষোভ হচ্ছে অনুভূতির উত্তপ্ত উত্তাল অবস্থা। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতি হচ্ছে শান্ত। মনের তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অনুসারে বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলিকে বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতি (**intellectual sentiments**), সৌন্দর্যানুভূতি (**aesthetic sentiments**), ও নৈতিক অনুভূতি (**moral sentiments**) এই তিন দলে ভাগ করা যায়। বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতিতে—যেমন, বিজ্ঞানুরাগ—যেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধির (**logical thinking**) নির্বাধ ব্যবহার—সেখানে শিক্ষিত মানুষ গভীর আনন্দ পায়। সৌন্দর্যানুভূতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্জিত রুচি বা সৌন্দর্যবুদ্ধির তৃপ্তি। যেমন, সেন্টিমেন্ট অব দি সাবলাইম (**sentiment of the sublime**) এবং সেন্টিমেন্ট অব দি লুডিক্রাস্ (**sentiment of the ludicrous**)। বিরাট বা মহানের সম্মুখে মানুষের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশান্ত আনন্দ,—তাকে বলা হয় সেন্টিমেন্ট অব দি সাবলাইম, আর এর বিপরীত হচ্ছে সেন্টিমেন্ট অব দি লুডিক্রাস্—কিম্ভূতকিমাকার, হাস্যকর দ্রব্য বা অবস্থার সম্মুখে আমাদের যে অনুভূতি,—যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি হচ্ছে নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, মহত্তের প্রতি আকর্ষণ এবং নীচতার প্রতি বিরূপতা। আবার আছে রিলিজিয়স্ সেন্টিমেন্ট (**religious sentiment**) বা ঈশ্বরানুভূতি—যা হচ্ছে ধর্মজীবনের ভিত্তি। বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অনুভূতির মিশ্রণ।

বর্তমানে সেন্টিমেণ্ট কথাটা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুকেন্দ্র ভাবপুষ্ট উন্নত অনুভূতির স্থায়ী অবস্থাকে বলা হয় সেন্টিমেণ্ট। সেন্টিমেণ্টে প্রকাশ পায় কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী প্রক্ষোভ। কতকগুলি ভাবসম্পদপুষ্ট বস্তু বা অবস্থা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন মায়ের মনে শিশুকে ঘিরে বিচিত্র ভাবসংশ্লিষ্ট স্থায়ী অনুভূতির কেন্দ্র বর্তমান। মাতৃস্নেহ হচ্ছে শিশুর সম্বন্ধে মার বিশুদ্ধ অনুভূতি বা সেন্টিমেণ্ট; এ অনুভূতি অবস্থা বিশেষে ভয় রাগ আনন্দ নানা প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। শ্যাণ্ড (Shand) তাই বলছেন, "**প্রক্ষোভ হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাব-জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা।**"[৫২] ম্যাকডুগ্যাল প্রত্যেক প্রক্ষোভকে যুক্ত করেছেন একটি সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে। তাই বিশুদ্ধ রস তাঁর মতে

৫২ **Shand—The Foundation of Character**

একাধিক সহজ প্রবৃত্তির মিশ্রণে এক একটি যৌগিক অবস্থা। "সহজাত অন্ধ কর্মপ্রেরণাগুলি কেন্দ্রীকৃত হয় বিশুদ্ধ রসে।"

বিশুদ্ধ রস উন্নত মানসিক অবস্থার পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বস্তু-বিবর্জিত নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্যও নয়—ম্যাকডুগ্যাল-এর মতে। তিনি বলেছেন, "কতকগুলি বিশিষ্ট দ্রব্য সম্পর্কে ব্যক্তির কতকগুলি আবেগ বা ইচ্ছা অনুভব করবার প্রবণতাকে বলা হয় সেন্টিমেন্ট। এগুলি হচ্ছে স্থায়ী অনুভূতি-প্রবণতা, যা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।" সেন্ট্‌লী-ও প্রায় এক কথাই বলেছেন, "কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভসমষ্টি আবর্তিত হয়। এই প্রক্ষোভসমষ্টির স্থায়ী মানসিক মূলকে বলা যায় বিশুদ্ধ অনুভূতি।"[৫৩] আবেগ বা বিশুদ্ধ অনুভূতির কার্যকরিতার দিকে ঝোঁক (conative tendency) আছে। এ বিষয়ে মর্টন প্রিন্স-ও ম্যাকডুগ্যাল-এর সমর্থক। কিন্তু প্রিন্স-এর ভাবমূলের (ideal origin) দিকে জোর দেন। তিনি বলছেন, "বিশুদ্ধ অনুভূতি হচ্ছে সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভাব।"[৫৪] জেমস কিন্তু ম্যাকডুগ্যাল-এর মতের সমর্থক নন। তিনি প্রক্ষোভ ও সেন্টিমেন্টের অনুভূতির দিকের (feelings element) ওপর জোর দেন। তা সহজ প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত এবং সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না। সেন্টিমেন্ট কথাটা ম্যাকডুগ্যাল ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা যে অর্থে ব্যবহার করছেন: তা প্রায় স্টাউট্‌-এর 'মেন্টাল্‌ ডিসপোজিশন্‌' কথার সমার্থক। কিন্তু স্টাউট সেন্টিমেন্ট কথাটা অনুভূতির উন্নততর ভাবপুষ্ট অবস্থা অর্থেই ব্যবহার করেছেন এবং তার মূল সহজ প্রবৃত্তিতে, এ কথাটা তিনিও জেমস্‌-এর মতো স্বীকার করেন নি।[৫৫]

রস্‌ প্রায় ম্যাকডুগ্যাল-এর প্রতিধ্বনিই করেছেন। রস-এর মতটা পাদটীকায় দেওয়া হল।[৫৬]

---

৫৩ McDougall—Outline of Psychology, p. 48

৫৪ Morton Prince, Quoted by J. S. Ross—Groundwork of Educational Psychology, p. 122

৫৫ Stout—Manual of Psychology, pp. 375-379

৫৬ What then is a sentiment? Like a complex, it is an acquired organisation of disposition in the mental structure, the only distinction being one of degree. Sentiment is the name we give to a complex at a certain level of development. When a complex acquires a certain degree of stability, when it becomes an important part of the mind, we call it a sentiment. We speak for example of a sentiment of hatred but of a feeling of emotion or anger, the difference being that the sentiment is a permanent part of ourselves, while the emotion or the feeling is merely a passing experience. J. S. Ross—Groundwork of Educational Psychology, p. 121

বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চরিত্র (**Sentiment and character**)—শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতির বিকাশ ধীরে ধীরে হয়, কারণ এটা বুদ্ধি বিচার ও তুলনা -সাপেক্ষ। আবার বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি সমান বস্তুনিরপেক্ষ বা সমান সর্বগ্রাহী নয়। মা শিশুর কাছে বহু প্রক্ষোভের কেন্দ্র, সুতরাং বলা যায় মার সম্বন্ধে তার মনে শিশুকালেই বিশুদ্ধ অনুভূতি জন্মে। প্রথম অবস্থায় এ অনুভূতি একটি বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাই এটা বস্তুগত (concrete) ও বিশিষ্ট (particular)। তারপরে শিশু মাতৃসমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ভয় আশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ প্রক্ষোভের কেন্দ্র বলে ভাবতে শেখে, সুতরাং এ-ও একটা বিশুদ্ধ অনুভূতি। কিন্তু এ অনুভূতি বিশেষকে নিয়ে নয়, এক জাতীয় বহুকে নিয়ে; কিন্তু এখানে সেই বহুরাও জীবন্ত ব্যক্তি—কাজেই বাস্তব, (concrete)। তাই বলা যেতে পারে এ অনুভূতি হচ্ছে বাস্তব অথচ বহুকে নিয়ে (concrete-universal)। কিন্তু শিশুর চিন্তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও বস্তুকে (concrete objects) অতিক্রম করে, বস্তুহীনভাবে পৌঁছে। তখন বিশুদ্ধ অনুভূতি মাকে নিয়ে নয়, মাতৃসমাদের নিয়েও নয়—মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে। নিতান্ত শিশুর জীবনে এ পরিণতি সম্ভব নয়—এ অবস্থা অত্যন্ত উচ্চ চিন্তার পরিচায়ক। **চরিত্রসৃষ্টির মানেই হচ্ছে এ রকম কয়েকটি ধ্রুব উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে জীবনের নিয়ন্ত্রণ।**

স্থায়ী ভাব ও ধাত (**Emotional disposition, Temperament**)—কোন লোককে বলি রাগী, কাউকে বলি প্রেমিক। তার মানে কি তারা সব সময় রেগেই আছে বা শুধুই প্রেম করে বেড়াচ্ছে? তা নয়। রাগী হচ্ছে তেমন প্রকৃতি বা ধাতের মানুষ, যারা অল্প কারণে রেগে যায়; প্রেমিক হচ্ছে যার প্রকৃতি হচ্ছে সহজে মানুষকে ভালোবাসা। এগুলিকে বলতে পারি তাদের স্থায়ী ভাব (disposition) বা ধাত (temperament)। এদিয়ে স্থায়ী প্রকৃতি বোঝায়। 'ডিস্‌পোজিসান' কথাটা কেউ কেউ শ্যাণ্ড (Shand) যে অর্থে 'সেন্টিমেণ্ট' কথাটা ব্যবহার করেছেন, সে অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন। ইম্যোস্যান্, ইম্যোস্যানাল মুড, ইম্যোস্যানাল ডিস্‌পোজিস্যন ও সেন্টিমেন্টের প্রভেদ স্টাউট্ এ ভাবে করছেন :—

"প্রক্ষোভ (emotion) হচ্ছে একটি বাস্তব সচেতন অবস্থা। ডিস্‌পোজিস্যন্ হচ্ছে কোন বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি প্রক্ষোভ অনুভব করবার স্থায়ী প্রবণতা। মুড ও ডিস্‌পোজিস্যন্ এক জিনিস নয়। মুড হচ্ছে একটা অস্পষ্ট

অথচ সচেতন অনুভূতির অবস্থা, কিন্তু ডিস্‌পোজিস্যন্‌ হচ্ছে একটা স্থায়ী ভাব, —যেটা থাকছে যখন ইমোশন্ বা মুড্ অনুভূত হচ্ছে না তখনো। বিশুদ্ধ রস বা সেন্টিমেন্টের সংজ্ঞা কখনো এভাবে দেওয়া হয়—একটি ভাবকে কেন্দ্র করে ইমোশ্যানাল ডিস্‌পোজিস্যন্‌গুলির সংস্থিতি।"[৫৭]

একটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ (Analysis of an Emotion)—জাত বিজ্ঞানী ডারুইন রাগ ও ভয়ের যে চমৎকার বিশ্লেষণ বহু বৎসর পূর্বে দিয়ে গেছেন, তা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আজও আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। নিচে রাগের বিশ্লেষণ থেকে কতকটা অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"রাগের প্রকাশ নানাভাবে হয়ে থাকে। হৃদযন্ত্র ও রক্তচলাচলের ক্রিয়া সর্বদাই আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনো বা বেগুনী রং হয়, বুকটা ঘন ঘন ফুলে ওঠে এবং বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র কম্পিত হতে থাকে…উত্তেজিত মস্তিষ্ক পেশীগুলিতে বলসঞ্চার করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে প্রদীপ্ত করে তোলে…মুখ সাধারণত দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়…দাঁতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায়, কখনো কখনো দাঁতে দাঁত ঘষা হয়। ক্রোধে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা বা এই জাতীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ…বাস্তবিক পক্ষে আঘাত করবার আকাঙ্ক্ষা কখনো এমন অদম্যভাবে প্রবল হয় যে জিনিসপত্রে মুষ্ট্যাঘাত করা হয়, অথবা সবেগে ভূমিতে আছড়ে ফেলা হয়। বিষম ক্রোধের ফলে কম্পন প্রায়ই দেখা যায়—গলার স্বর যেন কণ্ঠে রুদ্ধ হয়; অথবা স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ ও অসঙ্গত হয়…অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপাল স্পষ্ট ভ্রূকুটিতে আকুঞ্চিত হয়… চোখগুলি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে—অথবা হোমর যেমন বলেছেন, যেন তারা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। কখনো তা রক্তবর্ণ ধারণ করে…কখনো ঠোঁটগুলি বাইরে প্রসারিত হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোঁটগুলি বরং আকুঞ্চিত হয় এবং তার ফাঁক দিয়ে বিকট হাস্যে বিস্ফারিত দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতগুলি দেখা যায়।"[৫৮]

রাগের প্রকাশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয় বর্তমান দুজন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তা দেওয়া হল : "বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রাগের প্রকাশ নানা প্রকার বাক্‌নির্ভর আক্রমণের সাহায্যে ঘটে থাকে, যথা অবজ্ঞা, উপহাস, ইঙ্গিত, পশ্চাতে নিন্দা, কুৎসা, বিষাক্ত রসিকতা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি। অনুরূপ-

---

৫৭ Stout—Groundwork of Psychology, pp. 375-76

৫৮ Darwin—The Expression of the Emotion in Man and Animals, pp. 111 & 374

ভাবে একটু বড় হলে, শিশু তার রাগের ঝালটা প্রকাশ করে বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধতা ও অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে—যেমন, শিক্ষক যখন বিশেষ করে সবাইকে চুপ করতে বলছেন তখন ক্লাসে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা, গোলমাল করা ইত্যাদি দ্বারা স্কুল পালানো, অপরাধ-প্রবণতা, অপরাধ-করণ ইত্যাদি নানা ব্যবহারে। কল্পনার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাগপ্রকাশের নানা বিকল্প উপায় এবং প্রতিশোধ-গ্রহণের নানা ফন্দীও মাথায় আসে।"[৫৯]

শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব এবং তাদের কাজে লাগাবার বা পরিবর্তন করবার উপায় (Effects of emotions on education and how best to utilise or modify them)—শিশুদের দেহ ও মনের ওপর রাগ ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রভূত প্রভাব আছে। ইতিপূর্বে শিশুদের মনের এই দিকটাতে খুব বেশী দৃষ্টি আমরা দিই নি। কিন্তু অগ্রসর দেশের শিশু-শিক্ষায় ব্রতী শিক্ষকেরা এ কথা বলেন যে এবিষয়ে অমনোযোগের ফলে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন চিরকালের জন্য বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। সুজান্ আইজ্যাক্‌স্, আগাথা বাওলী, এবং ই. এম. গার্ডনার শিশুর অনুভূতির প্রতি সর্তক দৃষ্টি রেখে কিভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত, এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বার্টরাণ্ড রাসেল্ ভয়ের কুফল সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ় মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান জগতের অধিকাংশ দুঃখ নৃশংসতা অমানুষিকতার মূলে রয়েছে অকারণ ভয়, এবং তজ্জনিত অবিশ্বাস, ঘৃণা ও প্রতিহিংসাপরাণতা। তাই তাঁর মতে শিশুর মন থেকে অকারণ ভয় দূর করা শিক্ষার একটা মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।[৬০]

পূর্বেই আমরা বলেছি জীবনের আদিম প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় হিসাবে রাগ ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির নির্মম পরিবেশের মধ্যে যে বন্য জন্তুরা বাস করে, তাদের বাঁচতে গেলে এই প্রবল প্রবৃত্তিগুলির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এরা যে জীবনের মৌলিক উপাদান, একথা ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ থেকে শুরু করে অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানীরা সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। ক্যানন-এর মতানুযায়ী, এরা হচ্ছে জীবনের জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার (emergency) উপযোগী। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ সে বন্য

---

৫৯ Gates & Jersild—Educational Psychology, p. 98
৬০ Russell—On Education

বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়ে এসেছে। তার জীবন আজ বুদ্ধিচালিত ও উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক। তার সমাজের গঠন-রীতি, প্রবল অনুভূতি-প্রকাশের বিরোধী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি তাকে প্রাকৃতির শক্তিগুলির ওপর প্রভুত্ব এনে দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস এনেছে, ভয় ও ক্রোধের পরিধি ছোট করে দিয়েছে। আবার বিপরীত দিকে বর্তমান অর্থনীতির ভিত্তিতে গড়া সমাজে লোভ প্রতিযোগীর প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্রেক করছে।

প্রবল প্রবৃত্তিগুলি জীবনের পক্ষে হানিকর, একথা সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন এবং তাই উপদেশ দিয়েছেন প্রবৃত্তিকে জয় করবার। গীতায় তাই দেখি শ্রীকৃষ্ণের বাণী,—

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

তাই প্রাজ্ঞ যিনি, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, তিনি হবেন প্রবৃত্তি ও অনুভূতির অতীত। তিনি হবেন দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃসুখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ ও স্থিতধী।[৬১] দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে যদি রুচি না থাকে, বিদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতও উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগে ভয়ে পরিপাক-ক্রিয়া বিকল হয়, ঘুম বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়—দেহকে এরা জীর্ণ করে। ক্রাইল্ এমন প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যে জৈব প্রয়োজনের দিক থেকে সমস্ত প্রবল আবেগ ও অনুভূতিই বিষম শক্তিক্ষয়ের কারণ; তিনি দেখিয়েছেন যে, আবেগের দৈহিক ফলাফল পেশীক্রিয়ার দ্বারা শক্তিক্ষয়ের সমান।"[৬২] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্ প্রেসিডেন্ট চার্লস্ ডব্লিউ. এলিয়ট অ্যামেরিকার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘজীবনলাভ ও কর্মশক্তি অব্যাহত কি করে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "উননব্বই বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা কি করে অক্ষুন্ন রাখা যায় তার কোন সহজ ও

৬১ শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—কর্মযোগ, ২য় অধ্যায়
৬২ Crile—Man, an Adaptive Animal

নির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ আমার অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারব না, তবে এটুকু শুধু বলব—একটা জিনিস খুবই দরকারী, সে হচ্ছে সর্ব অবস্থায় যতটা সম্ভব শান্ত ও অবিচলিত থাকা।"[৬৩]

কিন্তু অনুভূতির প্রকাশও মাঝে মাঝে হওয়া চাই। স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে রেগে গেলে সেটার প্রকাশ হয়ে যাওয়া ভালো। যোগাভ্যাসের উচ্চতম স্তরে পৌঁছলে তখন নাকি "নিরুদ্ধ" অবস্থায় পৌঁছানো যায়। তবে আমাদের মতো নিম্নস্তরের মানুষদের পক্ষে মাঝে মাঝে ফেটে পড়াটা দরকার। ফ্রএড বিশেষ করেই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক প্রকাশ না পেলে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং গুরুতর মানসিক বিকৃতি কি করে ঘটে। আমাদের জটিল সভ্য জীবন এ রকম বহু বিকৃতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। কারণ সেখানে অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। রোগের কারণ ঘটে অথচ ঝগড়া করতে পারি না, ভয়ের কারণ ঘটে অথচ পলায়ন করতে পারি না, এতে যে আত্ম-বিরোধিতা সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিতই হানিকর। সভ্যতার বিকাশের ফলে ভয়ের যে দৈহিক প্রকাশ, যথা যুদ্ধ বা পলায়ন ইত্যাদি, তা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু আবেগটি লুপ্ত হয়ে যায় নি। তা ছাড়া রোগের হেতু উপস্থিত হলে থাইরয়ড্ অ্যাড্রিনাল যকৃৎ ইত্যাদি গ্রন্থি উত্তেজক পদার্থের সান্নিধ্যে এসে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে, কিন্তু তাদের মুক্তির পথ নেই। কতকটা নিষ্ক্রিয় দেহের মধ্যে এপ্রকার আলোড়নের ফলে ক্ষরণ ইত্যাদি অস্বাভাবিক ভাবে সঞ্চিত হয়ে যায়—যার ফল প্রাণীর পক্ষে নিশ্চয়ই হানিকর।[৬৪]

এ সব আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অনুভূতির জগৎকে আমাদের বুঝতে হবে, শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তার মানসিক বৃত্তির বিকাশে সাহায্য করতে হবে।

ছোট শিশুদের পক্ষে প্রধান আয়োজন স্নেহ ও বিশ্বাস। শিক্ষক যেখানে প্রকৃত স্নেহশীল, যেখানে তিনি শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন, সেখানে শিক্ষার কাজ সহজ হয়। শিশু যাতে অযথা ভয় না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভয় মনকে ছোট করে, আত্মবিকাশে বাধা দেয়, জীবন-সংগ্রামের

---

৬৩ Gates—Psychology for Students of Education, p. 194

৬৪ Raup—Complacency—The Foundation of Human Behaviour, pp. 85-86

জন্যে শিশুকে অনুপযোগী করে তোলে। শিক্ষক যেখানে ভয়ের বস্তু, বিদ্যালয় যেখানে বিভীষিকা, অঙ্ক বা ভূগোল যেখানে শিশুর মনে ত্রাসসঞ্চার করে, সেখানে শিক্ষা বিফল হচ্ছে। কিন্তু ভয়েরও স্থান আছে। শিক্ষককে যাতে ছাত্রেরা লঙ্ঘন না করে, যাতে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে বহুর কল্যাণে ব্যক্তি নিজেকে সংযত করে, সে জন্যে শাসনের দণ্ড শিক্ষকের হাতে থাকা চাই। কিন্তু শুধু ভয় দিয়ে যে শাসন, সে তো "পুলিসী জুলুম্"—তাতে মানুষ তৈরী হয় না—গোলাম তৈরী হয়। তাই ভয় দিয়ে শিশুকে যেমন পঙ্গু করা পাপ, তেমনি যেখানে বাস্তবিক ছাত্রদের একক ভাবে বা সমষ্টিগতভাবে দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে, তাকে ভয় করতে শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। শিশু যেন ভয় করতে শেখে রোগকে ও অস্বাস্থ্যকে, নিষ্ঠুরতাকে ও অমানুষতাকে।

তেমনি রাগ। যথাসাধ্য রাগের কারণ-অপসারণ করতে না পারলে শিক্ষার জন্য শিক্ষকের পরিশ্রমের বিরাট অপচয় ঘটবে। রাগ করে ভাত বেশী খাওয়া যেতেও বা পারে, কিন্তু রাগ করে বেশী লেখাপড়া শেখা যায় না। শিক্ষকের ব্যবহার সংযত হতে হবে। শিশুকে শক্তির অতিরিক্ত কাজ দিয়ে, অযথা লজ্জা বা শাস্তি দিয়ে তার মনকে তিক্ত করে, তাকে ভালো শেখানো যেতে পারে না। থর্নডাইক-এর ফললাভের সূত্র আমাদের এ কথাটি শিখিয়েছে যে ন্যায্য প্রশংসা দিয়ে শেখার উৎসাহ বাড়ানো যায়। তবে রাগেরও স্থান আছে। করুক না শিশুরা কিছু রাগারাগি, মারামারি, একটু শক্ত হোক, আঘাত নিতে ও আঘাত দিতে কিছুটা শিখুক। জীবন-সংগ্রামে এটা তো চাই। তবে মাত্রা যেন না ছাড়ায়। তা ছাড়া রাগেরও মোড় ফেরানো যেতে পারে। শিশু রাগ করতে শিখুক নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে, নিজের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

এই অনুভূতির ঠিক ঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে রুচি ও চরিত্র। সুন্দরকে ভালোবাসা, মহৎকে শ্রদ্ধা করা, মানুষের জন্যে দরদ, এ তো সুশাসিত অনুভূতির পথেই আসবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষ গড়া, তবে অনুভূতিকে সেই মহৎ কাজে কি করে লাগাতে হবে তা অবশ্যই শিক্ষাব্রতীকে জানতে হবে। প্লেটো তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, একেবারে বাল্যকাল থেকে উপযুক্ত বিষয়ে আনন্দ পেতে ও বেদনা বোধ করতে শিখতে হবে।, প্রকৃত শিক্ষার অর্থই তো এই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানস-জীবনের দৈহিক আধার

মনের সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে, তার অনুষঙ্গী হিসাবে, কোন না কোন দৈহিক পরিবর্তন। চোখে দেখা, কানে শোনা, উত্তাপ বোধ করা, ক্ষুধা তৃষ্ণা এই মানস ক্রিয়াগুলি, সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা-ই যায় না। রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভও প্রকাশিত হয় চোখ-মুখের ভাবে, দেহের উত্তাপ, নাড়ীর দ্রুততা, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ ইত্যাদি দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন দ্বারা। স্মৃতি কল্পনা ভাবনা বিচার ইত্যাদি উচ্চতর জ্ঞানদ ক্রিয়ায় বাহ্য শারীরিক পরিবর্তন লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু মস্তিষ্কে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, এবং পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তখন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ধূসর পদার্থে বিভিন্ন আলোড়ন চলতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে বহু শতাব্দীব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে দেহবিজ্ঞানীরা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার সাথে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত আছে স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous system)—যার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক (Brain)। কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র ছিন্ন হলে সে ইন্দ্রিয় বা পেশীর বোধ ও সক্রিয়তা লুপ্ত হয়। এ জাতীয় কোন নার্ভ বা স্নায়ুকেন্দ্র (nerve-centre) পীড়িত হলেও তার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয় বা পেশীর বোধ বিকল হয়। আবার বিপরীতভাবে মস্তিষ্কস্থিত কোন স্নায়ুকেন্দ্রকে কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করলে সে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয়ের বোধ বাহ্য উদ্দীপক (stimulus) না থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টি করা যায়।[১] মৃত্যুর পর মনীষী ব্যক্তিদের করোটি (skull) ব্যবচ্ছেদ করে লক্ষ্য করা গিয়েছে, তাঁদের মস্তিষ্ক হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক বড় ও ভারী ; সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তন (size) ও গুরুত্বের (weight) নিকট-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেল, বুদ্ধির পরিমাণ ও মস্তিষ্কের আয়তনের সম্বন্ধ (correlation) উল্লেখযোগ্যভাবে নিকট নয়। এ সম্বন্ধ +·১০ থেকে +·১৫-র মধ্যে। আরো

১ Cattell—Your Mind and Mine

পরীক্ষার পর এখন বোঝা যাচ্ছে, মস্তিষ্কের স্নায়ু-সম্বন্ধের (nerve-connections) জটিলতা ও সূক্ষ্মতার ওপর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অধিকতরভাবে নির্ভরশীল।[২] এ কথা এখন নিঃসন্দেহভাবেই বলা যায় যে, দেহ ও মন, বিশেষত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী (nervous system) এবং মানসক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত। এ সিদ্ধান্ত শারীরবিদ্যা (Physiology), রোগবিদ্যা (Pathology), ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান (Anatomy) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত।[৩] এ জন্তেই মনোবিজ্ঞানীকে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যই করতে হবে। সমগ্র দেহযন্ত্রকে আমরা তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি—

১। দেহের বিভিন্ন **সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়াদি** (Receptors)—এদের সাহায্যে আমরা দেহের বাইরের ও ভেতরের বিভিন্ন সংবাদ পাই। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক দ্বারা আমরা দেহের বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকি। দেহের অভ্যন্তরেও সংগ্রাহক-যন্ত্র আছে, যার সাহায্যে দেহের ভেতরের পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায়।

২। **পেশী, গ্রন্থি** (Muscles, Glands etc.—Effectors)—এদের সাহায্যে দেহের সমস্ত গতি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 'এরা কাজ করে'—তাই এদের নাম Effectors। পেশীগুলির (Muscles) সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ি-চাড়ি—বাইরের জগতে পরিবর্তন ঘটাই। আর গ্রন্থিগুলি (Glands) থেকে ক্ষরণ দেহের ভেতরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাজ করে।

৩। দেহের ইন্দ্রিয়াদি ও পেশীসমূহের মধ্যে সংযোগস্থাপন, তাদের পরিচালনা এবং সমন্বয়সাধনের জন্তে রয়েছে সমগ্র **মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী (The Brain and the Nervous system)**। এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বলা হয় সংযোজক বা Connectors। এ অংশকে আবার তিনটি প্রধান ভাগে ভাগে করা যায়—(ক) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল** (Central **Nervous system**)—এর অন্তর্গত হল তিন তলে বিভক্ত **মস্তিষ্ক** (Upper Brain or Cerebrum, Midbrain & Hindbrain or Cerebellum) এবং **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal Cord)। (খ) **উপান্ত মণ্ডল** (Peripheral **system**)—এদের অধীন হল মস্তিষ্ক থেকে বহির্গত স্নায়ুসূত্র (Cranial nerves), এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বহির্গত স্নায়ুসূত্র (Spinal nerves)।

২ Woodworth—Psychology, p. 245
৩ Angell—Psychology, pp. 13-16

এই মণ্ডলের অন্তর্গত (অথবা কারো কারো মতে, এ আর একটি স্বতন্ত্র মণ্ডল) হল **স্বতঃক্রিয় মণ্ডল** (Autonomic system)—এদের আবার তিনটি বিভাগ—(১) উর্ধ্ব (২) মধ্য ও (৩) অধঃ।

সমস্ত জীবদেহে মূল উপাদান হল **জীবকোষ** (Cell bodies)। এই জীবকোষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যে কোষ—যা দ্বারা ইন্দ্রিয়, পেশী মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছে—তার নাম নিউরনস্ (neurons)।

নিউরনের গঠন ও ক্রিয়া, সন্ধিস্থান (Structure & functions of Neurons, Synapses)—জড় পদার্থের মূল উপাদানকে যেমন বলা হয় অণু (atom), তেমনি সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ দেহের মূল উপাদানকে বলা হয় কোষ (cell)। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জীব দেহের মৌল-কোষ বিভিন্ন প্রকারের, এমন কি দেহের বিভিন্ন অংশের কোষও একপ্রকার নয়; তবে সমস্ত জীবন-শক্তির কেন্দ্র, তার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে কোষ এবং তারা বিভিন্ন প্রকারের হলেও তাদের গঠন মূলত একই প্রকারের। প্রাণীদেহকে যেমন জটিলতা অনুযায়ী উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তেমনি কোষগুলির মধ্যেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ আছে। উদ্ভিদ-দেহের কোষ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের কোষের তুলনায় অনেক সরল। মানবদেহের কোষ সবচেয়ে বেশী জটিল ও বিভক্ত (differentiated)। আবার **মনুষ্যদেহের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র সংগঠক কোষ (neurons) সবচেয়ে বেশী জটিল ও বহু বিভক্ত (most complex and highly differentiated)**। দেহের অন্যান্য অংশের সংগঠক কোষগুলি (যথা পেশী ত্বক্ ইত্যাদি) আপনা হতেই বিভক্ত হয়ে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এ ভাবে বেড়ে যায়। জন্মকালে শিশুর দেহে যে সংখ্যক কোষ থাকে, যৌবনে তা বহুগুণ বেড়ে যায়। এ জন্যেই দেহের বৃদ্ধি। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডল যে বিশেষ জাতীয় কোষ দ্বারা তৈরী হয়, তাদের সংখ্যা জন্মকাল থেকেই নির্দিষ্ট। বয়সবৃদ্ধির ফলে তাদের আয়তন কিছু বাড়লেও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না। স্নায়ুমণ্ডলের একটি কোষের মৃত্যু ঘটলে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়,—তবে তার কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাছাকাছি অন্যান্য কোষেরা চালিয়ে দেয়। **এই কোষগুলির নাম নিউরন্ (neuron)**। নিউরনের কেন্দ্রে থাকে কোষ, এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত তন্তুর ন্যায় শাখাপ্রশাখার দ্বারা এ অন্য নিউরনের সঙ্গে যুক্ত

হয়ে জটিল জাল সৃষ্টি করে, (a neuron is a cell and its fibres)।[8] সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ নিউরনের সমাবেশের দ্বারা গঠিত। নিউরনের কেন্দ্রে

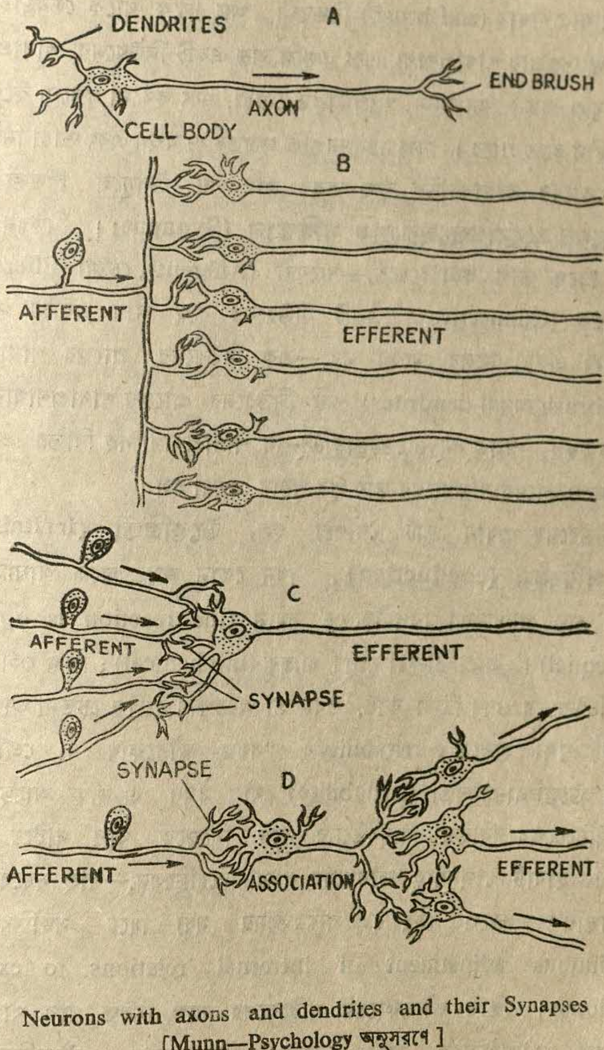

Neurons with axons and dendrites and their Synapses
[Munn—Psychology অনুসরণে]

আছে কোষ (cell body) এবং তা থেকে প্রসারিত শাখাপ্রশাখা। এগুলি সাধারণত দু শ্রেণীর—অ্যাক্‌সন্ (axon) ও ডেন্‌ড্রন্‌স্ বা

8 Munn—Psychology, p. 476

ডেনড্রাইটিস্ **(dendrons or dendrites)**। প্রত্যেক নিউরনের এক দিকে থাকে একটি অ্যাক্সন্; তা একটি দীর্ঘতর মূল, যার শেষ মাথা ভেঙ্গে সূক্ষ্মতর শাখাপ্রশাখায় (end brush) বিভক্ত। অন্য দিকে থাকে ডেনড্রাইটিস্ বা বহু সূক্ষ্ম তন্তুপ্রায় শাখাপ্রশাখা, এবং এগুলি অন্য একটি নিউরনের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হয়। অ্যাক্সন্ অপেক্ষাকৃত মোটা, এবং কখনো কখনো কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু ডেনড্রন্‌গুলি ক্ষুদ্রতর ও মসৃণ এবং তারা নিউরনের কেন্দ্র-কোষের কাছাকাছিই সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় বহু উপমূলে বিভক্ত। দুই **নিউরনের সংযোগস্থলের নাম সন্ধিস্থান (Synapse)**। নিউরনগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে,—সংবেদী (Afferent), চেষ্টদা (Efferent) ও সংযোজক (Connective)। একটি নিউরনের সঙ্গে আর একটির সংযোগ একটানা একটা নলের মতো নয়,—এক নিউরনের প্রান্তের শাখাপ্রশাখা (end-brush অথবা dendrites) অন্য নিউরনের প্রান্তের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে জড়িত হয়। অ্যাক্সন্ ও ডেনড্রাইটিস্-রূপ শাখাপ্রশাখা সহ বিভিন্ন প্রকারের নিউরন ও তাদের সন্ধিস্থানের ছবি পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

নিউরনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল, **উত্তেজিতা (irritability)** এবং **পরিবহন (conduction)**। যখন কোন জড় বস্তুকে আঘাত করি, তখন তার প্রতিক্রিয়া বিপরীত ও সমান (the reaction is opposite and equal)। এ প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (mechanical); কিন্তু কোন শক্তি যখন নিউরনের ওপর ক্রিয়া করে, তখন তা অতিক্ষীণ হলেও চেতনা জাগায়,—একেই বলা হয়েছে irritability। "সমস্ত জীবকোষ বা প্রোটোপ্লাজমের উত্তেজনা-প্রবণতা (irritability) মৌল ধর্ম। এ শক্তি আছে বলেই দেহ-পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হার্বার্ট স্পেন্সার্ জীবধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন,—বাহ্য সম্বন্ধের সঙ্গে আভ্যন্তরিক সম্বন্ধে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সঙ্গতিকরণ (a continuous adjustment of intrernal relations to external relations)। তিনি জীবকোষের পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত খাপ খাওয়াবার চেষ্টা-রূপ মৌলক্রিয়াকে লক্ষ্য করেই, এই সংজ্ঞায় পৌঁচেছিলেন।"[৫] একাধিক শক্তি একসঙ্গে তার ওপর ক্রিয়া করলে নিউরন তাদের একত্র

৫ Stout—Manual of Psychology, p. 64

করতে ও বাড়াতে পারে (reinforcement), তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে (separation), তাদের মধ্যে কোন একটি শক্তিকে বেছে নিয়ে (selection) কেবল সে শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হতে পারে; এমন কি কোন শক্তিকে সে বাধাও দিতে পারে (inhibition)। কোন শক্তি দ্বারা নিউরন উত্তেজিত হলে, সে শক্তি অ্যাক্সন্ দ্বারা একদিকে বাহিত হয়ে তার প্রান্তে অবস্থিত উপশাখার (end-brush) দিয়ে পৌঁছে, এবং সে প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত অন্য কোন নিউরনের ডেনড্রাইটদিগকে উত্তেজিত করে। এভাবে শক্তি সর্বশেষে কোন পেশী বা ইন্দ্রিয়ে পৌঁছালে, সে-পেশী বা ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক নিউরন হতে অন্য নিউরনে শক্তি প্রবাহিত হতে গেলে, সন্ধিস্থানের বাধা অতিক্রম করতে হয়। নিউরনের সঙ্গে একাধিক নিউরনের সংযোগ থাকে এবং শক্তি বিভিন্ন পথে বাহিত হওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু স্নায়ুকেন্দ্রের শাসনে একটি বিশেষ পথেই স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত হয়; এবং শক্তি একটা নির্দিষ্ট পথে চালিত হলে, সন্ধিস্থানের বাধা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং পুনর্বার অনুরূপ শক্তি উত্তেজিত হলে পূর্বের পথেই শক্তির প্রবাহ সুগম হয়। এই অভ্যাস-গঠনের মূল কথা। স্নায়ুকেন্দ্র থেকে পেশী অথবা ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছাতে স্নায়বিক শক্তি পথে পথে সন্ধিস্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু এমনি চমৎকার ব্যবস্থা যে, প্রতি নিউরনের কোষে কোষে শক্তির পুনরুজ্জীবনের (recharging) ব্যবস্থা আছে।[৬]

স্নায়বিক শক্তি এক নিউরন হতে আর এক নিউরনে সোজাসুজিভাবে একটানা বাহিত হয় না। দুই নিউরনের সন্ধিস্থানে (synapse) সে শক্তি সামান্য কিছু বাধা পায়। এ জন্যই কোন উদ্দীপক (stimulus) ইন্দ্রিয়ের গ্রাহক স্নায়ুতন্তুকে (receptors) আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-চেতনা জাগে না—কিছু বিলম্ব হয়। উদ্দীপকের ইন্দ্রিয়ের ওপর প্রাথমিক আঘাত, এবং ইন্দ্রিয়ের বোধ বা চেতনার মধ্যে যে সামান্য সময়ের ব্যবধান, তাকে 'Reaction time' বলা হয়। কোন পেশী দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করলে, পেশীর উপাদান—নিউরনগুলির সন্ধিস্থানে কিছু কিছু বিষ সঞ্চিত হয়, তার ফলেই অবসাদ (fatigue) বোধ হয়।

---

৫ Kenneth Walker—Human Physiology, p. 14

৬ Ratcliff—How Your Nervous System Works, Reader's Digest, Oct. 1956, p.69

বিভিন্ন প্রকার নিউরন এবং তাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বা পেশী-সংযোগ নিচের চিত্র থেকে বোঝা যাবে।

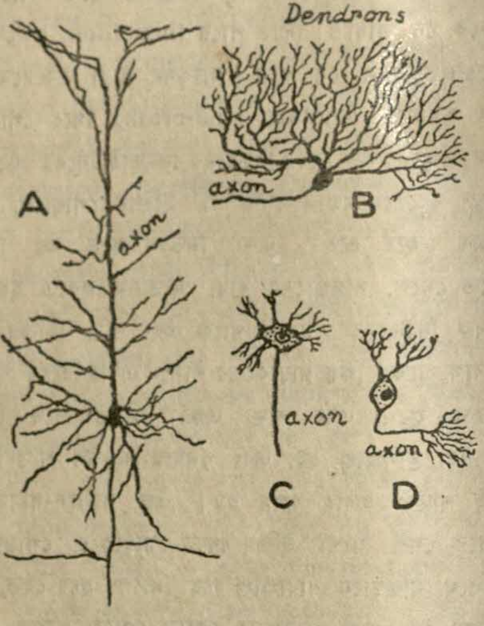

Sensory and motor axons, their nerve cells and connections
A. Pyramidal cell from Cortex. B. Neuron from Cerebellum. C. Motor neuron from Spinal cord. D. Connecting neuron.
[Sandiford—Educational Psychology অনুসরণে]

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল (Autonomous Nervous System)—উপান্ত মণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল (Autonomous nervous system)। এ মণ্ডল কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, এবং চেতনার ওপর এদের প্রভাব সামান্য, কিন্তু জীব-দেহের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুতর ক্রিয়া (হৃদস্পন্দন, শোণিত-প্রবাহ, রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ, পরিপাকক্রিয়া ইত্যাদি) এ মণ্ডলের দ্বারা শাসিত। এ মণ্ডলের আবার তিনটি উপবিভাগ—ঊর্ধ্ব মধ্য ও অধঃ (upper, middle and lower)। ঊর্ধ্ব স্বতঃক্রিয়মণ্ডল হৃদ্‌পিণ্ড ও পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্য স্বতঃক্রিয়মণ্ডলের বিশেষ প্রভাব অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ও অন্ত্রস্থ মসৃণ

পেশীর (smooth visceral muscles) ওপর। অধঃ স্বতঃক্রিয়মণ্ডল বা ত্রিকাস্থিমণ্ডলের (sacral system) বিশেষ ক্রিয়া জননেন্দ্রিয় গ্রন্থির (reproductive glands বা gonads) ওপর। অনুভূতির (রাগ ভয়

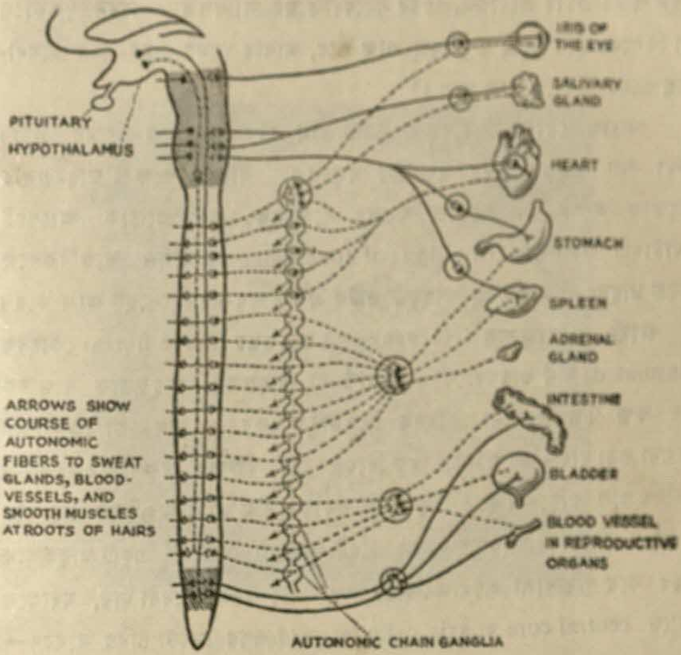

Sympathetic and Para-sympathetic systems
[Munn—Psychology অনুসরণে]

কাম ইত্যাদি) সঙ্গে স্বতঃক্রিয়মণ্ডলের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বতঃক্রিয়মণ্ডলকে আবার সমবেদী (sympathetic) এবং অপসমবেদী (para-sympathetic) এই দুই অংশেও ভাগ করা হয়েছে। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি (glands) এবং হৃদ্‌পিণ্ড ফুসফুস যকৃৎ পাকস্থলী জননেন্দ্রিয় প্রত্যেকটিতেই সমবেদী (sympathetic) এবং অপসমবেদী (para-sympathetic) স্নায়ুর সংযোগ আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি,—তার সঙ্গে কেবলমাত্র সমবেদী গ্রন্থিরই যোগ। এ মণ্ডলের মূলকেন্দ্র মধ্য মস্তিষ্কের অনুপুষ্পাকে (hypothalamus)। এ মণ্ডলের প্রভাব বিভিন্ন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার (motor functions) ওপর। সমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া হচ্ছে এর সক্রিয়তা (যথা

হৃৎস্পন্দন) বৃদ্ধি করা (stimulates activity) ; আর পরাসমবেদী (para-sympathetic) কাজ হচ্ছে রাশ টানা (retards activity)। এই দুই মণ্ডলের সুসমন্বয় সুস্থ দেহমনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এ সমন্বয়ের দায়িত্ব মস্তিষ্কের। যখন ত্বরিৎক্রিয়ার প্রয়োজন, তখন সমবেদীতন্ত্রের আধিপত্য,—যেমন যুদ্ধকালে বা বিপদের মুখে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুস্ কাজ করে, আবার ঘুমের সময় অপসমবেদী-তন্ত্র এদের ক্রিয়াকে শান্ত করে।[৭]

অত্যন্ত মোটামুটিভাবেই এই বিভাগ উপবিভাগ ও এদের ক্রিয়ার কথা বলা হল। এদের স্বতঃক্রিয় বললেও, বাস্তবিকপক্ষে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রত্যেক অংশই অন্য প্রত্যেক অংশের সঙ্গে যুক্ত, এবং প্রত্যেক অংশেরই মোটামুটি কর্মবিভাগ (division of functions) থাকলেও বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী একটি বহু-অংশযুক্ত জটিল ঐক্যসম্পন্ন যন্ত্র হিসেবেই কাজ করে।

নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র (Nerves)—বহু স্নায়ুতন্তুর (nerve fibres) কোষবদ্ধ (insulated) দীর্ঘ স্নায়ুপদার্থের নাম নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র। স্নায়ুসূত্রকে বাস্তবিক বহু সূক্ষ্ম তন্তু জড়ানো কোষবদ্ধ ইলেকট্রিক কেব্‌লের সঙ্গে একাধিক কারণে তুলনা করা যায়—এর গঠনের দিক দিয়েও বটে, ক্রিয়ার দিক দিয়েও বটে। অনেকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র হতে বিস্তৃত, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অ্যাক্‌সনগুলিকে গুচ্ছ করে উপযুক্ত স্নায়ুকোষ আবরণে আবদ্ধ করেই স্নায়ুগুলি তৈরী। একটি স্নায়ুতন্তুকে ছেদ করে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখলে দেখা যায়, মধ্যস্থলে আছে central core বা axis cylinder, তার ওপর মোটা চর্বির আবরণ—তার নাম myelin sheath ; এরও বাইরে আছে সংযোজক তন্তু (connective tissues) দিয়ে তৈরী পাতলা আর একটি আবরণ, তার নাম neurilema। বিদ্যুৎ-প্রবাহ-বহনকারী তারের মতো, মধ্যস্থলের axis cylinder-ই স্নায়বিক শক্তিকে এক স্থান হতে দেহের অন্যত্র বহন করে। বৈদ্যুতিক তার যেমন রবার বা অন্য কোন অপরিবাহী (non-conducting) আবরণ দিয়ে জড়ানো থাকে, তেমনি মাইয়েলিন ও নিউরিলেমাও স্নায়ুতন্তুকে আবৃত করে এবং স্নায়বিক শক্তির অপচয় (leakage) নিবারণ করে।[৮] স্নায়বিক শক্তি অনেকাংশে ক্ষীণ বৈদ্যুৎশক্তির সঙ্গে তুলনীয়। তবে বৈদ্যুৎশক্তির ত্বরিত গতি, কিন্তু এ শক্তির গতি মন্থর।

---

৭ Munn—Psychology, p. 401

৮ K. Walker—Human Physiology, pp. 111-12

মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া, এবং মেরুদণ্ড ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ুসূত্র বহির্গত হয়ে দেহের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের বোধকেন্দ্র (Sensory centre) ও চেষ্টাকেন্দ্রের (Motor centre) সংযোগবিধান করে। নিচের ছবি হতে এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা সহজ হবে।

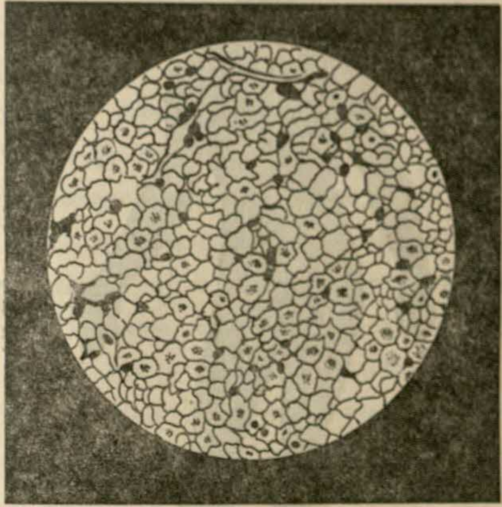

Cross-section of a nerve.
[Munn—Psychology অনুসরণে]

মস্তিষ্ক যেন একটি বিরাট ও জটিল শাসনযন্ত্রের সদর দপ্তর। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এবং দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে বহু স্নায়ুর সাহায্যে সংবাদ এসে মস্তিষ্কে পৌঁছে, সেখানেই ঘটে এই বিভিন্ন সংবেদনের সংযোগ সমন্বয় তাৎপর্যবোধ। আবার মস্তিষ্কের উপযুক্ত কর্মকেন্দ্রগুলি থেকে বহু স্নায়ু (nerve) কেন্দ্রীয় দপ্তরের 'হুকুমনামা' বহন করে নিয়ে যায় দেহের বহু সংখ্যক পেশী (muscles) গ্রন্থি (glands) ইত্যাদির কাছে, তখন তারা সক্রিয় হয়। প্রতি মুহূর্তে স্নায়বিক শক্তি বাইরে থেকে ভেতরে আসছে এবং ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে; কিন্তু এমনি আশ্চর্য এ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যে, সুস্থ দেহে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন পথগামী বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য ঘটে। "একটি বৃহৎ টেলিফোন কেব্‌লের মধ্যে বহু তারের একত্র সমাবেশ দেখে আমরা বিস্মিত হই এবং যখন দেখি বিষম জটিল সংবাদ বহন- ও প্রেরণ-যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে লণ্ডন থেকে মেলবোর্ন

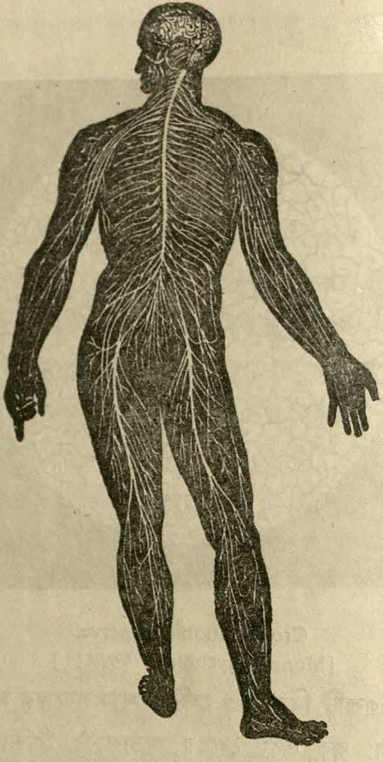

The Human Nervous System
[Woodworth—Psychology অনুসরণে]

সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তখন হতবাক্ হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে যে স্নায়ুমণ্ডল এ থেকে বহুগুণে জটিল, বহুগুণে ব্যাপক, বহুগুণ অধিক নির্ভুল তৎপরতার অধিকারী, এ সম্বন্ধে আমরা একবার চিন্তাও করি না। একে আমরা মেনেই নিয়েছি। এই স্নায়ুমণ্ডলের কোটি কোটি কোষের (cells) জালের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল লক্ষ লক্ষ সংবাদ গ্রহণ করছে, আদেশ প্রেরণ করছে; হৃৎযন্ত্র কখন কত দ্রুত স্পন্দিত হবে, অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে, এবং কখনই বা ফুস্‌ফুস্‌ নিশ্বাস গ্রহণ করবে। নার্ভ বা স্নায়ুসূত্রের বহু প্রসারিত সংযোগ-জাল বিস্তৃত না থাকলে, দেহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোষের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকত না। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়ালখুশীতে কাজ করত।"[৯] কাজেই মস্তিষ্ককে একটি বিষম জটিল সুইচ্‌ বোর্ড বা টেলিফোন একস্‌চেঞ্জের সঙ্গে তুলনা করা খুবই সঙ্গত।

এই স্নায়ুসূত্রগুলিকে তাদের কার্য (function) এবং গঠনানুযায়ী **সংবেদী (Sensory or affernt), চেষ্টদা (Motor or efferent) এবং সংযোজক** (Connective)—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় কোন উদ্দীপক দ্বারা তাড়িত হলে, সংবেদী স্নায়ুসূত্র সে সংবাদ (message) ভেতরে মস্তিষ্কে বা সুষুম্নাকাণ্ডে বোধকেন্দ্রে (Sensory centre) বহন করে নিয়ে যায়। সুতরাং এদের afferent বা in-carrying nerves বলা হয়। আবার চেষ্টদা স্নায়ুসূত্রদের কাজ হল, মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত চেষ্টাকেন্দ্র (motor centre) থেকে হুকুম বাইরের দিকে পেশী বা গ্রন্থিদের কাছে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং এদের efferent বা out-carrying nerves-ও বলা হয়। আর সংযোজক স্নায়ুসূত্রের (connective) কাজ হচ্ছে এ দু জাতীয় কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন করা।

স্নায়ুসূত্রের মধ্য দিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হয় (nerve-current) তার স্বরূপ কি? তাদের বৈচিত্র্যেরই-বা কারণ কি? এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে, এ শক্তি রাসায়নিক-বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আকার (electrochemical waves)। এ তরঙ্গ খুবই ক্ষীণ এবং খুব কম শক্তিই এতে ব্যয়িত হয়, কিন্তু এ কোন পেশী বা ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তোলবার পক্ষে আশ্চর্যভাবে সক্ষম।[১০] সংবেদী স্নায়ুসূত্রগুলি ইন্দ্রিয়ে বোধ-সঞ্চারেই কেবল সক্ষম, আবার চেষ্টদা স্নায়ুসূত্র কেবল পেশীকেই সক্রিয় করতে সমর্থ। আবার চক্ষুর সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুচ্ছগুলি দৃষ্টিবোধই জাগায়। আর ত্বকের সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুগুচ্ছ স্পর্শের বোধ জাগায়। কাজেই মুয়েল্যের (Muller) নামে

---

৯ J. D. Ratcliff—How Your Nervous System Works, The Reader's Digest,—Oct., 1956

১০ Woodworth—Psychology, p. 253

এক বৈজ্ঞানী এই ধারণা করেছিলেন যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-ও পেশীসংযুক্ত স্নায়ুগুলি বিভিন্ন প্রকারের স্নায়বিক শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ চোখের সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুগুলি বিচ্ছিন্ন করে এনে যদি কর্ণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যেত তবে কান দিয়েই আমরা দেখতে পেতাম। এ ধারণাকে 'The doctrine of specific nerve energies' বলা হয়। এ প্রকার পরীক্ষা অবশ্যই করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার ফলে, এ মতবাদ সত্য নয় বলেই মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ একই প্রকারের। তবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বোধ জাগায় কেন? সংক্ষেপে এর উত্তর হচ্ছে—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন নার্ভগুলি মস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়। এ কেন্দ্রগুলিই শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধের বিভিন্নতার জন্য দায়ী। ইন্দ্রিয়ের শেষ প্রান্তে সংলগ্ন স্নায়ুকোষগুলির উদ্দীপকও বিভিন্ন প্রকারের। ইন্দ্রিয়বোধ ও পেশীক্রিয়ার যে প্রভেদ, তার জন্যও নার্ভগুলি দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি।[১১]

স্নায়ুগুলি যে স্নায়বিক শক্তি (impulses) বহন করে, তা দ্রুত একটির পর একটি তরঙ্গের আকারে আসতে থাকে। তাদের উৎস হচ্ছে স্নায়ুকোষ-কেন্দ্রিক নিউরনগুলি। এই শক্তি যখন সঞ্চালিত হয় তখন তার অন্তঃস্থিত শক্তির (potential) সবটাই সেই মুহূর্তে ব্যয়িত হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই স্নায়ুকেন্দ্র আবার সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত হয়ে পরবর্তী শক্তি-তরঙ্গ প্রেরণ বা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়। হয়, কেন্দ্রটি উত্তেজিত হয়ে সবটা শক্তিই নিঃশেষে ব্যয় করবে, না হয় তা একেবারেই উত্তেজিত বা সক্রিয় হবে না। একেই 'The all-or-none law in nerve and muscles' বলা হয়েছে। ডিনামাইটের চার্জ যদি বিস্ফোরিত হয়, তবে সবটাই বিস্ফোরিত হয়—নয়তো একেবারেই হয় না। তার ওপর যে পরিমাণ শক্তিই ক্রিয়া করুক না কেন, স্নায়ুগুচ্ছের কেন্দ্রে যে সম্ভাব্য শক্তি আছে, তার বেশী সে স্নায়ুগুচ্ছ কিছুতেই ব্যয় করতে পারে না।

---

১১ What seemed like "specificity of energy" was due to "specificity of termination." Indeed, the switching of visual and auditory nerves, if possible, would do what the specific nerves, energy theorists said it would do,—make us "see with our ears" and "hear with our eyes",—but not because the energies are different. The impulses which go to the visual region of the cerebral cortex would now be coming from the ears, and those which go to auditory region would now be coming from to eyes. Munn—Psychology, pp. 398-99

কিন্তু এ দেখা যায়, যে উদ্দীপকের পরিমাণ (quantity of the stimulus) যতটা বেশী, সংবেদন বা বোধের তীব্রতাও তত বেশী। 'All-or-none' নীতির এ বিরোধী বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। যখন উদ্দীপকের পরিমাণ বেশী হয়, তখন কোষকেন্দ্র থেকে শক্তি অতি দ্রুত বারে বারে ক্ষরিত হতে থাকে, কাজেই বোধও তীব্রতর হয়। তা ছাড়া যেখানে উদ্দীপকের পরিমাণ বেশী, সেখানে কাছাকাছি অনেকগুলি কোষকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়ার ফলে বোধ তীব্রতর হয়।[১২] তাই শিশুকে স্নান করাবার জন্যে মা যদি শুধু আঙুলের ডগা জলে ডুবিয়ে তা বেশী গরম কিনা পরীক্ষা করেন, তবে তা খুব নিরাপদ নয়। শিশুকে সেই ঈষদুষ্ণ জলের টবে স্নান করাতে গেলে শিশুর পক্ষে তা বিষম উত্তপ্ত বোধ হতে পারে,—কারণ গরম জল তখন তার ত্বকের নিম্নের বহুসংখ্যক কোষকে উত্তেজিত করাতে উত্তাপ বোধ বিষম তীব্র হয়েছে।[১৩]

স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ও ক্রিয়া—মানুষের দেহ ও মনের সমস্ত চেতনা প্রক্ষোভ উদ্যম ক্রিয়া যা দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত, সেই জটিল ও দেহের সর্বত্র বিস্তৃত স্নায়ুসংগঠনকে স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous system) বলা হয়। দেহের প্রত্যেক পেশী, অস্থিসন্ধি (joints)—যা দ্বারা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়; প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়,—যার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের বিচিত্র সংবেদন,—তার সমস্তের মূলে রয়েছে জটিল স্নায়ুমণ্ডলী। এ স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রে রয়েছে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রধান সংবেদী (Sensory) ও চেষ্টদা (Motor) স্নায়ুগুচ্ছ-সম্বলিত কেন্দ্রাদি (centres)। তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগের কোটি কোটি স্নায়বিক সূত্র এবং এ সমস্ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত বহু বহু স্নায়ুসূত্র (nerves), যারা দেহের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় পেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি। পেশীর সাহায্যে আমরা ক্রিয়া করি। এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় জটিল স্নায়ুমণ্ডলীরূপ যন্ত্র দ্বারা; এবং সর্বোপরি সমস্ত বোধ এবং ক্রিয়ার সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভারও রয়েছে, এই সদাজাগ্রত যন্ত্রটির ওপরে। দেহের এমন কোন অংশ নেই যা স্নায়ুমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ-

---

১২ Woodworth—Psychology, pp. 253-54

১৩ Ratcliff—How Your Nervous System Works, Reader's Digest, Oct. 1956.

বহির্ভূত। মাথায় চুলের গোড়ায় চুলকানি থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি অঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন, সমস্তই এ স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

স্নায়ুমণ্ডলীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—**কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল**

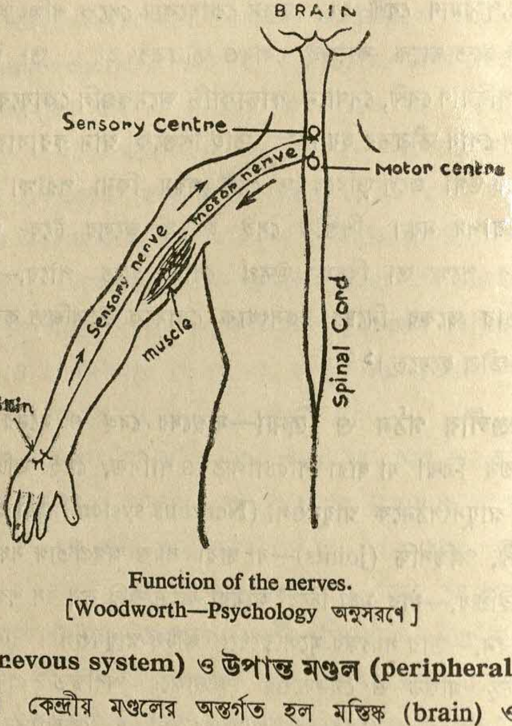

Function of the nerves.
[Woodworth—Psychology অনুসরণে]

(central nevous system) ও **উপান্ত মণ্ডল (peripheral nervous system)**। কেন্দ্রীয় মণ্ডলের অন্তর্গত হল মস্তিষ্ক (brain) ও সুষম্নাকাণ্ড বা মেরুদণ্ড (spinal cord)। এদের একত্রে **The cerebro-spinal axis** বলা হয়। এ কেন্দ্রীয় মণ্ডলের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাধিক। এ হল দেহযন্ত্র চালনার সদর দপ্তর। সমস্ত প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীর পরিচালনার দায়িত্ব এ মণ্ডলে ন্যস্ত। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বোধ, এবং পেশীর কর্মোদ্যোগে সংযোগ ও সমন্বয়ের (integration) কাজ কেন্দ্রীয় মণ্ডলের। উপান্ত মণ্ডলের অন্তর্গত হল—মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড-নির্গত বহু স্নায়ুসূত্র এবং তাদের বহুতর শাখা। এক কথায় এদের বলা হয়—cerebro-spinal nerves। এরা কেন্দ্রীয় মণ্ডলের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। কেন্দ্রীয় মণ্ডলে অবস্থিত সংবেদ ও চেষ্টার কেন্দ্রস্থিত শক্তি এদের সক্রিয় করে। মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত কেন্দ্র থেকে স্নায়বিক শক্তি **চেষ্টদা নার্ভ দ্বারা (motor nerves)**

বাহিত হয়ে পেশীতে পৌঁছালে, তবেই পেশী সক্রিয় হয়ে তৎসংলগ্ন অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালন করে। আবার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যখন বাহ্য বা অভ্যন্তরীণ কোন উদ্দীপক (stimulus) দ্বারা তাড়িত হয়, তখন তার সংবাদ সংবেদ নার্ভ (sensory nerves) দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত সংবেদকেন্দ্রে (sensory centre) পৌঁছালে তবেই ইন্দ্রিয়-বোধ বা সংবেদন (sensation) জাগে। স্নায়ুসূত্রের আর এক প্রান্তে আছে, উদ্দীপক (stimulus) -গ্রহণকারী **সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়** (**Receptor**), এবং স্নায়ুকেন্দ্র থেকে প্রেরিত শক্তিকে কর্মে পরিণত করতে সক্ষম **পেশী** (**effector**)। এ বোধ ও ক্রিয়ার যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ-রক্ষার কাজ (connector) হচ্ছে বিচিত্র ও বহু-বিস্তৃত স্নায়ুমণ্ডলীর।[১৪]

কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল—সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক (Spinal Cord & Brain)

সুষুম্নাকাণ্ড—কতকগুলি টুকরো হাড় পিঠের মধ্যস্থলে নিচ হতে ওপর পর্যন্ত ক্রমশ সাজানো। ওপরের দিকে ক্রমশ মোটা হয়ে এ নিম্ন মস্তিষ্কে গিয়ে প্রবেশ করেছে। এ মানুষের মেরুদণ্ড। এর ওপর ভর দিয়েই মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। শিম্পাঞ্জী জাতীয় বানরেরা ছাড়া আর কোন ইতর প্রাণীই মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে দু পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না। প্রাণী-জগতের বিবর্তনের ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, এবং জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মূল কারণ। মেরুদণ্ডের হাড়ের টুকরোগুলির মধ্য দিয়ে মস্তিস্ক থেকে স্নায়ুগুলি নেমে এসে দেহের সমস্ত পেশী, গ্রন্থি ও অভ্যন্তরীণ যন্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। আবার তেমনি দেহ ও দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত বোধ-উদ্দীপক ইন্দ্রিয় থেকে সহস্র স্নায়ু গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মধ্যস্থলের ফাঁক দিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে। সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ড হচ্ছে একটি সুরক্ষিত করিডর (corridor), যার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে দেহের সমস্ত অংশের যোগ রক্ষিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের হাড়ের টুকরাগুলির দুই পাশে ও মধ্যের ছিদ্রপথের সমান্তরাল দুটি ছিদ্রপথ আছে। তাও স্নায়ুপদার্থে পূর্ণ। এখানেই

১৪ Sherrington—The Integrative Function of the Central Nervous System

সমবেদী ও অপসমবেদী তন্ত্রের এবং প্রত্যাবর্তক্রিয়ার (Reflexes) নিয়ামক কেন্দ্রসমূহ বর্তমান। মেরুদণ্ডের মালার মতো গাঁথা হাড়ের টুকরাগুলোকে বলে কশেরুকা (Vertebrae)। ৩১টি হাড়ের টুকরার সমন্বয়ে মেরুদণ্ড গ্রথিত।

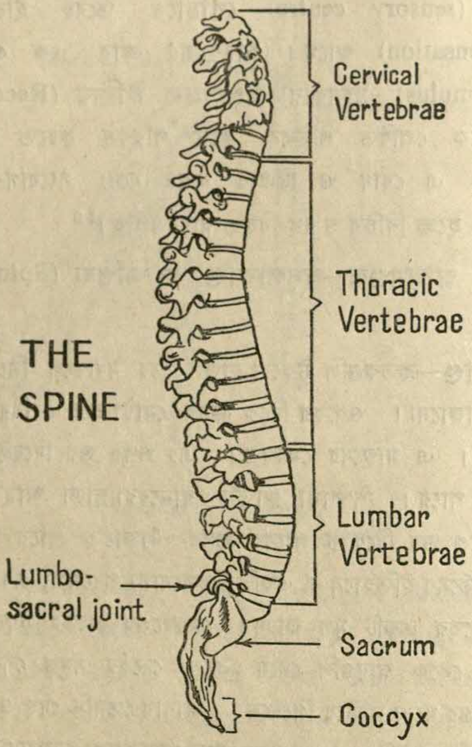

The Spinal Cord,
[Reader's Digest, Oct. 1956 অনুসরণে]

দুটি হাড়ের টুকরার সন্ধিস্থলের ফাঁক থেকে মেরুদণ্ডে দুই দিকে নার্ভগুলি ছড়িয়ে গেছে। কাজেই সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১-জোড়া নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র বার হচ্ছে। এগুলির ৫-জোড়া উর্ধ্বাংশ থেকে (cervical)—এগুলি ফুসফুস প্লীহা ইত্যাদির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্য সুষুম্নাকাণ্ড হতে ৭-জোড়া lumbar, এবং ১২-জোড়া dorsal, স্বেদগ্রন্থি, রক্তবহা সূক্ষ্মশিরা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, পাকস্থলী, মসৃণ পেশী, রোমমূল ইত্যাদির নিয়ামক। সুষুম্নাকাণ্ডের এই

মধ্য অংশে অবস্থিত স্নায়ুকোষগুচ্ছ (ganglia) ও নার্ভসমূহ রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভের (emotion) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুষুম্নাকাণ্ডের

Spinal column, showing right sympathetic chain
[Lickley—The Nervous System অনুসরণে]

নিচের দিক থেকে নির্গত (Sacral) চার-জোড়া নার্ভ জননেন্দ্রিয় মূত্রাশয় ইত্যাদি ক্রিয়ার নিয়ামক। সকলের নিচে তিন-জোড়া নার্ভ (coccyx);

এরা স্মরণ করিয়ে দেয় বহু যুগ পূর্বে মানুষের পূর্বপুরুষ লাঙ্গুলের অধিকারী ছিল। যেখানে সুষুম্নাকাণ্ড মোটা হয়ে নিচের দিক থেকে নিম্ন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তাকে বলা হয় সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata)। পর পর ছবি দুটি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে।

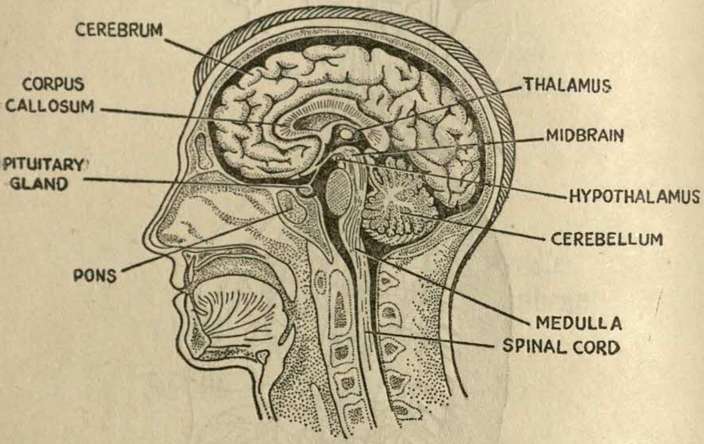

Cross-section of Brain, its different parts with Spinal Cord
[Munn—Psychology অনুসরণে]

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ (Different parts of the brain)—মস্তিষ্কের দৃঢ় অস্থিময় আবরণটি (cranium—করোটি) উন্মোচন করে একপাশ থেকে দেখলে দেখা যাবে, ধূসর ও কোমল শ্রেষ্ঠ স্নায়ুপদার্থ আবরিত অমসৃণ ফুলকপির আকারের একটি বস্তু, যা একটি স্থূল বৃন্তের ওপর বিস্তৃত। নিম্নের এ বৃন্তটিই নিচে নেমে সুষুম্নাকাণ্ড হয়েছে। সুষুম্নাশীর্ষককে আলাদা ধরলে, মস্তিষ্ককে নিচ থেকে ওপরে পর পর চারটি অংশে ভাগ করা যায়: (১) সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata), (২) লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং তার পাশে অবস্থিত পনস্ (Pons Variolii), (৩) মধ্যমস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ককাণ্ড (Midbrain বা Brain-stem) এবং এর সঙ্গে যুক্ত পিটুইট্যারী গ্রন্থি (Pituitary gland), পুষ্পাক্ষ (Thalamus) ও অনুপুষ্পাক্ষ (Hypothalamus), (৪) গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)।

সুষুম্নাশীর্ষক (medulla) হচ্ছে সুষুম্নাকাণ্ডের ওপরের অংশ যা ঘাড়ের কাছে মোটা হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। Cervical nerve-গুলি এখানে অবস্থিত কেন্দ্র থেকেই বহির্গত হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে, এবং এর মধ্যদিয়েই মুখমণ্ডলে অবস্থিত প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত নার্ভগুলি ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের বোধকেন্দ্রে ওপর দিকে উঠেছে।

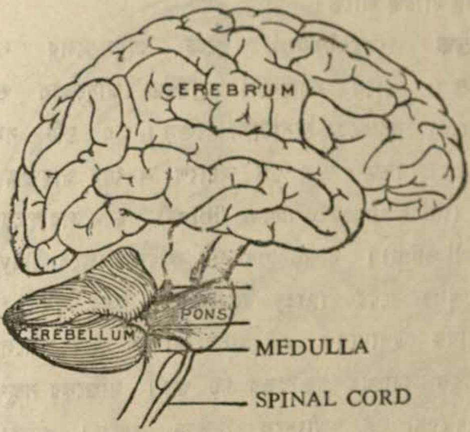

Brain and its parts
[Lickley—The Nervous System অনুসরণে]

লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) দুইটি পিণ্ডে (lobes) বিভক্ত। এই স্থানে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের প্রধান কাজ হচ্ছে যে সব ক্রিয়ায় বহু পেশীর কাজ একত্র করে সমন্বয় করা প্রয়োজন হয়, যেমন—হাঁটা, কথা বলা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি, তাদের নিয়ন্ত্রণ। অতিরিক্ত মদ্যপানে এ কেন্দ্রগুলিই প্রথম বিকল হয়, যার ফলকে বলা হয় মাতলামি। দেহের ভারসাম্য (balance) রক্ষার কাজটির দায়িত্ব প্রধানত লঘুমস্তিষ্কের।

মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain) ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের যোগের সেতু; একে তাই মস্তিষ্কবৃন্তও (Brain-stem) বলা হয়। নিম্নজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক এর বেশী পরিণতি লাভ করে নি, কাজেই একে Old brain-ও বলা হয়। ইতর প্রাণীদের ইন্দ্রিয়বোধ ও পেশীক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, স্থূল, অবিভক্ত (undifferentiated)। এবং এ জাতীয় বোধ ও ক্রিয়ার কাজ মধ্যমস্তিষ্কই নিম্ন ইতর প্রাণীদের বেলা সম্পন্ন করতে সমর্থ।

মানুষের মস্তিষ্কে এ অংশের কতকগুলি সমন্বয়ের কাজের ভারও আছে। বিশেষত, অনুপুষ্পাক্ষে অনুভূতির জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নিদ্রা ও জাগরণের কাজের সঙ্গেও এর বিশেষ যোগ আছে। পুষ্পাক্ষের প্রধান কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয় থেকে আগত স্নায়ু-তরঙ্গকে গুরু মস্তিষ্কের উপযুক্ত সংবেদ-কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া। সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়স্থাপনেও পুষ্পাক্ষের কিছু দায়িত্ব আছে।

গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) হচ্ছে স্নায়ুমণ্ডলের সদর দপ্তরের সর্বোচ্চ কেন্দ্র। ওখানে সর্বাপেক্ষা পরিণত স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুদের (nerve fibres) সবচেয়ে ঠাসাঠাসি ভিড়। এ দুটি সমান অর্ধাংশে (hemispheres) বিভক্ত। এ দুই অর্ধাংশ অসংখ্য স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত দৃঢ় চাদরের (thick sheet of nerve fibres) বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত (corpus callosum)। মস্তিষ্ক পর পর কয়েকটি স্তরে (layers) গঠিত। সর্বোচ্চ স্তর ধূসর বর্ণের (grey matter)। এই ধূসর পদার্থই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়বিক উপাদান। এই ধূসর আবরণ ভেদ করলে পাওয়া যায় শ্বেতবর্ণ স্নায়বিক পদার্থের গভীরতর দৃঢ় স্তর। মস্তিষ্কের সম্মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত বিদারণ-রেখা দুই অর্ধাংশকে বিভক্ত করছে। প্রত্যেক অর্ধাংশেই আবার দুটি গভীর বিদারণ-রেখা (Fissure of Rolando and Fissure of Sylvius) চারটি ভাগে মস্তিষ্ককে ভাগ করছে—এদের নাম হচ্ছে (সম্মুখ দিক থেকে শুরু করে পশ্চাৎদিক) Frontal lobe, Parietal lobe, Occipital lobe এবং Temporal lobe। মস্তিষ্কের ওপরের তল (surface) নিটোল মসৃণ নয়। এ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বহু খালে (sulci) বিদীর্ণ এবং আকুঞ্চিত (convolutions)। আকুঞ্চনগুলি এবং বিদারণ-রেখা (খাল) যত বেশী হয়, এবং যত গভীর হয়, ততই ধূসর স্নায়ু-পদার্থ ঠাসাঠাসি করে থাকবার বেশী জায়গা পায়, এবং বুদ্ধিও বেশী হয়। অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মস্তিষ্ক বেশী ভারী, এবং অনেক মনীষী ব্যক্তির মস্তিষ্ক (মগজ) তাঁদের মৃত্যুর পর ওজন করে দেখা গিয়েছে, যে তা সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বেশী ভারী। কিন্তু এই ভারী হওয়া বা গুরুত্ব, আপেক্ষিক। দেহের ওজনের তুলনায় যে প্রাণীর মস্তিষ্ক বেশী ভারী, সে প্রাণী বেশী বুদ্ধিমান। সেই হিসাবে হাতীর মগজ মানুষের মগজের তুলনায় হালকা, এবং হাতী মানুষের তুলনায় নিশ্চয়ই কম বুদ্ধিমান। সাধারণত পুরুষ মানুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের

মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী ভারী, এবং প্রচলিত ধারণা এই যে পুরুষেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী বুদ্ধি রাখে। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের ওজন যুক্ত করে দেখলে, বরং মেয়েদের মস্তিষ্কই কিছু বেশী ভারী। কিন্তু বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষার পর স্থির করেছেন যে, মস্তিষ্কের ওজন বুদ্ধির প্রখরতা-

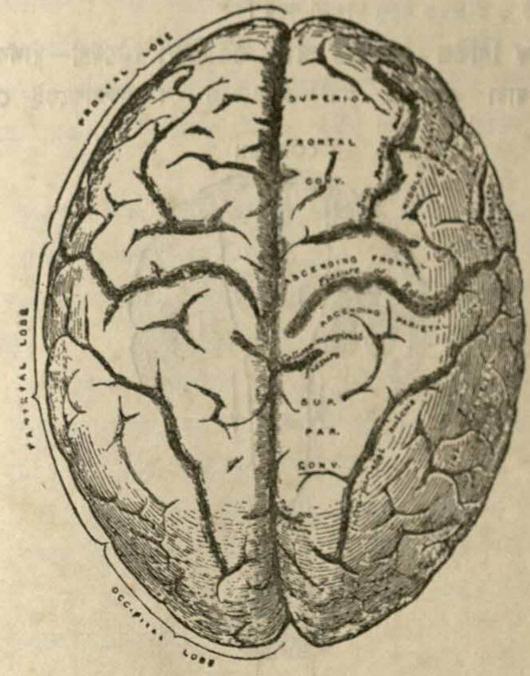

Lobes of the Brain, convolutions & sulci
[Lickely—The Nervous System অনুসরণে]

নির্ধারণ করে না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু সংযোগ আছে, তা-ই বুদ্ধির স্বল্পতা- বা প্রাচুর্য-নির্ধারণ করে। এই সংযোগ-সূত্রগুলি সংখ্যায় যত অধিক হবে, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের সংযোগ-সূত্র যত জটিল হবে বুদ্ধিও তত বেশী প্রখর হবে।

দেহের প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীসমূহ-সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলি হয় গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রে এসে শেষ হয়, অথবা সেখান থেকে শুরু হয়। গুরুমস্তিষ্কের

দুটি অর্ধাংশের কথা বলা হয়েছে। একটা মজা দেখা যায়, গুরুমস্তিষ্ক থেকে নির্গত ডান অর্ধাংশের নার্ভগুলি পুষ্পাক্ষে বা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে দেহের বাম দিকে চলে যায়, এবং বাম অর্ধাংশ থেকে নির্গত নার্ভগুলি ডান অঙ্গে চলে যায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ডান অর্ধাংশ দেহের বামদিকের পেশী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অনুরূপভাবে বাম অর্ধাংশ দেহের ডান দিকের পেশী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে চালনা করে।

মস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থান ও ক্রিয়া নির্দেশ—দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে গুরুমস্তিষ্কেই বোধ ও

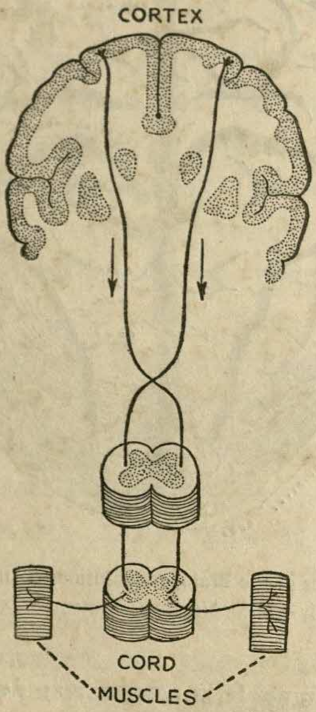

The right-left crossing of the principal motorpath
[Woodworth & Marquis অনুসরণে]

চেষ্টার প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপিত। এরা গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে (areas) নির্দিষ্টভাবে স্থাপিত (localised)। তদ্ভিন্ন স্মৃতি (memory), সংগঠক কল্পনা (constructive imagination), বিমূর্ত চিন্তা (abstract

thinking), বিচার-বিবেচনা (reasoning), চিন্তা দ্বারা সমস্যা-সমাধান (problem-solving) ইত্যাদি উচ্চতম মানসক্রিয়াও মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করবার কারণ আছে। একে **মস্তিষ্কে বিভিন্ন ক্রিয়ার কেন্দ্র-নিরূপণ মতবাদ বলা হয় (the theory of localisation of functions in the brain)** এ মতবাদের পশ্চাতে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যায়—

১। গুরুমস্তিষ্কের কোন ক্ষুদ্র অংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা তুলে ফেললে (extirpation) প্রাণীর কোন ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি বা পেশীর কর্মশক্তি বিনষ্ট হয়; ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি ইতর প্রাণীর ওপর এ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

২। ইতর প্রাণী বা মানুষের মস্তিষ্কের কোন অংশ রুগ্ণ হলে, কোন কোন ইন্দ্রিয় ও পেশীয় ক্রিয়ার বিষম বৈকল্য দেখা যায়। গুরুতর পীড়ার বেলা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার দ্বারা, অথবা মৃত্যুর পর করোটি ছেদ করে (autopsy) এ দেখা যায়।

৩। গুরুমস্তিষ্কের আচ্ছাদক করোটি (skull bone) উন্মোচন করে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে মৃদু বৈদ্যুৎতরঙ্গ স্পর্শ করালে কোন কোন ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হয়, অথবা কোন কোন পেশী সক্রিয় হয়।

৪। কোন ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাহক কোষ (receptor cells)-সংযুক্ত স্নায়ুসূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায়, মস্তিষ্কের কোন বিশেষ কেন্দ্রে গিয়ে সেগুলি শেষ হয়েছে। আবার দেখা যায়, মস্তিষ্কের কোন অংশ থেকে নির্গত স্নায়ুগুচ্ছ অনুসরণ করলে সেগুলি কোন পেশী বা গ্রন্থিতে এসে থামে।[১৫]

সংবেদ-কেন্দ্র (Sensory areas)—এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুসূত্রগুলি মধ্য-মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে গুচ্ছাকারে গুরুমস্তিষ্কের কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। যেমন কানের ভেতর ১০০,০০০ অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুকোষ আছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শেষ প্রান্তে বহু সহস্র সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু আছে। শব্দতরঙ্গ কানের ভেতর প্রবেশ করে এদের মধ্যে কতকগুলি তন্তুকে আন্দোলিত করে। তার ফলে ক্ষীণ বৈদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। সে শক্তি-তরঙ্গ আশ্চর্য কৌশলে সহস্রগুণ বর্ধিত হয়ে, স্নায়ুসূত্র বয়ে অবশেষে

১৫ Woodworth—Psychology, p. 267

গুরুমস্তিষ্কের একটি বিশেষ কেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে, তখনই সংবেদ জন্মে যে শ্রীমতী মীরা অরোরা বলছেন, "পরফেসর্ সাব্ আপকা জিব্ দেখলাইয়ে।"

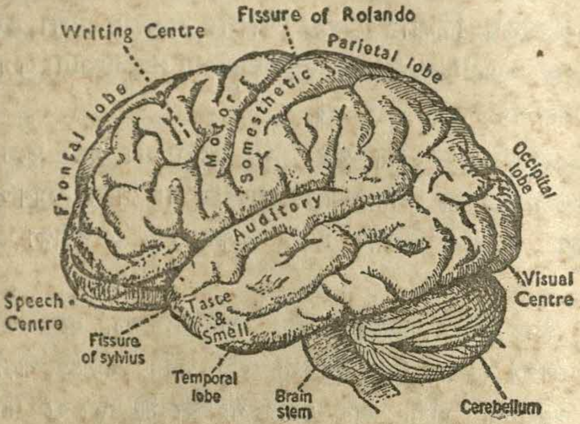

Localisation of functions in the cerebrum
[Woodworth—Psychology অনুসরণে]

অথবা বুঝতে পারি, দূরের ময়দার মিলে সন্ধ্যা ছ'টার সাইরেন্ বাজছে। কাজেই, "We hear not with our ears but in the brain." ঠিক তেমনি চোখের মধ্যে আছে ১৩ কোটি ইথার তরঙ্গ-সংগ্রাহক কোষ। তাদের কিছু সংখ্যক উত্তেজিত হয়ে অক্ষিপট (retina)-সংলগ্ন স্নায়ুগুচ্ছসংবলিত স্নায়ুসূত্র দ্বারা বাহিত হয়ে, অবশেষে গুরুমস্তিষ্কের Occipital lobe-এ একটি কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে, তখন সংবেদ জন্মে, 'গাছের পাতাটি কি সুন্দর তাজা সবুজ'।[১৬] এবার বিবিধ বোধ বা সংবেদ কেন্দ্রগুলির স্থান-নির্দেশ করা যাক।

ত্বক ও পেশী বোধের কোষ-কেন্দ্র (The Somaesthetic area) এগুলি Parietal lobe-এ; ওপরে Fissure of Rolando এবং নিচে Fissure of Sylvius দ্বারা সীমাবদ্ধ। দেহের সমস্ত অংশের ত্বক ও পেশী থেকে স্পর্শ, উষ্ণতা ও শৈত্য-বোধ, অঙ্গসঞ্চালন-বোধ (Kinaesthetic sensations) ইত্যাদির কেন্দ্র, গুরুমস্তিষ্কের এ স্থানে। এ স্থানের বামে Fissure of

১৬ We see the lovely spring foliage *with* our eyes, but it is the brain that gives us a feeling of joy and appreciation. J. D. Ratcliff—How Your Nervous System Works.

Rolando পার হয়ে, এ অংশের প্রায় সমান্তরাল হচ্ছে চেষ্টাকেন্দ্র (Motor area)। Somaesthetic কেন্দ্রে কোন আঘাত লাগলে, বা রোগের দ্বারা এর কোন অংশের স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্ট হলে, শরীরের কোন অংশের ত্বকের বা অঙ্গের বোধশক্তি লোপ পায়। কর্মকেন্দ্রের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি, এই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ অংশ, পায়ের ত্বক ও পেশী-বোধ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সর্বনিম্ন অংশ, মুখের ত্বক ও পেশীর বোধ নিয়ন্ত্রণ করে।[১৭]

শ্রবণ-কেন্দ্র (Auditory area)—Fissure of Sylvius-এর নিচে, temporal lobe-এর ঊর্ধ্বাংশের ক্ষুদ্র কিছু স্থান শব্দ-বোধের কেন্দ্র। দুই কান থেকে স্নায়ুসূত্র দুই অর্ধাংশের এই কেন্দ্রে এসে শেষ হয়, এবং এ কেন্দ্র নষ্ট হলে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বধির হয়ে যায়। তবে এরকম আঘাতের দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়।

দৃষ্টিকেন্দ্র (Visual area)—Parietal lobe-এর দক্ষিণে, Occipital lobe-এর নিচের দিকে, ডাইনে ক্ষুদ্র স্থান দৃষ্টির বোধ-কেন্দ্র। চক্ষু থেকে স্নায়ুসূত্রগুলির (optical nerves) এই স্থানেই সমাপ্তি। ডান চোখ থেকে Optic nerve বাঁদিকে, এবং বাঁ চোখ থেকে Optic nerve ডান দিকে যাওয়ার পথে পরস্পর অতিক্রম করে বলে মনে হয় (appear to cross)। কিন্তু এই নার্ভ বা স্নায়ুসূত্রের তন্তুগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায়, অক্ষিপটের (Retina) ভেতরের অর্ধাংশের তন্তুগুলি পরস্পর অতিক্রম করে বটে, কিন্তু বাইরের অর্ধাংশের তন্তুগুলি যে দিকের চক্ষু, মস্তিষ্কের সেই দিকের অর্ধাংশেই গিয়ে শেষ হয়। কাজেই ডান অর্ধাংশের দৃষ্টিকেন্দ্র দুই অক্ষিপটেরই দক্ষিণ অর্ধেক থেকে সংবাদ পায়, এবং বাম অর্ধাংশ দুই অক্ষিপটেরই বাম অর্ধেক থেকে সংবাদ পায়।[১৮]

কাজেই গুরুমস্তিষ্কের দক্ষিণ অর্ধাংশের দৃষ্টিকেন্দ্র নষ্ট হলে, একটা চোখ

---

১৭ Woodworth—Psychology, p. 270

১৮ The visual area of the right hemisphere gets the combined messages from the right halves of both retinas; similarly on the left side. Woodworth—Psychology, p 271

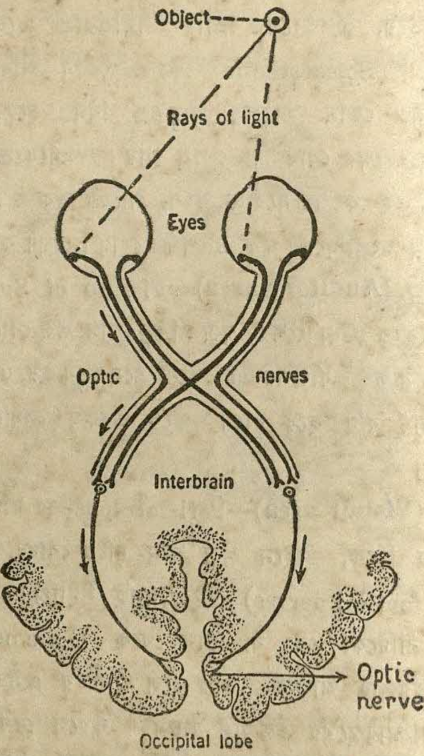

Path of nerves from the two retinas to visual area of the brain
[Woodworth—Psychology অনুসরণে]

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায় না। প্রত্যেক অক্ষিপটের দক্ষিণ অর্ধ দৃষ্টিশক্তি হারায়, তার ফল অর্ধ অন্ধত্ব বা hemianopsia।

ঘ্রাণ- ও স্বাদ-কেন্দ্র (Smell and Taste areas)—এগুলি মস্তিষ্কের সর্ব-নিম্নের প্রকোষ্ঠ বা temporal lobe-এর নিম্নাংশে বর্তমান। এ কেন্দ্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব স্পষ্ট নয়।

মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্র (Motor areas)—দেহের প্রধান পেশীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুসূত্রগুলিকে অনুসরণ করলে দেখা যায়, সেগুলি লঘুমস্তিষ্কের (cerebellum) মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে, গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের (Frontal lobe) দক্ষিণ ও ঊর্ধ্ব অংশে Fissure of Rolando-র পাশে পাশে, Somaesthetic area-র সমান্তরাল অংশে (Pre-central gyre) অবস্থিত। এখানে আছে, সেরা কোষক্ষু (giant cell)—তাদের আকৃতি

অনেকটা পিরামিডের মতো, তাই তাদের pyramidal cells-ও বলা হয়। এখান থেকে হ্রস্ব-দীর্ঘ নানা আকারের অ্যাক্সন্ মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে নিম্ন কর্মকেন্দ্রে (lower motor centres) পৌঁছে গুচ্ছাকারে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর কতকগুলি অ্যাক্সন্ মুখমণ্ডলের পেশীগুলির প্রান্তে উপনীত হয়েছে। এ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান বৈদ্যুৎশক্তিতে উত্তেজিত করলে, দেহের ও মুখমণ্ডলের বিভিন্ন পেশী সক্রিয় হয়। এই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্থান পায়ের পেশীকে চালনা করে, আর একটু নিচের কেন্দ্র দেহের মধ্যস্থলের পেশীগুলিকে উত্তেজিত করে ; এবং এই কেন্দ্রের সর্ব-নিম্নের স্থানগুলি ঘাড়, মাথা, মুখের বিভিন্ন পেশীর সঞ্চালন-ক্রিয়ার জন্যে দায়ী, এ কথা বিশ্বাস করার হেতু আছে। এ কেন্দ্রের কোন স্থান রুগ্‌ণ বা ছিন্ন হলে তার সঙ্গে সংযুক্ত পেশী স্থায়ীভাবে অথবা কিছুকালের জন্যে অচল হয়ে যায়। এ চেষ্টাকেন্দ্রের সংলগ্ন গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের কিছুটা অংশকে pre-motor area বলা হয়। এই অংশের কাজ বিভিন্ন চেষ্টাকেন্দ্র ও পেশীর ক্রিয়াগুলির সংযোগ- ও সমন্বয়-সাধন। চেষ্টাকেন্দ্র বিচ্ছিন্ন একটি বা কয়েকটি পেশীর ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু যখন বহু পেশী-ক্রিয়ার সমন্বয় প্রয়োজন হয় (যেমন ভাত-তরকারী মেখে, গ্রাস করে খাওয়া) তখন এই pre-motor area-র ডাক পড়ে।[১৯]

কিন্তু মস্তিষ্কের সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্র সমগ্র মস্তিষ্কের ভগ্নাংশ মাত্র স্থান অধিকার করে। মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের খুব সামান্য জ্ঞানই ছিল, এবং অনেক সময় দেখা যেত এ অংশের অনেকটা অংশ দুর্ঘটনার ফলে ছিন্ন হয়ে গেলেও ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই এ অংশকে silent area নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ-দিকে হাসপাতালে একটি শ্রমিক ভর্তি হল, শাবলের আঘাতে যার মস্তিষ্কের সম্মুখ দিকের অনেকটা অংশ উড়ে গিয়েছে। চিকিৎসার ফলে শ্রমিকটি আপাতদৃষ্টে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তার চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। সে ছিল সৎ ও কঠিন পরিশ্রমী, কিন্তু সে এখন অমিতাচারী, মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চকে পরিণত হল।[২০] অনুরূপ আরো বহু ঘটনা পরে দেখা গিয়েছে। উডওয়ার্থ নিউইয়র্ক স্টক-একস্‌চেঞ্জের এক দালালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

---

১৯ Woodworth & Marquis—Psychology, pp. 153-54

২০ K. Walker—Human Physiology, pp. 120-21

তার গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে একটি অর্বুদ (tumour) অস্ত্রোপচার দ্বারা ছেদন করতে গিয়ে মস্তিষ্কের দুই অর্ধাংশের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের অনেকটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। তাঁর বিষম মাথাধরা এবং মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগ দূর হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানেও দেখা যায় তাঁর চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর পূর্বের ন্যায় কাজে উৎসাহ দূর হল, পরকে দুঃখ দিতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না, মিথ্যা বড়াই করতেন, অশ্লীল কথা বলতে, এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করতে তিনি অভ্যস্ত হলেন। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ তাঁর থাকত না। ছোটখাটো নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাতেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেখানে একাগ্রতা প্রয়োজন, তাতে তাঁর উৎসাহ ছিল না। বৎসরাধিক কাল হাসপাতালে তাঁর মানসিক পুনর্বাসনের (mental rehabilitation) জন্যে চেষ্টা করে সামান্য কিছু উন্নতি দেখা গেলেও খুব বেশী উপকার হল না।[২১] এ সমস্ত বহু ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং ইতর প্রাণীদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলে তার ফলাফল লক্ষ্য করে দেহবিজ্ঞানীরা এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে মস্তিষ্কের বৃহৎ অংশের কাজ বিভিন্ন সংবেদ ও ক্রিয়ার সমন্বয়। সুতরাং সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্র ছাড়াও বহু **সংযোগকেন্দ্র** (**association areas**) মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো রয়েছে।

স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তা, বিচার, সমস্যা-সমাধান ইত্যাদি উচ্চতম ক্রিয়ার জন্যে সমগ্র মস্তিষ্কের সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন। সম্ভবত ব্যক্তিত্বের মূল স্নায়বিক কেন্দ্র এ স্থানেই। মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়াদি থেকে স্নায়বিক উত্তেজনা গ্রহণ করে, পেশীসমূহে স্নায়বিক শক্তি প্রেরণ করে (receptor-effector mechanism), স্নায়বিক শক্তি যথাস্থানে প্রেরণ করে, তাদের মধ্যে সংযোগসাধন করে (switch-board mechanism)। এ সমস্ত কাজগুলি সুষুম্নাকাণ্ড, লঘুমস্তিষ্ক, মস্তিষ্ক-কাণ্ড brain-stem or midbrain), পুষ্পাক্ষ ইত্যাদির দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে' এবং ইতর প্রাণীদের বেলায় এর বেশী প্রয়োজন নেই। স্নায়ুমণ্ডলীর এ পর্যন্ত বিকাশই প্রাচীন মস্তিষ্ক (old brain)। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের

২১ Woodworth—Psychology, pp. 278-79

ধারায় মানুষ যখন দেখা দিল, তখন মস্তিষ্কেরও নতুন উন্নতি (new brain) হল। স্নায়বিক উত্তেজনা (nervous stimulation), সংবেদগ্রহণ, এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response)-রূপ সহজ প্রতিক্রিয়া ছাড়াও, গৃহীত জ্ঞানের সংরক্ষণ (retention of impressions) এবং তাদের নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহারের (utilization of old impression to meet new situations) প্রয়োজনে নতুন মস্তিষ্কের (new brain) আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল।[২২]

নিম্নের স্তরের (সুষুম্নাকাণ্ড, সুষুম্নাশীর্ষক, ইত্যাদি) স্নায়ুসূত্রের সংযোগ দ্বারা সহজ ও যান্ত্রিক (যথা, আবর্তক্রিয়া) প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কে, বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) সম্মুখ প্রকোষ্ঠে স্নায়ুসূত্রের জটিল সংযোগের (complex nerve circuits) দ্বারাই কেবলমাত্র (১) যে সব ক্রিয়া শিক্ষাসাপেক্ষ (behaviour that is learned), (২) যা চেতনার সঙ্গে যুক্ত (associated with awareness), (৩) যা ইচ্ছা দ্বারা পরিবর্তন ও পরিচালন করা যায় (under voluntary control), এ সমস্ত উচ্চতর ক্রিয়া সম্ভব হয়।[২৩] "সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী যেমন দেহের সমস্ত ক্রিয়া আরম্ভ করে, যুক্ত করে, সমন্বয় করে, তেমনি গুরুমস্তিষ্কও সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কবৃন্ত, লঘুমস্তিষ্ক এবং অন্যত্র যে সব নিউরন্‌গুচ্ছ আছে, তাদের ক্রিয়া আরম্ভ করে, বাধা দেয়, সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে।"[২৪] নানা কারণেই, বিশ্বাস করার হেতু আছে যে, স্নায়ুমণ্ডলীর অন্যান্য অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরুমস্তিষ্কে এবং তার সংলগ্ন মধ্যমস্তিষ্কে পরিবর্তন-সাধন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চেতনার ক্ষেত্রেও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।[২৫]

মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, এই মত-বাদ প্রথম প্রচার করেন গল্ (Gall)—১৮০০ সনের কাছাকাছি। তাঁর মতবাদ (Phrenology) এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করলেও এখন তা পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি মনে করতেন, কোন মানসিক ক্ষমতা (mental faculty) কোন ব্যক্তিতে বিশেষ বিকশিত হলে, মস্তিষ্কের কোন একটি অংশ স্ফীত (bulges) হয়। তাঁর মতে, জ্ঞান বিচার ইত্যাদি ক্ষমতার (intellectual

২২ Munn—Psychology, p. 403
২৩ Munn—Psychology, p. 402
২৪ Stout—Groundwork of Psychology, p. 68
২৫ Stout—Groundwork of Psychology, p. 72

powers) স্থান হচ্ছে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ। কাজেই যাঁদের কপাল প্রশস্ত ও উচ্চ, তাঁরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। নৈতিক গুণসমূহের (moral qualities) স্থান মস্তিষ্কের উর্ধ্ব অংশে, এবং সর্বোচ্চ অংশে (crown) অবস্থিত শ্রদ্ধাভক্তির (veneration) স্থান। পাশব প্রবৃত্তিগুলির স্থান পশ্চাদংশে এবং কাম বা যৌনাকাঙ্ক্ষার (sex) স্থান সর্বনিম্নে। সুতরাং তাঁর মত, মস্তিষ্কের গঠন দেখেই কোন মানুষের চরিত্র-বিশ্লেষণ করা যায়। তাঁর এই মতের ওপর নির্ভর করে নানা বুজরুক মানুষকে ঠকাতে লাগল, এবং এক ভুয়া মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান (phrenology) গড়ে উঠল।

তাঁর মতবাদ ভ্রান্ত হলেও, তাঁর ইঙ্গিত একটি বহুল সম্ভাবনাময় গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা ফেলে দিয়ে, প্রাণীর দেহে তার ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমত, মস্তিষ্কে চেষ্টাকেন্দ্রগুলি আবিষ্কৃত হল, ক্রমে সংবেদকেন্দ্রগুলিও নির্দিষ্ট হতে লাগল এবং এ মতবাদ গড়ে উঠতে লাগল যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বোধ ও ক্রিয়ার জন্যে দায়ী। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি ফ্লুরেন্স (Flourens) পরীক্ষা করে দেখলেন, লঘুমস্তিষ্ক কেটে বাদ দিলে প্রাণীর ভারসাম্য এবং বিভিন্ন ক্রিয়ার সমন্বয়-ক্ষমতা ব্যাহত হয়, মস্তিষ্কবৃন্তে আঘাত দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এবং দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়; গুরুমস্তিষ্ক নষ্ট হলে স্মৃতিশক্তি, স্বাধীন উদ্যম (initiative), বিবেচনাশক্তিও নষ্ট হয়। কিন্তু তিনি যতদূর বুঝতে পেরেছেন, তাতে তাঁর মত এই যে, মস্তিষ্ক সমগ্রভাবেই ক্রিয়া করে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। এই মতবাদ পরবর্তীকালে ল্যাস্‌লী ও শেরিংটনও সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে পূর্বে-উল্লিখিত অন্যান্য গবেষণার ফলে, এবং যুদ্ধে মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যবহার হাসপাতালে লক্ষ্য করে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে চেষ্টা- ও সংবেদ-কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অবস্থান (localised) আছে, এ মত প্রাধান্য লাভ করে।[২৬] হ্যালিবার্টন এ মতবাদ-সমর্থনে বহু পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এ মত অধিকাংশ দেহবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন।[২৭] স্নায়ুতন্তুদের গন্তব্যপথ অনুসরণের (tracing the nerve)

২৬ Woodworth & Marquis—Psychology (1st. Asian Ed. 1961), p. 251
২৭ Halliburton—Handbook of Physiology, p. 729

fibres) সূক্ষ্মতর পন্থা এবং গবেষণার অধিকতর নির্ভরযোগ্য ফলাফলও এই মতবাদের পোষকতা করছে। এ প্রসঙ্গে, বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত চারটি বিভিন্ন কেন্দ্রের আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের নীচের দিকে (Fissure of Sylvius-এর ঠিক ওপরে) একটি ক্ষুদ্র অংশ বাক্য-উচ্চারণ (pronunciation)-ক্রিয়া পরিচালনা করে। এরই কাছাকাছি ক্ষুদ্র আর একটি কেন্দ্র, বাক্যের লেখন (writing)-ক্রিয়ার নিয়ামক। কোন কোন রোগী উচ্চ রক্তচাপ-জনিত পক্ষাঘাতের ফলে বাক্য-উচ্চারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু বাক্য-লেখনের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। আবার বিপরীতও দেখা যায়। বাক্য-শ্রবণ (word-hearing) ও বাক্য-দর্শনের (word-seeing) কেন্দ্রও ভিন্ন ভিন্ন, এ রকম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[২৮] আধুনিক গবেষণার ফলে এ-ও প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, চেষ্টাকেন্দ্র হতে শক্তি ক্ষরিত হলে সচেষ্ট ক্রিয়ার বোধ (sense of innervation) জন্মে, পূর্বের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। চেষ্টাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সচেতন ইচ্ছার (will) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই।[২৯]

যদিও আধুনিক গবেষণার ফলে মস্তিষ্কে সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান প্রায় নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুরেন্স-এর সিদ্ধান্ত যে সমগ্র মস্তিষ্ক সমগ্রভাবে একক যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়া করে, এ কথার যাথার্থ্যও ক্রমেই অধিকতর স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। মস্তিষ্কের বৃহত্তর অংশের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগসাধন, এবং এ প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, স্মৃতি, কল্পনা, বিমূর্তচিন্তা ইত্যাদি উচ্চতম মানসিক ক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্র মস্তিষ্কে চিহ্নিত করা যায় না। সমগ্র মস্তিষ্ক, বিশেষত গুরুমস্তিষ্ক, সমগ্রভাবে এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। ব্যাঙ, কবুতর, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক অপসারণ করে দেখা গিয়াছে, যে প্রাণী যত বেশী উচ্চ শ্রেণীর, তার ব্যবহার এ অপসারণ দ্বারা তত বেশী প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়। ব্যাঙের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক অপসারণ করলে তার ব্যবহারে খুব বেশী পরিবর্তন দেখা যায় না। কবুতর এ অবস্থায় উড়তে পারে এবং ডালে গিয়ে বসতে পারে, কিন্তু কেমন জড়বৎ বসে থাকে—তাড়া না দিলে স্বাধীন ইচ্ছায় কোন ক্রিয়া-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় না। কুকুরের বেলায় এ প্রতিক্রিয়া আরো

২৮ Walker—Human Physiology, pp. 121-122

২৯ Stout—Groundwork of Psychology, pp. 76-77

বেশী প্রতিকূল দেখা যায়। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া-ব্যতিরেকে সচেষ্ট ক্রিয়া (voluntary actions) সম্ভব নয়।[৩০] এ অবস্থায় পুরাতন অভ্যস্ত কাজ করতে সক্ষম হলেও প্রাণী নতুন কাজ শেখবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারায়।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র নানাপ্রকার সংবেদ ও ক্রিয়ার নিয়ামক হলেও মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সহযোগিতা ভিন্ন তারা কাজ করতে পারে না। তা ছাড়া, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, মস্তিষ্কে কোন একটি কেন্দ্র বিনষ্ট হলে, কিছুদিন পর চেষ্টার ফলে, সেই কেন্দ্রের কাজ অন্য কোন কেন্দ্র চালাতে পারে (substitution)। একটি কুকুরকে অনেকদিন ধরে কয়েকটি খেলা শেখানো হল। তারপর তার করোটি ছেদ করে মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্রের খানিকটা অংশ অপসারণ করা হল। ফলে কুকুরটি শেখানো খেলাগুলি আর করতে পারল না। সে সুস্থ হয়ে উঠলে, আবার তাকে সেই পুরাতন খেলাগুলো শেখাতে চেষ্টা করা হল। আশ্চর্যের বিষয় যে, কুকুর আবার এ খেলাগুলো শিখতে পারল, যদিও তাতে সময় আগের চেয়ে বেশী লাগল এবং পূর্বের মতো স্বচ্ছন্দে সে খেলা দেখাতে পারত না। পরিবর্তিত অবস্থায় মস্তিষ্ক কোন এক বিকল কেন্দ্রের কাজ অন্যান্য কেন্দ্রের সাহায্যে চালাতে পারে, মস্তিষ্কের সামগ্রিক ঐক্যের এ-টি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমস্ত স্নায়ুবিকমণ্ডলীকে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ মণ্ডলীতে শাসনযন্ত্রের মতো স্তরবিভাগ (administrative levels) আছে, অধিকার ও দায়িত্ববণ্টন আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আছে সুসমন্বয় (co-ordination এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থা (central control)। সব কেন্দ্রেই সংবাদ-গ্রহণ (reception of information), হুকুম প্রচার (issuing of directives) এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সাধনের (establishing contacts) ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে কেন্দ্রের স্থান যত উচ্চে, তার দায়িত্ব তত বেশী গুরুতর এবং সংযোগ-ব্যবস্থা তত জটিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেরই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, এবং জরুরী অবস্থায় স্বাধীন ক্রিয়ার অধিকার আছে; কিন্তু নিম্নতর কেন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিম্নতম কেন্দ্রকে উচ্চতম কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসাধন করতে হলে নিজস্ব উচ্চতর কেন্দ্রের মাধ্যমেই তা করতে হবে। উচ্চতর কেন্দ্র নিম্নতর কেন্দ্রের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে;

৩০ Walker—Human Physiology, p. 122

প্রয়োজন হলে নিম্নতর কেন্দ্রের কাজ নিজ দায়িত্বে চালাতে পারে, কিন্তু এর বিপরীত ব্যবস্থা নেই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যেমন সম্পূর্ণ সুযুক্তিপূর্ণ, ব্যতিক্রমবিহীন, স্বতঃবিরোধিতাবিহীন ব্যবস্থা নয়, তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেও একই কাজের জন্যে বিভক্ত দায়িত্ব (divided control), বিভিন্ন কেন্দ্রের দায়িত্বের সুস্পষ্ট সীমারেখার অভাব (duplication of functions), নানা বৈপরীত্য ও ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মতো এখানেও পুরাতন কাঠামোর ওপরই যেন জোড়াতাড়া দিয়ে নতুন কাঠামো তৈরী হয়েছে, পুরাতন মস্তিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন মস্তিষ্ক। এর সুবিধা এই যে, এর ফলে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি। দুয়ের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা ও ঐক্যের সূত্র বর্তমান, কিন্তু এর অসুবিধা হচ্ছে যে, এ একেবারে নতুন অবস্থার সঙ্গে খুব দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত অসঙ্গতি সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই অতি জটিল স্নায়ুমণ্ডলী আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।[৩১]

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ (The stimulus-response formula)—মনোবিজ্ঞানী যখন মানুষকে জানতে চান, তখন তিনি যে হাজারো প্রশ্ন করেন সেগুলোকে সংক্ষেপে তিনটি প্রশ্নে পরিণত করা যায়—

ব্যক্তি কি করে? কেন তা করে? কিভাবে করে? অথবা অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, **মনোবিদ্যার প্রধান তিনটি প্রশ্ন**। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, **কি**?—'**What**?'—কাম্যবস্তু বা গন্তব্যস্থান (কৃষ্ণা গানের ক্লাসে যাচ্ছে, বাট্টু ফল পাড়ছে)। একে ইংরেজীতে বলব—**Goal**। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—**কেন**—'**Why**?'—এ হচ্ছে কর্মের পশ্চাতে মানসিক তাড়না বা প্রেষণা (কৃষ্ণা এবার সঙ্গীতে 'প্রভাকর' পরীক্ষা দেবে।)। ইংরেজীতে বলব **Motive**। আর তৃতীয় হচ্ছে **কিভাবে**?—'**How**?'—এ হচ্ছে কর্মের কৌশল (বাট্টু দেয়ালের ওপর চড়ে পেয়ারা পাড়ছে)। একে ইংরেজীতে বলব **Route**।

প্রথম প্রশ্ন, ব্যক্তি কি করে? এর উত্তর এক কথায় বলা যায়, সে তার পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে (the individual deals with the environment)। প্রতিকূল পরিবেশকে সে বাধা দিতে চেষ্টা করে (resists), যেমন—শীতের কন্‌কনে হাওয়া বইলে গায়ে মোটা পশমের চাদর

৩১ R. B. Cattell—Your Mind & Mine, pp. 28-34

জড়ায়। আবার কখনো সে পরিবেশের সঙ্গে সহযোগিতা করে, কখনো তাকে কাজে লাগায়, যেমন—হাওয়ার দিকে পাল ঘুরিয়ে নৌকার গতিকে ত্বরান্বিত করে। পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকে শিশু ভাষা-শিক্ষা করে, ভদ্রতা-শিক্ষা করে। এ সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার **পরিবেশকে জানে (knows the environment)**। এবং সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে **নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় (adjusts himself to the environment)** সুতরাং দেখা যায়, প্রতিনিয়ত ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে আদানপ্রদান (interaction) চলছে, এবং এই পারস্পরিক সম্বন্ধকে পরিবেশ-ব্যক্তি-পরিবেশ, অথবা W—O—W এই ফর্মূলা দিয়ে প্রকাশ করা যায় (এখানে W হচ্ছে World বা সমগ্র পরিবেশ, এবং O হচ্ছে Organism বা দেহধারী ব্যক্তি)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ব্যক্তি কেন কোন কাজ করে? এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিই সব চেয়ে ভালো দিতে পারে। এমন কি, অনেক সময় সে নিজেও খুব ভালো জানে না, কেন সে বিশেষ একটি ক্রিয়া বিশেষ একটি সময়ে করছে। এ মনোবিজ্ঞানের আন্তরিক (subjective) দিক। **জন্মগত সংস্কার, সাময়িক প্রক্ষোভ (emotion), গভীর অনুভূতি (sentiment) এবং কখনো বা শুষ্ক বিচারবুদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রেষণা (motivation) জোগায়।** এ মানসিক হলেও এর পেছনেও মূল উদ্দেশ্য হল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির মিল। কাজেই সেখানেও W—O—W ফর্মূলা কাজ করছে।

তৃতীয় প্রশ্ন, ব্যক্তি কিভাবে কোন কাজ করে? এ প্রশ্নেও দেখি, সেই পরিবেশ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। একে দু অংশে ভাগ করে দেখা যায়—এক হচ্ছে কিভাবে পরিবেশ ব্যক্তির ওপর ক্রিয়া করে, W—O। আবার বিপরীতভাবে, কিভাবে ব্যক্তি পরিবেশের ওপর ক্রিয়া করে, O—W।

পরিবেশ ব্যক্তির ওপর ক্রিয়া করে, প্রধানত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। আলো, শব্দ, উত্তাপ ইত্যাদি উদ্দীপক (stimuli) ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট গ্রাহক স্নায়ুতন্তুকে (receptors) চঞ্চল করে, সেই উত্তেজনার স্রোত সংবেদ স্নায়ুসূত্র (sensory nerves) বয়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট সংবেদকেন্দ্রে (sensory centre) সাড়া জাগায়, তারই ফল বিভিন্ন সংবেদন, যথা—সবুজ রঙ, বাঁশীর সুর, গরম জল ইত্যাদি। কিন্তু কেবলমাত্র সংবেদেই এ সমাপ্তি ঘটে না। সংবেদকেন্দ্রের

সঙ্গে চেষ্টাকেন্দ্রের সংযোগ ঘটে সংযোজক স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে (connecting nerves)। এবং চেষ্টাকেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে নতুন শক্তি প্রেরণ করে চেষ্টা স্নায়ুসূত্রের পথে, যার ফলে কোন পেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটায়, যথা—পাকা পেয়ারাটি দেখে বাছু দেয়াল বেয়ে উঠে গাছের ডালটি নামিয়ে পেয়ারাটি গাছ থেকে পাড়ল। এই সংবেদ ও ক্রিয়ার স্রোত অন্বাদ্বিভাবে যুক্ত হয়ে নতুনতর সংবেদ ও ক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করবে। যা সংগ্রাহক স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে, তা হচ্ছে Stimulus এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে Response। কাজেই ব্যক্তির জীবনে চলছে, Stimulus-Response—Stimulus-Response-এর অবিচ্ছিন্ন স্রোত। ব্যক্তির এই প্রতিক্রিয়া বা Response যে ইন্দ্রিয়-বোধের নিম্নস্তরেই আবদ্ধ, এমন নয়। কলকাতায় বাসার টবে লাল গোলাপ দেখে মনে পড়ল, নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনস্-এর পুষ্প-সমারোহ। এ-ও Response। অথবা এ গোলাপ দেখে, যদি কোন তরুণী ভবিষ্যতের একটি আনন্দময় সন্ধ্যার কথা স্মরণ করে, তা-ও সেই ব্যক্তির response। যদি কোন ভগবদ্ভক্ত সেই গোলাপ দেখে ভগবানের অপার করুণার ধ্যানে নিমগ্ন হন, তা-ও response। সুতরাং সবক্ষেত্রেই দেখছি, সেই এক যোগসূত্র, Stimulus-Response।

ব্যক্তি পরিবেশের ওপর ক্রিয়া করে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয় পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের দ্বারা। কিন্তু পেশী নিজে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয় না। মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্র (motor centre) থেকে স্নায়বিক শক্তি বাহিত হয়ে পেশীকে সক্রিয় করে, পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণ কার্য (effect) সৃষ্টি করে, কাজেই তাদের বলে Effectors। পেশী ছাড়াও মনুষ্যদেহে আরো কিছু যন্ত্র আছে যারা কার্য সৃষ্টি করে, এরা হচ্ছে glands বা রসক্ষরা গ্রন্থি—যেমন, লালাস্রাবী গ্রন্থি (salivary gland) মুখাভ্যন্তরে খাদ্যকে আর্দ্র করে, তারপর যকৃৎ এবং আরো কোন কোন গ্রন্থি অন্ত্রমধ্যে খাদ্যকে জীর্ণ হতে সাহায্য করে। এখানেও সেই Stimulus-Response সূত্রের ক্রিয়া।

জড়বস্তুর বেলাতেও তো আমরা দেখি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action-reaction) অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (purely mechanical)। জড়বস্তুর ওপর যে শক্তি ক্রিয়া করে, তার প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত (equal and opposite), কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়।

একই উদ্দীপক বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জাগায়। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা শক্তি রুচিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র Stimulus-Response-এর অন্ধ সূত্র দ্বারা তার ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কাজেই সূত্রটিকে একটু পরিবর্তন করে লিখতে হবে, S—O—R; Stimulus ক্রিয়া করে Organism-এর ওপরে, এবং তার ওপর নির্ভর করে Organism-এর Response। Response বুঝতে হলে Stimulus-কে Organism-এর সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে।

এখন Organism বা **ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন?** এর **তিনটি কারণ** (factors) নির্দেশ করা যেতে পারে। (১) **ব্যক্তির দেহমনের স্থায়ী গঠন** (Structure বা Permanent characteristics) দেহের গঠন বলতে বর্তমান কালে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতিই শুধু বোঝায় না, বংশগতিক্রমে যা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের যাবতীয় পরিবর্তনও বোঝায়। মনের পরিবর্তন দ্বারা আমরা বুঝি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কাল পর্যন্ত তার অভ্যাস, চিন্তা, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার মোটামুটি স্থায়ী গঠন। সহজেই বোঝা যায় একটি শিশুর কোন বিশেষ উদ্দীপক সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, একজন পরিণত মানুষের প্রতিক্রিয়া তা থেকে পৃথক হবে; অথবা একজন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া এবং একজন নির্বোধ লোকের প্রতিক্রিয়া এক হবে না। একজন সাধারণ গ্রাম্য মানুষ দাঁত তুলতে যে রক্তপাত হয়, তা দেখে বিচলিত হয়, কিন্তু একই বয়সের একজন দন্তচিকিৎসক এতে একেবারেই চঞ্চল হন না। (২) **ব্যক্তির বর্তমান সাময়িক অবস্থা** (Temporary state)। শান্ত অবস্থায় কোন মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং দেহের সতেজ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের হয়। তেমনি রাগ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন অনুভূতি যখন মনকে অধিকার করে আছে, তখন একই উদ্দীপক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। (৩) **ব্যক্তি বর্তমানে যে কাজে ব্যাপৃত আছে** (activity in progress) তার ওপরও তার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। পুরোহিত যখন অষ্টগ্রহ শান্তি যজ্ঞে ব্যাপৃত, তখন দক্ষিণার পরিমাণ দ্বারা সহজেই তিনি প্রলুব্ধ হবেন। কিন্তু, যখন গৃহিণী তাঁর মৃত্যুশয্যায়, তখন এ চিন্তাও তাঁর কাছে বিষবৎ হবে।

কাজেই **কোন এক মুহূর্তে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া** (response) **ব্যক্তির স্থায়ী গঠন, বর্তমান সাময়িক অবস্থা এবং তৎকালে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য**

অনুসরণ করছে বা যে ক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছে ; এ সব কিছুর ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে কোন একটি কারণ (factor) বলবৎ হয়ে তৎমুহূর্তের ক্রিয়াটি নির্ধারণ করবে।

ইতিপূর্বে, ব্যক্তি কি করে ? এই প্রশ্নের উত্তরটি W—O—W এই সূত্রদ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, এবং কোন ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করে এবং কিভাবে এ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এই প্রশ্নের উত্তরটি S—O—R সূত্র দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। এবার এ দুই সূত্রকে একত্র করে আমরা নিম্নলিখিত সূত্র পেতে পারি, W—S—O—R—W, অর্থাৎ পরিবেশ থেকে উদ্দীপক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, তার ফলে ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা তার পরিবেশকে প্রভাবিত করে বা পরিবর্তন করে। কিন্তু একটি বিশেষ মুহূর্তে বহু উদ্দীপক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছে। এবং কোন একটি উদ্দীপকের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি বহু সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু তা হলে তার প্রতিক্রিয়া মোটামুটি সফল হয় কি করে ? এবং পরিবেশের সঙ্গে তার সুসঙ্গতি ঘটে কি করে ? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় তার পরিবেশকে নিজ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে এবং নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে খাপ খাওয়াতে পারে (can deal efficiently with the environment)। এর কারণ, তার কাছে একসঙ্গে যে উদ্দীপকগুলি আসে, তাদের মধ্যে সে বাছাই করে (selectivity), বর্তমান মুহূর্তে সে কোন্ উত্তেজনায় সাড়া দেবে। এবং তার বর্তমান ক্রিয়ার সঙ্গে উদ্দীপকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই সে সার্থকভাবে সাড়া দেয় (set)। যখন কোন ক্রিয়াতে তার সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে, তখন তার পরিপোষক উদ্দীপনা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া সফল হয়। সকল ক্রিয়ার সার্থক সমাপ্তির জন্যেই একটি **প্রস্তুতি-পর্ব (preparatory set)** প্রয়োজন। যেখানে ব্যক্তি প্রস্তুত, সেখানে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সময় অকিঞ্চিৎকর। যেখানে ব্যক্তি প্রস্তুত নয়, অথবা যেখানে বহু উদ্দীপক একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে জটিল প্রতিক্রিয়া দাবি করছে, সেখানে এ সময় দীর্ঘতর। এর নাম—Reaction time।[৩২]

'Reaction time' সম্বন্ধে একটি সহজ পরীক্ষা—এ পরীক্ষায় টেবিলের এক প্রান্তে থাকেন পরীক্ষক (experimenter), আর এক

[৩২] Woodworth & Marquis—Psychology, pp. 194-212

প্রান্তে থাকেন ব্যক্তি যার ওপর পরীক্ষা হচ্ছে (organism)। দুয়ের মাঝখানে একটি অস্বচ্ছ পর্দা, যাতে পরস্পরকে দেখতে না পান। Eর কাছে থাকে একটি সুইচ্ এবং সময়-মাপক একটি বৈদ্যুৎশক্তিচালিত ঘড়ি। অন্য দিকে C-এর সামনে থাকে একটি বৈদ্যুতিক আলো, এবং ওপারে ঘড়ির সঙ্গে তার দ্বারা সংযুক্ত একটি চাবি (key)। E পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে বলেন, 'Ready'। তার পরেই সুইচ্ টিপেন, এবং Oর সামনের আলোটি জ্বলে ওঠে, এবং তাঁর সামনের ঘড়িটি চলতে সুরু করে। আলোটি দেখা মাত্রই O তাঁর সামনের চাবিটির ওপর আঙুলটি তুলে নেন। তৎক্ষণাৎ ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন দেখা যায়, আলোর সুইচ্ টেপা, এবং Oর আলো দেখার মধ্যে প্রায় ⅕ সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়েছে। এ হল Reaction time।[৩৩]

নানা রকম উত্তেজক (stimuli) নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে আলোর বেলায় প্রতিক্রিয়ার সময় প্রায় '১৮ সেকেণ্ড, কিন্তু শব্দ বা স্পর্শের বেলায় প্রতিক্রিয়ার সময় কিছুটা কম—'১৪ সেকেণ্ড।[৩৪] উপরের উদাহরণটি সরল প্রতিক্রিয়ার সময়-মাপক পরীক্ষার। কিন্তু এ পরীক্ষা জটিলতর হতে পারে। যেমন, ব্যক্তিকে বলা হল লাল আলো দেখলে ডান হাত তুলতে হবে, আর সবুজ আলো দেখলে বাম হাত। অথবা বলা হল একটি সংখ্যা, বা বর্ণ দেখা বা শোনা মাত্র তার পরবর্তী (বা পূর্ববর্তী) সংখ্যা বা বর্ণটি বলতে হবে। এসব পরীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার সময় বেশী লাগে। সহজেই বোঝা যায় এ সব পরীক্ষায় অভ্যস্ত হলে, প্রতিক্রিয়ার সময় হ্রাস পায়। যে সব কথা বা ছবির সঙ্গে কোন গভীর অনুভূতির স্মৃতি জড়িত থাকে, সেখানে প্রতিক্রিয়ার সময় দীর্ঘতর হয়। মনোবিকলনের (Psychc-analysis) ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর সুপ্ত মানসিক দ্বন্দ্ব বা গ্রন্থি আবিষ্কারের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।[৩৫]

৩৩ Reaction experiment (Reaction-time experiment): A classical psychological experiment, in which the time a subject takes to a stimulus is measured, generally by some type of chronoscope. The stimulus may be any sense stimulus and the response, in the case of simple reaction time is usually given by lifting the finger from the button of reaction key or tapping key ; the signal or stimulus may be complicated in various ways, and to various degrees-in which case we have compound or complex reactions time as a result, and the response may be made with different and appropriate types of reaction key—lip key, sound key etc, Drever—A Dictionary of Psychology, pp. 235-36

৩৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 213

৩৫ Stout—Groundwork of Psychology, P. 59

রোগীকে আরামে শুইয়ে একটির পর একটি কথা অনর্গল বলতে বলা হয়। দেখা যায়, সে কোথাও কোথাও থেমে যাচ্ছে। যে কথাগুলির বেলায় সে এমন

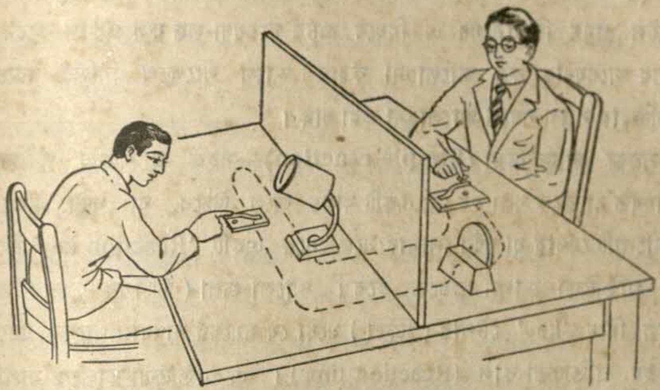

Fig. 15. Reaction time Experiment
after Woodworth & Marquis Psychology. P, 212 (Fig., 37, Asian Ed., '61)

থেমে যায়, সে কথার সঙ্গে তার কোন মানসিক দ্বন্দ্বের স্মৃতি জড়িত আছে, এ প্রকার সন্দেহ করা হয়ে থাকে। এবং সেই অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব থেকে রোগীকে মুক্ত করে তাকে নিরাময় করে তোলা সম্ভব হয়।

প্রতিক্রিয়া কাল (The reaction-time)

সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়া অর্থ, বাইরের কোন উত্তেজকের উপস্থিতিতে ব্যক্তির ক্রিয়া। এবং উত্তেজকের বোধ, ও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, যে সময়ের ব্যবধান থাকে, তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া-কাল। বর্তমান কালে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে এই প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা সুরু হওয়ার গোড়ায়, একটি মজার কাহিনী চলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীনিচ মানমন্দিরে এক মন্দভাগ্য সহকারী জ্যোতির্বিদের চাকুরী চলে যায়, কারণ তাঁর কাজ ছিল, কোন বিশেষ গ্রহ যখন ঠিক মেরিডিয়ানে আসবে সে সময়টি টুকে রাখা, এবং তাঁর নির্ণীত সময় সর্বদাই আসল সময় হতে বেশী হত। অর্থাৎ

তাঁর প্রতিক্রিয়া কাল ছিল, স্বাভাবিক হতে অনেক বেশী। এর কিছুকাল পরেই প্রতিক্রিয়া কাল সম্বন্ধে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নিয়ে জার্মান জ্যোতির্বিদ বেসেল্ (Bessel-1882) একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপরেই হেল্ম্‌হোলৎস, ক্যাটেল্ প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা-লব্ধ ফল প্রকাশ করেন। এ সব গবেষণার ফল আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

সহজ প্রতিক্রিয়া (Simple reaction)—সহজ প্রতিক্রিয়া পরীক্ষায় সাধারণত ব্যক্তিকে বলা হয় যে, একটি বাতি জ্বলে উঠবে, বা ঘণ্টা বাজবে, ঐ আলোটি দেখার বা ঘণ্টা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Reaction key' টিপে তাঁর প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। আলো জ্বলা (উদ্দীপক), ও ব্যক্তির আঙ্গুল দিয়ে 'key' টেপার (ক্রিয়া) মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time)। এ প্রতিক্রিয়া-কালকে মাপাই হল এ পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণত আলো জ্বলা ও আলো দেখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র। সাধারণ ঘড়ি দিয়ে এত কম সময় মাপা যায় না। এজন্য বৈজ্ঞানিকগণ তুটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। হিপ্‌স্ ক্রনোস্কোপ (Hipps Chronoscope) নামে অত্যন্ত মূল্যবান ঘড়ির সাহায্যে সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ মাপা চলে (এর প্রতি অংশকে সাধারণত সিগ্‌মা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যদিও Standard deviation-এর চিহ্নও সিগ্‌মা, তবুও মনোবিজ্ঞানে এ নিয়ে সাধারণত কোন ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না)। তাছাড়া Vernier chronoscope-এর সাহায্যেও সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাপা চলে।

সহজ প্রতিক্রিয়া (Simple reaction) তিন প্রকারের হয়; পেশীর প্রতিক্রিয়া (Muscular reaction), সংবেদনের প্রতিক্রিয়া (Sensorial reaction) এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural reaction)। পেশীর প্রতিক্রিয়াতে ব্যক্তির মনোযোগ নিবিষ্ট হয় আঙ্গুলের গতির প্রতি; উদ্দীপকটি দেখা মাত্রই 'Key' টিপে দিতে হবে। সংবেদনের প্রতিক্রিয়াতে তাঁর লক্ষ্য থাকে উদ্দীপকের ওপর, উত্তেজকটি ভাল করে অনুধাবন করে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। মনোযোগের বস্তুর এ প্রভেদের ফলে, সাধারণত পেশীর প্রতিক্রিয়া-কাল, সংবেদনের প্রতিক্রিয়া-কাল হতে কম হয়ে থাকে। যেমন, মায়ার্স উদাহরণ দিচ্ছেন, আলো উদ্দীপকের প্রতি গড় পেশী-প্রতিক্রিয়া

কাল যখন ১৭৫ সিগমা হচ্ছে, তখন গড় সংবেদন-প্রতিক্রিয়াকাল হচ্ছে ২৭০ সিগমা। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতে পেশী বা উত্তেজকের প্রকৃতি—এর কোনটির ওপরই বিশেষ করে ঝোঁক না দিয়ে, সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করা হয়। সাধারণত, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-কাল, সংবেদনে-প্রতিক্রিয়া কাল ও পেশী-প্রতিক্রিয়া কালের মাঝামাঝি হয়। এ তিনপ্রকার প্রভেদ নির্ভর করে ব্যক্তির মনোভাবের ওপর। যথেষ্ট অনুশীলনের ফলে সহজ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়, এবং প্রায় প্রত্যাবর্তকক্রিয়ার (reflex action) সমগোত্রীয় হয়।

জটিল প্রতিক্রিয়া (Composite reaction)—সহজ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি শুধু একটি মাত্র উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে, এবং ঐ উদ্দীপকটির প্রকৃতি তাঁর আগে থেকেই জানা থাকে। এখানে কোন দ্বিধা বা চিন্তার অবকাশ থাকে না, প্রায় যান্ত্রিক ভাবেই ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এ প্রতিক্রিয়া জটিলতর হয়ে উঠবে, যদি একই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের উদ্দীপক থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক বেছে নেওয়ার প্রশ্ন থাকে। জটিল প্রতিক্রিয়া কয়েকটি বিশেষ ধরণের হতে পারে, যথা—'Discrimination reaction' এবং 'Choice reaction'। 'Discrimination reaction' পরীক্ষায় সাধারণত একই সময়ে একাধিক উদ্দীপক দেওয়া হয়, যেমন দুটি বিভিন্ন স্বর, বা দুটি ভিন্ন রং। এদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে ব্যক্তিকে বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ রং বা স্বরটি সে লক্ষ্য না করবে, ততক্ষণ সে কোন প্রতিক্রিয়া জানাবে না। Choice reaction-এ প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি আরো জটিলতর। এখানে একাধিক উদ্দীপক ছাড়া, Reaction key-এর সংখ্যাও বেড়ে যায়। সাধারণত ব্যক্তিকে দুটি Reaction key দেওয়া হয়, লাল আলো দেখা গেলে ডান হাতের key তে চাপ দেবে; নীল আলো দেখা গেলে বাঁ হাতের key তে চাপ দেবে। তাকে লক্ষ্য করতে হবে, কখন কোন উদ্দীপকটি আসে, এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

বলাই বাহুল্য, সহজ প্রতিক্রিয়ার মত যান্ত্রিক ভাবে জটিল প্রতিক্রিয়া ঘটে না, এবং জটিল প্রতিক্রিয়াতে যথেষ্ট চিন্তা ও মনোযোগের প্রয়োজন, এবং সময়ও বেশী লাগে। অনেক মনোবিদ্ চেষ্টা করছেন,[৩৬] জটিল প্রতিক্রিয়াতে

৩৬। 'মনোবিদ্যার রূপরেখা' গ্রন্থে 'মনোবিজ্ঞানে মতবাদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তা ও নির্বাচনের জন্য যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তার পরিমাপ করতে। ডাচ্ মনোবিদ ডণ্ডার্স্-এর ধারণা ছিল যে, 'discrimination reaction time' থেকে সহজ প্রতিক্রিয়াকাল বিয়োগ দিলেই 'discrimination time' বা বিভিন্ন উদ্দীপকের জন্য বিশেষ্ মানসিক প্রস্তুতির প্রতিক্রিয়াকালকে পাওয়া যাবে। অনুরূপ ভাবে, Choice reaction time থেকে 'discrimination time' বাদ দিলে 'will' বা 'choice' বা বাছাই-এর সময় কতটা তা পাওয়া যাবে। একে আমরা elimination by subtraction পদ্ধতি বলতে পারি। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কোনও একটি জটিল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সহজ প্রতিক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কয়েকটি ক্রিয়া বা চিন্তাশক্তির সমন্বয়। এ জটিল প্রতিক্রিয়া কাল হতে সহজ প্রতিক্রিয়া কালকে বাদ দিলেই উক্ত চিন্তাশক্তি বা মস্তিষ্ক চালনার সময়ের হিসাব হবে।

এ মতের সমর্থন আমরা পাই ভুণ্ডের (Wundt) মতবাদে। প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাকে ভুণ্ড কয়েকটি অংশে বিশ্লেষণ করেছেন,—প্রথমত, উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোগ ও পরিচয় (perception of stimulus), দ্বিতীয়ত মনোনিবেশের ফলে উদ্দীপকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা পূর্ণ পরিচিতি (apperception), তৃতীয়ত ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া।

ক্যাটেলের পরীক্ষা ও মতামত—আমেরিকান্ মনোবিদ্ জেম্স্ ম্যাক্‌কীন ক্যাটেল্ লাইপৎজিগ-এ ভুণ্ডের মনোগবেষণাগারে প্রতিক্রিয়া কালের ওপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, এবং ঐ বিষয়ে বিশেষ গবেষণার ফলে, ১৮৮৬ সালে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর গবেষণা পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে, ও মানসিক ক্রিয়ার রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নূতন দিক সূচিত করে।[৩৭]

ক্যাটেল, ডণ্ডার্স্ ও ভুণ্ডের মতবাদের বিরোধিতা করলেন। তিনি বলেন যে, 'discrimination' বা 'choice reaction time' কে ডণ্ডার্স্ যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা সম্ভব নয়। সহজ প্রতিক্রিয়া কালকে বাদ দিলে যে অতিরিক্ত সময়ের হিসাব আমরা পাই, তা শুধু ক্রিয়াটির জটিলতাই নির্দেশ করে, আর কিছু নয়। ক্যাটেলের মতে যে কোন প্রতিক্রিয়াই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়া, তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, বা

৩৭। Title of James McKeen Cattell's dissertation, "The time taken up by cerebral operations."

কতগুলি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টি হিসাবে দেখা যায় না। কি সহজ, কি জটিল যে কোন প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি অখণ্ড রূপ আছে, একটির সময় অপরটি থেকে বাদ দিয়ে, অবশিষ্টাংশের সাহায্যে ক্রিয়াটির বিশেষত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।

ক্যাটেলের মতে সহজ প্রতিক্রিয়ার সময়ে ব্যক্তি উদ্দীপক ও পেশীর প্রতি সমগ্র মনোনিবেশ করে। এখানে ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও পেশীর মধ্যে নার্ভের যোগাযোগ পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে, অপেক্ষা শুধু উদ্দীপকের জন্য। 'Discrimination' বা 'choice reaction' পরীক্ষায়, নার্ভের সংযোগ আরো জটিলতর হয়ে ওঠে, এখানে উদ্দীপকটি অজানা থাকার দরুণ মনে একটি উদ্বেগের ভাব থাকে, অজানিতের প্রতীক্ষায় মন শঙ্কিত ও দ্বিধাযুক্ত হয়, ও দু-তিন রকমের উদ্দীপকের চিন্তায় মন দোলায়মান থাকে। ফলে অধিকতর প্রস্তুতির ও মনোযোগের প্রয়োজন হয়, এবং প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হয়। ভুণ্ডের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে ক্যাটেল্ বলেন, উদ্দীপকের সম্যক পরিচিতি বা (apperception) অনেকক্ষেত্রেই, প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবার পরে আসে, এবং ইচ্ছা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু প্রতিক্রিয়ার পূর্ব প্রস্তুতিতে। অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়া যত অনায়াসে ও যান্ত্রিকভাবে হবে, ততই ইচ্ছাশক্তির বিলোপ হবে।

ক্যাটেল-এর পরীক্ষার ফলে প্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ তথ্য :

সহজ প্রতিক্রিয়া কালের সীমা নির্ভর করে, কিছুটা ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের প্রকৃতির ওপর, এবং কিছুটা ব্যক্তির মনোযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) ও প্রস্তুতির ওপর। যেমন, শব্দের প্রতি reaction time, আলোর প্রতি reaction time থেকে কম। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যও এই পরীক্ষাতে যথেষ্ট ধরা পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতির সময় নিয়ে ক্যাটেল্ অনেক পরীক্ষা করেছেন। 'Ready' বলার পর, ব্যক্তির প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগে ; ক্যাটেলের মতে এটা এক সেকেণ্ড ; উড্রোর মতে দু সেকেণ্ড সবচেয়ে ভাল ব্যবধান। সময় কম হলে পূর্ণ মনোযোগ দেবার পূর্বেই হয়ত উদ্দীপক এসে পড়বে, আবার সময় বেশী হলে, মনোযোগ সরে যেতে পারে, ফলে প্রতিক্রিয়াকাল বেড়ে যাবে।

অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়েছে গোলমাল সৃষ্টি করেও ব্যক্তির 'reaction time' পরিবর্তিত হয় না। মনোযোগের মূল্যই এখানে বিশেষ

প্রধান, এবং ক্লান্তি সাধারণত 'reaction time'-এর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। এটা আশ্চর্যের বিষয়, ক্যাটেল্ দেখেছেন, সারাদিন প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেও তাঁর প্রতিক্রিয়াকাল পরিবর্তিত হয় নি। সাধারণতঃ শৈশবে ও বার্ধক্যে প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হয়ে থাকে।

Associative reaction বা অনুসঙ্গ প্রণালীতে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেও ক্যাটেল্ কয়েকটি মূল্যবান তথ্যে উপনীত হয়েছেন। অনুসঙ্গ প্রণালীতে প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কতগুলি শব্দ পর পর ব্যক্তিকে দেখান হয়, ঐ শব্দ দেখে তার মনে যে কথা আসবে, তা সে লিখবে বা বলবে। এই পদ্ধতি অনির্দেশিত হতে পারে, অর্থাৎ তার মনে প্রথমেই যে ভাবের উদয় হবে, মুক্তভাবে তাই লিখবে। আবার এই পদ্ধতি নির্দেশিত (controlled) হতে পারে—যেমন একটি বিশেষ্য পদ দেওয়া হল, এবং তাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিশেষণ পদ বলতে হবে। ক্যাটেল্ দেখিয়েছেন, ব্যক্তি নিজ মাতৃভাষায় যত তাড়াতাড়ি শব্দ বা সংখ্যা মনে করতে পারে, বিদেশী ভাষায় তত পারে না। একটি বস্তুর অংশ হতে পূর্ণ মনে করা সময়-সাপেক্ষ, যেমন 'ছাদ' হতে 'বাড়ী', কিন্তু পূর্ণ বস্তু হতে অংশ মনে করা সহজ, যেমন 'পেন্সিল' হতে 'শীষ'। আবার 'বিড়াল' (species) হতে 'পশু' (genus) মনে করা যত সহজ, উল্টোটি তত নয়। শব্দ ও ভাষা নিয়ে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে ক্যাটেল্ দেখিয়েছেন, একটি বিচ্ছিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়াকাল অর্থযুক্ত একদল শব্দের প্রতিক্রিয়াকাল হতে বেশী। ক্যাটেলের এ সিদ্ধান্ত ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতির উপর বিশেষ আলোকপাত করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)—প্রতিবর্ত স্নায়ুসূত্র চাপ (Reflex arc)—

মানসিক ক্রিয়াকে অতিমাত্রায় সরল করে, উত্তেজক—প্রতিক্রিয়া সূত্রদ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া সরল ও জটিল দুইই হতে পারে। যেখানে প্রতিক্রিয়া উদ্দীপকের সামান্য পরেই দেখা দেয়, সেই তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া,—যেখানে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োজন নেই, তাকে প্রতিবর্তক্রিয়া বা reflex action বলা হয়।[৩৮] অ-খেয়ালে গরম কেৎলীতে আঙুল লাগা মাত্র

৩৮। Reflex action : The direct and immediate response of an effector (muscle or gland) or group of effectors to the stimulation of a receptor (sense-organ).

তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে নি, চোখে ধুলিকণা পড়া মাত্র চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, মাথা লক্ষ্য করে আততায়ী ঢিল ছুঁড়লে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নীচু করে আঘাত এড়াই, দেহের আপৎকালীন জরুরী প্রয়োজনে এই প্রকারের সহজ ও ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা আবর্তক্রিয়া। এ সমস্ত প্রক্রিয়া চিন্তাপ্রসূত ও চেষ্টাসাপেক্ষ নয়।

স্নায়বিক দিক হতে, এই প্রতিক্রিয়াতে একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহক স্নায়ুতন্তু (receptor) উত্তেজিত হয়, এই উত্তেজনা বা স্নায়বিক শক্তি বোধদা স্নায়ুসূত্র (sensory nerve) বয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের নির্দিষ্ট বোধকেন্দ্রে পৌঁছে; সেখান থেকে সংযোজক তন্তুর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ইহা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত নিকটবর্তী একটি কর্মকেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করে; এবং কর্মকৃৎ স্নায়ুসূত্রের (motor nerve) মধ্য দিয়ে ঘুরে এসে স্নায়ুশক্তি কেন্দ্রের নিকটস্থ এক বা একাধিক

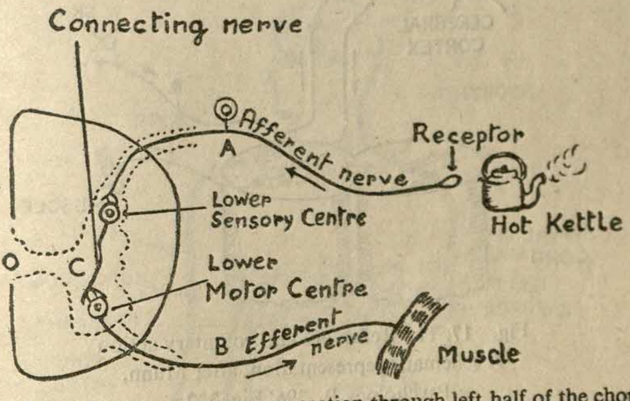

Fig. 16. A Reflex arc-transverse section through left half of the chord to illustrate reflex action after K. Walker—Human Physiology, P. 115

পেশীকে চঞ্চল করে' কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত সঞ্চালন ঘটায়। এখানে স্নায়বিক শক্তি সুষুম্নাকাণ্ড হতে উপরে উঠে মস্তিষ্কবৃন্ত, মধ্যমস্তিষ্ক বা গুরুমস্তিষ্কের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে না। এখানে স্নায়বিক শক্তির পথ অনেকটা একটি বৃত্তের চাপের আকারে, এবং যেখান হতে সুরু হয়েছে সেখানেই প্রায় প্রত্যাবর্তন করে, তাই একে স্নায়ুশিরা চাপ (**Reflex arc**) বলা হয়।[৩৯]

স্নায়ুমণ্ডলে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ স্তর আছে, যথা সুষুম্নাকাণ্ড, সুষুম্নাশীর্ষ, লঘুমস্তিষ্ক, মস্তিষ্কবৃন্ত, থ্যালামাস্, ও গুরুমস্তিষ্ক। সমস্ত স্তরেই বোধ ও কর্মের

৩০। K. Walker—Human Physiology, P. 115

স্নায়ুসূত্র ও কেন্দ্রের সংযোগ সাধন ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রতিবর্তক্রিয়ায় স্নায়ুসংযোগ সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্ন স্তরেই সীমাবদ্ধ। এই ক্রিয়া অনেকটা অন্ধ ও যান্ত্রিক (blind and mechanical)। তাই, এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয় না। সে জন্য এই প্রতিক্রিয়া দ্রুত। কিন্তু যে ক্রিয়া চিন্তা ভাবনা বিবেচনার ফলে করতে হবে, সেখানে স্নায়বিক উত্তেজনা ইন্দ্রিয় হতে সুষুম্নাকাণ্ড, লঘুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক অতিক্রম করে গুরুমস্তিষ্কের বোধকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে; সেখান থেকে সংযোগী-সূত্র গুরুমস্তিষ্কের নির্দিষ্ট চেষ্টা বা কর্মকেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করে। সেখান হতে কর্মকৃৎ স্নায়ুসূত্রের পথ বেয়ে, মধ্যমস্তিষ্ক ও

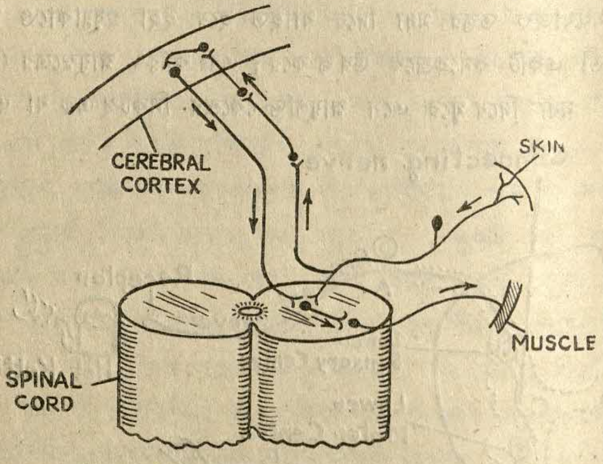

Fig. 17. The Reflex arc and voluntary action
A schematic representation, after Munn,
Psychology P. 396. Fig. 202.

সুষুম্নাকাণ্ডের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে' স্নায়ুশক্তি উপযুক্ত পেশীকে চঞ্চল করলে তবেই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জাতীয় ক্রিয়া তাই অপেক্ষাকৃত সময় সাপেক্ষ। এখানে স্নায়ুসূত্রের সংযোগ প্রতিবর্তক্রিয়ার তুলনায় অবশ্যই জটিল।

অনালী রসক্ষরা গ্রন্থি (Ductless Glands) [৪০] পেশীগুলি দেহের কর্মসম্পাদনকারী ভৃত্য। এদের কাজ প্রত্যক্ষ। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে আর

৪০। Glands : An organ in the body, the function of which is to produce a specific substance, or specific substances exercising an important influence on the bodily economy ; a very heterogeneous group, but falling into two main divisions—duct glands, and duct-less or endocrine glands.

একপ্রকার যন্ত্র আছে, যারা নীরবে চক্ষুর অন্তরালে কাজ করে। এদের একটি মাত্র মুখ খোলা। এদের ক্রিয়া ভেতরে থেকে বাইরের দিকে—valve এর বিপরীত। মধ্যমস্তিষ্কে, ঘাড়ের কাছে, এবং দেহের নানাস্থানে এ গ্রন্থিগুলি ছড়ানো আছে। এরা রক্তস্রোতে, পাকস্থলীতে বা অন্যত্র, বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষরণ করে, নানা ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে।

মস্তিষ্ক স্নায়বিক শক্তির সাহায্যে বোধ ও কর্মের সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু স্নায়বিক সংযোগ ব্যতীত, এ গ্রন্থিগুলিও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীন ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। অনালী গ্রন্থিগুলি রক্তস্রোতে শক্তিশালী যে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, তাদের হর্মোণ (hormones) বলা হয়। এই রস গ্রন্থিগুলি হতে ক্ষরিত হয়ে বিভিন্ন

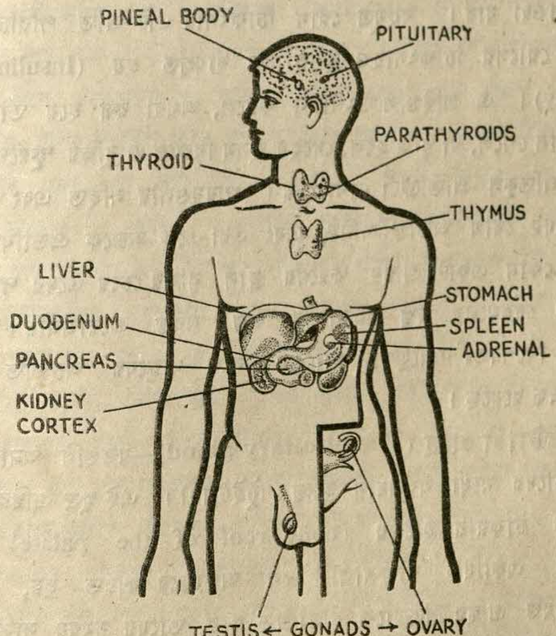

Fig. 18. The location of the different glands after Munn. Psychology, P. 90. Fig. 45. (Harrap).

আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে প্রভাবিত করে বলে, এদের রাসায়নিক সংবাদবাহক বা 'Chemical messengers' ও বলা হয়।[৪১] প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে,

৩২। Sandiford—Educational Psychology, P. 72

বেলিস্, ও ষ্টার্লিং, 'হর্মোণ' নামটি ব্যবহার করেন, যার ইংরাজী অর্থ হল, 'activiser'।[৩৩] তাঁরা আবিষ্কার করেন, যে প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থির সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু-সংযোগ ছিন্ন করলেও, খাদ্য গ্রহণের পরে এই গ্রন্থি হতে একপ্রকার জারকরস ক্ষরিত হয়। অন্ত্রমধ্যস্থ ডুয়োডেনাম্ হতে নির্গত সেক্রেটিন্ নামক রাসায়নিক পদার্থ রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়ে প্যানক্রিয়াসে পৌঁছলে, তা সক্রিয় হয়ে জারকরস ক্ষরণ করে। এই জারকরস বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হজমের সহায়ক। সুস্থ কুকুরের প্যান্‌ক্রিয়াস্ উৎপাটন করলে, তার রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। মানুষের বহুমূত্র রোগের সঙ্গে প্যান্‌ক্রিয়াসের অসুস্থ ক্রিয়ার যোগ আছে। প্যান্‌ক্রিয়াস্ হতে ক্ষরিত রস শোধন করে শক্তিশালী ইনস্যুলিন্ নামক ভেষজ পদার্থ পাওয়া যায়। বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় এটি অতি পরিচিত ঔষধ। মানসিক রোগের চিকিৎসায়ও ইনস্যুলিন ব্যবহৃত হয় (**Insulin shock theraphy**)। এ গ্রন্থিগুলি উৎপাটন করলে, অথবা রুগ্ন হয়ে তাদের ক্ষরণ অত্যন্ত হ্রাস পেলে, বা বৃদ্ধি হলে, দেহের সুসম বিকাশ ও বুদ্ধির স্ফুরণের ওপর গুরুতর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত এবং পরস্পরের মধ্যে এদের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, কোন একটি গ্রন্থির ক্ষরণের হ্রাস বৃদ্ধির চেয়ে এদের পারস্পরিক সুসামঞ্জস্য দেহমনের সুস্থ বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এদের ক্ষরণের (বিশেষতঃ এ্যাড্রেন্যাল্ গ্ল্যাণ্ডের) সঙ্গে মানুষের অনুভূতি জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

পিটুইট্যারী গ্রন্থি (The pituitary gland)—যতগুলি অনালী গ্রন্থি আছে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে পিটুইট্যারী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থির অবস্থান মধ্যমস্তিষ্কে টাকরার হাড়ের (bony roof of the palate) ওপরে। এ থেকে একাধিক শক্তিশালী রস অভ্যন্তরে ক্ষরিত হয়, এবং এ অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থির ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাদের সমন্বয় সাধন করে। এজন্য এ গ্রন্থিকে 'The Master gland' বলা হয়।[৪২] পিটুইট্যারী গ্রন্থির দুটি ভাগ, সম্মুখ ও পশ্চাৎ (anterior and posterior); এ দুটি অংশের ক্রিয়াও বিভিন্ন। এর সম্মুখভাগ শৈশবে অপসারিত হলে বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে, অস্থিসংগঠক টিস্যুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর ও মনের পরিণতিও রুদ্ধ

৪২। K. Walker—Human Psychology, P. 139

হয়, এবং ব্যক্তি 'বামন' (dwarf) হয়। আবার এর ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা যায়, এর ফলে কোন কোন কিশোর সাতফুট পর্যন্ত লম্বা (giant) হয়, এবং অকালেই এদের যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য দেখা যায়। কখনো কখনো দেহের কোন কোন প্রান্তই অসঙ্গতভাবে বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে 'Acromegaly' বলে। অথচ বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না।[৪৩] এ গ্রন্থির সম্যক্ ক্ষরণের সঙ্গে সতেজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ আছে এবং এর ক্ষরিত রস হতে প্রস্তুত ভেষজ গ্রহণ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়।[৪৪] এ উপকার সবটাই এ গ্রন্থিক্ষরিত রস হতেই কিনা সে বিষয়ে মট্রাম্ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪৫] এ গ্রন্থির সম্মুখ ভাগ হতে ক্ষরিত রস ACTH এড্রেনাল গ্রন্থির এক অংশকে (adrenal cortex) উত্তেজিত করে, তার ফলে, Cortisone নামে আর একটি শক্তিশালী ভেষজ ক্ষরত হয়। Cortisone-এর অভাব ঘটলে, যৌনাকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায় এবং শরীরে সতেজতা ও শক্তি ব্যাহত হয়। এ থেকে gonads বা যৌনগ্রন্থির উপর পিটুইট্যারীর প্রভাব বুঝতে পারা যায়। পিটুইট্যারী অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থি এবং এর সম্মুখ ভাগ এতগুলি ক্রিয়া করতে সক্ষম, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এবং সে জন্য কোন কোন দেহ-বিজ্ঞানী মনে করেন অন্যান্য গ্রন্থিকে প্রত্যক্ষভাবে এ সক্রিয় করে না,—এর প্রভাব অপ্রত্যক্ষ।[৪৬]

পিটুইট্যারীর পশ্চাদংশ ছেদন করলে, গুরুতর প্রতিকূল শারীরিক প্রভাব দেখা যায় না। তবে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়েছে, এই অংশ থেকে দুইটি বিভিন্ন রস নির্গত হয়। এর একটির ক্রিয়া পাকস্থলী এবং বিশেষ করে জরায়ুর মসৃণ পেশীর উপর। এই রস এ পেশীর সঙ্কোচসাধনের সহায়ক। এই জন্য প্রসব বেদনা বাড়িয়ে সন্তান প্রসবে সহায়তার জন্য এ রস হতে প্রস্তুত নির্যাস, প্রসূতিকে ইনজেক্সান করা হয়। অন্য রসটি প্রস্রাব বৃদ্ধির সহায়ক (diuretic) এবং স্তনদুগ্ধক্ষরা গ্রন্থির (mammary gland) উপরও এর প্রভাব আছে। পিটুইট্যারীই একমাত্র গ্রন্থি, যার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পুষ্পাক্ষের সঙ্গে মানুষের অনুভূতিজীবন জড়িত, এবং পিটুইট্যারী ও থ্যালামাস্ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

৪৩। Sandiford—Educational Psychology, P. 75
৪৪। Valentine—Psychology; P. 641
৪৫। Walker—Human Physiology, P. 142
৪৬। Mottram—The Physical Basis of Personality

থাইরয়েড গ্রন্থি (The Thyroid gland)—এটির অবস্থান গলার নীচে কণ্ঠার (Adam's apple) দুই পাশে। অনেকেরই এ নামকরণটির জন্ম এর আকারে। এর প্রকৃত কাজটি এর সঙ্গে জড়িত এবং sympathetic nervous-এর সঙ্গে এর নিয়ন্ত্রণ এ সম্পৃক্ত। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এর ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। সে সময় সুইজারল্যান্ডের দুইজন শল্যচিকিৎসক (surgeons) কয়েকটি রোগীর গলগণ্ড (goitre) চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচার দ্বারা এটি সম্পূর্ণ ছেদন করেন। ফলে তাদের থাইরয়েড গ্রন্থি সম্পূর্ণ উৎপাটিত হল। অস্ত্রোপচার সফল হল কিন্তু রোগীদের শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল (cretins), তাদের চামড়া শুষ্ক ও কুঞ্চিত (wrinkled) হল, চুলের গোছাগুলি বৃদ্ধির হ্রাস পরিলক্ষিত হল, এবং আঙুলগুলি মোটা হয়ে গেল। শুধু দেহেরই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, তাদের বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতারও অবনতি ঘটল; তারা নির্জীব, নির্বোধ, উদাসীন হল এবং তাদের কণ্ঠস্বর ভারি, গলার (guttural) হল। এ থেকে জানা গেল এর কার্যকারিতা thyroxin (formula $C_{15}H_{11}O_4NI_4$)। এর রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও আয়োডিন।[৪৮] "দেহকোষের অক্সিজেন গ্রহণ এ গ্রন্থির ক্ষরণের উপরে নির্ভরশীল। শক্তি ক্ষয়ের হারও এর নিয়ামক ক্রিয়া (regulation) বর্তমান। "এর দ্বারা শিশুদের দেহের গঠন মেধা ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে।"[৪৯] এই গ্রন্থির ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে, ব্যক্তি অতি মাত্রায় চঞ্চল, উত্তেজিত, ও মানসিক উত্তেজনাপ্রবণ হয়। মেজাজ খিটখিটে হয়। শরীরের ওজন কমে যায়। এই সব ক্ষেত্রে, থাইরয়েড গ্রন্থির কিয়দংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা ছেদন করলে উপশম হয়। মানসিক অশান্তি থাইরয়েডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, এবং আবার থাইরয়েডের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে, মানসিক উদ্বেগ বাড়ে। ক্ষরণ কম হলে বিপরীত উপসর্গ দেখা দেয়। দেহ স্থূল, চক্ষু নিষ্প্রভ, ত্বক শিথিল, রুক্ষ, হাত-পা ফোলা ফোলা, বুদ্ধি ক্ষীণ, মনোযোগ ও উদ্যমের অভাব দেখা দেয়; এ রোগের নাম Myxoedema। যে সব শিশু থাইরয়েডের উপযুক্ত ক্ষরণের অভাবে দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (cretinism), তাদের নিয়মিত ভেড়ার থাইরয়েড, খাইয়ে দিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। এবং

৪৮। Walker—Human Physiology, P. 146
৪৯। Walker—Human Physiology, P. 141

পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জীবের আপৎকালীন জরুরী অবস্থার (emergency) সম্মুখীন হওয়ার জন্যই এ গ্রন্থি মানুষের সহায়ক।

প্রবল অনুভূতি ভয় ও ক্রোধের সঙ্গে এড্রেনিন ক্ষরণের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। "এড্রেনালিন যুদ্ধ বা পলায়নের (fight or flight) জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। এ গ্রন্থি বিশেষ করে যোদ্ধা বা কাপুরুষের সহায়ক। কাজেই বিষম পরিবেশের মধ্যে জীব যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই জৈব প্রয়োজন সাধনে এ গ্রন্থির বিশেষ প্রয়োজন।"[৫০]

যৌনগ্রন্থি (Sex glands or gonads)—এই গ্রন্থি জননেন্দ্রিয়ের অঙ্গ। পুংলিঙ্গ হতে শুক্র, এবং স্ত্রীলিঙ্গ হতে ডিম্বাণু নির্গত হয়। তা ছাড়াও, এ গ্রন্থি হতে যে শক্তিশালী রস রক্তস্রোতে ক্ষরিত হয়, মানুষের দৈহিক, মানসিক বৃদ্ধি, ও সুস্থ ব্যবহারের ওপর, তা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এ গ্রন্থি হতে একাধিক হর্মোণ ক্ষরিত হয়, তার কতগুলি পুরুষের লক্ষণ ও ব্যবহার, আর কতগুলি স্ত্রীজাতির লক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু কতগুলি হর্মোণ আছে যা স্ত্রী ও পুরুষ দুইয়ের মধ্যেই বর্তমান। তাদের সংমিশ্রণে পুংলক্ষণ বৃদ্ধিকারী হর্মোণের প্রাধান্য ঘটলে, প্রাণী পুংলিঙ্গ বলে এবং স্ত্রীলক্ষণ প্রধান হলে স্ত্রীলিঙ্গ বলে পরিগণিত হয়। পুরুষের দার্ঢ্য, তেজ, এবং নারীর লজ্জা, কমনীয়তা বিভিন্ন হর্মোণের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। পুরুষদেহে স্ত্রীলক্ষণ বিকাশক্ষম হর্মোণের প্রাচুর্য ঘটলে, সে পুরুষ মুখ-চোরা, লাজুক, ও 'মেয়েলী' হয়। তেমনি স্ত্রীদেহে পুংলক্ষণ বিকাশক্ষম হর্মোণের প্রাধান্য হলে, "মদ্দা মেয়ে" সৃষ্টি হয়। দিল্লী কলেজে থাকতে একটি মেয়ে দেখেছি, যার চিবুকের কাছে রোম এত ঘন, যে রোজ তাকে দাড়ি কামাতে হয়। বাল্যকালেই এ গ্রন্থি উৎপাটিত হলে নপুংসক পুরুষ সৃষ্টি হয়; তাদের মুখে রোম গজায় না, তেজ বীর্য থাকে না। নিম্ন প্রাণীদের যৌনক্রিয়া এবং যৌনাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবেই যৌনগ্রন্থি হতে নির্গত হর্মোণের প্রভাবে ঘটে। মানুষের বেলায় হর্মোণের প্রভাব অবশ্যই আছে, কিন্তু তা তার বুদ্ধি, সামাজিক আচার দ্বারা বহুলভাবে নিয়ন্ত্রিত, আচ্ছাদিত ও শোভামণ্ডিত।

৫০। Woodworth & Marquis—Psychology, P. 128

Any emergency provoking fear or anger causes the adrenals to throw into the blood, an excess of secretion, and thus to mobilise the body for the activities that are necessary to meet the emergency, whether they be flight or fight. The surprarenals are consequently often referred to as the emergency glands of the body. Walker—Human Psychology, P. 144

নিম্ন প্রাণীদের যোনিগ্রন্থির পরিবর্তন দ্বারা বিপরীত-লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী সৃষ্টি করা কখনো সম্ভব হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে বিস্ময়কর লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটে।

এতক্ষণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির (endocrene glands or glands of internal secretion) কথা বলা হয়েছে। এবার আরো কয়েকটি গ্রন্থির উল্লেখ করা যাক, যাদের ক্ষরণ রক্তস্রোতে নয়,—তাদের ক্ষরণ বহির্মুখী। এ গ্রন্থিগুলি সনালী (ductile)। এণ্ডোক্রীন্ গ্রন্থিগুলি অনালী (ductless)। এ সনালী গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধেও বলা যায়, 'এরা কাজ করে' (effectors)। এদের মধ্যে স্বেদ গ্রন্থি (Sweat gland), লালাগ্রন্থি (Salivary gland) অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal gland) ও স্তনদুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (Mammary gland) সকলেরই পরিচিত। স্বেদগ্রন্থি ও অশ্রুগ্রন্থি শরীরের অভ্যন্তরে সঞ্চিত বিষাক্ত পদার্থ দেহ হতে নিষ্কাশন করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে (antiseptic action)। লালাগ্রন্থি খাদ্য পরিপাকের জন্য, এবং স্তন্যগ্রন্থি নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

এবার লালাগ্রন্থি সম্পর্কিত প্যাভ্‌লভের (Pavlov) কয়েকটি পরীক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

The Conditioned Reflex—Pavlov's experiments—

খাদ্য জিহ্বার সংস্পর্শে আসামাত্র লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হয়, এবং লালা ক্ষরণ হতে থাকে। এ প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটে, এবং এর জন্য কোন সচেতন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ, খাদ্যের সংস্পর্শে আসামাত্র জিহ্বা হতে লালা নিঃসৃত হয়,—এ একটি তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা আবর্তক্রিয়া (Reflex action)। কিন্তু খাদ্য জিহ্বার সংস্পর্শে আসলে যেমন লালাক্ষরণ হতে থাকে, তেমনি খাদ্যের গন্ধে, অথবা তার দৃষ্টিমাত্রও জিহ্বা সজল হয়ে ওঠে। পশুদের বেলায় দেখা যায়, যে পাত্রে পশুকে (গরু, কুকুর,) নিত্য খাদ্য দেওয়া হয়, এমন কি যে মানুষ নিত্য তাদের খাদ্য দেয়, তার দর্শনেও পশুর জিহ্বা হতে লালা গড়াতে থাকে। এ লক্ষ্য করে, রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী প্যাভলভ্ কতগুলি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন, যা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, এবং যার ফলে শিক্ষার একটি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কৃত হয়। প্যাভলভের পরীক্ষার বিবরণ নীচে দিচ্ছি। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—

(১) কতগুলি উদ্দীপকের কতগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural reflexes) তৎক্ষণাৎ সৃষ্টির শক্তি আছে। এ উদ্দীপকগুলি উপস্থিত থাকলে প্রতিক্রিয়াটি তৎক্ষণাৎ ঘটে।

(২) এ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থা (attendant condition) গুলিও সে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন খাদ্যের গন্ধ বা দর্শনও লালাক্ষরণ উদ্রেক করে।

(৩) কিন্তু সে অবস্থাটি বহুবার সে উদ্দীপকের সঙ্গে উপস্থিত থাকা চাই। যেমন, কোন একটি দ্রব্যের বিশিষ্ট গন্ধ বা রূপ, খাদ্যের সঙ্গে অনেকবার যুক্ত থাকা চাই। কলার বিশিষ্ট গন্ধ ও আকার, তার আস্বাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, সেই গন্ধ বা আকার গরুর জিহ্বাকে লালাসিক্ত করবে।

(৪) বহুবার অনবচ্ছিন্নভাবে সে অবস্থা (condition) স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে উপস্থিত থাকলে, তা পরে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ উদ্দীপক উপস্থিত না থাকলেও, তা একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন একটি গরুকে অনেকদিন ধরে পাকা কলা খেতে দিলে, পাকা কলা দেখলেই গরু এগিয়ে আসবে, এবং কলা খাবার আগেই তার জিহ্বা রসসিক্ত হবে, এমন কি, মানুষের বেলাও এ সত্য।

(৫) অবস্থাটি যদি এমন একটি কৃত্রিম অবস্থা হয়, যা উদ্দীপকের সঙ্গে স্বভাবত যুক্ত থাকে না,—তা হলেও তা উত্তেজকের সঙ্গে বহুবার যুক্ত থাকলে তা একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন খাদ্য দেবার অব্যবহিত পূর্বে, প্রতিদিনই একটি ঘণ্টা বাজানো হত। এর পর দেখা গেল, সেই ঘণ্টা বাজলেই কুকুর চঞ্চল হয়ে উঠত এবং তার জিহ্বা হতে লাল গড়াতে সুরু করত। এরই নাম দেওয়া হল—**The Conditioned Reflex**। উত্তেজক স্বাভাবিকভাবে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম, উত্তেজকের সহিত নিয়ত সংযুক্ত অবস্থা (condition), কৃত্রিম হলেও, সে একই প্রতিক্রিয়া (Reflex) সৃষ্টি করতে পারে।[৫১]

৫১। Conditioning a process by which a response comes to be elicited by a stimulus, object, or situation other than that, to which it is the natural or normal response. The term was used originally of the case where a reflex, normally following on a stimulus A, comes to be elicited by a different stimulus B, through the constant association of B with A. Pavlov made the Conditioned Reflex, the principle of explanation of many complex behaviour phenomena. Drever—A Dictionary of Psychology, P. 4

Conditioned Reflex নামটি Pavlov প্রথম ব্যবহার করেন, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াটি আবর্তক্রিয়া নয়, সুতরাং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ ক্রিয়াকে Conditioned Response বা সংক্ষেপে C. R. বলেন। স্বাভাবিক উদ্দীপককে Unconditioned Stimulus (U.S), স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে Unconditioned Response (U. R),এবং কৃত্রিম উদ্দীপককে Conditioned Stimulus (C. S). বলা হয়। এবার প্যাভ্‌লভের পরীক্ষাটির বিবরণ দেওয়া যাক।

প্যাভ্‌লভ্‌ প্রথম কয়েকটি স্বশিক্ষিত কুকুরের ওপর এ পরীক্ষা করেন (১৯০০ সাল)। কুকুরগুলিকে তাঁর গবেষণাগার, তাঁর যন্ত্রপাতি ও লোকজনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত করানো হয়। তাদের পরীক্ষার কাজে লাগানোর আগেই, পরীক্ষার পদ্ধতিটার সঙ্গে তাদের অভ্যস্ত করা হয়। এবার যেমন দোল্‌না টাঙানো হয়, সেরকম আড়াআড়ি কাঠের একটা ফ্রেমের সঙ্গে

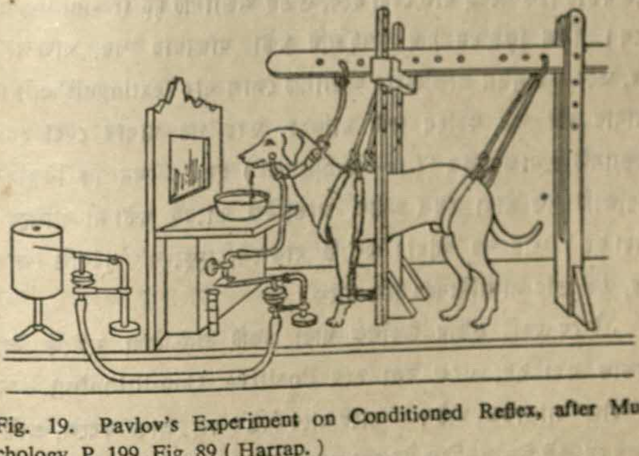

Fig. 19. Pavlov's Experiment on Conditioned Reflex, after Munn, Psychology, P. 199. Fig. 89 (Harrap.)

কুকুরটিকে চামড়ার দোয়াল দিয়ে বাঁধা হয়, যাতে কুকুরটি স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু বেশী নড়াচড়া করতে না পারে। এবার কুকুরের মুখের ফুটোর পাশ দিয়ে লাল-নিঃসারী গ্ল্যাণ্ডের নীচ পর্যন্ত সরু রবারের নল ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এ নল বেয়ে, কুকুরের জিহ্বার লালা পাশে রক্ষিত দাগকাটা একটি কাঁচের গ্লাশে গড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা হল, এমনি স্বাভাবিক অবস্থায়, এক সেকেণ্ডে কয় ফোটা লালা নিঃসৃত হয়। তার পর

দেখা হয়, কুকুরটির প্রিয় খাদ্য খেতে দিলে, এবং আনন্দে চর্বণ করতে আরম্ভ করলে, লালা নিঃসরণ প্রতি সেকেণ্ডে কত ফোঁটা বেশী বাড়ে। প্যাভ্‌লভ্‌ লক্ষ্য করলেন, কুকুর যখন চর্বণ করে, তখন তো লালা নিঃসরণের পরিমাণ বাড়েই ; এমন কি খাদ্য দেখা মাত্রও লালা নিঃসরণ সুরু হয়ে যায় ; অথবা যে প্লেটে তাকে রোজ খাদ্য দেয়া হয়, তা দেখলে, এমন কি, যে লোক নিত্য তাকে খাবার দেয়, তাকে দেখামাত্রও, লালা নিঃসরণ হতে থাকে।[৪২] ক্রমশঃ আরো বেশী কৃত্রিম উদ্দীপক (C. S.) যার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার (U. R.) আদৌ সম্পর্ক নেই, তা দিয়ে নূতন উত্তেজক-প্রতিক্রিয়া-সম্বন্ধ স্থাপনে তিনি সমর্থ হলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, যে **অনেকদিন ধরে খাদ্য দেবার ঠিক আগেই, যদি একটি ঘণ্টা বাজানো হয়, তা হলে ঘণ্টাটি বাজালেই কুকুরের লালা নিঃসরণ হতে থাকে—তার পর খাবার না দিলেও।** অবশ্য যত বেশীদিন ধরে ঘণ্টার ঠিক পরেই খাদ্য দেয়া হবে, ততই অভ্যাসটি দৃঢ় (re-inforcement) হবে। কিন্তু কিছুদিন যদি উপর্যুপরি ঘণ্টা বাজাবার পর, খাদ্য না দেয়া হয়, তবে এই নূতন প্রতিক্রিয়ার অভ্যাসটি লোপ পায় (extinguished)। কিন্তু আবার যদি অল্প কয়দিন ঘণ্টা বাজিয়ে, তার পর খাবার দেয়া হয়, তবে অভ্যাসটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত (re-established) হয়। এমন কি কিছুদিন যদি পরীক্ষাটি বন্ধ রাখা হয় (অর্থাৎ, স্বাভাবিক ভাবেই ঘণ্টা না বাজিয়ে খাদ্য দেয়া হয়) তার পর আবার ঘণ্টাটি বাজালে, কুকুরের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়, এবং তার লালানিঃসরণ হতে থাকে।

এই যে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক দ্বারা একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে প্রাণীকে অভ্যস্ত করা হয়, একে বলা হবে **Positive Conditioning.** আবার বিপরীত ব্যাপারও ঘটে। বারে বারে বিরূপ ফল লাভ করলে, প্রাণী এ-ও শেখে যে, ওই উদ্দীপকটিকে উপেক্ষা করতে হবে,—একে বলা হবে **Negative Conditioning.**

প্যাভ্‌লভ্‌ একটি কুকুরকে নিয়ে এ Negative Conditioning পরীক্ষাটি করলেন। খাদ্য দেবার ঠিক আগেই একটি গোলাকৃতি (circular) আলোর মালা জ্বলে উঠত। কিন্তু ডিম্বাকৃতি (elliptical) আলোর মালা জ্বলে ওঠার পর, কোন খাদ্য দেয়া হত না। এ রকম কিছুদিন চলার পর দেখা

৪২। **Woodworth & Marquis—Psychology, pp. 318-19**

গেল, ভিন্নাকৃতি আলোর মালা জ্বললে, কুকুরের জিহ্বা হতে কোন লালাস্রাব হয় না। কুকুরটি এখানে Negatively Conditioned হয়েছে।[৪৩] এমন কি, পরীক্ষা করে দেখা যায়, অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও রুদ্ধ করা যায়। যুদ্ধের ঘোড়াকে কামান বন্দুকের উৎকট শব্দের মধ্যেও, স্থির থাকতে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রথম প্রথম গোলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া লাফিয়ে ওঠে ও পালাতে চায়। এ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে তীক্ষ্ণ কশাঘাত করা হয়। কিছুদিন এ রকম করার পর, ঘোড়া গোলা-গুলির শব্দ হলেও, আর লাফায় না। এর সঙ্গে সঙ্গে গোলার শব্দে ঘোড়া না লাফালে, তাকে সুখাদ্য দিয়ে পুরস্কৃত (reward) করা হয়। এইভাবে তার Negative Conditioning পাকা হয়। সহজেই বোঝা যায় মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি সুফল প্রদান করে। **প্যাভ্‌লভের মতে, সমস্ত শিক্ষার ব্যাপারের মূলসূত্রই হচ্ছে Conditioning-Deconditioning।** সবুজ আলো দেখলে চলতে হবে, লাল আলো দেখলে থামতে হবে, এ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়। কিন্তু মোটর চালককে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা এই প্রকারে Conditioned হতে হয়, যাতে বিনা চিন্তা ভাবনায়ই সে লাল আলো সামনে দেখলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামায়। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, এ না করলে জরিমানা, শাস্তি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিপত্তি ঘটে। আবার উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নীচে তাকালে স্বভাবতঃ ভয় হয়, পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, কিন্তু ডাইভ্‌ শিখতে হলে (diving), অথবা প্যারাসুট বাহিনীতে ভর্তি হলে, বারে বারে অভ্যাসের দ্বারা এ ভয় ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠা যায়। শিশুর শিক্ষার অনেকখানি এ রকম কৃত্রিম উদ্দীপকের সম্মুখীন হয়ে নূতন প্রতিক্রিয়াতে অভ্যস্ত হওয়া। ক্লাশের ঘণ্টা বাজলে, ক্লাশে গিয়ে বসতে হবে, Roll-call এর সময় তার Roll. No. শিক্ষক ডাকা মাত্রই দাঁড়িয়ে উঠে, 'Present Sir' বলতে হবে, এ প্রকার Conditioning শিক্ষার অঙ্গ। আবার শিক্ষক শিশুর অনেক কুঅভ্যাস, ভুল প্রতিক্রিয়া (Wrong responses) দূর করে দেন—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, শাস্তি ইত্যাদি দ্বারা। যে শিশু অন্ধকারে ভয় পায়, তাকে ক্রমে ক্রমে এ মিথ্যা ভয় জয় করতে

৪৩। Cane & Nisenson—Giants in Science, P. 218.

শেখানও (deconditioning) শিক্ষকের কর্তব্য, এবং তা Conditioned Response-এর সূত্রের সাহায্যে সম্ভব। আমাদের বহু শিক্ষিত ক্রিয়াই কতগুলি Conditioned Responses-এর শৃংখল-সমষ্টি।[৪৪]

দেহ ও মনের সম্বন্ধ : 'Parallelism & Interactionism' মতবাদ—দেহ ও মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, এ সাধারণ মানুষও জানে। শরীর সুস্থ থাকলে মন সতেজ থাকে ; শরীর অক্ষম হলে, মনও দুর্বল হয়। আবার বিপরীত ভাবে, মন প্রফুল্ল থাকলে, শারীরিক গ্লানিকে উপেক্ষা করা যায়, আর মন উদ্বেগপ্রাপ্ত হলে, শারীরিক নিপুণতাও ক্ষুন্ন হয়।[৪৫] কিন্তু দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে, স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়ার নিকট সম্বন্ধ ক্রমশঃই আরো স্পষ্ট করে জানতে পারা যাচ্ছে। বাইরের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এসে আঘাত করে : সে উদ্দীপনা স্নায়ুসূত্র বেয়ে মস্তিষ্কের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছলে, আমাদের বোধ জন্মে, এবং মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্র হতে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে স্নায়ুসূত্র বেয়ে পেশীমূলে পৌঁছলে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্র উৎপাটিত হ'লে, অথবা স্নায়ুসূত্র ছিন্ন হ'লে, কোন ইন্দ্রিয় বা পেশী বিকল হয়। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের ফলে সংজ্ঞালোপ হয় ; মস্তিষ্কের স্নায়বিকপদার্থ রোগগ্রস্ত হ'লে, মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। গভীর মনোযোগ সহ কোন মানসিক ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকলে, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন হয় এবং স্নায়ুপদার্থের সক্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; বিভিন্ন যন্ত্র (Encephalograph) দ্বারা তা পরিমাপ করা যায়। অনুভূতির জীবনের সঙ্গে থ্যালামাস্, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিষ্টেমের এবং কোন কোন গ্রন্থির ক্ষরণের সম্বন্ধ নিশ্চিন্তভাবে জানা গিয়েছে। এ প্রকার সহস্র সহস্র উদাহরণ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী ও মানসিকক্রিয়ার সম্বন্ধ সুপ্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দেহ ও

---

৪৪ Pavlov তাই বলেছিলেন "different kind of habits based on training, education and discipline of any sort, are nothing but a long chain of Conditoned Reflexess" Pavlov–Conditioned Reflexes (Tr.G. V. Anrep) P. 395.

৪৫ "Some of such influences (of bodily conditions on mental processes) are matters of common observation : for example, the mental stimulation by drinking strong coffee, the various effects of alcohol at different stages of inebriation, the sedative influence of bromides and other sleep-inducing drugs. As to the influence of mental processes on bodily conditions,··· under hypnotic suggestion a strong pin-prick may not hurt at all ; and that ordinary waking suggestion may banish fatigue."

মনের চূড়ান্ত সম্বন্ধ কি, এ একটি মৌলিক দার্শনিকপ্রশ্ন। এ চূড়ান্ত উত্তর দিবার দায়িত্ব মনোবিজ্ঞানের নয়। তথাপি মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। এ একটি জটিল সমস্যা। কারণ, সাধারণ মানুষ মনে করে, দেহ ও মনের স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক। এবং আধুনিক যুগের গোড়াতে দার্শনিক দেকার্তেও এ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

এ সম্বন্ধে চারিটি সম্ভাব্য মত গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি পদার্থ, কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। একে বলা হয়—Inter-actionism মতবাদ।

(২) দেহ মন একই আদিম পদার্থের দুটি বিভিন্ন দিক,—তারা পাশাপাশি চলে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে না। এ মতবাদকে বলা হয়—Parallelism।

(৩) একটি মাত্র পদার্থ-এর মূলে আছে, তা হচ্ছে জড় (matter)। এবং যাকে বলা হয় মন, তা এই জড়েরই পরিণতি ও ছায়ামাত্র। এই মতকে বলা হয়—Materialism বা Epiphenomenalism।

(৪) মূল পদার্থ একটি হচ্ছে মন বা আত্মা। জড় বস্তুর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই—ইহা মায়া মাত্র। এ মতকে বলা হয়—Idealism।[৪৫]

মনোবিজ্ঞান প্রথম দুটি মত সম্পর্কেই বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত, এবং সে দুটি মতই আমরা এখানে আলোচনা করব।

পরস্পর প্রতিক্রিয়া মতবাদ (Interactionism)

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেকার্তে দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করলেও, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। জ্ঞান হতে গেলে, ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হয়। তখন মন এ উত্তেজনার কারণ নির্দেশ করে দেয়। তার ফলেই বস্তুজ্ঞান জন্মে। আবার যখন আমরা ক্রিয়া করি, তখন মন তার ইচ্ছাশক্তি পেশীগুলির ওপর প্রয়োগ করে, তার ফলে অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেহ ও মন বিভিন্ন হলেও পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে (Interaction)।[৪৬] দেকার্তের মতে দেহ মনের এই পারস্পরিক প্রভাবের কাজটি মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনীয়েল গ্রন্থির (pineal gland) মাধ্যমে ঘটে থাকে।

---

৪৬ Interactionism holds that brain-events affect mind-events, and that mind-events affect brain-events. Hocking—Types of Philosophy, P. 224

মন একটি স্বতন্ত্র শক্তি, এবং তা দেহের ক্রিয়াকে চালিত করে। ষ্টাউট, Interactionism মতবাদের এ দিকটার ওপরই জোর দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা আকাজ্ক্ষা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, স্নায়বিক শক্তিকে বিশেষ একটি দিকে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র মস্তিষ্কের অন্তর্গত জড় পদার্থের সংঘর্ষ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা, সিগারেট ধরাবার জন্য দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালানোর মত অত্যন্ত সহজ ক্রিয়ারও, সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। তবে ষ্টাউট সিদ্ধান্ত কচ্ছেন যে, জড় বস্তুর সমস্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা জড় শক্তির সাহায্যেই করা উচিত। যেখানে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেখানেই কেবলমাত্র চিৎশক্তির ক্রিয়া স্বীকার করা যেতে পারে। তাঁর মতে, মন দেহকে প্রভাবিত করে, এ মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, শক্তির সংরক্ষণ মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তা করতে হবে। এটা খুব উদ্ভট কল্পনা নয়, যে, প্রতিনিয়ত জড়শক্তি চিৎশক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে আবার পুনরায় তা জড়শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অথবা এমনও কল্পনা করা যেতে পারে যে, চিৎশক্তি জড়শক্তির রূপ-পরিবর্তন ও স্থানপরিবর্তনের ক্রিয়ার শাসন, পরিচালন ও দিক-নির্দেশ করে, কিন্তু যে শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছু ঘটায় না। কেল্‌ভিনের মত সুবিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানীও অনুরূপ মত সমর্থন করেছেন।[৪৭]

দেহ মনকে প্রভাবিত করে, এবং বিপরীতভাবে মনও দেহকে প্রভাবিত করে, বিশ্বাস করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে, এটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। দেহ ও মন-রূপ বিভিন্ন দুটি পদার্থ কি করে একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে, এটা রহস্যময়ই থেকে যাচ্ছে।

সমান্তরালবাদ (Parallelism)—উপরি উক্ত পরস্পর প্রতিক্রিয়াবাদের অসুবিধাগুলি এড়াবার জন্য স্পিনোজা (Spinoza) এ মত প্রচার করলেন যে, আদিম চরম বস্তু হচ্ছে ঈশ্বর—দেহ ও মন তাঁরই বিভিন্ন বিভাস (aspects)। দুটি সমান্তরাল রেখা যেমন পাশাপাশি চলে, কিন্তু কখনও পরস্পর মিলিত হয় না, তেমনি দেহ ও মন পাশাপাশি চলে, কিন্তু এদের সম্বন্ধ

৪৭। McDougall বলছেন, "The energy value of the output of the human body in the form of work, heat, chemical products and so forth, equals almost exacty the energy value of food and oxygen absorbed,—that is the value of the sum total of energy supplied to the body" C. W. Valentine—Psychology as applied to Education, P. 632

পরস্পর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ (Interaction) নয়। কাজেই আমরা যেখানেই মানসক্রিয়া সেখানেই তার অনুষঙ্গ হিসাবে, দৈহিক ক্রিয়া দেখতে পাই।

ষ্টাউট বলেন, যতই আমরা নিম্নতর স্নায়ুমণ্ডল হতে, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হই, ততই চেতনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুষঙ্গী স্নায়বিক ক্রিয়ার (neural processes) মধ্যে মিল পাই। সুতরাং এ প্রত্যাশা জাগে যে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের গঠন ও ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে জানলে, দেহ ও মনের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ সমান্তরলতার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ সফল হয় নি। মোটামুটিভাবে এ বলা যায় যে, স্নায়বিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলে,—যেমন, যতই উদ্দীপক তীব্র হয়, বা তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ততই সংবেদনও (Sensation) স্পষ্টতর ও তীব্রতর হয়। আবার যখন মানুষ গভীর মনোযোগে কোন বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন মস্তিষ্কের স্নায়বিক পদার্থ ও রক্তসঞ্চালন অধিকতর সক্রিয় হয়। কিন্তু যদি এই মতবাদ দাবী করে যে, স্নায়বিক এবং মানসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ সমান তালে চলে, এবং দুয়ের প্রকৃতির মধ্যে আন্তরিক মিল আছে, তবে এ মত নিশ্চিতই প্রমাণযোগ্য নয়।[৪৮] সংবেদনের স্তরেও আমরা দেখতে পাই, লাল রংয়ের বোধ এবং নীল রংয়ের বোধের মধ্যে গুণগত প্রভেদ (qualitative difference) বর্তমান, কিন্তু তাদের পশ্চাতে মস্তিষ্কে স্নায়ুপদার্থ, স্নায়ুসূত্রের সংযোগ এবং স্নায়বিক শক্তি, মূলতঃ একই প্রকারের। গভীর শোক ও নিবিড় আনন্দ, এ দুই বিপরীত মানসিক সংক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ-অশ্রুবর্ষণে। আবার সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গী মানসিক পরিবর্তন আছে কিনা সন্দেহ। এ কথাও নিশ্চয়ই বলা যায়, বাইরের দিক হতে যে উদ্দীপক দেহে সামান্য পরিবর্তন আনে, তা মানসিক দিক হতে অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আবার এ-ও দেখা যায় যে, মানুষের গভীরতম অনুভূতির কোন বাহ্য প্রকাশ নেই। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধটি নিতান্তই অভিজ্ঞতালব্ধ (brutally empirical)। তাদের মধ্যে সম্বন্ধটি এমনই এলোমেলো যে, কোন যুক্তিসঙ্গত

৪৮ If the theory is, that every difference and resemblance between psychical states and events is regularly paired off with a corresponding difference and resemblance in contemporaneous cerebral states and events : and if this be taken to mean that there is intrinsic analogy or likeness of nature between psychical fact and correlated physiological fact, Parallelism cannot be maintained for a moment, even as a suggested possibility. Stout—Manual of Psychology, P. 77

সূত্রদ্বারা এর ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, অনেকক্ষেত্রে এ দুই প্রকার ক্রিয়া একসঙ্গে চলে, কিন্তু কেন এ সমান্তরলতা তার কোন ব্যাখ্যা সমান্তরলতাবাদীরা দিতে পারেন না। মস্তিকের ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও এত অসম্পূর্ণ যে, মানসিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গী কি স্নায়বিক পরিবর্তন ঘটে, তা মনোবিজ্ঞানী সর্বক্ষেত্রে সঠিক ও নির্ভুলভাবে বলতে পারেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে এই অনুষঙ্গ সম্বন্ধ সর্ব্বক্ষেত্রেই ঘটে, এ কল্পনা করা অন্যায় নয়।[৪৯]

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে এ দুই মতবাদের কোনটাই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। জড়জগতের বস্তুদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, দেহ ও মনের সম্পর্ক ঠিক সেই প্রকার হতে পারে না। এবং দুটি বিপরীত বস্তু কি করে এ প্রকার পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত হতে পারে, তা নিতান্তই রহস্যজনক। আবার সমান্তরালবাদেও দেহ ও মনের সম্বন্ধ কম রহস্যময় থাকছে না। আর সমস্তক্ষেত্রে সমান্তরলতা প্রমাণিতও হচ্ছে না। বাস্তবিকপক্ষে সমস্যাটির সমাধান মনোবিজ্ঞানের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এর সমাধান দেহ ও মনের প্রকৃতি এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের চূড়ান্ত স্বরূপ নির্ণয় দ্বারা দার্শনিকই কেবল মাত্র করতে পারেন।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও পরিবর্তনের জ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে নিশ্চয়ই সহায়ক, কিন্তু এ-ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানসিক ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে দৈহিক বা স্নায়বিক পরিবর্তন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মানসিক ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে, তা উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত (teleological)।[৪৮] পরস্পর -প্রতিক্রিয়া মতবাদ বা সমান্তরলতাবাদ যেটিই আমরা গ্রহণ করি না কেন, মানসিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখীনতা স্বীকার করতেই হবে।

---

৪৯ Our ignorance of what takes place in the brain is immense, so that after all, it may not be impossible that some parallel in the neural connections may exist corresponding to such association of ideas. But this appeal to ignorance is the only course open to the Parallelist, Stout—Manual of Psychology, P. 82

সপ্তম অধ্যায়

সংবেদন ও ইন্দ্রিয়াদি

বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের ক্রিয়া (Different sense-organs : their structure and function)—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমরা বাইরের জগতের ও দেহের অভ্যন্তরের পরিবর্তনের সংবাদ পাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সুপরিচিত। এ ছাড়া দেহাভ্যন্তরস্থ আরো কিছু ইন্দ্রিয়ও বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গঠন বিভিন্ন, তাহাদের ক্রিয়াও বিভিন্ন, এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধের দ্বার। জ্ঞানের উৎস হিসাবে চক্ষু সর্বশ্রেষ্ঠ, এর গঠনও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। গুরুত্বের দিক থেকে, তার পরেই কর্ণ ও ত্বকের স্থান। নাসিকা ও জিহ্বা জ্ঞানদা ইন্দ্রিয় হিসেবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সুখ দুঃখ অনুভূতি ও জীবনের পোষক ইন্দ্রিয় হিসেবে এরা উপেক্ষণীয় নয়।

চক্ষু (The Eye)—মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে দুইটি চক্ষু জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ণ ও আকার সম্বন্ধে বোধ জাগায়। বর্ণ-বোধের উদ্দীপক হচ্ছে, বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (electro-magnetic waves)। এ তরঙ্গগুলির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের উপরে, বিভিন্ন বর্ণের বোধ নির্ভর করে। কিন্তু হ্রস্বতম ও দীর্ঘতম বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলি অক্ষিপটে কোন উত্তেজনা জাগায় না। সবচেয়ে ছোট যে বৈদ্যুৎ-চৌম্বক ঢেউগুলি, সেগুলিকে আমরা চোখে দেখি না, এবং তারা মানুষের দেহের মত অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করে যেতে পারে। এই সব-চেয়ে-হ্রস্ব তরঙ্গগুলির নাম—Ultra-violet rays, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বেগ্‌নীপারের আলো'। যে হ্রস্বতম বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আমাদের চোখে বর্ণবোধ জাগায়, তাহা হচ্ছে বেগুনী রং। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০০ মিলিমাইক্রন্। দীর্ঘতম যে বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ চোখে বর্ণবোধ জাগায়, তা হচ্ছে লাল রং। এই রংয়ের উদ্দীপক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৭০০ মিলিমাইক্রন্। এ হতে দীর্ঘতর তরঙ্গ, কোন বর্ণের বোধ জাগায় না। এই দীর্ঘতর আলোর নাম Infra-red, বা 'লাল-উজানী আলো'।

বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা যে রংগুলি চোখে দেখি, —তারা হচ্ছে লাল, হলুদ, সবুজ নীলাভসবুজ, নীল ও বেগুনি। সূর্যের আলো পরকলার (prism) মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হলে, এ তথ্য আমরা

জানতে পারি। রংয়ের এই বিভাগকে **'chromatic series'** বলা হয়, আর ধবধবে সাদা ও কুচকুচে কালো এবং মধ্যবর্তী সমস্ত ধূসরের শ্রেণীকে বলা হয় **'achromatic series'**।[১] লাল, হলুদ, সবুজ, নীল এগুলি হল রং বা hue, আর সাদা-কালো-ধূসর এরা আলো বা **light**। সমস্ত রং বা বর্ণের একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণ দ্বারা আমরা পাই, সাদা আলো। আর কালো হচ্ছে, সমস্ত বর্ণ বা রংয়ের অভাব।

বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলির যেমন দৈর্ঘ্য আছে, তেমন আছে তাদের উচ্চতা। এ উচ্চতা নির্ধারণ করে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য—brightness। **সাদা-কালো ধূসরকে একটি রেখায় আমরা উপর দিক হতে নীচে, বেশী-কম হিসেবে সাজাতে পারি আর রংগুলিকে রামধনুর বর্ণালী অনুযায়ী— Violet, Indigo, Blue, Green (3 shades), Yellow এবং Red,— এইভাবে Vibgyor) সাজানো যায়।** এবং **Violet** রং এবং **Red** রং, এই দুইয়ের মিশ্রণে Purple রংকে বসিয়ে দুইটি মাথা একত্র করে গোল বা ডিম্বাকারে বর্ণগুলিকে সাজানো যায়। এবং সাদা-ধূসর-কালোর রেখায় অনুপাতে রং বা **hue** গুলিকেও ঔজ্জ্বল্য অনুসারে সাজানো যায়। আর একটি কথা, প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গেই কিছু না কিছু আলোর (light) মিশ্রণ ঘটে। যে রংয়ে এই মিশ্রণ সব চেয়ে কম ঘটে, তা তত বেশী বিশুদ্ধ বা **saturated**। যে লাল রং সব চেয়ে লাল (saturated), তাতে সাদা-ধূসর আলোর মিশ্রণ সব চেয়ে কম। কাজেই স্মরণ রাখতে হবে, বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণের ভিন্নতা (hue), তরঙ্গের উচ্চতা বা তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ঔজ্জ্বল্য (brilliance), আর তরঙ্গগুলির মিশ্রণের উপর নির্ভর করে বর্ণের বিশুদ্ধতা (saturation)।[২]

প্রত্যেক বস্তুই তার আণবিক প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী, তার ওপর আলো পড়লে আলোর কিছু উপাদান শুষে নেয়,—আলোর বাকী যে উপাদান সে ফিরিয়ে দেয় অর্থাৎ প্রতিফলিত করে, তাকেই আমরা বলি বস্তুর রং।[৩]

---

১ Stout এদের neutral tints বলেছেন—the neutral tints are white, black and intermediate greys.

২ The stimuli for vision are light-waves, differing in wavelength, in mixture, and in intensity. Visual sensations differ correspondingly in hue, in saturation, and in brilliance. Woodworth & Marquis—Psychology. P427

৩ ..The different hues are due to the different wave-lengths of the transmitted or reflected light. Drever.—Dictionary of Psycholory. P. 42

সাদা বস্তু, আলো হতে কোন উপাদানই গ্রহণ করে না। সে বৈরাগী, তার অযাচক বৃত্তি; সে হাত পেতে কিছুই গ্রহণ করে না, সে সবটা আলোই প্রতিফলিত করে। আর কালো হল কৃপণ ও লোভী, সে সবটুকু উপাদানই আলো হতে চুরি করে, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। অন্য সমস্ত রংয়ের বস্তুই, কিছু রাখে, কিছু ফিরিয়ে দেয়।

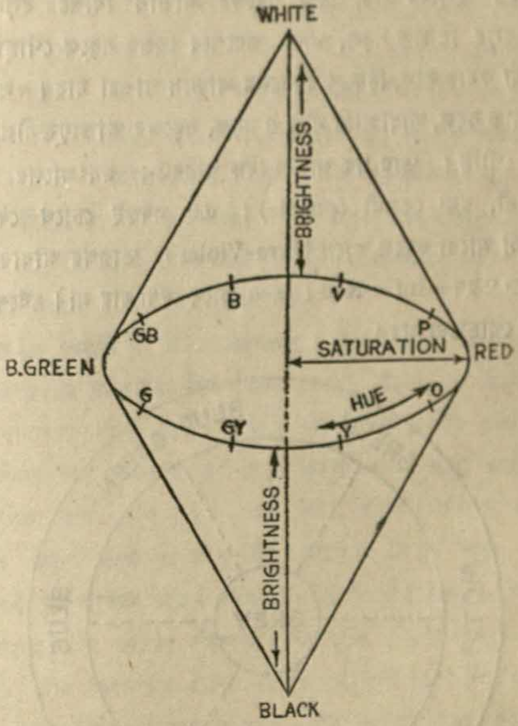

Fig. 20. A Colour Solid—the relation between hue, brightness, and saturation is shown by conceiving of the range of colours, as varying in a tridimensional solid, around the white-black axis. Mid-grey is represented as in the exact centre. The most saturated hues, at any brightness level between white and black are represented as on the outside of the solid. Hues decrease in saturation as the white-black axis is approched. Fig. 169. Munn—Psychology, P., 342

রংয়ের মিশ্রণের নিয়ম,—বিপরীত বর্ণঃ (Laws of colour mixture-Complimentary colours) ঃ—সমস্ত বর্ণগুলিকে বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা লাল-হলুদ-সবুজ-নীল এ চারটি প্রধান রংয়ে

সাজাতে পারি। যদি তাদের অন্তর্বতী সমস্ত রংগুলি মাঝে মাঝে সাজানো হয়, তবে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত বা ডিম্বাকৃতি আকার পাওয়া যাবে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গ যা লালরংয়ের সংবেদন জাগায়, সেখান থেকে সুরু করে, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমলে ক্রমে হলুদমিশ্রিত লাল, কমলা, লালমিশ্রিত হলুদ হতে শেষে বিশুদ্ধ হলুদ রংয়ে পৌঁছি। সেখান হতে দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে আর একটি দিক্ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হলুদের পর, কিছু সবুজের আভাস বিশিষ্ট হলুদ, বাসন্তী রং, ঈষৎ হলুদ মিশ্রিত সবুজ, এবং অবশেষে বিশুদ্ধ সবুজে পৌঁছানো যায়। আবার দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে, দিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সবুজের পর সামান্য নীলাভ সবুজ, আধাআধি নীল ও সবুজ, সবুজের আভাযুক্তনীল, অবশেষে নীলে গিয়ে পৌঁছি। তার পর আবার দিক পরিবর্তন—ঈষৎলালের আভাযুক্ত নীল, বেগুনী, রক্ত বেগুনী (purple)। এই পর্যন্তই চোখে দেখা যায়। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আরো কমলে আসে Ultra-Violet। তারপর আবার সব চেয়ে বড় দৈর্ঘ্যযুক্ত তরঙ্গ—Infra-Red। এ-ও চোখে দেখা যায় না। সর্বশেষ আবার লালে গিয়ে পৌঁছানো যায়।

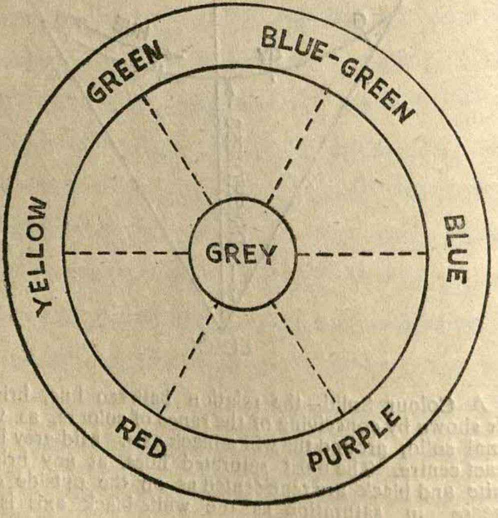

Fig. 21. The Colour Circle. Complementary colours as diametrically opposed to each other.
Fig. 104. Woodworth & Marquis Psychology P. 442.

সূর্যের সাদা আলো—রামধনুর সাত রংয়ের মিশ্রণ, যার প্রমাণ মিলে, সূর্যের আলো কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করলে। সুতরাং সমস্ত প্রধান

রং মিশ্রিত করলে পাওয়া যায়, সাদা বা ধূসর। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর কোন বর্ণের বোধ নির্ভর করে, এ কথা সত্য হলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। দুটি পাশাপাশি প্রধান বর্ণের (লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল) উপযুক্ত মিশ্রণে মধ্যবর্তী একটি রং পাওয়া যায়। যেমন কমলা রংয়ের বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৬৫০ মিলিমাইক্রন্। কিন্তু এই রং, লাল (৭০০ মিলিকাইক্রন্) ও হলুদ (৬০০ মিলিমাইক্রন্) মিশ্রিত করে পাওয়া যায়। তেমন বিশুদ্ধ হলুদ ও বিশুদ্ধ সবুজ, সমপরিমাণে মিশ্রণে পাওয়া যায় বাসন্তী রং। আবার নীল ও লালের মিশ্রণে পাওয়া যায় বেগুনী। বর্ণের যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে, তাতে **ঠিক বিপরীত দুটি রং মিশ্রণ করলে পাওয়া যায় ধূসর,—এরা পরস্পর পরস্পরকে নাকচ** করে দেয়। এই বিপরীত রংয়ের জোড়াকে **Complementary colours** বলা হয়। বিশুদ্ধ লাল ও বিশুদ্ধ নীল এবং বিশুদ্ধ হলুদ ও বিশুদ্ধ সবুজ বিপরীত হলেও, উডওয়ার্থ এদের **disappearing colour pairs** বলেছেন, কারণ এদের মিশ্রণে দুটি রং-ই অন্তর্ধান করে।[৪]

প্রধান রং কয়টি ? Elementary, Primary and Salient hues—এই প্রশ্নের উত্তর তিন দিক থেকে দেওয়া যায়—(১) মনোবিজ্ঞানের দিক হতে বা বোধের দিক হতে,—লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত রংই পৃথক ও বিশিষ্ট। কমলা রংএর মধ্যে আমরা লাল ও হলুদকে পৃথক করে দেখি না। তবে এটা স্বীকার করতে হয়, বর্ণের মধ্যে লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল এবং আলোর মধ্যে সাদা ও কালো সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে (salient)। (২) পদার্থবিদ্যার দিক হতে,—বিভিন্ন আলো এবং তাদের মিশ্রণের ফল হতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে লাল, হলুদ, নীল উৎপাদক বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মিশ্রণে সমস্ত বর্ণ (hues) এবং সাদা, কালোও পাওয়া যেতে পারে। এমন কি হলুদ রংও লাল ও সবুজের উপযুক্ত মিশ্রণে পাওয়া যায়।[৫] সুতরাং লাল, সবুজ এবং নীলাভ বেগুনী

৪। Woodworth & Marquis—Psychology, P. 443

৫। একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রংয়ের মিশ্রণের বেলায় রঙীন আলো যুগপৎ অক্ষিপটে অথবা সাদাপর্দায় ফেলে দেখতে হবে—ছবি আঁকিবার রং মিলিয়ে নয়। ছবি আঁকবার রং, হলুদ ও নীল মিশালে সবুজ রং পাওয়া যায়, এটা স্কুলের ছেলেরাও জানে—কিন্তু এই দুই রংয়ের আলো মেশালে, সাদা বা ধূসর পাই। "The mixture of paints is decidedly not adding lights, for each paint absorbs or subtracts part of the light and the effect of the double subtraction is very different from adding blue and yellow" Woodworth & Marquis, P. 443.

এই তিনটি প্রধান বর্ণ, এ হলো **ইয়ং-হেলমহোলৎজ** (Young-Helmholtz) মতবাদের ভিত্তি। (৩) অক্ষিপটের (Retina) গঠনে বিভিন্ন স্নায়ুপদার্থ অনুযায়ীও বিভিন্ন বর্ণ ও আলোর উৎপত্তি ও মিশ্রণের ফলাফল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। ইয়ং-হেলমহোলৎজ্ মতবাদ অনুসারে অক্ষিপট তিন প্রকারের আলো দ্বারা উত্তেজনক্ষম রাসায়নিক-স্নায়বিক পদার্থ (Photo-chemical substances) দ্বারা গঠিত; এদের মধ্যে একদল লাল, অন্যদল সবুজ ও অন্যদল নীলাভ বেগুনী (Blue-violet) আলোর প্রতি সব চেয়ে বেশী সাড়া দেয়। এই দলগুলি দুই বা ততোধিক একসঙ্গে উত্তেজিত হলে, মিশ্র বর্ণের বোধ জন্মে।

হেরিং (Hering)—ইনি চারটি মৌলবর্ণ, Red Green, Blue, Yellow এবং White-Black আলোর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এদের উৎপত্তির মূলে আছে তিন প্রকার বিভিন্ন স্নায়ুপদার্থ। এরা প্রত্যেকটিই আবার জোড়া-জোড়া বিপরীত-ধর্মী (catabolic & anabolic)। প্রথম-জোড়া হল White-Black বোধের কারণ, দ্বিতীয় জোড়া Blue-Yellow বোধের উৎপত্তিস্থল, এবং তৃতীয় হচ্ছে Red-Green বোধের উদ্বোধক। হেলমহোলৎজের মতে কালো বোধের কারণ হল, উদ্দীপকের অভাব,—এটা নেতিবাচক। কিন্তু হেরিং-এর মতে কালো একটি সদর্থক বোধ—ইহা White-Black স্নায়ুপদার্থের উত্তেজনার ফল।[৬]

ল্যাড্-ফ্রাংকলিন্ (Ladd-Franklin) মতবাদ—এ মতবাদ পূর্বের দুই মতবাদের সমন্বয় করে', পূর্বের মতবাদগুলির ত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করে। এ মত অনুযায়ী, অক্ষিপটের সংগঠক একই স্নায়ুপদার্থের ক্রমবিকাশের ফলে ঘটেছে বিভিন্ন বর্ণবোধ। এরা তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর নয়। গঠনের প্রাথমিক অবস্থায়, স্নায়ুপদার্থ সাদা-কালো বোধ জন্মায়। এই পদার্থের গঠনাত্মক ক্রিয়া (catabolic function) প্রাধান্য লাভ করলে সাদা, এবং ধ্বংসাত্মকক্রিয়া (anabolic function) প্রাধান্য লাভ করলে, কালোর বোধ জন্মে,—এ হোল চোখের প্রাথমিক বর্ণবোধ। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে, এ স্নায়ুপদার্থ হলুদ-নীল বর্ণবোধ জাগায়। এখানেও স্নায়ুপদার্থ বিপরীতধর্মী। ক্রমপরিণতির ধারায় সর্বশেষ দেখা দেয়,—লাল-সবুজ বোধ জাগাতে সমর্থ, বিপরীত-ধর্মী, সবচেয়ে উন্নত অক্ষিপট সংগঠক স্নায়ুপদার্থ। এই ক্রম বিকাশের ধারা ভ্রূণ-বিকাশ বিজ্ঞানের

৬। Drever—Dictionary of Psychology, P. 117

(embryology) সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত, এবং পরিণত মানুষের অক্ষিপটে এ তিনটির এককেন্দ্রীয় স্থান বিভাগ (concentric areas in the retina), এ মতের পরিপোষক।[৭] এ মত (এবং হেরিং এর মতও) অল্প কটি মাত্র মৌল বর্ণ বা স্নায়ুপদার্থের উত্তেজনা দ্বারাই আমাদের অসংখ্য বর্ণবোধ সুব্যাখ্যা করতে সক্ষম। বিপরীত বর্ণ, এবং তাদের মিশ্রণে কেন উভয় বর্ণই অন্তর্ধান করে, কেন মিশ্রবর্ণ বোধ জন্মে, এ সমস্ত কথাও আমরা বুঝতে পারি. এবং এ মতবাদ দ্বারা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করতে পারা যায়। তবে বর্ণান্ধতা (Colour-blindness) আলোচনা কালে আমরা দেখব

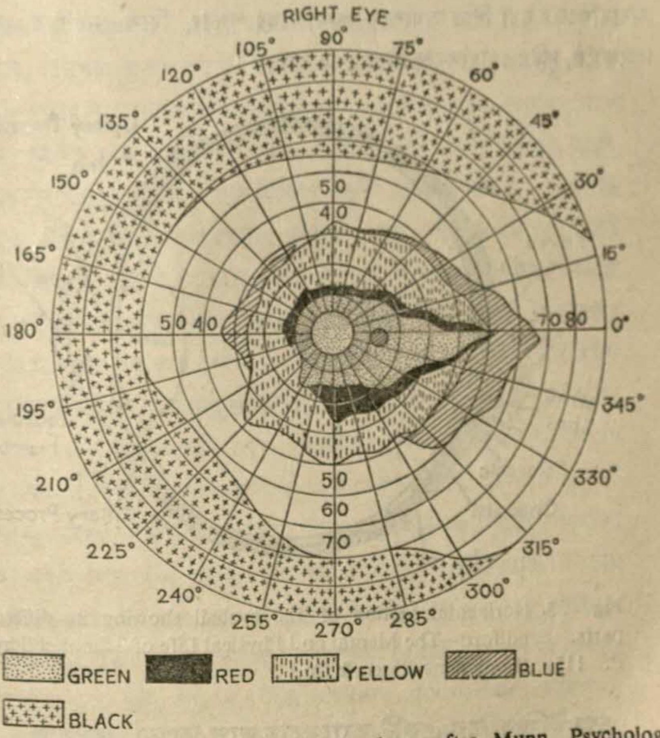

Fig. 22. Concentric areas in the retina, after Munn. Psychology, P. 336. Plate 5. Harrap.

যে, যদিও এই মতানুযায়ী, যারা লাল রং দেখতে পায় না তারা সবুজ রংও দেখে না ; যারা হলুদ রং দেখে না, তারা নীলও দেখেনা,—তথাপি এটা সবক্ষেত্রে সত্য বলে দেখা যায় না।

৭। Munn—Psychology, P. 345.

চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন (Structure of the eye)—চক্ষু-ইন্দ্রিয় দু'টি গোলক, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে অস্থিকোঠরে সুরক্ষিত, এবং কয়েকটি পেশী দ্বারা বদ্ধ। এ পেশীগুলির সাহায্যে চক্ষু দুটিকে উপরে-নীচে বা পাশা-পাশি সঞ্চালন করা যায়। অক্ষিগোলকের সামান্য অংশই সম্মুখ হতে দেখা যায়। অক্ষিগোলকের নিরাপদ অভ্যন্তরে যে বক্র তল (curved surface) সব চেয়ে বেশী সুগ্রাহী (sensitive), তাতেই বাইরের জিনিষের ছবি ফোটে। চক্ষুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত স্নায়ুসূত্র (optic nerve) অসংখ্য স্নায়ুতন্তুতে বিভক্ত হয়ে, এই তলের সূক্ষ্ম স্নায়বিক উপাদান গঠন করেছে। অন্যদিকে স্নায়ুসূত্র মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে অবশেষে গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত parietal প্রকোষ্ঠে, দৃষ্টির বোধকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে।

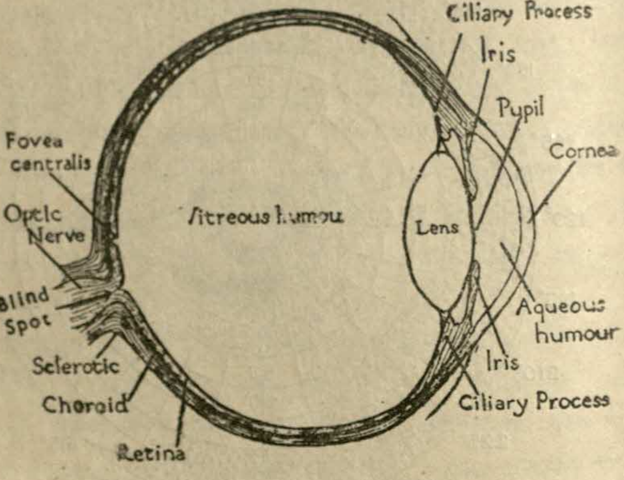

Fig. 23. Horizontal section of the eyeball showing its different parts. Sandiford—The Mental and Physical Life of School children, P. 113. (Longmans Green & Co.)

চক্ষু ইন্দ্রিয়টিকে একটি ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা যায়। অথবা এ কথা বোধ হয় আরো সত্য যে চক্ষুর অনুকরণেই মানুষ ক্যামেরা তৈরী করেছে। অক্ষিগোলক হচ্ছে, ক্যামেরার দৃঢ় বাক্সটি। একেবারে অভ্যন্তরে অবস্থিত সুগ্রাহী বক্রতল যেখানে ছবি ফোটে,—যার নাম **অক্ষিপট** (Retina) তা হচ্ছে ক্যামেরার sensitised plate বা film। অক্ষিগোলক সকলের চেয়ে

বাইরে যে দৃঢ় আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত, তার নাম **sclerotic**। এ শ্বেত আবরণের কিছু অংশই আমরা চক্ষুর সম্মুখভাগ হতে দেখতে পাই। এই শ্বেত আবরণের একেবারের সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ স্ফিত হয়ে স্বচ্ছ একটি লেন্সে (lens) পরিণত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আলো চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করে। এর নাম **অচ্ছোদপটল** (cornea)। এ হচ্ছে ক্যামেরার বাইরের লেন্স। আবরণের (schlera) ঠিক নীচেই আছে, আর একটি কালো আবরন, যা বাইরের তীব্র আলো অনেকটাই শুষে নেয়, এর নাম **choroid**। এ হচ্ছে ক্যামেরার ভিতরের কালো লাইনিং। তার নীচেই যে অন্তর্বতীতল তাই অক্ষিপট (**retina**)। এবার চোখের সম্মুখ ভাগ হতে আলোর গতি অনুসরণ করে, চোখের ভিতরে প্রবেশ করলে, আমরা একটি স্বচ্ছ জলপূর্ণ থলির সাক্ষাৎ পাই—তার নাম **aqueous humour**। এ তরল পদার্থ চক্ষুকে পোষণ করে, স্নিগ্ধ রাখে। এর পিছনেই আমরা পাই নীল বা বাদামী রঙের, সঙ্কোচন-প্রসারণ-শীল, মধ্যস্থলে ছিদ্র-বিশিষ্ট একটি গোল পর্দা। এ পর্দাটি, আলো অতি তীক্ষ্ণ হলে, আপনা থেকে প্রসারিত হয়, ফলে মধ্যস্থলের ছিদ্রটি ছোট হয়ে ভিতরে আলো প্রবেশে বাধা দেয়। আবার অন্ধকারে পর্দাটি আপনা হতেই গুটিয়ে যায়, এবং মধ্যের ফটোটি বড় হলে যথাসম্ভব বেশী আলো প্রবেশের পথ করে দেয়। এ পদার্থটিকে বলে **কনীনিকা (Iris)** এবং মধ্যস্থলের ছিদ্রটিকে বলে **চক্ষুতারকা** (**pupil**)। অন্ধকারে বেড়ালের বা ছোট শিশুর চোখের তারাটি বেশ অনেকটা বড় দেখায়। ক্যামেরায় ইহার অনুরূপ ব্যবস্থার নাম **aperture**। চক্ষুতারকার ঠিক পশ্চাতেই থাকে অসমান, ডিমের মত দুই দিকেই উত্তল, নমনীয় ও কিঞ্চিৎ সঙ্কোচন প্রসারণশীল একটি লেন্স (**double convex lens**)। ক্যামেরার ভিতরের লেন্সের ন্যায়, এরও কাজ হচ্ছে বাইরের আলো বা ছবিকে কেন্দ্রীভূত করে (focussing), ভিতরে সুগ্রাহী পর্দায়, সুস্পষ্ট রেখায়, ফুটিয়ে তোলা। চক্ষুর লেন্সের সঙ্গে দুই পার্শ্বের পেশীর (**ciliary processes**) সাহায্যে, লেন্সটিকে বেশী উত্তল (more convex), বা কম উত্তল করা যায়, যাতে আলো বা দ্রব্যের দূরত্ব অনুযায়ী ছবিটিকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়। দ্রষ্টব্য বস্তু কাছে থাকলে, পেশীগুলি লেন্সটিকে প্রয়াস দ্বারা সঙ্কুচিত করে, ফলে তা অধিকতর উত্তল (more convex) হয়। আর দ্রব্যটি দূরে থাকলে, লেন্সটি প্রসারিত হয়ে কম উত্তল (less convex) হয়। ক্যামেরাতে

ভিতরের লেন্সটিকে যান্ত্রিকভাবে সামনে পিছনে এনে, এই কাজটি করা হয়। লেন্সের পশ্চাতে অক্ষিগোলকের বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে আর একটি অস্বচ্ছ রসভাণ্ড (vitreous humour)। চোখ দিয়ে আমরা ঘনত্বের যে বোধ (sensation of solidity) পাই, তার একটি কারণ, এই জলপূর্ণ স্থান। ক্যামেরার ভিতরেও, এই কারণে, কিছু খালি জায়গার ব্যবস্থা। চোখের ভিতরের এই জলভাণ্ড চক্ষুগোলকের আকার স্থির রাখে, অভ্যন্তরের স্নায়বিক তন্তুগুলির পোষণ করে, তাদের স্নিগ্ধ রাখে। গ্লকোমা (Glaucoma) রোগ হলে, এই জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে, ভিতরের অক্ষিপটের স্পর্শকাতর স্নায়ুপদার্থের উপর চাপ দিতে থাকে। এই চাপ বেশী বাড়লে চক্ষু অন্ধ হতে পারে, তাই শলাকা সাহায্যে অচ্ছোদপটল ভেদ করে, এই জল নিষ্কাশন করতে হয়। এই রসভাণ্ডের পশ্চাতেই চক্ষুর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতি-উদ্দীপক (highly sensitive) স্নায়ুপদার্থের বক্র তল, যার নাম অক্ষিপট (retina)। এই তলের মধ্যস্থলে পীতবর্ণের একটি সামান্য নীচু (depression) স্থান, সেখানেই সবচেয়ে পরিষ্কার ছবি ফোটে (centre of clear vision) এবং সমস্ত রকম আলো এবং রংয়ের বোধ জাগে। এই স্থানটির নাম পীতবিন্দু (**yellow spot or fovea centralis**)। অচ্ছোদপটলের মধ্য দিয়ে এসে অক্ষিপটের এই স্থানেই আঘাত করে।[৮]

অক্ষিপটও কতগুলি স্তরে গঠিত। অক্ষিপটের যে তলে আলো এসে আঘাত করে, তা প্রায় স্বচ্ছ। তার মধ্যদিয়ে আলো গিয়ে রঙীন স্নায়ুতন্তুর স্তরে (**Pigment layer**) প্রতিহত হয়। এর ফলে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এবং তারা এই স্তরের সহিত সংযুক্ত, **Rods** ও **Cones** নামক স্নায়ুতন্তুগুলি অগ্রভাগকে উত্তেজিত করে। সে উত্তেজনা চোখের ভিতরে আলোর বিপরীত দিকে উর্দ্ধপানে প্রবাহিত হয়ে, দ্বিমুখী কতগুলি স্নায়ুকোষ গুচ্ছে (bipolar ganglionic cells) উত্তেজনা সংক্রামিত করে দেয়। এই স্নায়ুকোষগুচ্ছের প্রান্তেই এসে দৃষ্টিবোধক স্নায়ুসূত্রের (optic nerve) প্রান্তস্থিত সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়। অবশেষে সেই স্নায়ুসূত্র বয়ে উত্তেজনা মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে, গুরুমস্তিষ্কের occipital lobe-এ দৃষ্টির বোধকেন্দ্রে পৌঁছে।

এই বিভিন্ন স্তরের স্নায়ুকোষগুলির মধ্যে rods এবং cones সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এ rod cells গুলিই সাদাকালো বোধের (achromatic

৮। **Woodworth & Marquis—Psychology, P. 434**

vision) জন্য দায়ী। তাদের সংখ্যা দশলক্ষেরও একশত গুণ! পীতবিন্দু এবং ঠিক তার কাছাকাছি কোন rod cells নেই। অক্ষিপটের অন্যান্য অংশে এরা ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারে এই rodদের সাহায্যেই আমরা দেখি। conesগুলি বর্ণবোধের (chromatic vision) জন্য দায়ী। পীতবিন্দু—যেখানে সমস্ত রং আমরা স্পষ্ট দেখি—সম্পূর্ণভাবে cones দিয়ে তৈরী। এ

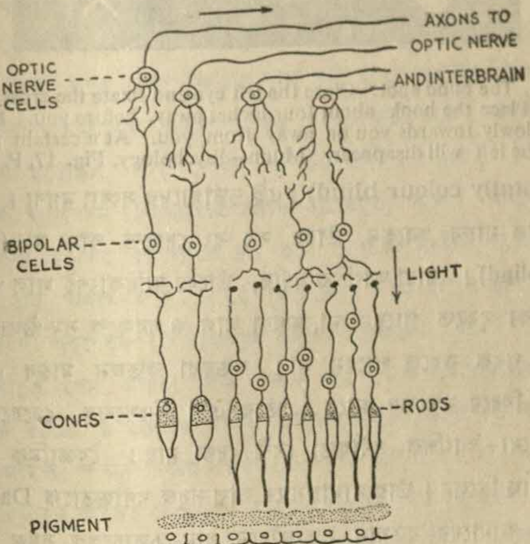

Fig. 24. Layers of the retina : The light reaching the retina passes through the nearly transparent retina, till stopped and absorbed by the pigment layer and producing chemical changes which stimulate the tips of the rods and cones. The rods and cones then pass the impulse along to the bipolar cells and these in turn to the optic nerve cells. The axons of these cells carry the impulse through the interbrain, ultimately to the occipital lobe in the cerebrum. Woodworth & Marquis—Psychology. P. 435

স্নায়ুতন্তুগুলি কতকটা ত্রিকোণাকৃতি, এবং উজ্জ্বল আলোর মধ্যেই এরা সক্রিয়। কিন্তু অন্ধকারে এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই, অন্ধকারে সমস্ত রংকেই আমরা কালো দেখি।[৯] অক্ষিপটে পীতবিন্দুর পাশেই একটি স্থান, সেখানে দর্শনের কোন বোধ জাগে না—না আলোর, না বর্ণের, না রূপের। এ স্থানেই Optic nerve অক্ষিপট ভেদ করে প্রবেশ করেছে। এ বিন্দুটির নাম **Blind spot**। আমরা প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষার দ্বারা, আমাদের চোখের মধ্যে এ বিন্দুটির অবস্থান প্রমাণ করতে পারি।

৯। Munn—Psychology, Pp. 348-49

বর্ণান্ধতা (Colour blindness)—কিছু পরিমাণ লোক আছেন, যাঁরা কোন রংই দেখতে পান না। এদের দৃষ্টিশক্তিতে দোষ না থাকলেও এরা জগতের সমস্ত বস্তুকেই শুধুমাত্র সাদা-কালো আলোযুক্ত দেখেন। এরা সম্পূর্ণ

Fig. 25. The blind spot. Close the left eye and fixate the cross with your right eye. Place the book about four inches away, before you. Now move the book slowly towards you or away from you. At a certain point, the circle to the left will disappear. Munn—Psychology, Fig. 17, P. 346

বর্ণান্ধ (totally colour blind)। এই দুর্ভাগ্যদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন, তাঁরা সব রং দেখতে পান না (partially colour blind)। যাঁরা আংশিক বর্ণান্ধ, তাঁদের অধিকাংশই লাল ও সবুজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না, অথবা লাল ও সবুজকে সম-ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট ধূসর থেকে পৃথক করতে পারেন না। শতকরা কতজন মানুষ এ প্রকার বর্ণান্ধ, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে এটা নিঃসন্দেহ, মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে আংশিক বর্ণান্ধতা বেশী দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক Dalton আংশিক বর্ণান্ধ ছিলেন। তাঁর নামানুসারে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতাকে Daltonism বলা হয়। আমাদের বর্তমান সভ্যজীবনে যান চলাচলের সমস্ত আলোই প্রায় লাল ও সবুজ; তাই যান চালকদের বর্ণান্ধতা গুরুতর দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সেজন্য, এটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রচলিত। তাদের মধ্যে Ishihara colour test বা Nagel cards tests সমধিক প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে Munn—Psychology বইয়ে ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর ৪নং এবং ৫নং প্লেট দুটি চিত্তাকর্ষক। অথবা Woodworth & Marquis প্রণীত Psychology ৪০১ পৃষ্ঠার সঙ্গে ৫নং প্লেটটি দেখা যেতে পারে।

হলুদ-নীল বর্ণান্ধতা খুবই বিরল। পূর্বেই বলা হয়েছে অক্ষিপট তিনটি এককেন্দ্রিক স্থানে (concentric zones) বিভক্ত। সকলের বাইরের স্থানটি, শুধু সাদা-কালো বোধ উদ্দীপক rod স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত। মধ্যবর্তী স্থানটি, হলুদ-নীলের বোধ জাগায়, এখানে rod ও cone স্নায়ুতন্তু মেশামিশি করে আছে। সবচেয়ে মধ্যবর্তী সংকীর্ণতম ক্ষেত্রটি, শুধুই লাল-সবুজের বোধ জাগায়। এ অংশ শুধুই cones দ্বারা গঠিত। Perimeter যন্ত্রদ্বারা

বিভিন্ন ব্যক্তির অক্ষিপটে এই স্থানগুলির অবস্থান ও বিস্তৃতি নির্ধারণ করা যায়। এ সম্বন্ধেও Munn-এর বইয়ের ৫নং প্লেটটি দ্রষ্টব্য। বর্ণান্ধতা না ঘটলেও কারও কারও চোখে কোন কোন বর্ণের বোধ সম্বন্ধে কিছু দুর্বলতা (colour weakness) দেখা যায়।[১০]

অনুবেদন: সবর্ণ ও অসবর্ণ (After-image Positive and Negative)—অনেকক্ষণ কোন জিনিষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর, সেই দ্রব্য হতে চোখ ফিরিয়ে সাদা পর্দা বা দেওয়ালের দিকে তাকালে, সেই বস্তুটির ছবিটি অল্প কিছুক্ষণের জন্য সেখানে ফুটে ওঠে। যে জিনিসটিকে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার যে রং, ছবিটিও সেই রংয়েরই দেখা যায়। একে সবর্ণ অনুবেদন (**Positive After-image**) বলে। কখনো কখনো দেয়ালে দেখা ছবিটির রং পরিবর্তিত হয়ে দেখা জিনিষটির রংয়ের বিপরীত রং দেখা যায়, অর্থাৎ লাল রংয়ের জিনিষের, সবুজ রংয়ের ছবি দেখা যায়। একে অসবর্ণ অনুবেদন (**Negative After-image**) বলে। এর কারণ, কোন দ্রব্যকে যখন আমরা দেখি, তখন তা থেকে প্রতিফলিত আলো, অক্ষিপটের rods ও cones নামক স্নায়ুতন্তুগুলিকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা-জনিত স্পন্দন, দৃষ্টির সম্মুখ হতে দ্রব্যটি অপসারিত হলেও, কিছুক্ষণের জন্য চলতে থাকে, কাজেই যে ছবিটি আমরা দেখি, তা বাস্তবিক সেই সংবেদনটিরই (sensation) জের। সেজন্য বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা একে After-image না বলে **After-senation** বলেন। অক্ষিপটের স্নায়ুপদার্থ তিনটি জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত বর্ণ বা আলোর অনুভূতি জাগায়। Catabolic প্রক্রিয়া যতক্ষণ চলতে থাকে ততক্ষণ দেখা যায় লাল বা হলুদ বা সাদা। আর Anabolic প্রক্রিয়া সুরু হলে, সে জিনিষেরই ছবি দেখি, বিপরীত রং-এ—সবুজ, নীল বা কালো।

যদি কোন জিনিষের দিকে অল্পক্ষণ মাত্র তাকিয়ে চোখ সাদা দেয়ালের দিকে ফেরান হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সবর্ণ অনুবেদন হয়, কিন্তু বেশীক্ষণ জিনিষটির দিকে তাকিয়ে, সাদা দেয়ালে চক্ষু ফেরালে বিপরীত রং দেখা যায় অর্থাৎ অসবর্ণ অনুবেদন হয়।[১১]

---

১০ Colour weakness—Defective Colour Vision, without colour blindness affecting one or more colours. Drever—Dictionary of Psychology, P. 43

১১ If, after looking steadfastly at a white patch on a black background, the eye be turned to a white background, a grey patch is seen for some little time. When a red patch is looked at, and the eye subsequently

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হওয়া (Dark adaptation)—হঠাৎ আলো হতে অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকলে, আমরা কিছুই দেখতে পাই না। কিছুক্ষণ পরে, ঘরের জিনিষগুলিকে দেখতে পাই, যদিও অবশ্য তাহাদের রং বুঝতে পারি না; সবই কালো বলে মনে হয়। অন্ধকার চোখ সয়ে যাওয়া, এই অবস্থাকে **dark adaptation** বলে। conesগুলি অন্ধকারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। শুধুমাত্র rodsগুলিই সম্ভবতঃ ক্রিয়া করে।[১২] চোখ অন্ধকারে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হতে সময় নেয় আধঘণ্টা, কিন্তু তার পরে অক্ষিপটের rodsগুলির ক্ষীণ আলো দেখবার ক্ষমতা দশলক্ষ গুণ বর্ধিত হয়। অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন হয়। দিনের আলোতে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল রং হল হলুদ, কিন্তু অন্ধকারে সবুজ-মিশ্রিত-হলুদ রংয়ের জিনিষগুলিই বেশী উজ্জ্বল (bright) মনে হয়; ঘোর লাল ও ঘোর (dark) রক্তবেগুনী (purple) বেশী ঘোর মনে হয়। যে বিজ্ঞানী প্রথম এটা পরীক্ষা দ্বারা লক্ষ্য করেন, তাঁর নাম অনুসারে একে Purkinje Phenomenon বলা হয়। যারা সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, তাদের বেলাও ইহা সত্য। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধরা তীক্ষ্ণ আলো সহ্য করতে পারে না।

বর্ণের বৈপরীত্য বা বিরোধ (Visual contrast)—কোন উজ্জ্বল রংয়ের দ্রব্যের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে, সেই রংয়েরই কম উজ্জ্বল অন্য দ্রব্যের দিকে তাকালে কিছুটা নিষ্প্রভ (dark) মনে হয়। আবার নিষ্প্রভ রংয়ের কোন দ্রব্যের দিকে তাকিয়ে তার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল সেই রংয়ের দ্রব্যকে অধিকতর উজ্জ্বল (brighter) মনে হয়। কোন রংয়ের তলের (coloured surface) বিপরীত রংয়ের তলের দিকে তাকালে, পূর্বের রংটি বেশী ঘন (saturated) বোধ হয়। এ জন্য তীব্র আলোতে কয়লা আরো মলিন দেখায়। কালো মেয়েদের উজ্জ্বল রংয়ের পোষাকে আরো কালো দেখায়! বাস্তবিক পক্ষে, চিত্রশিল্পীদের এবং ফ্যাসানকামীদের রংয়ের মিশ্রণ ও রংয়ের বৈপরীত্যের নিয়মগুলি না জানলে চলে না। কোন রংয়ের শাড়ীর সঙ্গে, কোন রংয়ের জুতো match করে, তা সুবেশা মেয়েদের জানতেই হয়। সিনেমা হলে, রাত্রে কৃত্রিম আলোয় যে পাউডার মানায়, দিনের বেলায় রৌদ্রের আলোয় সে পাউডার দৃষ্টিকটু বোধ হতে পারে, এ জ্ঞান না থাকলে, বন্ধুমহলে মান হারাইবার সম্ভাবনা আছে।[১৩]

---

turned to neutral ground, the negative image is greenish-blue, the colour of the negative image is complementary to that of the object...When the primary stimulation is very transient, it may give rise in the first instance to a positive after-image. Stout—Manual of Psychology, Pp, 280-81

১২ Drever—Dictionary of Psychology, P. 59

১৩ Stout—Manual of psychology, P. 275.

যুগপৎ বৈপরীত্য (Simultaneous contrast)—এ দর্শনেন্দ্রিয়েরই বিশেষত্ব। ত্বুটি সমান ধূসর রংয়ের কাগজের একটিকে কালো পটভূমিকায় এবং আর একটিকে সাদা পটভূমিকায় রাখলে, কালো পটভূমিকায় রাখা ধূসর কাগজের টুকরোটিকে অধিকতর উজ্জল দেখায়। রঙীন পটভূমিকায় ধূসর একটি ফোটা দিলে, তাতে বিপরীত রঙের আভা দেখা যায়। ত্বুটি পাশাপাশি রং পরস্পরের ওপর বিপরীত রংয়ের ছায়া ফেলে, যদিও অনেক সময়ই আমরা এটা লক্ষ্য করি না। পদার্থ বিজ্ঞানের দিক হতে কালো হল অভাবাত্মক, আলোর অনুপস্থিতি ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক হতে এটা একটা অস্তিত্ব-সূচক অনুভূতি। তাই সাহিত্যিক সত্যই বলেন, 'অন্ধকারের রূপ আছে' ; বৈষ্ণব কবিরা বলেন, 'কালো রূপে ভুবন মজে'।

এক চোখে দেখা ও ত্বুই চোখে দেখা : ঘনত্বের বোধ (Monocular and Binocular vision : Stereoscopic effect)—চক্ষুগোলক ত্বুটি। ত্বুটিতেই একই দ্রব্যের প্রায় একই ছায়া পড়ে (ডান চোখে বস্তুটির ডান দিকটা একটু বেশী এবং বাম চোখে বাঁদিকটা একটু বেশী দেখা যায়)। তথাপি আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়া-জোড়া দেখি না। কেন এ হয়, তা একটি রহস্য। অবশ্য ত্বু' চোখেরই স্নায়ুসূত্র পরস্পরের সাথে জড়িত হয়ে ভাগাভাগি হয়ে যায় এবং বোধকেন্দ্রে ত্বুটি স্নায়ুসূত্র Occipital lobe-এর ত্বুই অর্ধাংশ অনুরূপ একই স্থানে পৌঁছে। ডান দিকের দৃষ্টি বস্তু ত্বুটি চোখেরই অক্ষিপটের ডান অংশে ছায়া ফেলে। এবং ত্বুটি চোখের পিছন হতে Optical nerve-এর বাম অংশ Occipital lobe-এর বাম অংশে গিয়ে শেষ হয়। ত্বুটি Occipital lobe ও অসংখ্য স্নায়ুসূত্র দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তথাপি ত্বু চোখের ত্বুটি ছবি মিলে কি করে এক হয় তা বৈজ্ঞানিকরা ঠিক জানেন না। (পূর্বের ছবি দেখ)

তবে এটা জানা যায়, যে ত্বুই চোখের ত্বুটি ছবি (যা ত্বুটি অক্ষিপটে যুগপৎ প্রতিফলিত হয়) একত্র মিলে ঘনত্ব বোধ (perception of solidity) সৃষ্টি করে। একে Stereoscopic vision বলে। তবে এটা সম্পূর্ণ দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাপার নয়। ঘনত্ববোধ জন্মাতে হলে দর্শনের সঙ্গে স্পর্শানুভূতিরও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। (পরে 'ঘন বস্তুর প্রত্যক্ষণ' আলোচনা দেখ)

জিনিসগুলিকে সোজা দেখি কেন? (Erect vision in spite of inverted images)—পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, চোখের

লেন্সের মধ্য দিয়ে বস্তুর যে ছবি প্রতিফলিত হয়, তা উল্টা (inverted), অর্থাৎ উপরকে নীচ এবং ডানকে বাম—এ রকমই ছবি অক্ষিপটে দেখা যায়। অথচ আমরা জিনিষগুলিকে সোজা দেখি কেন? এ আর এক রহস্য। তবে, এ সম্বন্ধেও নিশ্চিত করেই বলা যায়, এ জন্য স্পর্শানুভূতি এবং পেশী সঞ্চালন-জনিত বোধের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে ষ্ট্র্যাটন (Stratton) একটি চমৎকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি এমন একটি চশমা তৈরী করলেন, যা চোখে পরলে, সমস্ত জিনিসকে ১৮০° কোণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত করে, অর্থাৎ ডানকে বাম, এবং উপরকে নীচ করে দেখা যাবে। তা হলে অক্ষিপটে সমস্ত জিনিষের ছায়া সোজাই পড়বে। এ চশমা তিনি অনবরত পরে রইলেন। প্রথম কদিন খুবই ভুল হতে লাগল। ডাইনের দরজা খুঁজতে বাঁদিকে,—নীচের জিনিষ তুলতে ওপরে হাত বাড়াতে লাগলেন। অনেক বার মাথা ঠুকে গেল, হোঁচট খেলেন। কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে, জিনিষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তিনি এই পরিবর্তিত জগতের দিক নির্ণয়ে সপ্তাহকাল পর অভ্যস্ত হলেন। তখন আর বেশী ভুল হত না। যখনই ভুল হত, তখনই তা সংশোধিত হত, স্পর্শ বা হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা। এতেই উপর-নীচে বোধের পূর্ব অভ্যাস সম্পূর্ণ দূর হল। এবার তিনি চশমা ছেড়ে ফেললেন। আবার পরিচিত পুরাতন জগতে ফিরে যেন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন; কিন্তু মাঝে মাঝেই দিগভ্রম হতে লাগল। যা হোক, দু' একঘণ্টা পরেই পুরাতন আয়ত্ত অভ্যাস ফিরে এল, তিনি স্বাভাবিক হলেন। এ হতেই বোঝা যায় যে, জিনিষগুলি যে আমরা সোজা দেখি তা বহুল পরিমাণেই দৃষ্টি ও স্পর্শ এবং অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে সামঞ্জস্যের ফল।[১৪]

শ্রবণেন্দ্রিয় (The ear)—চোখের পরেই, গুরুত্ব হিসাবে কানের স্থান। শব্দগ্রহণ ছাড়াও, এ দূরত্ব নিরূপণ ও দিকনির্ণয়েরও সহায়ক। দেহের সাম্য বোধ (sense of equilibrium)-এর ব্যাপারেও এর কিছু দায়িত্ব আছে।

আমরা যে শব্দ বা স্বর শুনি তার উদ্দীপক (stimulus) হচ্ছে বায়ুতরঙ্গ। এই তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। যে তরঙ্গগুলি অত্যন্ত হ্রস্ব, তারা যেমন শ্রবণ-অনুভূতি জাগায় না, তেমনি যে তরঙ্গগুলি অতি দীর্ঘ, তাও কানে শোনা যায় না। যে ঢেউগুলি লম্বা, সেগুলি সেকেণ্ডে কম বার স্পন্দিত হয়, আর ছোট ঢেউগুলি স্পন্দিত হয়, অনেক বেশী বার। সেকেণ্ডে ২০ বার স্পন্দিত ঢেউ, সব চেয়ে গভীর স্বরের (deepest audible

---

১৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 451

tones) সংবেদন জাগায়। এর নীচে যে ঢেউয়ের স্পন্দন, তা আমরা শুনতে পাই না। সব চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বর, যা আমরা কানে শুনতে পাই, তার উত্তেজক ঢেউ, সেকেণ্ডে ২০,০০০ বার স্পন্দিত হয়। তরঙ্গের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা অনুযায়ী স্বরের গুণের যে পরিবর্তন, তাকে ইংরাজীতে বলে pitch। সা রে গা মা পা ধা নি ইত্যাদি হল, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হিসাবে pitch-এর বিভিন্নতা। এরা এবং পরের উপরের পর্দার 'স' নিয়ে এক একটি Octave। নীচু Octave-এর সাত স্বরে তরঙ্গের যে দৈর্ঘ্য, উপরের পর্দায় (Octave) সেই সেই স্বরের তরঙ্গের স্পন্দনের গতি, তার দ্বিগুণ। সাধারণ ভালো হারমোনিয়মে সাড়ে তিন অক্টেভের বেশী থাকে না। ভাল অর্গানে অনেক বেশী অক্টেভ্ থাকে। মানুষের কণ্ঠের স্বরযন্ত্র, ভাল অর্গানের নীচু পর্দার বা উচু পর্দার স্বর উৎপাদন করতে পারে না। ইংরাজীতে নীচু পর্দার গভীর স্বরকে বলে Bass আর উচু পর্দার তীক্ষ্ণ স্বরকে বলে Soprano। কানেও খুব উচু বা নীচু পর্দার তরঙ্গ, কোন অনুভূতি জাগাতে পারে না। অবশ্য, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ বিষয়ে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। কুড়ি বৎসরের পর, উচু পর্দার স্বর শুনবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পায়। কুকুরের কান, মানুষের কানের চেয়ে উচু ও নীচু পর্দার স্বর শুনতে পায়।

তরঙ্গের যেমন দৈর্ঘ্য আছে, তেমনি আছে উচ্চতা। এ পরিমাণ বা volume নির্দেশ করে। যে তরঙ্গ উচ্চতায় যত বেশী, সে তত জোরালো স্বর (loud tones) উৎপাদন করে। অবশ্য তরঙ্গের স্পন্দনের হার, এবং তার উচ্চতা, পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের শব্দ-তরঙ্গ (সেকেণ্ডে ৫০০ হতে ৫০০০ স্পন্দন) যে স্বর উৎপাদন করে, তাই আমরা সব চেয়ে স্পষ্ট শুনতে পাই, কিন্তু উচু বা নীচু পর্দার স্বর, আমরা তেমন সুস্পষ্ট শুনি না। কাজেই কোন স্বর জোরালো, তা শুধু তরঙ্গের পরিমাণ বা amplitude-এর উপর নির্ভর করে না, স্পন্দনের দ্রুততার হারের উপরও নির্ভর করে। Loudness মাপবার একক (unit)-এর নাম decibels।[১৫]

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের মিশ্রণের ফলে, তার আকারেরও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন অনুযায়ী, বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন বিশিষ্টতা লাভ করে। একে

১৫ The rustle of leaves has a loudness of one bel or ten dicibels. Its energy is 10 times that required to make a 1000 cycle tone barely audible. . Heavy street traffic in a city like New York has an energy level 10^8 or 100,000,000 times that required to make a 1000-cycle tone just barely audible. It is thus eight bels or eighty db, louder than household loudness. Munn—Psychology, P. 366

ইংরাজীতে বলে timbre। একই পর্দার, একটি সমান জোরালো 'সা' সেতার, হারমোনিয়ম, তবলা, বা গীটারে পৃথক শোনাবে। বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠ-স্বরেও এ প্রভেদ লক্ষণীয়; তার কারণ, বিভিন্ন যন্ত্র বা স্বরনালী বিভিন্ন দৈর্ঘের বায়ুতরঙ্গের বিভিন্ন মিশ্রণ দ্বারা বিভিন্ন আকারের (composition) তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তাই এ প্রভেদ।

বিভিন্ন বায়ু তরঙ্গ যখন একত্র মিশ্রিত হয়ে কর্ণপটেই আঘাত করে; তখন তা কখনও সুখকর, কখন অস্বস্তিকর হয়। যখন বিভিন্ন তরঙ্গের ওঠা-নামা ও দৈর্ঘ্যের মধ্যে নিয়মিততা থাকে, এবং তা সুখকর সঙ্গতি বা harmony সৃষ্টি করে, তখন তাকে আমরা সুর বা সঙ্গীত (musical sounds) বলি। কিন্তু, যখন মিশ্রিত তরঙ্গ গুলির উত্থান-পতনে নিয়মিততার অভাব যা বিরক্তি-কর,সে কর্কশ ধ্বনি-বিরোধকে discord বলা হয়। এ হচ্ছে গোলমাল (noise)। বিভিন্ন তরঙ্গের স্পন্দনের হারের নিয়মিততা যেমন সুখকর অনুভূতি উদ্রেক করে, তেমন, তা অভ্যাসের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কাজেই, পাঞ্জাবীদের কাছে যা মধুর সঙ্গীত, বাঙ্গালীর কাছে তা হয়তো কর্ণপীড়াদায়ক নির্বোধ গোলযোগ। সমস্ত মিশ্রিত বায়ুতরঙ্গের সমষ্টিই একত্র হয়ে কর্ণপটহে আঘাত করে, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে, সে মিশ্রণের মধ্যে মূলস্বর (fundamental tone) এবং উপস্বর (overtone) পৃথক করা যায়। এমন কি বাদ্যযন্ত্রে শব্দিত একটি অ-মিশ্র স্বরের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলস্বর ও উপস্বরের মিশ্রণ থাকে। উপযুক্ত যন্ত্র (analyser) দ্বারা তাহাদের পৃথক করা সম্ভব। বিভিন্ন যন্ত্রে একই স্বর (tone) ধ্বনিত হলেও, তাদের মধ্যে যে প্রভেদ বোধ হয়, তার কারণ বিভিন্ন যন্ত্রে উৎপন্ন উপস্বরগুলি বিভিন্ন।

এবার কর্ণের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। কর্ণের তিনটি প্রধান অংশ বহিঃ কর্ণ (External ear), মধ্য কর্ণ (Middle ear) এবং অন্তঃ কর্ণ (Internal ear)। কানের নমনীয় চর্মময় যে অংশটি বাইরে থেকে দেখা যায়, তা বহিঃকর্ণের সবচেয়ে বাহিরের অংশ, নাম Concha বা pinna। তার মধ্যস্থলে যে ফুটাটি কানের ভেতরে চলে গেছে তার নাম External auditory meatus। এ পথে বায়ুতরঙ্গ কর্ণপথে প্রবেশ করে। এই ছিদ্রপথের শেষে আছে পাৎলা চামড়ার একটি আবরণ ঝিল্লী, যাকে বলা হয়, কর্ণপটহ (Ear drum বা Tympanic membrane)। বাইরে থেকে বায়ুতরঙ্গ এ পটহকে স্পন্দিত করে। পটহের চারিদিকেই অস্থিপ্রাচীর দ্বারা

সুরক্ষিত। কর্ণপটহ হতেই মধ্যকর্ণ (Middle ear) সুরু। পটহের ঠিক পশ্চাতেই সংলগ্ন তিনটি পরস্পর সংবদ্ধ হাড়ের মালা। প্রথমটির আকার

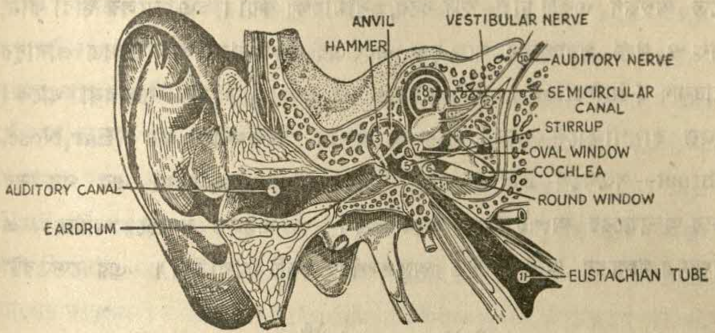

Fig. 26 Cross section of the ear, after Munn—Psychology?

কতকটা হাতুড়ির মত, তাই নাম hammer,, তার পরেরটি নেহাইর মত, নাম সেজন্য anvil ; আর সকলের অভ্যন্তরেরটি ঘোড়ার পিঠে চড়িবার পাদানের আকৃতি, তাই নাম তার stirrup। এই পাদানের শেষ অংশটি ডিম্বাকৃতি, এবং তা হাড়ের দেওয়ালের গায়ে অনুরূপ আকারের একটি ছিদ্রের (ovalforamen) মুখে আঁটিয়া বসে। তার ঠিক নীচেই আর একটি ঝিল্লী আবৃত গোলাকার ছিদ্র (round foramen)। বায়ুতরঙ্গ পটহে যে স্পন্দন সৃষ্টি করে, তা হাড়ের মালা বয়ে এবং কেন্দ্রীভূত (concentrated) হয়ে ডিম্বাকৃতি ছিদ্র

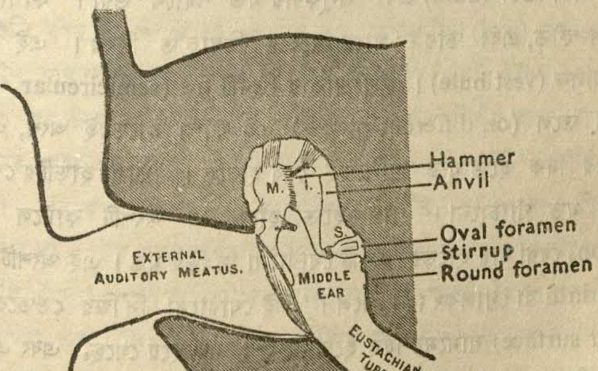

Fig. 27. Semicircular canals and labyrinth. Lickley—The nervous System, P. 104. Fig. 8. (Longmans Green & Co.)

পথের ঝিল্লীকে স্পন্দিত করে। এ পর্যন্ত মধ্যকর্ণের সীমা। কানের এই অংশেই গলা হতে একটি নল এসে যুক্ত হয়, এর নাম Eustachian tube।

এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য আছে; কর্ণপটহের উপর বাহির হতে বায়ুর যে চাপ পড়ে, ভিতরের দিক হতে নাক ও মুখ দ্বারা গৃহীত বায়ুদ্বারা ভিতর হতে অনুরূপ একটি চাপ সৃষ্টি করে, সাম্যরক্ষা করা। এ নলের দ্বারা কান, নাক ও গলা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এবং এর কোনো একটি ক্ষেত্রে জীবাণুর আক্রমণ (infection) হলে' অন্যত্রও তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য হাসপাতালে কান, নাক ও গলার চিকিৎসার জন্য (Ear, Nose, Throat—সংক্ষেপে ENT) একই বিভাগ (department)। এর পর সব চেয়ে অভ্যন্তরের অংশই হচ্ছে অন্তঃ কর্ণ। এর গঠনও সবচেয়ে জটিল। এ মস্তিষ্কের গহ্বরের অভ্যন্তরস্থিত অদ্ভুতদর্শন একটি ফাঁপা নল। এর ভেতরটা

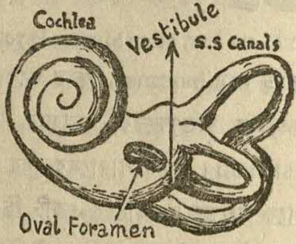

Fig. 28. Labyrinth showing the oval foramen, the bony cochlea and the semicircular canals. walker. Human Physiology, P. 133. Penguin,

তরল পদার্থভরা (fluid) এবং বালুকণার মত পদার্থে ভরা। ফাঁপা নলটির মধ্যস্থল স্ফীত, এবং তারই গায়ে রয়েছে ডিম্বাকৃতি বিবর। এই অংশটির নাম অলিন্দ (vestibule)। অর্ধচন্দ্রাকার তিনটি নল (semicircular canals) বিভিন্ন তলে (on different planes) এই ফাঁপা হাড়েরই অংশ, এবং এরা সামনের দিক হতে ঘুরে অলিন্দেই শেষ হয়েছে। ফাঁপা হাড়টির পেছনদিক শঙ্খের মত প্যাঁচানো। পাশ হতে হাড়ের এ অংশটি কাটলে (cross section) দেখা যায় হাড়ের একটি ঘোরানো সিঁড়ির মত। এই অংশটিকে তাই labyrinth বা গোলকধাঁধা বলে। এই ঘোরানো সিঁড়ির ভেতরের তল (inner surface) সামনের দিক হতে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, এবং এ তলটি নরম ফিতার মত স্নায়বিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। একে বলে basilar membrane। শব্দ গ্রহণকারী স্নায়ুগুলি শব্দের গ্রাহক (receptor)। Basilar membrane, সরু মোটা অসংখ্য তারের মত স্নায়ুতন্তু fibres) দ্বারা গঠিত। সামনের অংশে basilar membrane-এর ফিতাটি অনেকটা মোটা,

ক্রমশঃ ভিতরে পাৎলা হয়ে গেছে। সামনের অংশের তারের মত তন্তুগুলিও কিছুটা মোটা ও ঢিলা (slack)। ভিতরের দিকের তন্তুগুলি ক্রমশঃ সরু ও আঁট। গ্রাহক স্নায়ুকোষগুলি হতে সরু চুলের মত পদার্থ উঁচু হয়ে আছে। অন্তঃকর্ণের ভিতরের তরল পদার্থ ও বালুকণা সেই চুলগুলিকে আন্দোলিত করলে, স্নায়ুতন্তুগুলি উত্তেজিত হয়। সে উত্তেজনা মস্তিষ্কের বোধ কেন্দ্রে পৌঁছলে, শ্রবণরূপ সংবেদন জন্মে। অন্তঃকর্ণে, basilar membrane-এর উপরে যে অংশ হতে সূক্ষ্ম চুলের মত জন্মায়, তার নাম Organ of Corti। Basilar membrane এ চাঞ্চল্য Organ of Corti-র চুলগুলিকে অবনত করে (bend), এবং এই চুলগুলির ঠিক নীচেই শব্দ গ্রহণকারী স্নায়ুসূত্রের প্রান্তের স্নায়ুগুচ্ছ। অন্তঃকর্ণের basilar membrane-এর উপরে যে তারগুলি চঞ্চল হয়ে, কতগুলি চুলকে আন্দোলিত করে, তারাই বিভিন্ন প্রকার শব্দ শুনবার কারণ, এরকম অনুমান করা হয়।[১৬]

শব্দ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of hearing)— উপরের যে মত উল্লিখিত হল, তা Helmholtz দ্বারা প্রচারিত। তাঁর মতে basilar membrane-এর উপর সূত্রগুলি পিয়ানোর তারের মত সরু, মোটা, হ্রস্ব, মধ্যম, দীর্ঘ। এ বিভিন্ন অংশের সূত্রগুলি উত্তেজিত হলে, বিভিন্ন প্রকারের স্বর আমরা শুনতে পাই। বায়ুতরঙ্গ যখন অন্তঃকর্ণে (basilar membrane) অনেকটা জায়গায় বিস্তার করে, তখন আমরা উচ্চ শব্দ (loud sound) শুনি, যখন কম জায়গাকে আক্রান্ত করে, তখন নীচু (low) শব্দ শুনি।

বর্তমানে, বায়ুতরঙ্গগুলি সেকেণ্ডে কতবার স্পন্দিত হয় (frequency), তার সহিত স্বর গ্রহণের সম্বন্ধ আছে, এ কথাটির উপর নির্ভর করে কয়েকটি নূতন মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন যে, কানটি টেলিফোন যন্ত্রের মত। বহিঃকর্ণে প্রবেশকারী বায়ুতরঙ্গ যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার স্পন্দিত হয়, তবে অন্তঃকর্ণের পশ্চাতে স্নায়ুসূত্রগুলি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার বৈদ্যুৎ-বেগ (impulse) মস্তিকের বোধকেন্দ্রে প্রেরণ করে।[১৭] কিন্তু Wever এবং Bray বহু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ব্যাপারটি ঠিক অত সহজ নয়। বহিঃকর্ণে বায়ুতরঙ্গ যখন সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার বার স্পন্দিত হচ্ছে, তখন অন্তঃকর্ণের পশ্চাতের স্নায়ুসূত্রের কোন একটি

---

[১৬] Munn—Psychology, P. 371

[১৭] Munn—Psychology, P. 372

তন্তুও সেকেণ্ডে এক হাজার বারের বেশী স্পন্দিত হয় না। সুতরাং তাঁরা বললেন যে, তন্তুগুলি আলাদা আলাদা কাজ করে না। অনেকগুলি একসঙ্গে হয়ে, বোধকেন্দ্রে স্নায়ু-তরঙ্গের গুলি যেন ছুঁড়ে মারে, তাই এই মতবাদকে Volley theory of hearing বলা হয়। যেখানে অনেকগুলি স্নায়ুতন্তু একত্র হয়ে কাজ করে, সেখানে উচ্চগ্রামের স্বর (high pitch—যথা, ধা, নি), আর যেখানে একত্র ক্রিয়াশীল তন্তুগুলির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে নীচু গ্রামের স্বর (lower pitch, যথা—সা, রে,) সৃষ্টি হয়। যেখানে তন্তুগুলি অতি দ্রুত তরঙ্গ ছুঁড়ে মারে, সেখানে পাওয়া যায়, উচ্চ শব্দ loud sound) আর যেখানে তন্তুগুলি মন্থর গতিতে কাজ করে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে কম বার তরঙ্গ ছুঁড়ে মারে, সেখানে পাওয়া যায়, নীচু শব্দ (low sound)। বহু পরীক্ষার পর, বিজ্ঞানীরা আপাততঃ সিদ্ধান্ত করেছেন, যে দুইটি মতবাদই অংশতঃ সত্য। তাই দুটিকে একত্র গ্রহণ করেই শব্দ গ্রহণ রূপ জটিল সংবেদনের সুব্যাখ্যা সম্ভবপর। সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা যেখানে পাঁচ হাজার বারের অনেক উপরে (high frequencies), সেখানে হেলমহোল্‌ৎসের মতবাদ অধিকতর সন্তোষজনক, কিন্তু যেখানে সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা পাঁচ হাজার বারের নীচে (low frequencies), সেখানে বেভার ও ব্রের মতবাদ অধিকতর প্রযোজ্য।[১৮]

কর্ণের সাহায্যে দূরত্ব ও দিক বোধ—কোন্ শব্দ দূরের, কোন্ শব্দ কাছের তা শব্দের উচ্চতা (loudness) দ্বারা সহজেই বুঝতে পারি। দূরের শব্দ অস্পষ্ট, মিশ্রিত। দূর হতে হাটের কোলাহলের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য বোধ থাকে না, কাছে আসলে, বিবিধ শব্দ আলাদা আলাদা পৃথক করতে পারি।

শব্দ শুনে আমরা ডাহিন, বাম, উপর, নীচ প্রভেদ করতে পারি। স্বতন্ত্র ভাবেই কান এ বোধ কতকটা দিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ দিক-জ্ঞানের জন্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে চোখের সহযোগীতা আবশ্যক। চক্ষু বুজে, সোজাসুজি ডান বাঁয়ে শব্দের স্থান আমরা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু দুই কানের মাঝামাঝি কোন জায়গা হতে শব্দ আসলে, তার স্থান নির্দেশ কঠিন হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে বলেই, এরোপ্লেনের শব্দে উপরে তাকাই, ইঁদুরের কিচ্‌মিচ্‌ শব্দের উৎস নীচে খুঁজি। এ সম্বন্ধে Young একটি পরীক্ষা করেন, যা দৃষ্টি সম্বন্ধে Stratten-এর পরীক্ষার অনুরূপ।

১৮ Munn—Psychology, P. 374

একটি মানুষের দুই কানের সঙ্গে, শব্দ গ্রহণের জন্য চওড়ামুখ দুটি নল, এমনভাবে সংলগ্ন করা হল যে, ডান দিকের শব্দ বাঁ কানে, এবং বাম দিকের শব্দ ডান কানে এসে পৌঁছে। এবার লোকটি চোখ বুজে রইল, এবং বিভিন্ন দিক্ হতে শব্দ করে দেখা গেল, তারই শব্দ সম্বন্ধে দিক্ ভ্রম জন্মেছে। চোখ খুলে দিলে, কিন্তু এ ভ্রম হয় না।[১৯]

অন্তঃকর্ণের অর্ধ-বৃত্তাকার খালগুলির সহিত, ভারসাম্যবোধ, গতিবোধ, ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থান বোধের সম্পর্ক আছে। কান, শুধু শব্দ গ্রহণের যন্ত্র নয়। প্রাণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে, শব্দগ্রাহক ও শ্রবণের ইন্দ্রিয় হিসাবে কর্ণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু কর্ণযন্ত্রের অন্তর্গত semicircular canals ও vestibule, অত্যন্ত নীচু স্তরের প্রাণীর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে, এরা গতিবোধ, দিক্‌বোধ, ভারসম্য বোধের স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মাছ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটে, পাখী আকাশে ওড়ে ও দিক হারায় না, টিকটিকি বা ব্যাংকে চিৎ করে দিলে তৎক্ষণাৎ উপুড় হয়ে যায়, বিড়াল উঁচু ছাঁদ হতে লাফিয়ে, পায়ের উপর ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে।

মানুষের বেলায়ও দেখা যায়; এই অন্তঃকর্ণের—semicircular canal গুলি হতে স্নায়ুগুচ্ছ একত্র হয়ে vestibule হতে স্বতন্ত্রভাবে শ্রবন স্নায়ুসূত্রে (auditory nerve) গিয়ে মিশেছে। semicircular canals ও vestibule যে ফাঁপা হাড়ের নলের অংশ, তার তরল ও বালুকা সদৃশ পদার্থ (otoliths) দ্বারা পূর্ণ এবং basilar membrane-এর উপর যেমন সূক্ষ্ম চুল আছে, এখানেও ভিতরে তার চেয়ে লম্বা লম্বা চুল আছে। তিনটি semicircular canal পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। মাথা কোনো দিকে ঘোরালেই canalগুলির ভিতরের তরল পদার্থ গতি লাভ করে, এবং otolithগুলি গড়াতে সুরু করে, এবং লম্বা চুলগুলিতে গিয়ে ধাক্কা দেয়, এবং চুলগুলির গোড়ার স্নায়ুকোষগুলিকে চঞ্চল করে। এইগুলির সহিতই শ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছের একটি স্বতন্ত্র শাখা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। semicircular canal-এর জলের গতি, মাথার যে কোন সঞ্চালন বোধ নির্দেশ করে। একটি সম্পূর্ণ আবৃত এরোপ্লেনে চলার কালে, প্লেনের সামান্য হেলা-দোলাও semicircular canal-এর তরল পদার্থে গতি সৃষ্টি করে, এবং তৎক্ষণাৎ তা আমরা বুঝতে পারি। চক্ষু বন্ধ করে, কোন মানুষকে একট নির্দিষ্ট গতিতে ঘোরাতে আরম্ভ করলে,

১৯ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 483

তা সে টের পায়। ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ঘুরানো বন্ধ করলে, তরল পদার্থ বিপরীত গতি নেয় এবং মানুষটি চোখ বুজে থাকলে, সে কিছুক্ষণের জন্য বিপরীত দিকে গতি অনুভব করে। Semicircular Canal এবং Vestibuleএ পীড়াজনিত স্নায়ুতন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, গতিবোধ ও ভারসম্য বোধ নষ্ট হয়।[২০] কিছুক্ষণ দ্রুত ঘুরলে বা liftএ অতিদ্রুত উপরে উঠলে বা নামলে, অনেক সময় মাথা ঘোরে, তার কারণ Semicircular Canal এর তরল পদার্থের অতি দ্রুত বা অসমান গতি।[২১]

ত্বক ঃ উষ্ণতা, শৈত্য, বেদনা ও স্পর্শ সংবেদন (The skin : Sensations of warmth, coldness. pain and touch)—

সমস্ত দেহের বহিরাবরণ হচ্ছে চর্ম। এ দেহকে বহু বিপদ ও আঘাত হতে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করে। মনোবিজ্ঞানে আমরা একে বহু বোধদা ইন্দ্রিয় হিসেবেই বিবেচনা করব, যদিও চর্মকে আমরা স্পর্শ বোধের ইন্দ্রিয় হিসেবে ভাবতেই অভ্যস্ত। তথাপি, সামান্য পরীক্ষাতেই জানা যায়, ত্বক একটি মাত্র ইন্দ্রিয় নয়, এবং এ কেবল স্পর্শ বোধই জাগ্রত করে না, উত্তাপ, শীতলতা, বেদনা বোধও উদ্রিক্ত করে। এই প্রাথমিক চারটি বোধ ছাড়াও, আমরা ত্বকের সাহায্যে শুষ্কতা, আর্দ্রতা, চুলকানি ইত্যাদি মিশ্র বোধও পেয়ে থাকি। ত্বক বাস্তবিক পক্ষে চারটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। ত্বকের উপরিভাগ বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপকের গ্রাহক, এবং ত্বকের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মাত্রায় স্পর্শ, উষ্ণতা, শৈত্য ও বেদনা বোধের গ্রাহক-যন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় ত্বকের নীচেও চারিটি বিভিন্ন রকমের স্নায়ুকোষ আছে।

বাহুমূলে ত্বকের উপর দিয়ে একটি পেন্সিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বুলালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পর্শ বোধই শুধু পাওয়া যায়; কিন্তু কোন কোন স্থানে সুস্পষ্ট শৈত্যের অনুভূতি পাওয়া যায়। ত্বকের এই বিশেষ বিন্দুগুলি **Cold spots** বলা হয়। 45°c থেকে 50°cর উত্তপ্ত একটি শলাকা এই বিন্দু স্পর্শ করলে, যে সংবেদন পাওয়া যায়, তা সুস্পষ্টভাবে শীতলতার। ত্বকের সব অংশে এই বিন্দুগুলি সমানভাবে ছড়ানো নাই। কানের বাইরের অংশ এবং পিঠে এ

---

২০ It is certain from physiological experiments involving destruction of part or all of the inner ear or its nerves, that postures, righting movements, and steadiness of progression depend on this organ, as well as on the muscle sense. Woodworth & Marquis—Psychology, P. 485

২১ Munn—Psychology, P. 375

বিন্দুগুলি বেশী পরিমাণে থাকাতে, শরীরের এই স্থানগুলিতে শীত আমরা বেশী বোধ করি। অনুরূপভাবে কবোষ্ণ একটি শলাকার অগ্রভাগ ত্বকের উপর বুলালে, কোন কোন বিন্দুতে সুস্পষ্ট উষ্ণতার সংবেদন পাওয়া যায়। হালিবার্টন বলছেন যে ধোবানী ইস্ত্রীর উত্তাপ পরীক্ষা করে, তা গালে স্পর্শ করিয়ে। দেহের এ অংশে উত্তাপ বিন্দুর (**heat spot**) আধিক্য। তাপ বোধের বিন্দু (**heat spots**) গুলিও ত্বকের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। সাধারণ সুস্থ মানুষের দেহাভ্যন্তরের তাপমাত্রা ৯৮° ফারেনহিট্-এর কাছাকাছি। ঘরের মধ্যে সাধারণ অবস্থায়, ত্বকের উপরের তাপমাত্রা ৮৫° থেকে ৯০°র মধ্যে। ত্বকের বাইরের তাপমাত্রা দুই এক মাত্রা বেশী বা কম হলেই, ত্বকের তাপবিন্দু গুলিতে তা টের পাওয়া যায়। যদি ঘরের তাপমাত্রা অনেকটা বাড়ে অথবা কমে, তা হলে ত্বকের তাপমাত্রাও সেই অনুপাতে বাড়ে এবং কমে। দেহ যেন একটি রেফ্রিজারেশন যন্ত্র, যা মানুষের দেহকে তার চতুষ্পার্শের আবহাওয়ার উষ্ণতা ও শৈত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।[২২]

ত্বকের কোন কোন বিন্দু বা বিন্দুসমষ্টি বিশেষভাবে বেদনার বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম। একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগ শলাকা দেহের ত্বকের উপর বুলালে, কোন কোন কেন্দ্রে তীক্ষ্ণ বেদনার অনুভূতি হয়। এই বোধ অ-সুখকর। অন্যান্য বিন্দুতে স্পর্শবোধও, মাত্রা ছাড়ালে অ-সুখকর। ত্বকের বেদনা-বিন্দু, **pain spots**) যে অনুভূতি জাগ্রত করে, তার বিশেষত্ব হল, সে অনুভূতি হুল্ ফোটানোর মত জ্বালাকর।[২৩] এই বিন্দুগুলিও ত্বকের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো। চোখের অচ্ছোদপটল (cornea) প্রায় সমস্তটাই বেদনা-বিন্দু দ্বারা গঠিত। তাই ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণা চোখে গেলেও এত বেশী অস্বস্তি হয়। মুখগহ্বরে, বিশেষ করে গালের ভিতর অংশে বেদনা-বোধ খুব কম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে, মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থেও বেদনাবোধ সামান্য। ত্বকের বেদনা বোধের উদ্দীপক, হয় যান্ত্রিক (সূচ ফোটানো), অথবা তাপ অতি-বৃদ্ধি বা হ্রাস, রাসায়নিক (এ্যাসিড ইত্যাদি)

---

২২ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 452.

২৩ What is distinctive of pain-sensations (of the skin) is that they have a stinging, smarting or pricking character. They are in addition, nearly always unpleasant. Stout—Manual of Psychology P. 246.

অথবা বৈদ্যুতিক। সর্বক্ষেত্রেই এটা এ পরিমাণ উগ্র হওয়া প্রয়োজন, যাতে সে অংশের ত্বক্ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই বোঝা যায় বেদনা-বিন্দুগুলি খুব সূক্ষ্ম বোধ জ্ঞাপক (sensitive) নয়।[২৪]

ত্বকের অধিকাংশই স্পর্শবোধ জ্ঞাপক, তবে এই স্পর্শবোধ সর্বত্র সমান তীক্ষ্ণ নয়। পায়ের গোড়ালীতে এ বোধ ভোঁতা। আবার হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, কপাল ইত্যাদি স্থানে এ বোধ তীক্ষ্ণ। সাধারণতঃ দেখা যায়, অস্থি-গ্রন্থির কাছাকাছি এ বোধ কম, কিছু দূরে এ বোধ বেশী; দেহের সম্মুখভাগে এ বোধ বেশী, পশ্চাৎভাগে এ বোধ কম। "ত্বকের স্পর্শবিন্দু (touch spot) যদি একটি সূক্ষ্ম সূঁচের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তা হলে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি তীক্ষ্ণ চাপের বোধ পাওয়া যায়, কিন্তু তার সঙ্গে বেদনাবোধ থাকে না। এবং সূঁচটি গরম বা ঠাণ্ডা হলেও উত্তাপ বা শৈত্য বোধ জাগে না।[২৫] ত্বকের উপর স্পর্শবিন্দু ও বেদনা-বিন্দুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তারপরেই শৈত্য বোধের বিন্দুর; সবচেয়ে কম সংখ্যা হচ্ছে উত্তাপ বোধ বিন্দুর। স্পর্শ-বোধের উত্তেজক হচ্ছে ত্বকের উপরিভাগে চাপ (pressure)। এই চাপ দ্বারা স্পর্শবোধ আবার দুই প্রকারের, **Protopathic** বা heavy touch এবং **Epicritic** বা discriminative touch.

কোন ব্যক্তি চোখ বুজে বসলে, তার ত্বকের বিভিন্ন স্থান একটু জোরে কোন বিন্দুতে স্পর্শ করলে, সে প্রায় নির্ভুলভাবে সে স্থানটি নির্দেশ করতে পারে। একে হ্বাউট্ 'heavy touch localisation' বলেছেন। কিন্তু আর এক প্রকার স্পর্শ সংবেদন সূক্ষ্মতর ভাবে পরিমাপ করতে হয়। দু'কাঁটা-ওয়ালা একটি সহজ যন্ত্র (Aesthesiometer) দ্বারা চোখ-বন্ধ-করা কোন মানুষের ত্বকের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করলে দেখা যায়, সব জায়গার স্পর্শ-কাতরতা (sensitivity) সমান নয়। যন্ত্রের কাঁটা দুটিকে কাছাকাছি আনা যায়, ফাঁকও করা যায়। কোন কোন জায়গায় কাঁটা দুটি খুব কাছাকাছি থাকলেও, দুইটি বিন্দুতে পৃথক ও স্পষ্ট স্পর্শানুভূতি পাওয়া যায় (যেমন অঙ্গুলির অগ্রভাগ)। কিন্তু পিঠে, কাঁটা দুটিকে অনেকটা ফাঁক করলে, তবেই দুটি পৃথক বিন্দুতে স্পর্শবোধ হয়। এ জাতীয় স্পর্শানুভূতিকে 'Epicritic touch localisation'

২৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 463.
২৫ Sherington—Text book of Physiology, P. 921.

বলা হয়েছে। ডাঃ হেড্ নিজ দেহের ত্বকের উপর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যে, সূক্ষ্ম epicritic touch-এর অধিকতর স্পর্শকাতর স্নায়ুকোষগুলি ত্বকের ঠিক নীচেই থাকে; কিন্তু heavy touch-এর বোধ উদ্দীপক স্নায়ুকোষগুলি

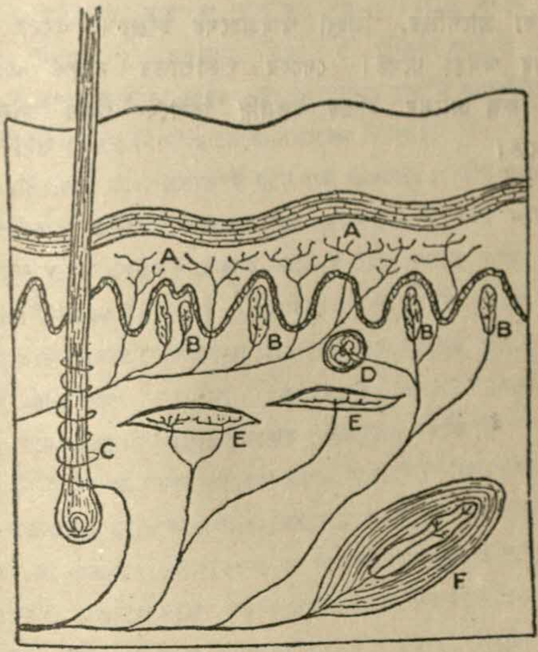

Fig. 29. The cutaneous sense organs. A is a free nerve ending in the sense organ of pain, B is a Meissner corpulscle, the sense for light pressures, C is a nerve-ending coiled around a hair, a sense of pressure aroused by movement of the hair, D is a Krause's corpuscle probably a sense-organ for warmth; F is a Paccinian corpuscle probably a sense-organ for deep pressure or for warmth.

Sandiford—Educational Psychology, Fig. 14, P. 61 (Longmans Green & Co.) অনুসরণে

ত্বকের আরো নীচে পেশী (muscle) ও কণ্ডরার (tendons) সঙ্গে যুক্ত থাকে। ত্বকের বিভিন্ন বোধের জন্য দায়ী, বিভিন্ন রকম কোষের চিত্র উপরে দেওয়া গেল :

সংবেদন হিসাবে স্পর্শবোধের মূল্য অসামান্য। এ দ্বারা জগতের বস্তুর অস্তিত্ব, তার রূপরেখা (outline), তাহার ঘনত্ব (solidity) ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বোধ জন্মে। স্পর্শবোধ পেশী-সঞ্চালন বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দূরত্ব, ইত্যাদি গতি বোধ সৃষ্টি করে।

নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা স্বাদগ্রহণের ইন্দ্রিয়। এদের সুখ দুঃখ উৎপাদনের ক্ষমতা যথেষ্ট। দেহের শুভাশুভের সঙ্গেও এদের যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞানের ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হিসাবে এদের স্থান সকলের চেয়ে নীচুতে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension SERVICE
CALCUTTA-27

অষ্টম অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ—Perception

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের মূল্য অপরিসীম। জ্ঞানলাভের তিনটি পথ স্বীকৃত (১) প্রত্যক্ষণ—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপস্থিত বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানলাভের উপায় (২) অনুমান—চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতীকের (symbols) দ্বারা অতীত, ভবিষ্যৎ, দূর বা সম্ভাব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উপায় এবং (৩) বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হ'তে জ্ঞানলাভের উপায়।

এই তিনটি পথের মধ্যে প্রত্যক্ষণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ সাধারণ মানুষের অধিকাংশ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

প্রত্যক্ষণ ও সংবেদন—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে বাহ্য বা আন্তর উদ্দীপক দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা। একে বলা হয় **সংবেদন (sensation)** কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনায় যে সংবেদন লাভ হয় তা জ্ঞানের উপাদান হলেও, সংবেদনকে জ্ঞান বলা চলে না। সংবেদনের তাৎপর্য বোধ হ'লে তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অক্ষিপট যখন ইথার তরঙ্গদ্বারা উদ্দীপিত হয় তখন তাকে বলি সংবেদন। কিন্তু এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ বোধকেন্দ্রে সাড়া জাগিয়ে যখন রং বা আলোর বোধ জন্মায়, তখন তা প্রত্যক্ষণ। সাধারণতঃ বহু সংবেদনের সমন্বয় ও তাৎপর্য বোধই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মনে শুদ্ধ সংবেদনের কোন অস্তিত্ব নেই—a pure sensation is a psychological myth. সংবেদন মাত্রই ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা রঞ্জিত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তারই নাম প্রত্যক্ষণ। কতকগুলি ইথার তরঙ্গ অক্ষিপটে আঘাত করলে আমরা তার মানে বুঝি, 'একটি লাল বল'। অর্থাৎ একাধিক সংবেদন একত্র হয়ে ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দেশ কালে অবস্থিত একটি বস্তুর বোধ জন্মায়। একেই আমরা প্রত্যক্ষণ বলি—তাই বলা হয়েছে,—a perception is the interpretation of sensation—it is the synthesis, localisation and objectification of sensations.

প্রত্যক্ষণ অভ্যাস নির্ভর—ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং তার দ্বারা রঞ্জিত হয়েই সংবেদন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একাধিকবার

লাল বল দেখেছি বলেই কতগুলি ইথার তরঙ্গ অক্ষিপটে এসে আঘাত করলেই বুঝি, একটা লাল বল রূপ বস্তু আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই একথা বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষণ হচ্ছে এক প্রকার অভ্যাস perception is a kind of habit. আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাজনিত অভ্যাসের জন্যই এই ইথার তরঙ্গাবলিকে লাল বল বলে মনে কচ্ছি। বলটি পূর্ব অভিজ্ঞতায় লাল জানি বলেই, ওটিকে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারেও লাল বলি, যদিও বাস্তবিকপক্ষে, তখন কিন্তু বলের রংটি আলোর পরিবর্তনের জন্য আর 'লাল' নেই তা, অন্য রং ধারণ করেছে। তাই দেখা যায় সংবেদনগুলির সতত পরিবর্তন সত্বেও একবার তাদের বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন একটি বস্তু হিসাবে প্রত্যক্ষ করলে, ছোট খাটো পরিবর্তন সত্বেও সেই সংবেদন সমষ্টি 'লাল বল' এই তাৎপর্যই বহন করতে থাকবে--একেই বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষণের স্থিরতা গুণ'—constancy of perception.[১] শিক্ষার এটা একটা অঙ্গ যাতে শিশু দ্রব্যগুণ ও অবস্থার পরিবর্তন সত্বেও একটি বস্তুকে সেই বস্তু বলে চিনতে শেখে। প্রত্যক্ষণের মধ্যে এই অভ্যাসগঠন থাকে। ইতর প্রাণী বা নিতান্ত ছোট শিশু বহু সংবেদনকে একত্র ক'রে এক বস্তু হিসাবে বুঝতে শেখে না, অথবা অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একই বস্তু হিসাবে বুঝতে পারে না। ইঁদুর ছানা ছুটাছুটি না করতে থাকলে, বিড়াল তাকে নাকি তার খাদ্য হিসাবে চিনতে পারে না। কিন্তু ইঁদুর ছানা ছুটে পালালেই তখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা ক্ষীণবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি তারাও গুণ বা অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটলে বস্তুটিকে আর সেই বস্তু বলে চিনতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ছেলেরা মুখোশ পরে এলেও পরিচিত বস্তুকে চিনতে ভুল করে না।

প্রত্যক্ষণ শুধু সংবেদনের সমষ্টি নয়—তাদের সমন্বয়—সংবেদনগুলি বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, পরস্পর সংযোগবিহীন। কিন্তু মানুষের মন এই বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে[১] তাদের অর্থপূর্ণ করে গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষণ সংবেদনগুলির যোগফল মাত্র নয়—তাদের এক জীবন্ত

---

১ The fact that we know the object to be red makes it seem red. In other works, we interpret it as red. It is only after evening has set in that we usually notice the changes in colour which objects show as the illumination fails. As a matter of fact, objects change in hue brightness and saturation, all day long.

Murphy: A Briefer General Psychology, P. 163.

সমন্বয়ের ঐক্যে বিধৃতকরণ। এ কথা বিশেষ করেই বোঝা যায় ঘনতা (solidity) ও দূরত্ব (distance) প্রত্যক্ষণের বেলায়।

ঘনত্ব ও দূরত্ব চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কিন্তু তা সত্যই আমরা 'দেখি' না। আমাদের অক্ষিপটে যে সংবেদন আসে তা ঘন বস্তুর নয় (not of a solid object) তা একটি তলের (of a surface)। কিন্তু আমাদের পেশী সঞ্চালনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই সংবেদন সমষ্টি ঘন বস্তু (solid objects) হিসাবেই বুঝতে শিখি। প্রত্যক্ষের যে ভ্রম (illusion) তার জন্যেও দায়ী হচ্ছে মন। অতীত অভিজ্ঞতা এসব ক্ষেত্রে আমাদের বিভ্রান্ত করে। এখানে ভ্রম যেটা হয় সেটা সংবেদনে নয়, সংবেদনের অর্থবোধে।[২] আমাদের মন সংবেদনগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে জানে এবং তারপর এই পৃথক অংশগুলিকে একত্র করে' এক বস্তু হিসাবে দেখে, একথা সত্য নয়। সমগ্রতাবোধই মনের প্রাথমিক ধর্ম। গেষ্টল্ট মনোবিদ্‌রা প্রত্যক্ষণের আলোচনায় মনের এই সমগ্র গঠনের (pattern forming) দিকটা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

প্রত্যক্ষণের তিনটি স্তর—প্রত্যক্ষণের **প্রথম স্তরে,** কোন বস্তুকে ব্যক্তি যখন প্রত্যক্ষ করে, তখন তাকে অ-বিশ্লেষিত, অংশে অবিভক্ত, অস্পষ্ট সমগ্রভাবেই দেখে। তখন দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ বা দিককে সে আলাদা করে দেখতে বা বুঝতে শেখে না। তখন বাস্তবিকপক্ষে অর্থ বা তাৎপর্যবোধ জন্মে না। **দ্বিতীয় স্তরে,** বস্তুর বিভিন্ন অংশের দিকে মন যায়, কিন্তু তখনও সেই অংশগুলির পরস্পরের যোগ অথবা অংশগুলির সঙ্গে সমগ্রের যোগটি শিশুর মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই স্তরেও অর্থবোধ সম্পূর্ণ নয়। তবে এই স্তরেই বলা যায়, সংবেদনগুলিকে পৃথক করে বোঝা হচ্ছে। **তৃতীয় স্তরে** বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক ও স্বতন্ত্র না থেকে একটি অর্থপূর্ণ সমগ্রের ঐক্যে

২ The visual perception of space illustrates the synthesis and organisation of sensory impressions. Our interpretation of size, distance etc., depends on many ones from the eye muscles etc. Even though the retina only reports two dimensions, we learn to see three dimensions because we have learned to use a three dimensional world; the *use* of the muscles and the sensations consequently received from the muscles give a context by which to interpret the two dimensional impression on the retina. Illusions are false interpretations based on the misuse of past experiences, especially the wrong grouping of sense-impressions.

Murphy : A Briefer General Psychology, P. 193.

বিধৃত হয়। এই স্তরেই প্রত্যক্ষণ সম্পূর্ণ হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রত্যক্ষণের এই তিন স্তর বোঝানো যেতে পারে। দূরে একটি কালো কিছু দেখতে পেলাম, নদীর উপরে। তখন এটা কি, তা বোঝা গেল না। মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল যেন একটা রঙীন কাপড়ের পাল। ক্রমে আরো লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম দুটি মানুষ ও একটি জাল, আর একটি মানুষ হাল ধরে আছে। এবার বুঝতে পারলাম পদ্মানদীতে একটি জেলেডিঙ্গি মাছ ধরছে। এখানে প্রথম স্তরে অস্পষ্ট অ-বিশ্লেষিত একটা অখণ্ড 'কিছুর'বোধ, দ্বিতীয় স্তরে সেই অস্পষ্ট অখণ্ডতা পাল, মানুষ, জাল, হাল ইত্যাদিতে বিশ্লেষিত হোল; তৃতীয় স্তরে এই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত সংবেদনগুলি জেলেডিঙ্গির প্রত্যক্ষণরূপে একটি সমগ্র ঐক্যবোধে পরিণত হলো।

প্রত্যক্ষণের এই দুটি দিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা ভালো বুঝতে পারব।

প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ

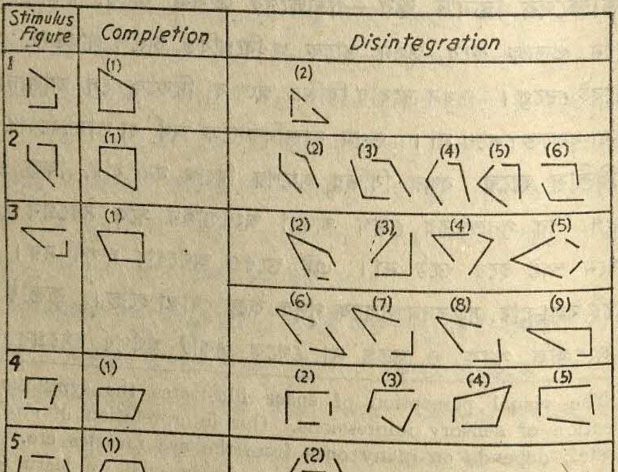

Fig. 30. প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। বাঁ ধারের প্রথম সারির (উপর থেকে নীচ) ছবিগুলি ব্যক্তির সামনে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় সারিতে ছবিগুলিতে দেখা যায় ফাঁকগুলি ভরাট করে ব্যক্তি দেখছে। তৃতীয় সারিতে দেখা যায় ছবিগুলি ব্যক্তি দেখে, ফাঁকগুলি আরো বেশী ফাঁক করে। [Gibson এর J. Exp. Psycho. 1929 vol 12 p. 28 অনুসরণে]

দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একটি পরীক্ষা : একেবারে বাঁ ধারের পাঁচটি ভাঙা ছবি (পরীক্ষার সময় বাস্তবিকপক্ষে ১০টি ছবি দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে পাঁচটি মাত্র এখানে দেওয়া হোল) প্রত্যেকটি ১½ সেকেণ্ড করে', কয়েকজন মানুষকে দেখানো হোল। কিছুক্ষণ পরে তাদের বলা হোল ছবিগুলি মনের থেকে যে কোন ক্রম অনুযায়ী আঁকতে। দ্বিতীয় সারিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই ছবিটির ফাঁকগুলি ভরাট করে এক একটি সম্পূর্ণ আকার দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সারিতে আরো কয়েকজনের আঁকা ছবিতে বরং বিপরীত ধারা দেখা যাচ্ছে। তারা ভাঙ্গা ছবিগুলির ফাঁকগুলো বরং আরো ফাঁক করে এঁকেছে। দ্বিতীয় সারির সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ছবিগুলি প্রত্যক্ষণের তৃতীয় স্তর সূচনা কচ্ছে, আর তৃতীয় সারিতে আমরা প্রত্যক্ষণের বিশ্লেষণধর্মী দ্বিতীয় স্তরের পরিচয় পাই। এরা জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রথম দলের তুলনায় পেছিয়ে আছে, কারণ এরা বহু অংশকে সমগ্রের ঐক্যে বাঁধতে পারছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান তত্ত্ব। জানা অর্থই বহুকে মনের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্যে বাঁধা। গোড়াতেই শিশুকে খুটিনাটি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করে শেখালে সে বিভ্রান্ত হয়। এভাবে শেখাতে চেষ্টা করলে, সে সংবেদনগুলি মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। গোড়া থেকে ঐক্য ও সমগ্রতার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাকে চালিত করতে হবে। শিক্ষা কিছু অগ্রসর হলে তখন বিশ্লেষণের উপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের স.মনে যে উদ্দীপক উপস্থিত থাকে তাকে আমরা অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান আগ্রহ অনুযায়ী রাঙিয়ে দেখি। সর্বত্রই দেখা যায় আমরা কোন না কোন প্রকার অর্থ বা 'তাৎপর্য' আবিষ্কারের চেষ্টা করি। তাই অর্থহীন কালির আঁচড় বা ছবিকেও একটা মনগড়া রূপ দিতে না পারলে, মন যেন স্বস্তি পায় না।

প্রত্যক্ষণ ও অর্থ আবিষ্কার—পর পৃষ্ঠায় প্রথম ছবিটি হয়তো মনে হবে একটি বনমানুষ সামনের ও পিছনের একটা পায়ে ভর দিয়ে এবং সামনের ও পিছনের একটা করে পা উঁচু করে যেন হেঁটে চলেছে। দ্বিতীয় ছবিটি মনে হবে একটি সিংহ শাবক। পঞ্চমটি এক নাক-উঁচু, চুল-খোপা-করে-বাঁধা, ঠোঁট-ফাঁক-করা-বুড়ি ; সপ্তম একটি ঘোমটা-পড়া বর্ষিয়সী মহিলা, যেন পেছন ফিরে চরকা কাটছেন, অষ্টম একটি গলাবন্ধ ঝুঁটি-ওয়ালা গরম লোমের টুপি ইত্যাদি। এখানে দেখা যাচ্ছে

মন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা বর্তমান আগ্রহের তাড়নায়, উপস্থিত উদ্দীপকের অর্থ বা তাৎপর্য্য গ্রহণ করে থাকে। এই তাৎপর্য গ্রহণের ক্রিয়াতে প্রত্যক্ষণের তিনটি স্তরই লক্ষ্যণীয়, প্রথম, অস্পষ্ট অখণ্ডতা, দ্বিতীয়, বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা এবং তৃতীয় বিচ্ছিন্ন অংশগুলির পুনরায়

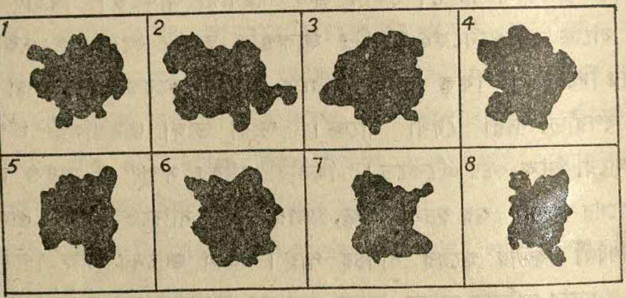

Fig. 31. অর্থহীন কতগুলি কালির ফোঁটা। কিন্তু ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অর্থ-আবিষ্কার করে প্রত্যক্ষ করে। [Murphy A Briefer General Psychology Fig 47a p. 178 অনুসরণে]

গভীরতর সমগ্রতার ঐক্যের বন্ধন। এই তাৎপর্য গ্রহণের দ্বারা সংবেদনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং তা উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়।[৩] উড্‌ওয়ার্থ এই পরিবর্তনেরও দুটি রূপের কথা বলেছেন; একটিকে তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ মিশ্রণ (blend)। আর একটি হচ্ছে বহু অংশের একটি অখণ্ড ঐক্যের সমন্বয় (pattern)। প্রথমটি প্রত্যক্ষণের প্রথম স্তর, যেখানে বস্তুটিকে অস্পষ্টভাবে 'এক' বলে বুঝি, যেমন, আইসক্রীম্ খাওয়ার সময়, তার স্বাদগন্ধস্পর্শ সব মিলে একটি অবিশ্লেষিত অস্পষ্টবোধ; এখানে সব মিলে একটি সম্পূর্ণ মিশ্রণ। কিন্তু কাল-পুরুষকে যখন আকাশে দেখি, তখন যে তারার সমষ্টি নিয়ে কালপুরুষের

৩ Perception means interpretation of sense impressions. This interpretation depends upon past experiences and present attitudes. In order to interpret we must organize and make a whole out of what is presented to the senses. We cannot do this until we have learned how to analyse sense impressions. When the perception is once complete, it becomes very difficult to disentangle the separate sensory elements which played a part in arousing it. In fact, perception seems to alter the characteristics of the sensory elements so that they are no longer the same things that they would be if they existed isolated from one another.

Murphy : A Briefer General Psychology, P. 181 & 193.

কল্পনা, তাদের আলাদা বিচ্ছিন্ন করেও দেখতে পারি। কিন্তু কালপুরুষরূপে যখন তারাগুলিকে এক করে দেখি, সেখানে সবগুলি তারা মিলিয়ে একটি অর্থপূর্ণ আকৃতি (pattern) সৃষ্টি করি।[৪] এটি পরিণত মনের পরিচয় এবং মার্কির মতে এটি প্রত্যক্ষণের তৃতীয় স্তর সূচনা করে।

Signs, Symbols, Cues, Reduced cues.

সংবেদন (sensations) গুলি হোল সংক্ষিপ্ত চিহ্ন বা প্রতীক মাত্র আর প্রত্যক্ষণ হোল সেই প্রতীকের তাৎপর্য আবিষ্কার। আমরা যখন বই পড়ি তখন ছাপার অক্ষরগুলি আমাদের মনে অর্থবোধ জাগায়। এমন কি, সবগুলি অক্ষর আমরা আলাদা আলাদা লক্ষ্যও করি না; কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস দ্বারা আমরা সহজেই অর্থবোধ করি। এখানে ছাপার অক্ষরগুলি হচ্ছে বস্তু বা ঘটনার প্রতীক মাত্র (symbols)। তারাই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত কিন্তু আমাদের মন অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে সেই প্রতীক গুলির অর্থ আবিষ্কার করে। যেমন CAT এই প্রতীক চোখের সামনে উপস্থিত হলে, লোমওয়ালা, লেজওয়ালা, একটি ছোট জন্তুকে চিনে নি। আর চিহ্ন (sign) বলি বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত কোন গুণ বা উদ্দীপককে। যতগুলি বেশী চিহ্ন সংবেদনের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত হবে ততই প্রত্যক্ষণটা সম্পূর্ণতর বা স্পষ্টতর হয়। যেমন, ধোঁয়া হচ্ছে আগুনের চিহ্ন। সঙ্গে যদি উত্তাপ এবং হিরণ্যবর্ণ রূপ চিহ্নগুলিও থাকে, তাহ'লে প্রত্যক্ষণের দ্বারা তার মানে বুঝি আগুন। অনেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের মধ্যে যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তা সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক লিপির মত, কিন্তু ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা ও বর্তমান আগ্রহের ভিত্তিতে তার অর্থ নির্ণয় করে। একেই বলি প্রত্যক্ষণ। একটি বড় বল যদি পাঁচ হাত দূরে থাকে, তখন যে সংবেদন চোখ দিয়ে পাই, তা হচ্ছে অর্ধখণ্ডিত একটি গোলার্ধ, কিন্তু যা তার অর্থবোধ হয়, তা হোল সম্পূর্ণ ত্রিতলবিশিষ্ট ঘনত্বগুণ-সম্পন্ন একটি অখণ্ড গোলকের। এখানেই দেখতে পাই, মনের স্বাভাবিক ধর্ম, ফাঁক বুজিয়ে সমগ্রতার অভিজ্ঞতা লাভের।[৪]

উড্ওয়ার্থ প্রতীক (symbol) বা চিহ্ন (sign) কথা ব্যবহার না করে, ইঙ্গিত বা সংকেত (cue) কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি বলেন সংবেদন

৪ Woodworth: Psychology, P. 444.

মনের সামনে কিছু সংকেত উপস্থিত করে। মন সে সংকেত অনুসরণ করে' একটি সমগ্র নিটোল অভিজ্ঞতা গড়ে তোলে।[৫] আমাদের চোখ দেখলো লাল রংয়ের একটি অর্ধগোলাকৃতি তল। মন এই ইঙ্গিতের মানে করলো, একটি লাল বল।

অভিজ্ঞতা যতই পরিণত হয়, ততই সংক্ষিপ্ততর ইঙ্গিত (reduced cues) থেকে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা গঠনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ দ্রুততর ও সম্পূর্ণতর হয়। এটা মনের পরিণতির একটি মাপকাঠি। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক কোন রোগীর দিকে একবার চোখ বুলিয়েই অনেক কিছু 'দেখেন', যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যারা নির্বোধ তারা 'সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত'-

Fig 32. এখানে কয়েকটি অসম্পূর্ণ চিহ্ন থেকে সম্পূর্ণ একটি মানুষের ছবি ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে
[Munn Psychology Fig. 128. p. 270 অনুসরণে]

এর অর্থোদ্ধার করতে সহজে পারে না। শিক্ষাবিদের কাছে এটি আর একটি মূল্যবান তত্ত্ব। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হ'বে, শিশুর মনকে এমন ভাবে তৈরী করা যাতে সে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের অর্থভেদ করে একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এই অর্থোদ্ধার বা তাৎপর্যনির্ণয় শুধুই ইন্দ্রিয়ের সংবেদন মাত্র নয়—এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং দ্রুত যুক্তি বিচারও অবশ্যই থাকে এবং সে কারণেই এই পদ্ধতি কিছুটা মানসিক পরিণতির অপেক্ষা রাখে। তাই যারা ক্ষীণবুদ্ধি

৫ Woodworth & Marquis: Psychology, P. 405 & P. 406.

বা জড়বুদ্ধি তাদের প্রত্যক্ষণ আপেক্ষিক ভাবে শ্লথ, শিথিল, এবং তাৎপর্যের দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও অসংবদ্ধ।[৬]

প্রত্যক্ষণে সংক্ষিপ্ত সংকেত (reduced cues) থেকে তাৎপর্যবোধ, বহু সময় ও শ্রম লাঘব করে এবং জ্ঞানলাভের এটি একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার, কিন্তু এতে ভ্রমের সম্ভাবনাও কখনো কখনো থাকে। সংক্ষিপ্ত সংকেত সব সময় একই জিনিষ বোঝায় না—যেমন অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে খোলা মাঠের মধ্যে চোখের সামনে বড় কালো কোন বস্তুর সংবেদনের অর্থ হ'তে পারে, দূরের এক পাহাড় বা কাছের এক খড়ের গাদা। দুই ক্ষেত্রেই একই উদ্দীপক অক্ষিপটে এসে পৌঁছচ্ছে। বর্তমান মনের অবস্থা বা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তি তার অর্থবোধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করবে এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আবার বিপরীতও হতে পারে। একই দ্রব্য বহু সংক্ষিপ্ত সংকেত পাঠাতে পারে। এখানেও ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সংক্ষিপ্ত সংকেতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একই বস্তু বলে চিনে নেওয়ায়।[৬] পূর্বেই আমরা দেখেছি যে এটাও মনের একটি ধর্ম যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বেশে কোন বস্তু আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লেও, তা একই দ্রব্য বলে বুদ্ধিমান মানুষ চিনে নিতে পারে। ভগ্ন বা বিচ্ছিন্ন সংবেদন-সমষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষণ গ্রহণের ক্ষমতাকে পুনঃ সমাকলন বা redintegration বলা হয়।[৭]

---

৬ The signal may be very sketchy in comparion with the whole object. Justt a brief glimpse, a whiff of odour, or a snatch of sound will be enough. Such reduced cues save time and trouble(though they sometimes lead to mistakes in perception . . . Stimuli are like words, in that many of them have two or more meanings. . . . . Not only is it true that the same sign may have different meanings, but it is also true that different signs may have the same meaning . . . . this important line of facts goes by the name of perceptional constancy; which means that the same object will be perceived as the same and as having the same characteristics (within limits) inspite of the different stimuli which it sends to you under different conditions.

Woodworth & Marquis: Psychology, P.p. 406-507.

৭ Any fraction of some previously experience situation may, by itself, lead to recall of a whole experience. This phenomenon is variously referred to as redintegration, recall in terms of reduced cues or response to minimum cues.

Munn—Psychology, P. 270.

Ambiguous Figures—একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে বিভিন্ন বলে মনে হতে পারে। চক্ষুদ্বারা যে সংবেদন আমাদের কাছে পৌঁছে তাদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য। নীচের ছবিগুলি বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জক এদের তাই ambiguous figures বলা হয়।

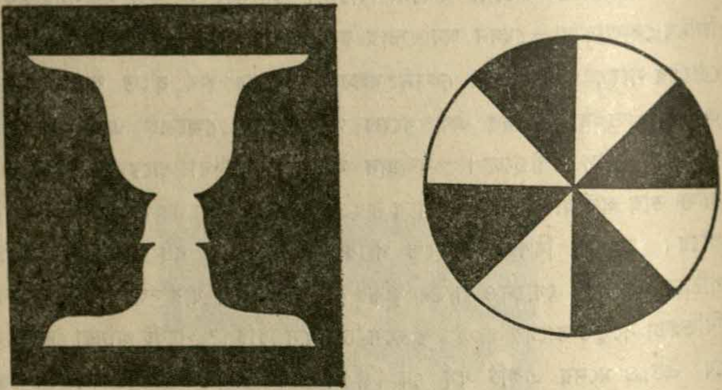

Fig. 33. Figure & Background উপরের দুটি ছবিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।
[Woodworth & Marquis Psychoslogy p. p.408-409 অনুসরণে]

Figure & Ground—অনেক ক্ষেত্রে যখন আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন তার একটি পটভূমি (background) এবং একটি পুরোভূমি (forground) থাকে। এই দুই মিলিয়েই সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষণ। পটভূমির সঙ্গে যুক্ত করেই পুরোভূমির ছবিটি স্পষ্ট ও অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে পটভূমি ও পুরোভূমি স্থান পরিবর্ত্তন করে, এবং তাতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন 'ছবি' প্রত্যক্ষ করি। এখানেও দেখা যায় যে প্রত্যক্ষণ ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় নয়। মনই স্থির করে, পটভূমি বা পুরোভূমি কোনটি প্রাধান্য লাভ করবে। প্রত্যক্ষণ শুধুই ইন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়—এখানে অর্থবোধেরও বালাই আছে। শুধু দৃষ্টি নয়, শব্দগ্রহণের বেলায়ও এরকমটি ঘটে থাকে।

নিরীক্ষণ—Observation—প্রত্যক্ষণে মন দ্রব্য বা ঘটনার হুবহু ছবি তোলে না। অনেকগুলি সংবেদন একই সঙ্গে বহু ইন্দ্রিয়ের সামনে এসে হাজির হয়। তাদের মধ্যে সবগুলির দিকেই মন আকৃষ্ট হয় না। ব্যক্তির বর্তমান আগ্রহ, প্রয়োজন, পরিচিতিবোধ ইত্যাদি দিয়েই মন স্থির করে, এই সংবেদন-

গুলির মধ্যে কোনগুলিকে সে নির্বাচন করবে, কোনগুলিকে সে বর্জন করবে। যে সংবেদনগুলি মন গ্রহণ করল, তাদের নিজ প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী সাজিয়ে দেখবার কিছুটা স্বাধীনতা প্রত্যক্ষণে থাকে। তাই একই দ্রব্য বা ঘটনা দুইজন ব্যক্তি ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যক্ষ করে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহের বেলায় সচেতনভাবে শাসন সংযমাধীনে প্রত্যক্ষণকে ব্যবহার করা হয় এবং নির্ভুল জ্ঞান লাভের এই পদ্ধতিকে বলা হয় **নিরীক্ষণ** বা **পর্যবেক্ষণ (observation)** সাধারণ প্রত্যক্ষণে গ্রহণ-বর্জনের কাজটি হয় অচেতনভাবে, কিন্তু পর্যবেক্ষণে সংবেদনের গ্রহণ-বর্জন-সংকলন হয় সচেতনভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সাধনের উপায় হিসাবে, কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে। তাই পর্যবেক্ষণের সংজ্ঞা হচ্ছে—নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যক্ষণ observation is regulated perception. নিরীক্ষণের বেলায় পূর্ব নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যক্ষণকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বস্তু বা ঘটনার বিশেষ একটি দিক বা বিশেষ কোন পরিবর্তনের দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়। যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষণ করেন, তখন সূর্য সম্পর্কে সেই বিশেষ পরিবর্তনই তিনি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দেখেন, অন্যান্য বিষয় তিনি তৎকালে উপেক্ষা করেন। পর্যবেক্ষণের বেলায় অবশ্য ঘটনার সংঘটন বা পরিবর্তন নিরীক্ষকের চেষ্টা-নিরপেক্ষ; প্রকৃতি ঘটনাটি ঘটায় এবং যে অবস্থার মধ্যে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তাও প্রকৃতি-সৃষ্ট। যদি সূর্যগ্রহণের কালে মেঘ বা কুয়াশা থাকে তবে সেই অসুবিধাকে স্বীকার করে নিয়েই পর্যবেক্ষণের কাজে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, এই সব বাহ্য বাধা অথবা ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার প্রতিকূলতা, আজ কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অতিক্রম করে, বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানের কাজে পর্যবেক্ষণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সফল। দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বহু দূরের অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্রব্যের নির্ভুল পর্যবেক্ষণ সম্ভব—যা সাদা চোখের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তেমনি, ইনফ্রায়েড্ রশ্মির সাহায্যে কুয়াশা বা অন্ধকারের মধ্যেও দূরের জিনিষের ছবি তোলা যায়—রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরস্থ অস্থি, অন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদির রোগ ধরা পড়ে। বর্তমানের মাইক্রো ক্যামেরা দিয়ে অতি সূক্ষ্ম অণুর অন্দরের খবর পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা জন্মগত—ছোট শিশুও প্রত্যক্ষণ করতে পারে; কিন্তু

নিরীক্ষণ শিক্ষা সাপেক্ষ। ব্যক্তির বর্তমান উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনের পক্ষে কোনটি সার (essential) ও কোনটি আকস্মিক (accidental) তা জানলে, তবেই প্রত্যক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরীক্ষণে পরিণত করা যায়। এই 'ঝাড়াই-বাছাই' কি করে করতে হয়, শিক্ষার এটি একটি অঙ্গ হওয়া উচিত। বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিশুদের নিরীক্ষণের আগ্রহ ও নিপুণতা যাতে বর্ধিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। শুধু বই পড়ার মধ্য দিয়ে জানার চেয়ে, নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে জানা, অনেক বেশী কার্যকরী এবং সেই জন্যই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পরিচয়ের (nature study) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ব্যবহারবাদীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষণ—Behaviouristic view of perception—প্রত্যক্ষণ জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। এ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখানে পরিবেশ যেমন ব্যক্তির উপর ক্রিয়া করছে, ব্যক্তিও তেমনি পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সাহায্য করে, তাহার পরিবেশ থেকে উদ্দীপক গ্রহণ করতে; অন্যদিকে তার পেশী তাকে সাহায্য করে, অবস্থা অনুযায়ী পরিবেশের উপর ক্রিয়া করতে। পরিবেশের উপর যথোচিত প্রতিক্রিয়া করতে হলেই ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশকে জানা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষণ এই অত্যাবশ্যক ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে' ব্যক্তির সুস্থ জীবন-ধারণের সহায়ক হয়। জানা ও করা জীবনের এই দুইটি মৌলিক দিকই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সূত্র (Stimulus-Response formula) দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ জানা ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। দ্রব্য থেকে উদ্দীপক এসে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে। সে সেই উদ্দীপক গুলির মধ্য থেকে কিছু বেছে নিয়ে, এমন প্রতিক্রিয়া করে, যাতে বস্তুটির সঙ্গে একটি সফল সক্রিয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। পরিবেশ থেকে অজস্র উদ্দীপনা ব্যক্তির নিকট এসে পৌঁছে। ধরা যাক, এই বহু উদ্দীপকের মধ্যে লাল রংয়ের বোধদায়ক বৈদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, ব্যক্তির অক্ষিপটে গিয়ে আঘাত করল। ব্যক্তির এবার বোধ জন্মাল, যে বাগানে একটি গোলাপ ফুল ফুটেছে। তখন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হ'ল, হাত বাড়িয়ে ফুলটিকে আকর্ষণ করা ও তাহাকে বৃন্তচ্যুত করা অর্থাৎ পরিবেশে কিছু পরিবর্তন সাধন করা। এই সমগ্র ঘটনা শৃংখলকে আমরা পুরাতন W—S—Ow—R—W সূত্র দিয়ে প্রকাশ করতে পারি;

এখানে W মানে হল World বা অসংখ্য সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ ; S হল সেই পরিবেশ থেকে নির্গত উদ্দীপক বা Stimulus। সেই উদ্দীপক, O অর্থাৎ Organism বা ব্যক্তির দেহে এসে পৌছল। কিন্তু O সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়। তার প্রস্তুতির অবস্থা অনুসারে সে W থেকে উদ্দীপক বাছাই করে। এটা বুঝাবার জন্যই Ow চিহ্ন ব্যবহার করা হল। এবার ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বা Response (সংক্ষেপে R) প্রকাশ পেল এবং সেই প্রতিক্রিয়া (R) পৃথিবী বা পরিবেশে (W) কিছু পরিবর্তন সাধন করল।[১]

মানুষ মন-সম্পন্ন সচেতন প্রাণী। সুতরাং সে নির্বিচারে সমস্ত উদ্দীপকের প্রতি মন দেয় না, এবং একই ধরনের উদ্দীপক সম্পর্কে তাহার প্রতিক্রিয়াও সব সময় এক রকমের নয়। ব্যতিক্রমহীন ঐক্যের পরিবর্তে, বরং দেখা যায় বিচার বিবেচনাজনিত বৈচিত্র্য। বৌমা যখন কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন বাইরের সমস্ত কোলাহল সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ; কিন্তু তার ছেলেটি দূরে কেঁদে উঠলেও, তৎক্ষণাৎ সে সেখানে ছুটে যায়। মানুষের বিচার বিবেচনা আছে বলেই, তার ব্যবহার সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নয়। সে অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্য থেকে, নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বা কয়েকটিমাত্র বেছে নেয়, এবং তার প্রতিক্রিয়া ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। গড়ের মাঠের কাছ দিয়ে যেতে বিরাট কোলাহল শুনে বিচলিত হই না। আন্দাজ করি, ইষ্টবেঙ্গলদল একটি গোল দিয়ে থাকবে ; কিন্তু হাজরার মোড়ে গোলমাল শুনলে সতর্ক হই, আশঙ্কা করি, হয়তো বা এটা ট্রাম পোড়াবার অভিযান। প্রত্যক্ষণ সহজতম জ্ঞান হলেও তাতে বুদ্ধি, বিচার, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্থান আছে। অর্থবোধ করতে হলেই, চাই নূতন সংবেদনকে পুরাতন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করা, এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ।

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গেষ্টল্ট বা সমগ্রতাবাদীদের মত—Gestalt theory of Perception—গেষ্টল্ট (Gestalt) কথাটি জার্মাণ, এর অর্থ হল রূপ, নক্মা, সংগঠন বা পূর্ণতা। এই মতবাদ একদিকে প্রাচীন অন্তদর্শনপ্রণালী-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞান, এবং অন্য দিকে ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানের বিরোধী। গেষ্টল্টবাদীরা বলেন যে, মানসিক ক্রিয়াগুলি সরলতর বিচ্ছিন্ন বোধের সমষ্টি মাত্র নয় ; তাঁদের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যের ইঙ্গিত আছে। সমস্ত

[১] Woodworth & Marquis: Psychology, P. 403.

মানসিক ক্রিয়ার গতি হল সমগ্রতার অভিমুখে, এই সমগ্রতা বা সংগঠনেই (Configuration) তাদের তাৎপর্য বা প্রাণ।[৯]

গেষ্টল্টবাদীদের মতে, আমরা বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে একত্র করে প্রত্যক্ষণ গড়ি, এটা ঠিক নয়। বাস্তবিক পক্ষে সংবেদনের মধ্যেই একটি প্যাটার্ণ হিসাবে দেখা দিবার ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক সংবেদনই নিজ বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী ছিন্ন করে, একটি বৃহত্তর ঐক্যের অঙ্গীভূত হতে চায়। আকাশে কতগুলি তারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, কিন্তু মন তাদের রূপ দিল, একটি বিরাট বীরমূর্তিতে। হাতে তাঁর অস্ত্র, মাথা হেলিয়ে পা ছড়িয়ে আকাশে শয়ান, এর নাম কালপুরুষ। আবার কতগুলি মার্বেল মেজেতে ছড়ানো, আমরা কল্পনা করলাম একটি ফুল। আমাদের দৃষ্টি একটি মাত্র মার্বেলে আবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক নয়। সে সব কয়টি মার্বেলকে একত্র করে, একটা সুসংবদ্ধ প্যাটার্ণে রূপ দিতে চায়। যখন বই পড়ি, তখন কি বিচ্ছিন্নভাব একটি একটি অক্ষর আলাদা আলাদা দেখি? তা নয়। কতগুলি অক্ষর একত্র করে একটি অর্থপূর্ণ শব্দে গ্রথিত করে নি। আবার অভ্যাসের ফলে, এবং মনোযোগের দ্বারা কয়েকটি শব্দকেও এক সঙ্গে যুক্ত করে অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত করে' দ্রুত অগ্রসর হই। সে জন্য দুই একটি অক্ষর বদ গেলেও অনেক সময় তা আমদের চেখে পড়ে না। উপরে ক'টি বাক্যে ইচ্ছা করেই, আমরা কয়েকটি বর্ণ বা চিহ্ন বাদ দিয়ে গেলাম। সম্ভবতঃ এটা অনেকের চোখ এড়িয়ে যাবে। তাই প্রুফ্ দেখা যথেষ্ট কঠিন কাজ। মনের এই সংগঠনের দিকে ঝোঁক আছে বলেই কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্র (Geometrical figure) সামান্য কিছু অসম্পূর্ণ রেখে গেলে, দর্শকের তাতে মানসিক অস্বস্তি জন্মে, এবং কল্পনার সাহায্যে সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করে ক্ষেত্রগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখবার দিকে প্রবণতা থাকে। নীচের কয়টি ছবিই শিশুরা 'অভগ্ন'ই

---

৯ Gestalt (Ger): form, pattern, structure, or configuration; an integrated whole, not a mere summation of units or parts.

Gestalt Psychology: A type of psychology which arose as a strong reaction against atomic psychology in all its varieties, equally hostile to behaviourism and to introspectionism; its basal contention is that mental processes and behaviour cannot be analysed, without remainder, into elementary units, since wholeness and organisation are features of such processes from the start.

দেখবে, নয় হয়তো মনে করবে ছবিগুলি ভুল ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ ছবিটিতে মেয়েটির দুই হাতেই একটি আঙ্গুল কম, এও হয়তো তাদের দৃষ্টি

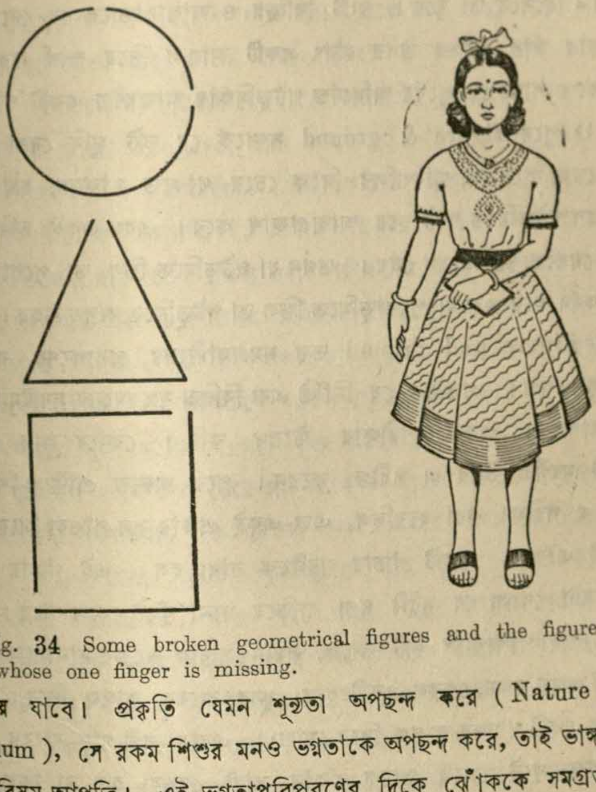

Fig. 34 Some broken geometrical figures and the figure of a girl whose one finger is missing.

এড়িয়ে যাবে। প্রকৃতি যেমন শূন্যতা অপছন্দ করে (Nature abhors vacuum), সে রকম শিশুর মনও ভগ্নতাকে অপছন্দ করে, তাই ভাঙ্গা বিস্কুটে তার বিষম আপত্তি। এই ভগ্নতাপরিপূরণের দিকে ঝোঁককে সমগ্রতাবাদীরা The principle of closure অথবা pragnanz বলেছেন।[১০]

প্রত্যক্ষণ ব্যাপার নিয়ে সমগ্রতাবাদীরা অনেকগুলি পরীক্ষা করেছেন, এবং এ সব পরীক্ষা থেকে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যক্ষণ বিচ্ছিন্ন কতগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র নয়। শিশু (বা পশু) যখন কোন গুণ প্রত্যক্ষ করে, তখন তা একটি সমগ্র পটভূমিকার সঙ্গে যুক্ত করেই দেখে।

১০ Pragnanz (Ger.): A term employed by the Gestalt school, for the tendency of every mental form or structure towards meaningfulness completeness, and relative simplicity.
Drever—Dictionary of Psychology, P. 215.

যখন তার কাছে একটি উজ্জ্বল রং উপস্থিত করা হয়, এবং তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন সে পূর্বের বৈচিত্র্যহীন পটভূমিকায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হিসেবে তা বুঝে। রংটি বিচ্ছিন্ন ও আলাদাভাবে সে দেখে না। সেইপ্রকার তার হাতের উপর হঠাৎ একটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলে, সে এটা বুঝতে পারে যে, পূর্বের অনির্দেশ্য পটভূমিকায় আকর্ষণীয় একটি পরিবর্তন ঘটল।[১১] পূর্বে figure & ground সম্পর্কে যে দুটি ছবি দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে যে, ছবিগুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ যেন একটি রূপ পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এবং একই ছবি চেয়ে দেখতে দেখতে, বিভিন্ন রূপ নেয়। তখন যা পটভূমিতে ছিল তা পুরোভূমিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যা পুরোভূমিতে ছিল তা পটভূমিতে অপসৃত হয়।

এই Figure and ground তত্ত্ব সমগ্রবাদীদের প্রত্যক্ষণের ব্যাখ্যার একটি মূল সূত্র। প্রত্যক্ষণ যে নির্দিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টিমাত্র নয়, তা প্রমাণকল্পে একটি পরীক্ষার উল্লেখ কচ্ছি। কোয়েহ্‌লার প্রথমে কয়েকটি মুরগীর উপর এ পরীক্ষা করেন। পরে অন্যান্য প্রাণী ও শিশুদের উপরও এ পরীক্ষা করা হয়েছিল, এবং একই প্রকার ফল পাওয়া গিয়েছিল। পরীক্ষাটি এইরূপ। একটি খাঁচায় মুরগীকে রাখা হল। এই খাঁচার একটি দিক এতটা খোলা যে মুরগী গলা বাড়িয়ে দানা খুঁটে খেতে পারে। এই খোলা দিকে পাশাপাশি দুটি তাকে, সমান সংখ্যক শস্যের দানা রাখা হল। তাক দুটি একই রকম, কেবল একটি হাল্কা ধূসর রংয়ের কাগজ দিয়ে মোড়া, এবং আর একটি গাঢ়তর কাগজ দিয়ে মোড়া। এবার মুরগী গাঢ় রংয়ের তাক থেকে শস্য খুটে খেলে তাকে কোন বাধা দেওয়া হত না, কিন্তু হাল্কা রংয়ের তাক থেকে খেতে গেলেই, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। এ পরীক্ষা কিছুক্ষণ ধরে চলল। কিন্তু তাকগুলি অনেক সময় ডানেরটা বাঁয়ে

---

১১ Koffka বলছেন "Consequently, we ought not to say that the child sees a *luminous* point; but rather that the child sees a *luminous point upon a relatively indifferent background*; or, in the case of touch, that pressure is felt upon the hand, which before had been lacking in phenomenal distinction. Generally stated, from an unlimited and illdefined background, there has arisen a limited and some what *definite phenomenon*."
Koffka—The Growth of the Mind, P. 145.

এবং বাঁয়েরটা ডাইনে, এ ভাবে স্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হত। কিছুদিন এ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, মুরগীটি সর্বদাই গাঢ়তর রংয়ের কাগজ মোড়া তাকটি থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং হাল্কা রংয়ের তাকটিতে শস্যকণা থাকলেও, এবং তাকে বাধা দেওয়া না হলেও, সেই তাকে মুখ দেয় না। তা হলে ব্যবহারবাদীদের মত অনুযায়ী, অভ্যাসের ফলে গাঢ়তর রংটি মুরগীর কাছে Positive, এবং হাল্কা রংটি Negative হওয়া উচিত, অর্থাৎ গাঢ়তর বিশেষ ধূসর বর্ণের S (উদ্দীপক) উপস্থিত হলে, O (প্রাণী)-র R (খাদ্য খোঁটা রূপ প্রতিক্রিয়া) উপস্থিত হওয়া উচিত। এ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলে, তাই দেখা যায় বটে। কিন্তু এবার পরীক্ষাটির একটু পরিবর্তন করা হল। এবারও তাক দুটি এবং তার উপর রক্ষিত শস্যের দানা একই রইল। গাঢ় ধূসর রংয়ের কাগজ মোড়া তাকটিও কোন পরিবর্তন হল না। কিন্তু হালকা ধূসর রংয়ের কাগজ মোড়া তাকটিকে আরও গাঢ়তর ধূসর রংয়ের কাগজে মোড়া হল। অর্থাৎ পূর্বে মুরগী যে গাঢ় ধূসর রংয়ের তাক থেকে খাদ্য বেছে খেতে অভ্যস্ত হয়েছিল এবার তার চেয়ে গাঢ়তর ধূসর রংয়ের তাকের ব্যবস্থা হল। দুটি তাকেই সমপরিমাণ শস্য দেওয়া হল। এবার ব্যবহারবাদীদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সত্য হলে, মুরগী পূর্ব-অভ্যস্ত গাঢ় ধূসর রংয়ের তাক হতে (positive stimulus) খাদ্য খুটে খাবে, এই আমরা আশা করব। কিন্তু দেখা যায় মুরগী গাঢ়তর ধূসর রংয়ের তাক থেকেই খাদ্য খুঁটে খায়, **পূর্ব অভ্যস্ত গাঢ় ধূসর রংয়ের তাক থেকে নয়।** এতে প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষণে একটি বিশেষ উদ্দীপকেই (Specific stimulus) প্রাণী প্রতিক্রিয়া কচ্ছে, তা নয়। এখানে **মুরগীর প্রতিক্রিয়া একটি সমগ্র সম্পর্ক (the total relation of darker-than) বোধের উপরই নির্ভর করছে।** মানব শিশুর বেলায় অনুরূপ পরীক্ষা দ্বারা অনুরূপ ফলই পাওয়া গিয়েছে।[১২] এবং এই পরীক্ষা মুরগীর উপর করে যে ফল পাওয়া গেল তাতে এটা বুঝা যায়, এমন কি ইতরপ্রাণী যাদের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নি, সেখানেও

১২ "In this special arrangement, where two different colours are placed side by side in an otherwise symmetrical figure of a very simple form . . . . what is characteristic of the experience is not the mere presence of one colour lying by itself, and another colour lying by itself, but the togetherness of the two colours."

Kohler—The Mentality of Age.

প্রত্যক্ষণ দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমগ্রতাবাদের নীতি (the principle of configuration) কাজ কচ্ছে।[১৩]

অধ্যাস, মায়া (Illusion)—ভারতীয় দর্শনে রজ্জুতে সর্পভ্রম, বা শুক্তিতে মুক্তাভ্রম, প্রাচীন ও বহু ব্যবহৃত উদাহরণ। বাস্তবিক পক্ষে, অধ্যাস বা মায়া হচ্ছে প্রত্যক্ষণের ভ্রম। ঘড়িতে সাতটা বেজেছে, অথচ ভুলে দেখলাম আটটা বেজেছে। এই যে ভুল করলাম, সে ভুলটা কোথায়? উদ্দীপক এ ক্ষেত্রে ঠিকই ইন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করেছে, ভ্রম হচ্ছে উদ্দীপকের অর্থবোধে। সুতরাং মায়া সম্পূর্ণ অমূল নয়, সোনার পাথর বাটির মত অলীক এবং অসম্ভবও (self-contradictory) নয়। এর পশ্চাতে বাস্তব সত্তা আছে, কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য আমরা সেই বাস্তব সত্তার স্বরূপটি নিরূপণ করতে অসমর্থ হই (আবরণ), এবং তাতে অন্য সত্তা আরোপ করি (বিক্ষেপ)। বেদান্তবাদীরা একে বলেছেন অধ্যাস।

Perception and Illusion

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যক্ষণ ও মায়া মূলতঃ একই মানসিক প্রক্রিয়া, কিন্তু মায়া আমাদের অনভীপ্সিত লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে দেয়। কোন যন্ত্র বিকল হলেই, তার ভিতরের কলকব্জা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্টতর হয়। তাই বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, মায়া বা ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষণ, সত্য প্রত্যক্ষণের বিষয় বুঝতে বিশেষ সহায়ক। প্রত্যক্ষণের মধ্যে ছোট খাটো ভুলকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা উপেক্ষা করি, কারণ কার্যক্ষেত্রে এ ভ্রম খুব মারাত্মক নয়। কিন্তু যেখানে ভ্রমটি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে (যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম) সেখানেই প্রত্যক্ষণের ভ্রমকে "মায়া" ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।[১৪] ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যে ঘটনা উপস্থিত হয়, তাকে কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতা যখন বিকৃত বোধে পরিণত করে, তখনই মায়ার সৃষ্টি—'a subjective perversion of the objective content'।[১৫] গেষ্টল্টবাদীরা বলেন, সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই মন উদ্দীপককে একটি সমগ্র অখণ্ড পট-

---

১৩ Koffka—The Growth of the Mind, P. 156.

১৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 422.

১৫ Drever—Dictionary of Psychology, P. 127.

ভূমিকার বিন্যাস করে তার অর্থবোধ করে। মায়ার বেলায়, সেই সমগ্র অখণ্ড পটভূমিকা কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতা অথবা ইন্দ্রিয়ের কতগুলি প্রবণতার জন্যে স্থানান্তরিত হয়, এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার অমিল ঘটে। তবে প্রত্যক্ষণ ও মায়া এই দুই ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উদ্দীপক উপস্থিত থাকে। এই দুই ক্ষেত্রেই মন সেই উদ্দীপককে একটি বৃহত্তর ঐক্য বা pattern-এ বিধৃত করে তার তাৎপর্য বোধ করে। পিঁয়াজে (Piaget) শিশুদের জীবন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখেছেন যে, শিশুদের জীবনে প্রত্যক্ষণ ও মায়ার প্রভেদটা একেবারেই পাকা নয়। শিশু যখন খেলায় মত্ত থাকে, তখন কাঠের লাঠিটাই ঘোড়া ; ভাঙা, রং ওঠা, ছেঁড়া কাপড়ের পুতুলটাই তার খুকু। এগুলি 'যেন-ঘোড়া', 'যেন-খুকু' নয়—এরা শিশুর কাছে সত্যই ঘোড়া ও খুকু। বাস্তব জগত ও কল্পনার জগতের প্রভেদ শিশু বুঝতে শিখে, বড়দের সংসর্গে এসে যতক্ষণ সে তার খেলার জগতে আছে, তখনই সে আছে স্ব-ভাবে, এবং সেখানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।[১৬]

বয়স্ক মানুষের ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের কারণ, কখনো কখনো দেহের বাহিরের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে, আবার কখনোও তাহা দেহের বা ইন্দ্রিয়ের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে। এবং মায়া বা ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষকে তারা কোথা হতে উদ্ভূত, সে অনুযায়ী আমরা চারিটি বিভিন্ন দলে ভাগ করতে পারি।

১। বাহিরের কারণ থেকে উদ্ভূত মায়া—আয়নায় প্রতিবিম্ব বা পাহাড়ের কাছে খোলা জায়গায় চীৎকার করলে যে প্রতিধ্বনি শুনি, তা এ জাতীয় মায়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আয়নার ছবিটিকে শিশু জীবন্ত বলেই ভ্রম করে, এবং যে মানুষের ছবি, তাকে সে আয়নার পিছনদিকে খোঁজে, তার কারণ, বাস্তবিক পক্ষে চোখে যে আলো এসে পৌঁছে, তা আয়নার পিছন দিক হতেই। অবশ্য বয়স্ক মানুষ এ ভ্রম সহজেই অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু তা শিক্ষা-সাপেক্ষ। আয়নায় প্রতিবিম্বিত বস্তুর ছায়া দেখে ছবি আঁকতে দিলে (**mirror drawing**) আমরা বেশ মুস্কিলে পড়ি। বেশ কিছুদিন অভ্যাস না করলে এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা যায় না।[১৭]

১৬ Piaget—The Language and Thought of the Child.

১৭ "These physical illusions have some psychological interest simply because we learn to overcome them and to perceive the objective facts, in spite of the misleading stimuli."

Woodworth & Marquis—Psychology, P. 423.

২। অভ্যাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত মায়া—হাতের ছুটি আঙ্গুল কোণাকুণি একটির উপর আর একটি রেখে, আঙ্গুলের ফাঁকের মাথায় একটি মার্বেল রাখলে, ছুটি মার্বেল বলে ভ্রম হয়। তার কারণ, ছুটি আঙ্গুলের ছুটি স্পর্শ বোধ হচ্ছে, এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ছুটি স্পর্শবোধ হলে, ছুইটি দ্রব্য বোঝায়। প্রুফ্ দেখার সময় যে ভুল হয়, তাও এই কারণেই ঘটে। ভুল সত্ত্বেও অতীত অভ্যাসের ফলে পাঠক একই তাৎপর্য বোধ করে, সন্তুষ্ট হয়ে অগ্রসর হয়ে চলে।

Fig. 35. Aristotle's illusion—Woodworth—Psychology, P. 28 (Methuen)

৩। মনের প্রকৃতি ও প্রত্যাশা থেকে উদ্ভূত ভ্রম—গোয়ালন্দ স্টেশনে চাঁদপুর ষ্টীমারের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি; শরীর ক্লান্ত। হঠাৎ দূর দিগন্তে হয়তো বা কালোমেঘের একটুখানি ইঙ্গিত বিভ্রান্ত করল; চীৎকার করে বললাম, ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো অস্পষ্টভাবে ষ্টীমারই দেখতে পেলেন। ভীড়ের মধ্যে ছেলে হারিয়ে গেলে, মোটামুটি সমবয়স্ক বা একধরনের জামাপরা ছেলেকে, পেছন থেকে দেখে, মা তাকে আপন ছেলে বলেই ভ্রম করবেন।

৪। একটি সমগ্র সংবেদন-সমষ্টি উপযুক্ত বিশ্লেষণ অভাবে ভ্রমের কারণ হতে পারে—কোন একটা ছবি সমগ্র ভাবেই প্রত্যক্ষ করে তার অর্থগ্রহণ করি। তাতে ছোট খাটো ভুল থাকলেও, উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে ভ্রম হতে পারে। পর পৃষ্ঠার ছবিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

প্রথম দুইটি পাশাপাশি রেখার মধ্যে, বাঁ দিকের রেখাটি ডান দিকের রেখার থেকে বড় মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঠিক নয়। অনুরূপ

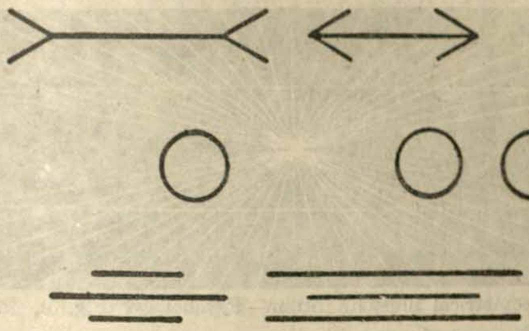

Fig. 36. Muller—Lyer Illusion.

ভাবে, প্রথম বৃত্ত ও দ্বিতীয় বৃত্তের বহিঃসীমার দূরত্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের অন্তঃসীমার দূরত্ব সমান, কিন্তু প্রথম দুইটি বৃত্তের মধ্যে দূরত্ব বেশী মনে হয়। তৃতীয় ছবিতে উপরের ও নীচের মধ্যবর্তী রেখাটির দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু তাদের সমান মনে হয় না।

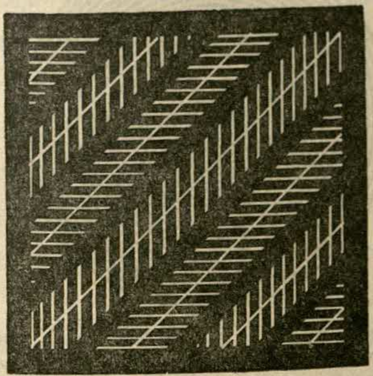

Fig. 37. The Zoellner illusion—Munn—Psychology Fig. *b*, P. 325.

উপরের ছবিটিতে ৭টি সমান্তরাল তেরছা রেখা পরস্পরের সঙ্গে যেন মিশে

যাবে মনে হয়। পরের ছবিটিতে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা মাঝখানে যেন বেঁকে গেছে।

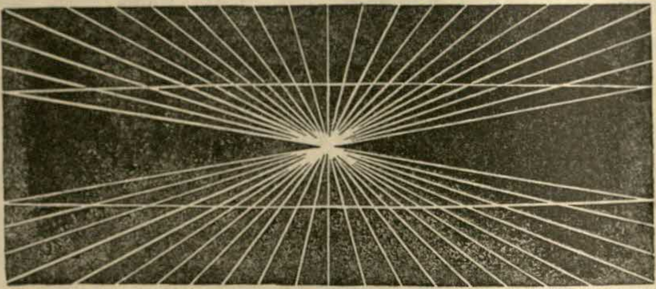

Fig. 38. Geometrical illusion. Munn—Psychology, Fig. c, P. 325.

৫। **গতি সম্পর্কে ভ্রম—Illusions of apparent motion—** নিয়ন্ আলোর বিজ্ঞাপনে দেখি, একটি আলোকিত তীর ছুটে চলেছে, বা চায়ের কেৎলী থেকে কাপে ঝলকে ঝলকে চা ঢালা হচ্ছে, অথবা বিজলী পাখার ব্লেডগুলি ঘুরছে। বাস্তবিক পক্ষে, এ গতির বোধ ভ্রমাত্মক, কারণ বাস্তবিক পক্ষে একটির পর আর একটি সাজানো তীর বা ব্লেড্ প্রত্যেকটিই স্থিতিশীল। কিন্তু সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় পর পর এগুলি আলোকিত

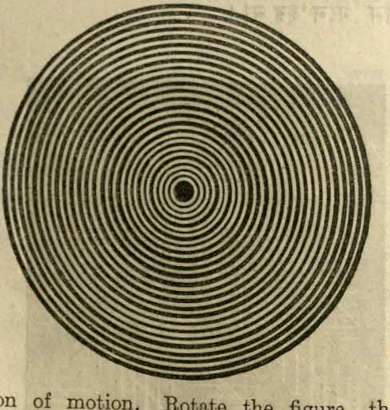

Fig. 39. Illusion of motion. Rotate the figure, the circles will seem to move and moving radii will be seen.

হচ্ছে বলেই, এই গতির ভ্রম জন্মে। সিনেমার ছবির বেলায়ও ঠিক একই কথা। কোন গতিশীল ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের দ্রুত কয়েকটি স্থিতিশীল ছবির (stills—সেকেণ্ডে ১২টি বা আরো বেশী) পিছন হতে

আলো ফেলে দ্রুত একটির পর আর একটি ছবি পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে অক্ষিপটের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়। দুটি ছবির মধ্যের ফাঁকটি, অবিচ্ছিন্নভাবে after-sensation গুলি ভরে থাকে। এই ভ্রমাত্মক গতিবোধকে **Phi-phenomenon** বলা হয়। Muller-Lyer illusion এবং Phi-phenomenon থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, চোখের সামনে যা থাকে, ঠিক ঠিক তাই আমরা দেখি না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও প্রত্যাশা দৃষ্ট বস্তুকে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় বিভ্রম জন্মায়। [১৮]

প্রত্যক্ষণে ভ্রম ও নির্ভুলতা—প্রত্যক্ষণের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে চোখে দেখার উপরে, তাই চোখের প্রত্যক্ষণ ব্যাপারটা কতটা নির্ভুল, তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনেক প্রভেদ আছে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় কম বা বেশী ভুল করে থাকে। যে ভুলগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অথবা একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বহু পার্থক্য ঘটে, সেগুলিকে বলা হয় variable error (যেমন, একসঙ্গে বারোটা মার্বেল একটা থালের মধ্যে ছড়িয়ে রেখে এক লহমায় সেগুলি দেখে ঠিক সংখ্যাটি বলতে বললে, কেউ বলবে ৯টি, কেউ ১০টি, কেউ ১৩টি, কেউ ১১টি ইত্যাদি)। কিন্তু কতগুলি ভুল আছে সেগুলি সকলেই প্রায় করে (যেমন অনেকগুলি মার্বেল ছড়ানো থাকলে, এক লহমায় দেখে ঠিক সংখ্যাটি বলতে বললে, সকলেই প্রায় কিছু কম সংখ্যা বলে, অথবা ডানদিকের জিনিষগুলির সংখ্যা বা অন্য কোন গুণ সম্পর্কে যতটা ভুল হয়, তার চেয়ে সাধারণতঃ বাঁ দিকের সম্বন্ধে ভুলটা বেশী হয়)। এই ভুলগুলিকে বলা হয়—constant error 'যে ভুলগুলি এমন সর্বসাধারণের (constant), সেগুলির প্রকৃত রূপ জানা থাকলে, তাদের সম্পর্কে ভুলগুলি অভ্যাস দ্বারা কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু যে ভুলগুলি পরিবর্তনশীল (variable), সেগুলি দূর করা কঠিন।

এক লহমায় দেখে, কতটা সংখ্যা ছাত্র ঠিক ঠিক বলতে পারে, এ পরীক্ষা বুদ্ধির পরীক্ষাও বটে। যারা এক লহমায় বহু সংখ্যক বস্তুকে নির্ভুল

---

১৮ Munn—Psychology, Pp. 424-427.

ভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারে, তারা বেশী বুদ্ধিমান, আর যারা কম সংখ্যক জিনিষকে প্রত্যক্ষণ করতে পারে তারা কম বুদ্ধিমান।

এ রকম আরো পরীক্ষাও হয়েছে। দুটি জিনিষ একই গুণে খুব কম তফাৎ থাকলে, হঠাৎ তাদের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি (discrimination) না। দু'টি মেয়ে মাথায় প্রায় সমান সমান (সিকি ইঞ্চি মাত্র তফাৎ) হ'লে, খুব লক্ষ্য না করলে কে বড়, কে ছোট, তা বলে দেওয়া যায় না। অথবা দুটি একরকমের জিনিষের ওজন খুব কাছাকাছি হ'লে চট্ করে কোনটা বেশী ভারী বলা মুস্কিল। অবশ্য এ সব বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান যাতে সম্ভব হয়, সে জন্যে মানুষ বুদ্ধি ক'রে নানা মাপক যন্ত্র (measuring instruments) তৈরী করেছে, যাতে প্রত্যক্ষণ দ্বারা আন্দাজে পরিমাপের ভুল দূর হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষণে ভুল যে হয়, তা মনস্তত্ত্ববিদের কাছে একটি আকর্ষণীয় তথ্য (interests fact)। তিনি জানতে চান, কেন এ ভুলগুলি হয়, এ ভুলগুলি ব্যক্তির সম্বন্ধে কি তথ্য আমাদের দেয় ইত্যাদি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়ের গঠন সম্পর্কে কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং এটাও লক্ষ্যণীয় যে সাধারণতঃ একই অবস্থায়, বেশী ভুল যারা করে তারা কম বুদ্ধিমান, আর কম ভুল যার করে তারা বেশী বুদ্ধিমান। তা ছাড়া অস্বাস্থ্য, মানসিক উদ্বেগ এবং মনোযোগের অভাবের সঙ্গে এই জাতীয় ভুলের নিশ্চিতই নিকট সম্বন্ধ আছে। শিক্ষাবিদের কাছে এই তথ্য মূল্যবান এবং মনোযোগ অধ্যায়ে কি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগ আকর্ষণ করে ভুল কমানো যায় তা আলোচিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষণের ভ্রম নিবারণের উপায়—প্রত্যক্ষণের যে নানাপ্রকার ভ্রমের উদাহরণ আমরা দেখেছি, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নিম্নলিখিত কারণগুলি ভ্রমের ক্ষেত্রে কাজ করে। (১) উদ্দীপকগুলি যেখানে বিভিন্নার্থজ্ঞাপক (২) প্রাচীন অভ্যাসের দাসত্ব এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে অক্ষমতা (৩) পূর্ব-নির্দিষ্ট অচল সংস্কার অথবা পূর্ববর্তী কোন দৃঢ় ধারণার প্রভাব এবং (৪) সংবেদনগুলিকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিবর্তে সাধারণ ভাবে অথবা মোটামুটি একটি ধারণা গ্রহণ করে, সন্তুষ্ট থাকা।

বৈজ্ঞানিকেরা সর্বদাই সতর্ক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সত্যজ্ঞান লাভের পক্ষপাতী। সেই জন্য তাঁরা পূর্বোক্ত যে চারটি কারণে ভ্রমের সম্ভাবনা, সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে থাকেন। বিজ্ঞানীরা সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ

প্রত্যক্ষণ, সতর্ক বিশ্লেষণ, যতটা সম্ভব পূর্বসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, সেই চেষ্টা, এ প্রকার বিভিন্ন উপায়ে প্রত্যক্ষের ভ্রম যথাসাধ্য নিবারণ বা নিরসন করতে চেষ্টা করেন। শিক্ষাবিদের পক্ষে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা অনুসৃত এই উপায়গুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন। নিরীক্ষণ সর্বদাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চালিত। তাই নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই বৈজ্ঞানিকের সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং নিজের সংস্কার বা পূর্বে স্থিরীকৃত ধারণা দ্বারা চালিত না হয়ে, তিনি প্রশ্ন দ্বারা প্রকৃতির নিকট হতেই নির্ভুল উত্তর দাবী করেন।[১৯] তিনি সর্বদাই নূতন ও অপ্রত্যাশিতের জন্য চোখ কান খোলা রাখেন।

বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ— Scientific Observation— উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই বুঝা যাবে, বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ কত কঠিন। বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের প্রথম দাবী, যে তা বস্তুগত (objective) এবং নির্ভুল (free from error) হওয়া চাই। তাই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বেলায় সাবধান হওয়া দরকার, যে ব্যক্তির প্রত্যাশা বা সংস্কার তার প্রত্যক্ষণকে যেন অন্যায়ভাবে প্রভাবিত না করে।

ভ্রমের যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হল, তা থেকে বুঝা যায় ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষণের মূলে থাকে (১) উত্তেজকের ভ্রমাত্মক ইঙ্গিত (misleading) stimuli), (২) প্রাচীন অভ্যাস এবং নূতন অবস্থা সম্বন্ধে ব্যক্তির অন্ধতা, (৩) পূর্ব সংস্কার বা ধারণা হতে সঞ্জাত প্রত্যাশা, (৪) সমগ্র প্রত্যক্ষণের বিভিন্ন অংশগুলির বিশ্লেষণ সম্পর্কে অসাবধানতা। 'মোটামুটি সব ঠিক আছে' এই আত্মসন্তুষ্টির ভাব, অথবা 'কোথায় কি যেন একটু ঠিক নেই' এ রকম অস্পষ্ট এবং আলস্যজনক মনোভাব, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পক্ষে মারাত্মক। আয়না আমাদের ভ্রমাত্মক ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু একটু সাবধান হয়ে তার প্রকৃতি যদি বুঝিতে পারি, তখন তাকে বরং আমাদের কাজে লাগাতে পারি— যেমন, মোটর চালক আয়নার অন্যান্য যানবাহনের বিপরীত গতির ছায়া

১৯ We should be able to learn something from the scientists on the essentials of good observation. They submit their theories to the test of observation and abide by the result . . . . the second thing to notice is that the scientist approaches nature *with questions to be answered by observation.* Of course he has his eyes open for unexpected phenomena, and his background of knowledge enables him to seize the significance of an unexpected phenomenon.

দেখে তা সংশোধন করতে শিখলে, তা তার গাড়ী চালনার পক্ষে বরং সহায়কই হয়। মনের মধ্যে কতগুলি স্থির বা বদ্ধমূল ধারণা (preoccupation) বা সংস্কার (bias) অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পক্ষে মস্ত বাধা, কিন্তু মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পরিদর্শন সম্ভব নয়। মন একটি সাদা পর্দা (tabula rasa) নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অতীত অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস সু-পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে সহায়ক। এবং মনের প্রস্তুতি (preparatory set) পর্যবেক্ষণের কাজকে সহজ করে। বৈজ্ঞানিকের কাছে, অভ্যাসের ফলে, অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত (reduced cues) অনেক বেশী তাৎপর্য-পূর্ণ হয়—যেমন, রোগীর নাড়ীর দ্রুততা থেকে, অথবা শিশুর দেহের ওজন থেকে, চিকিৎসক রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই আন্দাজ করতে পারেন। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগমনের একটি মাপকাঠি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন বা symbol-এর ব্যবহার।[২০] বৈজ্ঞানিক, পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির নিকট হতে সুস্পষ্ট উত্তর আদায় করে নেন—The scientist approaches nature with questions, answered by observation. পূর্ব থেকেই স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, কি প্রশ্নের উত্তর আমরা পর্যবেক্ষণ দ্বারা চাই। তাহলে পর্যবেক্ষণ সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হতে পারে এবং তা নির্ভুল জ্ঞানের পক্ষে সহায়ক হয়। বহু সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি সাবধান ও সুশৃংখল পর্যবেক্ষণ, কারণ সেখানে পরীক্ষণ সম্ভব নয়।[২১]

অমূল প্রত্যক্ষ (Hallucination)—এখানে আর একপ্রকার ভ্রমাত্মক অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যায়, যার নাম hallucination। হঠাৎ গভীর রাত্রে স্পষ্ট শুনলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। একবার, দুবার তিনবার এ ডাক শুনে শয্যাত্যাগ করে দরজা খুলে দেখলাম, কেউ নেই। অথবা হঠাৎ সুস্পষ্ট অনুভব করলাম, বহুদিন পূর্বের স্বর্গগতা মা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথা ফিরিয়ে চোখে দেখলাম, মা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন, ; পরনে তাঁর লালপেড়ে গরদের শাড়ী, কপালে টক্‌টকে সিন্দুরের ফোঁটা। কিছুক্ষণ বাদেই মূর্তি অন্তর্হিত হল! এ রকম অভিজ্ঞতা অধ্যাস বা মায়ার (illusion) মত সচরাচর না ঘটলেও, একেবারে

২০ Murphy—A Briefer General Psychology. P. 180.

২১ Boring, Langfeld and Weto—Psychology P. 93.

বিরল নয়; এমন অভিজ্ঞতা সুস্থ মানুষেরও ঘটে। ধর্মপুস্তকে দৈববাণী বা দেব-দর্শনের অভিজ্ঞতাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে hallucinationই বলা হবে। যদি এ অভিজ্ঞতা কোন ব্যক্তিতে বারে বারেই ঘটে, তবে তা মানসিক বিকার বলে সন্দেহ করতে হবে। এখানে কল্পনার প্রভাব অতিমাত্রায় প্রবল। অধ্যাস বা Illusion (রজ্জুতে সর্পভ্রম) এর মত, এ অভিজ্ঞতাও স্পষ্ট এবং বিশ্বাস-উৎপাদক। এই জাতীয় দুই অভিজ্ঞতাই ভ্রমাত্মক। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অধ্যাসের বেলায় অভিজ্ঞতার কিছু একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে, যেমন অন্ধকারে আঁকা বাঁকা দড়িটা দেখেই, 'সাপ' বলে চমকে উঠেছি। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের বেলায়, অভিজ্ঞতার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সম্ভবতঃ, মস্তিষ্কের ভিতর থেকে কোন বৈদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়কে উদ্রিক্ত করেছে। "অধ্যাসের বেলায় ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ অবস্থায়ই আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কোন বস্তু দ্বারাই তারা প্রভাবিত; কিন্তু পূর্বের কোন স্থায়ী অভ্যাস বা সংযোগ হেতু অথবা অন্য কোন কারণে, মনে কোন দ্রব্যের উপস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মে। ...কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের বেলায় যে ভুল ধারণাটী জন্মে, সেটা অংশতঃ বা পূর্ণতঃ ইন্দ্রিয়াদি ও তার স্নায়ুসম্বন্ধগুলির মধ্যে কোন বিকৃতির ফল। যেমন, জর বিকারের প্রলাপের মধ্যে রোগী ইঁদুর বা সাপের কথা বলে। সত্যই সে ইঁদুর বা সাপ দেখে, কারণ ইঁদুর বা সাপ দেখলে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ও ইন্দ্রিয়-গুলিতে যে পরিবর্তন ঘটত, বিকারের ফলে তার ভেতর থেকেই সেই পরিবর্তন ঘটে।...অমূল প্রত্যক্ষের একটি কারণ হচ্ছে, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহের প্রকৃতি ও পরিমাপের পরিবর্তন, এবং ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের বিকার। রক্তের মধ্যে এ্যালকোহল, আফিম, ইথার, ক্লোরোফর্ম অথবা অনুরূপ কোন বিষপদার্থ সঞ্চিত হ'লে, সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসক্রিয়া মন্দীভূত হওয়াতে রক্তে কার্বোনিক এ্যাসিড্ সঞ্চিত হয়, এবং তার ফলে মস্তিষ্কের বোধকেন্দ্রগুলি অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়।"[২২]

অনেক সময় অধ্যাস ও অমূল প্রত্যক্ষের মিশ্রণ ঘটে। স্বপ্নের বেলায় এ রকম প্রায়ই হয়। প্রথম দিকে বাহ্য একটা উত্তেজক কারণ থাকে বটে, কিন্তু যে ছবি ক্রমে ফুটে উঠতে থাকে, তা শেষটায় সেই প্রথম উত্তেজকের সঙ্গে

---

২২ Stout—Manual of Psychology, Pp. 447-448.

সম্পর্কশূন্য। যেমন, জানালা খুলে শুয়েছি, বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে। স্বপ্ন দেখলাম, সমুদ্রে ভেসে চলেছি। এমন সময় একটা কাঠের গুঁড়িকে আঁকড়ে ধরলাম (কোল বালিশ বুকের কাছে জড়িয়েছি); হঠাৎ কাঠটা বাঘ হয়ে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল, এবং আমার নাকের উপর থাবা মারল (হয়তো এক ফোঁটা বৃষ্টি নাকের উপর পড়েছে)। আমি তখন বললাম 'আমার খিদে নেই।' আর তখনি বাঘটা একটা জাহাজ হয়ে গেল ইত্যাদি।

ষ্টাউট্ অমূল প্রত্যক্ষের দৈহিক বা স্নায়বিক কারণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড্‌পন্থীরা মনে করেন, অবচেতন মনের ক্রিয়াই এর মূল কারণ। অবচেতন মনে সংঘাতই অনেক সময় অমূল প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। স্বপ্নের মত এ-ও সম্ভবতঃ কোন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পন্থা। এটা মানসিক বিকারের লক্ষণ। বাস্তবিকপক্ষে উন্মাদ রোগগ্রস্থদের মধ্যে, অমূল প্রত্যক্ষ অস্বাভাবিকভাবে প্রবল।

স্থান বা দেশ প্রত্যক্ষণ—Perception of Space—সমস্ত প্রত্যক্ষণের মধ্যেই স্থান বা দেশ (space) সম্বন্ধে বোধ থাকে। স্থান বা দেশ বলতে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, ঘনত্ব, দূরত্ব, আয়তন এই সবই বোঝায়; প্রত্যেক সংবেদনের মধ্যেই সম্ভবতঃ দেশ বা স্থান-বোধের বীজ অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। আমরা কোন জিনিষ যখন স্পর্শ করি, তখনই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ ত্বকের খুব নিকট কয়েকটি স্থানের বিশেষ বোধের (local signs) মধ্য দিয়ে, বস্তুটি কতকটা জায়গা জুড়ে আছে (extensity) এই অস্পষ্ট বোধ জাগায়। পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার ফলে, এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায়, এ বোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থান বা দেশ বোধ জাগ্রত করবার পক্ষে, চক্ষু ও ত্বক সকলের চেয়ে বেশী সহায়ক।

দেশ বা স্থানের ধারণার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে, আমরা জেমস্, ষ্টাউট্ ও ওয়ার্ডের অনুসরণ করে বলব, যে সংবেদনের প্রাথমিক বিস্তারবোধই (extensity) ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ফলে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ, বিস্তার দূরত্ব ইত্যাদি সুস্পষ্ট বোধে পরিণত হয়। এটা মানুষের মনের ধর্ম যে কোন দ্রব্য বা ঘটনার বোধ হতে হলে, স্থানে বা দেশে না সাজিয়ে নিয়ে ব্যক্তি তার তাৎপর্যবোধ করতে পারে না। এই অর্থে এটা প্রাক্-অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক

ব্যক্তিমনের একটি রূপ (a priori subjective form)। কিন্তু এর সুস্পষ্ট বিকাশ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ (a posteriori)।

স্পর্শ ও পেশীসঞ্চালন দ্বারা দ্রব্যের ঘনত্ববোধ—Tactual perception of solidity—একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে। তা একটি তল (surface)। স্পর্শ ও পেশী সঞ্চালন দ্বারা (Kinaesthesis) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বোধকে সমন্বয় করে নিলেই, তলের বোধ জন্মিবে। চোখ ব্যবহারের দ্বারা অনুরূপভাবেই তলের বোধ বিকশিত হয়। দু'টি তলের সমন্বয়ে ঘনত্ব বোধ জন্মে। নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় স্পর্শের দ্বারা এটা ঘটে।

স্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারা বস্তুর অবস্থান নির্দেশ—Localisation of objects through touch and vision—যখন কোন দ্রব্যকে জানি, তখন তার অবস্থানও বোধ করি। অবস্থান মানে হল, দ্রব্যটি আমার কোন্ দিকে, এবং কতদূরে (direction & distance) আছে। এটা সক্রিয় স্পর্শ, পেশীসঞ্চালন ও সক্রিয় দৃষ্টি দ্বারা জানি। দ্রব্যটি বাঁ দিকে হলে, চক্ষু বা ঘাড় একভাবে ঘুরাই, ডানে হলে, বিপরীত দিকে ঘুরাই। উপরে হলে, ঘাড় চিৎ করে বা অক্ষিগোলক উপর দিকে সঞ্চালন করে দেখি ; নীচের দিকে হলে, বিপরীত। ডালের উপরের পেয়ারাটি পাড়তে হাত উপরের দিকে বাড়াই ; মেঝ থেকে বইটি তুলতে, উপর হয়ে মাথা নীচু করে হাত নীচে বাড়াই। দিক্-বোধ তাই নির্ভর করে পেশী ইত্যাদি সঞ্চালনের প্রকৃতির উপরে।

আর দূরত্ব বোঝা যায়, পেশী-ক্রিয়াজনিত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা। বেশী উঁচু বা বেশী নীচুতে কোন দ্রব্য স্পর্শ করতে হলে, পরিশ্রম বেশী হয় ; কোন জিনিষ হাত বাড়িয়ে ধরতে যদি পরিশ্রম বেশী হয়, তবে তা দূরে ; পরিশ্রম কম হলে তা কাছে। যদি হাতের নাগালের বাইরে হয়, তবে সে জিনিষটির কাছ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তা ছুঁতে, পা এবং অন্যান্য অঙ্গের পেশীর পরিশ্রম যতটা হয়, তা দিয়ে মাপ করি তার দূরত্বের। পা'টিকে মাপকাঠি করলে, পর পর পা কতবার ফেললে জিনিষটির কাছে পৌঁছা যায়, তা দিয়ে বলি, "অত ফুট দূরে।"

দৃষ্টি দ্বারা দূরত্ব কি ভাবে বোঝা যায়?—Visual perception of distance—চক্ষু তো দূরের দ্রব্য পর্যন্ত ছুটতে পারে না, দ্রব্যকে সাক্ষাৎ-ভাবে স্পর্শও করতে পারে না। তা হ'লে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দূরত্ব পরিমাপ

করি কি করে? বিশপ্ বার্কলে এজন্ত এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, চোখের পক্ষে দূরত্ববোধ প্রত্যক্ষ ব্যাপার নয়, এটা অনুমান-সাপেক্ষ। যখন কোন দ্রব্যের দূরত্ব সক্রিয় স্পর্শ এবং পেশীসঞ্চালনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে চোখও ব্যবহার করি। এটা একবার নয়, বহুবার ঘটে। সুতরাং চোখও দূরত্ব বোধ আয়ত্ত করে (acquired perception)। চক্ষু কতগুলি চিহ্নকে দূরত্বজ্ঞাপক বলে বুঝতে শিখে। এই বোধ অতীত অভিজ্ঞতা-নির্ভর, এবং দ্রুত অনুচ্চার অনুমানসাপেক্ষ।[২০]

চক্ষুদ্বারা দূরত্ববোধ-বিধায়ক চিহ্নসমূহ—Visual signs of distance.

(১) একই দ্রব্য দূরে থাকলে ছোট দেখায়। দূর থেকে কোন ষ্টীমারকে এক ক্ষুদ্র বিন্দুর মত দেখায়, কাছে আসলে তা প্রকাণ্ড দেখায়। বাস্তবিকপক্ষে অক্ষিপটে দূর জিনিষের ছায়া, কাছের জিনিষের ছায়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর। কাজেই অন্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, চোখে প্রতিফলিত ছবির ক্ষুদ্রাকৃতি, দ্রব্যের দূরত্ব বোঝায়। এ চিহ্ন ব্যবহার করেই, শিশুকে আমরা দ্রব্যের দূরত্ব অনুমান করতে শিক্ষা দিই, এবং ছবি আঁকার বেলায়ও এ কথাটি আমরা মনে রাখি। জ্যাঙ্গুইল্ এবং মান্ এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছেন,—তা হল এই যে, অক্ষিপটে বস্তুর ছবির এরকম হ্রাসবৃদ্ধি (apparent variation in the size of the visual image) সত্ত্বেও, আমরা বিশ্বাস করি যে, বস্তুর প্রকৃত আয়তনের (real dimension) কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নি। দ্রষ্টার অবস্থান ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য দ্রব্যের আকৃতিও বিভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, যেমন একটি গোলাকৃতি জিনিষ সোজাসুজি উপর দিক হতে গোল দেখালেও, দূর থেকে এবং একপাশ থেকে ডিম্বাকৃতি দেখায়। তথাপি দর্শক এ ভুল করে না যে দ্রব্যটির বাস্তবিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। দর্শক এ পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে, দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট আয়তন ও আকৃতি আছে, তা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে। একে মান্ **perceptual constancy** বলেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, যে সত্য প্রত্যক্ষণ, অভ্যাসের উপর এবং অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এ জন্যই এ্যাঞ্জেল (Angell) বলেছেন যে "a fully developed

---

২০ Stout—Manual of Psychology, P. 478.

perception is simply a kind of habit.''[২৪] নূতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার নিরিখেই ব্যক্তি যাচাই করে, এবং প্রত্যেক নূতন প্রত্যক্ষণের বেলাতেই নূতন ও পুরাতন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে, কাজেই Angell ঠিকই বলেছেন যে, 'a perception is a synthetic experience, and the combination of the new and th• old is the essential part of the synthesis.''[২৫]

আমরা আলোচনার ধারা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছি। আমরা আলোচনা করছিলাম, কি চিহ্ন দ্বারা চোখ দ্রব্যের দূরত্ব অনুমান করে? প্রথম চিহ্নটি হল, দ্রব্যের যে ছবি অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয়, তার আয়তনের পরিবর্তন। এবার অন্য চিহ্নগুলি আলোচনা করা যাক।

(২) দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখায়, কাছের জিনিষ স্পষ্ট দেখায়। দূর থেকে কোন দ্রব্যের রূপরেখাটি তত তীক্ষ্ণ (sharp outline) বোধ হয় না। সেই দ্রব্যই কাছে আসলে তা তীক্ষ্ণতা লাভ করে। দূর থেকে দ্রব্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ পরিষ্কার চোখে পড়ে না। নিকট থেকে দ্রব্যের রূপ-রেখাটিই শুধু স্পষ্ট হয় না, তার সমস্ত অংশগুলি এবং তাদের সম্বন্ধ পরিষ্কার চোখে দেখা যায়। কাজেই অন্য সমস্ত অবস্থা এক থাকলে, একটি দ্রব্যের ছবিটি যখন সুস্পষ্ট, তখন বুঝি জিনিষটি কাছে। মীরা অরোরার সালোয়ার কামিজের ছিট্‌টার প্যাটার্ণ স্পষ্ট দেখছিনা, ওর গলায় ঝুলানো ষ্টেথিস্কোপটিও ভাল দেখা যাচ্ছে না, কাজেই বুঝি শ্রীমতী এখনও কিছুটা দূরে আছে। কাছে আসলে তার ছিটের জামা কাপড়ে ফুলের ডিজাইন্ স্পষ্টই দেখতে পাই। দেখি ওর ষ্টেথিস্কোপের মুখের ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের ঢাকনাটি, ওর কানের দুলের মুক্তাগুলি, এমনকি গালের ছোট তিলটিও।

(৩) দূরের জিনিষের কখনো কখনো রংয়ের পরিবর্তন হয়—এও দূরত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন। কাছে নন্দনপাহাড় রুক্ষ ধূসর, মাঝে মাঝে গাছপাতার সবুজ ছোপ। কিন্তু চার মাইল দূর মতিনগর থেকে এই পাহাড়কে দেখায় ঘননীল। তখন বুঝি পাহাড় অনেক দূরে।

(৪) আলোছায়ার পার্থক্যও দূরত্ব জ্ঞাপন করে। পাহাড়ে যে অংশটা

---

২৪ Munn—Psychology, P. 328.
২৫ Angell—Psychology, p. 159.

দৃষ্টি থেকে দূরে, তা অন্ধকার। এই আলোছায়ার পার্থক্য দ্বারা শিল্পী কাছের ও দূরের পার্থক্য বোঝান। এটি একটি সুপরিচিত কৌশল, এই দুইটি চিহ্নকে aerial perspective বলে।

(৫) দুটি সমান্তরাল রেখা দূর দিগন্তে গিয়ে ক্রমশঃ মিলে যায় বলে বোধ

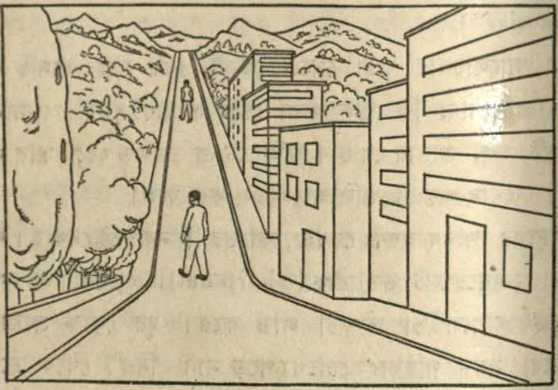

Fig. 40. Geometrical perspective, after Woodworth & Marquis. Psychology—Fig. 105 P. 449.

হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে তা অসম্ভব। ইহাও দূরত্ব জ্ঞাপক একটি সুপরিচিত চিহ্ন, যা শিল্পীরা প্রায়শঃই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৬) নিকটের দ্রব্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে, চোখের ভিতরের উভয়দিকে-উত্তল লেন্সের দুই মাথায় চাপ দিয়ে লেন্সের উত্তলতা (convexity) বাড়াতে হয়। এজন্য লেন্স-সংলগ্ন সিলিয়ারী পেশীগুলির সক্রিয়তা প্রয়োজন। কিন্তু দূরের জিনিষের দিকে তাকাবার সময় লেন্সের উত্তলতা বাড়াতে হয় না, কাজেই সিলিয়ারী পেশীর কোন পরিশ্রম হয় না।

(৭) কোন চলন্ত যান থেকে বাইরের দিকে তাকালে, সামনের জিনিষগুলি দ্রুতবেগে বিপরীত দিকে সরে যায়, কিন্তু যে জিনিষ যত দূরে, তা তত কম দ্রুতবেগে অর্থাৎ ধীরে ধীরে ধরে সরে যায়। একে বলে Parallax।[২৬] এটা

২৬ Parallax: One of the conditions upon which the perception of relative distance depends, when movement at right angles to the line of vision alters the relative position of two unequally distant objects. Drever—Dictionary of Psychology, P. 197.

দৃষ্টিদ্বারা দূরত্ব বোধের একটি চিহ্ন। এই চিহ্নগুলি এক চোখ বা দুই চোখ দিয়ে দেখা (monocular and binocular vision) দুই ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

কিন্তু কতকগুলি চিহ্ন আছে যেগুলি কেবলমাত্র যখন দুই চোখ ব্যবহার করা যায়, তখনি কাজে লাগে। নীচে সেই চিহ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

(ক) দুই চোখ যখন একই দ্রব্যের দিকে ফেরানো যায়, তখন অক্ষিগোলক দুটিকে সেই একই দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ করতে অক্ষিগোলক-সংলগ্ন পেশীগুলি সংকুচিত বা প্রসারিত করতে হয়। দ্রব্যটি কাছে হলে পেশীর পরিশ্রম বেশী হয়, দূরে হলে পরিশ্রম কম হয়। দুই অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে (Yellow spot) দ্রব্যটির স্পষ্ট ছবি ফুটলে, তবেই দ্রব্যটি আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু দুটি অক্ষিগোলকই ঠিক ঠিক ভাবে দ্রব্যটির দিকে নিবদ্ধ হলে, (convergence of the eyeballs on the object) তবেই দুই চোখের পীতবিন্দুতে দুইটি ছবি এক হয়ে স্পষ্ট ছবি ফোটে, এবং দূরত্বের ধারণাও জন্মে। একটি অক্ষিগোলকে একটি আঙুল দিয়ে টিপে কোন দ্রব্যের দিকে তাকালে একই দ্রব্যের, দুটি ভিন্ন ভিন্ন ছবি চোখে দেখি।

(খ) দুটি চোখে যে দুটি ছবি ফুটে, তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা, এবং স্পর্শের সহায়তায়, আমরা দুটি ছবিকে এক করে দেখি। যত দূরে দ্রব্যটি থাকে, ততই তাদের মধ্যে পার্থক্য কমে এবং নিকট থেকে দেখলে, দুটি চোখের ছবিতে পার্থক্য বেশী হয়। এবং পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি ছবিকে এক করে দেখতে যে মানসিক পরিশ্রম, তা দূরত্ব বোধের একটি চিহ্ন।

চক্ষুর দ্বারা ঘনত্ব বোধ—Visual perception of solidity—স্পর্শের সঙ্গে নিকট সহযোগিতা ও অভ্যাসের দ্বারাই চোখের পক্ষে ঘনত্ববোধ সফল ও সুস্পষ্ট হয়, এবং দূরত্ববোধের অনেকগুলি চিহ্নই ঘনত্ব বোধেরও চিহ্ন। বাস্তবিক-পক্ষে ঘন দ্রব্যের (solids) বিভিন্নতল দ্রষ্টার নিকট হতে বিভিন্ন দূরত্বে থাকে। কাজেই ঘনত্ববোধ ও দূরত্ববোধ বাস্তবিকপক্ষে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত।

এখানেও দুই অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে দুটি ছবির ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের এক করে দেখার চেষ্টাতে, দূরত্ব ও ঘনত্ববোধ স্পষ্টতা লাভ করে। Stereoscope যন্ত্রের সাহায্যে এটা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। এ যন্ত্রে দুটি ছবি দুটি

চোখের সামনে এমন ভাবে রাখা হয়, যাতে দুই চোখে দুইটি ছবি পৃথক দেখা যায়। চোখের সামনে দুটি আতসকাঁচ থাকে, তার মধ্য দিয়ে ছবিগুলিকে বড় করে দেখা যায়। ছবি দুটির মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকে (দুটি চোখের মধ্যে যতটা দূরত্ব, দুটি ক্যামেরার লেন্স দুটিকেও ঠিক ততদূর দূরত্বে রেখে একই দৃশ্যের ছবি তোলা হয়)। ছবি দুটি একটি ফ্রেমে চোখের সামনে রাখা হয় এবং এ ফ্রেমটিকে (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে ছবি দুটিকে) সামনে পিছনে আনা যায়। এ রকম ভাবে সামনে পিছনে আনতে আনতে, হঠাৎ দুটি ছবি এক হয় এবং ঘনত্ব ও দূরত্বের বোধ নিয়ে চোখের উপর ফুটে উঠে। ছবি দুটি তো একটি তলে (surface) আঁকা, কিন্তু দুই চোখ ব্যবহারের ফলে উপরি উক্ত চিহ্নগুলির সক্রিয়তায় ঘনত্ব ও দূরত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধে পরিণত হয়।

আলো ছায়ার বিভিন্নতা (একটি বৃত্ত অংকন করে এক দিকে একটু অসমান shade দিলেই একটি বল বুঝাবে), আকৃতি পরিবর্তন (যেমন, সম-চতুষ্কোণ

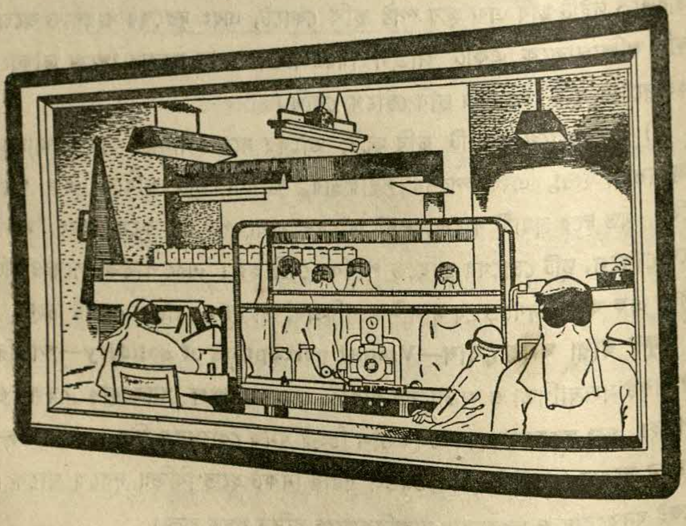

Fig. 41. Visual signs of solidity and relative distance.

দ্রব্যকে বরফির মত), সমান্তরালতার পরিবর্তন, কোণের পরিবর্তন (সমকোণকে সূক্ষ্মকোণে) দ্বারা শিল্পীও কাগজের তলে আঁকা ছবিতে ঘনত্বের বোধ সঞ্চার করেন। এই আপাত পরিবর্তনগুলিকে Geometrical perspective

(জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত) বলা হয়।[২৭] উপরে দুইটি ছবি দিয়ে এটা বোঝাতে চেষ্টা করা গেল। এখানে দেখা যাবে, যে চিহ্নগুলি দূরত্ব বোধ জন্মায়, তাহা ঘনত্ববোধেরও সহায়ক।[২৮]

গতিবোধ—Perception of motion—গতি হচ্ছে বস্তুর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন। এই বোধ স্পর্শ, এবং পেশী-কণ্ডরা-অস্থিসন্ধির সঞ্চালন দ্বারা পাওয়া যায় এবং দৃষ্টির সাহায্যেও পাওয়া যায়। গতিশীল বস্তু আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলে আমরা দেখি, দ্রব্যটির বিভিন্ন বিন্দু একটির পর একটি আঙ্গুলের মাথায় এসে লেগে সরে যাচ্ছে, যদিও আমরা হাত নাড়াই না। অথবা যদি দ্রুত ঘূর্ণ্যমান বস্তু না হয়, তা হলে চলমান দ্রব্যটির উপর হাত রাখলে, হাতটিও বিনা চেষ্টায় চলতে আরম্ভ করবে। সক্রিয় স্পর্শ দ্বারাও আমরা দ্রব্যের গতি বুঝতে পারি। বিপরীত দিকে হাত চালালে আমরা বেশ একটা বাধা বুঝতে পারি। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর দ্রব্যের অবস্থা পরিবর্তন নির্ভর কচ্ছে না, কাজেই সহজেই বুঝতে পারি, গতিটা আমার নয়, গতিটা দ্রব্যের। চক্ষু দ্বারাও প্রত্যক্ষভাবে গতি বোধ করতে পারি। নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি দ্বারা দ্রব্যটির দিকে তাকালে, দ্রব্যের বিভিন্ন বিন্দুর ছায়া একটির পর একটি অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে প্রতিফলিত হতে থাকে। অথবা সক্রিয় দৃষ্টি দ্বারা দেখি, চলমান দ্রব্যের কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে নিবদ্ধ রাখতে হলে, ঘাড় বা চোখ অনবরত ঘুরাতে হয়। অর্থাৎ ঘাড় ও অক্ষিগোলক সংলগ্ন পেশীর শ্রমের পরিমাণ ও প্রকৃতি দ্বারা, গতির বেগ এবং পথ আমরা বোধ করতে পারি।

সময় বোধ—Perception of time—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ ইত্যাদি সময়জ্ঞাপক ধারণা। এই ধারণাগুলিকে দুটি দলে ভাগ করা যায়—পারম্পর্যবোধ (succession) এবং স্থিতিকালবোধ (duration)। এগুলি শুদ্ধ ধারণা (abstract ideas)। এতে পৌছতে, বুদ্ধির অনেকটা বিকাশ প্রয়োজন। এবং সমস্ত শুদ্ধ ধারণার মত, এই ধারণাগুলিতে পৌছতেও প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, তুলনা, প্রভেদ, বর্জন (elimination of elements which are not common) এবং সামান্যী করণ (generalisation) প্রয়োজন।

---

২৭ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 448.

২৮ জেম্‌সের মতে চক্ষুর দ্বারা দূরত্ব ও ঘনত্ব বোধ অনুমান-সাপেক্ষ নয়। চোখের পক্ষে এ বোধ প্রত্যক্ষ এবং চোখের দ্বারা এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর বোধ জন্মে।

এ কাজ বিশ্লেষণ ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। কিন্তু সময় বোধের প্রত্যক্ষণমূলক ভিত্তি কি?

কোন ঘটনা যখনই আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখনই বোধ করি, এটা কতকটা সময় জুড়ে ঘটছে। এই ঘটনাটি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে আছে সময়-ব্যাপ্তি বা স্থিতিকালবোধ। এ বোধকে ষ্টাউট্ নাম দিয়েছেন Protensity। স্থিতিকালের স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা (যেমন—ঘণ্টা, মিনিট, সপ্তাহ ইত্যাদি) প্রত্যক্ষমূলক এই অস্পষ্ট বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্লেষণ বিচার-বিবেচনা দ্বারা, ঘটনার অন্য সমস্ত উপাদানকে বাদ দিয়ে, এই সামান্য গুণটিকে আমরা নির্দিষ্ট, নির্ভুল, সর্বত্র সর্ব অবস্থায় ব্যবহার্য, একটি বৈজ্ঞানিক একক দ্বারা পরিমাপ করি, যেমন পাঁচ মিনিট, দুই ঘণ্টা, তিন বৎসর, এক শতাব্দী ইত্যাদি। অবশ্য দীর্ঘতর কালব্যাপ্তি, যেমন—শতাব্দী, আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বোধ করিতে পারি না। কিন্তু কাছে ঘড়ি না থাকলেও, পাঁচমিনিট ও আধঘণ্টার তফাতটা আমাদের বোধের মধ্যে ধরা পড়ে। অবশ্য আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা, আমাদের কালব্যাপ্তি বোধকে প্রতারিত করে,—যেমন আনন্দের দিনে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখার তিনঘণ্টা যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়; আবার নববিরহীর কাছে স্ত্রীর নিকট হতে বিচ্ছেদের দুটি দিনও যেন এক যুগ বলে মনে হয়। বিজ্ঞান তাই ব্যক্তিগত মানসিকতা-ভিত্তিক সময়ের পরিমাপকে বিশ্বাস করে না। সে তাই চিন্তা বিবেচনা করে সময়ের এক একটি বস্তুগত মাপক স্থির করে, যা ঘড়ির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সময়ের এই ঘটনানিরপেক্ষ মাপ বিশুদ্ধ-ধারণা-নির্ভর (abstract concept)।

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বোধ—প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে যেমন কালব্যাপ্তির একটি অস্পষ্ট বোধ থাকে, তেমনি কালপ্রবাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বোধও থাকে। একটি ঘটনার পরে আর একটি ঘটনা যখন ঘটে, তখন দুটি ঘটনার মধ্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা পরিবর্তনের যোগসূত্র (experience of transience) আমাদের প্রত্যক্ষণের মধ্যেও বোধ করি। "যখন আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি, তখন হঠাৎ বিজলী বাতির সুইচ্ টিপে আলো জেলে দিলাম। এ ঘটনার বিবরণ দিতে যদি আমরা বলি, প্রথমে ছিল অন্ধকারের প্রত্যক্ষণবোধ, এবং ঠিক তারই পরে এলো আলোর বোধ, তা হলে ঘটনার বিবরণটি অসম্পূর্ণ হল; এর সঙ্গে এটাও যোগ করতে হবে যে, এই দুই বোধের

মধ্যে পরিবর্তনটিও অদ্ভুতভাবে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি। যে অনুভূতি আমাদের এ ক্ষেত্রে হয়, তা শুধুমাত্র অন্ধকার তার পরেই আলোর অনুভূতি নয়, এ হল অন্ধকার আলোতে পরিবর্তিত হল, সেই অনুভূতি।"[২৯]

পরিবর্তনের এই প্রত্যক্ষবোধই আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই সুস্পষ্ট কালবিভাগের মূল। এই বিভাগের মধ্যবিন্দু হল বর্তমান। অতীত ও ভবিষ্যৎ আপেক্ষিক। বর্তমানের তুলনায়ই কোন কাল অতীত বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমানও তো একটি স্থির বিন্দু নয়। কালপ্রবাহ তো কোথায়ও স্থির হয়ে নেই, এর মন্ত্র হল 'চরৈবেতি'। এই মুহূর্তকেই যদি বর্তমান বলি, তবে এ ক'টা কথা লিখতে লিখতেই তা অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে। এবং পূর্বমুহূর্তেও যা ছিল ভবিষ্যৎ, তা বর্তমানে ক্ষণকাল পদক্ষেপ করেই, অতীতে মিলিয়ে গেল। সুতরাং, শুদ্ধ ধারণার দিক থেকে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সীমাজ্ঞাপনকারী কাল্পনিক একটি সদাসঞ্চরমান জ্যামিতিক রেখা। উইলিয়ম্ জেমস্ এই কাল্পনিক বর্তমানকে বলেছেন আমাদের উপনিষদের ভাষায়, 'ক্ষুরস্য ধারা' (knife-edge)। কিন্তু আমাদের বর্তমানের বোধ বিস্তারহীন জ্যামিতিক রেখা নয়,—"সংক্ষেপতঃ যে বর্তমানকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা 'ক্ষুরস্য ধারা' নয়, তা যেন ঘোড়ার পিঠে বসবার স্যাড্‌ল, যাহার সামনে পিছনে নিজস্ব কিছু বিস্তার আছে, যেখান থেকে সময়ের সামনে ও পিছনের দিকে আমরা তাকাতে পারি। কাজেই কালের প্রত্যক্ষবোধের যে একক, তার কিছু বিস্তার আছে জাহাজের সামনে ও পিছনের মত, এর এক মুখ ভবিষ্যতের দিকে, এবং আর এক মুখ অতীতের দিকে।[৩০] বাস্তবিক প্রত্যক্ষ বোধের এই বর্তমানকে জেম্‌স্ বলেছেন 'specious present'—অলীক বর্তমান বোধ।

"অতীত ও ভবিষ্যতের বোধ প্রত্যক্ষণের স্তরে অত্যন্ত প্রাথমিক। কিন্তু এই স্তরেও 'এখনও নয়' এবং 'আহা নেই' ('not-yet' consciousness and a "no-more" consciousness) বোধ থাকে। মনোযোগে প্রতীক্ষার ভাবের মধ্যেই, যা আসছে তার জন্যে প্রস্তুতির মধ্যেই, 'এখনও নয়', বোধটি জড়িত থাকে। এই 'এখনও নয়' বোধটি তীব্র হয়, যখন ইচ্ছা বা ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হয়, যেমন ক্ষুধার্ত কুকুর যে হাড়টির জন্য লালায়িত হয়ে

২৯ Stout: Manual of Psychology, Pp. 496-497.

৩০ James—Principles of Psychology, Vol.—1, P. 609.

আছে কিন্তু যা এখনও পায় নি, সেখানে এই 'এখনও নয়' ভাবটি তীব্র। এখানে যে বর্তমান শুধু দীর্ঘায়িত হচ্ছে তা নয়, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের প্রভেদ বোধও তীক্ষ্ণ হয়। 'আহা নেই' এই বোধটি খুব স্পষ্টভাবে বোধের মধ্যে প্রকাশ পায়, যদি তৃপ্তিদায়ক ইচ্ছা বা ক্রিয়ার বস্তু হঠাৎ অপসারিত হয়ে নৈরাশ্য জন্মায়। উপকথার কুকুরটি যে হাড়টি চিবিয়েছে, তার প্রতিবিম্ব জলে দেখে, তা ফেলে দিলে পর, তার মনে 'আহা, আর নেই' বোধটি নিশ্চয়ই খুব তীব্র হয়েছিল।"৩১

শিশুর মনের মধ্যে কল্প সৃষ্টির (imagination) ক্ষমতা প্রবল হ'লে কালের এই প্রভেদবোধ সুস্পষ্টভাবে জন্মে। সালী (Sully) একটি উদাহরণ দিয়ে, 'আহা, নেই' বোধের বিকাশ শিশুর মনে কি ভাবে হয় তা বুঝিয়েছেন। "একটি শিশু একটি মনোহর দ্রব্য প্রকাশ্যভাবে দেখছে,—ধরা যাক্, সে তাহার নার্সারীর দেয়ালে রৌদ্র রশ্মির খেলা দেখছে। হঠাৎ মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল, এবং সোনালী আলোর মনোমুগ্ধকর নৃত্যলীলার অবসান ঘটল। কিছুক্ষণ আগে যেখানে ছিল সোনার আলোর উজ্জ্বল ঐশ্বর্য, সেখানে দেখা দিল, নিতান্ত সাধারণ বিবর্ণ দেয়াল-আবরক কাগজ (dull commonplace wallpaper); তার মনের মধ্যে সোনালী আলোর নাচনের সুন্দর ছবিটি গেঁথে আছে, এবং মন তাতেই আকৃষ্ট হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এলো নিরস বর্তমান অভিজ্ঞতা, আলোশূন্য দেয়ালের দৃশ্য। সুতরাং এখানে বর্তমান অভিজ্ঞতার রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গেই রয়েছে যা এই মাত্র গত হল তার স্মৃতি (represented experience), এবং এই দুয়ের প্রভেদ-বোধ সুস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা এখানে বিদ্যমান।" ৩২

সাধারণভাবে এ কথা বলা যায়, যে সময়ের বোধ মনোযোগের উপর নির্ভর করে। 'আহা, নেই'! এই প্রাথমিক বোধ, যা এইমাত্র গত হল এমন বস্তুর উজ্জ্বল স্মৃতি, এবং বর্তমান বাস্তব অবস্থার রূঢ় প্রত্যক্ষণের প্রভেদ-বোধের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। এটা মনোযোগ-সাপেক্ষ। তেমনি, 'এখনও নয়,' এই প্রাথমিক বোধ, মনোযোগের মধ্যে প্রতীক্ষার যে উপাদান থাকে, তার উপর নির্ভর করে।

---

৩১ Stout—Manual of Psychology, Pp. 498—'99.

৩২ Sully—The Human Mind, Vol. I, Pp. 420-321.

আর 'বর্তমান' এই প্রাথমিক বোধের মূলেও আছে বাস্তব সংবেদনের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা।[৩৩]

কালব্যাপ্তি বোধের বেলায়ও একথা সত্য যে, এর সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক আছে। যেখানে উদ্দীপকগুলি একঘেয়ে, অথবা অতি দ্রুত এবং বহু সংখ্যায় একটির পর একটি ভীড় করে এসে দাঁড়ায়, সেখানে মনোযোগ ক্রিয়া সহজ ও মসৃণ হয় না এবং এ সব ক্ষেত্রেই সময় দীর্ঘ বলে মনে হয়। কিন্তু যেখানে বিষয়বস্তু প্রীতিপ্রদ, এবং মনোযোগের গতি ঘটনা বা বিষয়ের এক অংশ থেকে অপর এক অংশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে, সেখানে সময়ক্ষেপ হ্রস্ব বলে বোধ হয়।

দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান-বোধ সম্পর্কে মায়ার্স কতগুলি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মোটামুটি একথা বলা যায় যে, যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত হ্রস্ব, তাকে আমরা বাস্তবিক ব্যবধান অপেক্ষা দীর্ঘতর বলে বোধ করি, এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে হ্রস্বতর বলে বোধ করি। আর একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাবহুল কালের ব্যবধানকে (filled interval), ঘটনা-বিরল কাল ব্যবধান (empty interval) অপেক্ষা দীর্ঘতর মনে হয়।[৩৪]

কিন্তু এখানেও ষ্টাউটের কথাই সত্য বলে মনে হয়, যে সময় সম্পর্কে সমস্ত প্রকার-বোধের পরিমাপই মনোযোগের স্বাচ্ছন্দ্যতা বা অস্বাচ্ছন্দ্যতার দ্বারা প্রভাবিত।[৩৫]

Pre-perception—এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও সহযোগিতা করে। পুনঃ পুনঃ এ প্রকার সহযোগিতার ফলে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধের অস্পষ্ট স্মৃতিও সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাকে জটিলতর করে তোলে। একে ষ্টাউট্ বলেছেন—**complication**। ওয়ার্ড বলেন, "বরফ দৃষ্টিমাত্রই অগ্রিম তার শীতল স্পর্শানুভূতিও জন্মে, মাংসের চপ ভাজার গন্ধের সঙ্গে অগ্রিম তার স্বাদ বোধ

---

৩৩ Stout—Manual of Psychology, Pp. 499-500.
৩৪ Myers—Textbook of Experimental Psychology, Pp. 297-299.
৩৫ Stout—Manual of Psychology, P. 501.

করি।[৩৬] এখানে স্মৃতি বা ধারণা প্রত্যক্ষবোধ থেকে অপৃথক।[৩৭] কোন এক ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর প্রত্যক্ষণ যখন অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত স্মৃতির সঙ্গে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন স্বভাবতঃ সেই বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলে, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত গুণের বোধ সম্বন্ধে প্রত্যাশা জন্মে এবং তার প্রত্যক্ষণ ত্বরান্বিত হয়, এবং প্রত্যক্ষণ দ্বারা বোধ সম্পূর্ণতর ও সুস্পষ্টতর হয়।[৩৮] এ ব্যাপারটিরই একটু চরম উদাহরণ **Synaesthesia**, যেমন কোন কোন ব্যক্তি নাকি কথাকেও রংয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।[৩৯]

সংপ্রত্যক্ষ (Apperception)—লাইব্‌নিজ্‌ স্পষ্ট প্রত্যক্ষণ ক্রিয়াকে বলেছেন এ্যাপারসেপসান্, বিশেষতঃ যে প্রত্যক্ষণক্রিয়ায় প্রত্যক্ষের বস্তুর সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি ঘটে,—যেখানে বস্তুটিকে পরিষ্কার চিনতে পারা যায়। হারবার্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে apperception কথার অর্থ কিছু সম্প্রসারণ করেন। তাঁর মতে, শিক্ষার অর্থই হল জ্ঞানের বস্তুকে অতীতে জ্ঞাত, অনুরূপ ও বিপরীত বহু বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে তার সম্পূর্ণ অর্থবোধ করা। একটি নূতন জিনিষ দেখলাম—দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটি বাদাম। আরো অনুসন্ধানে জানলাম, এ বাদাম সাধারণতঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী বালুকাময় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে; এ বাদাম অন্যান্য বাদামের মত শক্ত খোসার মধ্যে হয় না—ফলের বাইরে জন্মে; এ ফল কাঁচা অবস্থায় নরম ও তিক্ত এবং আঁঠালো থাকে। এ বাদাম ফল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রৌদ্রে শুকিয়ে,

৩৬ What we have in such cases is rather a pre-perception than a mere fore-thought. The ice is not merely thought of as cold, it has a cold look,

৩৭ Stout—Manual of Psychology, P. 105.

৩৮ Preperception : : the prepared set or attitude of readiness for an expected perception, or other experience generally involving an anticipator idea, which intensifies the clearness and vividness of perception. Drever—Dictionary of Psychology, P. 216.

৩৯ Synaesthesia : phenomena in which sensation in one sense department carry with them as it were sensory impressions belonging to another sense department, as in coloured hearing.

Rex & Margaret. Knight Modern Introduction to Psychology, Pp. 122-123.

তার পর উত্তপ্ত বালুতে ভাজা ভাজা করে কড়কড়ে করতে হয়। এ বাদামে স্নেহজাতীয় উপাদান, শর্করা, ও শ্বেতসার যথেষ্ট থাকে কিন্তু এতে ভিটামিনের পরিমাণ সামান্য; ইহা সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ ও রেচক; ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়, ইত্যাদি। এখানে এই অজানা জিনিষটিকে পরিচিত বহু জিনিষের বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বাঁধা হল, এরই নাম apperception। "এ প্রকারে যা ছিল বিচ্ছিন্ন খণ্ডমাত্র, তা অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে,—অন্যান্য বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে ইহা বহু শৃংখলে গ্রথিত হ'য়ে, তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং পূর্বের আহরিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কল্পনার বৃহৎ অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়—বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটি পরিপূর্ণতার মধ্যে এ একটি নির্দিষ্ট স্থান লাভ করে।"[৪০] যেখানেই প্রত্যক্ষণ ব্যাপার স্পষ্ট, যেখানেই এর পশ্চাতে সচেতন মনোযোগ ক্রিয়া করছে, সেখানেই অবশ্য Apperception বা সংপ্রত্যক্ষও আছে। যারা যত বেশী যার প্রত্যক্ষণ করতে পারে তারা তত বেশী বুদ্ধিমান।

ওয়েবার ফেক্‌নার বিধি—দুটি একই জাতীয় উদ্দীপকের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য যদি খুব সামান্য হয়, তা হ'লে তারা যে সংবেদন উৎপন্ন করবে তাদের মধ্যেও পার্থক্য করা খুব কঠিন। এবং উদ্দীপকের পরিমাণ বাড়ালে সংবেদনও যে তীক্ষ্ণতর হবে তা সাধারণ অভিজ্ঞতাতেই আমরা জানি। কিন্তু ওয়েবার উদ্দীপকের পরিমাণের সঙ্গে সংবেদনের পরিমাণের সম্বন্ধ ঠিক কি রকম, তার নির্ভুল একটি আংকিক ফর্মুলা আবিষ্কারে চেষ্টিত হলেন। তিনি বহু পরীক্ষা করে দেখলেন যে, উদ্দীপকের পরিমাণ সামান্য বাড়লে সংবেদনের তীক্ষ্ণতা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না। আর একটা জিনিষও পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, উদ্দীপকের পরিমাণ যেখানে বেশী নয়, সেখানে অতি অল্প পরিমাণে তা বাড়ালে সংবেদনে সেই প্রভেদটা (least perceptible difference) তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। উদ্দীপকের পরিমাণ যত বেশী হবে, তাকে সেই অনুপাতে ততটা বাড়ালে তবেই সংবেদনে প্রভেদটা ধরা পড়ে। এক ইঞ্চি একটি রেখাকে $\frac{১}{৫০}$ ইঞ্চি বাড়ালে তবে প্রভেদটা চোখে পড়ে। তার চেয়ে ছোট হলে তফাৎটা সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে বোঝা যায় না। কিন্তু একটি

৪০ Stout manual of Psychology, P. 479.

রেখা যদি ৫০ ইঞ্চি লম্বা হয়, তা হলে কিন্তু সে ক্ষেত্রে আর মাত্র ১/৫০ ইঞ্চি তাকে বাড়ালে প্রভেদটা দৃশ্য হবে না, তখন বাড়াতে হবে ৫০ ইঞ্চির ১/৫০ ভাগ অর্থাৎ পুরো এক ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০ ইঞ্চির পর ৫১ ইঞ্চিতে পৌঁছলে, তবেই প্রভেদটি ধরা পড়বে। অর্থাৎ বৃদ্ধিটা ১/৫০ যোগ করে নয়, ১/৫০ দিয়ে গুণ করে করে। আগের উদ্দীপকের পরিমাণ যতটা হবে, সেই অনুপাতেই পরের উদ্দীপকের পরিমাণ বাড়ালে তবেই দুটির মধ্যে প্রভেদ বোঝা যাবে। একেই ওয়েবারের সূত্র বলা হয়। ওয়েবারের সঙ্গে ফেক্‌নারের নামও যুক্ত, কাজেই একে 'ওয়েবার-ফেক্‌নার ল'ও বলা হয়ে থাকে। ওয়েবারই প্রথম মানসিক প্রক্রিয়ার বেলায় নির্ভুল পরিমাপের (**psychometry**) রীতি প্রবর্তন করেছিলেন।[৪১]

৪১ According to Weber's law the variable error of estimate is strictly proportional to the quantity estimated. This famous law, however is approximately rather than precisely true . . . when the task is to discriminate two quantities, the law takes this general form : in any particular kind of perception, equal relative differences, (not equal absolute differences) are equally perceptible. A less general statement of the law is that, in any particular kind of perception, the least perceptible difference is not a certain absolute amount but a certain constant fraction of the total quantity, so the least perceptible difference of length is, not one inch or one foot or any such absolute amount, but (under the most favourable conditions of observation) about $\frac{1}{50}$ of the length of the lines compared. According to Weber's law, the least perceptible difference increases in direct proportions to the magnitudes compared.

Woodworth & Marquis. Psychology, P. 419.

নবম অধ্যায়

মনোযোগ

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।

যাঁদের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে, তাদের মধ্যে কে এই মহামূল্য উপদেশ কণ্ঠস্থ করেন নাই? শুধু বিদ্যা মহাধন কেন, যে কোন মূল্যবান লক্ষ্যে (worth while ends) পৌঁছতে হলেই, প্রয়োজন মনঃসংযোগের,—একাগ্র হয়ে লক্ষ্য বস্তু ধ্যানের। বাস্তবিকপক্ষে, হিন্দীতে Attention কথাটির প্রতিশব্দ হচ্ছে ধ্যান।

মনোযোগ বিশেষ্য নয়, ক্রিয়া। Attention কথাটি বিশেষ্য, কিন্তু ব্যাপারটি আসলে একটি ক্রিয়া,— Attending.— মনঃসংযোগ করা। "মনোযোগ কথাটা আসলে বিশেষ্যই নয়। তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে একটা ক্রিয়াপদ অনুসরণ করছে, সেটাই মনোযোগ কথাটার সত্যিকার অর্থ। মনোযোগের মধ্যে সর্বদাই আছে একটা সক্রিয়তা, এবং মনোযোগের উপযুক্ত ক্রিয়াটি হচ্ছে মনঃসংযোগ করা।" [১] "এটা একটি শক্তি বা বস্তু নয়, কাজেই 'মনোযোগ আছে' না বলে, যদি বলা যায়, 'মন দেওয়া হচ্ছে, তা হইলেই কথাটী বেশী সত্য হবে, যদিও তাতে মনে হবে যে, কথাটা ঘুরিয়ে বলা হল।" [২] মনোযোগ হচ্ছে ব্যক্তিরই একটি সচেতন ক্রিয়া।

মনোযোগ ব্যক্তির আগ্রহ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ব্যক্তিরই একটি বিশেষ আগ্রহান্বিত অভিজ্ঞতাকে আমরা মনোযোগ নাম দিয়ে থাকি। [৩] উদ্দেশ্য লাভের জন্য কোন বস্তুকে যখন চেতনার সামনে স্পষ্টভাবে স্থাপন করি, তখন তাকে বলি মনোযোগ। টিচ্‌নার স্পষ্ট চেতনার বা বিম্বগ্রহণের স্তরকেই বললেন মনোযোগ—A state of consciousness marked by levels

---

১ Ward—Psychological Principle, P. 61.
২ Munn—Psychology, P. 305.
৩ Ross—Groundwork of Educational Psychology, P. 167.

of sensory or imaginal clearness. তাঁর মতে, মনোযোগের কাজই বোধক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।[৪] কিন্তু ষ্টাউটের মতে, বোধ বিষয়ক আগ্রহ (theoretical interest) এবং ফললাভ বিষয়ক আগ্রহ (practical interest) এক হিসাবে পৃথক হলেও, তারা অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত। ফললাভ বিষয়ে আগ্রহ আছে বলেই, ফললাভের বস্তুকে বা অবস্থাকে ভাল করে জানতে, বুঝতে চাই। সেই জন্যই প্রয়োজন মনোযোগের।[৫] মনোযোগের উদ্দেশ্য, জ্ঞান না ক্রিয়া, এটা তর্কের বিষয় হলেও, সকলেই একমত, যে মনোযোগে মন কোন এক বস্তুতে বা বিন্দুতে কেন্দ্রীকৃত (focussed) হয়। মন তার পরিমণ্ডলের অন্য সমস্ত বস্তু বা ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এক বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় যখন কেন্দ্রীভূত হয়, তখন আমরা বলি, মনোযোগ হয়েছে। তার ফলে চেতনার বস্তু স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণরূপে আমাদের মনের সামনে প্রতিভাত হয়। যাতে মন নিবিষ্ট হ'ল, তাকে আমরা পরিমণ্ডলের মধ্যে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে দেখি। কিন্তু এই পৃথক ও স্পষ্ট করে দেখা অপেক্ষাও মনোযোগ আরো কিছু বেশী। মনোযোগের বস্তু, আমাদের অধিকতর জ্ঞানের আগ্রহ, অথবা সফল কর্মের আগ্রহের টানে মনকে টেনে রাখে। মনোযোগ একটি ক্ষণিক মুহূর্তের স্পষ্ট প্রত্যক্ষণ মাত্র নয়। কোন উদ্দেশ্য বা আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের বস্তুর যোগ আছে। কাজেই তা একটি কিছুকাল স্থায়ী ক্রিয়া।

মনোযোগের বস্তু—মনোযোগের বস্তু কি? 'মনোযোগের বস্তু' কথাটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। বর্তমানে যাকে জানবার বুঝবার জন্য আমাদের আগ্রহ, তা অবশ্যই মনোযোগের বস্তু। **কিন্তু মনোযোগের উদ্দেশ্য, কোন ক্রিয়া সম্পাদন** (conative)। কাজেই যার উদ্দেশ্যে, যার অভিমুখে চেতনার এই কেন্দ্রীকরণ,—যা মনোযোগ ক্রিয়াকে আকর্ষণ করে, ভবিষ্যতের দিকে চালনা করে তাও মনোযোগের বস্তু। প্রথম অর্থে, যা স্পষ্টভাবে চেতনার সামনে আছে, তা মনোযোগের বস্তু নয়—বরঞ্চ যা অস্পষ্ট, যাকে পুরাপুরি

---

৪ It is the function of attention to facilitate cognition.
Titchner—The Psychology of Feeling and Attention.

৫ The attainment of practical ends constantly requires fuller knowledge of what is aimed at, at the means of obtaining it. To this extent, practical interest involves a theoretical interest, which takes the form of **A**ttention.
Stout—Manual of Psychology, P. 158.

জানিনা, তাই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, মনোযোগকে সক্রিয় করে তোলে। **চেতনার বস্তুর স্পষ্টতা, মনোযোগের ফল,**—মনোযোগের গন্তব্য স্থান (termination); মনোযোগের যাত্রা সেখান থেকে সুরু নয়। দূর থেকে একটি মানুষকে আসতে দেখছি, তার চেহারাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, কিছুটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। তাই মনোযোগ দিয়ে দেখে চিনলাম, 'তাই তো, পুরাতন বন্ধু প্রবোধ আসছে'। চেহারাটা যদি গোড়াতেই স্পষ্ট দেখা যেত, তবে আর আগ্রহ উত্তেজিত হত না—মনোযোগের তাগিদ আসত না।[৬] **মনোযোগ—অমনোযোগ—Attention & Inattention**—যারা পড়াশুনা মনে রাখতে পারে না, শিখিয়ে দিলেও কাজ শিখতে পারে না, তাদের আমরা গাল দিয়ে বলি, তারা 'অ-মনোযোগী', অর্থাৎ, বুঝাতে চাই, মনোযোগ এবং অমনোযোগ দুইটি বিপরীতক্রিয়া। মনোযোগের ফলে, বিষয় চেতনায় স্পষ্ট হয়ে (distinct) ফুটে উঠে,—একটি বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। অমনোযোগে, চেতনা বস্তু থেকে বস্তুতে, অনির্দেশ্য-ভাবে ঘুরে বেড়ায়,—কোথায়ও সে স্থিতি পায় না,—এ একটি ছড়ানো অপরিচ্ছন্ন, অনির্দিষ্ট ক্রিয়া, এবং চেতনার বস্তু অস্পষ্ট, অ-পৃথকীকৃত, পরস্পর সংযোগ শূন্য (unclear, undifferentiated, disorderly)। অমনোযোগ তাই নির্ভুল জ্ঞান ও সফলক্রিয়ার পথে মস্ত বাধা। দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডব রাজপুত্রদের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন। সকল ছাত্রকে বললেন, "সামনে দুশো হাত দূরে, তেঁতুল গাছের ডান দিকের উঁচু ডালে, ঘুঘু পাখী বসে আছে, তাকে শর নিক্ষেপ করে বিদ্ধ কর।" সাত্যকি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি দেখছ?" সাত্যকি উত্তর করলেন, "আমি তো অনেক গাছ দেখছি, তেঁতুলগাছ কোথায়?" দ্রোণ বললেন, "তোমার মনস্থির নেই, লক্ষ্যভেদ তোমার কর্ম নয়।" তারপর দ্রোণাচার্য দেখলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন তেঁতুলের গাছের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গুরুদ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি জানালেন, যে তিনি তেঁতুল গাছের অনেকগুলি ডাল দেখছেন। দ্রোণাচার্য তাঁকেও ভর্ৎসনা করে বললেন, তাঁর মনোযোগ নেই। দুর্যোধন বললেন, তিনি পাখীটি দেখতে পাচ্ছেন, তার চারিদিকে অনেক পাতা। গুরু বলিলেন লক্ষ্যভেদ

৬ Stout—Manual of Psychology, Pp. 160-161.

করতে তিনিও সমর্থ হবেন না। তারপর দেখলেন, অৰ্জ্জুন নীরব একাগ্রতায় গাছের উপরের দিকে তাকিয়ে, শরসংযোগে প্রস্তুত হচ্ছেন। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন 'বৎস, কি দেখছ ?' অৰ্জ্জুন বললেন, তিনি একটি পাখীর মাথাটুকুর মধ্যে, একটি লাল চোখ দেখছেন। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমার মনোযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে, শরত্যাগ কর।" অৰ্জ্জুনের ধনু থেকে তীর বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে গিয়ে, পাখীটিকে ভূপাতিত করল, তার চোখে বাণ বিদ্ধ হয়েছে। এখানে দেখি, যেখানে মনোযোগ. সেখানেই, লক্ষ্যভেদ আর যেখানে অমনোযোগ সেখানে লক্ষ্যভেদ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

কিন্তু অমনোযোগ কি মনোযোগের বিপরীতক্রিয়া ? না কি, দুইই একই ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন দুইটি দিক ? মনোযোগ যদি হয় চেতনার আলোকিত সংকীর্ণকেন্দ্র, তবে অ-মনোযোগ কি নয়, তাহার স্বল্পালোকিত বৃহৎ পশ্চাৎপট। পড়ায় যখন মন দিয়েছি, তখন আমার চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্য দ্রব্য বা ঘটনা সম্পর্কে আমি অমনোযোগী। আর যে মেয়েটি ক্লাশে অধ্যাপকের বক্তৃতা সম্পর্কে অমনোযোগী, সে হয়তো তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার 'প্রিয় তারকা'র সর্বাধুনিক ছবিটি সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন। বাস্তবিক পক্ষে, মনোযোগ ও অমনোযোগ অবিচ্ছিন্ন। যেখানে আছে কোন একটি বিষয়ে প্রচণ্ড মনোযোগ, সেখানেই আছে, সেই বিষয়ের বাইরে অন্য সমস্ত বিষয়ে, সম্পূর্ণ অমনোযোগ।

"যা যা এক বিশেষ মুহূর্তে চেতনাকে অধিকার করে, তাদের সব কিছুকে মিলিয়েই, এই মুহূর্তের চেতনার ক্ষেত্র (field of consciousness)। কিন্তু এই ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্রেই কেবল মনোযোগ আকৃষ্ট। এই ক্ষেত্রের অন্য বৃহত্তর অংশ সম্পর্কে চেতনা সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়। চেতনার ক্ষেত্রকে তাই, দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি, তা হচ্ছে (১) মনোযোগের ক্ষেত্র এবং (২) অমনোযোগের ক্ষেত্র। অনেক সময়, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে ক্ষেত্র থাকে, তার সঙ্গে ইহা তুলিত হয়ে থাকে। দৃষ্টির সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্যে, যে অংশে আমরা চোখ নিবদ্ধ করি, তা আমরা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেখি, তখন এই অংশের দ্রব্যগুলি থেকে কেন্দ্রীভূত আলো, অক্ষিপটের যে ক্ষুদ্র বিন্দুকে পীতবিন্দু (yellow spot) বলা হয়, তাতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দৃষ্টির ক্ষেত্রের অন্যান্য অংশ, যা চোখের পাশ দিয়ে দেখি (from the

corners of the eye) তাদের ছায়া অস্পষ্টভাবে অক্ষিপটে এসে পড়ে।'[৭]

দৃষ্টি যেমন একই বস্তুতে বহুক্ষণ নিবদ্ধ থাকেনা, তেমনি মনোযোগও বহুক্ষণ একই বিন্দুতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। মনোযোগ গতিশীল। তাই একমুহূর্তে যা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু অধিকার করে আছে, তাই অল্পক্ষণ পরে মনোযোগের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রায়ন্ধকারে অপসারিত হয়। আবার যা ছিল অমনোযোগের অবহেলায় মলিন, তাকেই মন ঘুরতে ঘুরতে এসে স্বয়ংবরা রাজকন্যার মত বরমাল্য গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলে, "আমি তোমাকে বরণ করলুম।" এই স্বেচ্ছায় বরণের দ্বারা আমরা একটি দ্রব্য ও ভাবকে প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব দিচ্ছি এবং সেই মুহূর্তে অন্য বস্তু ও ভাবকে চেতনার কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিচ্ছি।[৮] ড্রেভার তাই বলেছেন যে মনোযোগের মধ্যে পরিত্যাগ ও নির্বাচনের ক্রিয়া আছে। পরিত্যাগটা সচেতন নয়,—কিন্তু নির্বাচনের ক্রিয়ার এটা অবশ্য অনুষঙ্গী।

যা অমনোযোগের ক্ষেত্র, তার কি চেতনার উপর কোন প্রভাব নেই? আমি যখন নিবিষ্ট হয়ে বই পড়ছি, সেই মুহূর্তে আমার চোখ যে বাক্যটিতে নিবদ্ধ, তার প্রতি আমার পূর্ণ মনোযোগ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অংশটুকু এতক্ষণ পড়ে এসেছি, তার অস্পষ্ট ছায়াও আমার বর্তমান মনোযোগের মুহূর্তকে অনুসরণ করে এবং আলোচিত বিষয়ের ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট ইঙ্গিতও বর্তমানের স্পষ্ট বোধকে রঞ্জিত করে। যতক্ষণ মন দিয়ে পড়াশুনা কচ্ছি, ততক্ষণ হয়তো খেয়ালই করিনা, দেয়ালঘড়িটার, টক্ টক্ শব্দ। কিন্তু ঘড়িটি হঠাৎ থেমে গেলেই, চেতনার ছন্দে কোথায় যেন ছেদ পড়ে, আর তাই অল্পক্ষণ পরেই ঘড়িটি বন্ধ হওয়ারূপ সামান্য ঘটনাটি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মনোযোগ ও অনুভূতি—মনোযোগের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, কাজেই তাতে আছে আগ্রহের ছোঁওয়া, অনুভূতির কিছু বা রং। এই অনুভূতির রংকে ড্রেভার বলেছেন feeling of worth-whileness।[৯] "কুকুর তাড়া করলে সদ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা যে পলায়নে মনঃসংযোগ করে, তা নেহাৎই অনুভূতির ফলে। তার পালানোর মূল্য সম্বন্ধে বুদ্ধিশীল চিন্তা

---

৭ Stout—Manual of Psychology, P. 161.
৮ Mc Dougall—Social Psychology, P. 209.
৯ Drever—Introduction to the Psychology of Education.

ততটা নেই, যতটা আছে অস্পষ্ট অনুভবের তাগিদ, যে পালানোটা তার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল।"[১০]

মনোযোগ ও চেতনা—Attention and consciousness.—মন দিয়ে পড়াই শিখি, আর কাজই করি, তখন সে বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ণচেতনা বর্তমান থাকে। যে দ্রব্য বা ঘটনার সম্বন্ধে মনোযোগ আছে, তা অবশ্যই উজ্জ্বল কেন্দ্রে বর্তমান। ওয়ার্ড 'চেতনা' কথার পরিবর্তে 'মনোযোগ' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর মতে 'চেতনা' কথাটির দ্যোতনা খুব স্পষ্ট নয়। তা ছাড়া 'মনোযোগ' কথাটি মনের মৌলিক ধর্ম যে গতিশীলতা, তার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এটা আপত্তি করা যেতে পারে যে, সমস্ত চেতনাই তো স-মনোযোগ চেতনা নয়। চেতনার মধ্যে কি এমন অনেক মানসিক অবস্থা নাই, যা অ-মনোযোগের ঔদাসীন্যে হতশ্রী? ওয়ার্ড বলেন, মনোযোগ এবং অ-মনোযোগ দুইটি বিপরীতক্রিয়া নয়। তাদের মধ্যে প্রভেদটা গুণগত (qualitative) নয়, পরিমাণ-গত। মনোযোগে চেতনা কেন্দ্রীভূত, আর অ-মনোযোগে তা ব্যাপ্ত ও অস্পষ্ট। এরা মনোযোগের স্তরবিভেদ মাত্র।[১১] প্রাণীর কোন এক মুহূর্তের সমগ্র চেতনাকে আমরা বড়, মাঝারী, ছোট এ রকম তিনটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত হিসাবে কল্পনা করতে পারি। সর্বাভ্যন্তরস্থ বৃত্তটি মনোযোগ এবং পূর্ণ চেতনার ক্ষেত্র, মধ্যের বৃত্তটি অস্পষ্ট চেতনার ক্ষেত্র, এবং সকলের বাইরের বৃত্তটি মনের অচেতন ক্রিয়াগুলির ক্ষেত্র-জ্ঞাপক। এই বৃত্তগুলির মধ্যের সীমারেখা তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত নয়, তা অনড়, অচলও নয়। কখনো কেন্দ্রীয় বৃত্তটির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত, যেমন, যখন খুব যত্নের সঙ্গে অতিক্ষুদ্র দ্রব্যে বা তাহার কোন অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি; আবার কখনো বা তা যথেষ্ট বিস্তৃত, যেমন, কোন নূতন দেশে গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে চারদিকের সমস্ত পরিবেশকেই লক্ষ্য করি। মধ্যের বৃত্তের সীমা অবশ্যই বহু-বিস্তৃত, কারণ, যা তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখছি তার বাইরে অস্পষ্ট চেতনায় যে সমস্ত দ্রব্য বা ঘটনা তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন দ্রব্যকে যখন মন দিয়ে দেখছ, তখন যে সব শব্দ তোমার চেতনায় এসে মৃদু আঘাত করছে, অন্য যে সমস্ত দৈহিক সংবেদন, সে মুহূর্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে এসে

১০ গুহ, দত্ত, ঘোষ-মনোবিদ্যার রূপরেখা পৃঃ ৩৪৩

১১ Ward—Psychological Principles, P. 63-65.

অস্পষ্ট চেতনা জাগাচ্ছে, যে মৃদু ভাল মন্দ লাগার আমেজ, সে সময়ে মনকে হাল্কা রংয়ে রাঙিয়ে যাচ্ছে, উত্তেজনা-আবেগের মৃদু আঘাত মনকে আন্দোলিত করছে, তা সবই এই বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।...সর্বশেষ শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি দৈহিকক্রিয়া যাদের সম্পর্কে আমাদের কোনই চেতনা নেই, মনোযোগও নেই সেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অবস্থাগুলি বাইরের ক্ষেত্র।[১২]

একদিক থেকে চেতনা ও মনোযোগের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। চেতনা চঞ্চল, অস্থির ; কিন্তু মনোযোগের মধ্যে আছে, গৃহিণী-সুলভ সংরক্ষণশীলতা। চেতনা হচ্ছে ফুলে ফুলে মধুলোভী চঞ্চল প্রজাপতি,—'মন নাই তার, কিছুতেই আর কিছুতেই।' কিন্তু মনোযোগ চায় ঘর বাঁধতে; সে কোন বস্তু বা ঘটনাকে বরমাল্য দান করে বলে, "ওগো শ্যাম, দাঁড়াও তোমায় দেখি।" চেতনা হচ্ছে বহু-বল্লভা স্বৈরিণী, কিন্তু মনোযোগ হচ্ছে কুলবধূ, সে একনিষ্ঠতা দাবী করে। অবশ্য, এ থেকে ধারণা করা ভুল হবে যে মনোযোগ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। মনোযোগ চেতনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। মনোযোগের একাগ্রতা মনকে কারারুদ্ধ করবার জন্যে নয়, সুষ্ঠুতর জ্ঞান ও সফল কর্মের জন্যে। মনোযোগ চেতনার স্বাভাবিক 'উড়ন চণ্ডী' স্বভাবকে সংযত করে, চেতনার বেগকে কেন্দ্রীভূত করে, বৃথা অপচয় বন্ধ করে। অনিয়ন্ত্রিত চেতনা সহজেই ক্লান্ত, নিস্পৃহ—কোন একটি বিষয়ে বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকতে, সে অনিচ্ছুক। কিন্তু মনোযোগ চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে, একটি নির্দিষ্ট পথে পদক্ষেপের পথ সুগম করে। মনোযোগ থাকলেই জ্ঞানের বিষয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ান্তরে গমন সহজ হয়; কর্মক্ষেত্রে এক ক্রিয়া থেকে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ায় যাওয়ার উৎসাহ ও নিপুণতা বৃদ্ধি পায়। মনোযোগই প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশ্বকে মনের মধ্যে ধরে রাখে, এবং অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার ফলকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের পথ সুগম করে। মনোযোগই ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ঐক্যের সূত্র আছে, তার একটি মূল কারণ।[১৩]

মনোযোগের বিস্তার—The Span of attention—এটা সাধারণ ধারণা, যে একসঙ্গে একটি বিষয়েই শুধু মন দেওয়া যায়। 'কেজো' ইংরেজ, তাই তাদের শিশুদের বাল্যকালেই শেখায়,

---

১২ Woodworth & Marquis—P. 397-398.
১৩ Stout—Manual of Psychology, P. 186.

One thing at a time,
And that done well ;
Is a very good rule,
As all can tell.

মনোযোগের সঙ্গেই যুক্ত থাকে 'একাগ্রতা' (one-pointedness) অর্থাৎ মন একটি বিষয়েই কেবল যুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে কতগুলি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, যে সকলের মনোযোগের ক্ষমতা সমান নয়। তবে মোটামুটি ভাবে দেখা যায়, অনেকগুলি মার্বেল যদি মেঝেতে ছড়ানো থাকে, অথবা অনেকগুলি বিন্দু যদি এলোমেলোভাবে কাগজে আঁকা থাকে, তাহলে একজন বয়স্ক মানুষ একসঙ্গে এক মুহূর্তে ছটার মত মার্বেল বা বিন্দু দেখতে পায়। একেই বলা হয় span of attention. "যদি বিভিন্ন সংখ্যার বিন্দু, রেখা, সংখ্যা বা অক্ষর মুহূর্তের জন্য ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে রাখা যায়, তাহলে পরস্পর সম্পর্ক-বিহীন প্রায় পাঁচটি বিন্দু বা রেখায় সে একই মুহূর্তে নজর দিতে পারে।[১৪]

ভ্যালেণ্টাইন্ একে span of attention না বলে, span apprehension বলার পক্ষপাতী, কারণ, যেখানে একনজরে দেখছি তাকে মনোযোগ বলা একটু শক্ত। অবশ্য মুহূর্তের জন্য হলেও—'সচেতন ইচ্ছা দ্বারা দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা', মনোযোগের এই প্রধান লক্ষণটি এখানে বর্তমান। ভ্যালেণ্টাইন এ সম্পর্কে যে পরীক্ষা করেছেন তার বিবরণ দিচ্ছি। ট্যাচিস্টোস্কোপ (Tachistoscope) যন্ত্রের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ($\frac{১}{২০}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত) কালের জন্য, কতগুলি অসংলগ্ন বিন্দু, রেখা, অক্ষর এক আলোকিত পর্দায় ফেলে, তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিকে তা বলতে বলা হয়। এ মুহূর্তকাল এত ক্ষুদ্র, যে চক্ষু নড়বার সময় পায় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকই এই অবস্থায় চারটি বা পাঁচটির বেশী বিন্দু, রেখা বা অক্ষর ঠিক ঠিক স্মরণ করতে পারে না। অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি (non-sense syllables)—যেমন, স ন তে র প···বড় জোর দশটি পর্যন্ত, এ অবস্থায় একনজরে, ব্যক্তি মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে।[১৫] মায়ার্স আঙ্গুল টোকা দিয়ে যে শব্দ হয়

---

১৪ Stout—Ibid, P. 176.
১৫ Valentine—Psychology & its bearing on Education, P. 245.

(tapping), তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, যদি নিয়মিত ছন্দে, ই সেকেণ্ড পরে পরে টোকা দেওয়া যায়, তবে ব্যক্তি আটটি পর্য্যন্ত সংখ্যা, এক সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। তার চেয়ে বেশী হলে, ঠিক মনে রাখতে পারে না। ব্যক্তিকে এখানে গুণতে দেওয়া হয় না। আর একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, না গুণেও ব্যক্তি সাত টোকার দলকে, আট টোকার দল থেকে ঠিক প্রভেদ করতে পারে।[১৬]

ছন্দ, মিল, প্যাটার্ণ মনোযোগের সহায়ক—একটা কথা সমস্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় যে, যেখানে বিন্দু, রেখা বা অক্ষরগুলি অর্থপূর্ণভাবে বা সু-সম ছন্দে সাজানো হয়, সেখানে অনেক বেশী সংখ্যা, আমরা এক নজরে দেখে, মনে রাখতে পারি। আকাশে অনেক অনেক তারার মধ্যে কতকগুলিকে যখন 'কালপুরুষ' হিসাবে কল্পনা করে দেখলাম, তখন সেই তারার সমষ্টি সংখ্যায় বহু হলেও, এক নজরে চিনতে ভুল হয় না; মনে রাখতে ভুল হয় না। তেমনি, এক সঙ্গে r t h i c s m s অক্ষরগুলি চোখের সামনে রাখলে, আমরা তাদের মনে রাখতে পারি না, কিন্তু এই অক্ষরগুলিকেই যখন Christmas রূপ অর্থপূর্ণ কথায় সাজিয়ে চোখের সামনে ধরি, তাদের মনের মধ্যে গ্রহণ করতে, এবং মনে রাখতে, কোন কষ্ট হয় না। উলট পালট অর্থহীন দশটি অক্ষরের বেশী একসঙ্গে মনে রাখতে পারি না, কিন্তু, 'যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা', এই পরিচিত প্রবাদ বাক্যটিতে ১৪টি অক্ষর থাকলেও, তা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি এবং মনে রাখতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে এটা মনোযোগের একটি মৌলিক ধর্ম যে, ইহা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সংযোগের সূত্র আবিষ্কার করতে সততই চেষ্টিত। ছন্দ, মিল, যতি, এ সবই এই সংযোগের সূত্র। যেখানে স্বাভাবিক কোন ছন্দ, বা অর্থ নেই সেখানেও একটুখানি ছন্দ, একটুখানি মিল কল্পনা করতে, আবিষ্কার করতে পারলে তবেই মন স্বস্তি পায়। গেষ্টল্টবাদীরা, মনের এই 'প্যাটার্ণ-ফর্মিং' প্রবণতাকে শিক্ষার একটি মূলসূত্র বলে মনে করেন। পূর্বেও এ কথা আলোচনা করেছি। শিক্ষকের কাছে মনোযোগের এই সূত্রটি স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। শিশু যে সমস্ত কথার সঙ্গে পরিচিত, যে সমস্ত জিনিষ বা দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত, সে সবের মধ্য দিয়েই শিশুর কাছে

১৬ Myers—Text book of Experimental Psychology, P. 322.

নূতন তথ্য পরিবেশন করতে হবে। নিতান্ত অপরিচিত, বড় বড় কঠিন শব্দ ও জটিল বাক্য, প্রাথমিক স্তরে, শিশুদের পক্ষে নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। এর ফলে, যে কথাটি তাদের কাছে বলতে চাই, তা থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে, নূতন নূতন শব্দ ও অপরিচিত ভাবের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায়, শিশুর মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অঙ্কে নূতন কোন প্রণালী শিখাতে হলে (যেমন গুণন শেষ করে ভাগ), প্রথমে ছোট ছোট সংখ্যা নিয়ে প্রণালীটি ছেলেমেয়েদের বুঝাতে হবে। এটাও বুঝাতে হবে যে, তাদের পরিচিত যোগ, বিয়োগ, গুণনের সাহায্যেই, এ নূতন পদ্ধতিটি কাজে লাগাতে হয়। ছোট ছোট অংকে শিশু অভ্যস্ত হলে, তবেই তাকে বড় বড় অংক দেওয়া উচিত। তা না হলে, সে যে অংক কষতেই অনেক ভুল করবে, শুধু তাই নয়, প্রণালী সম্বন্ধেও তার গুলিয়ে যাবে।[১৭]

ষ্টাউট্ এবং আরো বহু মনোবিজ্ঞানী মনোযোগের ঐক্য-মুখীনতার দিকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। "মনোযোগের বিস্তার (Span of attention) সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তার ফল মনোযোগের ঐক্য-মুখীনতার সূত্রের বিরোধী নয়। এলোমেলো, অসংবদ্ধ বিন্দু, রেখা, বা অক্ষর, চার হতে পাঁচটি, অধিকাংশ, ব্যক্তি, এক মুহূর্তে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। এই বোধ বা গ্রহণ করবার ক্ষমতার পরীক্ষা হয়, বোধের অব্যবহিত পরে কতটা আমরা মনে করতে পারি, তা দিয়ে। এটা অবশ্যই সত্য, মনোযোগের আলোকিত কেন্দ্রের মধ্যে এ কয়টি সংখ্যা বা বিন্দু ইত্যাদি স্থান পায়। কিন্তু এই বিন্দু বা রেখাগুলি অ-সংলগ্ন বা এলোমেলো এই অর্থে, যে তারা আমাদের মনে পরিচিত বা পরিচ্ছন্ন প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে না। কিন্তু তাদের বোধের মধ্যে এই বোধটি থাকে যে, তারা একটি দলের অন্তর্গত, এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে কিছুটা পরিমাণ ঐক্যের প্যাটার্ণ। যাকে এই প্রকার কোন ঐক্যের সূত্রে বাঁধতে পারি না, তাকে বুঝতেও পারি না, মনে আনতেও পারি না।...যখন আমরা অনেকগুলি জিনিষকে একসঙ্গে দেখি, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ সূত্র লক্ষ্য করি, কাজেই বাস্তবিক পক্ষে তাদের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অনেকগুলি দ্রব্য হিসাবে দেখি না, একটি সমগ্র বস্তু হিসাবেই দেখি।[১৮] একটি বাড়ীর দরজা, জানালা, সিঁড়ি

১৭ W. Scott—Journal of Exper. Ped. Vol. IV. No. 3.
১৮ Stout—Manual of Psychology, P. 176.

ইত্যাদি অনেকগুলি অংশ দেখেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও জন্মেছে যে এটা 'একটি বাড়ী'। আবার জানালার ফ্রেম, শিক্ খড়্খড়ি, আলাদা আলাদা দেখলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও রইল, যে এটি 'একটি জানালা'। কাজেই মনোযোগের কাজ হচ্ছে, বহুর মধ্যে ঐক্যকে লক্ষ্য করা।

মনোযোগ ও বুদ্ধি—এক সঙ্গে বহু বিষয়ে সমান মনোযোগ দেওয়া, উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক। কথিত আছে, মাইকেল মধুসূদন এক সঙ্গে তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এক সঙ্গে তিনজন পণ্ডিতকে মুখে মুখে বিভিন্ন অংশ রচনা করে বলে যেতেন, এবং তাঁরা তা লিখে নিতেন। নেপোলিয়ন সম্পর্কেও প্রবাদ আছে, তিনি রণক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের ভারপ্রাপ্ত ছয়জন সেনাপতিকে, একই সময়ে আদেশ বা উপদেশ দিতেন। এ রকম ক্ষমতা অবশ্যই অসামান্য।[১৯] বার্ট ক্ষীণবুদ্ধি, সাধারণ-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণধী. এই রকম বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের নানাদল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, যে যাদের বুদ্ধি যত বেশী, তারা এক সঙ্গে তত বেশী জিনিষে মনোনিবেশ করতে সক্ষম।[২০]

মনোযোগের স্থায়িত্ব—(**Duration of Attention**)—আমরা বলেছি চেতনা অস্থির, চঞ্চল, আর মনোযোগ স্থির ধীর। চেতনা নাকি বহুবল্লভা স্বৈরিণী, আর মনোযোগ হচ্ছে শান্ত একনিষ্ঠ কুলবধূ। কিন্তু কথাগুলি নিতান্তই উপমা ও অলংকার। মনোযোগের স্থিরতা আপেক্ষিক, তা অনড়, অচল নয়। বরং বলা যায়, মনকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যাবার কাজ মনোযোগের। ইহা চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও কেন্দ্রীভূত করে,—সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সকল কর্মের উদ্দেশ্যে। মনোযোগের মধ্যে কিছুটা স্থিরতা আছে, একথা সত্য, কিন্তু ইহা একই স্থির বিন্দুতে আবদ্ধ নয়। একনিষ্ঠ কুলবধূর সমস্ত মন স্বামী ও সংসারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। কিন্তু তিনি কি দিবানিশি পতিদেবতার মুখমণ্ডলেরই ধ্যানে মগ্ন? স্বামী ও সংসারের স্থির বিন্দুকে কেন্দ্র করে তাঁর মনোযোগ আন্দোলিত হয়,—কখনো মন দেন রান্নার কাজে, কখনো স্বামীর অফিসের ধরা চূড়া গুছিয়ে রাখেন, কখনো তাঁর লাইফ্ ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম যথাসময়ে পাঠিয়ে দেন, কখনো শ্বশুর শাশুরীকে কুশল সংবাদ লেখেন, আবার সন্ধ্যার

১৯ Most cases, however of so-called divided attention are instances of alternating attention. Julius Caesar did not really dictate four letters while writing a fifth, but his attention vibrated from one to another—Calkins. A First Book in Psychology, P. 107.

২০ C. Burt—The Backward Child, P. 480.

কর্তা বাড়ী ফিরবার আগেই গা ধুয়ে, বেণীরচনার কাজে মন দেন। কাজেই মনোযোগের মধ্যেও একটি অস্থিরতা বা আন্দোলন (Oscillation of attention) আছে। এবং পরীক্ষা দ্বারা, এ পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। যখন পাশে বসে নাতিটির খেলা মন দিয়ে দেখছি, তখন কয়েক সেকেণ্ড দেখছি তার কচি আঙ্গুলগুলির চাঞ্চল্য, পর মুহূর্তেই তাকাচ্ছি, তার নিবিষ্ট চোখ দুটির দিকে, তার পর মুহূর্তেই চোখে পড়ছে; ওর কালো কোঁকড়া চুলগুলিতে। ক্ষণিকের জন্য দুঃখ বোধ করলাম, মুখেভাতের পর আগামী সপ্তাহে, এই সুন্দর কেশগুচ্ছ ছেদন করতে হবে, তার পরই ওর ডাক কানে আসল, 'দাদু বালী চলো।,' প্রশ্ন হচ্ছে, কতক্ষণ একই বিন্দুতে পূর্ণ মনোযোগ আবদ্ধ থাকে? পরীক্ষার ফলে উত্তর পাওয়া যায়, যে মনোযোগের জোয়ার ভাঁটা আছে। প্রতি ৫।৬ সেকেণ্ড অন্তর, পূর্ণ মনোযোগ কমে যায়। একটি চমৎকার গবেষণার ছবি বের হয়েছিল আমেরিকার Look ম্যাগাজিনে। ডাঃ হারমাণ ব্রাণ্ড এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করেছিলেন। একটি আমেরিক্যান তরুণী একজন সুবেশ যুবকের দিকে যখন মনোযোগ দেয়, তখন তার চোখগুলি সেই যুবকের দেহের কোন কোন অংশে এবং কতক্ষণের জন্য আবদ্ধ হয়, এটাই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। সেই যুবতী বা যুবক কেউই পরীক্ষার বিষয় কিছু জানতেন না। এবং পরীক্ষক কাঠের পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য থেকে কাঠের পর্দার এক ফুটোয় আবদ্ধ একটি শক্তিশালী মুভী ক্যামেরা দিয়ে যুবকটি মেয়েটির দৃষ্টিপথে পতিত হবার পর দু মিনিট তার চক্ষু তারকার গতি ও অবস্থানকালের পরপর ছবি তুলে যান। এ রকম ৯৮টি মেয়ের চোখের গতি ও অবস্থান কালের ছবি তুলে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দুই মিনিটে চক্ষু প্রায় কুড়ি বার স্থান পরিবর্তন করে যুবকের দেহের বা পোষাকের বিভিন্ন অংশে নিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে ছয় সেকেণ্ড অন্তর মনোযোগ নড়েছে। মেয়েরা যুবকের বুক, চোখ, কলার, টাই, চুল, কান, জুতা সব অংশই পরপর লক্ষ্য করেছে। কিন্তু মোট সময়ের শতকরা ৩২ ভাগ সময় তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ যুবকের মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে, ২২ ভাগ সময় কলার, টাইর দিকে; আর বাকী সময় দেহের ও পোষাকের অন্যান্য খুটিনাটি লক্ষ্য করবার কাজে।[২১] গেষ্টল্টবাদীরা Figure & Ground এর নানা ছবি দিয়ে পরীক্ষা করে

২১ Brandt—The Psychology of Seeing.

দেখিয়েছেন, যে প্রত্যক্ষণের বেলায় সর্বদাই মনোযোগের এই তারতম্য ঘটে। Figure & Ground-এর ছবি দুটির প্রথমটির দিকে কিছুক্ষণ তাকালে মনে হবে, কালো পটভূমিকার উপর চারটি পাপড়িওয়ালা একটি ফুল, আবার পর মুহূর্তেই মনে হবে যে সাদা পটভূমিকায় কালো ফুল ফুটে আছে। দ্বিতীয় ছবিটির দিকে তাকিয়ে নিজেরাই আবিষ্কার কর, কি বিভিন্ন দুটি ছবি ফুটে ওঠে। (প্রত্যক্ষণ অধ্যায় দেখ)

মন দিয়ে বই পড়তে থাকলে, অক্ষিতারকা সেকেণ্ডর ভগ্নাংশ মাত্র সময় স্থির হয়ে থাকছে, ডানে লাফিয়ে নড়ছে, আবার বামে ফিরে আসছে। মুভি ক্যামেরা দিয়ে চক্ষু তারকার গতি ও অবস্থানের ফটো তুললে দেখা যাবে যে, it is a series of jerks with very short periods of rest. "কিন্তু চক্ষুতারকার চেয়ে মনোযোগ আরো বেশী অস্থির। কারণ হয়তো চক্ষু যখন কোন দ্রব্যের উপর নিবদ্ধ রয়েছে, মনোযোগ সেই দ্রব্য থেকে নড়ে অন্য কোন অধিকতর মনোহারী বিষয়ে লগ্ন হয়েছে ; এমন কি চক্ষু বুজে বিছানায় শুয়ে থাকলেও মনোযোগ দ্রুত এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় নড়ে নড়ে বসে।" [২২]

একাগ্র মনোযোগ কি ? তবে কি নিবিড় একাগ্র স্থির মনোযোগ বলে কিছু নেই ? না, তাও আছে। আমরা তন্ময় হয়ে ইষ্টবেঙ্গল—মোহন বাগান খেলা দেখি। বিষম উত্তেজনার মুহূর্তে বিশ্বসংসার ভুলে যাই। তখন ভীড়ের চাপের মধ্যে দেহ আড়ষ্ট স্থির, কিন্তু বলের সঙ্গে সঙ্গে মন নড়ছে, এধারে ওধারে, কিন্তু এই বর্তমান মুহূর্তের খেলার চিন্তাই মনকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করে আছে। অর্থাৎ মনোযোগের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সত্ত্বেও, একটি স্থায়ী আগ্রহের কেন্দ্র মনকে টেনে রাখে। "স্থির মনোযোগ (sustained attention) স্থাণুও অনড় নয়, কিন্তু এখানে মনোযোগের গতি ও পরিবর্তন আগ্রহের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ক্ষেত্রের মধ্যে মনোযোগ যত সজীব, ততই ইহা এই ক্ষেত্র অতিক্রম করে অন্য কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হবার প্রলোভনকে দৃঢ় ভাবে বাধা দেয়।" [২৩]

মনোযোগের দৈহিক ও স্নায়বিক অনুষঙ্গ—Physiological and Nervous concomitants of Attention—মনোযোগের পশ্চাতেই থাকে একটা প্রস্তুতি পর্ব (set) এবং মনোযোগের নিরবিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গী, দেহের

২২ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 400.
২৩ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 401.

পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সংযত কাঠিন্য। মন দিয়ে কঠিন বিষয়ে যখন বক্তৃতা শুনি তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বক্তার দিকে পরিচালিত করি। রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে, সমস্ত দৈহিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে বক্তার প্রত্যেকটি

Fig. 42. The physical set in attention—After Mnnn. Psychology, P. 384

কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনি, তার মুখ চোখের প্রত্যেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি; সমস্ত চিন্তা, বুদ্ধি জাগ্রত করে কেন্দ্রীভূত করি,—বক্তৃতার বিষয়ে।

মনোযোগের বেলায়, ইন্দ্রিয়ের চক্ষু এবং কর্ণই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। যখন স্বাদ, গন্ধ বা স্পর্শের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখনও যেন চক্ষু ও কর্ণ সে ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পেশীগুলির মধ্যে যে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, তা পরমুহূর্তে সমগ্রশক্তি ব্যবহারের জন্যে সমস্ত গতি ও চঞ্চলতার সংযমনের লক্ষণ। দৌড় প্রতিযোগিতায়, দৌড় সুরু করবার পূর্ব মুহূর্তে দৌড়ানীয়ারা এমনি ভাবে দেহের পেশী বিন্যাস করে, আপাতদৃষ্টিতে স্থির হয়ে, অবস্থান করেন, যাতে শক্তি এতটুকুও অপচয়িত না হয়ে, যথাসময়ে জ্যামুক্ত শরের মত তীব্রতম বেগে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হতে পারেন। পেশী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন প্রস্তুতির স্তরে থাকে আড়ষ্টতা, শক্তির সংকোচন (conservation & concentration) এবং তার পরই তীব্র তেজে শক্তির শৃংখল মুক্তি (release of energy), স্নায়বিক দিক হতেও গভীর মনোযোগের প্রস্তুতির পর্বে থাকে tension (প্রেষ ও অস্বস্তি), এবং তার পর, স্নায়বিক শক্তির, নির্দিষ্ট পথে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মনোযোগ যেখানে সফল পরিণতিতে ব্যক্তিকে নিয়ে যায়, তখন আসে গভীর আনন্দ,—বিফলতায় আসে অবসাদ। এবং মনোযোগের প্রয়াস যেখানে বারে বারেই ব্যর্থ হয়, সেখানে আসে ক্রোধ, বিরক্তি

(irritation) ও নিরাশা (frustration)। মনোযোগ নিম্নস্তরের আবর্তক্রিয়া নয়, ইহা মানুষের উচ্চতর সচেতন ক্রিয়া, কাজেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল এখানে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। মনোযোগে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে সুসামঞ্জস্য নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং মস্তিষ্কের বোধকেন্দ্র, চেষ্টাকেন্দ্র, এবং সংযোগকেন্দ্র ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্নায়ুসূত্রই মনোযোগের বেলা উত্তেজিত হয়। অনুভূতির জীবনের সঙ্গেও তার ফলাফলের নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং, মধ্যমস্তিষ্ক, থ্যালামাস, সিম্প্যাথেটিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক মণ্ডল, রসক্ষরা গ্রন্থির সক্রিয়তাও এর সঙ্গে যুক্ত।[২৪]

মনোযোগের ফল—Effect of attention.

মনোযোগ হচ্ছে, চেতনার কেন্দ্রীকরণ। এর ফলে, মনোযোগের বস্তু স্পষ্টতা (clearness) ও তীক্ষ্ণতা (sharpness) লাভ করে। মনোযোগ কালে, অন্যান্য দ্রব্য থেকে মনকে সরিয়ে এনে, বিশেষ একটি দ্রব্য বা ঘটনার অভিমুখী করা হয়। তার ফলে মনোযোগের বস্তু অন্য সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক (distinctness) হয়ে, দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোযোগের ফলে, ব্যক্তি একদিকে দ্রব্যের বিভিন্ন অংশকে অনেক পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণে (analysis) সমর্থ হয়; অন্যদিকে তার নিকট বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ (synthesis), ও অনুরূপ বস্তুর সাথে এর নৈকট্য (assimilation), এবং বিপরীত দ্রব্য থেকে পার্থক্য (discrimination) স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, বুদ্ধিদ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তার মধ্যেই রয়েছে, এই দুইটি বিপরীত গুণের সমন্বয়। মনোযোগ হচ্ছে বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান, ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। মনোযোগের ফলে, সংবেদনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, এ স্থায়িত্ব দীর্ঘতর হয় এবং প্রতিক্রিয়াকাল হ্রস্ব হয় (প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধে আলোচনা দেখ)। মনোযোগের দ্বারা জ্ঞান আহরণ যেমন সহজ হয়, জ্ঞান-লব্ধ বিষয় স্মৃতিতে তেমনি অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করে। উচ্চতর বিমূর্ত চিন্তা, যুক্তি, বিচার, সমস্যার সমাধান, সর্বক্ষেত্রেই মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, এবং নানা পরীক্ষার দ্বারা এর উপযোগিতা প্রমাণিত।[২৫] মনোযোগ ভিন্ন শিক্ষাসংগ্রহণ ও শিক্ষাদান দুইই অসম্ভব।[২৬]

---

২৪ Munn—Psychology, P. 246.

২৫ Stout—Manual of Psychology, Pp. 179-186.

২৬ Ross—Ground work of Educational Psychology, P. 17.

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ—Forms of attention—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। মনোযোগের বিভিন্ন স্তর বা কেন্দ্রীকরণের পরিমাণ অনুযায়ী দুই দলে ভাগ করা যায় **কেন্দ্রীভূত মনোযোগ** (focal attention) মনোযোগ যে দ্রব্য, বা দ্রব্যের যে অংশে সব চেয়ে বেশী নিবদ্ধ সে অংশ চেতনার কেন্দ্র অধিকার করে, আর (২) **উপান্ত মনোযোগ** (marginal attention)—যে দ্রব্যের প্রতি বা অংশের প্রতি মনোযোগ ঘনীভূত নয়, যা চেতনার মধ্যে থাকলেও, মনোযোগের কেন্দ্রে নাই, সেই প্রত্যন্ত প্রদেশের (fringe of attention) অস্পষ্ট মনোযোগ, এই দলের। কেউ কেউ বলবেন, মনোযোগের দুইয়ের অধিক স্তর আছে, এবং সেই অনুসারেই মনোযোগকে উচ্চ স্তরের, মধ্যস্তরের ও নিম্নস্তরের এই তিন দলে ভাগ করা যায়। আবার ম্যুন্‌স্টারবার্গ ব্যাপকতা বা পরিধি অনুযায়ী, মনোযোগকে **বহু-বিস্তৃত** (expansive) এবং সংকীর্ণ ক্ষেত্রে **সীমাবদ্ধ** (concentrated) এই দুই দলে ভাগ করেছেন। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের কাজের দিকে, একই সময়ে দৃষ্টি দেন। তার মনোযোগ বহু ব্যাপ্ত। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি-শিল্পী, তাহার ক্ষুদ্র যন্ত্রের কলকব্জার মধ্যেই নিবিড় মনোযোগ নিবেশ করেন। প্রথম জাতীয় কাজে মানসিক প্রেষ (tension) বেশী, এবং তা অধিকতর ক্লান্তিকর। দ্বিতীয় প্রকার মনোযোগ অভ্যাস ও চেষ্টাসাপেক্ষ, এবং সম্ভবতঃ এতে অধিকতর পরিমাণে মানসিকশক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু এই প্রকার মনোযোগে অভ্যস্ত হলে, তা তৃপ্তিকর। অবশ্য তৃপ্তিটা নির্ভর করে, মনোযোগের ফলে ক্রিয়ার সকল পরিণতির উপর। যেখানে স্নায়বিক শক্তি বহু বাধা কণ্টকিত নয়, যেখানে সেই শক্তি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে এবং সকল পরিণতিতে পৌঁছে দেয়, সেখানে তা নূতনতর উদ্যমের শক্তি যোগায়, এবং তা সুখকর।

আবার মনোযোগকে **স্থির ও অস্থির** এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। স্থির (বা মন্থর গতি) মনোযোগে মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থাকে। পূর্বেই বলেছি, কোন মনোযোগই সম্পূর্ণ স্থির নয়। তবে যাকে স্থির মনোযোগ (stable) বলা হয়, সেখানে মোটামুটি একটি স্থির কেন্দ্র থাকে, তার চারদিক ঘিরেই মনের পদযাত্রা,—মেধাবী ছাত্র, নিষ্ঠাবান্ শিল্পী বা

বৈজ্ঞানিক, মাতৃস্বভাবা সুগৃহিনী, সকলের মধ্যেই এই জাতীয় মনোযোগের প্রকাশ।

অস্থির মনোযোগ (mobile attention) মাত্রই চপল-স্বভাব নয়। মোটর চালক যখন জনাকীর্ণপথে মোটর চালায়, তখন তার মনোযোগ দুটি মুহূর্তও একই বিন্দুতে আবদ্ধ থাকেনা, কিন্তু এখানেও নিবিষ্ট মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন।

আবার মনোযোগের নিকট উদ্দেশ্য অনুযায়ী, **বিশ্লেষক** (analytic) ও **আশ্লেষক** (synthetic) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যিনি ঘড়ি মেরামত করেন, তিনি ঘড়িটা কেন বারে বারে বন্ধ হয়ে যায়, তা বুঝবার জন্যে, এর ভিতরের বিভিন্ন অংশের দিকে মন দেন; এ হচ্ছে বিশ্লেষণী মনোযোগ। কিন্তু যখন বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে জিনিষটিকে সমগ্রভাবে বুঝতে চাই, তখন সে মনোযোগ আশ্লেষণ-ধর্মী। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এই দুইটি বিপরীত ক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে থাকে, তবে কখনও মনের ঝোঁক আশ্লেষণের দিকে বেশী, কখনও বিশ্লেষণের দিকে বেশী, এবং সে অনুযায়ীই সেই মুহূর্তের মনোযোগের নামকরণ হবে।

অন্যভাবে মনোযোগকে **জন্মগত সংস্কারজাত** (instinctive) এবং নিজ **চেষ্টা দ্বারা আয়ত্তীকৃত** (acquired) এই দুই দলেও ভাগ করা যায়। জন্মগত প্রবৃত্তি-জাত মনোযোগ প্রাণধারণের ও জীবনের বিস্তারের মৌল প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। এটা চেষ্টাদ্বারা আয়ত্ত করতে হয় না। বাচ্চা রাত্রে সামান্য উস্‌খুস্‌ করলেও মার ঘুম ভেঙে যায়; পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সেদিকে মন যায়। স্বভাবজ কারণে যে মনোযোগ (যেমন, বজ্রপতনের তীব্রশব্দে) তা অনিচ্ছাকৃত, এমন কি, ইচ্ছাবিরুদ্ধ (Involuntary or non-voluntary)। যে মনোযোগ চেষ্টাদ্বারা আয়ত্তীকৃত তা অভ্যাস ও অনুকরণের ফল।[২১]

মান্‌ বলেছেন যে, যদিও বিভিন্ন জাতীয় মনোযোগের মধ্যে তীক্ষ্ণ ভেদরেখা টানা যায় না, তথাপি মনোযোগকে তিনটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়,—**অনিচ্ছাকৃত** (**Involuntary**) **স্বেচ্ছাকৃত**, (**Voluntary**) এবং **অভ্যাসকৃত** (**Habitual**)।

২১ Calkins—A First Book in Psychology, Pp. 209-10.

অনেক উদ্দীপক বা অবস্থা সবলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; তারা আমাদের প্রস্তুতি, ইচ্ছা বা ভাল-মন্দ লাগার উপর নির্ভর করে না। হঠাৎ পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ, বা ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ বা হঠাৎ কোন আঘাত, নিজেদের বলেই মনকে আকৃষ্ট করে। তারা কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। এ মনোযোগের স্বরূপ আবর্তক্রিয়ার (Reflex) ধরণের।

কিন্তু অনেক বিষয় আছে, যেখানে মনোযোগ স্বেচ্ছাকৃত। বিয়ের বেনারসী শাড়ী কিনতে, যে মেয়েটি মার সঙ্গে দোকানে গিয়েছে, সে স্বেচ্ছায়ই বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন দামের শাড়ীর দিকে মন দিয়েছে। এ মনোযোগ স্বেচ্ছাকৃত, এবং ব্যক্তির আগ্রহের সঙ্গে তা যুক্ত। ক্লাশে যদি অধ্যাপক মহাশয় বলেন, 'এবার বিশেষ মন দিয়ে শোনো, এবার পরীক্ষায় এটা আসবে"— তাহলে নিতান্ত অমনোযোগী ছাত্রেরও কান খাড়া হয়। ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক সবাই তখন মন দিয়ে ক্লাশের পড়া শোনে, note নেয়। এখানেও মনোযোগ চেষ্টাকৃত (Voluntary), এবং ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে এর যোগ আছে। চেষ্টাকৃত মনোযোগে অনেক সময়ই কোন বাধা অতিক্রম করতে হয়। ষ্টাউট্‌ মনোযোগকে **স্বেচ্ছাকৃত (Voluntary)**, **অ-স্বেচ্ছাকৃত (Non-Voluntary)** এবং **ইচ্ছা-বিরুদ্ধ (Involuntary)** এই তিন দলে ভাগ করেছেন। খুব মন দিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী কচ্ছি, তখন জানালার বাইরে বন্দুকের আওয়াজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মনকে টানে।

সব মানুষেরই বিশেষ কোন না কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকে। আমরা সেই বিশেষ আগ্রহ সম্পর্কিত আলোচনায় সহজেই আকৃষ্ট হই। যারা পূর্ববঙ্গের লোক, তাঁরা কাগজ খুলে পাকিস্তানে কোন গোলোযোগের সংবাদ থাকলে সে দিকে তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দেন। ছেলেরা কাগজ খুলে প্রথম দেখে খেলার খবর; মেয়েরা সন্ধান করে সিনেমার পৃষ্ঠায়, কোন্‌ নতুন 'বই' এল। মাড়োয়ারা দেখে শেয়ার মার্কেটের সংবাদ ইত্যাদি। এই মানসিক প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কতগুলি অভ্যাস ও সংস্কারের ফল। যিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্‌, তিনি কোন নতুন ফুল দেখলেই তার বিশ্লেষণ করতে বসেন, তার শ্রেণী বিভাগের দিকে তাঁর মন যায়। যিনি অঙ্কনে পটু তিনি মন দেন, ফুলের বর্ণ-বিন্যাস ও গঠনের দিকে, আর কবি হয়তো 'নীলমণিলতা'র সঙ্গে, কলিকাতার' মিল খুঁজে মনে মনে 'আধুনিক কবিতার' একটা খসড়া তৈরী করেন। এ সব ক্ষেত্রে

মনোযোগ একটা আকস্মিক ও তৎমুহূর্তের ব্যাপার নয়, এদের পেছনে ব্যক্তির বহুদিনের প্রস্তুতি আছে, এবং তার বিশেষ দিকে মনোযোগের যে প্রবণতা, সে সম্বন্ধে হয়তো সে সচেতনই নয়। কিন্তু এদের পশ্চাৎপটে আছে, ব্যক্তির অর্জিত কোন আগ্রহ বা অভীপ্সা (এ বিষয়ে Motivation অধ্যায়টিও দেখ।)[২৮]

মনোযোগের হেতু—Conditions of attention—কোন বিষয়ে যখন মনোনিবেশ করি, তখন তা বস্তুর কোন গুণের জন্যও হতে পারে, ব্যক্তির কোন নিজস্ব মনের তাগিদেও হতে পারে। প্রথম দলকে মান্ বললেন External determiners, আর দ্বিতীয় দলকে বললেন Internal determiners। মনোযোগের বাহ্য হেতুগুলি প্রথম আলোচনা করা যাক্।

শব্দের চেয়ে ছবি মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। আবার মানুষের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পশুপক্ষীর ছবির চেয়ে বেশী স্বাভাবিকভাবে মনকে টানে। আবার শব্দের মধ্যে, যেখানে ছন্দ ও মিল আছে, তা মনকে বেশী সহজে আকৃষ্ট করে।[২৯]

প্রবল উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপক প্রবল, তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হলে, তা সবলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মনকে আকর্ষণ করবে,—তীব্র আলো, বিকট শব্দ, হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক শক্, বিষম ঝাল, তৎক্ষণাৎ সেই বস্তুর দিকে মনকে আকর্ষণ করে।

ইঙ্গিতময়তা মনোযোগ আকর্ষণ করে, সাধারণতঃ যা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ, তা ক্ষণিকের জন্য মনকে নাড়া দেয়। কিন্তু তা আগ্রহকে টেনে রাখে না। যা সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ,—তার মধ্যে কোন রহস্য নেই, কোন চ্যালেঞ্জ নেই, তা বেশীক্ষণ মনোযোগকে ধরে রাখে না। কিন্তু যা আলো-আঁধারী, যা কিছু বা আবৃত (ঘোমটায় ঢাকা নূতন বৌর মুখ) যা অসম্পূর্ণ, তা কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে—পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এই জন্যই আর্টের ক্ষেত্রে, ইঙ্গিতের মূল্য এত বেশী।

---

২৮ Most of our acts of attending are continuing, rather than abruptly assumed sets, and they are sets of which we are frequently unaware. These continuing sets stem from our motives. They are related to drives, interests, attitudes, prejudices, and aspirations. Munn—Psychology, P. 518.

২৯ Munn—Psychology, P. 519.

শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ লেখক যতটা ব্যক্ত করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যঞ্জনা (suggestion) থাকে, তাঁর সৃষ্টিতে। তা জীবনের ফটোগ্রাফ নয়।

আলো যবে ভালবেসে
মালা দেয় আঁধারের গলে
সৃষ্টি তারে বলে। ৩০

বিজ্ঞাপনদাতা মনোযোগ আকর্ষণের এ কায়দা জানেন ; বিজ্ঞাপন-কৌশলীও মনোযোগ ধরে রাখবার এ কৌশল জানেন। যারা নীচুদরের বিজ্ঞাপন-দাতা, তারা রং-চং চটক্‌দার ছবি দিয়ে, মন ভুলাতে চান। দর্শকের কল্পনার উপর তার আস্থা নেই, তিনি তাই সবটাই প্রকাশ করে দেখাবার জন্যে, অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কিন্তু যিনি উঁচুদরের আর্টিষ্ট, তিনি দর্শকের কল্পনাকে রাঙিয়ে তুলেন (fires the imagination), তাকে পক্ষ বিস্তার করে উড়বার স্বাধীনতা দেন। আমেরিক্যান্‌রা হল সস্তা চটকদারের ভক্ত, জাপানীরা সত্যিকারের আর্টিষ্ট। তাঁদের সৃষ্টির গৌরব নগ্ন প্রকাশে নয়—নীরব ইঙ্গিতে।

উদ্দীপকের আয়তন, বৈপরীত্য, গতিশীলতাও নূতনত্ব মনকে টানে। উদ্দীপক বস্তুর আয়তন মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক, কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্ষণ হল, বৈপরীত্যের (contrast)। গ্রামের পথ দিয়ে হাতী চলে গেলে, একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখবেন না, এত বড় দার্শনিক আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি। আর প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে, লাল ঘাঘরা-পরা রূপী বাঁদর চেপে বসলে, মেঘের আড়াল থেকে, দেবকন্যারাও বুঝি উঁকি মেরে দেখবেন। যা ছবির কেন্দ্রে থাকে, তা অপেক্ষাকৃত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই ফটোগ্রাফার প্রধান বস্তুটিকে কেন্দ্রে রেখে তার পশ্চাৎপটকে (background) অস্পষ্ট করেন। গতিশীলতা জীবন্ত মনোযোগের ধর্ম, তাই এটা মোটেই আশ্চর্য নয়, যে নড়ন্ত চলমান বস্তু মনকে সহজে আকর্ষণ করে। তাই ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ণ যতটা মন ভোলায়, তার চেয়ে অনেক বেশী মনকে টানে চলচ্চিত্র। যা চলে, তারই বাঁকে বাঁকে, আছে নতুনের হাতছানি। আর মনোযোগের কাছে নতুনের আবেদন দুর্বার। "ফজলী আম ফুরুলো বলবো না, নিয়ে এস ফজলীতরো আম, বলবো যাও তো হে নিয়ে এসো বড় বাজার থেকে পাকা আতা।" অধিকাংশ 'ফ্যাসানের' অন্তরের সুরটি হল, 'নূতন কিছু করো।'

৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লেখন

যে উদ্দীপক বারে বারে মনের সামনে আসে তা মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপকের আর একটি গুণ, যা মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক, তা হচ্ছে পুনঃপৌনিকতা (repetition)। যে উদ্দীপক বারে বারেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এসে হানা দেয়, তা ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করেই। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষকেরা জোর দিয়ে বলেন, "বারে বারে পড়ো, তবে তো মন লাগবে, তবে তো শিখবে।" যে উদ্দীপকের নিজস্ব আকর্ষণীয় কোন গুণ নেই, তা বারে বারে মনের সামনে আসলে, তবেই চেতনায় গভীর দাগ কাটে। থর্ণডাইক্ একে শিক্ষণের একটি মূলসূত্র বলেছেন, (শিক্ষণ অধ্যায় দেখ)।

মনোযোগ ও আগ্রহ ঃ এবার মনোযোগের আন্তরিক হেতু (subjective determinants) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। মনোযোগের উদ্দেশ্য কোন সফলক্রিয়া সম্পাদন (পরীক্ষা পাশ করা, নতুন ফ্যাসানের একটা জামা তৈরী করা)। কাজেই যে কাজ ব্যক্তির বর্তমান আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত, তার প্রতি সে মনোযোগ দেয়।[৩১] পরীক্ষা পাশ করতে চাই, তাই ভাল না লাগলেও কেমিষ্ট্রির ফর্মূলা মুখস্ত করতে বসেছি। আবার, বর্তমান আগ্রহের সঙ্গে যোগ আছে বলেই, যে উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তার দিকেও মন দেই। "যখন আমার দুটি ছেলে শুনল যে, তাদের নিয়ে ফরাসী দেশে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব চলছে, তারা উৎসাহের সঙ্গে ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে গেল।"[৩২] যে উদ্দেশ্য আগ্রহ জাগায় তা মনোযোগও আকর্ষণ করে। কিন্তু উদ্দেশ্য যত দূরবর্তী হবে, সে বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখা, তত কঠিন হবে। চল্লিশ-বৎসর বাদে, হাইকোর্টের জজ হবার প্রলোভন দেখিয়ে বার বৎসরের ছেলেকে ল্যাটিন্ ব্যাকরণে মনোযোগ দেবার উপদেশ বৃথা।

অবশ্য চেষ্টা দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা, ক্রমে ক্রমে কোন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। আগে অশোকের অঙ্কে একেবারে মন ছিল না—কিন্তু

---

৩১ We may surmise that forced attention to uninteresting work, so far as it leads to success & satisfaction, may lead the student to face uninteresting tasks in a better spirit and with more determination. But we must note the condition stated, 'so far as it leads to success & satisfaction'; we have no reason to suppose that effort expended in vain will make a pupil more disposed to effort later on . . . unsuccessful effort is actually likely to discourage future efforts.

৩২ Valentine—Psychology and its bearing on Education, P. 230.

বলে থাকবে, বারে বারে জোর করে এ বিষয়ে সে মন দিয়েছে; কখন সে এ বিষয়ে ভুল করে এবং এমন মনোযোগ করে তা শুধু পূর্বের মত চেষ্টাসাপেক্ষ হয়। মনে রাখতে হইবে, অনুরূপ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা কোন বিষয়ে মনোযোগ করা তুলনায়—যদি তার সঙ্গে কোন আগ্রহ বা মানসিক অনুরাগ যুক্ত না থাকে।[৫৫]

প্রাচীন যৌ মানসিক শক্তি একাধার করে, ১৯০৫ কিংবা তারও আগে মনোবিজ্ঞানের কাছে তার কোন মানে কি? কিন্তু একাধারে মানসিক শক্তি একাধিক সম্বন্ধে তার আগ্রহ আছে বলেই, তার এই বিভিন্নমুখী বিষয়ে মনোনিবেশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের ধারণা (বিভিন্নমুখী বিষয়ের) মনোযোগের একটি প্রধান কারণ।

কর্মক্ষেত্রে এরূপ শিক্ষার ফলাফলের সূত্র (কর্মক্ষেত্রের শিক্ষণের ভিত্তি সূত্র দেখ) বলেছেন।

মনোযোগ ও অভ্যাস—প্রাচীনেরা মনোযোগকে মনের একটি বিভিন্ন শক্তি (faculty) বলে মনে করতেন। এর সঙ্গে শুধু ব্যক্তিদের সম্বন্ধ আছে, তার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও অনুভূতির সঙ্গে সম্বন্ধ যোগ আছে, এ কথা তাঁরা বুঝতেন না। তাই তাঁরা মনে করতেন, মনের এই শক্তিটিকে যত চালু রেখে, বারে বারে কাজে লাগানোই, তা থেকে সব চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যাবে। এটা সিদ্ধান্ত ভুল। উপযুক্ত আগ্রহ ছাড়া ব্যক্তিদের কেবল মাত্র অনুশীলন দ্বারা, মনোযোগ বেশীক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর বিষয়ে মনোনিবেশের অভ্যাসের দাম আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীনেরা এতে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছেন।[৫৬]

শিক্ষার সংক্রমণ মতবাদ—এই ভুল মতবাদ (*the doctrine of*

৫৫ Valentine—Psychology and its bearing on Education, P. 235.

৫৬ "The error of the old pedagogy lay in supposing that all drudgery gave a mental training, and that all acts of attention trained some power of volitional attention. The misfortune of much education is that children never do see that their drudgery has been worthwhile. No doubt, it often needs time to arouse interest in a given subject and occasional pressure now may result in interest and spontaneous work later. The mistake of some teachers and some schemes of education is to be content with "much later" or "never". Valentine—Latin; its Place and Value in Education, ch. 4.

McDougall. An Introduction to Social Psychology. P. 230.

ঔৎসুক্য এবং মনোযোগ: Interest & Attention—"মনোযোগ আর ঔৎসুক্য, অচ্ছেদ্য মিলনের গ্রন্থিতে বাঁধা। এক ভিন্ন অপরের অস্তিত্ব অর্থহীন। আমরা তাতেই মন দেই, যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, —যা আমাদের আগ্রহান্বিত করে।[৩৬]

ঔৎসুক্য অনেক সময়ই জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, তা দেখিয়েছি। আবার, তা একটি ভাব (Idea) কে কেন্দ্র করেও গড়ে ওঠে। ঔৎসুক্যটা বস্তুর গুণ নয়। বস্তুতে ঔৎসুক্যের উপাদান থাকতে পারে, তবু বস্তুটা নিজে কখনো ঔৎসুক্য নয়। ঔৎসুক্য একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য নয়, এটা ব্যক্তির মনে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংক্ষোভ-কেন্দ্র। "ঔৎসুক্যের স্থায়ী অবস্থার পশ্চাতে থাকে, একটি প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে আবেগপূর্ণ মানসিক গঠন (sentiment)। ঔৎসুক্য হচ্ছে এই স্থায়ী গঠন-সঞ্জাত সক্রিয় দিক"।[৩৭] যেখানেই ঔৎসুক্য, সেখানেই মনোযোগ। এই দুটি অবস্থা একই মানসিক গঠনের দুই পিঠ। মনোযোগ ঔৎসুক্যের বাহন হিসাবে কাজ করে। "কোন ব্যাপারে ঔৎসুক্য থাকা অর্থই, সেই বিষয়ে মন দেওয়ার প্রস্তুতি, এবং মনোযোগের পশ্চাতে আছে একটা মানসিক গঠনের সক্রিয়তা···কাজেই **ঔৎসুক্য হচ্ছে, মনোযোগের ক্রিয়াপ্রবণ সুপ্ত অবস্থা, আর মনোযোগ হচ্ছে, ক্রিয়াতে ঔৎসুক্য— Interest is latent attention, and attention is interest in action.**[৩৮]

Interest কথাটা যেমন বোঝায় আগ্রহ, তেমনি বোঝায় স্বার্থ। যা স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তাতেই আমাদের আগ্রহ। যা interesting, তাতে আমরা মন দেই। কিন্তু Interesting বললে সাধারণত বোঝায়, 'যা সুখকর'। কিন্তু সর্বদাই কি আমরা সুখকর জিনিষেই মন দেই? সুখকর জিনিষের অবশ্যই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কিন্তু মনোযোগের বস্তু অত্যন্ত অ-সুখকর, বিপজ্জনকও হতে পারে। ষ্টাউট্ বলেছেন, বিরক্তির বস্তুকে আমরা এড়াতে চাই, পরিবর্তন করতে চাই, তা উচ্ছেদসাধন করতে চাই, কিন্তু অন্যদিকে মনোযোগ চায় তার বস্তুকে ধরে রাখতে, বাড়াতে, চেতনায় তাকে

৩৬ Ross—Groundwork of Educational Psychology, P. 171.
৩৭ Ross—Groundwork of Educational Psychology, P. 173
৩৮ McDougall—An outline of Psychology, P. 272.

সুস্পষ্ট করে তুলতে।...কাজেই মনে হয়, মনোযোগের সঙ্গে বিরক্তির বস্তুর, একটা বিরোধ আছে। এ থেকে এটাই হয়তো আশা করা সঙ্গত, যে যেখানে আগ্রহ ক্রিয়ার অনুকূলে, সেখানে বস্তুর প্রতি মনোযোগ থাকবে, কিন্তু যেখানে আগ্রহ ক্রিয়ার প্রতিকূলে, সেই বস্তুর **বিরুদ্ধেই** মনোযোগ চালিত হবে। অর্থাৎ অপ্রীতিকর বস্তু থেকে মন আপনাকে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, যা অপ্রীতিকর তার প্রতিও আমাদের আকর্ষণ আছে, যেমন আকর্ষণ আছে প্রীতিকর বস্তুর প্রতি। সুসংবাদে আমরা মনোযোগ করি, দুঃসংবাদও মন দিয়ে শুনি।

এই আপাতবিরোধ দূর হতে পারে, যদি আমরা স্মরণ রাখি, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা অপ্রীতিকর, তার সম্বন্ধে চিন্তা করব না, এটা মনে করলেই তাকে সরিয়ে রাখা যায় না। রেলে কোথাও যেতে যেতে যদি টিকিটখানা হারিয়ে ফেলি, তখন যে বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে চিন্তাকে মন থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য কোন সুখকর বিষয় চিন্তা করলেই তার সমাধান হবে না। তখন কিছু একটা করতেই হবে। এবং কিছু করতে হলেই, মনোযোগের প্রয়োজন।[৩৯] খড়ের ঘরে বাস করে, পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে যে সচকিত হই, তা সুখকর বলে নয়, তা উদ্বেগজনক বলে,—সেই অবস্থার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে হবে বলে। অর্থাৎ **এখানে মনোযোগ এই কারণে নয়, যে এটা সুখকর। এখানে মনোযোগ দিতে বাধ্য হই, কারণ এখানে স্বার্থের তাগিদ আছে।** ব্যক্তির interest এখানে বিপন্ন। সুতরাং interesting বলে আমরা মনোযোগ দেই এ কথা না বলে মনোযোগ দিয়েছি সেজন্যই তা Interesting এ কথাই বলা উচিত।[৪০]

প্রতিভা ও মনোযোগ— Genius & attention—যাঁরা অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন, তাঁদের মনোযোগ স্থির, গভীর ও বহুবিস্তৃত। তাঁরা একই বিষয়ে, মনকে বহুক্ষণ নিবদ্ধ রাখতে পারেন, মনোযোগ সাহায্যে বস্তুর বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণে তাঁরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী পটু, তাঁরা বহু বিষয়কে মনের মধ্যে গ্রহণ করে. তাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারেন, সহজে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের প্রভেদ বুঝতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষমতা কি

---

৩৯ Stout—Manual of Psychology, P. 174.

৪০ Valentine—Psychology and its bearing on education, P. 229.

জন্মগত না আয়াসলব্ধ? এটি একটি প্রাচীন সমস্যা, ব্যক্তির জীবনে বংশগতির (heredity) প্রভাব প্রবলতর, না পরিবেশের প্রভাব প্রবল এই অত্যন্ত গুরুত্ব প্রশ্নের আলোচনা পরের অধ্যায়ে করব।

এখানে শুধু এটা উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, জনসনের মত যাঁরা মনে করেন যে প্রতিভা হচ্ছে পরিশ্রম করিবার অসীম ক্ষমতা (Genius is the capacity of taking infinite pains) তাঁরা মনে করেন, কষ্ট করে' চেষ্টা করে' পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশের শেষ ফল হল প্রতিভা। প্রতিভা, ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নীরস বিষয়েও মনোযোগের অভ্যাস থেকে সৃষ্ট হয়। এ মত, এই বিশ্বাস যে 'ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয় হয়' (the doctrine of grind) এবং শিক্ষার সংক্রামণ (Transfer of training) মতবাদেরই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার।

উইলিয়ম জেম্‌স কিন্তু বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানসিক ক্ষমতা জন্মগত এবং চেষ্টাদ্বারা এর উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। প্রতিভাশালীরা অধিকতর মনোনিবেশের ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা অনেক বেশী বিষয়ে রস পান। তাঁদের আগ্রহী উৎসুক মন, বহু বিষয়কে মনের মধ্যে একতার দৃঢ় সূত্রে বাঁধতে সমর্থ। তাঁদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সজীব বলেই, তাঁদের মনোযোগ সুফলপ্রসূ। মনোযোগের অভ্যাস-দ্বারা তাঁরা প্রতিভাধর হন নি, প্রতিভাধর বলেই তাঁদের সজীব মনোযোগের ক্ষমতা সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী।[৪১]

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের ব্যবহার: সর্বশেষে মনোযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন, মনোযোগের ফলে কি হয়, এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে মনোযোগকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়?

মনোযোগ যে আমাদের চিন্তাধারাকে সুগম ও সুসাধ্য করে, একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলাম, কেন না, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে চেয়েছি। তাই জ্ঞান বা চিন্তার ওপর মনোযোগের প্রভাব যথেষ্ট। কাজেই শিক্ষা-বিজ্ঞান চিন্তা নিয়ে যার কাজ-করবার, সেও মনোযোগের ফল

১ 'Geniuses' writes James "are commonly believed to excel other men in their power of sustained attention. In most of them it is to be feared, the so-called 'power' is of the passive sort. Their ideas coruscate every subject branches infinitely before their fertile minds and so for hours they may be rapt. *But it is their genius making them attentive, not their attention making geniuses of them.*"

সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি মনোযোগের ফলে বস্তুকে আমরা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। এই স্পষ্টতা আনবার জন্মে মনকে যথেষ্ট শক্তি খরচ করতে হয়। কিন্তু পটভূমিকা থেকে জিনিষটা বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াই মনোযোগের একমাত্র কাজ নয়। বস্তুটিকে জানার সময়ও সে সংক্ষেপ করে। অর্থাৎ মনোযোগ দেওয়ার ফলে জিনিষটা আমাদের তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আসে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সময় আর পরিশ্রম বাঁচানোটা, কম কথা নয়। মন দিয়ে যা পড়া হ'য়েছে, তা শেখা হ'য়েছে তাড়াতাড়ি—মন দিয়ে যা শোনা হ'য়েছে, সেই পড়ানোটা মনে গেঁথেছে সহজে। শিক্ষার ভূমিতে এই পরিশ্রমের অপচয় নিরোধের জন্তই মনোযোগের মূল্য অপরিসীম। এ ছাড়া শেখানো পড়াকে মনে ধ'রে রাখবার সময়ও, মনোযোগ অনেক বাড়িয়ে দেয়। স্মরণের মণিকোঠায় আমাদের যা সঞ্চয়, তা আসতে পারে, একমাত্র মনোযোগ থেকেই। তাই স্মৃতি বা মনে রাখার ওপর মনোযোগের প্রভাব আছে যথেষ্ট। শিক্ষকও মনোযোগ বাড়িয়ে স্মরণশক্তিকে দৃঢ় ক'রে তুলতে ঝোঁক দেন খুব বেশী।

মনোযোগের আরেকটা ক্ষমতা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। মনোযোগ যে বস্তুতে ন্যস্ত হয়, তাকে সে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতে চায়। ফুলটাকে মন দিয়ে দেখতে গেলেই, আমরা তার প্রত্যেকটি পাপড়ির গড়ন, তার মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য আলাদা আলাদা ভাবে লক্ষ্য করি,—এই হল মনোযোগের বিশ্লেষণী ক্ষমতা।

ঠিক বিপরীত একটা শক্তিও মনোযোগের আছে। সে জিনিষের মধ্যে সামগ্রিকতা খুঁজতে যায়। যে বস্তুতে মন নিবিষ্ট হ'য়েছে, সে বস্তু সম্পূর্ণভাবে কেমন, পটভূমির সঙ্গেই বা তার কি সম্বন্ধ,—তার নিজের মধ্যের খণ্ডাংশগুলিই বা তার মধ্যে কেমন ছন্দোবদ্ধ ভাবে আছে, এ প্রশ্নের জবাব মনোযোগ নিজেই খুঁজে নেয়। প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে একটি ঐক্য আছে, সেটা মনোযোগের ফলে আবিষ্কৃত হয়। যেমন আকাশের বিচ্ছিন্ন অগণ্য অনাত্মীয় তারা আর গ্রহের মধ্য দিয়ে মনোযোগী সন্ধানী কেপ্‌লার খুঁজে বের করেছিলেন, তাদের একতার সূত্র,—সূর্যের সঙ্গে সৌরজগতের নিবীড় আত্মীয়তা। শিক্ষা ও শিক্ষণের একটা মস্ত কাজ হচ্ছে, মূলগত সম্বন্ধ আবিষ্কার ও তার অনুসরণ। মনোযোগ ছাড়া কাজটি হতেই পারে না। কাজেই উন্নততম জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোযোগ অত্যাবশ্যক।

মনোবিজ্ঞানী শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের এই গুণগুলির সাহায্য নিলেন। শিক্ষায় মনোযোগ যদি আকর্ষণ করতে হয় তবে যা সম্পূর্ণ, যা একটি ছন্দে গাঁথা এমন বস্তু নিলে মনোযোগ সহজ হ'বে। তেমনি শিশুশিক্ষার জন্ত তাঁর আকর্ষণীয় নূতন জিনিষ নিয়ে পড়াশুনাকে সহজসাধ্য আর মনোরম করতে চেষ্টা করলেন। পড়াশোনায় এই মাধুর্য আনবার প্রয়াসের পেছনে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় আছে, কেন না ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিকরা মনোযোগের সঙ্গে ঔৎসুক্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা বুঝতে পারলেন এবং আরও বুঝলেন মনোযোগ কার্যকরী করতে হ'লে, ব্যক্তির মনে বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতেই হ'বে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোযোগের এই প্রধান সহায়টির দিকে তাঁরা তেমন নজর করেন নি।

"এতদিন পর্যন্ত একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি যে ছাত্রদের মনোযোগী করতে হবে, কিন্তু সম্প্রতিই মাত্র এ কথাটি ঘোষিত হয়েছে যে ছাত্রদের উৎসুক করেও তুলতে হবে।"[৪২]

কোন কোন মাষ্টার মশাই এতে নাক কুঁচকে আপত্তি জনালেন, এতে তো ছেলেগুলি একেবারে বখে যাবে। সব পড়াশোনার ব্যাপারেই যদি ভাল লাগানোর রাংতা পরাতে হয়, তবে বড় হ'য়ে শিশুরা কঠিন পড়াশোনার মুখোমুখি হবে কখন? পড়াশোনা পড়াশোনাই; তাতে ঔৎসুক্য বা আনন্দ সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ কথার উত্তরে মনস্তাত্ত্বিকরা সবিনয়ে জানালেন আগ্রহ সব সময়েই তো ভাল-লাগা নয়, দাঁত-তুলবার-ঘরের চেয়ারটা নতুন ধরণের ব'লে ঔৎসুক্য জাগায় বটে, তা বলে সে তো কিছু সুখকর জায়গা নয়। ঔৎসুক জাগানোই মনোযোগের পক্ষে দরকার, সেখানে আনন্দের প্রশ্নটা গৌণ, কিন্তু গৌণ বলেই তা নগণ্য নয়। স্কুলের পড়া আমার নীরস লাগছে তবু তাতে আমার আগ্রহ আছে, কেন না তা আমার স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু তারই পাশে পাশে যখন পড়াটা ভাল ক'রে তৈরী করতে পারছি সেখানে কি সাফল্যের আনন্দটার দাম নেই? এই জয়ের উল্লাসই আমাদের পড়াশোনায় মন দিতে সাহায্য করবে,— সাহায্য করবে বড় হ'তে।

আনন্দ দানের রীতি শিক্ষায় আজকাল খুব বড় একটা জায়গা অধিকার

---

৪২ Ross—Groundwork of Educational Psychology.

করেছে। দেখা গেছে আনন্দিত শিক্ষা অবসাদকে (fatigue) ঠেকিয়ে রাখে। মনোযোগ দিতে গিয়ে ছাত্রদের মনে যাতে ক্লান্তির ম্লান স্পর্শ না লাগে, তার জন্ম আনন্দের উপকরণ রাখতে হ'য়েছে আধুনিক শিক্ষকের। খোকনের নতুন মাষ্টারমশাই খেলায় মন দেওয়ার জন্ম এখন আর খোকনকে মারধোর করেন না; তিনি পড়াশোনাকেই তার নতুন খেলা করে তুলবার ব্রত নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল 'ইস্কুল পালানো ছেলে' ছিলেন, কারণ ইস্কুল তাঁর ঔৎসুক্য আকর্ষণ করতে বা পূরণ করতে পারেনি। তাই যেদিন শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়লেন সেদিন চাইলেন এমন একটি মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যা ছেড়ে ছাত্র পালিয়ে যেতে চাইবে না। এই হ'ল বর্তমান বিদ্যালয়ের আদর্শ।

বুদ্ধিমান শিক্ষক জানেন পড়াশোনায় শিশুকে মনোযোগী করতে হ'লে আনন্দ দিয়ে তাকে আগ্রহী আর উৎসুক করে তুললে কাজ সহজে হ'বে। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে আরও ভাল ক'রে এরা পড়তে শিখবে। শিশুরা গভীরতর অনুভূতির (sentiment) ক্ষেত্রে যদি বা খাটো, সহজপ্রবৃত্তির দিক দিয়ে তো শক্তিধর। তাই শিক্ষক এদের প্রবৃত্তিগুলোকে নাড়া দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন লেখাপড়ায়। সেখানেই তাঁর কাজ থেমে থাকে নি। তাঁর প্রস্তুতি চলেছে মানব শিশুকে গড়ে তুলবার কাজে। ধীরে ধীরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এদের হবি (hobby) বা খেয়ালকে কেন্দ্র করে নানা রকম ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন শিক্ষক। আরও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করে, পড়াশোনায় মন বসানোর কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের এটাই সব চেয়ে বড় অনুভূতি,—আমি হার মানবো না। সেই অজেয় মনোবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্যকরী হয়েছে। এর সাথে শিক্ষক পড়াশোনাকে ভালবাসার শিক্ষাও দিয়ে চলেছেন, আস্তে আস্তে। অঙ্ক আজ তাঁর ছাত্রদের কাছে ভীতির বস্তু নয়,—শুধু পরীক্ষা পাশের উপায় নয়, আনন্দ আহরণের পথ। ছাত্র অঙ্ককেই ভালবেসেছে। এমনি করে ভালবাসার সেন্টিমেণ্ট তার মনোযোগকেই অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছে। শুধু পড়াশোনা ছাড়া, চরিত্র গঠনের কাজেও মনোযোগ আর ঔৎসুক্যের সঙ্গমে যথেষ্ট সুফল ফলতে দেখা গেছে। যা আমাদের শুভ, যা আমাদের শ্রেয়ঃ, তাকে আমরা

নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছি, কেন না, এতে আমাদের ঔৎসুক্য (interest) আছে। ফলে আমরা তাতে মনোযোগী হ'য়েছি। এ মনোযোগ ঔৎসুক্যের সঙ্গে মিলনে শুধু কার্যকরী হয় নি, তা আনন্দের হ'য়েছে।

এমনি করে মনোযোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলছেন শিক্ষাবিদরা, ঔৎসুক্যের অপরিহার্য সাহায্যে। সমাজের চরিত্র গঠনের যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন, তা পালন করতে গিয়ে তাঁদের মত পরিবর্তিত হ'য়েছে অনেকবার,—পথও বদলেছে বারে বারে, তবু একদিন তাঁদের প্রয়াস সার্থক হ'বে, সাফল্যমণ্ডিত হ'বে, এ ভরসা আমরা রাখি, কেন না এতদিনে তাঁরা মানুষের মূল স্বভাবটি খুঁজে পেয়েছেন, এবং তাঁদের শিক্ষার ধারাও সেই মূলের ওপরেই আজ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

দশম অধ্যায়

বংশগতি ও পরিবেশ

"হবে না ? কত বড়ো বাপের বেটা !"

"কিন্তু বাপ বড়ো হ'লেই ছেলে বড়ো হয় না, শ্যাখ না, অতো বড়ো মহাপ্রাণ নেতার ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে তার কি পরিণতি হোল !"

বাসে চলতে চলতে দুই বন্ধুর বাক্যালাপের টুক্‌রো একটি অংশ। কিন্তু যে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা শিক্ষাবিদের কাছে একটা মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্ন। বংশানুক্রম (heredity) বড়, না পরিবেশ (environment) বড় ? পরস্পরের সম্বন্ধ কি ?

একই ক্ষেতে পাশাপাশি পোঁতা হোল দুটি বীজ,—একটি বেড়ে হোল আমগাছ—আর একটি কাঁঠাল গাছ। তফাতটা কেন ? নিশ্চয়ই বীজের তফাত।

আবার একই বীজ বুনে দেওয়া হোল দুটি সমান ক্ষেতে। একটিতে সার দেওয়া হোল, আর একটি রইল বিনা সারে। একটিতে ফলন হোল তিন মণ ধান, অন্যটিতে দশ মণ। তফাতটা কেন ? নিশ্চয়ই মাটির যত্নে।

Nature and Nurture

প্রত্যেক মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে বহু বহু কারণের উপরে,—তার পিতামাতা, সমাজ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক প্রভাব, কত কি। কিন্তু এ সমস্ত কারণকে চূড়ান্তভাবে দুটি মূল কারণে আমরা ভাগ করে বলতে পারি,—বংশগতি ও পরিবেশ,—যাকে নান্ (Nunn) বলেছেন **Nature and Nurture** [১] বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে অনেক লোকের গোদ হয়। এ রোগের কারণ ফাইলেরিয়া ক্রিমিকীট (filarial worms)। এ রোগের বাহক হচ্ছে একজাতীয় মশা (Wuchereria Bancrafti)।[২] সে অঞ্চলে এ মশার আধিক্য। এখানে কারণটাকে পরিবেশগত বলে নির্দেশ করতে পারি। আবার মার কটা চোখ, তার ছেলে মেয়েদেরও তাই। এখানে কারণটা প্রকৃতিগত

---

১ Nunn, P.—Education. Its data and principles.

২ Filarial worms-carrier certain kinds of mosquitoes, Wuchereria Bancrafti.

বা বংশানুগতিজনিত। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই দুটি শক্তি কাজ করছে। বাস্তবিকপক্ষে বলা যায়, **ব্যক্তি বংশগতি ও পরিবেশের গুণফল।** এখানে কোন একটিকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না। একটি ক্ষেত্রের পরিমাণ (বর্গফল = area) নির্ভর করছে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফলের উপরে। দুটি ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে সমান হলেই তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে না। আবার দুটি ক্ষেত্র অসমান দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ক্ষেত্রফলে সমান হতে পারে। তেমনি দুজন মানুষ একই পিতামাতার সন্তান, তবু তারা তফাৎ। আবার বিভিন্ন পরিবারের দুটি ছেলে, অথচ বুদ্ধি বিবেচনায় তারা প্রায় কাছাকাছি। মানুষকে বুঝতে গেলে, তাঁদের মধ্যে তফাত ও মিল বুঝতে গেলে, দুটিই জানতে হবে। কোনটিকেই বাদ দেবার উপায় নেই।

এ কথা মেনে নিলেও ঝগড়া বাধে। কথা থেকে যায়,—এ দুটির মধ্যে কোনটির প্রভাব বেশী। একদল, তারা বংশানুক্রমের উপর বেশী জোর দিচ্ছেন,—তাঁরা বলছেন, ভাল ফসল পেতে হলে, ভাল বীজ চাই-ই। ইংরাজী প্রবাদ আছে,—You cannot make a silk purse out of a sow's ears—অর্থাৎ শূকরের কান দিয়ে রেশমী রুমাল হয় না। আর একদল বলেন—চাই যত্ন, চাই নিষ্ঠা, ঘসতে ঘসতে পাথরও ক্ষয়ে যায়—মরুভূমিতে সোনা ফলে। পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই নিমাইয়ের মত গুরুর সঙ্গ পেয়ে হোল মহাভক্ত, পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগে ধূলিমুষ্টিও হোল সোনা।*

উডওয়ার্থ বলেছেন, "কোন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, তার মধ্যে কোন শক্তি প্রবলতর, তা হ'লে প্রশ্নটার কোন মানে হবে না, কারণ এই দুটি

---

* আমরা ফরাসী মনীষী Helve'tius (1704-71), দার্শনিক John Locke (1632-1704), সমাজতত্ত্ববিদ্ Robert Owen (1771-1858) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি, যাঁরা বংশানুক্রমের প্রভাবকে অস্বীকার করে পরিবেশকে বড় করে দেখেছেন। অপর পক্ষে Francis Galton ও তাঁহার অনুগামী Karl Pearsonএর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, যাঁরা বংশানুক্রমকে বড় বলে দেখেছেন। Galtonএর মতবাদ অনুসারে Galtonian School গড়ে উঠেছিল—"The basis of Galton's life-work was the conception that nature for man is more important than nurture, that this principle can be established quantitatively, and that only when it is fully realised will humanity be able to raise itself in the scale of mental and physical fitness."

—K. *Pearson* "Some Recent Misinterpretations of the Problem of Nature & Nurture" Eugenics Lab. Lecture Series. Quoted by *F. S. Freeman*. "Individual Differences." P. 78.

শক্তির সম্মিলনেই (যোগফলে নয়, গুণফলে) মানুষটা। কিন্তু দুইজন বা দু'দল মানুষের মধ্যে তফাত কেন হয়,—কোন শক্তি এ ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী এ প্রশ্ন সঙ্গত। একটা মোটর গাড়ীর চেয়ে আর একটা ভাল চলে, তার কারণ হতে পারে একটার চেয়ে আর একটার মোটর ভাল, অথবা একটার চেয়ে আর একটায় ভাল তেল ব্যবহার করা হচ্ছে।"

বংশগতি কি ? পরিবেশ কি ?

কিন্তু প্রশ্নটার বা প্রশ্নগুলির বিচারের আগে বোঝা দরকার,—বংশগতি (heredity) কাকে বলি, আর পরিবেশই (environment) বা কাকে বলি। উড্ওয়ার্থ থেকেই আবার জবাবটা নিচ্ছি—"মানুষ যা নিয়ে তার জীবনটা সুরু করল, তাকে বলি বংশগতি। জীবনটা সুরু হয়েছে তার জন্ম-সময়ে নয়, তারও প্রায় ন'মাস আগে। আর পরিবেশ বলতে বুঝি, এর পর থেকে ব্যক্তির উপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে।[৪]

একই পিতামাতার কয়টা সন্তান, তাদের বংশগতি কি এক ? মোটামুটী এক, তথাপি সম্পূর্ণ এক নয়। পিতামাতার সার্থক সঙ্গমের মুহূর্তে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হোল, তা কোন সময়ই পিতামাতার দেহের সম্পূর্ণ একই উপাদান বহন করে না। এমন কি, দুইটী যমজ সন্তানের বংশগতি বহুলাংশে এক হলেও, সম্পূর্ণ এক নয়। আবার পরিবেশ স্থূলভাবে এক হলেও, বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ এক নয়। একই মাটী থেকে আমগাছ যে রস সংগ্রহ করছে, নিমগাছও সেই রসই সংগ্রহ করে না। তাই একই পরিবারে একই ভাবে বর্ধিত হলেও দুটী শিশুর পরিবেশ এক নয়। উড্ওয়ার্থ তাই **কার্যকরী পরিবেশ (effective environment)** কথাটা ব্যবহার করেছেন। ইভ্ক্যুরী (Eve Curie) তাঁর মার বিখ্যাত জীবন কাহিনীতে লিখেছেন যে মাদাম ক্যুরী কৈশোরেই বই পড়তে ভালবাসেন। তাঁর অন্যান্য ভাই-বোনেদেরও কতকটা সে গুণ ছিল। কিন্তু মাদাম ক্যুরী এমন নিবিষ্ট হয়ে যেতেন যে তার আশে পাশে শত গোল-যোগেও তার ধ্যান ভঙ্গ হত না। ক্যুরী ঘরে বসে তন্ময় হয়ে পড়ছেন, তাঁর ভাই বোন যোজিয়া, হেলা, ব্রনিয়া মিলে কাঠের টুল টেবিল চেয়ার দিয়ে উঁচু

---

৪ "Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life (not at birth, but at the time of conception, about nine months before birth) while environment covers all the outside factors that have acted on him since that time." Woodworth and Marquis : Psychology, P. 152.

করে দুর্গ তৈরী করলো। হঠাৎ চীৎকার করে ধাক্কা দিলে, এবং দুর্গ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো! চকিত হয়ে ক্যুরী চোখ তুলে চমকে চাইলো অপ্রসন্ন মুখে, শুধু একবার বললে—একি বোকামী!—তারপর আবার বইয়ে ডুবে গেলো[৫] এখানে এই যে আসবাবপত্রের পরিবেশ এটা ক্যুরীর কাছে থেকেও নেই, এটা কার্যকরী পরিবেশ (effective environment) নয়, তার কাছে। ঠিক তেমনি, কলেজে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু প্রজাপতি নবনীতা তার পেছনের বেঞ্চটীতে বসে, মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে ফিস্ ফিস্ করে গল্প করে,—শাড়ীর দোকানের, গাড়ীর গুণাগুণ, সিনেমা-এ্যাক্ট্রেস্ আর নিজ অপূর্ব 'অভিজ্ঞতার'। এখানে কলেজের মনোজগৎ চপলা নবনীতার কাছে অর্থহীন। অথবা রবীন্দ্রনাথের 'যথাস্থান' কবিতায় দেখছি—

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
মেহগিণির মঞ্চ-জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অ-স্বাদিত মধু যেমন, যূথী অনাঘ্রাতা।[৬]

'ভাগ্যবন্ত'দের কাছে এই গ্রন্থের সংগ্রহ, ঐশ্বর্য-বিকাশের একটা বাহ্য উপায় মাত্র। পরিবেশ এখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না,—ব্যক্তির প্রকৃতি মধ্যে রয়েছে বিমুখতা।

দুই-এর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ

বীজের থেকেই গাছ সত্যি। কিন্তু অনুকূল জমিতে বীজ যতক্ষণ না পড়লো, ততক্ষণ, তা শুধুই সম্ভাবনা। আবার জমিতে হাজারো সার দিচ্ছি, যত্ন কচ্ছি, কিন্তু বীজ পোতা হোল না। তাতে অঙ্কুরও গজাবে না। বীজের মধ্যের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে প্রকাশ করে বা ক্ষুন্ন করে, ক্ষেতের মাটীর গুণাগুণ, আর মালির যত্ন বা অবহেলা।

হাঁসের ডিমের থেকে হাঁসই জন্মে, মুরগী নয়। আবার হাঁসের বাচ্চাকে জন্মের থেকে অন্য হাঁসের বাচ্চার থেকে আলাদা করে মুরগীর বাচ্চার সঙ্গে 'মানুষ' করা হোল। তাকে দেওয়া হোল না কোন জলাশয়ের কাছে যেতে, পূরো একটী বছর। তারপর ঝুপ্ করে তাকে ছুঁড়ে দিলাম পুকুরের মাঝখানে।

৫ Eve Curie—Life of Madame Curie.
৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ক্ষণিকা।

প্রথম খানিকটা হকচকিয়ে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দিব্যি সাঁতার কাটতে লাগলো, অন্য হাঁসের মতো। অনুরূপ একটা মুরগীর ছানাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটা ডানা ঝাপটে জল খেতে খেতে ডুবে মরল। এটা বংশগতির প্রভাব, সন্দেহ নেই।

বংশগতি কি অবশ্যম্ভাবী? তবে কি বংশগতি একটা অন্ধ, অমোঘ অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য শক্তি যার প্রকাশ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না? এ কি গ্রীক ট্র্যাজেডীর অদৃষ্ট (Fate)?[৭] যারা বংশগতির গোঁড়া পক্ষপাতী, তাঁরা এ কথাই বলবেন। লোম্‌ব্রোসো (Lombroso) বলবেন, অপরাধী যতটা জন্মগত, ততটা শিক্ষাগত নয় (Criminals are more born than made)। জেলের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা অনেকে বলবেন—জাত-অপরাধী (criminal types) আছে, জন্মের থেকে যাদের প্রবৃত্তি বিকৃত। কথাটা হয়তো একবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আবার অন্য কতকগুলো ঘটনাও সত্য। কতকগুলো সমুদ্রের মাছের ডিম ফোটবার আগে চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে রাখা হোল। যখন ডিম ফুটল তখন দেখা গেল তাদের দুটো করে দু'দিকে চোখ না হয়ে, একদিকে একটা বড় চোখ। উদ্ভিদ্ ফল ফুল নিয়ে যারা পরীক্ষা করেছেন তারা নানা রাসায়নিক সার, আলো ইত্যাদি পরিবর্তন করে নানা রকমের নূতন ফুল তৈরী কচ্ছেন। রাশিয়াতে লাইসেন্‌কো (Lysenko) এবং তাঁর অনুবর্তীরা এ রকম নানা পরিবেশের পরিবর্তন করেই গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের অদ্ভুত উৎকর্ষ বিধান করেছেন, এবং গোঁড়া পরিবেশবাদীরা বলেন, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা ব্যক্তিত্বের যে কোন পরিবর্তনই প্রায় সম্ভব। নূতন রাশিয়াতে এ মত অত্যন্ত প্রবল।[৮] মানুষের ক্ষেত্রেও এ রকম পরীক্ষা বিরল নয়। নিতান্ত গাধা বখাটে ছেলে, বুদ্ধিমান্ চরিত্রবান্ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের প্রভাবে সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনাগুলি এমন জটিল আর আপাত-পরস্পরবিরোধী যে প্রশ্নগুলির একটা সোজা হাঁ বা না উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্ভবতঃ এ কথা বলা যায়,—বংশগতি বা heredityর মধ্যে যে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, পরিবেশ তাকে কোন প্রকারেই সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কোন্ ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে কি বংশগতি লুকিয়ে আছে তা নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। পরিবেশের মধ্যেই সেই শক্তি,

---

৭ Dumville—The Child Mind.

৮ Dyson Carter—Soviet Science.

সেই সম্ভাবনা রূপ পায়। তবে বংশগতি অনিবার্য নয়। বংশগতির অবাঞ্ছনীয় কোন কোন গতি চেষ্টা দ্বারা, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা রুদ্ধ করা যায়।

বংশগতি বড় না পরিবেশ বড়—এ দুরূহ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়, তবুও প্রশ্নটি সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা সবাই ভালো ফসল চাই, ভালো ফল চাই, ভালো মানুষ চাই। শিক্ষককে এ প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে। তার উপর যে নির্ভর কচ্ছে সকল শিক্ষাপদ্ধতি। যদি বংশগতিকেই চূড়ান্ত শক্তি বলে মানতে হয়, তবে শিক্ষকের কাজ হবে ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করে বিদ্যালয় গড়া, সমাজকে সুসন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা,—আর বংশের উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে, অধিকার ভেদে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু যদি পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা, যত্নের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা, উৎকৃষ্টতর শিক্ষার পদ্ধতি দ্বারা, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও অবাঞ্ছনীয় অসামাজিক প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভব হয়, তবে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাকে হাল ছাড়লে চলবে না। যে ছাত্র আপাত-দৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, মিথ্যাবাদী, স্বভাবতঃ দুর্বিনীত, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করে যত্নবান হতে হবে, তাকেও বড় করে তুলতে, সুন্দর সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে। ভারতবর্ষ এ কথা বিশ্বাস করেছে, সে বলেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম-স্বরূপ লুকিয়ে আছে। শিক্ষকের কাজ হবে সেই কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিকে জাগ্রত করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে বিকশিত করা—Education is the bringing out the divinity that is already in man. মনোবিদ্যায় যতটুকু আমরা জেনেছি, তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশী সত্য বলে মনে হয়। কাজেই একদিকে শিক্ষকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব। বিপদ হচ্ছে এই, যে শিক্ষক শিক্ষার দ্বারা একদল ছাত্রকে উন্নত করতে পারেন। সে উন্নতি হ'ল সেই ব্যক্তিদের পক্ষে **অর্জিতগুণ** (**acquired characteristic**)। সেটা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই উৎকর্ষ পরবর্তী বংশধরেরা জন্মের সূত্রে পাবে না। স্তাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, "পরিবেশ হচ্ছে বংশগতির পরিপূরক; পরিবেশ কেবল

মাত্র নির্ধারণ করে, বংশগতির কোন্ লক্ষণটি কতটুকু পরিমাণে বিকাশ লাভ করবে। বংশগতির মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই যদি পরিবেশের কাজ হয়, তা হ'লে শিক্ষা, যা হচ্ছে পরিবেশের একটা অঙ্গ, তা দ্বারা যা সম্পন্ন করা যেতে পারে, তার গণ্ডী নিতান্তই সীমাবদ্ধ! তা হলে জাতির স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়, যদিও অবশ্য শিক্ষা একটা পুরুষকে (generation) গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম।"[১]

আগেই বলেছি বংশানুক্রম আর পরিবেশ এমনি জড়িয়ে থাকে যে, তাদের আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার। আরও দুরূহ এ কারণে, যে আগেই দেখিয়েছি যে বংশগতি একটা সহজ শক্তি নয়, পরিবেশও সহজ শক্তি নয়,— দুটোর মধ্যেই অনেক জট রয়েছে। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে গেলে বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেই তা করতে হবে। যদি নিছক বংশানুক্রমের প্রভাব কতটা তা বুঝতে হয়, তবে বংশানুক্রম স্থির রেখে, পরিবেশ পরিবর্তন করে, ফলটা লক্ষ্য করে দেখতে হবে। আবার পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ করতে গেলে, পরিবেশ স্থির রেখে, তাতে বিভিন্ন বংশানুক্রমের উপর কি ফল হয়, তা দেখতে হবে। এ ছাড়াও বিষয়ের জটিলতার জন্যে আরো বহু রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে, তার কিছু পরিচয় পরে আমরা দেবো। কিন্তু তার আগে বংশগতির মূল উপাদান এবং বংশগতি কি ভাবে এবং কি রীতি অনুযায়ী কাজ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

বংশগতির কল কৌশল—Mechanism of heredity—পিতা ও মাতার সার্থক সঙ্গমের ফলে মাতার গর্ভে ভ্রূণের প্রথম প্রাণসঞ্চার হয়। ভ্রূণের সেই প্রথম অবস্থার নাম যাইগোট্ (zygote)। এই যাইগোট্ (zygote) একটি এক কোষবিশিষ্ট (unicellular) প্রাণকেন্দ্র। এতে পিতা ও মাতার দৈহিক উপাদান সমভাবে থাকে। এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোষটি দ্রুত ভেঙে, এক হ'তে দুই, দুই হ'তে চার, এই ভাবে বিভক্ত হয়ে বেড়ে উঠে, শিশুর সমস্ত দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কোষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিউক্লিয়স (nucleus)। এই নিউক্লিয়সের মধ্যে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম্ (chromosome)। শ্রীযুত গোপাল হালদার 'ক্রোমোজোম্' কথার বাংলা

---

১ Sandiford—Educational Psychology.

করেছেন রঞ্জনিক।[১০] (মানুষের বেলায় ২৩ জোড়া,—উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণতঃ অনেক কম)। এই ক্রোমোজোম এর একটি এসেছে পিতার দেহ থেকে, আর একটি এসেছে মাতার দেহ থেকে। একটি কোষের নিউক্লিয়স্ ভেঙ্গে যখন দুটি কোষ হয়, তখন প্রত্যেক কোষেই এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ দেখা যায়। সুতরাং দেহের প্রত্যেকটি কোষেই পিতামাতার দেহের বা বংশগতির উপাদান ছড়িয়ে আছে। কেমন করে এক কোষ দুই হয়, তার ছবি দিচ্ছি।

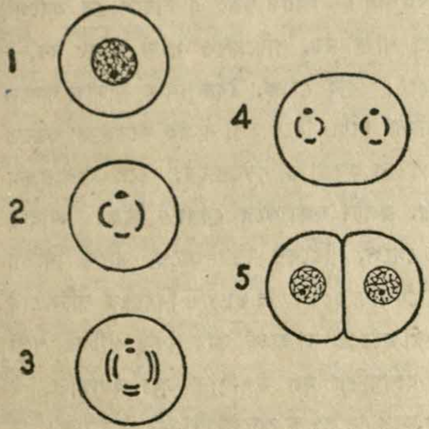

এখানে বোঝাবার সুবিধার জন্যে ২৩ জোড়ার বদলে মাত্র ৪ জোড়া ক্রোমোজোম দেখানো হল।

Fig. 21. Cell division and chromosomes—from Woodworth. Psychology—A study of Mental life, P. 197, Fig. 24. Methuen.

এই ক্রোমোজোমগুলির উপর দেহের নানা বৈশিষ্ট্য (যেমন কালো চোখ, কটা চোখ, বেঁটে হওয়া, ঢ্যাঙা হওয়া ইত্যাদি) নির্ভর করে। পূর্বে মনে করা হোত, এগুলিই বংশানুক্রমের মূল উপাদান। কিন্তু পরবর্তী কালে আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে জানা যাচ্ছে যে, ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে নানাভাবে সাজানো নানা আকারের অতি ক্ষুদ্র সুতার টুকরোর মত জিনিষ থাকে। এগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। এরা যে ভাবে সাজানো থাকে সে ক্রম নির্দিষ্ট এবং সব কোষের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় সমান থাকে। এদের বলে জীন্স্ (genes)। মানুষের বেলায় এই জীন্ (gene) এর সংখ্যা সহস্রাধিক। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে এই জীন্ (gene) গুলোকেই বংশগতির মূল উপাদান বলে মনে হয়।

১০ গোপাল হালদার—বাজে লেখা পৃঃ ১৫।

মেণ্ডেলের সূত্র—Mendel's law—যোহন্ গ্রেগর মেণ্ডেল্ (Johann Gregor Mendel—1822-1884) ছিলেন জাতিতে জেক্ (Czech) এবং জীবিকা ছিল তাঁর পৌরোহিত্য। তিনি বংশগতির মূল সূত্রগুলি আবিষ্কারের জন্যে ১৮৬৫ সালে মটরদানা নিয়ে পরীক্ষা করতে স্থরু করলেন। মটরদানা নিয়ে পরীক্ষার স্থবিধে হল এই যে, এদের ফলন দ্রুত—দুই তিন পুরুষের বংশানুক্রমের ধারা অনুসরণ করা কঠিন নয়। তা ছাড়া তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র সাতটী, এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নতাও সাত রকমেরই। স্থতরাং ক্রোমোজোম্‌গুলির জন্যেই এই সাত রকমের বিভিন্নতা হচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে ক্রোমোজোম্ আবিষ্কার মেণ্ডেল করেন নি। এ নামও তিনি দেন নি। তিনি বলেছিলেন 'ইউনিট্ ক্যারেক্টার'। কিন্তু বংশগতির মূল সূত্রটীর তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তাঁর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তাঁর আবিষ্কৃত বংশগতির সূত্র প্রায় এক সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডি ভ্রিজ্ (De Vries) কোরেন্‌জ্ (Correns) ও শ্চারম্যাক্ (Tschermak) পুনঃ আবিষ্কার করেন। মেণ্ডেলের 'ইউনিট্ ক্যারেক্টার'কেই তাঁরা বললেন ক্রোমোজোম্, এবং মেণ্ডেলের স্মৃতির সম্মানার্থ তাঁদের পুনরাবিষ্কৃত সূত্রকে তাঁরা মেণ্ডেলের বংশানুক্রমের সূত্র নাম দিলেন। আরও দেখা গেল, এক এক জোড়া ক্রোমোজোমের (পিতার দেহ থেকে এক, মাতার দেহ থেকে এক) সঙ্গে এক এক জোড়া গুণের সম্বন্ধ আছে। আবার এক জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের সঙ্গে, অন্য জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের কোন সম্বন্ধ নেই। যেমন একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে, যে মটরের পাকা দানাটা সম্পূর্ণ মসৃণ গোলাকার (Round); এর জোড়া ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে যে দানাটার উপরের চামড়াটা কুঁচকানো (Wrinkled)। আবার আর একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে লতাটা বেশ উঁচু হবে, এর জোড়াটার গুণ যে, লতাটা বেঁটে হবে। এখন গোল দানা বা কুঁচকানো দানা এইগুণের সঙ্গে গাছের উঁচু হওয়া বা বেঁটে হওয়ার কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলি বিচ্ছিন্ন কতগুলি শক্তি (unit character), যেগুলি আলাদা আলাদা ভাবে সন্তানে সংক্রামিত হয়।

(এবার গোল দানা মটরের সঙ্গে (যার পিতামাতা দুইই গোলদানাওয়ালা) যদি আর একটি গোলদানা মটরের মিশ্রণ হয়, তবে ফলটা অমিশ্র গোলদানা

মটরই হবে (RR)। তেমনি কুঁচকানো দানা মটরের সঙ্গে যদি কুঁচকানো দানা মটরের মিশ্রণ হয়, ফল অমিশ্র কুঁচকানো দানা মটর হবে (WW) এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু গোলদানা মটরের সঙ্গে কুঁচকানো দানা মটরের মিশ্রণ করা হলে, ফল কি হবে? এখানে ফলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই R এবং W ক্রোমোজোম তো রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ফলগুলি গোলদানা মটরই হয়েছে। এখানে R ক্রোমোজোম্ই প্রাধান্য পেয়েছে, W ক্রোমোজোম্ হটে গেছে। এখানে তাই R কে বলা হোল **প্রকট** (**Dominant**) আর W কে হোল **অপসৃত** (**Recessive**)। অর্থাৎ প্রকট ক্রোমোজোমকে (dominant chromosome) বড় অক্ষর আর অপসৃত ক্রোমোজোমকে (recessive chromosome) ছোট অক্ষর দিয়ে যদি লিখি, তবে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে পারি এভাবে,

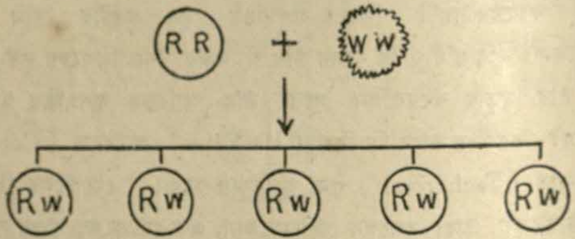

এতো গেলো প্রথম পর্যায়, First filial generation বা F_1র বেলায়। এখন (Rw) দের যদি পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ করা যায় তাহ'লে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে (F_2), সব মটর দানা গোল হবে না। তিনটে (শতকরা ৭৫) হবে অমিশ্র কুঁচকানো দানা (WW)। আবার তিনটি গোলদানার মধ্যে ১টি (শতকরা ২৫) হবে অমিশ্র গোলদানা (RR) আর দুটি হবে মিশ্র গোলদানা (Rw)। অর্থাৎ ছবি দিয়ে বোঝালে—

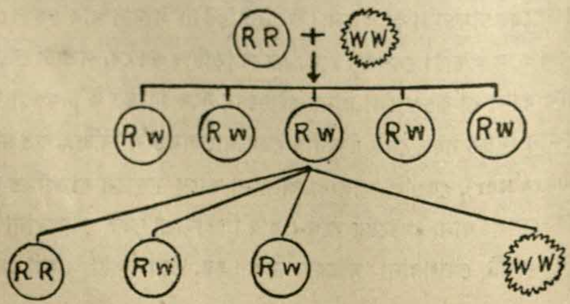

এর পর পর্যায়ে, অর্থাৎ F, পর্যায়ে, (RR) অমিশ্র গোলদানার ব্যবহার প্রথম পর্যায়ের (RR) অমিশ্রগোলদানার মতই হবে। অর্থাৎ এর দানা সর্বদাই অমিশ্র গোলই হতে থাকবে। তেমনি (WW) অমিশ্র কুঁচকানো দানার বেলায়ও, সর্বদাই তার থেকে (WW) দানাই পাওয়া যাবে। কিন্তু (Rw) দানাগুলি নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ করলে, আগের পর্যায়ের মত, ১টি (২৫%)-(RR), একটি (২৫%)-(WW) এবং বাকী দুটি (৫০%) হবে মিশ্র গোলদানা (Rw)। অর্থাৎ মোট গোলদানা হবে ৩ (৭৫%), আর কুঁচকানো দানা হবে ১ ((২৫%)। ছবি এঁকে দেখাই—

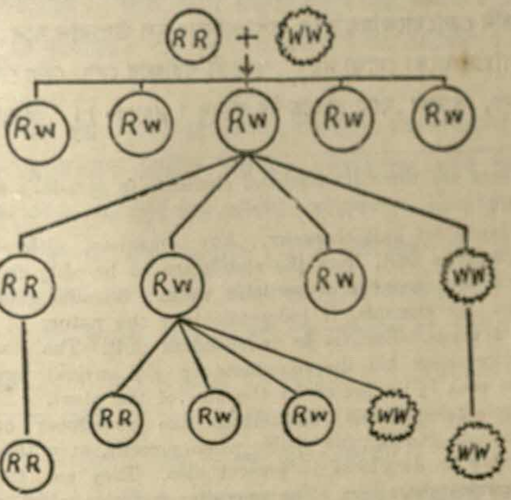

Fig. 22—Mendel's Law, from Sandiford—Educational Psychology. Longmans Green & Co.

মেণ্ডেল যে বংশানুক্রমের রীতি ও ধারা (Laws of heredity) আবিষ্কার করলেন তার ব্যাখ্যার তিনটি মূলনীতি হচ্ছে—

১। যদিও একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ দৈহিক দিক দিয়ে অখণ্ড, তবু বংশগতির দিক থেকে তাতে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রধান গুণ থাকে। একটা মটর দানা গোল বা কুঁচকানো হলে, তার গাছটা উঁচু বা বেঁটে দুরকমই হতে পারে।

২। বিপরীত গুণ উপস্থিত থাকলেও একটা গুণই প্রকাশ পায়, সেটাকে বলি প্রকট (dominant)। আর যে গুণটা বীজের মধ্যে থেকেও প্রকাশ পেলো না, তাকে বলি অপসৃত (recessive)।

৩। ক্রোমোজোমে বিপরীত দুটি গুণ থাকলেও সন্তান উৎপাদনকারী কোষে দুটি বিপরীত গুণের একটি মাত্রই থাকতে পারে। তাই উৎপন্ন সন্তানে একটি গুণই প্রকাশ লাভ করে।[১১]

মেণ্ডেল্ যখন ১৮৬৫ সালে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন, তখন এবং তার পরেও অনেক বৎসর পর্যন্ত এর বিশেষ কোন মূল্য প্রাণীতত্ত্ববিদরা দেন নি। অবশ্য মেণ্ডেলের মূলসূত্রগুলি ঠিক হলেও এ সূত্র একেবারে নির্ভুল নয়। তিনি ক্রোমোজোমগুলিকে বংশানুক্রমের মূল উপাদান মনে করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেল ক্রোমোজোম্‌ই মূলতত্ত্ব নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জীন্‌স্ (genes)। এদের উপর নির্ভর

---

১১ There are three fundamental elements in Mendel's explanation. These are :

(1) Independent unit character. Any organism, although physiologically a unit, from the standpoint of heredity is a complex of a large number of heritable units. Roundness or wrinkledness, for example, is independent of the nature of the plant, as a whole. Each is an independent unit. The plant may be tall or short, but the roundness or the wrinkledness of the ripe peas is unaffected by the size of the plant.

(2) Dominance—Certain characters, like roundness or tallness, dominate and become visible when present, even though wrinkledness or dwarfness is present also. They are thus termed dominant characters. The opposite character which recedes, as it were, in the presence of the dominant one, is called the recessive.

(3) Purity of the gametes (reproductive cells)—A better name for it is segregation. The reproductive cell can only contain one of the two alternative characters. It can, for example, contain the character for roundness or wrinkledness, but not both. If two germ-cells, each containing the factor for wrinklnedss, unite to form a zygote (fertilised egg), the resultant pea will be wrinkled; if one contains the factor for roundness and the other the factor for wrinkledness, the pea will be round owing to the dominance of roundness. Alternative characters are segregated in the formation of the germ cells, and no germ-cell can contain both. Sandiford—Educational Psychology, 32.

কচ্ছে জীবদেহের নানা লক্ষণ। কাজেই বংশানুক্রমের ধারা জীন্এর সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারটা যথেষ্টই জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে জীন্এর সংখ্যা সহস্রের উপর, কাজেই এদের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগে মানুষের গুণও হবে অজস্র। তা ছাড়া তিনি কোন গুণের প্রকটতা (dominance) সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচার করেছিলেন, সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকট ক্রোমোজোমের কাছে অপসৃত ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ হার মেনে হটে যাবে, এটা সব সময় সত্য নয়। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে দুই বিপরীত ক্রোমোজোমের সংযোগে মাঝারি এক গুণ সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবশ্য মেণ্ডেলও পরে স্বীকার করেছেন। আর তিনি ক্রোমোজোম মিশ্রণের ফল বংশানুক্রমে ৩ : ১ এই অনুপাত বলেছেন। সে কথাটাও মোটামুটি সত্য, একেবারে নির্ভুল সত্য নয়।

যাক্ মেণ্ডেলের সূত্র নূতন করে মর্যাদা পেয়েছিলো ১৯০০ সালের কাছাকাছি। তখন থেকে জীন্ ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণতত্ত্বে মেণ্ডেলের সূত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই জীন্ ফ্যাক্টর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন টি. এইচ. মরগ্যান্ (T. H. Morgan)। যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ্ খুব দ্রুত ফল উৎপাদন করে (যেমন আরসোলা, ইঁদুর, মাছি) তাদের উপর পরীক্ষা করেও মোটামুটিভাবে মেণ্ডেলের সূত্রের সমর্থন পাওয়া গেছে। মানুষের বেলায়ও মেণ্ডেলের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে কতগুলি লক্ষণ সম্বন্ধে, যেমন নীল বা বাদামী চোখ, কোঁকড়া শক্ত চুল, পুরু ঠোঁট, চামড়ার কর্কশতা, পাগলামী, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা ব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু চোখের রং সম্বন্ধে এবং আরো কয়েকটি অনুল্লেখযোগ্য লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি মেণ্ডেলের সূত্রের সমর্থন পাওয়া গেলেও, মানুষের অধিকাংশ দোষ, গুণ, প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। মানুষের দেহের কোষে রয়েচে সহস্র জীন্, তাদের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে বংশগতির ধারা এতই জটিল হয়ে পড়ে যে, পিতামাতার দেহের লক্ষণ মোটামুটি জানা থাকলেও, সন্তানের দেহে তার কোন লক্ষণটার দেখা পাওয়া যাবে, কোনটা পাওয়া যাবে না, কোনটা কি ভাবে পরিবর্তিত হবে, এ হিসাব করে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই উড্ওয়ার্থ ও মারকিস্ লিখছেন, "সন্তান দেহের সমস্ত জীন্ই পিতামাতার থেকে আসে, কিন্তু সেই জীনগুলির মিশ্রণ তার পিতা বা মাতা বা তার প্রত্যেকটি ভাই বা বোনের

থেকে বিভিন্ন, এবং একটি মানুষের মধ্যে যে যে জীনের মিশ্রণ আছে, ঠিক সেই মিশ্রণটি আর কোন মানুষের দেহে দেখা যায় না। এই জীনের মিশ্রণ এত বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যে তা বাস্তবিকপক্ষে অসংখ্য। প্রত্যেক শিশুর দেহের জীনের মিশ্রণ একান্তভাবে তারই। কাজেই **প্রত্যেক শিশুর বংশগতিও একান্তভাবে তারই নিজস্ব ধর্ম—The child's heredity is his own unique combination of genes.** [১২]

আবার উড্‌ওয়ার্থ তাঁর 'সাইকোলজী'তে লিখছেন "শুদ্ধ প্রাণ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সন্তান বংশগতির সূত্রে, পিতামাতার কাছ থেকে, কি পায় ? উত্তরাধিকার সূত্রে সে পায় ক্রোমোজোম্, সে পায় জীনস্। তার দেহের জীন্‌গুলি তার পিতামাতার দেহের জীন্‌গুলির যোগফল নয়। **সে তার পিতা বা মাতার প্রত্যেকের দেহে যে জীন্‌এর মিশ্রণ আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে তার অর্ধেক সংখ্যা মাত্র পায়।** যেহেতু প্রাণিতত্ত্বের দিক থেকে তার দেহের জীনের মিশ্রণ তার পিতামাতার দেহের জীনের মিশ্রণ থেকে পৃথক, কাজেই তার দেহের গঠন ও ব্যবহার তার পিতা বা মাতার প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন। পরিবেশের প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র বংশগতির দিক থেকেও প্রত্যেকটি সন্তান তার পিতামাতা ও ভাইবোনের থেকে মোটের উপর পৃথক।

'বংশগতি', 'উত্তরাধিকার' কথাগুলি এক হিসাবে মিথ্যা ধারণার উদ্ভব করে কারণ একথাগুলি পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু কোন শিশুর বংশগতি বুঝতে তার দেহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীনের মিশ্রণের কথাই আমাদের বোঝা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির বংশগতি বাস্তবিকপক্ষে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।" [১৩]

জীন্ ফ্যাক্টর্ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মেণ্ডেলের সূত্র কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়েছে সত্য, কিন্তু মেণ্ডেলের সূত্রের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এবং এই সূত্রের কেন বা whyর উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কেন এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বা এক পরিবারের লোকদের মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য থাকে, বংশানুক্রমের এই সর্বজনস্বীকৃত লক্ষণটি জীন্ ফ্যাক্টর্ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি॥

---

১২ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 164.

১৩ Woodworth—Psychology, P. 199.

বৈসাদৃশ্য ও অর্জিত গুণ Variations and Acquired characters—কিন্তু সাদৃশ্য যেমন থাকে বৈসাদৃশ্যও তেমনি থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলিও জীন্ ফ্যাক্টর পরিবর্তনের জন্যেই ঘটে। এই বৈসাদৃশ্য বা variations বংশানুক্রমের ধারায় মেণ্ডেলের সূত্র অনুযায়ী পরবর্তী পুরুষে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অনেকগুলি পরিবর্তন ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় অর্জিত বা বর্জিত,—তাদের বলে **অর্জিত গুণ** (acquired characters)। যেমন, এক ব্যক্তি চেষ্টা করে ভাল বাঁশী বাজাতে শিখল। এ গুণও কি পরবর্তী পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে? পূর্বে অনেকের (যথা, লামার্ক) ধারণা ছিল যে এই অর্জিত গুণগুলিও পরবর্তী পুরুষে বর্তে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় এক একটা পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে, ভালো ভালো খেলোয়াড়, অথবা ভাল আঁকিয়ে, বা ভাল গাইয়ে দেখা গিয়েছে। কিন্তু বহু সহস্র পরীক্ষার পরে নিশ্চিতভাবে না হলেও, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই সত্য বলে মনে হচ্ছে যে, অর্জিত গুণ সন্তানে বর্তে না। ভাইস্ম্যান (Weismann) বলেন যে, যে পরিবর্তনটা জার্মপ্লাজম্ (germplasm) থেকে উদ্ভূত নয়, (অথবা, আমরা বলব, যেটা জীন্ ফ্যাকটর্ থেকে আসেনি সেটা পরবর্তী পুরুষে পৌছে না। ভালো আঁকিয়ের ছেলে ভালো আঁকিয়ে হয়, তার কারণ (পরিবেশবাদীরা বলেন) পরিবেশটা এ গুণ আয়ত্ত করবার পক্ষে শিশুর অনুকূল। অবশ্য তার প্রকৃতির মধ্যে আঁকবার স্পৃহা এবং ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা চাই। সে হিসাবে অর্জিত গুণেরও অনেক সময় একটা প্রকৃতিগত মূল থাকে। ড্রামণ্ড বলেছেন, "অর্জিত গুণ বলতে আমরা এমন কোন গুণ বুঝি যার উৎপত্তি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। আমরা ব্যক্তির তেমন গুণগুলি বুঝি, যা এসেছে ব্যবহার, অব্যবহার বা প্রত্যক্ষভাবে বাইরের কোন প্রভাবের ফলে। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি কুকুরের লেজ কেটে ফেলা হয়, তা হলে এটা তার পক্ষে অর্জিত গুণ। তেমনি কোন মানুষের যদি শক্ত অসুখের ফলে চুলগুলি সব পড়ে যায়, তা হলে সেটাও হবে, সে মানুষের পক্ষে অর্জিত গুণ। কিন্তু যদি কোন যুবকের চুল প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতিরেকে অকালে পেকে যায়, অথবা যদি তার দাড়ি না গজায় তা হলে কিন্তু এগুলি অর্জিত গুণ নয়। যে মানুষের চুল এমনি অকালে পাকে, সম্ভবতঃ সে মানুষের ছেলেও এ গুণ (না দোষ?) উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। কিন্তু যে কুকুরের লেজ কাটা হোল, তার লেজকাটা বাচ্চা

হবে না। দুর্ঘটনা জনিত বা পরীক্ষামূলক অঙ্গহানির দুই একটি উদাহরণ ছাড়া, এটা অবশ্য অপ্রমাণিত রয়েছে যে, অর্জিতগুণ পুরপুরুষে বর্তায়। তবে সমস্ত অর্জিত গুণেরই একটা জন্মগত ভিত্তি থাকে।…এটা সত্য যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ের ছেলে যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ে হতেই হবে, এমন নয়। অবশ্য সে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে, যদি তার প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন থাকে। পিতামাতার কাছ থেকে সে পেশী বা স্নায়ুর গঠন পায়, কারণ তার পিতার পক্ষেও তা প্রকৃতিদত্ত বা বংশগত ছিল। কাজেই সে গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তর পুরুষে বর্তায়। প্রয়োজনীয় পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির গঠন যদি তার থাকে, তবে তার পিতা যেমন যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন, সেও তেমনি হতে পারবে, তবে সম্ভবতঃ তার পক্ষে সেটা আরও সহজ হবে, কারণ তার পিতার রুচি ও অভ্যাস, তাঁর যন্ত্রাদি, তাঁর বন্ধুবান্ধব ও যশ তাকে প্রভাবান্বিত করবে।”[১৪]

শিক্ষাবিদের কাছে এর তাৎপর্য—অর্জিত গুণ পরপুরুষে প্রবর্তিত হয় না, শিক্ষাবিদের কাছে এ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য এই যে, শিক্ষক এ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না যে পিতামাতা যখন কতগুলি সদগুণ আহরণ করেছেন, তখন সন্তানেরাও স্বভাবতঃই এ গুণের অধিকারী হবে। শিক্ষকের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারাই কেবলমাত্র শিশু সে সদ্‌গুণ পেতে পারে। কাজেই শিক্ষকের পক্ষে নিশ্চিন্ত আলস্যের অবকাশ নেই। আবার অবাঞ্ছিত গুণ যদি কিছু পিতামাতা অর্জন করে থাকেন (যেমন জুয়াখেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি) তাও শিশুতে বর্তাবেই এ আশঙ্কারও সঙ্গত কারণ নেই। শিক্ষকের চেষ্টা তাই হবে, শিশুর চারপাশের পরিবেশটি নির্মল, উৎসাহশীল, স্নেহ ও বিশ্বাসপূর্ণ রাখা, যাতে শিশু সদাচারে অভ্যস্ত হয় এবং যাতে কুৎসিত অভ্যাস বা আচরণে সে লিপ্ত না হয়।

আমরা যদি নির্বিচারে অনেক সহস্র মানুষকে পরীক্ষা করি তা হলে দেখা যায় মানুষের মধ্যে কোন গুণের পরিবর্তনগুলি (variation) সম্ভাব্যতার রীতি (Law of Probability বা chance) অনুসারে একটা বাঁকা রেখায় (curve) ছড়িয়ে আছে।[১৫] আর দেখা যায় বংশানুক্রমের একটা ঝোঁক

১৪ Drummond—The child.

১৫ 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রয়েছে মাঝারির (average) দিকে। যেমন, পিতামাতা দুইজনই খুব লম্বা হ'লে সন্তানেরাও লম্বা হবে সন্দেহ নেই,—কিন্তু সাধারণতঃ, তারা গড়ে পিতামাতার চেয়ে কম উঁচু হয়ে থাকে।

বংশগতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষয়—(১) বংশগতির নিয়মানুযায়ী সন্তানেরা পিতামাতার সদৃশ হয়। তাই বলে, "বাপকা বেটা", "যেমন মা, তেমন ছা।" কিন্তু সন্তানেরা হুবহু পিতা বা মাতা কারু মতই হয় না।

(২) বংশগতগুণ শুধু পিতামাতার থেকেই সন্তানে বর্তায় না। পিতা ও মাতার যারা পূর্বপুরুষ তাদের গুণও উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে দেখা দেয়। পূর্বপুরুষদের সংখ্যা যতই পিছনের পর্যায়ে যাওয়া যায় ততই গাণিতিকসূত্রে নির্দিষ্টভাবে বেড়ে যায় - যেমন প্রথম পূর্বপুরুষ ২ (পিতা ও মাতা), দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্বপুরুষের সংখ্যা ৪, তার পর পর্যায়ে ৮, তার পর পর্যায়ে ১৬, এরকম ভাবে বাড়তে বাড়তে চলে। বংশগতি সম্বন্ধে গ্যাল্টনের (Galton) সূত্র হচ্ছে, সন্তান পিতামাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার ½ পায়, পিতামহের ও পিতামহীর পর্যায় থেকে ¼, তার পূর্বপর্যায় থেকে ⅛, তার পূর্ব পর্যায় থেকে ১/১৬ গুণ পায়।

(৩) কখনো কখনো কোনো সন্তানে অনেক পূর্বপর্যায়ের কোন গুণ হঠাৎ আবার দেখা দেয়। যেমন, হঠাৎ একটি ছেলে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহের কটা চোখ পায়। তার ভাই, বোন, বাপ, মা, ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা কারু চোখ কিন্তু কটা নয়। কিন্তু বৃদ্ধপ্রপিতামহের চোখ কটা ছিল। এ জাতীয় ঘটনাকে বলে পশ্চাদাবর্তন (regression)। কখনো কখনো মনুষ্যেতর প্রাণীর কোন গুণও এভাবে দেখা দেয় (atavism)।

(৪) অর্জিতগুণ উত্তরপুরুষ সংক্রামিত হয় না।

(৫) পিতামাতার ব্যাধি উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে সংক্রামিত হয় এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। মাতৃগর্ভে ভ্রূণে অবশ্য মাতার দেহের ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে।

(৬) বিশেষ বিশেষ নিপুণতা পিতামাতা থেকে সন্তানে বর্তায় না, কারণ এগুণগুলি চেষ্টালব্ধ ও অর্জিত। তবে মৌলিক সাধারণ কতগুলি গুণ যেমন, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে।

(৭) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ সবই জন্মকালে প্রকাশ পায় না।

অনেক গুণ দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতি সাপেক্ষ। তাই বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত কালে বংশগত গুণ বা দোষ প্রকট হয়।

(৮) কখনো কখনো দেখা যায় পিতা বা মাতার কোন কোন দোষ (রং-কানা হওয়া—colour blindness, বা রক্তে জমাট বাঁধবার গুণের অভাব—haemophilia) ঠিক পরের পর্য্যায়েই দেখা যায় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে এদোষ পুরুষসন্তানদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু মেয়েসন্তানদের মধ্যে দেখা দেয়। এই রকম মেয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে, তাদের পুরুষ-সন্তানদের অর্দ্ধেকের মধ্যে এ দোষ দেখা যায়। পিতা ও মাতা দুজনের মধ্যেই এ দোষটি থাকলে তাদের মেয়ে সন্তানদের অর্দ্ধেকের মধ্যেও এ দোষ বর্তাবে। একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা **sex-linked heredity** বলে।

(৯) কখনো কখনো দুটি বিপরীত গুণের মিশ্রণে একটি প্রকট ও আর একটি অপসৃত না হয়ে, এদুটি গুণের সব রকম মিশ্রণই সন্তানদের মধ্যে দেখা যায়। বাদামী দানা ও সাদা দানা যবের মিশ্রণে, সাদার থেকে সুরু করে, গভীর বাদামী পর্যন্ত পাঁচ বিভিন্ন পোঁছের রংএর দানাযুক্ত যব পাওয়া যায়, একে বলে মিশ্রিত উত্তরাধিকার—**Blended heredity**।

বংশগতির বিভিন্ন উপাদান—Factors in heredity.

কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ কোন্ গুণ প্রকাশ পাবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শক্তি বা সম্ভাবনার উপরে। এই উত্তরাধিকারের উপাদানগুলি পাঁচ ভাগে (factors) ভাগ করা যেতে পারে। গণ species), জাতি (race), পরিবার (family), লিঙ্গ (sex) এবং ব্যক্তিত্ব (individuality)।

১। গণ—Species—মানুষের সন্তানের দৈহিক গঠন, কথা বলবার ক্ষমতা, মানসিক বৃত্তি মানুষের মতই হবে, গরু বা ছাগলের মত হবে না। এ গুণগুলি মনুষ্যগণের (species) লক্ষণ। অন্য প্রাণীর মত তার কতগুলি সাধারণ আদিম প্রবৃত্তি যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকবেই, কিন্তু তার প্রকাশের মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকবে।

২। জাতি—Race—সন্তানের মধ্যে যেমন গুণগত কতগুলি লক্ষণ বিদ্যমান, তেমনি কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্যও থাকবে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—

(ক) দেহের উচ্চতা—জাপানীরা বেঁটে বেঁটে, কিন্তু পাঠানেরা লম্বা। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা নগণ্য।

(খ) মাথার গড়ন—নিগ্রো জাতির মাথার খুলি ও চোয়াল লম্বাটে ও অপরিসর, নর্ডিক জাতির মুখের গড়ন ডিম্বাকৃতি, আর চীনারা হোল "চ্যাপ্‌টা সুধাংশু।"

(গ) অবয়বের গঠন—এক এক জাতের এক এক রকম, – রাশিয়ানরা হচ্ছে গোলগাল, লম্বা-চৌড়া গড়নের ; ইহুদীরা হচ্ছে লম্বা চিম্‌সে, নাক উঁচু ; নিগ্রোর হচ্ছে পুরু ঠোঁট ইত্যাদি। চোখের গড়ন, চোখের রংও বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রকম। অবশ্য ঐ বৈশিষ্টাগুলি সবই বংশগত একথা বলা চলে না। পরিবেশ যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্য ইত্যাদিও এজন্য কতকটা দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ঘ) চুল—চুলের রং এবং ধরণ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম। বাঙ্গালীর চুল কালো, দীর্ঘ ; ইংরেজদের চুল সোনালী ও সরু ; নিগ্রোদের চুল কড়া ও কোঁকড়ানো।

(ঙ) মেজাজ—দৈহিকগুণ যেমন জন্মগত তেমনি মানসিক গুণও অনেকসময় জন্মগত—যেমন, ফরাসীরা রসিক, আলাপী, ভদ্র ; ইংরেজ গম্ভীর, হিসাবী, সাবধানী। নিগ্রোরা আমুদে ও লঘুস্বভাব ; শ্লাভজাতি বিষণ্ণ ও চিন্তাশীল।

৩। পরিবার—প্রত্যেক পরিবারেরও ধারা আছে। পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (ক) স্বাস্থ্য (খ) বুদ্ধি (গ) বিশেষ নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য লক্ষ্যনীয়।

এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রচুর স্বাস্থ্যবান্, আমরা কথায় বলি তাদের, 'জোয়ানের গুষ্টি।' আর এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা রোগাটে।

শিশুকাল থেকেই একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। কাজেই মনে করা যায় এ পার্থক্য জন্মগত। অবশ্য বুদ্ধির পার্থক্য পরিবেশের উপরও নির্ভর করে, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব।

বিশেষ বিশেষ নিপুণতা (যেমন গাইবার ক্ষমতা, অংক কষবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা) এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন স্বাভাবিক। এর কতটা জন্মগত ও কতটা পরিবেশ ও শিক্ষাগত তা নিয়ে বহু তর্ক আছে। তবে কিছুটা যে বংশগত, এটা সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে।

৪। লিঙ্গ—লিঙ্গেরও পার্থক্য জন্মগত, এবং এ প্রভেদ কতগুলি দৈহিক ও মানসিক প্রভেদের কারণ।

নারী ও পুরুষের জন্মগত প্রভেদ—

পুরুষ ও নারীর দৈহিক প্রভেদ পরিণত বয়সে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নারীদেহের প্রধান সুর মাধুর্য ও ছন্দময়তা ; পুরুষ দেহের প্রধান সুর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা। জৈব প্রয়োজনেই এটা হয়েছে। লিঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট অবয়বাদির প্রভেদ ছাড়াও আরও প্রভেদ আছে। পুরুষের হাড়, নারীর চেয়ে স্থূলতর, দৃঢ়তর। নারীর পেশী কোমল ও অধিকতর নমনীয়। অল্প বয়সে মেয়েদের শরীরের 'বাড়' ছেলেদের তুলনায় দ্রুততর। কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়।

তাদের মানসিক পার্থক্য নিয়ে কাব্যে ও সাহিত্যে অনেক বিপরীত মতামত প্রচলিত আছে। সেগুলি অধিকাংশ সময়ই অ-নির্ভরযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আলোচনাও অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। সেখানেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জৈব প্রয়োজনে দৈহিক প্রভেদ যেমন আছে, মানসিক প্রভেদও তেমনি থাকবে, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আগে বলতে শেখে, কিন্তু ছেলেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর।[১৬] টারম্যানের (Terman) পরীক্ষায় দেখা যায়, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী, আবার ডব্লিউ, এফ বুক ও জে. এল্. মিডোজ্ নামে দুই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় দেখা যায়, মানসিক ন্যূনতা সম্পন্ন (mentally deficient) ছেলের সংখ্যাও মেয়েদের তুলনায় বেশী। টি. হাণ্ট নামে আর এক বিজ্ঞানী বলেছেন, ছেলেদের নানা সংবাদ রাখবার সামাজিক গুণ বেশী, কিন্তু মেয়েরা সমাজে অনেক বেশী মানিয়ে চলবার ক্ষমতা রাখে। প্রাচীনেরা নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু নারীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে নারী এমন সব দৈহিকগুণের পরিচয় দিচ্ছে, যা এককালে নিতান্তই পুরুষোচিত বলে বিবেচিত হত। মানসিক দিক থেকেও তাদের হীনতার অপবাদ নারী সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে সুরু করেছে। 'সবলা' আজ দৃপ্তকণ্ঠেই বলছে, 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী।' বর্তমান কালে অনেক মনোবিজ্ঞানীও মনে

১৬ Norsworthy Whitley—Psychology of childhood Ch. II.

করেন, মানসিক শক্তি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থক্য, প্রাচীনেরা যতটা বেশী মনে করতেন বাস্তবিক পক্ষে তা নয়।[১৭] এই প্রভেদের অনেকটা পরিবেশগত কারণেও বটে।

৫। ব্যক্তিত্ব—পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তগুণের সমষ্টি বিভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ তাই বিভিন্ন। একই পিতামাতার যমজ সন্তানদের বংশগতি বা উত্তরাধিকার সবচেয়ে কাছাকাছি, কিন্তু তার মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সন্তানের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার কাজই হবে প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাকে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া। এ বিকাশ উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ—Environment—ধাতুগত অর্থে, যা বেষ্টন করে থাকে, তা পরিবেশ। প্রত্যেক শিশু জন্মমাত্র এমন কি মাতৃগর্ভেও কতকগুলি অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ সবই তার পরিবেশ। শিশুর জন্মস্থানের ভৌগোলিক বিশেষত্ব, তার খাদ্য, গৃহ, বন্ধু, শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম এই সবই তাকে ঘিরে থাকে, তাকে প্রভাবান্বিত করে, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সমাজের এ পরিবেশ তার প্রকৃতির মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায় যে তাকে তার বংশগতি বা উত্তরাধিকার থেকে পৃথক করা যায় না। তাই অনেক সময় 'সামাজিক উত্তরাধিকার' বা social heredity কথাটি ব্যবহার করা হয়।[১৮] এ ব্যবহার খুব বিজ্ঞান-সম্মত নয়। বলাই বাহুল্য সমাজও সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির উপর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উন্নতি অনেকটা নির্ভরশীল একথা আধুনিক যুগ বিশেষভাবে বিশ্বাস করে।

পরিবেশকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—(১) গৃহ (২) বিদ্যালয়, (৩) সমাজ।

গৃহ বলতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, প্রীতি, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা ইত্যাদিও বোঝায়। ঘরের গড়ন, আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদি তো বোঝায়ই। গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, কারণ, শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়—সে তখন সম্পূর্ণ-

[১৭] Nimkoff—The child, P. 37.

[১৮] Children are born with a biological heritage, and they are also born into a social heritage-Sandiford.

ভাবে নির্ভর করে তার পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজনের উপর। এ সময়ে প্রীতি ও যত্নের অভাব, পিতা মাতার মধ্যে বিরোধ, গৃহের বাহ্যিক ও মানসিক আবহাওয়া তার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। এখানেই সে শেখে বিভিন্ন সু-অভ্যাস বা কু-অভ্যাস। এখান থেকেই সে পায় তার ভাষা, তার জীবন-দর্শনের প্রথম ইঙ্গিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানী তাই এ কথাটির উপর বারে বারে জোর দেন, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন—সুন্দর, নির্মল শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ।

বিদ্যালয় বলতে শিক্ষার সব উপাদানকে বোঝায়,—শুধু স্কুল ঘর নয়,—শিক্ষক, পুস্তক, বন্ধু, খেলা ধূলা; ঘরের বাইরে, বাড়তি বয়সে তার সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার সব উপায় বা উপাদানকে বলা যায় বিদ্যালয়-পরিবেশ। শিশুর দেহ যখন বাড়ছে, মন যখন উৎসুক, তখন গৃহের পরেই বিদ্যালয়ের প্রভাব সবচেয়ে গভীর। এখানে আছে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

সমাজ বলতে ধর্ম আচার ব্যবহার ভাষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিযোগিতা, নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, এ সব বোঝায়। মানুষের জীবন এ সবের দ্বারা গঠিত, প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত হয় এ কথা বোঝা কঠিন নয়। তাই বর্তমান যুগে মানুষ, 'আদর্শ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কোনটি?' এ প্রশ্ন কচ্ছে, এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্যে নানা পরীক্ষা নানা প্রচেষ্টায় ব্রতী হচ্ছে। সমস্ত সংগঠন, সংস্কার ও বিপ্লবের পেছনে রয়েছে এ বিশ্বাস, যে শিক্ষার উন্নতিও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা মানুষকে উন্নততর জীবনের অধিকারী করা যায়। মানুষ একক চেষ্টায় তার জীবনকে গড়ে না, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশটি অনুকূল হওয়া চাই। রাশিয়া আজ এ কথাটির উপর সবচেয়ে জোর দিচ্ছে।[১৯]

বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা—

এবার আমরা বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্পর্কে যে বিবিধ পরীক্ষা হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রায় সব পরীক্ষার মধ্যেই বুদ্ধির প্রভেদটা কতটা জন্মগত, আর কতটা পরিবেশগত, (nature or nurture) এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার

১৯ Beatrice King—Changing Man ; The Soviet Educational System.

সাধারণ রীতি অনুযায়ী বংশগতি বা উত্তরাধিকার যাদের মোটামুটি এক, বিভিন্ন পরিবেশে তাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করে পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার একই পরিবেশে লালিত বিভিন্ন বংশের ছেলেমেয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করে, বংশগতির প্রভাব নির্ধারিত হয়েছে। এ পরীক্ষাগুলিকে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত ছয়টি দলে ভাগ করতে পারি।

(ক) পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ—বিখ্যাত ও কুখ্যাত কয়েকটি বংশের (কয়েক পুরুষ ধরে) পর্যালোচনা।

(খ) নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বংশগতি ও পরিবেশ (বিশেষতঃ পরিবেশ) নির্ধারণ।

(গ) একেবারে শিশুকাল হতে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য পরিবারে পালিত পোষ্য সন্তানের সঙ্গে গৃহে পালিত সন্তানদের তুলনা।

(ঘ) একই পরিবেশে বর্ধিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুদের সম্পর্কে (যেমন অনাথাশ্রম, বেদের দল, বোর্ডিং হাউসে পালিত) আলোচনা।

(ঙ) খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের (যমজ, ভাই-বোন, পিতামাতা সন্তান) সম্বন্ধে আলোচনা।

(চ) শিশুদের বুদ্ধির সঙ্গে তাদের পিতামাতায় আর্থিক ও সামাজিক-মর্যাদার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা।

(ক) বংশমালা সংগ্রহ—

গ্যাল্টন্ (Galton) বংশপরম্পরার প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্যাল্টন-ডারুইন (Galton-Darwin—নিকটতম সম্পর্ক-বিশিষ্ট দুইটি বংশ) পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন (Hereditary Genius)। এই ইতিহাসই সম্পূর্ণতর করেন কার্ল পিয়ার্সন্ (Karl Pearson)। তিনি বহু পরিশ্রমে প্রায় এক হাজার বৎসর ব্যাপী ওয়েজউড্-ডারুইন-গ্যাল্টন্ (Wedgewood-Darwin-Galton) পরিবারের বংশ-তালিকা তৈরী করেন (The Life Letters and Labours of Francis Galton Vol. 1 Pedigree plates)। এই পরিবার কয়টিতে ইংল্যাণ্ডের বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, জন্মেছেন,—যাঁরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে নিজ নিজ কীর্তি রেখে গেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ডারুইন পরিবারে

—সোজাসুজি পর্যায়ে, পাঁচ জন অত্যন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ (theory of biological evolution) প্রচার করেছিলেন যে চার্লস্-ডারুইন, তিনি এঁদের মধ্যে অন্যতম। বংশগতির সমর্থকেরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করে থাকেন, যে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। কথাটার পেছনে জোর আছে, কিন্তু কেবলই বংশগতি এই উৎকর্ষের জন্য দায়ী এবং পরিবেশের প্রভাব নগণ্য, এ রকম সিদ্ধান্ত করাটা অনুচিত হবে।

আর. এল. ডাগ্ডেল (R.L. Dugdale), নিউইয়র্ক ষ্টেটে কারাগারসমূহের বড়কর্তা ছিলেন। অনেক বৎসরের কয়েদীদের নাম দেখে, তাঁর খেয়াল হ'ল একটা বংশের নাম বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তিন বছর বহু অনুসন্ধান করে করে, বের করলেন যে, পরিবারটির গোড়া পত্তন হয়েছে একজন দুশ্চরিত্র এবং ভবঘুরে শিকারীর থেকে। তিনি জ্যুকস্ (Jukes) এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে এই পরিবারটির বহু বৎসরব্যাপী বংশ-তালিকা সংগ্রহ করে দেখান যে, এই পরিবারের অধিকাংশ লোকই চোর, ডাকাত, খুনে ইত্যাদি। সৎলোক এ পরিবারে যাদের পাওয়া গেল, তারা কেউই উল্লেখযোগ্য ছিল না।[২০] এ থেকে ডাগ্ডেল্ ও গ্যাল্টন্ এর মত বংশগতির প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। কিন্তু এই পরিবারটির পরবর্তী ইতিহাস সংগ্রহ করেন ডাঃ এ. এইচ. ইস্টারব্রুক্ (Dr. A. H. Easterbrook) এবং ১৯১৫ সালে তিনি এদের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি দেখলেন জ্যুকরা তাদের আদিম বাসস্থান (সেখানে সিমেণ্ট-এর কারখানায় অধিকাংশ জ্যুকরা কাজ করত, এবং সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে চলে যায়) ছেড়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং নূতন বংশে বিবাহাদি করার ফলে এই পরিবারটির বংশধরদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে। কাজেই এখানে বংশগতি এবং পরিবেশ এ দুয়েরই প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।[২১]

২০ Dr. A. H. Easterbrook—The Jukes, 1915.

২১ And yet if anyone thinks that those in whom Nature hath not thoroughly done her part may not, in same measure make up her defects, if they be so happy as to light upon good teaching and without applying their own industry towards the attachment of virtue, he is to know that he is very much nay, atogether, mistaken. For a good natural capacity may be impaired by slothfulness, so dull and heavy natural parts may be improved by instruction. Plutarch. Discourses on the teaching and training of Children.

L. Dugdale—The Jukes, 1877.

অনুরূপ একটি প্রসিদ্ধ বংশমালা সংগ্রহ করেছেন এইচ্. এইচ্. গডার্ড (H. H. Goddard) এবং সে বংশটির কল্পিত নাম হচ্ছে ক্যালিক্যাকস্ (Kallikaks)। বাহুল্য বোধে এর আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম, তবে এখানেও বংশগতি ও পরিবেশ দুইয়ের প্রভাবই কাজ কচ্ছে এ রকম সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।[২২]

(খ) প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ—

গ্যালটন্ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে আলোচনা, তাদের বংশ ও পরিবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে তার উত্তর সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত করেছেন বংশগতির প্রভাবই প্রধান।[২৩]

ক্যাটেল্ অনুরূপ ভাবে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের জীবনী পুংখানুপুংখ ভাবে আলোচনা করে গ্যালটন্-এর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তিনি লিখছেন "দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিজ্ঞানীরা আছেন অঞ্চল বিভেদে তাদের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। গ্যাল্টনের এই সিদ্ধান্ত যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য বংশগতিই দায়ী, উপরোক্ত ঘটনা তার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধির উৎকর্ষ লোক বসতির ঘনতা, বিত্ত,সুযোগ, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।[২৪]

টার্ম্যান্ (Terman) কালিফর্ণিয়ার একহাজার তীক্ষ্ণধী ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মাপ, পিতামাতার বুদ্ধির মাপ, পিতার আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করে বংশগতির পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাংসারিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকূল ছিল কাজেই পরিবেশের কোন প্রভাব নেই, এরকম সিদ্ধান্ত অনুচিত হবে।[২৫]

(গ) অন্য পরিবারে পালিত সন্তান—

মিস্ বারবারা বার্কস্ (Miss Barbara Burks) ২০৪টি একরকম ছেলেমেয়ে যারা এক বছর বয়সের আগেই অন্য পরিবারে পালিত হয়েছে তাদের নিয়ে তাঁর পরীক্ষা চালান। আপন পিতামাতার বুদ্ধির মাপ ও এই শিশুদের বুদ্ধির মাপ, আবার পালক পিতামাতার বুদ্ধির মাপ এবং পালিত এই শিশুদের

২২ H. H. Goddard—The Kallikaks family 1914.

২৩ Galton—English men of science 1874.

২৪ Cattell—A Statistical study of American men of science. (Science 1906 N. S. 24, Pp. 732-742).

২৫ Terman—Study of a thousand gifted children in California.

বুদ্ধির মাপ ইত্যাদি তুলনা করে দেখিয়েছেন—বংশগতির প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই, আবার পরিবেশও যে প্রভাব বিস্তার করে তাও বোঝা যায়।

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিতামাতা ও সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্ক তুলনা করে যে পার্থক্য পাওয়া গেল তার ১৭% এর জন্য গৃহপরিবেশ দায়ী। পিতামাতার বুদ্ধিমত্তা এই বিভিন্নতার ৩৩% এর জন্য দায়ী। বংশগতির মোট প্রভাব সম্ভবতঃ ৭৫% থেকে ৮০%।[২৬] বার্কস্ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে যে প্রকার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, ১৯৩৫ সনে মিনেসোটাতে লীহি (Leahy) অনুরূপ একটি পরীক্ষা করে প্রায় একই প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। উভয় পরীক্ষার ফলাফল একটি গ্রাফের সাহায্যে পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

ফ্রীমান্, হোলৎজিঙ্গার ও মিচেল্ (Freeman, Holzinger and Mitchell) কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে একজন নিজ পিতামাতার কাছেই বড় হয়, আর একটি অন্য পরিবারে দত্তক হিসাবে গৃহীত হয়।

তাঁদের পরীক্ষার ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, ভালো পরিবারে যত্নের সঙ্গে পালিত হলে, দত্তক সন্তানদের, নিজ পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হয় সাংস্কৃতিক বিষয়ে। কিন্তু বংশগত বুদ্ধির পরিমাণের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না।

(ঘ) অনাথ আশ্রম ইত্যাদিতে পালিত ছেলেমেয়ে—

অনাথ আশ্রমে একই পরিবেশে পালিত ছেলেমেয়েরা বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণে সমান হবে, যদি পরিবেশের প্রভাবই প্রধান হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা দেখা যায় না। বিভিন্ন পরিবারে পালিত ছেলেমেয়ের মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, এখানেও প্রায় তাই দেখা যায়। কাজেই উগ্র পরিবেশবাদীদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু যাযাবর, ভবঘুরে, নৌকার, মাঝি, বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাহত হয়েছে এ রকম সিদ্ধান্ত করবার সঙ্গত কারণ আছে। এ সম্বন্ধে গর্ডন্ (Gordon)[২৭] এবং এ্যাশার (Asher)[২৮]-এর পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

---

২৬ "Home environment contributes about 17% of variance in I. Q.; parental intelligence accounts for about 33%. Total contribution of heredity probably is between 75% to 80%." Burks—Relative importance of nature and nurture upon mental development, 27th Year Book of the (American) National Society for the Study of Education, 1928.

২৭ Gordon—Studies of English gypsies and Canal boat children.

২৮ Asher—Study of Children in East Kentucky mountains.

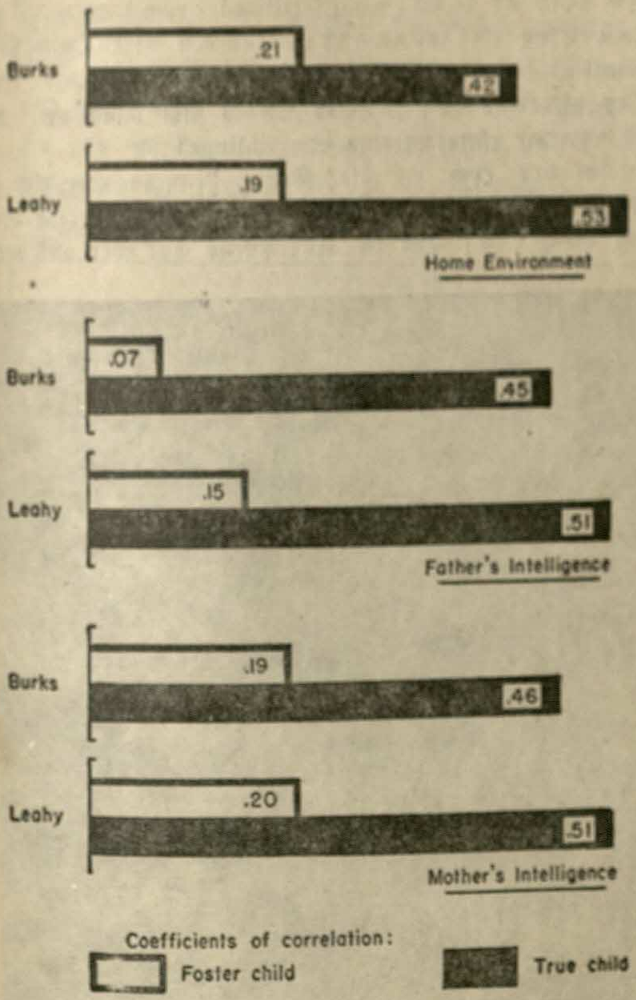

Figure 23. A comparison of foster child and true child correlations (Quoted from H. E. Jones—Environmental influences on mental development., Manual of Child Psychology Ed. L. Carmichael, P. 622.)

(ঙ) অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাদৃশ্য—

সঙ্গমকালে মাতার যোনিস্থ একটি অণ্ড (ovum) পিতার দেহস্থ একটি শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত (fertilized) হ'লে গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্তু

কখনও কখনও এই নিষিক্ত অণ্ড (fertilized ovum) ভেঙ্গে দুটি হয়। তাতে একই লিঙ্গ-বিশিষ্ট যমজ সন্তান হয়। এদের বলে আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস (Identical twins)। কিন্তু fraternal twins-দের বেলায় মাতার যোনিস্থ দুইটি বিভিন্ন অণ্ড দুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত হয়। আর একই পিতামাতার আলাদা সন্তানদের বলে siblings।

পরীক্ষা করে দেখা যায় আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস্‌দের মধ্যে বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণে সাদৃশ্য খুব বেশী। তাদের লিঙ্গ এক, তাদের চেহারার মধ্যেও আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকে। এমন কি এদের দুজনের একই সময়ে একই ধরণের

উপরের ছবিতে তিন জোড়া সমযোনি যমজদের আশ্চর্য সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য। দুই যমজ ভাই, দুই যমজ বোনকে বিয়ে করেন। তাদের একজনের আবার যমজ সন্তান হয়; Scheinfeld—You Hereditys পৃঃ ১৩৪ অনুসরণে।

অসুখ করে,—যদিও এরা দূরে দূরে থাকে। আবার ফ্রেটারন্যাল্ টুইনসদের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তা আইডেন্টিক্যাল টুইন্সদের চেয়ে কম। আবার সিবলিংস্দের মধ্যে মিল ফ্রেটারন্যাল্ টুইনসদের তুলনায় কম কিন্তু অনাত্মীয় দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তার চেয়ে বেশী। (বুদ্ধির হার বা I. Q. এর তফাতটা এসব ক্ষেত্রে কত হয়, এ বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হোল।

AVERAGE DIFFERNCE IN I. Q. POINTS			
Between Identical twins	Between Fraternal twins	Between brothers and sisters (sibling)	Between unrelated individuals
5	9	11	15

এতে বংশগতির প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ফ্রেটারন্যাল্ টুইনস্ এবং সিবলিংস্দের বংশগত জীন্স্-এর পার্থক্য তো সমান, কাজেই তাদের বেশী সাদৃশ্যের কারণ এই যে, তাদের পরিবেশ ও অনেকাংশই এক। আইডেন্টিক্যাল টুইনস্দের সাদৃশ্যের এটাও নিশ্চয়ই একটা কারণ যে, তাদের পরিবেশ (যেমন পিতামাতার যত্ন, বাড়ীঘর, বন্ধু-বান্ধব) অনেকাংশেই এক।

এ বিষয়ে, অল্প বয়সে বিচ্ছিন্ন আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস্—যারা বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েচে, তাদের নিয়ে পরীক্ষার ফল মূল্যবান। কারণ এখানে বংশগতি প্রায় এক, পরিবেশ বিভিন্ন। এ রকম অল্প কয়েকটি উদাহরণ মাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে জেসেল্ ও টম্সন (Gessel & Thompson) দুটি যমজ শিশু নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ভাই-বোন এবং সন্তান ও পিতামাতার সাদৃশ্য সম্পর্কে কয়টি পরীক্ষাও দেওয়া হল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সন্তান ও পিতার সাদৃশ্য (correlation co-efficient) হচ্ছে +·3 থেকে +·6 এবং বিভিন্ন গৃহে প্রতিপালিত ভাইবোনের সাদৃশ্য হচ্ছে +·15।

(চ) পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে শিশুর বুদ্ধি ইত্যাদির সম্বন্ধ—

সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানেরা

Author Date	Topic	Subject	Methods	Findings	General Remarks.
Gesell, A., and Thompson, H, (1929)	Effect of environmental change with heredity held constant.	A pair of identical twins studied from birth.	One twin given 6 weeks' training in stair-climbing beginning at age of 46 weeks. Other given 2 weeks' training at 53 weeks. Motion picture.	Motion picture showed nearly equal stairclimbing speed. At 79 weeks twin with greater training climed with greater slacrity and was more active in other motor situations.	"...Superior training did not make any tremendous difference in actual capacity, for achievement, but .... the advantage may have given the trained twin a sense of confidence...and consequently a real increase in amount climbing."
Hildreth G. H. (1928)	Resemblance of siblings in intelligence and achievement.	578 pairs of sibs with and without nursery-school experience, entering Ist. grade.	Intelligence test scores available. Correlations made for sibs living together, apart, and non-sibs.	Composite r for sibs with age partialed out, +41 ; for sibs reared apart (corrected for curtailed range), + ·50. Unrelated children reared apart yield same results as unrelated children reared together.	"True siblings reared apart for part of their lives still resemble each other about as much as true sibling pairs reared together. Unrelated children reared together for part of their lives resemble each other in intelligence no more closely than unrelated children chosen...at random."
Jones, H. E. (1928)	Intelligence resemblance between parents and children.	105 New England families : native born white of native born stock, from rural districts of Mars., N. H., Vt 210 parents, 317 childern.	Army Alpha (5 or 7) used with parents and children above 10 yrs.; Stanfnrd-Binet with the 213 children between 3½ and 14 yrs.	Average r of ·55 between intelligence of parents and children. Mother's influence greater than father's 5 points higherer ; unreliable but consistent difference Like—Sex r's about same as unlike—Sex r's.	Material throughout is consonant with Perason's thesis that "physical characters ... are inherited within brad lines in the same manner and with the same intensity" Not considered proof. 44

44 Murphy & Newcomb : Experimental Social Psychology, P. 32.

মোটের উপর বেশী বুদ্ধিমান। অবশ্য একজাতীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের মধ্যেও প্রচুর ভিন্নতা দেখা যায়। কাজেই এই পরীক্ষাতেও পরিবেশ ও বংশগতি দুইএর প্রভাবই প্রমাণিত হয়। উডওয়ার্থ ও মারকিস্ লিখছেন ক্ষেতচাষী ও অনিপুণ শ্রমিকের ছেলেদের বুদ্ধির হার নীচু, ডাক্তার, শিক্ষক ও শিল্প পরিচালকদের ছেলেদের বুদ্ধির হার উঁচু, কিন্তু এই দুই দলের ছেলেদের বুদ্ধির হার, সমাজের সাধারণ বুদ্ধির হারের চেয়ে খুব বেশী তফাত নয়। কলিনস্, গুডেনাফ্, জোনস্, এবং টারম্যান্ (Collins, Goodenough, Jones & Terman) এ বিষয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে পিতার জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সন্তানদের বুদ্ধির বিভিন্নতার সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। নীচে ফলটা মার্ফি ও নিউকোম্ (Murphy Newcomb)-এর বই থেকে দেওয়া হ'ল—

Occupation	*No. of families*	*Family Inter quartile Range (Middle 50 p. c.)*	*Median Family I. Q.*
Professional	90	106—126	116
Managerial	165	104—123	112
Clerical	131	105—122	113
Trade	413	100—120	110
Foreman	106	98 - 118	109
Skilled labour	569	94—114	134
Unskilled labour	377	85 - 108	95

তাঁরা ষ্ট্যান্ফোর্ড-বিনে বুদ্ধিপরিমাপক অভীক্ষা ব্যবহার করেন এবং সঙ্গে পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি ও সাংস্কৃতিকমান পরিমাপের জন্য হুইটিয়ার স্কেল্ ব্যবহার করেন। এসব পরীক্ষা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, আপন পিতামাতা ও নিজ সন্তানের মধ্যে বুদ্ধির মাপের মিল (correlation) পালিত সন্তান ও পালক পিতামাতার বুদ্ধির মাপের মিলের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। এতে বংশগতির অধিকতর প্রভাব প্রমাণ হয়। আবার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিষয়ে দেখা যায় পালক পিতামাতা ও পালিত সন্তানের মিল বেশী।

অর্থাৎ সাংস্কৃতিগত উন্নতি বিষয়ে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। নিম্নলিখিত চার্টটি বার্কসের পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে বুঝতে সহায়তা করবে—

Correlation of child's I. Q. with	Foster Group		Control Group	
	r	N	r	N
Father's M. A.	0 09	178	0 55	1·0
Mother's M. A.	0·23	204	0·57	105
Father's Vocabulary	0·19	181	0·52	101
Mother's Vocabulary	0·25	202	0·48	104
Whittier Index	0·24	186	0·49	101
Culture Index	0·24	181	0·26	99

বংশগতি ও পরিবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা তা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করতে হলে দু'ভাবে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী আমরা পরীক্ষা চালাতে পারি—

(১) বংশগতি অপরিবর্তিত রেখে পরিবেশের পরিবর্তন—

যেমন দুটি সর্ববিষয়ে সমান যমজ শিশু। একেবারে শৈশব থেকেই যদি বিভিন্ন পরিবেশে লালিত পালিত হয় তবে তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে যে প্রভেদ ঘটে তার জন্যে পরিবেশই দায়ী। এ জাতীয় অনেকগুলি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবারে বর্ধিত হলেও তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের প্রভেদ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত যে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন বিষয়ে বংশগতির প্রভাবই প্রবলতর। দুটি যমজ সন্তান নিজ পিতামাতার কাছে একত্রে লালিত পালিত হয়ে থাকলে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের প্রভেদ পাঁচ পয়েন্টের বেশী (যেমন একজনের ৯০ আর এক জনের ৯৫) হয় না। যে যমজেরা পৃথক পৃথক পরিবারে জন্মাবধি পালিত হয়, তাদের প্রভেদও বেশী নয়- সে প্রভেদ আট পয়েন্টের বেশী নয়। বিভিন্ন পিতামাতার বিভিন্ন জোড়া জোড়া যমজ সন্তানদের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের প্রভেদ অনেক বেশী। এতে বংশগতির প্রভাব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু এ জাতীয় যমজ সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব সূচক গুণ (Personality traits—ভদ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি) বিষয়ে প্রচুর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিত্ব সূচক গুণ বিষয়ে তাদের প্রভেদ ১৪ থেকে ২৭ পয়েন্ট। এ প্রভেদ উল্লেখযোগ্য। কাজেই এই সিদ্ধান্তও সঙ্গত যে, উন্নততর পরিবেশ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাদ্বারা ব্যক্তিত্বসূচক গুণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা সম্ভবপর।[২৬]

[২৬] Munn--Psychology. P. 43.

২। **দ্বিতীয় জাতীয় পরীক্ষাতে পরিবেশ অপরিবর্তিত রেখে বংশ-গতির পরিবর্তন করা হয়।** এরকম পরীক্ষা মানুষের উপর করা সম্ভব নয়, কারণ পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশী সচেতন এবং একই আপাত অপরিবর্তিত অবস্থায়ও দুজন মানুষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের। এ পরীক্ষা সাদা ইঁদুরের উপর করা হয়েছে। এই প্রাণীগুলি অতি দ্রুত বাড়ে। এবং অতি দ্রুত এদের বংশ বৃদ্ধি কাজেই এক বছরের মধ্যে এদের বেশ কয়েক পুরুষ জন্মগ্রহণ করে।

১৪২টি সাদা ইঁদুরকে তারের বা কাঠের ধাঁধাঁযুক্ত খাঁচাতে ঘুরে ঘুরে খাদ্যের জায়গায় পৌছা বিষয়ে বুদ্ধি (অথবা বিপরীতভাবে, এরা এই ক্রিয়ায় কতটা ভুল করে) তা পরীক্ষা করে দেখা গেল। লক্ষ্য করা গেল, যে ইঁদুরটি সব চেয়ে 'চালাক' সে মাত্র সাতবার ভুল পথে (blind alley) ঢুকেছে। আর যে সব চেয়ে 'বোকা' সে ভুল করেছে ২১৪ বার। অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশই এই দুই চরম সংখ্যার (extremes) মাঝামাঝি বার ভুল করেছে।

এখন এই ইঁদুরগুলির মধ্য থেকে পরীক্ষক সব চেয়ে 'চালাক' এক জোড়া (স্ত্রী ও পুরুষ) ইঁদুরকে মিলিয়ে দিলেন। আর সব চেয়ে 'বোকা' এক জোড়াকে মিলিয়ে দিলেন। এদের আলাদা আলাদা ঘরে ঠিক একই পরিবেশে (একই ধরণের খাদ্য, বাসস্থান, আলো, উত্তাপ ইত্যাদি) রেখে সাত পুরুষ পর্যন্ত চালাক জোড়া এবং বোকা জোড়ার সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের বুদ্ধি কেমন (ধাঁধাঁ যুক্ত খাঁচায় খাদ্য খুঁজে নেওয়া সম্পর্কে) তা লক্ষ্য করলেন। তাতে দেখা গেল, চালাক জোড়ার বংশধরেরা বাস্তবিক পক্ষে বোকা জোড়ার বংশধরদের তুলনায় গড়ে ভুল কম করে। আর একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে দুই দলের মাঝারীদের মধ্যে মিল খুব কম। অর্থাৎ দেখা যায় স্পষ্ট দুটি দল ইঁদুর সৃষ্টি হয়েছে, এক দল বুদ্ধিমান এবং একদল বোকা। অর্থাৎ এদের ছড়িয়ে থাকাটা দ্বিশীর্ষক একটা ঢেউয়ের (bimodal curve) আকারে। চালাকের সঙ্গে চালাকের এবং বোকার সঙ্গে বোকার মিলন ঘটিয়ে অষ্টাদশ পুরুষ পর্যন্ত লক্ষ্য করে আর খুব বেশী প্রভেদ দুই দলে দেখা গেল না।

এবার 'বোকা' দলের একটি ইঁদুরের সঙ্গে 'চালাক' দলের একটি ইঁদুরের মিলন ঘটিয়ে দেখা গেল যে এবার সবচেয়ে বোকা থেকে সুরু করে বেশ চালাক পর্যন্ত সব রকম সন্তানই পাওয়া যাচ্ছে এবং অধিকাংশই হচ্ছে মাঝারী। অর্থাৎ

এদের ছড়িয়ে থাকাটা একশীর্ষক সাধারণ রেখাএর আকারে (unimodal normal curve of distribution) প্রকাশ করা যায়। ২৭

এই পরীক্ষার ফল থেকে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত যে শুধু শারীরিক গুণ না, সুপ্রজনন দ্বারা (eugenics) মানসিক গুণেরও উন্নতিসাধন সম্ভব। অর্থাৎ মানসিক গুণের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিষয়ে বংশগতির প্রভাব সামান্য নয়।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে এ কথা সত্য মনে হয় যে যেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে প্রভেদটা খুব বেশী সেখানে বংশগতির প্রভাব প্রবলতর। প্রধান দৈহিকগুণগুলির উল্লেখযোগ্য প্রভেদ তো বংশগতি-নির্ভর বটেই, মানসিক গুণের প্রভেদ যেখানে বেশী, সেখানেও বংশগতির শক্তিই প্রধান। কিন্তু দৈহিক ও মানসিকগুণ বিষয়ে ছোটখাটো প্রভেদগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব এমনই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে, যে কোন গুণের পরিবর্তন কি বংশগতি না পরিবেশ-নির্ভর, তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত। জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের (Race differences) মূলে বংশগতি অবশ্যই ক্রিয়া করছে, কিন্তু দুই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্য, রীতিনীতি, অভ্যাসও নিশ্চয়ই তার দৈহিক-মানসিক বিকাশের মূলে কাজ করে। কাজেই মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিগত পরিবর্তন বংশগতি বা পরিবেশ এই দুইয়ের একটি মাত্র সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে তা ভুল হবে। সর্বক্ষেত্রের ব্যাখ্যাতেই আমরা বলব **বংশগতি বা পরিবেশ নয়—বংশগতি এবং পরিবেশ।** ২৮

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে শেষ সিদ্ধান্ত—

এ সব পরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয় যে, বংশগতি বা পরিবেশ এ দুইএর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। বংশগতি হচ্ছে সম্ভাবনা, কিন্তু সে সম্ভাবনা কতটুকু বা কি ভাবে বাস্তবরূপ নেবে, তা নির্ভর করছে পরিবেশের

২৭ Tryon, Genetic difference in maze learning ability in rats—39th Annual Year Book. National Society for the study of Education, P. 115

২৮ Errors have at times been made through failure to remember how powerfully the social environment works upon us. But the relations between persons are as important as the persons themselves. This requires that we consider two viewpoints, first the biological, and second a social science viewpoint.

Murphy—Brifer General Psychology c. pp 398-99

উপর। Ex nihilo nihil fit—শূন্যের থেকে কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। বীজের মধ্যে শক্তি বা সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাই গাছ হ'তে পারে। কিন্তু বীজ জমি থেকে কি রস পাচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে, গাছ সতেজ হবে না দুর্বল হবে। কিন্তু সম্ভাবনার একটা সীমা আছে,—শত যত্নেও সে সীমা অনতিক্রম্য। কিন্তু কোন একজন মানুষের সম্ভাবনা কতটা তা নিখুঁত ভাবে আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই। বুদ্ধি ও কাজের নানা অভীক্ষার (Intelligence and Performance tests) ফলাফল থেকে অবশ্য অসম্পূর্ণ একটা ধারণা আমাদের হতে পারে। তবে এটা অবিশ্যি জোর করেই বলা যায় যে একেবারেই জড় বুদ্ধি (idiots, morons) কোনদিনই প্রতিভাবান্ (genius) হবে না, শত চেষ্টাতেও। কাজেই শিক্ষক যদি তাঁর শিক্ষার ফল সম্বন্ধে অসম্ভব আশা রাখেন, তাহ'লে তাকে নিরাশ হতে হবে। তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে বংশগতির ঋণ একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ (limiting factor)। তাই ভাল ফল পেতে হ'লে, ভাল ধাতের ছেলে বাছাই করা তাঁর পক্ষে অন্যায় হবে না। কিন্তু বংশগতি পরিবর্তন করবার ক্ষমতা তো তাঁর হাতে নেই। আর বাছাই করে যারা "মীরন" বলেন, তাদের ভারও তো শিক্ষকের উপর। ভাল শিক্ষা, ভাল সঙ্গ, উপযুক্ত উৎসাহ এটা শিক্ষক দিতে পারেন। এটা দেওয়া তাঁর কর্তব্য। নিকৃষ্ট বংশগতির কতকগুলি কু-সম্ভাবনাকে বাধা দেওয়া যেতে পারে সুশিক্ষার দ্বারা, এটা সামান্য কথা নয়। আর উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, তারও উপায় আছে সুশিক্ষার মধ্যে। আর যারা মধ্যম তাদেরও মান কিছুটা উন্নত করা যায়। যত্ন পেলে প্রত্যেক ছেলেরই কিছু না কিছু উন্নতি হবেই। এটা শিক্ষকের আশার কথা, এবং তা সামান্য কথা নয়। "যাঁরা গণতন্ত্রের (democracy) গুণ বিচারে রত, এমন ব্যক্তি ও শিক্ষক বা সমাজ কর্মীর দৃষ্টিতে এ সম্ভাবনা যথেষ্ট মূল্যবান্। যদিও প্রত্যেক ধাঙ্ড়্ড়ারের ছেলে বড় এন্‌জিনীয়ার হয়তো হতে পারবে না, কিন্তু সে সার্ভেয়ার বা ডাক বিভাগের কেরাণী নিশ্চয় হতে পারে এবং সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধির হার পাঁচ অঙ্কও যদি উন্নত করা যায়, তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।"[২৯] সুশিক্ষা দিয়ে শুধু কয়েকটি ব্যক্তি নয়, একটা জাতেরও কতখানি উন্নতি হতে পারে, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে রাশিয়া।

২৯ Murphy and Newcomb—Experimental Social Psychology. P. 53.

ইংলণ্ড, আমেরিকাতেও এ কথা সত্য। আজ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, সে সব দেশের সমস্ত সন্তান ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। তার সুফল সে সব দেশে সুস্পষ্ট। বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়তো অনুকূল পরিবেশ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত নয়, কিন্তু, ব্যক্তির রুচি ও চরিত্র,—তার সমস্ত ব্যক্তিত্বই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। কাজেই শিক্ষক, সমাজ-সেবী, রাজ-নীতিবিদ্ সকলের চেষ্টা হওয়া উচিত পরিবেশকে উন্নত করবার। রাশিয়া সে অসম্ভব সাহস করেছে,—তার সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কাঠামো সে ভেঙ্গেচুরে বদলে দিয়েচে। তার ফল কি হয়েচে তা যে দেখতে পায় না সে অন্ধ। একটা পর্যায় যদি নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তার সুফল কি পরবর্তী পুরুষে কিছুটা প্রতিফলিত হয় না? ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত গুণ বংশানুক্রমিক না হতে পারে, কিন্তু 'সামাজিক বংশগতি' কথাটার বৈজ্ঞানিক কোন নির্দিষ্ট মানে না থাকলেও, সেটা মিথ্যে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা সামাজিক উত্তরাধিকার। "সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোঝা যায় একটা নূতন পর্যায়ের উপর পূর্বপুরুষেরা তাদের কার্য ও পুস্তকাদি দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। স্পষ্টতই শিক্ষা হচ্ছে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ।"[৩০] আজ রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচুরিন্, লাইসেংকো (Michurin, Lysenko) ইত্যাদি বিশ্বাস কচ্ছেন, বংশগতি কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করা সম্ভবপর। এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তবে একথা আজও অপ্রমাণিত!

অতিরিক্ত আশাবাদী যদি নাও হই, তবু শিক্ষার ফলে মানুষের ও সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করা যেতে পারে, এ আশা শিক্ষক নিশ্চয়ই করতে পারেন। যে সব পরীক্ষা এ যাবৎ হয়েছে তা অধিকাংশই বুদ্ধির পার্থক্যের মাপজোখ নিয়ে ব্যস্ত। রাশিয়াতে এই বুদ্ধির মাপের উপর বেশী মূল্য আর দেওয়া হয় না। মানুষ কেবল বুদ্ধি দিয়েই গড়া নয়, তার সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে পরিবেশের দামও অমূল্য। উন্নততর শিক্ষা প্রণালীর ফলে যদি বুদ্ধির উন্নতি নাও হয়, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, তার মূল্যও সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অসীম। আর শিক্ষার ফলে সমাজের

---

৩০ Godfrey and Thompson—A Modern Philosophy of Education P. 136.

কৃত্রিম বিভেদগুলি যদি দূর হয়, তবে বংশগতির উপরও তার প্রভাব দেখা দেবে। তখন দরিদ্র কিন্তু বুদ্ধিমান্, স্বাস্থ্যবান্ ও চরিত্রবান্ যুবকের পক্ষে অনুকূল পরিবেশে প্রতিপালিত ধনীর দুলালীর পাণিগ্রহণ অসম্ভব হবে না, এবং পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ যদি সকলে পায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, সুপ্রজনন বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ ক'রে, তাদের ব্যাখ্যা ক'রে, শিক্ষক ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির সহায়ক হতে পারেন। কাজেই সোজাসুজি ভাবে বর্তমান বংশগতিকে শিক্ষক পরিবর্তন না করতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নততর বংশধর সৃষ্টির সম্ভাবনাকে তার শিক্ষা দ্বারা তিনি ত্বরান্বিত করতে পারেন। "এটা সত্য যে আজ যে পর্যায় চলছে, তাদের বংশগতি আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। কিন্তু নূতন যে বংশধরেরা আজও জন্ম নেয়নি, তাদের বংশগতির উন্নতির সম্বন্ধে আমরা কিছু করতে পারি। কোন যুবক ও যুবতী যখন তার জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গী নির্বাচন কচ্ছে, তখন সে পরবর্তী পুরুষের উত্তরাধিকারকে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে কিছুটা পরিবর্তন কচ্ছে। যে যুবক যুবতীদের দেহ সুগঠিত, যাদের মানসিক নানা সদ্‌গুণ আছে, যারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিন্তু যাদের আর্থিক উপার্জন যথেষ্ট নয়, তাদের সন্তান প্রজনন, পালন, সুশিক্ষা ব্যাপারে সাহায্য করে, সমাজও এবিষয়ে কিছু আনুকূল্য করতে পারে। তাহলে এদের সন্তানদের মোটের উপর বংশগতি অনুকূল এবং গৃহপরিবেশও সন্তোষজনক হবে। বুদ্ধিমান্ ও সুস্থ, শান্ত পিতামাতার সন্তানেরা জীবনযাত্রার পথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় নিয়ে অগ্রসর হবে। এ জাতীয় সুসন্তানের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টাই করা কর্তব্য—অন্ততঃ এদের সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায়, তা করতেই হবে।" ৩১

বর্তমান যুগের দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্যৎ যুগের কাছে সে দায়িত্ব হচ্ছে উন্নততর মানুষের সম্ভাবনার পথ সুগম করে তোলা। শিক্ষক, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ্, এক কথায় সমস্ত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই তাই অক্লান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে একদিকে পরিবেশকে অধিকতর অনুকূল করে তুলতে আর অন্যদিকে আত্মানুশীলন দ্বারা নিজেকে উন্নততর করে, নিজ আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও শিক্ষার দ্বারা উন্নততর যুব সমাজ সৃষ্টি করতে, যার ফলে আসবে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্টতর জনক জননী আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ বলিষ্ঠ বংশধর।

৩১ Woodworth and Marquis.

একাদশ অধ্যায়

মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া

মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের মধ্যে, স্মৃতি বা মনে রাখা, একটি বিশেষ আলোচিত প্রসঙ্গ। কারণ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বদা এর প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা আমরা লক্ষ্য করি। সম্ভাব্য প্রশ্ন ক'টি খেটে খুটে তৈরী করেছি, পরীক্ষার হলে সেগুলি মনে রাখা দরকার। বাড়ী থেকে বেরোবার সময়, খোকার জন্যে যে রেশমের জুতো কিনবার কথা ছিল, তা বাড়ীতে ফিরে মনে পড়ল। কাল মিনতি নাচের যে কটি পদক্ষেপ শিখেছে, তা মনে রেখে আরো কতগুলি পদবিন্যাস শিখল। ট্রামে পাশের সীটের টাক-পড়া ভদ্রলোককে দেখে, ছেলেবেলার স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতকে চিনতে পারলাম; এমনি আমাদের জাগ্রত জীবনের অনেক প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, এই মনে-রাখা ও ভুলে-যাওয়ার বিচিত্র বিন্যাসে বোনা। সুতরাং কেন আমরা মনে রাখি, এবং কেনই বা ভুলে যাই, কি করলে মনে রাখা যায় তা জানতে আমাদের অসীম কৌতূহল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

বস্তুতঃ, মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া একই প্রক্রিয়ার (স্মৃতির) ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ। যে কারণে আমরা স্মরণ রাখতে পারি, তার অভাব ঘটলে আমরা বিস্মৃত হই। অতএব কি করলে মনে থাকে, তা আলোচনা করলে, পরোক্ষভাবে কেন ভুলে যাই তার উত্তরও জানা যায়।

স্মৃতির ছবি ও কল্পনার ছবি—কখনো অবসর বেলায় পুরাতন দিনের স্মৃতি মনে আসে। যা ঘটেছিল, তা যেন চিত্ররূপ নেয়। আমরা স্মৃতির অতলে অবগাহন করে, এই যে ছবির মুক্তা তুলি, তা কিন্তু কল্পনার ছায়াছবির রূপ নয়, এটা প্রত্যক্ষ ঘটনাও নয়। স্মৃতির ছবিতে অতীতে যা ঘটেছিল, তাই বহুলাংশে পুনরাবৃত্তি করি; যে রংয়ের ছবি দেখছি—কিছু দিন পরে আবার তা মনের মধ্যে দেখি। প্রত্যক্ষ ও প্রথম সাক্ষাতের চেয়ে এই স্মৃতির ছবি কিন্তু ম্লানতর।[১] হয়তো বা স্মৃতিতে দ্রব্যের মাত্র একটি গুণ (যেমন একটি ফুলে শুধু পাঁপড়ির গড়ন) মনে পড়ল।

১ Stout—Manual of Psychology.

অতীতের কোন ঘটনা, চেষ্টা করে, যদি স্মরণে আনি, তাহলে, যে ছবি মনে মনে জাগে, তাকে স্মৃতিকল্প (Memory image) বলে।

কল্পনা ও স্মৃতির ছবির পার্থক্য

ছবিটি যখন সম্পূর্ণ মন-গড়া কল্পনায় পাই, যার বাস্তব পরিবেশ ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতায় ভিত্তিস্থিত নয়, মন যেখানে যোগ-বিয়োগের অধিকারী, তা হ'ল কল্পনার ছবি (image of imagination)। এখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার ছিন্নাংশ অবশ্যই আছে, কিন্তু কোন বিশেষ ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি নাই। মনের এই শিল্পকাজটি নিতান্তই মুক্ত রং-তুলির খেলা, এটা অতীত অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফ নয়।

স্মৃতির সংজ্ঞা—স্মৃতি কি ? যাহাকে আমরা বলি স্মৃতি (memory), তা আসলে একটা বিশেষ্য নয়, একটা ক্রিয়া—স্মরণ করা। স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি একটা অভ্যাস, যেটা অর্জিত হয়,—পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়ন দ্বারা। কোন একটা বিষয় বার বার পড়ে বা করে, আমরা সেটা মনে রাখি। অভ্যস্ত বিষয় আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে সেই বিষয়টি সঞ্চিত বা সংরক্ষিত হয় বলেই তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়। কোন বিষয় স্মরণ করতে পারি, তাতে প্রমাণ হয়, পূর্ব্বে কিছু শেখা হয়েছে ; এবং এটাও প্রমাণ হয়, যে শেখা ও স্মরণের মাঝের সময়টাতে, যা শেখা হয়েছে, তা মনের মধ্যে কিছু দাগ রেখে যাচ্ছে।

মনে রাখার মধ্যে চারটি স্তর আছে **১। শেখা বা অভিজ্ঞতা গ্রহণ** (learning) **২। সঞ্চয় বা সংরক্ষণ** (retention) **৩। স্মরণ বা মনে করা** (recall) **৪। পূর্ব্ব স্মৃতিকে পূর্ব্বপরিচিত বলে চিনে নেওয়া বা মনে পড়া** (recognition)

সর্বক্ষেত্রেই মনে রাখার গোড়ায় আছে, শেখা। কখনো যা শেখা হয়নি তা মনে পড়বার কথাই ওঠে না ; অবিলম্ব স্মৃতির অর্থাৎ এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কতটা মনে থাকে, (**immediate memory span**) পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষার্থীদের কয়েকটি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি দেখানো হয়, এবং তৎক্ষণাৎ তাদের সেগুলি পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। যতগুলি বিষয় তারা একবার দেখে মনে রাখতে পারে, তাই তাদের অবিলম্ব স্মৃতির মাপ। **এবিংহজের** এইরূপ **অর্থহীন বর্ণ-সমষ্টি non-sense syllable** নিয়ে মনে রাখার **পরীক্ষা** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণতঃ, এরকম ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা বর্ণ-সমষ্টিগুলির মধ্যে কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করে মনে রাখবার চেষ্টা করে।[২] এমনি একটি Introspective Report —"প্রথমে syllable গুলোকে মনে মনে আবৃত্তি করেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভুলে গেছি। তারপর CAM, LUM এর সঙ্গে Panmunjon নামের সম্বন্ধ মনে আসে। পরে YAX এর সঙ্গে yak ও Mis ও TOH এর সঙ্গে, জাপানী নাম Miss Toh এর সাদৃশ্য মনে পড়ে। DYP কথাটি deep কথা দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি, শেষের কথাগুলির সঙ্গে অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে না পারায় মনে থাকছিল না।[৩] Non-sense syllable এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে Gestalt theoryর Law of configuration কে দেখা যায়। Nonsense syllable মনে থাকার অসুবিধার জন্য, এই পদ্ধতিতে স্মৃতি পরীক্ষার রীতি (এবিংহজের), পরবর্তীদের দ্বারা সমালোচিত হয়।

শেখায় এই মনে মনে সম্বন্ধের গাঁটছড়া বাঁধা (association) মনে করার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একটী ভাব আরেকটীর স্মৃতি মনে আনে, এক দ্রব্য আরেকটী দ্রব্যকে মনে পড়ায়, তার কারণ, এরা একটী সম্বন্ধের ঐক্যে বাঁধা। তাই আমরা পড়বার সময় চেষ্টা করি, যেন এই অনুষঙ্গ সম্বন্ধটীর (association) সূত্রগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারি। এই সূত্রগুলি ছাড়া স্মৃতি নিরালম্ব।

Laws of association—অনুবন্ধ সম্বন্ধের সূত্র—যেহেতু ভাল করে শিখবার ও সহজে মনে পড়বার একটী মূল সূত্র হচ্ছে, অনুবন্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করা, তাই অনুবন্ধ সম্বন্ধের রীতি নীতি একটু আলোচনা করি।

অনেক সময়ই একটি জিনিষ চিন্তা করলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আরেকটী জিনিষ মনে উদয় হয়। যেমন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম ও সুঠাম তরুণী, অথবা ঈশান কোণে মেঘ ও বৃষ্টি; এগুলিকে আমরা একসঙ্গে কাছাকাছি দেখেছি, তাই একটী আরেকটীর সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্র গেঁথে গিয়েছে। তাই একটীর কথা ভাবলে আর একটিও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে।

এরা সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে, নৈকট্যের জন্য। একে বলে **নৈকট্য সূত্র (Law of Contiguity)**

---

২ 'মনোযোগ' অধ্যায় দেখ। স্মৃতির পরীক্ষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩ David Hare Training College. Calcutta—র Psychology Bureau তে একটি পরীক্ষার নমুনা।

দুটি বস্তু কাছাকাছি না থাকলেও কখনো কখনো একটিকে দেখলে আরেকটির কথা স্মৃতিপথে উদয় হয়। যেমন বেড়াল ও বাঘ এ দুটির আকৃতির মধ্যে এমন সৌসাদৃশ্য আছে, যে একটিকে দেখলে, আরেকটির কথা মনে উদ্রেক হয়। একজন দাঁড়িওয়ালা, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করায়—এরা কখনো নৈকট্যে সম্বন্ধ যুক্ত হয় নি, কিন্তু **সাদৃশ্য-লক্ষণে যুক্ত** হয়েছে (**Law of Similarity**)। অবশ্য পরস্পরের মধ্যে কিছু ভিন্নতা না থাকলে, এরা সাদৃশ্য সম্বন্ধ সূত্রেও গ্রথিত হতে পারেনা। দুটি বস্তু যদি সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে এক হয়, তবে একটিই মনে হয়। অপরটিকে মনে হয় না।

সুতরাং অনুবন্ধ সম্বন্ধের আরেকটি মূল্যবান সূত্র হচ্ছে **ভিন্নতার সূত্র** **(Law of Contrast)**। দুটী বস্তু একেবারে বিপরীত হলেও, কখনো কখনো মনের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত হয়। যেমন শীত-গ্রীষ্ম, অথবা হাসি-কান্না। তবে এই শেষোক্ত সূত্রটি মৌলিক সূত্র বলে অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করেন না, কেননা কখনো কখনো বৈপরীত্যের এই সূত্রটি নৈকট্যের সূত্রের অপর পিঠ বলে অনুমান করা হয়। শীত ও গ্রীষ্ম, ঋতুর দুটি বিভিন্ন রূপ। সুতরাং শীত ও গ্রীষ্মকে আমরা নৈকট্য সূত্রের জোরেই যুক্ত করতে পেরেছি। হাসি কান্নাও প্রক্ষেভেরই দ্বৈত প্রকাশ ভঙ্গী, কাজেই এরাও কাছাকাছি থাকার ফলেই মনে দৃঢ় ছাপ ফেলে।

এই সবগুলিসূত্রই অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ নৈকট্যের সূত্রটীকে সৌসাদৃশ্যের সূত্রেও বিলক্ষণ ব্যাখ্যা করা চলে, এবং সৌসাদৃশ্য সূত্রকেও নৈকট্যের সূত্র বলে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য নয়। যেমন বিড়াল ও বাঘের আকৃতিগত সাদৃশ্য, মনের মধ্যে কখন কখন আমরা একত্র পুঞ্জিত করেছি, তাই হয়তো একটি ভাব আরেকটি ভাবকে সান্নিধ্যবশেই আহ্বান করে; পূর্বে যাদের মনের মধ্যে এক করেছি, তাদের একটি আর একটিকে মনের মধ্যে টেনে আনে। এখানে সাদৃশ্য সূত্রটিকে নৈকট্য সূত্রেই পরিণত করা চলে।

তাই হ্যামিলটন্ এই অনুবন্ধ সম্বন্ধের সূত্রগুলিকে একটি **পূর্ণাঙ্গ সূত্র** দ্বারা **(Law of Redintegration)** ব্যাখ্যার প্রয়াসী। সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ দুইটি ভাব মনের মধ্যে একসঙ্গে যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ভাবের সৃষ্টি করে। তারই একটি ছিন্নাংশ মনে পড়লে, সমস্ত পূর্ণাঙ্গ ভাবটিই মনে উদয় হয়। এ দ্বারাই দুটী ভাব পরস্পর সংযুক্ত হয়, এবং মনে পড়ার সাহায্য করে।

ড্রেভার এই সূত্রটিকে ভিন্ন নামে স্বীকার করে তাকে বলেছেন, সুষম সম্বন্ধের ঐক্যবন্ধন সূত্র (**Law of systematic relation**)। একটি জিনিষ বা ভাবকে আগ্রহের বশে যখন আমরা মনে করি, সেই মুহূর্তকে অতিক্রম করে তাদের সঙ্গে যুক্ত অন্য ঘটনাবলীও আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়। এমনি করে কতগুলি পূর্ণাঙ্গপট আমাদের মন সঞ্চয় করে। আগ্রহ ছিন্ন ভাবগুলির মধ্যে ঐক্যের বাঁধন সৃষ্টি করে। তাই এক খণ্ডাংশ অন্য খণ্ডাংশকে মনে করিয়ে দেয়। **Gestalt** মতে বিশ্বাসীরাও এই মতটিকে সমর্থন করেন।[৪]

সম্বন্ধ স্থাপন ছাড়াও, স্মৃতিতে সঞ্চয় করবার জন্যে (retention) এবং তা আবার মনে আনবার (recall) আরো যে কয়টি প্রয়োজনীয় কৌশল আছে, তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই—সুস্থ সতেজ মনে শেখা, এবং শিখব এই সংকল্প নিয়ে শেখা, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, সরব আবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্বন্ধ সৃষ্টি করে পঠন, মনের মধ্যে একটি অবস্থান মানচিত্র সৃষ্টি করে লওয়া, (যেমন মাদ্রাজ শহরটি, কলিকাতার দক্ষিণে, কলম্বোর উত্তর, এবং বোম্বাইয়ের পূর্ব্বে ইত্যাদি)। ছেদ যুক্তপাঠ আরেকটি স্মরণের সহায়ক পঠন রীতি। কি করলে, দীর্ঘকাল স্মরণে রাখতে পারি, সে প্রসঙ্গে আমরা এবিষয়ে আরো আলোচনা করব।

সংরক্ষণ বা Retention স্মৃতিতে সংরক্ষণ Retention স্মৃতির চারটি মৌলিক উপদানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রধানতঃ আমরা স্মৃতি বলতে, যা মনে ধরে রাখতে পারি, তাই বুঝি। সেই লৌকিক অর্থে, সংরক্ষণই স্মৃতি।

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে আমরা নতুন যা আয়ত্ত করি, তা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুপথে ছাপ ফেলে যায়। মনে এর প্রতিফলন ঘটে থাকে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই মস্তিষ্কের অসংখ্য স্নায়ুজালের শিরাপথে রণন তোলে, এবং মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী দাগ রাখে, এবং স্নায়ু-সংযোগ গঠনে পরিবর্তন ঘটায়। একেই আমরা বলি স্মৃতির রেশ (memory trace)। এ রেশগুলি জমা থাকে বলেই স্মৃতির অতলে ডুবুরী নাবিয়ে মুক্তা চয়ন করতে পারি তার জন্যই কেউ কেউ মনে করেন, কোন স্মৃতিই হারায় না। 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'।[৫] বহুদিন আগে শেখা কবিতার কলি, তাই কখনো মনের মধ্যে

---

৪ Collins & Drever—Experimental Psychology, P. 215

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হঠাৎ দেখা।

গুঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই জন্যই বহুদিন আগের পরিচিত কাকেও চিনতে পারি, এমন কি আপাতভাবে সম্পূর্ণ বিস্মৃত তথ্যও অল্প চেষ্টায় পুনরায়ত্ত করতে পারি।

একটি কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন মনোবিজ্ঞানী (বার্ট) তাঁর পনের মাসের শিশুপুত্রকে গ্রীক্ কবিতার খানিকটা অংশ শোনান, এবং বাচ্চার দেড়বছরের মধ্যে, আরো কয়েকবার সে অংশগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। শিশুর সাড়ে আট বছর বয়সে, ছেলেটি সেই কবিতাটির অংশ কয়েকটি, এবং সঙ্গে নতুন অন্য কিছু চরণও শেখে। এতে দেখা যায় সম্পূর্ণ নতুন অংশগুলি শিখতে তার যেখানে ৪৩৫ বার সময় লাগে, পূর্ব-শ্রুত অংশগুলি আয়ত্ত করতে, লাগে মাত্র ৩১৭ বার। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে স্মৃতির সঞ্চয় থাকার দরুণ, তার শেখার সময় ও পরিশ্রম ২৭% বাঁচল।[৬]

উপরে যে মনের উল্লেখ করা হ'ল তাতে মস্তিষ্কে স্নায়ুপথের রেখা শিক্ষা গ্রহণের পরেও ক্ষীণভাবে থেকে যায়। ষ্টাউটের মতে সেই সঙ্গে মনের অবচেতনায় (sub-conscious mind) অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়। মুনষ্টারবার্গ "অবচেতন" মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কার্পেণ্টার স্মৃতিতে সংরক্ষণ ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ স্নায়বিক ব্যাপার বলে মনে করেন। তাঁর মতকে theory of unconscious cerebration বলা হয়।[৭]

সব স্মৃতিই কি চিরস্থায়ী? কতদিন পর্যন্ত স্মৃতির রেশ থাকে? উপরোক্ত পরীক্ষাটিতেই দেখা যায় ১৫ বৎসর বয়সে ছেলেটি যখন আবার কবিতাটী শিখতে যায়, তখন তার অনেকটা অংশের স্মৃতি (কবিতার) তার লোপ পেয়েছে। কাজেই বহুদিন অব্যবহারে বহু শেখা-জিনিষ আমরা ভুলে যাই। মস্তিষ্কের মধ্যে শিক্ষণে ও অভ্যাসে যে স্নায়ুপথ তৈরী হয়, অব্যবহারে সে পথরেখা অস্পষ্ট হয়ে আসে। বয়স যত কম, স্মৃতির স্থিতিকাল (latency period) তত কম।[৮]

পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, কারও কারও স্মরণশক্তি অন্যদের অপেক্ষা ভাল,

---

৬ H. E. Burt.—An experimental study of early childhood memory. Final report. J. Genet, Psy. 1941, 52, 289-295.

৭ Wm, B. Carpenter. Principles of Mental Physiology. এবং চেতন অবচেতন-অচেতন সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য বিভুরঞ্জন গুহের মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার দেখ

৮ Hurlock & Schwartz—Child Development, P. 230-39.

আবার কোন কোন বিষয় বা তথ্য অধিকদিন মনে রাখা সহজ। অর্থপূর্ণ বর্ণসমষ্টি, অর্থহীন বর্ণসমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশীদিন মনে থাকে। তা ছাড়া

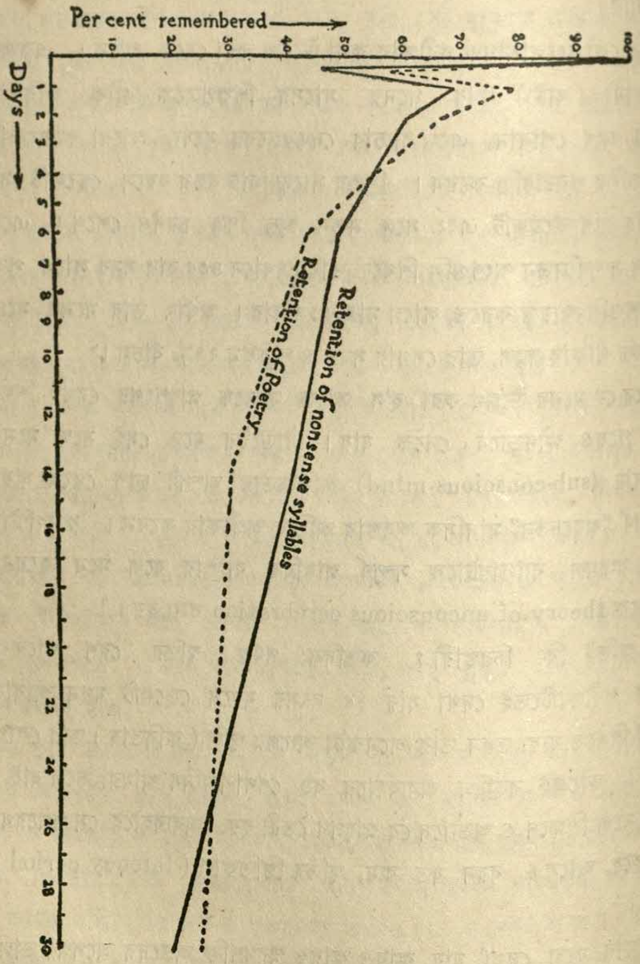

Fig. 50. Curves of forgetting nonsense syllables & poetry
(From Sandiford—Educational Psychology, P. 243, Fig. 51, Longmans Green & Co.)

বিষয়টি মনে রাখবার আগ্রহ থাকার উপরেও বেশীক্ষণ মনে থাকা নির্ভর করে। যে অভিজ্ঞতা প্রীতিপ্রদ, মন তাকে ধরে রাখে। কার্টারের (Carter) একটি

পরীক্ষা এই মত সমর্থন করে। তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ৫০টী ছেলেকে ৯টী শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে দেন। এর মধ্যে কয়েকটী তালিকায় ছিল, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ দ্রব্য বা ঘটনার নাম; কয়েকটী তালিকায় ছিল মাঝারি রকম প্রীতিপ্রদ-বা ভালও নয়, মন্দও নয়, এমন দ্রব্য ও ঘটনার নাম। কয়েকটী তালিকায় ছিল অল্প অল্প বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। আবার কয়েকটী তালিকায় ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। পরীক্ষায় দেখা গেল, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ তালিকাটী সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ছেলে-মেয়ের মনে থাকছে। সবচেয়ে অপ্রীতিকর তালিকাটী সবচেয়ে কম ছেলের মনে থাকছে।[৯]

ভোলা কিন্তু শুধু স্মৃতির রেখা মুছে যাওয়াতেই ঘটেনা। আমরা নিজেরা সচেষ্ট হইয়াও ভুলি। সুতরাং এটী একটী সক্রিয় প্রক্রিয়া। দেখা যায়, কোন নতুন পড়া শিখে তৎক্ষণাৎ আরেকটী কাজ করলে পরবর্তী কাজটীর স্মৃতি প্রথম শেখার স্মৃতিকে ম্লান করে দেয়। একে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন **Retro-active inhibition** বা পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাধা। তেমনি আবার কোন পাঠ শিখবার আগে যা ঘটেছে, তার স্মৃতি পরবর্তী কাজটীকে বাধা দেয়। একে নাম দেওয়া হয়েছে অগ্রক্রিয়াশীল বাধা (**pro-active inhibition.**).

পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাধার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে। কতগুলি অর্থহীনবর্ণসমষ্টি (nonsense syllables) এক ব্যক্তি দিনের বেলায় মুখস্থ করে, নানা কাজে ব্যস্ত রইলেন। দিনের শেষে দেখা যায়, তিনি অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অনুরূপ অর্থহীন বর্ণের সমষ্টি, মুখস্থ করবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে, পরীক্ষা করে দেখা যায়, যে ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা কম। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, একটা কাজ শেষ করেই, আরেকটা কাজ সুরু করলে, স্মৃতিচিহ্ন (memory trace) নষ্ট হয়, সব চেয়ে বেশী। কিছুক্ষণ বিশ্রামের ফলে সংরক্ষণ (retention) দীর্ঘতর হয়। অর্থাৎ পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাধা, প্রথম করা কাজটীর স্মৃতি ম্লান করে দেয়। এর কারণ সম্ভবতঃ, একটী পাঠ বা কাজ শিখবার সময় মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে যে পথ তৈরী হয়, তা মস্তিষ্কের অন্য সমস্ত তন্তু ও স্নায়ুযন্ত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। কাজেই, অন্য কাজ বা পাঠ শিখবার সময় সে স্নায়ুপথ অন্য স্নায়ু-

৯ Carter—Effects of emotional factors upon rec

পথের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।[১০] এ থেকে বোঝা যায়, শেখা হয়ে গেলে, অতীত বিষয়কে মনে সংরক্ষিত হবার জন্য কিছু সময় দেওয়া দরকার। অর্থাৎ শেখার পরেও স্নায়ু-পথে, গঠনের কাজ চলতে থাকে (**consolidation**)। তখন বাধা পেলে মনে সংরক্ষণের কাজ ভাল হয় না। এর দ্বারা আরেকটী জিনিষও প্রমাণিত হয়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যত তাড়াতাড়ি ভুলি, ঘুমন্ত অবস্থায় ভুলবার হার তার চেয়ে অনেক কম। সম্ভবতঃ **কোন জিনিষ আয়ত্ত করবার ও পরে মনে করবার সময়ের মধ্যে, সময়ের ব্যবধান নয়, সে সময়ে ঘটা ঘটনাবলীই স্মৃতিকে ম্লান করে।** তাই ঘুমের মধ্যের কয়েক ঘণ্টায় স্মৃতি ততটা নষ্ট হয় না। কারণ তখন মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত অলস থাকে।[১১]

ভুলবার ব্যাপারে আরেকটী উল্লেখযোগ্য তথ্য,—পর পর দুইটী একধরণের জিনিষ শিখলে বিস্মৃতি দ্রুত ঘটে; যেমন দুটী বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ পর পর শিখলে, একটীর মূল তথ্যের সঙ্গে অপরটীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

আরেকটী প্রয়োজনীয় তথ্য,—যেখানে মিল আছে, ছন্দ আছে অথবা যা অর্থপূর্ণ, তা আমরা ভুলি অনেক দেরীতে। বিচ্ছিন্ন তথ্য-সমষ্টি অপেক্ষা, ঐক্যবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ ধারণা আমরা সহজে শিখতে ও মনে রাখতে পারি। সুতরাং বেশীদিন স্মরণ রাখতে হলে, সূত্রবন্ধনে তথ্যগুলিকে মনের মধ্যে গাঁথতে হবে।

সহজে আয়ত্ত করবার, দীর্ঘদীন মনে সংরক্ষণ করবার, এবং যথাসম্ভব যথাযথ ভাবে মনে ফিরিয়ে আনবার উপায় হল শিক্ষিতব্য বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ (motivation) সৃষ্টি করা। বার্টলেটের (Bartlett) সিদ্ধান্ত এই যে, **শিশুরা আগ্রহে যা শেখে তাই সব চেয়ে ভাল মনে রাখতে পারে।**[১২] কাজেই গ্রহণ করবার জন্য মনটীকে প্রস্তুত করা (mental set) প্রথমে দরকার। এই মন প্রস্তুত করা কথাটী, শুধু পাঠ শিখবার ক্ষেত্রেই নয়, মনে করবার (recall) ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কাজেই ছাত্রদের হঠাৎ পরীক্ষা করে' (surprise test) তাদের কতটুকু মনে আছে, তা বাস্তবিক বোঝা যায় না। 'এটা আমার মনে রাখতেই হবে' এই সংকল্প নিয়ে শিখলেই, দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব। এবিংহজ্ এই নিয়ে একটী পরীক্ষা করেছেন। তিনি বার বার

১০ Woodworts & Marquis—Psychology. pp 557-59

১১ Van ormer E. B.—Retention after intervals of sleep & waking. Arch. Psy. 1932 No. 137

১২ Bartlett—Remembering.

কতগুলি অর্থহীন শব্দ বলে যান, শিখবার কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা ও মনোভাব তাঁর ছিল না। পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও, তিনি একটীও শব্দ শিখতে পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব দূর করে, শিখতেই হবে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, মনঃসংযোগ করেন ও আবৃত্তি করেন, এবং অতি অল্প সময়েই শব্দগুলি মুখস্থ করে ফেলেন। [১৩]

না ভুলবার আর একটি উপায়—আওড়ানো বা আবৃত্তি করা। (Recitation) চোখে দেখা পাঠটা যখন মনে মনে বা জোরে বলে অভ্যাস করলাম, তখন তা দৃষ্টির অতিরিক্ত বাচনিক স্মৃতির ডোরে বাধা পড়ল। এতে মনে রাখা দৃঢ়তর হল।

এ সম্পর্কে ওয়াটসনের একটা মত আছে। সেই ঘটনাই শুধু আমরা মনে রাখতে পারি, যেগুলির সঙ্গে আমরা কথার সম্পর্ক (verbal memory) স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। একটা বাগানে বেড়াতে গেলাম, দেখলাম, দক্ষিণে আটটা স্থপারী গাছ রয়েছে, পশ্চিমে তিনটা আমগাছ ও কাঁঠাল গাছ, পূবে সন্ধ্যা-মালতীর ঝাড়, মাঝখানে বেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হেনা, জবা। আর তা ছাড়া মরশুমী ফুলের বেড্ আছে আটটা। মনে মনে এই যে লক্ষ্য করলাম, এ যেন নিজের কানে নীরবে কথা বলা (Thinking is subvocal speech)-এতে ঘটনাটা মনে থাকবে।

মনে রাখার ব্যাপারে সরব আবৃত্তি নীরব আবৃত্তির চেয়ে ফলপ্রদ এতে পড়া কথাটি ভাল মনে থাকবে। [১৪] এ মনে থাকাটা পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই শুধু নয়, দীর্ঘকাল পরেও লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হল ঃ

যে জিনিষটি শেখা হল—	১৬টি অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি		মোট ১৭০ শব্দ সমন্বিত ৫টি ছোট ছোট জীবন কাহিনী।	
	পড়ার ঠিক পরেই শত-করা কতটা মনে রইল	৪ ঘণ্টা পরে	পড়ার ঠিক পরেই শত-করা কতটা মনে রইল	চার ঘণ্টা পরে কতটা মনে রইল

[১৩] Woodworth—Psychology, P. 271

[১৪] Woodworth & Marquis—Psychology.

সমস্ত সময় নীরবে পড়া	৩৫%	১৫%	৩৫	১৬
১/৫ সময় আবৃত্তি	৫০%	২৬%	৩৭	১৯
২/৫ " "	৫৪%	২৮%	৪১	২৫
৩/৫ " "	৫৭%	৩৭%	৪২	২৬
৪/৫ " "	৭৪%	৪৮%	৪২	২৬

মনে রাখার আরেকটি কার্য্যকরী উপায়, বিরতিযুক্ত পাঠ বা কার্যের অভ্যাস (spaced learning)।

কোন ফাঁক না দিয়ে, পুনরাবৃত্তির দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তারচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়, কিছুটা বিরামের পর পুনরাবৃত্তি করলে। মাঝে মাঝে বিরামের দ্বারা শিক্ষার ফলটা মনের মধ্যে পাকা হয়ে গেঁথে বসবার সুযোগ পায় (**consolidation**) এবং তা স্মৃতিপটে স্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে থাকে। বেশ লম্বা সময় পুনরাবৃত্তির পর, সামান্য কিছু সময় বিরাম দিলে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।[১৫]

মনে রাখার ব্যাপারেও, ক্রমান্বয়ে পড়ে যাওয়া অপেক্ষা, মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে পড়া অনেক কার্য্যকরী হয়।

তবে প্রথম শেখার পরে, এবং দ্বিতীয় শেখাটীর মধ্যে সময়ক্ষেপ খুব বেশী বিলম্বিত না হওয়াই উচিত। কেননা, পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে, শেখার ঠিক পরের ২৪ ঘণ্টায় ভোলার হার সবচেয়ে দ্রুত। শেখার পরের আধঘণ্টায় অর্ধেক আয়ত্ত বিষয় আমরা ভুলি—দুই তৃতীয়াংশ আমরা ভুলি পরবর্তী ৮ ঘণ্টায়। ৩/৪ অংশ ভুলি, ছয় দিনে, এবং একমাসে ভুলি ৪/৫ অংশ। সুতরাং প্রথম পুনরাবৃত্তি, শেখার প্রথম আধঘণ্টার মধ্যে হওয়া দরকার।[১৬]

Recall—মনে ফিরিয়ে আনা—এটী স্মৃতির তৃতীয় স্তর, যখন আমরা মনে সঞ্চিত স্মৃতি পুনরায় সচেতন মনে ফিরিয়ে আনি। আগে যে বিদ্যা আয়ত্ত হয়েছে, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুনঃস্মরণ করতে পারা, স্মৃতির একটী প্রধান অংশ। ডায়াসে দাঁড়িয়ে দুদিন আগের শেখা কবিতা আবৃত্তি করি, এর নাম recall বা মনে ফিরিয়ে আনা।

---

১৫ Murphy—A Briefer Course to Psychology.

১৬ Woodworth—Psychology, P. 266

সব সময় কিন্তু সংরক্ষিত স্মৃতি থেকে পূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়ে আনা যায় না। হয়তো কবিতাটির কয়েক চরণ মনে পড়ে, সম্পূর্ণ কবিতাটি মনে আসে না। কারও সঙ্গে পরিচয় আগে ছিল, তাকে দেখে চিনতে পারি, কিন্তু কোথায়, কবে, কি সূত্রে পরিচয়, তা ভুলে যাই।

সম্পূর্ণ মনে পড়ার পক্ষে যে সব বাধা উপস্থিত হয়, তার মধ্যে উদ্বেগ ও ভয় শক্তিশালী বাধা। উদ্বেগ ও ভয় আমাদের যে সমস্ত কার্য্যক্ষমতাকে পঙ্গু করে নিতে পারে, তার মধ্যে স্মৃতিশক্তি অগ্রগণ্য। পরীক্ষার হলে তৈরী করে-যাওয়া-পড়া ভোলা, অথবা মঞ্চের উপরে সযত্নে প্রস্তুত পাঠ ভুলে যাওয়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। একজন জনপ্রিয় নায়কের জীবনীতে তাঁর একটি মঞ্চাবতরণের কাহিনীতে এই অভিজ্ঞতার সুন্দর বর্ণনা আছে। "পার্টটা কিছুক্ষণ আগেও মনে মনে স্মরণ করছিলাম, কিন্তু এখানে প্রবেশ করবার মুহূর্তে একি হল! একটি বাক্যও মনে পড়ছে না। একটি শব্দও না। সর্ব্বনাশ! কি যে করি? স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছি। প্রম্পটার তাঁর উইংস্ থেকে উঠে, আমার উইংসে এসে, আমাকে পেছন থেকে মারলেন এক ধাক্কা। সামনে তাকিয়ে দেখি, কালো কালো অসংখ্য মাথা, যেন জনসমুদ্র। আর এক অব্যক্ত বাক্যহীনতার স্রোতে আমি যেন ভেসে চলেছি। অতি ভীষণ, অতি নিষ্ঠুর, অতি দুঃসহ সেদিনকার সেই মৌন মুহূর্তটুকু।" [১৭]

কখনো, মনে করবার সময়, একই সঙ্গে দুটি ভাব মনে উদয় হয়। তার সংঘর্ষণে যা মনে করতে চাই তা মনে আসেনা। এরূপ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে মনে করবার চেষ্টা করলে, আপনা আপনি প্রয়োজনীয় স্মৃতি মনে ফিরে আসে।

মনে পড়বার পক্ষে আরেকটি বাধা, অপ্রীতিকর বা লজ্জাজনক স্মৃতি। যা আমাদের অহংবোধকে পীড়িত করে, তা মনে পড়ে না। ফ্রএড-পন্থীরা মনে করেন, আমরা যখন সচেতন নই, তখনও এই অহং অবচেতন মনে অতন্দ্র-ভাবে জেগে থাকে। যা আমাদের অহংকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়, তার উপর ব্যক্তি শোধ তোলে, তাকে বিস্মৃতির রাজ্যে নির্ব্বাসন দিয়ে। একে ফ্রএড পন্থীরা বলেন অবদমন (Repression)। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন, "অবদমন

---

১৭ অহীন্দ্র চৌধুরী—নিজেরে হারায়ে খুঁজি—দেশ, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬০—পৃঃ ৮৩১

জৈব প্রয়োজনে ঘটে ; যা প্রাণীর পক্ষে বেদনাদায়ক বা অস্বস্তিকর, তার হাত হতে বাঁচবার জন্যে এটা আত্মরক্ষার উপায় (defense mechanism)। বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা মনে রাখতে অস্বীকার করার মূল্য দিয়ে, মনে শান্তি লাভ করে। আমাদের প্রাপ্য চেকগুলির কথা মনে রাখি, কিন্তু যে বিলগুলি শোধ করতে হবে, তা আমরা ভুলে যাই।[১৮]

অনেক সময় খানিকটা অংশ আমরা মনে করতে পারি, খানিকটা পারি না। কোন নাম মনে করতে গিয়ে অপর একটি নাম মনে আসে। এ সমস্তই ক্রএডের মতবাদে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। অংশতঃ মনে রাখার একটি উদাহরণ: একটি ছবি দেখলাম, তা মন হতে আঁকতে দিলে, আরও বেশী কিছু যোগ করা হয়, আবার কিছু কিছু অংশ বাদ পড়েও যায়, কিছু পরিবর্তন হয়। এখানে মনে করার বিষয়ে, কল্পনা বা প্রতিসৃষ্টির (reconstruction) কারসাজি আছে। দীর্ঘকাল অব্যবহারে স্মৃতির রেখা অস্পষ্ট হয়ে আসে, তখন আমরা নতুন করে কল্পনার রং মিশিয়ে পুরাতন ছবিকে উজ্জীবিত করি।

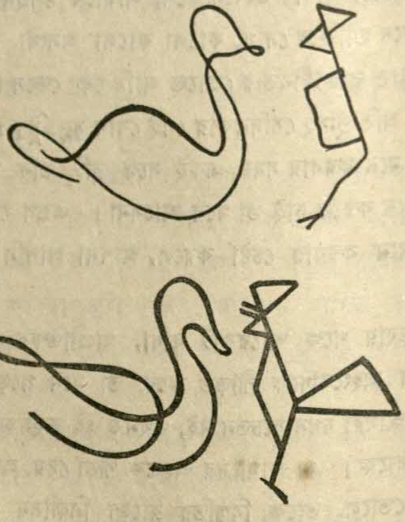

Fig. 51. From Bartlett J. C. "Remembering" A study is Experimental and Social Psychology Cambridge. England. The Uni Press 1932—P. 178.

ওপরের ছবিটা দেখার কয়েকঘণ্টা পরে স্মৃতির থেকে উপরের ছবিটি আঁকা হয়।

১৮ Sandiford Educational Psychology, P. 248

মোট কথা যে বিষয়টি মনে করতে চাই তার উপাদানগুলির মধ্যে সম্বন্ধের বাঁধনটি (association) দৃঢ় হওয়া দরকার, যাতে একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত হতে গোটা তথ্যই সহজে মনে উদ্রিক্ত হয়। (প্রত্যক্ষণ অধ্যায় দেখ।)

Recognition—মনে পড়া বা পরিচিতি—পূর্বেই উল্লেখ করেছি স্মৃতির সমস্ত ছবিই পরিপূর্ণভাবে মনে ফিরিয়ে আনা যায় না। কত সময় কোন মুখ দেখে, মনে হয় তা পূর্ব পরিচিত; কোন গানের কলি পূর্বশ্রুত সুর নিয়ে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে। "যে গন্ধ বয় এই সমীরে, মন বলে তারে চিনি চিনি।" কবে, কোথায়, কি সূত্রে ইত্যাদি সম্পূর্ণ মনে না পড়লেও যখন পূর্বে জানা কিছুকে চিনতে পারি, তখন তাকে আমরা বলি পরিচিতি (Recognition)। সুতরাং বেশী সময়ই সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়ে আনা না গেলেও, তাকে পরিচিত বলে বুঝতে পারি। পরিচিতির মূল কথা হল, 'তোমাকে তো চিনি, এই বোধ। স্মৃতির মধ্যে মোটা অংশই পরিচিতির। সম্পূর্ণ মনে করা, অনেক কম সময়ই ঘটে না। পরিচিতি, মনে করার মত নির্ভুল বা পূর্ণাঙ্গ নয়। পরিচিতিতে ভুল হতে পারে। অনেক সময় চেষ্টা করে চিনতে হয়। প্রথম অভিজ্ঞতার সময় যদি সাবধানে দ্রব্য বা ব্যক্তির গুণগুলি লক্ষ্য না করা হয়, তা হলে দীর্ঘদিন ব্যবধানে চেনা কঠিন হয়।

তবে একথাও সত্য, মনে আনার চেয়ে, মনে পড়া (recognition) সহজ-সাধ্য, কারণ পরিচিতির বস্তুটি সামনে উপস্থিত থাকে; মনে করতে হলে, কিন্তু সক্রিয় সন্ধান ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় কি না?—এটি বহুজনের জিজ্ঞাসা। একথা সত্য, আমরা কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ত করলে, বা মনে রাখতে বিশেষ চেষ্টা করলে, বেশীদিন ভালভাবে মনে রাখতে পারি। তবে স্মৃতিশক্তি কোন পেশীর মত নয়, যে উপর্যুপরি ব্যবহারে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটি একটি মাত্র অবিভাজ্য ক্ষমতা নয়, এবং এ সম্পূর্ণ দেহগত নয়। জেম্‌স্ এর মতে স্মৃতিশক্তি বাস্তবিকপক্ষে জন্মগত, এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুবস্তুর গুণ ও পরিমাণের উপরই নির্ভর করে, তাই এর বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। অবশ্য এ মত সকলে স্বীকার করেন না।

স্মৃতি ব্যাপারটি,—শেখা, মনে রাখা, মনে আনা, আর চেনা, এ কয়টি ক্রিয়ার সমন্বয়ে সৃষ্টি। মনে আনা (recall) ও চেনা (recognition) এ

দুটি ক্রিয়া অনেকটা অস্পষ্ট ; এদের উন্নতির জন্যে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা কঠিন। তবে যেখানে ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা হয়, যেখানে নানা সম্বন্ধ দিয়ে ঘটনাটি মনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, আর যেখানে ঘটনাটিকে ভাল লাগে, তা মনে আনা আর চেনা সহজ হয়। শেখা ও মনে রাখার বেলাও এ কথাগুলি সত্যি।

সংক্ষেপে, **ভাল মনে রাখার কয়েকটি সূত্র উল্লেখ** করতে পারা যায়। পূর্ব্বেই এ বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

১। অর্থপূর্ণ ঘটনা ও শব্দ মনে রাখবার পক্ষে সহজ। ডেভিস্ ও মূর এই নিয়ে কিছু পরীক্ষার পরে দেখান, যে যদিও ভোলার ছন্দ (forgetting curve) অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন শব্দসমষ্টির বেলায় একই ধরণের, ভোলার হার অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টির বেলায় অনেক কম। গিল্‌ফোর্ডের পরীক্ষায় দেখা যায় শিখবার ৫ দিন পরে, অর্থহীন বর্ণসমষ্টি শতকরা ৩০% মনে থাকলে, অসম্পূর্ণ তথ্য মনে থাকে ৫ দিন পরে শতকরা ৮০% ভাগ।[১৯]

২। যে বিষয় বা পাঠ ছন্দোবদ্ধ ভাবে শেখান হয়েছে (organisation of knowledge) তা বেশীদিন ধরে মনে থাকে। সুতরাং পড়বার বিষয়টি যত বেশী ভালভাবে সাজানো হয়, ততই তা মনে থাকবার সম্ভাবনা বেশী। বহুদিনের ব্যবধানে, খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ মনে না থাকলেও, বিষয়টির অন্তরের ঐক্যবন্ধন মনে থেকে যায়।

৩। ভাল করে শেখা—ভাল প্রণালীর সাহায্য নিয়ে শেখা দ্বারা স্মৃতিকে সাহায্য করা চলে। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালী নির্ধারণের জন্য এত বিভিন্ন চেষ্টা। বারে বারে পড়া, মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিয়ে পড়বার অভ্যাস (distributed practice), মুখে মুখে বলা বা সরব আবৃত্তি (verbalisation), সমস্ত বস্তুটির ধারণা করে নেওয়া (taking an overall view), দরকারী জায়গাগুলি দাগ দিয়ে পড়া, তথ্য সমষ্টির মধ্যে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা, মনে রাখবার জন্যে মনের মধ্যে অনুকূল পরিবেশটি সৃষ্টি করা, এ সমস্তই স্মৃতিকে দীর্ঘতর করতে সাহায্য করে।

৪। পাঠটির উপর দখল থাকলে, মনে রাখা সহজ, তাই যতটুকু শিখলে

১৯ Guilford J. P.—General Psy-New York. Van Nostrand 1939. P. 409.

চলে, তাহার চেয়ে কিছু বেশী শিক্ষা করা দরকার (**overlearning**)। নীচের ছবি থেকে বুঝতে পারবে, যে বিষয় যত বেশী ভাল করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শেখা হয়েছে, তা তত কম তাড়াতাড়ি ভুলি। A তে বিষয়টি মাত্র শেখা হয়েছে, তাতে ভোলার হারও দ্রুত। B, C, D তে ক্রমশঃই বেশী ভাল করে অতিরিক্তের অধিক শেখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ভোলার হারও অনেক কম। এটাও লক্ষ্য কর যে, প্রথম দিকে ভোলার হার দ্রুততর, ক্রমশঃ তা মন্থরতর হয়।

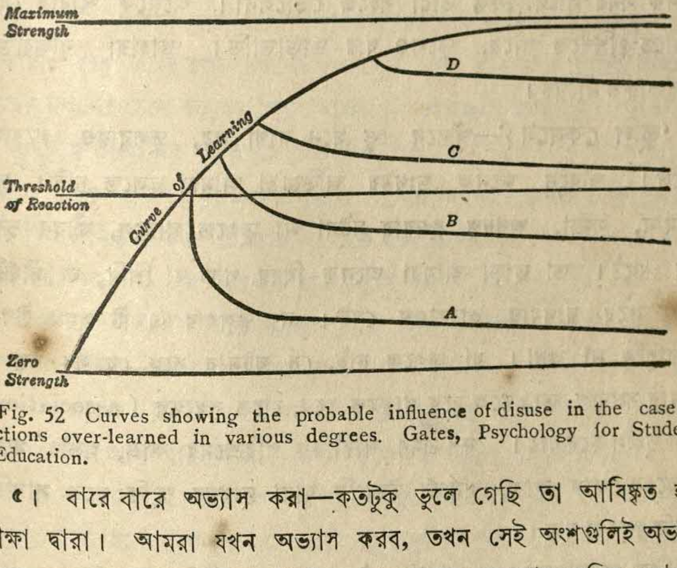

Fig. 52 Curves showing the probable influence of disuse in the case of functions over-learned in various degrees. Gates, Psychology for Students of Education.

৫। বারে বারে অভ্যাস করা—কতটুকু ভুলে গেছি তা আবিষ্কৃত হয়, পরীক্ষা দ্বারা। আমরা যখন অভ্যাস করব, তখন সেই অংশগুলিই অভ্যাস করা দরকার, যা ভাল শেখা হয়নি। বারে বারে অভ্যাস স্মৃতির ডোরের দুর্ব্বল বন্ধনীগুলিকেই ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করে।

৬। আগ্রহ—যে বস্তু আমরা মনে রাখতে আগ্রহী, তা বেশীদিন মনে থাকে। অতএব পড়ার বিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার প্রয়োজন। এখানেই সুশিক্ষকের পরীক্ষা।

৭। অধীত বিষয় মনে রাখবার জন্যে মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেই কারণে, আকস্মিক পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। মনে করবার জন্যে খানিকটা ভূমিকা দরকার—কিছুটা সময় প্রয়োজন (warming up period), ঘোড়াকে আসল রেসের আগে, যেমন দৌড় করে নেওয়া হয়।

৮। সর্ব্বশেষ, নিজের স্মৃতিশক্তিতে বিশ্বাস রাখা দরকার। তাহলে দরকারের সময় মনে পড়বে। 'আমার স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল, আমি মনে রাখতে পারি না,' এরকম আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে বিষয়টি মনে না করতে পারার জন্য দায়ী।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা। স্মৃতিশক্তি ব্যক্তি বিশেষে কম বেশী হয়ে থাকে। কেউ কেউ আয়ত্ত করতে যেমন দ্রুত পারে, মনেও রাখতে পারে অনেকদিন; এটা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। আবার একদল লোকের কাজ বা পড়া আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু তারা সহজে ভোলেনা। অনেকে আবার যেমন দেরীতে শিখতে পারে, ভুলেও যায় তাড়াতাড়ি। তাহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে অপেক্ষাকৃত নীরেট।

'ভুলি কেমনে?'—জীবনে শুধু মনে রাখা নয়, ভুলবারও প্রয়োজন আছে। জীবনে অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা ভুলতে চাই। দুঃখ অপমান, লজ্জা, অপদস্থ হওয়ার ঘটনা না ভুলতে পারলে, জীবন দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আমরা অনেক বিষয় পড়ি বা শিখি, যা দীর্ঘদিন মনে করে রাখবার প্রয়োজন নেই। না ভুলবার একটি সহজ উপায়, পুনরাবৃত্তি না করা। যা ভুলতে চাই, সে ঘটনার সঙ্গে যে সব বস্তু বা ঘটনার সংযোগ, তা থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে সম্বন্ধের (association) বন্ধন দুর্ব্বল হয়ে যায়। দেশ ভ্রমণ, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, গভীর মনোনিবেশের কোন কাজ, ধর্মচর্চা ইত্যাদি দ্বারা দুঃখময় স্মৃতি হতে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কিন্তু জোর করে ভুলে যাবার চেষ্টা করলে, শারীরিক মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। এতে কখনো বা মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি (neuroses & complexes) ঘটে। দুয়েকটি স্মৃতির বৈকল্য সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্মৃতিবিলোপ (amnesia), কথার স্মৃতিভ্রংশ (aphasia), অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি (hypermnesia) স্মৃতি বিলোপ মানসিক বৈলক্ষণের প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় বা অতিরিক্ত উদ্বেগে স্মৃতি লোপ পায়। সাধারণতঃ এই স্মৃতি আবার ফিরে আসে, অনুরূপ কোন গুরুতর আঘাতের ফলে।

কথার স্মৃতিভ্রংশতাও মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে দেখা দিতে পারে, এর ফলে কারো কারো কথা বলবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। যদিও সে সব কথা বুঝতে পারে। অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কখনো সহসা দেখা দিতে পারে। তখন অতীতে বিস্মৃত কোন ঘটনা সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধৃত হয়। কোন কোন মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই মনে রাখবার ভয়ানক ক্ষমতা থাকে। এই সমস্তই স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম ঘটনা।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা—ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন শক্তি বা ক্রিয়া সব চেয়ে দরকারী, তবে একবাক্যে সকলেই বলবেন 'মনে রাখা।' শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রের সকলের চেয়ে বড় ভয় 'ভুলে যাওয়া।' কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মনোবিদ্ এই মনে রাখা ও ভুলে রাখার কলকব্জা কি, প্রকৃতি কি, এদের পদ্ধতি বা বিধি কি, মনে রাখবার কৌশল কি, এসব বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান পরীক্ষার ভিত্তিতে জানতে উদ্যোগী। এ বিষয় নিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা যাচ্ছে।

একসঙ্গে কতটা মনে রাখা যায়—Immediate memory span বিষয়ে পরীক্ষা—একবারে আমরা কতটা মনে রাখতে পারি (immediate memory span) তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন ষ্টার্, এলিস্, ম্যাক্এল্উই। এসব পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে এটা নির্ভর করে বয়স ও কি জাতীয় উপাদান শেখা হচ্ছে তার ওপর। চার থেকে পাঁচ বছরের ছেলেরা একবারে চারটি সংখ্যার (digit) বেশী শুনে তৎক্ষণাৎ মনে রেখে পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। ছয় থেকে আট বছরের ছেলেরা পাঁচটি সংখ্যা, নয় থেকে বার বছরের ছেলেরা ছয়টি সংখ্যা, আর বারো বৎসরের উর্ধ্বে ছেলেরা সাতটি সংখ্যা।[২০] যখন পরিচিত দ্রব্য একটির পর একটি শিশুকে দেখান হয় তখন দেখা যায় সে পাঁচটি পর্যন্ত দ্রব্যের নাম দেখার অব্যবহিত পরে বলতে পারে, তেরো বছরের ছেলে পারে আটটি দ্রব্য একসঙ্গে তৎক্ষণাৎ মনে রাখতে। প্রাপ্তবয়স্কেরা এরকম বিচ্ছিন্ন সংখ্যা বা অক্ষর বা নাম একসঙ্গে আটটির বেশী সাধারণতঃ মনে রাখতে পারে না।[২১]

---

২০ Starr—"The diagnostic value of the Audio-visual digit memory span, Psych. Clin, 1923. 15. pp. 61-84

২১ Mc Elwee—Further standardisation of the Ellis Memory Test for objects test. J. Appl. Psychology 1933, 17, pp 69-70

ভোলার হার ও মনে রাখার হার সম্পর্কে এবিংহজের পরীক্ষা— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতটা ভুলে যাই আর কতটাই বা মনে থাকে, তা নিয়ে এবিংহজের পরীক্ষা প্রসিদ্ধ, এবিংহজের পরীক্ষার পদ্ধতি অভিনব এবং সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই মানসিকপ্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে জড় বিজ্ঞান-সম্মত কঠিন সুশাসিত পরীক্ষা পদ্ধতি (experiment under strict scientific control) ব্যবহার করলেন স্মৃতি বা বিস্মৃতি নিয়ে পরীক্ষণ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অর্থহীন বাক্য সমষ্টি ব্যবহারের (use of nonsense syllables) রীতি প্রবর্তন করলেন, এবং সমস্ত পরীক্ষাই নিজের উপর করে' সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মনে রাখা ও ভুলে রাখার প্রকৃতি এবং তাদের ক্রিয়া বুঝতে হলে, দেখা ব্যাপারটার এমন সহজতম রূপ নিতে হবে, যেখানে অর্থবোধদ্বারা তা কোন প্রকারে প্রভাবিত না হয় এবং অর্থহীন বাক্য সমষ্টি ব্যবহার দ্বারাই কেবল মাত্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে মনের প্রভাবশূণ্য ঠিক একই অবস্থায় সমভাবে তুলনা করা যাবে।[২২] তিনি দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একটি স্বরবর্ণ বসিয়ে বহু অর্থহীন শব্দ (nonsense syllables তৈরী করলেন। এই শব্দগুলি যেহেতু অর্থহীন, সুতরাং এগুলি স্মরণ রাখা সকলের পক্ষেই সমান সোজা বা সমান কঠিন। এপ্রকার অর্থহীন শব্দ-শৃংখলের উদাহরণ দেওয়া যায়—REC, CAG, NOL, YIX, JAF, TUL ইত্যাদি।

কয়েকজন ব্যক্তিকে একই অবস্থায়, একই পদ্ধতিতে অর্থহীন শব্দগুলি মুখস্থ করতে দেওয়া হয়। ধরা যাক, শব্দগুলি একটির পর একটি, দুই সেকেণ্ড

---

২২ He (Ebbinghaus) knew that memorizing is powerfully influenced by the meaning which the material has for the memoriser. And so he had to simplify the questions he asked. He had to ask in effect : How does memorizing proceed when, as far as possible, the influence of meaning is eliminated ? In other words, he deliberately asked questions about meaningless rote memorizing...throughout his lengthy series of experiments. Ebbinghaus used himself as subject, that is, he assumed the dual role of experimenter and memorizer. He also took every precaution to keep conditions as standard and as constant as he could. He required particularly to standardise three things : the material to be memorised ; the procedure used in memorising ; and the methods of measuring the results of memorising.

Murphy—A Briefer course of Psychology.

অন্তর অন্তর ছাত্রের কাছে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয়, অথবা একটি যন্ত্রের সামনে জানলায় শব্দগুলি একটির পর একটি এসে দু' সেকেণ্ডের জন্ম দেখা দেয়। আটটি শব্দের এরকম চারটি লাইন (ধরা যাক্) ছাত্রের সামনে ধরা হবে। তালিকাটি শেষ হয়ে গেলে, তাকে সে শব্দগুলি নির্ভুলভাবে বলতে বা লিখতে বলা হয়। যে পর্যন্ত না ছাত্রটি নির্ভুলভাবে শব্দগুলি বলতে বা লিখতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত, বারে বারে, সেই শব্দগুলি পূর্বের মত তার সামনে ধরা হয়। এই নির্ভুল ভাবে শিখতে সে কতটা সময় নিল, তা লিপিবদ্ধ করা হোল। একই পদ্ধতি সকলের বেলা ব্যবহার করা হয়। এক লাইন শব্দসমষ্টি বললেই পরের লাইনের শব্দগুলি বলতে বলা হয়. (anticipation method)। এতে দেখা যায় যে, সকলের শেখার সময় সমান নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বুদ্ধিমান্ ছেলেরা তাড়াতাড়ি শেখে। এবং পরীক্ষার ফলেই জানা যায় যে যারা দ্রুত শেখে তারাই বেশী দিন মনেও রাখতে পারে।[২৩] যদিও অবশ্য সাধারণ মানুষের এ ধারণা আছে যে যারা ধীরে ধীরে শেখে। তারা মনেও রাখতে পারে বেশী দিন ধরে।

বিভিন্ন সময় অন্তে কতটা মনে থাকে সে বিষয়ে এবিংহজের পরীক্ষা—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভুলে যাই। এটা সবাই জানে। কিন্তু এই ভোলার হারটা কেমন? সহজেই বোঝা যায়, এটা পরীক্ষা করতে হ'লে অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি নেওয়াই সুবিধা। এবিংহজ্ প্রথমে আটটি অর্থহীন বর্ণের তালিকা একটির পর মুখস্থ করলেন। এই আটটি তালিকা প্রথম মুখস্থ করতে কতটা সময় লাগল, সেটা তিনি লিখে রাখলেন। তালিকাগুলি মুখস্থ হওয়া মাত্রই, তিনি তালিকাগুলি সরিয়ে রেখে অন্য কাজে মন দিলেন। ২০ মিনিট পরে তালিকাগুলি আবার মুখস্থ বলতে গিয়ে দেখলেন, তাদের অনেকটা ভুলে গেছেন কিন্তু এবার আবার নূতন করে তালিকাগুলি মুখস্থ

---

২৩ All these experiments generally show fast learners to be better retainers than slow learners. The child who, on the average is a slow learner is handicapped in nearly all kinds of memory activities... When all people are given the same number of learning trials, that is the same amount of of time for memorising the answer is quite clear. Given the same amount of time for learning, the rapid memoriser achieves a higher degree of mastery, that is, he remembers more of the material than does the slow memoriser. This finding rejects the maxim that the higher the degree of initial mastery then, the higher the degree of mastery even after a lapse of time.

M. I. Hunter—Memory, pp 137-139

করতে আগের চেয়ে সময় কম লাগল। ধরা যাক, প্রথম বারে তাঁর তালিকাগুলি মুখস্থ করতে সময় লেগেছিল ১,০০০ সেকেণ্ড। এবার সময় লাগলো ৬০০ সেকেণ্ড। তা হ'লে বোঝা গেল দ্বিতীয় বারে তাঁর শিক্ষার পরিশ্রম বেঁচেছে ৪০০ সেকেণ্ড; তা হলে তাঁর পরিশ্রম বাঁচার অঙ্ক (saving score) হ'ল শতকরা ৪০। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ২০ মিনিট পরে পূর্বশিক্ষার ৬০% তিনি ভুলে গেছেন কিন্তু ৪০% তাঁর মনে থেকে গেছে। আবার অনুরূপ বিভিন্ন আটটি তালিকা তিনি মুখস্থ করে ১ ঘণ্টা, ৯ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা, দুদিন, ছদিন, ও একত্রিশ দিন ফেলে রেখে, তারপর আবার মুখস্থ করতে গিয়ে কতটা পরিশ্রম বাঁচে, তা লক্ষ্য করে হিসাব কষে শতকরা হার পরিমাপ করলেন। নীচে তাঁর পরীক্ষার ফল সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল।

প্রথম শিক্ষার কতক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার শেখা হল	২০ মিনিট	১ ঘণ্টা	৯ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা	দুইদিন	ছয়দিন	একত্রিশ দিন
শতকরা কতটা পরিশ্রম বাঁচলো	৫৮%	৪৪%	৩৬%	৩৪%	২৮%	২৫%	২১%

এবিংহজের এই পরীক্ষায় (১৮৮৫) দেখা যায় শিক্ষার পরে কোন জিনিষ ফেলে রাখলে, গোড়ার দিকে ভোলার হারটা দ্রুততর, কিন্তু ক্রমেই সে হার মন্থর হয়ে আসে। এই ক্রমমন্থর ভোলার হারের লেখ তৈরী করলে দেখা যায়, এটি শুধু অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি শেখা ও ভোলার বেলায়ই সত্য তা নয়, অর্থপূর্ণ গদ্য, কবিতা বা অন্য উপাদানের বেলায়ও সত্য। এবিংহজের পর অন্যান্য পরীক্ষকের পরীক্ষা থেকেও ভোলার হারের বা পরিশ্রম কতটা বাঁচে, তার অঙ্কের যে লেখ, তা মোটামুটি একই রকমের, এটা দেখা যায়। এজন্যে এবিংহজের ভোলার হারের লেখকে এ বিষয়ের আদর্শ, এমন কি, একমাত্র লেখ বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। [২৪]

---

২৪ Since 1885, other investigators have asked this questton about rate of forgetting. They have used a variety of materials, e. g. passages of prose, lists of factual material, geometrical figures, poetry. They have also measured remembering by means of recall scores, recognition scores, as well as savings scores. And they have almost always found that forgetting follows this progressively diminishing trend. So general has been this finding, that the classical curve of Ebbinghans has sometimes been called the curve of forgetting.
Hunter—Memory, p 129.

স্মৃতিতে সংরক্ষণ বিষয়ে পুনঃ অনুশীলনের সুফল বিষয়ে পরীক্ষা— কোন পড়ার বিষয় বারে বারে পড়লে, অথবা যে কাজ শিখতে হবে, তা বারে বারে করলে, তা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, এটা প্রচলিত ধারণা। এবিংহজ্ পরীক্ষা দ্বারা এ ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি তিনটি পৃথক পৃথক দলকে একই বিষয় মুখস্থ করতে দিলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল দশবার পাঠের পর ছেলেরা একবার নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারলো। তাদের প্রথম দল সে বিষয়টি দশবার পড়ার পর যখন দেখা গেল একবার তারা নির্ভুল ভাবে মুখস্থ বলতে পারছে, তখন তাদের নিরস্ত করা হ'ল। দ্বিতীয় দলটিকে দশবার পড়ার পর যখন বিষয়টি সবে আয়ত্ত হয়েছে (just learnt), তার পরেও আরও পাঁচবার তাদের সে বিষয়টি পড়তে দেওয়ার পর, তাদের সেই পাঠে নিরস্ত করা হল। এরা সবে আয়ত্ত করার চেয়েও কিছু বেশী পোক্ত হল (over-learnt)। তৃতীয় দলটিকে দশবার পড়ে সবে মুখস্থ করার পর, আরো দশবার পড়তে বলা হ'ল। তারা আরো বেশী সে বিষয়ে পোক্ত হ'ল। এর প্রমাণ নীচের ফল থেকেই বোঝা যাবে—

	প্রথম দল	দ্বিতীয় দল	তৃতীয় দল
একদিন পর কতটা পরিশ্রম বাঁচলো	২১·৭%	৩৬·২%	৪৭·১%
২৮ দিন পর কতটা পরিশ্রম বাঁচলো	১·৫%	২০·৫%	২৫·১%

কতগুলি বাক্য মুখস্থ করার পর তিনটি দলকে অনুরূপ পরীক্ষা করে দেখা গেল।

একদিন পর কতগুলি শব্দ ঠিক ঠিক বলতে পারলো	৩·১%	২·৬%	৫·৮%
আটাশ দিন পর কতগুলি শব্দ ঠিক ঠিক বলতে পারলো	০·০%	০·৩%	০·৪%

এর থেকে এবিংহজ্ এ সিদ্ধান্তই করলেন যে, কোন বিষয় ভাল করে শিখতে হ'লে কিছু অতিরিক্ত শেখাই ভাল। যত বেশী বার বিষয়টি অনুশীলন করা যায়, ততই তা বেশী গভীর ভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

ক্রুগারের পরীক্ষা— কিন্তু এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা করে ক্রুগার (১৯২৯) এবং অন্যান্য গবেষকেরা এ সিদ্ধান্তের কিছু সংশোধন করলেন।

ক্রুগার পরীক্ষার ফলে দেখলেন অনুশীলন যতই বাড়ানো যায় ঠিক সেই অনুপাতে সেই বিষয়ে নিপুণতা বাড়ে না। যতটা পুনরাবৃত্তির বার বাড়ানো যায়, ততই লাভের অঙ্কটা ক্রমে কমে আসে (diminishing return) এবং একটা স্তরের পরে পুনরাবৃত্তি দ্বারা আর কোন লাভ হয় না। [২৫]

মুখস্থ করা বিষয়ে আরো কিছু পরীক্ষা—একটি কবিতার ১০ লাইন মুখস্থ করতে যদি ১৫ মিনিট সময় লাগে, তবে সেই কবিতার ২০ লাইন মুখস্থ করতে ৩০ মিনিট লাগবে এবং ৩০ লাইন মুখস্থ করতে ৪৫ মিনিট লাগবে? এ বিষয় নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে দেখা যায়, ১০ লাইনের কবিতা মুখস্থ করতে যে সময় লাগে, ২০ লাইনের কবিতা মুখস্থ করতে তার দ্বিগুণের চেয়ে বেশী সময় লাগে এবং যতই শিক্ষিতব্য বিষয়টির আয়তন বড় হবে, ততই আনুপাতিক হিসাবে সময় বেশী লাগবে। পরীক্ষার বাস্তব ফল নীচে দেওয়া হল—

উপাদানের পরিমাণ—	১০০ লাইনের একটি কবিতা বা গদ্য	২০০ লাইনের বিষয়	৫০০ লাইনের	১০০০ লাইন
শিক্ষণের জন্য সময় প্রয়োজন	৯ মিনিট	২৪ মিনিট	৬৫ মিঃ	১৬৫ মিঃ

মুখস্থ করার পক্ষে কোন্ সময় শ্রেষ্ঠ?—সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যায় যে, যখন দেহ ও মস্তিষ্ক শান্ত ও সতেজ থাকে, তখনই কোন জিনিষ ভাল করে শিখবার পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল সময়। এবং যা ভাল করে শেখা যায় তা ভাল মনেও থাকে। এবিংহজ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন, দিনের বেলায় দশটার সময় কোন বিষয় মুখস্থ করতে যতটা সময় লাগে, সন্ধ্যা ৭টার সময় সে বিষয় শিখতে সময় বেশী প্রয়োজন হয় ১২ ./° গুণ। সেই সময় কোন অধীত বিষয় মনে করতে গেলেও দেখা যায়, সকালের দিকের চেয়ে তখন ভুল বেশী হয়।

---

২৫ Thus a student who wants to be sure of remembering a lesson would not stop studying at the moment when he had just mastered it. He would overlearn by countining his study longer. However, he would be unwise to continue over-learning for too long, because, after a time, the additional effort involved would not justify the progressively smaller gains in later remembering.

Hunter—Memory, p 132

স্পিট্জারের পরীক্ষা—এবিংহজ্ স্মৃতি ও বিস্মৃতির যান্ত্রিক এবং সরলতম দিক নিয়েই পরীক্ষা বেশী করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে বিষয় শেখা হ'ল তা যে মনে বেশী দাগ কাটে, এর সমর্থনে এবিংহজের পরীক্ষার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মৃতির অনুরূপ আর এক যান্ত্রিক দিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন স্পিট্জার (১৯৩৯)। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখেছেন যে কিছু দিন অন্তর অন্তর পুনরাবৃত্তি করলে শিক্ষনীয় বিষয় দীর্ঘতর দিন মনের মধ্যে সংরক্ষিত (maintenance) হয়।[২৬] স্পিট্জার কয়েকটি ছেলেকে বাঁশ গাছ সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ পড়তে দিলেন। তার পর প্রত্যেকটি ছেলেকে বাঁশ গাছ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে, তার উত্তর অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হোল। এবার ছেলেদের তিনটি দলে ভাগ করা হোল। তাদের যে আর পরীক্ষা দিতে হবে তা তাদের বলা হ'ল না। কেউ পরীক্ষা দিল একদিন পরে, কেউ সাতদিন পরে, কেউ চৌদ্দ দিন পরে, কেউ একুশদিন পরে এবং কেউ তেষট্টি দিন পরে। এতে তিনি দেখতে পেলেন যে যারা অল্পদিন পরে পরীক্ষা দিল, তারা বেশী ভাল মনে রাখতে পেরেছে।

মেরী এ্যালেনের পরীক্ষা—(১৯৬০) মনে রাখার ব্যাপারে অর্থবোধের গুরুত্ব যথেষ্ট। এবিংহজ্ স্মৃতির এই দিকটার দিকে খুব মনোযোগ দেন নি। পরবর্তীকালে বহু মনোবিদ্ই পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশ যেখানে কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যুক্ত, যেখানে সমগ্রের একটি ঐক্য অংশগুলিকে সূত্রদ্বারা বন্ধন কচ্ছে, যেখানে শিক্ষনীয় উপাদান অর্থপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধে বিধৃত, সেখানে মনে রাখা সহজ হয়। যেখানে শিক্ষিতব্য বিষয় বিচ্ছিন্ন অথবা সম্বন্ধশূন্য ও অর্থহীন, সেখানেও মন সম্বন্ধ খুঁজতে চেষ্টা করে। মনের এই প্রবণতার দিকে গেষ্টল্ট মনোবিদেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মেরী এ্যালেনের পরীক্ষায়ও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে একটা বিষয়ের বিভিন্ন অংশকে কোন অর্থপূর্ণ সম্বন্ধে যুক্ত করতে পারলেই শেখাটা এবং মনে রাখাটা সহজ হয়। এটাও দেখা যায় একটা মোটামুটি লম্বা বিষয়কে টুকরো টুকরো করে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে, সবটা শিখতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে সবটা বারে বারে পড়ে আয়ত্ত করতে কম সময় লাগে।[২৭]

---

২৬ Hunter—Memory, P. 106-107.
২৭ Hunter—Memory, P. 114-116

কেটোনার পরীক্ষা (১৯৪০)—ও একথা প্রমাণিত করে যে, যেখানে ছাত্র শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপাদানের মধ্যে কোন যুক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তি আবিষ্কার করতে পারে সেখানে তা দৃঢ়ভাবে স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন কতগুলি অর্থহীন বিষয় মুখস্থে আগ্রহের সৃষ্টি হয় না, এবং এমন মুখস্থের কাজ ক্লান্তিকর। কিন্তু যেখানে যুক্তিগত সম্বন্ধ থাকে, অথবা যেখানে মন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলির পশ্চাতে কোন নীতি বা মূল সূত্র আবিষ্কার করতে পারে, সেখানে শেখা যেমন ত্বরান্বিত হয়, তেমনি তা স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়।[২৮] একটি পরীক্ষা উল্লেখ করা যাচ্ছে। নীচের দুই সারি অঙ্ক দুই দল ছেলেকে মুখস্থ করতে দেওয়া হ'ল

2 9 3 3 3 6 4 0 4 3 4 7

5 8 1 2 1 5 1 9 2 2 2 6

প্রথম দলকে তিন মিনিট সময় দেওয়া হ'ল তিনটি তিনটি সংখ্যা একসঙ্গে নিয়ে মুখস্থ করবার। দ্বিতীয় দলকেও তিন মিনিট সময় দেওয়া হ'ল; কিন্তু তাদের সংখ্যাগুলির বিন্যাসের পিছনে মূল সূত্র খুঁজে বের করে মুখস্থ করতে বলা হ'ল। প্রথম দলটি বারে বারে পড়ে' সংখ্যার লাইন দুটি মুখস্থ করল। দ্বিতীয় দলটি আবিষ্কার করল যে, নীচের লাইনে ৫ থেকে সুরু করে পরের সংখ্যা ৮এ যেতে ৩ যোগ করতে হয়। আবার ৮এর পরের সংখ্যা ১২ পাওয়া যায় ৪ যোগ করলে; এর পরের সংখ্যা ১৫ পাওয়া যায় ৩ যোগ করে, আবার এর পরের সংখ্যা ১৯ পাওয়া যায় ৪ যোগ করে। এ ভাবে প্রথম ৩ এবং তার পর ৪ যোগ করে করে, নীচের সারি শেষ করে উপরের সারিতে গেলেই, যে ভাবে দুসারি সংখ্যা সাজানো হয়েছে তা পাওয়া যায়। এই মূল সূত্র আবিষ্কার করার ফলে দ্বিতীয় দলের মধ্যে দুইসারি সংখ্যা দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে গেল। তিন সপ্তাহ পরে দল দুটিকেই আবার সংখ্যা গুলিকে স্মৃতির থেকে সাজাতে বলা হয়। তাতে দেখা গেল যে প্রথম দল যারা অন্ধভাবে বারে বারে মুখস্থ করেছে, তাদের একজনও সংখ্যাগুলি মনে করে ঠিকভাবে লিখতে পারলো না; কিন্তু দ্বিতীয় দলের শতকরা ২৩ জন ঠিক ঠিক সংখ্যাগুলি সাজাতে সমর্থ হল।[২৯]

---

২৮ Katona—Organising and Memorizing·

২৯ Hunter—Memory, P. 98-99.

বার্টলেটের পরীক্ষা—এবিংহজের পরীক্ষা যেমন ছিল অর্থহীন শিক্ষিতব্য বিষয় নিয়ে, বার্টলেটের পরীক্ষা তেমন ছিল অর্থপূর্ণ উপাদান নিয়ে। মানুষের জীবনে অধিকাংশ শিক্ষিতব্য বিষয়ই অর্থপূর্ণ। বার্টলেট্ তাঁর নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, মনে রাখাটা যেমন একটা যান্ত্রিক পুনঃপৌনিক অনুশীলনের ফল নয়, ভুলে যাওয়াটাই তেমনি যান্ত্রিক ও সম্পূর্ণ নেতিবাচক অবলোপ নয়। যখন ভুলে যাই, তখন যা শিখেছি তার দাগগুলি মন থেকে শুধু মুছেই যায় না। তার মধ্যে অনেক সংযোগ বিয়োগ ঘটে। একটা ছবি দেখলাম।

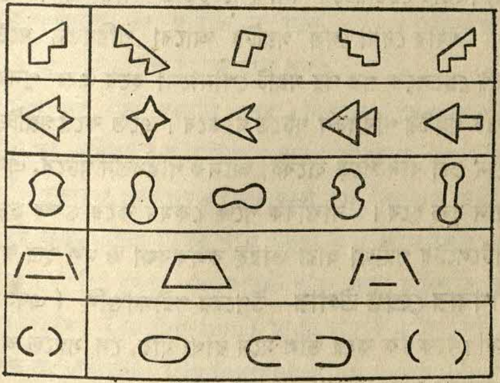

প্রথমে দেখা ছবির সার। পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আঁকা ছবির সার—Woodworth & Marquis. P. 567. Fig. 137 অনুসরণে

তার কিছুদিন পরে যদি ছবিটি আবার আঁকতে বলা হয়, তবে দেখা যাবে, তার প্রধান লক্ষ্যনীয় চিহ্ন বা রূপরেখাটা (outline) মনে থাকলেও, সেই মূল ছবির অনেক পরিবর্তন হয়।[৩০] এ পরিবর্তনটা এক এক ব্যক্তিতে এক এক রকম। এ পরিবর্তনটা নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহ, শিক্ষা, রুচি, আবেগ ও ব্যক্তিত্বের উপরে। বার্টলেট দেখলেন গল্পের বেলাও তেমনি। প্রথম গল্পটি যখন শোনা হ'ল বা পড়া হ'ল তার অল্পদিন পর পরই যদি আবার গল্পটি শোনা যায় বা পড়া যায় তা হলে গল্পটি আবার বলতে বা লিখতে বললে পরিবর্তনটা সামান্যই

৩০ Bartlett—Remembering, P. 178.

হয়। প্রথম পড়া বা শোনা এবং আবার তা বলা বা লেখার মধ্যের সময়টা বাড়ে যত, ততই মূল গল্পের থেকে পুনরাবৃত্ত গল্পের প্রভেদটা বেশী হয়। ব্যক্তির মনোযোগ, মধ্যবর্তীকালের অভিজ্ঞতার ভিড়, তার আগ্রহ, মনের গড়ন ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরই এ পরিবর্তন নির্ভর করে।[৩১]

বার্টলেট আর এক রকমের পরীক্ষা করলেন। তিনি একটা গল্প একটি ছেলেকে বললেন। এর কিছুদিন বাদে তিনি ছেলেটিকে বললেন গল্পটি অন্য আর একটি ছেলেকে বলতে। তখনই দেখা গেল গল্পের মূল কাঠামো ঠিক থাকলেও, তার খুটিনাটি উপাদানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবার এর কিছুদিন পরে, দ্বিতীয় ছেলেটিকে বলা হল, তৃতীয় আর একটি ছেলের কাছে গল্পটি বলতে। এবার দেখা গেল গল্পটির আরো পরিবর্তন ঘটেছে। এমনি করে যতই বেশী ছেলেকে পর পর গল্পটি শোনানো হবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে বলা হবে, ততই গল্পটির পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। এতে করে গল্পটির অনেক ছোট খাটো উপাদান তো বাদ পড়ে যাবেই, অনেক পরিবর্তন ঘটবে, এমন কি, অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হবে। বাস্তবিক পক্ষে কেমন করে গুজব ছড়ায়, এবং সত্য বিকৃত হয় বার্টলেটের পরীক্ষা দ্বারা তারই কলকবজা ও মূল সূত্র জানা গেল।[৩২]

মনে রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়—উপরের পরীক্ষাগুলি (এবং অনুরূপ আরো অনেক পরীক্ষা থেকে কি করে ভাল মনে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা মূল্যবান্ ক'টি সিদ্ধান্ত করতে পারি।

(১) বারে বারে অনুশীলন স্মৃতির সহায়ক।

(২) প্রথমবার শেখার সময়ই শুধু বারে বারে অনুশীলন নয়—কিছুদিন পর পরই পুনরাবৃত্তি বা পুনরনুশীলন প্রয়োজন।

(২) মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়লে বা শিখলে বেশী ভাল শেখা হয়, বেশী ভাল মনে থাকে। কিন্তু বিরতির কাল দীর্ঘ হলে, বিস্মৃতির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৩) কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, শিক্ষিতব্য বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি। যা মনোরম, যা চমকপ্রদ, যা নাটকীয় তা বেশীদিন মনে থাকে।

(৪) আগ্রহ সৃষ্টির পথে পুরস্কার ও প্রশংসা সহায়ক।

(৫) আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে সহজেই মনোযোগ আসে। মনোযোগ

৩১ Woodworth--Psycholcgy, (18th ed) P. 359.

৩২ Hunter—Memory, P. 144-152.

থাকলে যা শেখা যায় তা মনে গেঁথে যায় তা তাই মনেও থাকে বেশী দিন। তাই যা পরিচিত ও সহজ তার সাহায্যেই প্রথমে শিশুকে শেখানো শুরু করতে হবে। রস পেলে তবেই মনে থাকবে। যা অবান্তর বা কম প্রয়োজনীয়—শিশুকে প্রথম শেখাবার সময় তা বাদ দেওয়া সঙ্গত। স্মৃতিশক্তি অনাবশ্যককে ধরে রাখতে চায় না।

(৬) যা যুক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত তা মনকে সহজে আকর্ষণ করে—তাতে মনের পরিশ্রম লাঘব হয়। না বুঝে বারে বারে পড়া বা করার চেয়ে, সমগ্রের সঙ্গে অংশগুলির যুক্তিগত যোগ বুঝতে পারা, শিক্ষার পথে অনেক সুফলপ্রদ উপায়। এতে গোড়াতে পরিশ্রম বেশী হলেও,—অর্থবুঝে, যুক্তিগত সম্বন্ধ ও মূলনীতি আবিষ্কার করে শিখলে, তা স্থায়ীভাবে মনে থাকে। সমগ্রভাবে বিষয়টি বুঝতে পারলে, তার অংশগুলিও সহজে মনে থাকে।

(৭) যা শেখা হল, তা অন্যান্য শেখা বিষয়ের সঙ্গে যত বেশী যুক্ত করে শেখা যায়. ততই তা অধিকতর জীবন্ত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রধান আগ্রহের সঙ্গে এবং সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা যত সুদৃঢ়বন্ধনে যুক্ত, তা তত বেশী মনে থাকে।

(৮) দেহের সুস্থতা এবং মনের শান্ত অবস্থা এবং প্রক্ষোভের সংযমন, শিক্ষা ও স্মৃতির সহায়ক। ওষুধ খেয়ে এবং মাদুলী ধারণ করে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় না। তবে অভিভাবণ (suggestion) দ্বারা অনেক সময় কিছু ফল হয়।[৩৩]

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি (Photographic memory)—কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা আমরা শুনি, যে তারা একবার

---

৩৩ (1) Motivation—Secure and maintain interest in learning by providing appropriate incentives. Utilize existing interest by integrating the task into activities which are already interesting.

(2) Material—Present material in ways which emphasize whatever characteristics are to be memorized and do so in a form which is as familiar as possible to the learner. As far as possible, enable the learner to gain an overview of the whole before proceeding to the parts. Items to be remembered together and in sequence should be presented together, and in that sequence.

(3) Repetition—Encourage active use of the material. Distribute practice, making memory drills short and stopping at the first sign of fatigue.

(4) Maintenanc—After learning ensure adequate over learning, directly by reviewing frequently at first, and, later, progressively at longer intervals ; indirectly, by integrating what his been learned into further activities, encourage understanding of what has been learned by securing its use in relation to other relevant learning.

Hunter—Memory. P. 141-42.

মনোযোগ দিয়ে যা দেখে তা-ই হুবহু ফটোগ্রাফের ছবির মত তাদের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। কিছুদিন পর সে স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে বললে তারা সমস্ত খুটিনাটি সহ ছবিটি আবার মনের সামনে নিয়ে আসতে পারে। এ প্রকার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিকে ফোটোগ্রাফিক্ মেমারী বলা হয়। সাধারণতঃ অতীত কোন অভিজ্ঞতাকে যখন আবার আমরা স্মরণ করি তখন তার ছোটখাটো খুটিনাটি অনেক উপাদান আমরা স্মরণ করতে পারি না। তাই এ জাতীয় অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে আমরা ঈর্ষা করি।

এজাতীয় জীবন্ত স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জার্মান মনোবিদ্ জ্যাইনস্ (Jaensch)। তিনি দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিশুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ ছয় জনের জীবন্ত স্মৃতিশক্তি থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ ক্ষমতা বিরল ; শতকরা একজনের বেশী ব্যক্তির এ ক্ষমতা থাকে না। এ প্রকার স্মৃতিকে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা নাম দিয়েছেন **'আইডেটিক ইমেজ (Eidetic image)**। এই ক্ষমতা যে সব ছেলে মেয়ের আছে তারা কোন দ্রব্য বা ঘটনা দেখার কিছুদিন পরেও সেই দ্রব্য বা ঘটনার জীবন্ত ছবি মনে আনতে পারে। যদি তাদের সামনে একটি ধূসর রংয়ের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা সেই পর্দাতেই 'বাইরে' (out there) সেই দ্রব্য বা ছবিটি রং-রেখাসহ স্পষ্ট দেখতে পায়। এমন কি, সেই ছবি জীবন্ত দ্রব্যের মত নড়ে চড়ে। অবশ্য এই প্রকার ছবি (image)-কে ঠিক ফটোগ্রাফ বলা যায় না। কারণ এতে মূল দ্রব্যের হুবহু প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। শিশুর কল্পনার রং দ্বারা তা রঞ্জিত হয়, তার পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এ সব আইডেটিক্ রূপকল্পে (image) মূল উপাদানের খুটিনাটি বিষয় প্রায় নির্ভুল ভাবেই প্রতিফলিত হয়। এ বিষয়ে অল্‌পোর্টের একটি পরীক্ষা বিস্ময়কর। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০টি এগারো বছরের ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি ছেলেদের সামনে একটি দুই বর্গফুট কালো পর্দার উপর কতগুলি ছবি একটার পর একটা (প্রত্যেকটি ছবি ৩৫ সেকেণ্ডের জন্য) রেখে তাদের লক্ষ্য করতে বললেন। সব কটি ছবিই আগ্রহ—আকর্ষক, ঘটনাবহুল এবং বহু খুটিনাটি বিষয় তাতে আঁকা আছে। ছবির মূল বস্তুগুলি বা ঘটনাগুলি সিলুয়েটে আঁকা, পশ্চাৎপটে দ্রব্যাদি হালকা রং-এ রঞ্জিত। এর মধ্যে একটি ছবি ছিল

জার্মানীর একটা সহরে একটা সরাইখানার সামনের রাস্তার। তাতে অল্প জায়গার মধ্যেই অনেকগুলি ঘটনা ও খুটিনাটি অনেক জিনিষের ছবি সিলুয়েটে

আইডেটিক্ ইমেজ্ সম্পর্কে পরীক্ষা
Dr. Allport. Eidetic imagery অনুসরণে

আঁকা ছিল। এ ছবিটা ৩৫ সেকেণ্ড ছেলেদের সামনে পর্দায় টানিয়ে তাদের লক্ষ্য করে দেখতে বলা হোল। তারপর ছবিটা সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেই কালো পর্দাটার দিকে তাকিয়ে ছবিটার সব খুটিনাটি সম্বন্ধে ছেলেদের উত্তর দিতে বলা হ'ল। অলপোর্ট দেখে বিস্মিত হলেন যে, ৩০টি ছেলে সেই পর্দার উপরই যেন ছবিটাকে আবার দেখতে পাচ্ছে এবং তা দেখেই যেন প্রশ্নের জবার ঠিক ঠিক দিতে পাচ্ছে। এমন কি, প্রথম কিছু ভুল করলেও পরে আবার কালোপর্দার দিকে তাকিয়ে ছবিটা দেখে তারা নিজেদের ভুল সংশোধন করলো। এই ছবিতে সরাই খানার উপরে সাইন বোর্ডে জার্মান ভাষায় লেখা ছিল Gartenwirthschaft. ছেলেরা কেউই জার্মানভাষা জানতো না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ত্রিশটি ছেলের প্রত্যেকেই অপরিচিত এই নামটি ঠিক ঠিক বলতে পারলো। কোন কোন ছেলে উল্টা দিক থেকেও অক্ষরগুলি ঠিক ঠিক সাজাতে পারলো। কেউই দুটা অক্ষরের বেশী ভুল করলো না এবং যারাও ভুল করেছিলো, তারাও আবার কালো পর্দার দিকে তাকিয়ে সেখানেই যেন লেখাটা দেখে, নিজেদের সংশোধন করতে সমর্থ হোল।[৩৪] চোখে দেখে ছবি থেকে হুবহু তার স্মৃতির জীবন্ত পুনরুদ্ধারের মত কানে শুনেও অপরিচিত

[৩৪] Gordon Allport—Eidetic imagery. Brit. J. Psychol 1924, 15, P. 99-120.

ভাষার দীর্ঘ বাক্য, গানের সুর অর্থ না বুঝেও ঠিক ঠিক স্মৃতিপথে আনবার ক্ষমতার উদাহরণের কথাও জানা গেছে। ৩৫

এ শক্তি অবশ্যই বিস্ময়কর কিন্তু স্মৃতিতে মূল অভিজ্ঞতার হুবহু পুনরুদ্ধার (যাকে বলা হয়েছে ফোটোগ্রাফিক্ মেমারী) এ প্রায় কখনোই ঘটে না। মন কখনো যান্ত্রিক ভাবে অভিজ্ঞতার ছবি তুলে না এবং স্মৃতিতে মূল অভিজ্ঞতার ছবি কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই। বার্টলেট্ তাঁর পরীক্ষায় এটা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছেন। ক্লভারও পরীক্ষা করে দেখেছেন পরীক্ষকের অভিভাবনের (suggestion) ফলেও রূপ কল্পের পরিবর্তন ঘটে। ৩৬

Synaesthesia—রাশিয়ান্ মনোবিদ্ লুরিয়া (Luria) একটি অত্যদ্ভুত অসাধারণ স্মৃতি শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি শেরেসেভ্স্কির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ কাহিনী বর্ণনা করার আগে 'সাইনেস্‌থেসিয়া' নামে এক বিশেষ প্রকার সংবেদনের কথা বোঝা দরকার। 'সাইনেস্‌থেসিয়া' কথার মূলগত অর্থ এক সঙ্গে অনুভূতি 'অথবা' সংযুক্ত সংবেদন। অর্থাৎ কোন কোন মানুষের এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যখন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁরা কোন সংবেদ লাভ করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে, অন্য এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সংবেদ সাধারণতঃ পাওয়া যায় তা পূর্ব সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যেমন, এমন ব্যক্তি যখন গান শোনে তখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে রংয়ের অনুভূতি অর্থাৎ এমন

---

৩৫ Acoustic as well visual eidetic images are sometimes reported. A child with acoustic eidetic imagery will repeat long lists of digits after hearing them once. As described to me by a colleague, one eidetic child looked at the desk while a list of a dozen or so digit was being read to him, then "read" them off forwards and backwards while still looking at desk.

Munn, Psychology P. 69.

৩৬ Does there then, exist anything to correspond with the popular notion of 'photographic memory'? From what has been said, the answer is clearly in the negative. Remarkable though eidetic imaging may be, it in no way suggests the static, duplicative characteristics of a photograph. It resembles any other instance of recalling in being a constructive process and it manifests the same forms of distortion which are typical of such constructing .... But the fact that it is a reconstruction, rather than a literal reproducing points to a principle which seems to have universal application (a principle which is eloquently elaborated by Sir Frederic Bartlett in his book Remembering).

Hunter—Memory. P. 202

ব্যক্তি রঙীনগান শোনে। ৩৭ এমন মানুষেরা ভবিষ্যতে যখন অতীতে শোনা কোন গান স্মরণ করতে চায়, তখন তা করে কোন বিশেষ রং-এর কল্পের সাহায্যে। শেরেসেভ্স্কির এ প্রকারের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁকে যদি ১০, ১৫ এমন কি তারও বেশী, অর্থহীন শব্দ বা রাশি বা দুর্বোধ্য অঙ্কের ফর্মূলা দেওয়া হোত, তা হলে তিনি নিজের স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সেগুলিকে ভেঙে কয়েকটি লাইনে নীচে নীচে এবং পাশাপাশি সাজিয়ে নিতেন এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট পারম্পর্য ঠিক করে নিতেন। তারপর তিনি কল্পনা করতেন, যেন তিনি পুস্কিন্ স্কোয়ার থেকে গোর্কি ষ্ট্রীট ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। যে উপাদান গুলি মুখস্থ করতে হবে, তিনি সেগুলিকে সেই রাস্তার দুধারের দ্রব্য হিসাবে নির্দিষ্ট ক্রম-অনুযায়ী সাজিয়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন। এমন অদ্ভুত ছিল তাঁর ধৃতিশক্তি যে, একবার যা মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন, তা অনেক বছর পরেও তিনি ঠিক ঠিক সেই পূর্ব নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আবার মনের সামনে আনতে পারতেন। অঙ্ক, অর্থহীন শব্দ, অপরিচিত ভাষায় কথিত বাক্য সব গুলিকেই তিনি কতগুলি পরিচিত দ্রব্যের ছবির সঙ্গে যুক্ত করে চোখের সামনে দেখতে পেতেন এবং মনে করবার সময় তিনি তাঁর কাল্পনিক পথ ভ্রমণের রূপকল্প মনের সামনে এনে ঠিক ঠিক বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। ৩৮

---

৩৭ Synaesthesiel ; phenomena in which sensations in one sense department carry with them, as it were, sensory impressions belonging to another sense department, as in coloured hearing

Drever. A Dictionary of Psychology.

৩৮ Such memory abilities were remarkable enough. But his ways of dealing with the material were more remarkable still. He dealt with the material in terms of vivid imaging. When a digit sequence was dictated to him, he would visualize digits written down on a blackboard or on paper, mostly in his own legible handwriting ; those imaged digits were usually arranged in tabular way, in short lines of five or six figures. When a word sequence was given, he would visually image corresponding shapes and arrange them in a long row, so as not to disturbs their sequence. He usually did this by taking an imaginary walk, starting from Pushkin quare and going down Gorky Street. As he went along, he placed the corresponding shapes at points along the route. To recall the sequence, he repeated his imaginary walk and read off the patterns he had positioned along the way. In short, he would often translate the material, item by item, into imaged patterns and fix its sequence of these patterns by locating them against the unfolding background of an imaginary imaged route.

Hunter—Memory. p. 207.

এটা সহজেই বোঝা যায়, এই সংবেদ-সংযুক্তি (Synaesthesia) মনে রাখার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু এই শক্তি তো আয়ত্ত করা যায় না। তা ছাড়া, এই জন্মগত শক্তির রহস্য কি তা ত আমরা জানিনা। অন্য একটি কথাও বিবেচ্য। শেরেসেভ্স্কির বেলায় এটা দেখা গেছে যে, কখনো কখনো এতে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাও আছে। শেরেসেভ্স্কির কাছে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর বা সুরের ছবি ভিন্ন ভিন্ন। তাই একই উপাদান বিভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে, ভিন্ন ভিন্ন ছবি শেরেসেভ্স্কির মনে উদিত হত, এবং তা ঠিক একই রূপে তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারতেন না। আবার দেখা যেত, যখন মূল উপাদানটি তার কাছে উপস্থিত করা হ'ত, তখন হাঁচি বা কাসির শব্দে 'ছবিটা' ঝাপসা হয়ে যেতো। ৩৯

আমাদের দেশে সোমেশ বসুরও এ-রকম অদ্ভুত ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। যাদুকর পি সি সরকারও এ রকম স্মৃতিশক্তির খেলা দেখিয়ে থাকেন। অনেক সময় বলা হয়, যোগাভ্যাস এই অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির কারণ। যদিও এ জাতীয় অদ্ভুত শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে আমরা অসমর্থ, তথাপি মনোবিদ্ স্মৃতি-শক্তির এই সাধারণ সূত্রেরই এ সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখতে পান যে, যতই কোন অভিজ্ঞতা অন্যান্য আরো অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তিগত নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত হয়, ততই তা গভীর ভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যায়, এবং তাদের স্মৃতিতে পুনরুদ্ধার সহজ হয়।

---

৩৯ However—Synesthesia, having thus helped an accurate reproduction, could in certain circumstances hinder it. If during the reading of a series of words or figures, somebody began to caugh, spots appeard in the inner 'visual field' of Shereshevskii which could shade the shapes and disturb their readability.

তিনি মানুষের মুখ ভাল মনে রাখতে পারতেন না—কারণ তাঁর মতে একই মুখ বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় এত পরিবর্তন হয় যে, কোন একটি চিহ্ন দিয়ে তাকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখা যায় না। একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ীর যাতায়াত ও তাদের গন্তব্য ইত্যাদিও তিনি ভাল মনে রাখতে পারতেন না। তিনি লিখেছেন "I remember them badly ; I am accustomed to remembering everything as they actually are, but in a modified form. I don't mean that the lines don't resound or sing for me—it is just that as soon as I have turned away their voice is different.

A. R. Luria—Problems of Psychology—No. 1, Pergamon Press 1960.

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE.
CALCUTTA-27

ষোড়শ অধ্যায়

কল্পনা

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্ মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে   বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে।
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়   যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাঁধত আঁচল সহকারের ডালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"[১]

* * * *

"গতকাল গৃহিণীর কাছে একটা বিশেষ রকমের খাবার প্রস্তুত করবার প্রস্তাব পেশ করলে গৃহিণী বিরূপ ও বিমর্ষ হয়ে বললেন, বেশ যখন বলছ খাবার তখন নিশ্চয় তৈরী করে দেব, কিন্তু এই সর্তে যে তুমি আমাকে তা খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারবে না। এরূপ অদ্ভূত সর্তের উল্লেখ বলে তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে প্রশ্ন করলে, গৃহিণী তার জবাবে আপনাদের কোয়ার্টারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই যে ওখানে কয়েকটি ভদ্রসন্তান বাস করে ওরা কি খায় তার খোঁজ রাখ? এমন কোন অপরাধ যদি তারা করেই থাকে —যার জন্য এই দণ্ড তাদের প্রাপ্য, তথাপি সে অপরাধ তারা নিজেদের লাভ ও লোভের জন্য করে নাই, করেছে—তোমার আমার জন্য, দেশ ও দশের জন্য, অথচ সেই অপরাধের শাস্তি-স্বরূপ তারা জেল খাটবে কারাকষ্ট ভোগ করবে, অখাদ্য ও কুখাদ্য খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করবে, আর আমরা ঠাঁয় তাদের দৃষ্টির সম্মুখে বসে চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে উদরপূর্তি ও রসনা-তৃপ্তি করব, এত বড় অনাচার কখনো ধর্মে সইবে না। তোমার প্রাণ চায় তুমি

১ রবীন্দ্রনাথ—ক্ষণিকা (সেকালে)

স্বচ্ছন্দে তা খেতে পার; কিন্তু ওদেরকে অভুক্ত রেখে সুখাদ্য আমার মুখে কিছুতেই উঠবে না, আমি ওদেরকে খাওয়াতে না পারি, আমার নিজের আহারের আয়োজন কমাবার অধিকার তো আমার আপন হাতে।"[২]

মনের ছবি আঁকবার ও ছবি ধরে রাখবার দুটি উদাহরণ। প্রথমটিতে কবি-মন খেয়াল খুসী মত ছবির পর ছবি আঁকছে,—একে বলি ইম্যাজিনেশান্। আর দ্বিতীয়টী অতীত ঘটনা যেমন যেমনটি ঘটেছিল, মনের মধ্যে ঠিক তেমনই ছবি ফুটিয়ে তোলা; একে বলা হয় ইমেজারি (Imagery)। একটিতে কবি নিজেকে হারিয়েছেন এক মাধুর্যময় অবাস্তব কল্পলোকে, আর একটিতে বাংলার একজন পুরাতন বিপ্লবী বর্ণনা করেছেন অতীত রাজনৈতিক অন্তরীণের বাস্তব আত্মকাহিনী। দ্বিতীয়টির আর একটি সহজ পরিচিত নাম আছে, তা হল স্মৃতি বা Memory।

কিন্তু দুটি অভিজ্ঞতাই ছবিকে অবলম্বন করে। তাই ব্যাপক অর্থে দুটিই ইম্যাজিনেশন্। ব্যাপক অর্থে—স্মৃতি ও কল্পনা উভয়েই কল্পনা ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, বাস্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই ইম্যাজিনেশান্ কথাটা ব্যবহৃত হতে পারে, তবে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থেই কথাটা প্রচলিত।[৩]

অবশ্য যদিও একথা বলি যে-সংকীর্ণ অর্থে কল্পনার বেলায় মন ছবি আঁকে এবং নূতন কিছু সৃষ্টি করে, তথাপি সে ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই নূতন অভিজ্ঞতা আসর জমিয়েছে। যার কোন অংশই কুত্রাপি আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তু হয় নি, বা হতে পারে না, তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা যখন করা হয় তখন তার পেছনে আছে পক্ষী ও ঘোড়ার

---

২ জগদানন্দ বাজপেয়ী—চলার পথে—৯০ পৃঃ

৩ "The word imagination is used technically, in two ways There is a wider and a narrower connotation of the term. In its wider meaning imagination includes all imaging and thinking in images. It therefore is equivalent to imagination in its narrowest sense, plus imagery. Imagination in the narrower sense is restricted to those cases where imagery are recombined to form new wholes. We are said to imagine the things we have never actually experienced. Imagery (or memory) refers to those cases where pictures of specific parts of one's past experience are recalled; we can image i. e. form mental images only of the things we have actually experienced." Sandiford—The Mental and Physical Life of School Children, P, 250.

বাস্তব অভিজ্ঞতা। কল্পনায় এই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণকে একত্র করা হয়েছে মাত্র। মন এখানে তার অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাদের বিভিন্নভাবে সাজায় বা বিচ্ছিন্ন করে, বাড়ায়, কমায়। নিজের প্রয়োজন মত অতীত অভিজ্ঞতার মাল-মশ্‌লাগুলি সাজায় গুছায়; উড্‌ওয়ার্থ তাই বলছেন, "কল্পনা হচ্ছে মনের সংগৃহীত উপাদানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া। যখন কোন ব্যক্তি তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলিকে আবার মনের সামনে আনে আর তাদের নতুন করে সাজিয়ে নতুন ছবি তৈরী করে, তখন সে ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে আমরা বলি কল্পনা। কল্পনার বস্তুর বিভিন্ন অংশ পূর্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল। এখন তাদের আবার মনের সামনে এনে ভিন্নভাবে সাজানো হোল, যেমন সেণ্টরের (Centaur) কল্পনা হোল, ঘোড়া আর মানুষের ছবির মিশ্রণ, মৎস্যকন্যা হোল মীন ও মানবীর ছবির মিশ্রণ। [৪]

আমাদের অভিজ্ঞতার দুইটি প্রধান পথ। একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথ। চোখে দেখছি, গাছের ভেজা পাতাগুলি থেকে জল ঝরছে, বিপন্ন কাকগুলি কা কা রবে ডাকছে, শুনছি। যে কলম দিয়ে লিখছি, তার স্পর্শ কঠিন লাগছে, এগুলি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Perception)। যে ঘটনা সদ্য সদ্য বর্তমান কালে ঘটছে, যে বস্তুগুলি অত্যন্ত দূর দেশে নয়, তাদেরই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু যা অতীত, যা ভবিষ্যৎ, যা দূরবর্তী তাতো আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সুতরাং তারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে না। তা হলে যা দূর দেশে বা দূর কালে ঘটে, তাদের আমরা কি উপায়ে জানি ? তাদের জানতে হলে ছবির (images) সাহায্য চাই। বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্তু অতীতের 'ছবি' মনে আবার ফোটাতে পারি, ভবিষ্যতের 'ছবি' কল্পনার রংএ আঁকতে পারি। এই 'ছবি' দিয়েই জানি দূর দেশকেও। পড়ি রাশিয়ার কথা, আমেরিকার কথা, বিলাতের কথা—তাদের 'ছবি' মনের চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে। কাজেই মানুষ দেশ ও কালের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে, এই ছবি বা image-এর সাহায্যেই। মানুষের উচ্চতর বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তাও এই ছবিকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়। অধিকাংশ প্রাচীন মনোবিদের মতে ছবিহীন চিন্তা (Imageless thought) একটা অসম্ভব কথা। এই 'ছবির' সাহায্যে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, তাকেই বলি ইম্যাজিনেশ্যন।

৪ Woodworth—Psychology, P. 552.

আমরা এতক্ষণ বারে বারে বলেছি 'ছবি দেখা', 'ছবি আঁকা'। তাহলে ইম্যাজিনেশন্ কি সব সময়েই চিত্রধর্মী এবং দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর (pictorial and visual)? তা নয়; শব্দ, স্পর্শ, স্বাদ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রতিরূপ বা ইমেজ থাকতে পারে। অতীতের শোনা একটি গান যখন স্মরণ করি, তা 'ছবি' নয়। বলা যেতে পারে তা মনের মধ্যে অতীতের সুরের প্রতিধ্বনি। যখন অতীত কোন সুখকর স্পর্শ স্মরণ করি তখন তাকেও 'ছবি' বলা যায় না। কি নাম দেব সেই ইমেজ্-এর? প্রতিস্পর্শ? কল্পনা করতে পারি, একটি স্বপ্ন-পুরীর উদ্যান, তাতে ফুটে আছে বহু সুগন্ধ ফুল, ফলে আছে নানা বিচিত্র ফল। সেই ফুলগুলির গন্ধ, সেই ফলগুলির আস্বাদ কল্পনা করে, ক্ষণিকের জন্যে তৃপ্তিলাভ করতে পারি। কাজেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে এক এক জাতীয় কল্প বা ইমেজ্ হতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক মনোবিদ্ বলবেন আমাদের অনুভূতি ও আবেগেরও ইমেজ আছে। বহুদিন পূর্বের ভীতিপ্রদ ঘটনা স্মরণ করে সেই ভয়ের প্রতিধ্বনি মনে জাগতে পারে। কাজেই যে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যখন বাইরের কোন উত্তেজকের (stimulus) সাহায্য ব্যতিরেকে "মন হতে" সৃষ্ট হয়, তখন তাকেই কল্প (image) বলা যায়। "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে সব মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়, যদি সেগুলিকে মন আবার নিজের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারে, বাহ্য কোন উত্তেজকের তাড়না ব্যতিরেকেই, তখন আমরা পাই কল্প বা ইমেজ! এতে যেন আমরা মনে না করি যে কল্প হুবহু প্রত্যক্ষ বস্তুরই মতন। অনেক বিষয়ে বরং বলা যেতে পারে, যে কল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ বস্তুর অবাস্তব ছায়া।"[৫] প্রত্যেক সংবেদন (sensation) প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আবেগ বা অনুভূতির প্রতিরূপ বা কল্প থাকতে পারে। বিভিন্ন মুখ বা ঘটনার যেমন কল্প আছে তেমনি অবসাদ, ভয়, একাকীত্ববোধ, স্বস্তি লাগার কল্প বা ইমেজ থাকতে পারে।[৬] অবশ্য আমাদের জীবনে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, তাই কল্পের অধিকাংশই চিত্রধর্মী। তাই অনেক সময়ই 'কল্প বা ইমেজ' বলতে আমরা ছবিই বুঝি।

স্মৃতি ও কল্পনা—Memory and Imagination.—বিম্ব বা কল্পের সাহায্যে যে জ্ঞান, তাকে ইম্যাজিনেশন্ বলা হয়। এই ইম্যাজিনেশন্ কথাটি

৫ Sandiford. The Mental and Physical Life of School Children P. 250

৬ Thorndike. Elements of Psychology P. 143

এইখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাপক অর্থে বিম্ব-নির্ভর জ্ঞান বা ইম্যাজিনেশন্ বলতে স্মরণ (Memory) এবং কল্পনা (Constructive Imagination) দুইই বুঝায়। যখন অতীতের কথা স্মরণ করে, দেবযানী বলেছেন,

আছে মনে—
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

আর কচ উত্তর দিচ্ছেন

তুমি সদ্য স্নান করি,
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে নবশুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী ঊষা, হাতে সাজি
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাশি
পূজার লাগিয়া।[১]

এখানে দুজনেই বিম্বের সাহায্যে নিজেদের অতীত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত কচ্ছেন। যদিও প্রচলিত ভাষায়, অভিজ্ঞতার এই রোমন্থনকে স্মৃতি (Memory) বলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে এও একপ্রকার Imagination, বা বিম্বের সাহায্যে জ্ঞান।

কিন্তু সাধারণতঃ ইম্যাজিনেশন্ কথাটি সংকীর্ণতর অর্থেই ব্যবহার করা হয়। **স্মৃতির বেলায়, ব্যক্তির নিজস্ব অতীত অভিজ্ঞতাকে কল্প বা বিম্বের সাহায্যে মনের সামনে আবার টেনে আনা হয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন যেমনটি ঘটেছিল, ঠিক তেমন তেমন ভাবেই।** কখনো কখনো নির্দিষ্টভাবে এবং সাধারণভাবে, অতীত অভিজ্ঞতার যে প্রভাব মনের মধ্যে থাকে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিদায় অভিশাপ

তাকে স্মৃতি বা memory বলা হয়। কিন্তু স্মরণের ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ, যখন অতীত অভিজ্ঞতাকে আমরা চেতনার সামনে টেনে আনি। [৮]

কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে, আমরা কল্পনা বলতে, **সেই প্রকার মানসক্রিয়াই বুঝি, যেখানে অতীত অভিজ্ঞতার বস্তুকে কল্প বা বিম্বের সাহায্যে, নিজের প্রয়োজন মত, খেয়ালখুসী মত সাজানো** হয়। এসব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত নাও হতে পারে। এপ্রকার বিম্ব ইতিহাসের বা বিজ্ঞানের সহায়ক হয়ে বিদ্যা বা জ্ঞানবর্ধনের উপায় হতে পারে (Historical or Scientific imagination)। আবার ভবিষ্যৎ অনাগত দিনের ছবি আঁকতে ব্যবহৃত হতে পারে (expectation)। অথবা, কখনো নিতান্ত কবিজনোচিত স্বপ্নবিলাস (phantasy) হতে পারে। সুতরাং দূর অতীত (ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বাইরে), ভবিষ্যৎ, দূর দেশ বা ঘটনা, অথবা কেবলমাত্র যা সম্ভাব্য তার সম্বন্ধে জ্ঞান, কল্পনার সাহায্যেই সম্ভব। কল্পনার বিস্তার, তাই স্মৃতির চেয়ে বিস্তৃততর, এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাও এখানে বেশী। ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই তা আবদ্ধ নয়। [৯]

অনেক সময় কল্পনা বলতে বুঝা যায়, যা বাস্তবের বিপরীত, অলীক। এই অর্থেই আমরা 'কবি-কল্পনা' কথাটি ব্যবহার করি। সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে। বাস্তবিক পক্ষে, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের প্রধান

---

৮ Stout তাই বলেছেন sometimes the word memory is used as synonymous with retentiveness' in general. This application of the term is inconveniently wide. It is better to confine it to ideal revival, so far as ideal revival as merely reproductive, and does not involve transformation of what is revived, in accordance with present conditions... the objects of past experiences to be reinstated, as far as possible, in the order and manner of their original occurence.

Stout—Manual of Psychology. P. 521

৯ ড্রেভার কল্পনার সংজ্ঞা দিচ্ছেন—Imagination ; the constructive, though not necessarily creative employment of past perceptal experience, revived as images in a persent experience at the ideational level, which is not in its totality a reproduction of past experience, but a new organisation of materials derived from past experience ; such construction is either creative or imitative.

Drever—A Dictionary of Psychology, P. 127

অভিযোগ এই, যে তাঁরা মিথ্যার বেসাতি করেন। D. G. Rossettiর একটি কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত কচ্ছি—

"The blessed Damozel leaned out
From the gold bar of Heaven ;
Her eyes were deeper than the depth
Of waters stilled at even ;
She had three lilies in her hand,
And the stars in her hair were seven. [১০]

অথবা রবীন্দ্রনাথ—

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
অই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে ;
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ দাহে।
ভগ্নতপস্থার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি। [১১]

অথবা সর্বশেষে, শিশুদের প্রিয় কবি স্থকুমার রায়

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা ?
রাণীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা ?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রাণীর দাদা ? [১২]

কিন্তু কল্পনা সর্বদাই বাস্তব-বিমুখী, এই অভিযোগ কি সত্য ? বৈজ্ঞানিক কেলভিন্ বা রাদারফোর্ড বা বোর্ যখন বস্তুর মৌল উপাদান এ্যাটমের গঠন বর্ণনা করেছেন, অথবা জীনস্ যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যতের বর্ণনা দিয়েছেন, তাও কি কল্পনা-নির্ভর নয় ? অবশ্য, এই সব ক্ষেত্রে কল্পনা উপযুক্ত পরীক্ষা ও

---

১০ D. G Rossetti—The Blessed Damozel

১১ রবীন্দ্রনাথ—পূরবী, তপোভঙ্গ

১২ স্থকুমার রায়—আবোল তাবোল, বোম্বাগড়ের রাজা

প্রমাণ দ্বারা কঠোরভাবে শাসিত, কবির কল্পনার মত বল্গাহীন নয়। তবুও, এখানেও সেই কল্পের বা বিম্বের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জ্ঞানের অগ্রগমন নির্ভর কচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। এরূপ গল্প আছে, নিউটন্ একদিন পার্কে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় টুপ্ করে একটি আপেল পড়ল। তাঁর বৈজ্ঞানিক ও উৎসুক মনে, তখনি এই চিন্তা উদয় হ'ল, কেন আপেলটি নীচে পড়ল? কেনই বা সমস্ত দ্রব্য (বল, ইট, শিল) অবলম্বন হারিয়ে ফেললে মাটিতে পড়ে? তিনি তখন এ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার জন্যে এই কল্পনা করলেন, যে একটি অদৃশ্য সূত্রের আকর্ষণে সমস্ত অবলম্বনহীন দ্রব্য মাটিতে এসে পড়ে। এমনি করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরূপ মতবাদের সূত্রপাত হ'ল।

বিম্বের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ—আমরা ইম্যেজ্ বুঝাতে 'বিম্ব' 'প্রতিরূপ,' বা 'ছবি' একথাগুলি ব্যবহার করেছি। তাতে এই ধারণা জন্মিতে পারে, যে সমস্ত Image-ই দর্শনেন্দ্রিয়নির্ভর। এ কথা সত্য নয়। অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর বিম্বগুলিই সব চেয়ে স্পষ্ট, এবং আমাদের অধিকাংশ কল্প বা বিম্বই প্রত্যক্ষ-দর্শন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়েরই অনুরূপ বিম্ব আছে। আমরা বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যের সুবাস (অথবা বিপরীত) স্মরণ করতে পারি; যেমন, আতরের গন্ধ, শুঁটকি মাছের গন্ধ। তেমনি শিশুর কোমল স্পর্শ, হঠাৎ অখেয়ালে সাপের গায়ে হাত পড়লে যে শীতল স্পর্শ, শিরীষ কাগজের কর্কশ স্পর্শ, এগুলি পরে কল্পের সাহায্যেই স্মরণ করতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, কোন কোন মনোবিদ্ মানুষের কার মধ্যে কোন বিম্ব প্রধান, সে অনুযায়ী, মানুষের—Audile, Tactile, Visile, Motile ইত্যাদি দলে ভাগ করেছেন। অন্ধ হেলেন্ কেলারের জীবনে স্পর্শের বিম্বই ছিল প্রধান, কারণ স্পর্শ দ্বারাই তাঁর পরিচয় ঘটত, পৃথিবীর সঙ্গে।[১৩] এমিল্ জোলা বলতেন, "প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি বিশেষ গন্ধ আছে; এ কথা মার্সাই," বা প্যারী ইত্যাদি প্রত্যেক নগরীর সম্বন্ধে যেমন সত্য, তেমনি প্যারীর বিভিন্ন রাস্তা, বা বিভিন্ন ঋতু সম্বন্ধেও সত্য। শরতের বিশিষ্ট গন্ধ হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা (mushrooms) এবং পচন্ত পাতার।[১৪] ভোজন-রসিক মুজ্তবা আলির কল্পনাকে সম্ভবতঃ স্বাদ-ধর্মী বলা চলবে। কিন্তু আধুনিক মনোবিদেরা মানুষের এ প্রকার শ্রেণীবিভাগের

১৩ Helen Keller—The Story of my Life

১৪ Stout—Groundwork of Psychology, P. 113

পক্ষপাতী নন। তাঁরা বলেন, সব মানুষের মনেই অল্পবিস্তর সবগুলি বিম্বই কখনো না কখনো, দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বলা হয় চিত্রধর্মী, কিন্তু তিনি কি ধ্বনিধর্মীও নন? সম্ভবতঃ, এই গুণগুলির কোন কোনটির মধ্যে ধনাত্মক মিল (high positive correlation) বেশী (যেমন চিত্র ও ধ্বনি ; গন্ধ ও স্বাদ), আবার কোন দুটি গুণের মধ্যে এই মিল হয়তো কম। এ গুণের প্রত্যেকটিকে আধার করেই মানুষকে বেশী, কম, মাঝারী অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া যায়, একটি ঘণ্টাকৃতি বক্র রেখায় (normal curve of distribution)। "মানুষেরা কতগুলি নির্দিষ্ট ও পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে নেই, বরং তারা যে কোন গুণ অনুযায়ী অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। অল্প কয়টি বিশুদ্ধ 'টাইপ' বা অনেকগুলি মিশ্রটাইপের পরিবর্তে, বরং একটি মাত্র 'টাইপ'ই আছে, এবং তা হচ্ছে মাঝারী। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন বিম্বের পরস্পর-বিরোধিতার পরিবর্তে, বরং দেখা যায়, এই বিভিন্ন বিম্বগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।[১৫]

বিম্বের বৈশিষ্ট্য—প্রত্যক্ষের বিষয় ও বিম্বের প্রভেদ—Characteristics of an Image : Percept and image—যখন কোন দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সামনে থাকে, তার যে ছায়া ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়, তাকে বলা হয় Percept। ষ্টাউট্ একে বলেছেন, Impression। আর বস্তুটি যখন ইন্দ্রিয়ের সামনে নেই, তখন চেষ্টা করে তার যে ছবি 'মনের মধ্যে, ফুটিয়ে তুলি, তা হচ্ছে, কল্প বা বিম্ব (image)। দুইই সত্য হয়ে আমাদের সামনে দেখা দেয়, দুইই তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ। কিন্তু নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে, প্রভেদ আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, image হচ্ছে, প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুর প্রতিবিম্ব (copy or representation) ; percept বা রূপ হচ্ছে প্রত্যক্ষের বিষয়, তা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ আলোকিত। চোখের সামনে আছে, তাকে, পরিষ্কার করে জানি, তার সম্বন্ধে খুটিনাটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু 'বিম্ব' তো প্রতিরূপ, তা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, কম আলোকিত,—তার রূপরেখা (outline) তত তীক্ষ্ণ (sharp) নয়, তার খুটিনাটি (details) মনে ভাসে না। প্রতিরূপ বা বিম্ব কতকটা বিচ্ছিন্ন (fragmentary) ; হয়তো যে ফুলটি দেখেছি, তার বিশেষ রংটাই মনে পড়ছে, তার পাপড়ির গড়ন, সে গাছের

[১৫] Thorndike—Educational Psychology, P. 204

পাতা, বা সে ফুলের গন্ধ হয়তো মনে করতে পারি না। প্রত্যক্ষে দ্রব্যটিকে তার পরিবেশের ঐশ্বর্যের মধ্যে সম্পূর্ণ করে জানি। কিন্তু বিম্বটি কেমন যেন অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা, প্রায়ান্ধকার। তবেই মনে হতে পারে তাদের মধ্যে যে প্রভেদ তা পরিমাণগত (quantitative), গুণগত (qualitative) নয়। ষ্টাউট্ এ প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচনা করে, হিউমের একটি উদ্ধৃতি সমর্থন করে বলেছেন যে, যা প্রত্যক্ষের বিষয়, তা সবলে মনকে ধাক্কা দেয়।[১৬] হঠাৎ বিদ্যুতের চমক, অথবা ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ 'সিটি' আমাদের চেতনার তটে প্রবলভাবে আঘাত করে। আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও, চেতনায় এদের প্রবেশ আমরা বাধা দিতে পারি না। তারা 'মানে-না-মানা'! কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা-গুলিকে ভবিষ্যতে স্মরণ করি, তখন তাদের এই অনতিক্রম্য প্রবলতা থাকে না। প্রত্যক্ষের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক প্রবলতা থাকে, কল্প বা বিম্বের মধ্যে তা থাকে না। **প্রত্যক্ষের বস্তু ও তার বিম্বের মধ্যে এ প্রভেদ গুণগত।** বিম্ব বা কল্পকে প্রত্যক্ষের বস্তুর একটি দুর্বল সংস্করণ বলতে পারা যায় না। প্রত্যক্ষের বিষয়, দূরত্ব, আলোর অভাব ইত্যাদি নানা কারণে অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু কখনো তাদিগকে বিম্ব বা প্রতিরূপ বলে আমরা ভ্রম করি না।

ওয়ার্ড বিম্বের অস্পষ্টতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বহু কারণের মধ্যে বিস্মৃতিকে (obliviscence) প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া প্রত্যক্ষের বস্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষণের দ্বারা (reduplication), মনের মধ্যে গভীরতর দাগ কাটে।[১৭] আবার বিম্বের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন কোন ক্রিয়া সম্পাদন ; সুতরাং ক্রিয়ার উদ্দেশ্য-বস্তুর, কোন একটি বা অল্প কয়টি গুণের পরিবর্তে সব কয়টিগুণই চেতনার সামনে আনলে, কাজের পক্ষে তা বরং বাধাই সৃষ্টি করে। তাই বিম্বের এই বিচ্ছিন্নতা ও অস্পষ্টতা।[১৮]

বিভিন্ন প্রকারের বিম্ব—Kinds of images

(ক) **After-image**—আমরা পূর্বেই দেখেছি সংবেদনের বস্তু সরিয়ে

১৬ Hume is prefectly right in affirming that percepts differ from images in the force or livliness which they strike upon the mind.
Stout—Manual of Psychology, P. 136

১৭ Ward—Psychological Principles, P. 199

১৮ Stout—Manual of Psychology, P. 143

নিলেও বস্তুর ছবিটি চোখের সামনে সামান্য কিছুক্ষণ থাকে। একে After image বলা হলেও, বাস্তবিকপক্ষে একে After-sensationই বলা উচিত। Positive after-imageএ বস্তুর যে রং তাই দেখি, আর negative after-imageএ তাহার বিপরীত রং দেখি।

(খ) **Primary memory image**—রাস্তা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেগে চলেছি হঠাৎ মনে হল, কে যেন অভিবাদন করল। আচ্ছন্ন চেতনায় এই ঘটনাটি যথেষ্ট জোরে ঘা দিলনা। কিন্তু সামান্য পরেই, খেয়াল হল, পরিচিত একটি ছেলে যেন অভিবাদন করেছিল। নিবিষ্টমনে লেখায় ব্যস্ত আছি, হঠাৎ দেয়াল ঘড়িটির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তখন এটা একেবারেই খেয়াল হয় নি। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম, ঘড়িটির টক্ টক্ শব্দ বন্ধ হয়েছে, ঘড়িটি চলছে না। এসব ক্ষেত্রে, যে সব ছবির সাহায্যে, এ জ্ঞান,—ঘটনার অব্যবহিত পরে, যে স্পষ্ট স্মৃতি (vivid memory of the immediate past) তাকে জেম্‌স নাম দিয়েছেন—Primary Memory image।[১৯]

(গ) **Memory image**—কোন ঘটনা ঘটবার কিছুদিন পর, যদি চেষ্টা দ্বারা, তা মনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করি, তা হলে যে বিম্ব মনে উদিত হয়, তাকে Memory image বলা হয়। Primary memory image ঘটনার অব্যবহিত পরেই, মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, এবং তা মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে, বিনা চেষ্টায়। কিন্তু Memory imageকে মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, ঘটনার কিছুদিন পরে—ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টায়।

(ঘ) **Recurrent Image**—কোন উত্তেজক ঘটনা ঘটবার পরেও, সে ঘটনার রেশ, তার বিম্ব মনের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে থাকে। একটা গান খুব ভাল লাগল। গানটা শেষ হবার পরও, অনেকক্ষণ বারে বারে, সেই গানের স্থরটা মনের মধ্যে যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এ জাতীয় বিম্ব বা কল্পকে বলে **Recurrent Image.**

(ঙ) **Eidetic Image**—মনোবিদ্ Jaench প্রথম এ জাতীয় বিম্বসম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং তাঁর মারবুর্গ ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব্ সাইকোলজীর অনুগামীরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। তাঁদের মতে চৌদ্দ বৎসরের নীচের কিছু সংখ্যক শিশুর মনে অত্যন্ত জীবন্ত কল্পনার অস্তিত্ব দেখা যায়। কোন দ্রব্য বা ঘটনার

১৯ James—Principles of Psychology, Vol. II

অব্যবহিত পরে, দ্রব্যটি, অপসারিত হলেও, শিশু সেই দ্রব্যটি তার রং, রূপ, ঘনত্ব-সহ, জীবন্ত হিসাবেই যেন চোখে দেখতে পায়। থুলেস্ বলেছেন এজাতীয় প্রতিবিম্ব কিছু পরিমাণ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, এবং সাধারণতঃ (যদিও সর্বদা নয়), পরবর্তী জীবনে এটা লোপ পায়। সাধারণ বিম্ব বা চিত্র-কল্প (visual image) হতে এগুলির প্রভেদ এই যে, এগুলি অধিকতর স্থায়ী ও স্পষ্ট, বাইরের বাস্তব দ্রব্যদের মত, এদের যেন বাস্তব অস্তিত্ব আছে; এবং এই বিম্ব যতক্ষণ আর চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ, শিশু সেই দ্রব্যের সমস্ত গুণ সম্বন্ধে, সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, কখনো আবার সে দ্রব্য সম্বন্ধে এমন গুণ বা লক্ষণের কথা বলে যা বাস্তবিক প্রত্যক্ষের মধ্যে ছিল না।[২০] (এ সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায় দেখ)

উড্‌ওয়ার্থ বলেন, "এ রকম মনে হয়, যে চৌদ্দবৎসরের কম অনেক ছেলে মেয়ে, সম্ভবতঃ অর্ধেক ছেলেমেয়ে, কোন কঠিন পদার্থ (solid object) বা ছবি যদি খুব মন দিয়ে দেখে, এবং তার পর চোখ বোজে (অথবা আরো ভাল হয়, যদি সেই দ্রব্য বা ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে, সামনের একটি ধূসর পর্দার দিকে তাকায়) তা হলে, তারা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় যে, দ্রব্যের স্পষ্ট ছবিটি তখনও তাদের চোখের সামনেই আছে, দ্রব্যটিকে যখন প্রত্যক্ষ করছিল, তখন তার যে গুণগুলি লক্ষ্য করে নাই, সেগুলি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করলে, উত্তর দিতে পারে। তাদের মনে যে বিম্ব জাগে, তা ফটোগ্রাফের ছবির মত হলেও দ্রব্যের হুবহু প্রতিমূর্তি নয়। তারা কতকটা পরিবর্তনশীল (plastic), এবং শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহ অনুযায়ী, তারা মূল দ্রব্যের আকার হতে পরিবর্তিত হয়; এ পরিবর্তন কখনও ইচ্ছাকৃত, কখনও বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে।"[২১]

শিশুর ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান—The place of imagination in education—শিশু বয়স্ক মানুষের তুলনায় অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ। তার

২০ Thouless—General and Social Psychology, P. 259

২১ Drever সংজ্ঞা দিয়েছেন,—Eidetic image ; a term used primarily of a type of vivid imagery, which is, as it were, projected into the external world, and not merely 'in one's head' ; a half-way house hallucination.

Drever—Dictionary of Psychology, P. 71-79

Woodworthy—Psychology, P 350

চিন্তা অনেকটাই বিম্বের সাহায্যে অগ্রসর হয়। বাস্তব জীবনের বাধানিষেধ, নিয়মগুলি সে মেনে নেয় না। বাস্তবিক পক্ষে, তার কাছে প্রত্যক্ষ ও কল্পনার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তার কাছে সমস্ত জিনিষই জীবন্ত, এবং একটি জিনিষের বাঁধাধরা একটিই গুণ থাকবে, এমন কোন কথা নাই। তাই একটা লাঠি, খোকার ঘোড়া। তাকে সে, হেট্ হেট্ করে চালায়,—কথা না শুনলে, চাবুক দিয়ে মারে। এবং আধঘণ্টা বাদে, সে লাঠিকেই আবার, 'আমাল্ খোকা' বলে সে কত আদর করে, চুমু খায়। পরের দিন সে লাঠি ভেঙে টুকরো করে উনুনের আগুনে গুঁজে, দিয়ে তাতে আগুন ধরে উঠলে, সে হাত তালি দিয়ে নাচতে থাকে।[২২] বয়স্কের পৃথিবী একটি সমগ্র এক; তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট স্থান ও চরিত্র আছে। কিন্তু শিশুর জগৎ এমন সীমাবদ্ধ, এবং আইন কানুনের দাস নয়। শিশু বয়স্কদের জগতে বাস করে, কিন্তু তার 'জগতের' সঙ্গে, বড়দের জগতের অনেক সময় অমিল হয়। কিন্তু সে যখন 'কানাই মাষ্টার' হয়, ছাত্র কুকুর ছানাকে পড়াতে ব্যস্ত, তখন মা এসে হয়তো (নোংরা কুকুর) বলে তাকে দূর দূর করে খেদিয়ে দেন। শিশু তার কল্পগুলি বয়স্কের জগৎ হতেই সংগ্রহ করে বটে (সে ডাক্তার সাজে, মা সাজে, ইঞ্জিন-চালক হয়, পড়ায়, ঔষধ খাওয়ায়, জুতা পালিশ করে), কিন্তু তার কল্পগুলিকে সে নিজের খেয়াল খুশী মতই সাজায়,—তারা কখনো বা বড়দের জগতের অনুকরণ, আবার কখনো তার বিধি নিয়ম. বড়দের নিয়মের বিপরীত। কিন্তু, তাই বলে' মনে করা ভুল হবে, যে শিশুর জগতে কোন নিয়মকানুন নেই, তা একেবারেই উদ্ভট,—আবোল-তাবোল।[২৩] এটা অনেক শিশু-মনোবিদই লক্ষ্য করেছেন, যে শিশুর জগতে জড় বস্তু নেই,—সবই জীব। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চার বৎসর বয়সে প্রথম গোয়ালন্দ–চাঁদপুর, ষ্টীমারে ভ্রমণকালে, চাকায় আবর্তিত সাদা সাদা ঢেউগুলি দেখে বলেছিল, 'ঢেউগুলি হাসচে'।[২৪] তিন বৎসরের স্থমিত্রা F ᗺ এই প্যাটার্ণটি দেখে বলেছিল, ওরা দুজনে কথা বলচে'।[২২] শিশুদের এ প্রকার বহু ব্যবহার লক্ষ্য করে সালী বলেছেন, "আমরা যাকে জীবনহীন বা চেতনাশূন্য বলে মনে করি, শিশু তাদের জীবন্ত ও সচেতন

[২২] Buhler—Gestige Eintwicklung, P. 325
[২৩] Jean Piaget—The Language and Thought of the Child
[২৪] Koffka—Growth of the Mind, P. 368

বলেই গ্রহণ করে।[২৫] বর্তমান শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কল্পনা-প্রবণতা ও তাদের জীবনে তার গুরুত্ব লক্ষ্য করে, (শিশুর খেলা 'ছেলে-খেলা' নয়, এটা বিষম গুরুতর ব্যাপার) শিক্ষার কাজে, কি করে একে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে বহু গবেষণা করেছেন। ফ্রোয়েবেল, ওয়েন্, মন্তেসরী এবং তাঁদের পরবর্তী সমস্ত আধুনিক শিশু-শিক্ষাবিদেরা (পিয়াজেঁ, সুজান্ আইজ্যাক্স্ ইত্যাদি) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর কল্পনার বিকাশ কি করে সুফলপ্রসূ করা যায়, সে বিষয়ে নানা প্রণালী আবিষ্কার করেছেন। একেবারে শিশুদের বেলায়, খেলাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।[২৬] কল্পনার উপযুক্ত বিকাশ ভিন্ন, সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়, এটাই বর্তমানে শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানীদের মত। কল্পনাকে তাই 'বাজে' তুচ্ছ জিনিষ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মন্তেসরী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে গ্রহণ করলেও রূপ কথা ইত্যাদি অমূলক কল্পনার পক্ষপাতী নন। অন্য মনোবিদেরা মন্তেসরীর মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন শিশু শিক্ষার এক স্তরে রূপ কথারও প্রয়োজন আছে।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ—Classification of imagination

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হতে কল্পনার শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

১। **নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় কল্পনা— Passive and Active imagination**—যেখানে ব্যক্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই কল্পগুলি মনের মধ্যে এসে হাজির হয়,—যেমন অলস দিবা-স্বপ্নের বেলায়—তাকে নিষ্ক্রিয় কল্পনা বলা হয়। আর যেখানে ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় কল্পগুলিকে মনে উপস্থিত করে, বা তাদের সাজায় (যে মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে, সে তার ভবিষ্যৎ সংসারের রূপ কল্পনা করে), তাকে সক্রিয় কল্পনা বলা হয়।

২। **পরাধীন ও স্বাধীন কল্পনা—Reproductive and Creative imagination**— মনের মধ্যে যে কল্প জাগে তা যেখানে অপরের উপর নির্ভরশীল তা পরাধীন, যেমন,—কেউ হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা কচ্ছেন, এবং শ্রোতার মনে নানা ছবি ফুটিছে, যা সেই বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল; স্বাধীন কল্পনায় কল্পের রূপ ও সংযোগ, ব্যক্তির নিজস্ব ক্রিয়ার

২৫ Sully—Studies of Childhood, P. 30

২৬ Montessori—Method.

উপর নির্ভর করে। যেমন, তুমি M. Sc. পাশ করে ভবিষ্যৎ জীবনে কি করবে, তা কল্পনা কচ্ছ। কবির কাব্য রচনা, দার্শনিকের স্বপ্ন, স্থপতিকারের পরিকল্পনা, ইত্যাদি প্রতিক্ষেত্রেই স্বাধীন কল্পনা-নির্ভর।

৩। **জ্ঞানমুখী, আনন্দমুখী ও কর্মমুখী কল্পনা—Intellectual Aesthetic and Practical imagination**—কল্পকে কি কাজে ব্যবহার করা হয়, সে অনুযায়ী, কল্পনাকে উপরি উক্ত তিন দলে, ভাগ করা যায়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, কল্পের ব্যবহার করেন, জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে। আবার কবি, শিল্পী, কলারসিক কল্পের ব্যবহার করেন, আনন্দদান বা আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে। আবার এন্‌জীনীয়ার, টেক্‌নিসিয়ান্‌ও কল্পের ব্যবহার করেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য, কোনো 'কেজো' পরিকল্পনাকে রূপদান।

৪। **বুদ্ধিশাসিত ও বল্গাহীন কল্পনা— Controlled and Uncontrolled or Autistic imagination**—কল্পের ব্যবহার যেখানে **বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত**, সেখানে তা জ্ঞানান্বেষণ ও কর্মসম্পাদনের সহায়ক। **প্রতীক্ষা (expectation), বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও ঐতিহাসিক কল্পনা** বল্গাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। তা বুদ্ধি দ্বারা শাসিত। আধুনিক মানুষের জীবনে, এ প্রকার কল্পনার গুরুত্বই সমধিক।

প্রতীক্ষার বেলায়, আমরা বর্তমানের কতগুলি লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্দাজ করি, এবং সে জন্য প্রস্তুত হই। রাত্রি ৯টায় কড়া নাড়া শুনে, আন্দাজ করলাম, মাখন বাবু প্রেস থেকে মনোবিদ্যার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রুফ নিয়ে এসেছেন। চটি পায় দিয়ে নীচে নামবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই, কল্পের বাস্তবসত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকে।

কিন্তু **অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার** বেলায়, কল্পনায় যা রচিত হয় তা বাস্তবিক সত্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—যদিও গুরুতর মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তাদের সত্যতায় বিশ্বাস করে। **দিবাস্বপ্ন, (Day-dream) অধ্যাস (Illusion), অমূল প্রত্যক্ষ (Hallucination), ভ্রান্তি Delusions), ও স্বপ্ন (Dream)** অনিয়ন্ত্রিত, স্বয়ং-চালিত (autistic) কল্পনার উদাহরণ।

অধ্যাস ও অমূলপ্রত্যক্ষের কথা আলোচনা করা গিয়েছে; দুইই প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ভ্রম (রজ্জুতে সর্পভ্রম, নিশির ডাক)। অধ্যাসের বেলায় প্রত্যক্ষের

একটা ভিত্তি থাকে, কিন্তু ভ্রম হয় তার অর্থবোধে (interpretation)। প্রত্যক্ষের বস্তু ছিল রজ্জু, কিন্তু আলোর স্বল্পতাবশতঃ, মনোযোগের অভাবে, অথবা মানসিক অস্থিরতার জন্য রজ্জুকে কল্পনা করলাম সর্প। অমূলপ্রত্যক্ষের বেলায় ভ্রম প্রত্যক্ষের কোন ভিত্তি নেই, থাকলেও তা যৎসামান্য। নিশির ডাক, দৈবাদেশ ইত্যাদি, অমূল প্রত্যক্ষের উদাহরণ। কখনো না কখনো সকলেরই এ প্রকার ভ্রম হয়, কিন্তু বারে বারে এটা ঘটলে, তা মানসিক বিকৃতির লক্ষণ বলে বুঝতে হবে। **ভ্রান্তি (delusion)** আরো গুরুতর মানসিক বিকারের পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে একটি ভ্রান্তধারণাজনিত অত্যন্ত স্পষ্ট কল্পনা বাসা বাধে, এবং সে বিশ্বাস করে, সকলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কচ্ছে (delusion of persecution), তাকে গালাগালি দিচ্ছে (delusion of reference) অথবা সে বিশ্বাস করে, সে ভগবান্, সে সম্রাট, তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক (delusion of grandeur)। এমন হওয়া অসম্ভব নয়, যে ব্যক্তিটি অন্য সমস্ত বিষয়ে স্বাভাবিক, কিন্তু এই একটি বিষয়ে, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, সে অপ্রকৃতিস্থ। এ প্রকার ভ্রমাত্মক বিশ্বাস Dementia Praecox এবং Schizophrenia-রূপ উন্মত্ততায় বিশেষ লক্ষণ।[২৭] ফ্রয়েড্-বাদীদের মতে, সমস্ত মানসিক বিকারের মূলে আছে, অবচেতন মনে কোন অমীমাংসিত সংঘাত। মানুষের মনে হঠাৎ কোন আঘাত, বা স্বাভাবিক তীব্র আকাঙ্ক্ষা অবদমনের ফলে, তার অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির (complex) সৃষ্টি হয়। মানসিক বিকার তারই প্রকাশ। কোন মানুষের কৃতকর্মের জন্য হয়তো তীব্র পাপবোধ আছে, কখনো কখনো এ পাপবোধ কোন কাল্পনিক অপরাধের জন্যে। কিন্তু এই পাপবোধ (guilt-consciousness) তাকে পীড়া দেয়। সে ইহা গোপন করতে চায়। নিজের কাছেও ইহা সে এটা স্বীকার করতে চায় না; কিন্তু তার বিবেক তাকে ধিক্কার দেয়,—একেই সে কল্পনা করে, তার চতুষ্পার্শে মানুষদের তিরস্কার রূপে। এটা তার পীড়িত আত্মার, আত্মপীড়ন দ্বারা আত্মক্ষালনের উপায়,—অন্ধ অথচ কুটিল উপায়।[২৮]

মানুষের অহং বড় প্রবল। আমরা নিজেকে ভালবাসি, অপরের দ্বারা

২৭। Bleuler—A Text-book of Psychiatry

২৮। Mc Dougall—An Outline of Abnormal Psychology, P. 334-5

প্রশংসিত হয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই। "মানুষের দেহের পক্ষে যেমন বাতাস অপরিহার্য, তেমনি মনের পক্ষেও অপরিহার্য, অহমিকার তৃপ্তি। আমরা যা খুসী করবার ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা করি। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমরা যা চাই, তা পাই না। যা করতে চাই, তা করতে পারি না। পদে পদে পাই আঘাত। এতে আমাদের অহংবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। বাইরের জগতে এ ক্ষোভ মেটাবার উপায় নেই। তাই আমরা আশ্রয় নিই কল্পনায়।"[২৯] হার্ট ও জোন্‌সের মতে, অবদমিত ইচ্ছা বা পাপ-বোধ, তার চতুষ্পার্শ্বে একটি জটিল জগৎ সৃষ্টি করে, এবং তা ব্যক্তির চেতন মানসস্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, (dissociation) নিজস্ব সত্তা ও শক্তি লাভ করে।[৩০]

স্বপ্ন—Dreams—ঘুমের মধ্যে যে সব কল্প আমাদের চেতনায় ভেসে ওঠে—তাদের বলি স্বপ্ন। স্বপ্নের কল্পগুলি অনেক সময় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যদিও তাদের মধ্যে যুক্তিগত কোন সঙ্গতি নেই, তথাপি যখন স্বপ্ন দেখি, তখন তার সত্যতায় বিশ্বাস করি। অনেক সময়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিতান্ত বিশৃংখল স্বপ্ন দেখি,—এবং ভয়ে চীৎকার করে জেগে যাই। ভয়টা এখানে সম্পূর্ণ সত্য, যদিও তার বাস্তব কারণ নেই, এবং স্বপ্নের ঘটনাগুলি বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্বন্ধের কঠিন শাসন উপেক্ষা করে চলে।

স্বপ্ন এবং এর কারণ অনুসন্ধান—Dream and its interpretation—স্বপ্ন চিরদিন মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। স্বপ্নে মৃত আত্মীয়স্বজন আমাদের দেখা দেন, আমরা দূর দেশ বা দূর কালে বিচরণ করি, সেখানে বাঘে কথা বলে এবং পরমুহূর্তেই পাউরুটিতে পরিণত হয়,—সম্ভব-অসম্ভব-উদ্ভট-আজগুবীর, সে এক আশ্চর্য মিশ্রণ। স্বপ্ন চেতন ও অচেতন দুইই। ইহা তৎকালে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ, কিন্তু ঘুম ভাঙলেই, এই অলীক কল্পনার খেলায় আমরা হাসি। কিন্তু কেন এমন হয়? কি এর ব্যাখ্যা? কি এর তাৎপর্য ও ইঙ্গিত? না কি, ইহা সম্পূর্ণই অর্থহীন ও অলীক? প্রাচীন যুগ হ'তে মানুষ এ প্রশ্ন করেছে, এ সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজেছে।

প্রাচীন কালে, মানুষ মনে করত জ্যোতির্ময়, সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য আত্মাবস্তু,

---

২৯। গুহ—মানুষের মন ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ
৩০। Hart—Psychology of Insanity.

দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ। ঘুমের সময়, এই আত্মা দেহ থেকে বাইরে এসে বিচরণ করে। আত্মা অ-জড় বস্তু, ভৌতিক সত্তা, তাই দেশ কালের বাধা সহজেই সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এবং স্বপ্ন নিরর্থক নয়, তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বন্ধু আত্মারা অনেক সময় ভবিষ্যৎ কোন বিপদ সম্বন্ধে ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিয়ে তাকে সাবধান করেন,—কখনো বা গুপ্তধনের রহস্য ভেদ করে দেন ইত্যাদি।

বর্তমান যুগের মানুষ ভৌতিক সত্তায় বিশ্বাসী নয়। তারা স্বপ্নকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই মনে করে, এবং প্রাকৃত শক্তির সাহায্যেই এর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। এর মধ্যে কতক ব্যাখ্যা শারীরিক (physical and physiological) কারণ দ্বারা, এবং কতক ব্যাখ্যা মানসিক কারণ দ্বারা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে, স্বপ্নের কতগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাক্।

স্বপ্ন ঘুমের অচেতন অবস্থায়—কল্পের সচেতন খেলা। সচেতন জীবনের সঙ্গে ইহা সম্পর্কিত,—অতীতের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, স্বপ্নে প্রতিফলিত। আবার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গেও অনেক সময় এর যোগ থাকে। স্বপ্নের মধ্যেও এক প্রকারের বিশৃংখল যুক্তি বিচার থাকে। স্বপ্নের মধ্যেও ভয়, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। সচেতন জীবনের সঙ্গে এর প্রভেদও লক্ষ্যণীয় (১) স্বপ্নের প্রকৃতি অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষের মিশ্রণে। স্বপ্নে অবাস্তব মানুষ ও ঘটনাকে আমরা সত্য বলে দেখি, যেন তারা বাহ্য জগতে সত্যই বিদ্যমান্। ঘুমের মধ্যে মুখে বৃষ্টির ছাট লাগছে,—স্বপ্নে দেখলাম—সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছি। এখানে স্বপ্নের পিছনে একটা বাস্তব কারণ আছে, যদিও স্বপ্নে তাকে বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে। সচেতন জীবনের অন্যান্য প্রত্যক্ষের সঙ্গে, অধ্যাসের অমিল সহজেই ধরা পড়ে। বাস্তব জগতের রূঢ় দাবী, সহজেই অধ্যাসটি যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করে দেয়। কিন্তু স্বপ্নে, কল্পের অসপত্ন রাজস্ব ; সেখানে প্রত্যক্ষ এসে, কল্পের অবাস্তবতা পদে পদে প্রমাণ করে দেয় না। কাজেই, স্বপ্ন নিতান্ত অসম্ভব হলেও, তা বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম। ঘুমের মধ্যে বিচার বুদ্ধির প্রহরা শিথিল। (২) স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় অঙ্গচালনা করি, তা জেগে উঠলে টের পাই। বুড়ি স্বপ্ন দেখল, যে আমসত্ত্ব রোদে শুকুতে দিয়েছিল, তা কাকে ঠোকরাচ্ছে।

বুড়ি হস্ হস্ করে জোরে জোরে হাত নেড়ে, কাক তাড়াতে গিয়ে মশারীর দড়ি ছিঁড়ে তার মুখের উপর পড়ল, আর ঘুম ভেঙে গেল। কেউ কেউ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে হেঁটে দরজা খুলে বাইরে চলে যায় (Somnumbulism)—অশিক্ষিত মানুষ বলে, নিশিভূত ভুলিয়ে ঘর থেকে বের করেছে।

(৩) স্বপ্নে যে সব কল্প ফুটে ওঠে তা বহুক্ষেত্রেই, বাস্তব অভিজ্ঞতা অভ্যাস ও কল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন (dissociated) হয়ে, নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করে; সেই কারণেই, স্বপ্ন অনেক সময় আজগুবী, উদ্ভট, অবিশ্বাস্য। তথাপি সেই মুহূর্তে তারা বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ, কারণ উন্মাদের প্রলাপের মধ্যেও একরকমের বিকৃত যুক্তি আছে (there is method in his madness)। এরকম বিচ্ছিন্নতা ঘটে বলেই, আমি স্বপ্ন দেখতে পারি, যেন আমি মৃত্যুশয্যায়, শিয়রে আমিই আবার বিষণ্ণ মুখে সেবা কচ্ছি (splitting of personality)। এই বিচ্ছিন্নতার চূড়ান্ত অবস্থাতে (ডাঃ জোন্সের মতে) সিজোফ্রেনিয়া-রূপ গুরুতর মানসিক বিকার ঘটে,—সাহিত্যে যাকে অমর করেছেন ষ্টিভেন্সন্ ডাঃ জিকেল্ ও মিঃ হাইড্ রূপে। একই মানুষের দুইরূপ, দেব ও দানব।[৩১]

স্বপ্নের দেহগত কারণ—অতিভোজনের ফলে বা বুকের উপর চাপ রেখে শুলে, অনেক সময় মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। এ সব ক্ষেত্রে পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ ঊর্দ্ধদিকে হৃদপিণ্ডে বা মস্তিষ্কে চাপ দেয়। মস্তিষ্কের কোষগুলি উত্তপ্ত হয়ে সম্ভবতঃ দর্শনের বোধ-কেন্দ্রকে ভিতর থেকে উত্তেজিত করে, তার ফলে আমরা স্বপ্ন দেখি। কেউ কেউ বলেন, ঘুমের মধ্যে খাদ্য থেকে সঞ্জাত কিছু মাদকপদার্থ রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে মস্তিষ্ককেও আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র ইত্যাদি গুলিতে ঘুমের মধ্যে যখন মেরামতের ক্রিয়া (anabolism) চলতে থাকে, তখন এই সমস্ত যন্ত্র বা গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত কিছু বিষাক্ত পদার্থও রক্তে সঞ্চিত হয়, এবং তা রক্তস্রোতে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। সে জন্য মস্তিষ্কের বোধকেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ইত্যাদি ভেতর থেকে উত্তেজিত হয়, তাহার ফলে স্পষ্ট কল্প (vivid images) সৃষ্টি হয়, এবং কখনো কখনো ঘুমের মধ্যেও অঙ্গসঞ্চালন ঘটে।

৩১। Calkins.—A First Book in Psychology, P. 387-85
ক্যাল্‌কিনস্ স্বপ্নে বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিলেও, জোনস্ বা অন্যান্য ফ্রয়েড্-পন্থীরা একে যে ভাবে মানসিক ব্যাখ্যার মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা তিনি স্বীকার করেন না।

কিন্তু, **স্বপ্নের মানসিক কারণ** নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে ও সেগুলিই **সমধিক গুরুত্বপূর্ণ**। এই সব গবেষক সকলেরই মত, যে ব্যক্তির অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন, যে সব সমস্যা বর্তমানে আমাদের বিব্রত করছে এবং যাদের সম্বন্ধে ঘুমিয়ে পড়বার আগে, চিন্তা করেছি, অনেক সময় তাদের সমাধান স্বপ্নের মধ্যে মিলে যায়। কখনো কখনো অমীমাংসিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান ঘুমের মধ্যে হয়েছে। তাই কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেখানে কিছুতেই করা যাচ্ছে না, তখন এটা অনেক ক্ষেত্রেই সদুপদেশ যে—Sleep over the problem। মনোবিদ্‌দের মতে, আমরা যখন চিন্তা করি তখন স্নায়বিক শক্তি মস্তিষ্কের কোষ, স্নায়ুসূত্রকে উত্তেজিত করে, এবং সচেতন চিন্তা শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ মস্তিষ্কের মধ্যে চলতে থাকে। কাজেই অর্ধেক-শেখা পড়াও ঘুমের মধ্যে চেতন চেষ্টা ব্যতিরেকেও, মনের মধ্যে স্থিতি লাভ করে (consolidation)।[৩২] রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' নাটকের প্লট এই ভাবেই নাকি পেয়েছিলেন। তাঁর এরকম আরো স্বপ্নে-পাওয়া গল্প আছে।

গেষ্টল্ট বাদীদের শিক্ষার সূত্র অনুযায়ী, যে কাজ আমাদের করতে হবে তার জন্যে, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। যে পর্যন্ত না কাজটি তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে, সে পর্যন্ত অস্বস্তি চলতে থাকে। একে K. Lewin বলেছেন, task-tension।[৩৩] Hull এর মতে, সমস্ত শিক্ষার (তা সে বই শেখাই হোক্, আর কাজ শেখাই হোক) উদ্দেশ্য, এই অস্বস্তি দূরীকরণ (need reduction)। স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের এই অস্বস্তি দূরীকরণের কাজ চলতে থাকে। তার কারণ, এটি মনের একটি মূল ধর্ম, যে সে অপূর্ণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না,—সে সম্পূর্ণতা খোঁজে। Hartmann একে principle of closure বা pragnanz (pregnance) বলেছেন। তাঁর ভাষায়, শিক্ষার কাজ হচ্ছে "একটা অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করা। চিত্রটা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না, সে জন্যেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এতে শিক্ষার্থীর মনে একটা অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়, যা থেকে সে মুক্তি খোঁজে।" স্বপ্নেও সম্পূর্ণীকরণের এ কাজটি চলতে থাকে।

৩২। Sandiford—Educational Psychology, P. 209

৩৩। Lewin—A dynamic theory of Personality

স্বপ্নের এই সমস্ত মতবাদেই, স্বপ্নকে ব্যক্তির বর্তমান সমস্যা পূরণের উপায় হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্‌ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিন্তাজগতে বিষম আলোড়ন-আনয়নকারী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Interpretation of Dreams প্রকাশ করেন। তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, স্বপ্ন শুধু ব্যক্তির বর্তমান অশান্তি দূর ও সমস্যাসমাধানের সঙ্গেই যুক্ত, এমন নয়। সমস্ত স্বপ্নই ব্যক্তির কোন-না-কোন ইচ্ছা পূরণ করে। এই ইচ্ছার মধ্যে অনেকগুলি আছে শৈশবের অপরিপূর্ণ এবং অবদমিত স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা।[৩৪] তাঁর মতে, স্বপ্ন নিরর্থক নয়—তা ব্যক্তির অন্তরের কতগুলি গভীর প্রয়োজন ও আকূতির ইঙ্গিত দেয়, এবং ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত না জন্মিয়ে, ও সামাজিক নীতি-বুদ্ধির প্রহরা এড়িয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কতগুলি নির্দোষ প্রতীকের সাহায্যে সেই ইচ্ছাগুলি পরিপূরণে সহায়ক হয়। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন ইচ্ছা পরিপূরণের নির্দোষ উপায়, এবং ইহা ব্যক্তির ঘুমের রক্ষক।[৩৫] প্রত্যেক স্বপ্নই হচ্ছে ইচ্ছাপরিপূরণের দ্বারা, ঘুমের বিঘ্ন দূরীকরণের চেষ্টা—"every dream is an attempt to put aside a disturbance of sleep, by means of wish-fulfilment।" আদিম কাম (Id) আমাদের কাছে কতগুলি দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক দাবীর অনেকগুলি, সমাজের শাসন, অথবা আমাদের নীতিবুদ্ধির (super-ego) বাধা ইত্যাদির জন্য পূরণ করতে পারিনা। ভয় ও লজ্জার জন্য এই অ-সামাজিক অবস্থাগুলিকে আমরা সচেতন মনের সামনে আসতে বাধা দি, এবং এদের অবদমন (repression) করি। তার ফলে, এই আকাঙ্ক্ষাগুলি সচেতন মনের আলোকিত স্তর থেকে নির্বাসিত হয়ে নির্জ্ঞান মনের (Unconscious) অন্ধকার স্তরে আশ্রয় নেয়। ব্যক্তি নিজেও তখন এ আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুলে যায়। ফ্রয়েডের মতে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অধিকাংশই যোনি-কেন্দ্রিক (sexual)। শৈশবের আদিম আকাঙ্ক্ষা মাত্রই, তাঁর মতে, এই দলের। এ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পিতা, মাতা, সমাজ অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তির চোখে দেখে। তাই শিশু তার এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি গোপন করতে থাকে। শিশুর অপরিণত নীতিবুদ্ধির প্রহার (censor) তার সমাজ-বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার উপর খবরদারী করে। ফলে, এই আদিম কামাকাঙ্ক্ষাগুলি অবচেতন মনে গোপন

৩৪। Freud—Interpetation of dreams,
৩৫। Munn—Psychology, P. 144

থাকে। কিন্তু বিপুল এদের শক্তি, তাই এরা ধ্বংস হয় না,—আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে মাত্র। ঘুমের মধ্যে এই সুযোগ মিলে। তখন ব্যক্তির অন্তরের নীতি-বোধের প্রহরা শিথিল হয়। কিন্তু প্রহরী ঘুমিয়ে পড়লেও, সে তো সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। তাই আদিম আকাঙ্ক্ষাগুলি চুপে চুপে, ছদ্মবেশ ধারণ করে, মনের সামনে এসে হাজির হয়। এর দ্বারা ব্যক্তির ভিতরে আকাঙ্ক্ষার অবদমনের জন্যে যে অস্বস্তি (tension) চলছিল, তা দূর হয়; বিকল্প কতগুলি প্রতীকের সাহায্যে মনের গোপন ইচ্ছা-পূরণ হয় (wish-fulfilment)। অস্বস্তি দূর হয় বলেই, ব্যক্তি শান্তিতে ঘুমুতে থাকে। স্বপ্ন যে অদ্ভুত খাপছাড়া মনে হয় তার কারণ, সেখানে যে সব ছবি ফুটে, তারা প্রতীক মাত্র (symbols)। প্রতীকের ছদ্মবেশে আমাদের মনেরই ইচ্ছা স্বপ্নে এলো-মেলো ভাবে দেখা দেয়। এই এলোমেলো ভাবের কারণ, স্বপ্নের কল্প বা বিম্ব (images) গুলি অনেক সময় সংক্ষিপ্ত হয় (condensation), কখনো তাদের পরিবর্ত বা বিকল্প (substitution) মূলের স্থান অধিকার করে। কখনো বা সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর স্থানান্তর (transference) ঘটে। তাই স্বপ্নে যে কল্প প্রকট (manifest content), তা দ্বারা তার স্বরূপ অনেক সময় বোঝা যায় না। অভিজ্ঞ মনোবিকলন-বিদ্ এই প্রকট কল্পের পশ্চাতে, ব্যক্তির যে গোপন ইচ্ছা (latent content) তা অনুমান করতে পারেন। মনোবিকলনে উপযুক্ত পারদর্শিতা থাকলে বোঝা যায়, যে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আদিম কাম (Id) আপনার অন্তর্নিহিত অস্বস্তি দূর করবার পথ খোঁজে (cathexis)। আদিম কামের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহের দ্বারা রুদ্ধশক্তির দ্বারোদ্ঘাটন ও অস্বস্তি নিরসন (release of energy and elimination of tension)। বাস্তব জগতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সোজাসুজি লাভের পথে বাধা আছে, তাই স্বপ্নে কল্পের সাহায্যে, প্রতীকের সাহায্যে, ছদ্মবেশে সেই নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার তির্যক পথে পরিতৃপ্তি (vicarious satisfaction of forbidden wishes)। একে বলা যেতে পারে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

স্বপ্ন তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখকর। তবে দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠি কেন? ফ্রয়েডের মতে, যদি স্বপ্নে কোন নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা প্রতীকের আবরণ

খুলে ফেলে, বড় বেশী সোজাসুজি পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে, তখন মন ভয় পেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, এবং চেতন মন নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৬]

স্বপ্নের কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত, একজন প্রসিদ্ধ মনোবিদের ভাষায় অতি সংক্ষেপ দেওয়া হল :

ফ্রয়েড স্বপ্নকে ইচ্ছাপরিপূরণ ও ঘুমের অভিভাবকত্বের (ঘুম যাতে না ভেঙে যায়) উপায় বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে "প্রত্যেক স্বপ্নেই কোন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির দ্বারা ঘুমের বিঘ্ন দূর করার একটা চেষ্টা।" আমাদের জৈব আকাঙ্ক্ষা (ফ্রয়েডীয়দের মতে অদস্ বা আদিম কাম) গুলি পরিতৃপ্তি দাবী করে। ঘুমন্ত অহং-এর কাছেও এ দাবী করা হয় ; কখনও কখনও এ দাবীর পশ্চাতে থাকে সন্দেহ, সংঘাত অথবা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা বিষয়ে অক্ষমতা। ঘুমন্ত অহং-এর প্রধান আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যাতে ঘুমটা বিঘ্নিত না হয় : কিন্তু অতৃপ্ত জৈব আকাঙ্ক্ষার দাবীকে অহং ঘুমের বিঘ্নকারক বলে মনে করে এবং এই বিঘ্ন দূর করতে চেষ্টিত হয়। ছদ্মবেশী জৈব আকাঙ্ক্ষার দাবী আপাতদৃষ্টিতে মেনে নিয়ে শান্তি ক্রয় করে। এক নির্দোষ ছদ্মবেশের অন্তরালে, অবস্থা অনুযায়ী জৈব আকাঙ্ক্ষার দাবী পরিপূরিত হয়। তার ফলে দাবীটাও প্রশমিত হয়। স্বপ্নের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডেরই (dreamwork) প্রধান কাজ হচ্ছে স্পষ্ট যোনি-কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষার উগ্র দাবীর পরিবর্ত হিসাবে নির্দোষ কতগুলি কল্পের ব্যবহার। স্বপ্ন অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি যে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মগোপন করে, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সংক্ষেপীকরণ (condensation)। স্থানচ্যুতি (displacement), প্রতীকব্যবহার (symbolism), নাটকীয় (dramatisation) এবং গৌণ পরিবর্তন (secondary elaboration) প্রধান।[৩৭]

কিন্তু ফ্রয়েড্ কি করে তাঁর অভিনব স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পৌঁছলেন এবং এটা যে একটি মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, তারই বা প্রমাণ কি ?

৩৬। "The dream is a compromise between the suppressed and the suppressing tendencies. The nature of such struggle and compromise is shown in the nightmare, which becomes more and more terrifying until the dreamer wakes up. The disguise covering the suppressed wishes break forth into clear consciousness and takes full control of the situation.

Murphy—Historical Introduction to Modern psychology, P. 317

৩৭ Hall. A Primer of Freudian Psychology

ফ্রয়েড্ বললেন যে, অনেক স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ অতিশয় স্পষ্ট। পেট-রোগা ছেলে স্বপ্ন দেখে, রেস্তোরাঁয় গিয়ে, সে বিরিয়ানী পোলাও ও প্যাটিজ্ ডিসের পর ডিস্ সাবাড় কচ্ছে। দরিদ্র ছিন্নমূল রেফিউজী, ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে লাখ-টাকার স্বপ্ন দেখে। এসব ক্ষেত্রে, স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ খুবই স্পষ্ট। দিবা-স্বপ্নের বেলায়ও এ কথা সত্য। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাপূরণ এরকম সোজাসুজি প্রায়ই হয় না। তা হয় কতগুলি প্রতীকের সাহায্যে। বিপিন বাবু স্বপ্ন দেখলেন, তার ধনী বাল্য বন্ধু (যাঁর নিকট থেকে সর্বদা সাহায্য পেয়ে থাকেন) নিখিলেশ মৃত্যুশয্যায়। আত্মীয়স্বজন তাকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে এবং তিনি বন্ধুকে তাঁর দামী মোটরে করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। পথে মোটরটা এক নির্জন জঙ্গলের কাছে এক খাদে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, এবং নিখিলেশ বাবুকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি মোটরটা মেরামত করছেন, এমন সময় দেখলেন মোটর থেকে একটা শিকল উঠে তার গলায় ফাঁসির মত চেপে ধরল। চেষ্টা করেও তা খুলতে পারলেন না। যেই মোটরে উঠতে যাবেন·· এমন সময় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বন্ধুর অসুখ বা অন্তর্ধান, তার দামী মোটরে বেড়ানো (বাস্তবিক পক্ষে নিখিলেশ বাবুর কোন মোটর ছিল না) ইত্যাদি স্বপ্ন বিপিনবাবু কয়েক দিনই দেখলেন। এ স্বপ্নে তিনি মনে মনে কিছু অস্বস্তি বোধ করলেন, এবং অবশেষে পরিচিত একজন মনোবিকলন-বিশারদ ডাক্তারের কাছে গিয়ে তাঁর স্বপ্নবিবরণ বললেন। মনোবিদ্ প্রশ্নাদির পর যে তথ্যগুলি জানতে পারলেন তা এই—নিখিলেশ বিপিনবাবুর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। বিপিন বাবুর সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। স্ত্রী রুগ্না। নিখিলেশ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুখী, উদার-হৃদয় ধনী বন্ধু। নিখিলেশের স্ত্রী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। দুই বন্ধুর মধ্যে উদার প্রীতি থাকলেও প্রাচীনপন্থী নিখিলেশ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিপিনের পরিচয় করিয়ে দেন নি। কয়েকদিন ধরে বিপিন বাবুকে আরামে শুইয়ে ডাক্তার বাবু বিপিন বাবুর (অনেক সময় অসংলগ্ন বিবরণ থেকে) স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে, এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন (১) বিপিন বাবুর অবচেতন মনে নিখিলেশের সম্বন্ধে ঈর্ষা ও বিরূপতা আছে, তার মৃত্যুশয্যার স্বপ্ন বন্ধুর মৃত্যু আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক। (২) বিপিন বাবুর নির্জ্জান মনে এই নিষ্ঠুর ইচ্ছা আছে, যে তার বন্ধু বান্ধবদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিখিলেশ কেবলমাত্র তার উপরই নির্ভর করুক। তাঁর অসুখী সাংসারিক জীবন

ও রুগ্নাপত্নীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক লোহার শিকলের ফাঁস। (৪) নিখিলেশের স্ত্রীর প্রতীক, দামী মোটর গাড়ী। তা চুরমার হওয়া, তাঁর বৈধব্য কামনার প্রতীক। (৫) জঙ্গল ও খাদ যোনির প্রতীক। (৬) মোটর মেরামত, এবং তাতে আরোহন, বন্ধুপত্নীর বৈধব্য মোচন এবং তাঁর স্বামীত্ব লাভের প্রতীক। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নের প্রতীকগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ যৌনাকাজ্ক্ষার দ্যোতক, যদিও ব্যক্তি নিজের কাছেও এরূপ আকাজ্ক্ষার অস্তিত্ব স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। নীচে একটি স্বপ্নকাহিনী এবং তার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যাক্। এক অবিবাহিতা মহিলা স্বপ্ন দেখলেন, যে তাঁর একটি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, এবং তিনি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেই অবাক হচ্ছেন, যে তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর মনে কোন দুঃখ বোধ হল না। অভিজ্ঞ মনোবিকলন-বিশারদ এ স্বপ্ন বিশ্লেষণ কালে জানলেন, যে ইতিপুর্বে এই মহিলার আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, এই মহিলা যাঁর প্রণয়াকাজ্ক্ষিনী। কাজেই, এই বর্তমান স্বপ্নের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে মহিলা তাঁর প্রণয়ীর সঙ্গ কামনা কচ্ছেন। তাঁর আশা যে এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির মৃত্যু হলেও, আবার তাঁর প্রণয়ী উপস্থিত হবেন। ফ্রয়েড তাঁর প্রসিদ্ধ Interpretation of Dreams গ্রন্থে বহু স্বপ্নের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে সেই বইয়ের ১৯৯ পৃষ্ঠায় যে স্বপ্ন ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন তা দ্রষ্টব্য। Dr. A. A. Brill তাঁর Psychoanalysis গ্রন্থেও বহু স্বপ্নের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে তাঁর বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠায় যে স্বপ্নটির কথা বিশ্লেষণ করেছেন তা যেমনই হৃদয়গ্রাহী তেমনই শিক্ষাপ্রদ। Wilhelm Stekel এর How to understand your dream, পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট তথ্যবহুল।

ফ্রয়েড্ বহু শত স্বপ্ন কাহিনী, মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন, যে স্বপ্ন নিরর্থক নয়। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে, এ প্রশ্ন করলেন, কেন একজন মানুষ, এক বিশেষ জাতীয় স্বপ্নই দেখে? কেন সে অন্য স্বপ্ন দেখে না? কেউ কেউ বেশী স্বপ্ন দেখে চোরের, কারও বেশীর ভাগ স্বপ্ন খাওয়া সম্বন্ধীয়, কারও সমুদ্রে সাঁতার কাটার, কারও বা দাঙ্গাহাঙ্গামার বা মৃত্যুর। তিনি বুঝলেন, যে এই স্বপ্নগুলি নিশ্চয়ই ব্যক্তির কোন প্রয়োজন

মেটায়। অনেক স্বপ্নের মধ্যেই ব্যক্তির বর্তমান জীবনের কোন সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কাজেই তিনি বুঝলেন স্বপ্নকে বুঝতে হলে ব্যক্তির জীবনের আরো গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, যে বাল্যের বা শৈশবের অনেক বিস্মৃত ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে মুক্তি পায়। হয়তো বা পিতা বা মাতার প্রতি গভীর অভিমান, তাঁদের মৃত্যু বা ভয়ংকর দুর্ঘটনার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রূপ পায়। তিনি আরো দেখলেন, স্বপ্নের মধ্যে কতগুলি চিহ্ন প্রায়ই দেখা যায়, এরা এক এক জন মানুষের কাছে, এক এক রকমের চিহ্ন প্রতীকরূপে কাজ করে। এরকম সমস্ত স্বপ্ন চিহ্নের পরস্পর তুলনা ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন, যে স্বপ্নের চিহ্নগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনাকাঙ্ক্ষারই ছদ্মবেশী প্রতীক। অবশ্য যৌনাকাঙ্ক্ষা (sex) কথাটি ফ্রয়েড্ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি—জীবনের মূল শক্তিই হচ্ছে কাম (sex)। শিশু যে মাকে ভালবাসে, তাকে জড়িয়ে ধরে, আদর চায়, চুমু খায়,—তা এই কামেরই প্রকাশ। অবশ্যই শিশু এসব ক্রিয়ার যৌনতাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন না। কিন্তু পিতামাতা, ভাইবোন আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ভালবাসা আদরের মধ্য দিয়েই তার স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষার সহজ পরিতৃপ্তি ঘটে। কিন্তু যেখানে শিশুর এই স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না, সে অসুখী হয়—তার অবচেতন মনে অতৃপ্তি পুঞ্জীভূত হয়। আনা ফ্রয়েড্ এবং অন্যান্য শিশু মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, যেসব শিশুর পিতা বা মাতা অকালে মারা গিয়েছেন, যে সব শিশু অবাঞ্ছিত, যে সব শিশু জারজ, পরিত্যক্ত, যে শিশুর পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও বিশ্বাসের সুন্দর সম্পর্কের অভাব, তারাই বেশীর ভাগ অসুস্থ মন নিয়ে গড়ে ওঠে, এবং এরা কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খোঁজে। এবং এই সব শিশু যে নিরাপত্তা বোধের অভাব বোধ করে, তা তাদের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ সুস্থ শিশুদের তুলনায় এরা দুঃস্বপ্ন দেখে বেশী ভয় পায়।

ফ্রয়েডপন্থীদের মতে ব্যক্তির স্বপ্নবিশ্লেষণ তার মানসিক বিকারের মূল অনুসন্ধানের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এবং মনোবিকলন (Psychoanalysis) পদ্ধতি দ্বারা রোগের মূল আবিষ্কৃত হলে, মানসিক রোগের চিকিৎসা সহজ হয়। অত্র ব্যাখ্যাকল্পে মনোবিকলন পদ্ধতি কি, অতি সংক্ষেপে তা

একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মনোবিদের ভাষায় সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। "ফ্রয়েডের মতে, মানসিক বিকারের সফল চিকিৎসার একমাত্র উপায় হল, রোগীর মনের কোন গভীর অন্ধকারে পৌঁছে, সেখানে রয়েছে রোগের মূল। রোগীকে সম্মোহিত করার পরিবর্তে, ফ্রয়েড তাকে আরামে শুইয়ে মন শান্ত করে, যা তার মনে আসে, অবাধে তাকে তা নির্ভয়ে বলে যেতে উৎসাহ দিতেন। মুক্ত অনুষঙ্গের (free association) টানে, রোগীর মনে যে স্মৃতি, যে ভাব উদয় হয়, তাতে কোন বাধা দেওয়া হয় না। ডাক্তার শুধু এ দিকে দৃষ্টি রাখেন, যাতে রোগীর চিন্তা তার ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কিতই শুধু হয়, অন্য দিকে ছড়িয়ে না পড়ে। এ শাসন ও নিয়ন্ত্রণটুকু ছাড়া, রোগীর মনে যে কথা আসে, যে স্মৃতি উদয় হয়, তা যতই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, হাস্যকর বা অসঙ্গত, এমন কি অশ্লীল হউক না কেন—অসংকোচে তা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হয়। ফ্রয়েড সাধারণত রোগীকে তার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে বলেন। মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী দ্বারা অনুভূতি বিশ্লেষণ করে, সেই কথার অন্তর্গত প্রত্যেকটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানকে কেন্দ্র করে, সে সম্পর্কে রোগীর মনকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে দিয়ে তিনি রোগীর মনে মুক্ত তাৎপর্যপূর্ণ কোন ঘটনা লক্ষ্য করেন। এভাবে, রোগীর সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎকারের পর, তিনি দেখতে পেলেন, রোগীর বাল্যকালের কোন কোন স্মৃতি ও মনোভাব (যেমন পুরুষ রোগীর বেলায় মায়ের প্রতি গভীর টান, এবং পিতার প্রতি বিরূপতার কথা) মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এই খণ্ড খণ্ড স্মৃতির সম্বন্ধে, বারে বারে আলোচনার পরে দেখা গেল, রোগী তার বাল্যজীবনের কতগুলি আবেগপূর্ণ ভূমিকা পুনঃ-সঞ্চারিত করছে। শৈশবে পিতার প্রতি তার জটিল মনোভাব (তার প্রতি ভালবাসা এবং নির্ভরতা, আবার তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) এবার চিকিৎসকের প্রতি অর্পিত হয়। এর কারণ, মনোবিকলনকারী চিকিৎসকই এখন পিতার স্থলবর্তী। রোগীর আবেগপূর্ণ অনুভূতির এই স্থানান্তরণ রোগীর আরোগ্যের একটি পূর্ব লক্ষণ। যে গোপন মনোভাব রোগীর অবচেতন মনে 'আবদ্ধ' (fixated) হয়েছিল, বোঝা যায়, তার মূল শিথিল হয়ে তা সচল হয়েছে। যখন রোগীর মনের

আবদ্ধ আবেগ ডাক্তারে স্থানান্তরিত হয়, তার পরবর্তী চিকিৎসার স্তর হ'ল রোগীকে রোগের মূল সম্পর্কে সচেতন করে, ডাক্তারের উপর নির্ভর না করে, নিজের নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের উপর নিতে উদ্যোগী করে তোলা।" ৩৮-৩৯

মনোবিজ্ঞানের একটা স্তরে, রোগী বা রোগিনী তার গোপন প্রেমপাত্রের বিকল্প হিসাবে ডাক্তারের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়, এটা ফ্রয়েডের সহকর্মী ব্রয়ার (Bruer) প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন। এক হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগিণীর চিকিৎসার সাফল্যের মুখে সে ব্রয়ারের প্রতি নির্লজ্জভাবে অনুরক্ত হল। বিব্রত হয়ে ব্রয়ার মানসিক রোগের এ নূতন চিকিৎসার পথ ছেড়ে দিলেন। ফ্রয়েড ও একাধিক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন এতে বিচলিত না হয়ে, এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে সম্মোহন (hypnotism) অথবা মুক্ত অনুসঙ্গপ্রণালী ব্যবহারে রোগীর গোপন ও অবদমিত (repressed) আকাজ্ক্ষা যখন সচেতন মনে মুক্তি পায়, তখন স্বভাবতঃই সেই আকাজ্ক্ষার উপযুক্ত প্রেম-বস্তুতে (love object) তার পরিপূরণ খোঁজে। সহৃদয় ডাক্তারকেই সেই আকাজ্ক্ষিত প্রেমপাত্রের বিকল্প হিসাব কাছে পেয়ে, রোগী বা রোগিনী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক আবেগহীন নৈর্বক্তিকতা (impersonal attitude without emotional complications) রক্ষা করে চললে, শীগ্গীরই রোগী নিজেকে সংবরণ করে স্বীয় যুক্তিবিচার দ্বারা, নিজের অবস্থা বিবেচনা করতে পারে, এবং নিজের ভার নিজেই নিতে সমর্থ হয়।৪০ ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন অবচেতন মনের বিকারের দুষ্ট অবস্থার স্বাভাবিক রেচনের (catharsis) একটি নির্দোষ নিরাপদ উপায়।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব তাঁর অনুগামীরা অনেকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। এবং তাঁরা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন প্রণালীরও নানা পরিবর্তন করেছেন। তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই একমত যে স্বপ্ন নিরর্থক নয়, ইহা ব্যক্তির অবচেতন মনের অমীমাংসিত সংঘর্ষের পরিচয় বহন করে। একথাও

৩৮। Woodworth & Marquis—Psychology, P. 389

৩৯। Freud—A general introduction to Psycho-analysis

৪০। Woodworth—Contemporary Schools of Psychology. P. 13

স্বীকৃত যে, স্বপ্ন অনেক সময় ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের উপায়, ইহা তার অন্তরের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে সহায়ক। কিন্তু ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা সর্বদাই যোনি-কেন্দ্রিক, এবং স্বপ্ন ব্যক্তির বাল্যের কোন অমীমাংসিত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, এই দুইটি বিষয়ে অনেকই ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত নন। ফ্রয়েডের স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেছেন, "সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত কচ্ছি, যে ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যার সূত্র বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন,—বিশেষতঃ মানসিক যারা অসুস্থ, তাদের স্বপ্ন সম্বন্ধে সত্য হতে পারে, এবং কখনও কখনও যোনি বা যোনি-ক্রিয়া স্বপ্নে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে; কিন্তু সমস্ত স্বপ্নই যৌন-ইচ্ছার পরিপূরণ, এমন ব্যাখ্যা করবার মত উপযুক্ত প্রমাণ নেই। স্বপ্ন ও মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে, ফ্রয়েডের ব্যাখ্যার ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এতে বড় সহজে, যা কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র সত্য, তা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।[৪১] ফ্রয়েডের নিজ্ঞান মন ও অবদমন সম্পর্কে জোড্ বলেছেন" যে ফ্রয়েড্ অবচেতন মনের ত্রিতল হর্ম্যের যে ধারণা করেছেন এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে হর্ম্যের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অন্ধকারে শৃংখলিত কুৎসিৎ প্রাণীর হিসাবে যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন তা অতি মাত্রায় নাটকীয় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই নাটকীয় ধারণাকে খুব উচ্চ মূল্য দেওয়া চলে না।[৪২]

ফ্রয়েডের অনুগামীদের মধ্যে য়্যুঙ্গ (Jung), এ্যাড্‌লার (Adler) ও আর্নেষ্ট জোন্‌সের (Ernest Jones) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই স্বপ্ন ব্যাখ্যায় এবং মানসিকবিকারের মূল হিসাবে কামাকাঙ্ক্ষার অবদমনের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু সকলেই মনে করেন যে ফ্রয়েড্

৪১। McDougall—An outline of Abnormal Psychology, P. 186-87

৪২। The notion...of an unconscious as a kind of underground dungeon, in which repressed desires remain imprisoned, awaiting a means of escape, is far too dramatic to be accepted even as a symbolic representation of what occurs. When we temporarily forget a desire which subsequently recurs, we have no more ground for supposing, that it has somehow somewhere persisted all the time, than to use a simile of Ogden's, we have for regarding, "the return of spring each year as a proof that she has been lurking underground all the winter."

Joad—The Mind and it Workings, P. 77-87

কামকে জীবনের একমাত্র মৌলশক্তি হিসাবে গ্রহণ করে, একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং বাল্যের কোন অবদমিত ইচ্ছাই মানসিক রোগের কারণ, এটা তারা স্বীকার করেন নি। এ্যাড্‌লার মনে করে, সাধারণ মানুষের উদ্যমের পিছনে আছে হীনমন্যতা—Inferiority complex। প্রত্যেক মানুষ এই হীনতাবোধ অতিক্রম করে বা আবরণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, এবং নিজের কাছেও আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি অক্ষম ও দুর্বল মনের অধিকারী, সে নিজের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে, এমন একটি জীবন ধারায় (style of life) অভ্যস্ত হয়, যা তা অক্ষমতার অজুহাত হিসাবে সে ব্যবহার করতে পারে। সে অসুস্থতার অভিনয় করে। বাস্তব পরিবেশ তার উপর যে দাবী করে, তা এড়াবার উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি বাইরের কোন অসুবিধার অজুহাত সৃষ্টি করে, অথবা কোন ব্যাধি বা মানসিক বিকার কল্পনা করে এবং তার অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে, নিজের অহমিকাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে।[৪৩] তার স্বপ্নের মধ্যে তার এই আত্মরক্ষার চেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায়।[৪৪] ব্যক্তি তার অহমিকা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে, অবচেতন ভাব যে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে, তার সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছেন আর্নেষ্ট্ জোনস্। তিনি এদের নাম দিয়েছেন Ego-defense mechanisms। এদের মধ্যে একটি অতি পরিচিত কৌশল হচ্ছে **র‍্যাশনালাইজেশন Rationalisation**। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের কোন পাপ বা অপরাধকে ঢাকবার জন্যে, নিজের মনের কাছেও, সেই কাজের সমর্থনে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করে। যেমন মনিবের টাকা চুরি করেছি। কাজটা নিঃসন্দেহেই অন্যায়। কিন্তু নিজের মনকে বোঝাই, ব্যাটা আমার মত অনেক গরীবলোককে ঠকিয়েই টাকা করেছে, ওর দুশো টাকা মারলে অন্যায় কিছুই নেই। তা ছাড়া হয়তো ব্যাটা মদ খেয়েই এ টাকা ওড়াতো। এ টাকা আমি বরং সদ্ব্যয় করেছি, ছেলেমেয়েদের জামা কাপড়ের জন্যে।[৪৫] স্বপ্নেও এ জাতীয় নিজের মনকে চোখ ঠারার চেষ্টা চলে।

সাম্প্রতিক কালে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলেছে।

---

৪৩ Flugel—A Hundred years of Psychology P. 173.

৪৪ Adler—Individual Psychology

৪৫ এ বিষয়ে এবং ফ্রয়েড ও মানসিক বিকার সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য অধ্যাপক গুহের মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় (under strict laboratory conditions), ভেষজ ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে গভীর ঘুম সৃষ্টি করে, স্বপ্ন সম্বন্ধে কতগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হচ্ছে—যথা, সব মানুষই কি স্বপ্ন দেখে? স্বপ্নহীন গভীর ঘুম হয় কিনা? বহু পরীক্ষার পর, অধিকাংশ মনোবিদের সিদ্ধান্ত, যে আমরা সকলেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি—এবং প্রত্যহই স্বপ্ন দেখি। কোন কোন মানুষ গর্ব করে বলেন, যে তাঁদের একঘুমে রাত কেটে যায়, স্বপ্ন টপ্নের বালাই তাঁদের নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, স্বপ্ন দেখেন না বলে যাঁরা গর্ব করেন, তাঁরা রোজই স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু তা ভুলে যান। স্বপ্নের মধ্যে তাঁদের অন্তরের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে মিটে যায়, অবচেতন মনের সমস্ত সমস্যারই নগদ নগদ সমাধান হয়ে যায়, তাই স্বপ্নের কোন স্মৃতি তাঁদের মনের মধ্যে থাকে না। আর একটি প্রশ্ন হ'ল রাত্রে ক'বার আমরা স্বপ্ন দেখি? পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ আছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে, বলা যায় যে, একজন সুস্থ মানুষ প্রতি রাত্রিতে ছ'বার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে কি রং দেখা যায়? না, তা শুধুই সাদায় কালোয়? এ বিষয়ে পরীক্ষার ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় নাই। স্বপ্নের স্থায়িত্ব কতক্ষণ ব্যাপী? এ বিষয়ে এক পরীক্ষার ফলে এক মনোবিদ্ কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে পৌছেচেন। তাঁর মতে, রাত্রি যত গভীর হতে থাকে, স্বপ্ন ততই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। শেষ রাত্রের দিকে, ঘুমও পাৎলা হতে থাকে, স্বপ্নও ক্রমশঃ ক্ষণস্থায়ী হতে থাকে। এই পরীক্ষার সূত্র ধরেই, আর এক বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করলেন যে, ফ্রয়েড বলেছিলেন, স্বপ্ন ঘুমের পোষক dream is the guardian of sleep, বরং বিপরীত ভাবেই বলা উচিত, ঘুমই স্বপ্নের পোষক। তবে বর্তমান পরীক্ষার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন, স্বপ্নে ব্যক্তির কোন না কোন অপূর্ণ ইচ্ছা পরিপূরিত হয়, অথবা ব্যক্তির জীবনে কোন অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে অচেতন মন চেষ্টিত হয়।[৪৩]

দিবাস্বপ্ন অলস কল্পনা—Day dream, Phantasy—স্বপ্নের মধ্যে কল্পনার যে খেলা, তা ব্যক্তির সচেতন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

৪৩ Hall.—The meaning of Dreams.

তবে তা ব্যক্তির অবচেতন মানসের কোন ইচ্ছা মেটায়—কোন দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা করে। এটা ঘটে ঘুমের মধ্যে ; কিন্তু দিবাস্বপ্ন ব্যক্তির জাগ্রত সচেতন মনের ক্রিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূঢ় জগতের আঘাত, অভাব, নিরাশা ভুলবার জন্যে, ব্যক্তির এই ছেলে-খেলা। ফ্রয়েড্ তাই এ জাতীয় ক্রিয়াকে, বাস্তবজগতের আঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে, পলায়নী মনোবৃত্তি (escape from the Reality Principle বলেছেন। ফ্রয়েডের মতে, এ একপ্রকার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা (compensation)। বাস্তবজগতে যে অভাব ও বঞ্চনার দুঃখ ব্যক্তি ভোগ করে, রঙীন কল্পনার জাল বুনে (phantasy), ব্যক্তি যে দুঃখের ক্ষতিপূরণ করে, অন্তরের ক্ষতে প্রলেপ লাগায়। ফ্রয়েড্ মনে করেন, সমস্ত কাব্য ও দর্শনের মূলে এই পলায়নী বৃত্তি। তাই এদের এত আকর্ষণ। এখানেও অবচেতন মনের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এ পরিতৃপ্তি ইন্দ্রিয়ের স্তর অতিক্রম করে উর্ধ্বতর স্তরে। এখানে ঘটেছে মৌল কামাকাঙ্ক্ষার উদ্গতি (sublimation)।[৪৪] দিবাস্বপ্ন ও অলস কল্পনা আপাতমধুর এবং আশাহত মানুষের জীবনে এরও কিছু প্রয়োজনও আছে। কিন্তু ব্যক্তিও জানে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে এ অক্ষম। ছাত্ররা যাতে এই অলস কল্পনার দাস না হয় সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত দিবাস্বপ্নপ্রবণতা দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ।

কয়েকটি মানসিক বিকার ও তাদের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা—

মানস বিকারগুলিকে দুইটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়,—**নিউরোসিস্** (**neurosis**) ও **সাইকোসিস্** (**psychosis**)। নিউরোসিস্ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সাইকোসিসে রোগের মূল গভীরতর।

ঝানে (Janet) প্রথম এ ইঙ্গিত করেছিলেন যে চেতন-মানস হতে আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়ে (dissociation) মানসিক বিকার সৃষ্টি করে, কিন্তু কেন এই বিচ্ছেদ ঘটে, তার সুব্যাখ্যা প্রথম ফ্রয়েড্ই দেন। তিনি বলেন, বাল্যকালেই কতগুলি স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হওয়ার ফলে, অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে। এদের স্বাভাবিক ভাবে এবং নির্দোষ ভাবে মুক্তির ব্যবস্থার পথ রুদ্ধ হলে, এরা ব্যক্তির মানসস্রোতের সচেতন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজস্ব একটি

৪৪ Freud—Wit and its relation to the Unconscious.

গোপন জগৎ সৃষ্টি করে। এদের মুক্তির পথে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হলে, এরা অবচেতন মনে জটিল জাল (complexes) সৃষ্টি করে, এবং এরা কতগুলি অমূলক বিশ্বাস, আবেগ ইত্যাদির কোষে আবদ্ধ হয়ে, নিজস্ব সত্তা ও বেগ আয়ত্ত করে। সুতরাং, সমস্ত মানসিক বিকারের চিকিৎসায়ই বিচ্ছিন্নতার মূল আবিষ্কার করে অবচেতন মনের জটিল জালের বন্ধন-মুক্ত করে, অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে চেতন মানসজীবনে স্বচ্ছন্দ মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। ইহা বহু সময় ও ধৈর্য সাপেক্ষ।[৪৫] যে মনোবিকলন ((Psycho-analysis) পদ্ধতির দ্বারা এ প্রকার রোগ নির্ণয়, বা তার চিকিৎসা সম্ভব, তা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের দ্বারাই সম্ভবপর।

নিউরোসিস্‌গুলিকে সাধারণতঃ তিন দলে ভাগ করা হয়—

(১) **নিউর‍্যাস্‌থেনিয়া—Neurasthenia**—এর মূলগত অর্থ স্নায়বিক দুর্বলতা। এ সব রোগীদের উপসর্গ,—কাজে অনিচ্ছা, মাথাধরা, পিঠব্যথা, দুর্বলতা। এ সব রোগীদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন, জীবনে কোন জীবন্ত আগ্রহের কেন্দ্র সৃষ্টি করা (২) **সাইকেস্‌থেনিয়া—Psychasthenia**—এর মূলগত অর্থ, মানসিক অবসন্নতা (mental exhaustion)। কোন বিষয়ে মন স্থির করতে না পারা (the grasshopper mind), শুচিবাই, মুদ্রাদোষ, অকারণ দুশ্চিন্তা, প্রয়োজন না থাকলেও চুরি করবার ইচ্ছা (kleptomania), এ সব এই মানসিক রোগের উপসর্গ। এর পেছনে আছে, ব্যক্তির নিজ পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে চলবার অক্ষমতা। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মনঃসমীক্ষণ দ্বারা রোগী নিরাময় হয়। ওষুধ হিসাবে Eqanil, Largactil উপকারী। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত এ সব ঔষধ ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত। এ সব রোগীদের পক্ষে সুনিদ্রা বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য এ সব রোগে সাধারণতঃ রোগীকে কিছু মৃদু ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন করলে, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কাজেই রোগীর নাগালের মধ্যে এ সব ওষুধ রাখা নিরাপদ নয়।

হিষ্টিরিয়া—Hysteria—এ অনেক প্রকারের আছে। তবে এর যে রূপের সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত, তা হচ্ছে যে ব্যক্তি হাসি, কান্না, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভের প্রকাশ বন্ধ করতে পারে না,—হাসতে হাসতে বা কাঁদতে

[৪৫] Freud—An Introduction to Psycho-analysis

কাঁদতে অবসন্ন হয়ে পড়লেও, থামতে পারে না। গুরুতর ক্ষেত্রে,—হাত পা খিঁচুনী, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠা, চেতনালোপ ইত্যাদি ঘটে। এর পিছনে দৈহিক কারণ অবশ্য থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির বিষম আতংককর শব্দ (shell shock) ইত্যাদির ফলে হিষ্টিরিয়া দেখা দিতে পারে। এবং ব্যক্তি সাময়িক-ভাবে বা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অবশাঙ্গ (paralysed) হয়ে যেতে পারে। দৈহিক কারণ ছাড়াও, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন না কোন মানসিক কারণ বর্তমান থাকে। ব্যক্তির মনে গভীর কোন প্রক্ষোভ উপস্থিত হয়ে, তার স্বাভাবিক প্রকাশের পথ বারে বারে রুদ্ধ হলে, হিষ্টিরিয়া দেখা দেয়। ভয়, ক্রোধ ও কাম মানুষের প্রধান প্রক্ষোভ,—মেয়েদের পক্ষে তার কোনটিরই স্বাভাবিক প্রকাশের পথ সহজ নয়। তারা বাধ্য হয়েই চাপা প্রকৃতির। কিন্তু এই আত্মাবদমন অবচেতন মনে অস্বস্তি (tension) সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির সহের বা আত্মশাসনের শক্তির সীমা অতিক্রম করলে, তখন তাদের প্রকাশ, মাত্রাতিরিক্ত ভাবে হাসি, কান্না, আদরের মধ্য দিয়ে দেখা দেয়—এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই অবরুদ্ধ আবেশ কেটে পড়ে (release of tension)। হিষ্টিরিয়া রোগীরা অত্যন্ত অভিভাবন-পরায়ণ (suggestible)। এদের নিজস্ব ত্রুটি বা দুর্বলতা স্বয়ং সৃষ্ট শারীরিক রোগের লক্ষণ দিয়ে এরা চাপা দিতে চায়। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাও (দাঙ্গার সময় ভয়ে ভয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকা, চীৎকার করবারও উপায় নেই) কখনো কখনো হিষ্টিরিয়ার কারণ।[৪৬]

হিষ্টিরিয়াকে তিন দলে ভাগ করা হয় **এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়া, কন্‌ভার্সন হিষ্টিরিয়া ও ট্রমাটিক হিষ্টিরিয়া।**

সাইকোসিস্ গুলির কারণ, হয় মস্তিষ্কের **স্নায়ুপদার্থের বিকার (structural disorder)** অথবা **মানসক্রিয়ার বিকার (functional disorders)**। প্রথম জাতীয় সাইকোসিসের চিকিৎসা দুঃসাধ্য। এই দলের মধ্যে আছে **প্যারেসিস্।** সিফিলিস্ বিষে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে এ ভয়ানক রোগ ঘটে। রোগীর কতগুলি ক্রিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হয়, কতগুলি ক্রিয়ার উপর বশ থাকে না, কথা জড়িয়ে যায়, চলতে গেলে মাতালের মত টলে—মাথাটা দুলতে থাকে। কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করে, বা মাদক ভেষজ দিয়ে সাময়িক চিকিৎসা করা হয়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে

৪৬ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য গুহ 'মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার' পুস্তক দেখ।

মস্তিষ্কের রুগ্ন অংশ অস্ত্রোপচার করে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অল্পদিনের মধ্যে রোগী মারা যায়।

সেনাইল্ ও এ্যালকোহলিক্ সাইকোসিস্—ইহা বার্ধক্য-জনিত মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ক্ষয়, অথবা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কে বিষ সঞ্চারের ফলে ঘটে। এসব রোগীর স্মৃতিবিভ্রম (aphasia) ঘটে, অথবা মিথ্যাস্মৃতি (false memory) আয়ত্ত হয়। নানা প্রকারের ভ্রান্তি (delusions of persecution, delusions of grandeur etc) দেখা দেয়। এরও সহজ চিকিৎসা নেই।

ফ্যাংশ্যন্যাল সাইকোসিসের মধ্যে (১) ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্—Manic-depressive Psychosis—উন্মাদদের মধ্যে কিছুকে দেখা যায়, তারা হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত (manic) আবার কখনও নিতান্ত অবসন্ন (depressive)। ম্যানিক্ অবস্থায় রোগী বিষম চীৎকার করে, কুৎসিৎ গালাগালি করে, অনবরত হাত পা ছোঁড়ে, নাচে, গান গায়, জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে। আবার ডিপ্রেসিভ্ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অনুতপ্ত হয়,—কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না, কখনো বা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে। এরা নিজেদের কল্পিত হাসিকান্নার জগতে বাস করে।

সিজোফ্রেনিয়া—Schizophrenia—এর ধাতুগত অর্থ মনের বিভিন্ন অংশে ভাগ হয়ে যাওয়া (splitting of the mind)। পূর্বে এ অবস্থাগুলিকে ডিমেন্‌সিয়া প্রেকক্স **(Dementia Praecox)** বলা হত।—এর অর্থ যৌবনে উন্মাদ রোগ। সাধারণতঃ যৌবনেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ বিকার নানা প্রকারের :

১। **সাধারণ সিজোফ্রেনিয়া— Simple Shizophrenia**— এই বিকারে রোগী সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারায়। এরা মানুষের সঙ্গ এড়ায়, সর্বদা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ। পৃথিবীর সব কিছু থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নিজেদেরই ভিতরে (withdrawal) লুকিয়ে থাকতে চায়।

২। **হেবিফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া—Hebephrenic Schizophrenia**—এ রোগীরা বোকার মত হাসে, কাঁদে, কাপড় চোপর খুলে ফেলে। সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন। এদের কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি ও

বিবেচনার অভাব দেখা যায়। যদি বলা হয় 'তোমার মা কাল মারা গেছেন',—তবে হয়তো রোগী হা হা করে হাসতে থাকে।

৩। ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া—Catatonic Schizophrenia—এই রোগীদের মধ্যে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা যায়। এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মোম দিয়ে গড়া (waxy flexility); একভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। হাতখানা একভাবে বাঁকিয়ে দিলে, সে ভাবেই নিশ্চল ভাবে অপেক্ষা করে। কথা হয়তো বলে না, কয়েকমাস ধরেই। কোন কিছু করতে বললে, তা করবে না, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় খাবে কিনা, অমনি উত্তর দিবে, 'না' (Negativism)। বাইরের জগৎ এদের কাছে প্রায় অবলুপ্ত,—এরা নিজের মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রাখে (shut in, encapsulated)।

৪। প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া—Paranoid Schizophrenia—এই জাতীয় রোগীরাই মনোবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে বেশী। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তির মধ্যে যেন বিভিন্ন সত্তা ক্রিয়া করেছে, এবং এই সত্তার একটির সঙ্গে আর একটির কোন সম্পর্ক নেই। অনেক সময় ব্যক্তি নিজের এই বিভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন; এবং যখন একটি সত্তা ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া করে, তখন অন্য সত্তার স্মৃতিও তার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। এখানে বাস্তবিকই একটি ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ব্যক্তিতে ভেঙ্গে যায়—বাস্তবিকই Splitting of Personality ঘটে! সাহিত্যে ষ্টীভেনসনের মনোমুগ্ধকর ডাঃ জিকেল্ ও মিঃ হাইড্ বইখানা প্রকাশের পরে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে, এ রকম কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতার বাস্তব ঘটনার কথা জানা যায়। প্রত্যেকে ব্যক্তির মধ্যেই বিভিন্ন বিরোধী আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ (universe of desire) ক্রিয়া করে। ব্যক্তি অনেক সময়, পরস্পর বিরোধী নৈতিক তল থেকে (conflicting moral levels) ক্রিয়া করে। কিন্তু তথাপিও সুস্থ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আছে, সমস্ত বিভেদ ও বিরোধিতাকে সমন্বয় করবার শক্তি। বাস্তবিক পক্ষে, এটা সুস্থ ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে, এই একতার সূত্রটি ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির অন্তঃস্থিত বিভিন্ন শক্তি-আকাঙ্ক্ষা-দৃষ্টিভঙ্গীর এক একটি কেন্দ্র, স্বাধীন সত্তা লাভ করে', ব্যক্তিত্বের একতাকে বিপন্ন করে। পূর্বেই বলেছি

ফ্রয়েড্-পন্থীদের মতে সমস্ত মানসবিকারের মূলেই রয়েছে অবচেতন মনে এই বিসঙ্গ (dissociation)। সিজোফ্রেনিয়ার বেলায় এই বিসঙ্গ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। মানসিক রোগের চিকিৎসার বেলায়ও তাই এই বিসঙ্গ দূর করবারই চেষ্টা,—ব্যক্তিত্বের ঐক্যের শক্তিকে উদ্বোধন করবার প্রয়াস।[৪৭]

---

৪৭ মানসিক রোগ সম্পর্কে আলোচনায় নিম্নলিখিত কয়েকখানি বই বিশেষ সহায়ক—

McDougall	Abnormal Psychology
Hart	Psychology of Insanity
Freud	An Introduction to Pychoanalysis ; Psychopathology of Everyday life
Page	Abnormal Psychology
Crow & Crow	Mental Hygiene
Hadfield	Mental Health
Flugel	A Hundred years of Psychology
Shaffer	The Psychology of Adjustment

এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বিভুরঞ্জন গুহের মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাজ শেখা—পড়া শেখা (Learning)

শেখার মানে কি ? শিক্ষা'র সংজ্ঞা—শেখা মানে, নূতন কিছু আয়ত্ত করা,—এই নূতন কিছু, কোন ভাবও (ideas) হতে পারে, আবার কতগুলি কাজের কায়দাও (skill) হতে পারে। নাইট প্রথম জাতীয় শেখাকে 'প্রকৃত শিক্ষা' এবং দ্বিতীয় ধরণের শেখাকে 'অভ্যাস শিক্ষা' বলেছেন।[১] নূতন যা আয়ত্ত করা হয়, তার মূলে আছে পুরাতন অভিজ্ঞতা। পুরাতন অভিজ্ঞতা আমাদের নূতন অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর করে, এবং এই নূতন বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলে, আমাদের পূরাতন অভিজ্ঞতা, ভাব, ধারণা, কর্মকৌশল পরিবর্তিত হয়ে যায়। তা হলে, শেখার সংজ্ঞা হল, অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের ব্যবহারে যে পরিবর্তনের ছাপ লাগে, তাই হল শেখা—"a change in performance with practice' বা "modification of behaviour." শেখা মানে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান,—"profiting by past experience." তাই উড্‌ওয়ার্থ এবং মারকিস্ শেখার সম্বন্ধে বলেন, "শেখা মানে, ব্যক্তির বিদ্যা বা দক্ষতার সঞ্চয়ে, নূতন কিছু যোগ করা। বাইরের দিক থেকে দেখলে, শেখা মানে নূতন কিছু আয়ত্ত করা। সেই নূতন ক্রিয়াটি ব্যক্তির এমন ভাবে আয়ত্ত হওয়া চাই, যেন আবার পরেও সেই ক্রিয়াটি কাজে লাগে।[২] ম্যাকগিয়োক্ শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক, এবং তা কোন আগ্রহ বা প্রয়োজনকে মিটায়, এ কথার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শেখার সংজ্ঞা হল, "অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন। সম্ভবতঃ সব ক্ষেত্রেই এই

১। We must begin by distinguishing two senses of learning habit or motor learning (the sense in which we learn how to swim or to ride a bicycle) and true or ideational learning (the sense in which we learn how an engine works or understand the proof of theorem in geometry). Rex Margaret Knight. A modern introduction to Psychology. P. 127

২। Woodworth & Marquis—Psychology.

পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।[৩] শেখার ফলে ব্যক্তির ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে।

স্বাভাবিক পরিণতি ও চেষ্টাকৃত শেখা—কিন্তু এই পরিবর্তন. বয়সের সঙ্গে স্বাভাবিক পরিণতির (Maturation) ফলে যে পরিবর্তন, তা থেকে পৃথক। প্রথমতঃ, শেখার ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা পরিবেশের প্রভাবে, ব্যক্তির সচেষ্ট ক্রিয়ার ফলেই হয়। স্বাভাবিক পরিণতিতে যে পরিবর্তন, তা আসে ভেতর হতে,—বাইরের প্রভাবে নয়। দ্বিতীয়তঃ, শেখার ফলে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়, যে নূতন জ্ঞানটি আয়ত্ত হয়, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। অভ্যাসের ফলে, বাজনাটি যে আয়ত্ত করল, তা সম্পূর্ণ ভাবেই তার নিজস্ব বিদ্যা। অপরে সেই কৌশলের অধিকারী নাও হতে পারে। কিন্তু ম্যাচুরেশন বা দেহমনের স্বাভাবিক পরিণতির ফলে যে শক্তি সামর্থ্য, বুদ্ধি ও আবেগের প্রকাশ দেখা যায়, তা শুধু একই ব্যক্তির নয়, ঐ জাতির অন্তর্গত সকলের মধ্যেই কম বেশী পরিমাণে তা দেখা যায়।

কিন্তু এই পরিণতির সঙ্গে শেখার অতি নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। সব শেখার পশ্চাতেই থাকে, দেহমনের একটা উপযুক্ত পরিণতি। সব কাজ সব বয়সের জন্য নয়। দুই মাসের শিশুকে দর্শন শাস্ত্র শেখান সম্ভব নয়। তার বুদ্ধি যথেষ্ট পরিণত নয়। তেমনই সাইকেল চালাতেও সে পারবে না। তার পেশী ইত্যাদির উপযুক্ত পুষ্টি চাই। তাই গেসেল বলেন, শেখার পশ্চাতে থাকবে উপযুক্ত দেহ মনের পরিপক্কতা (Maturation)। [৪]

মানুষ যেমন শেখে, পশুরাও তেমনি শেখে। বানর নাচতে শেখে, মানুষের সহজ হাবভাব নকল করতে শেখে। সার্কাসের হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, নানা খেলা শেখে। এমনকি মাছদের মধ্যেও শেখার ব্যাপারটা দেখা যায়। এই সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে, ইতর প্রাণীরাও শেখে।

প্রাণীরা কি করে শেখে? থর্ণডাইকের পরীক্ষা—বস্তুতঃ, থর্ণডাইক

৩। McGeoch—The Psychology of Human Learning.

৪। Gessell—The maturation of infant behaviour. Psycho. Rev. 1930 37, 334-34

প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকেরা প্রথমতঃ পশুদের উপর নানা প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এবং ঐ সব সিদ্ধান্ত মানুষের শেখার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। এর একটি বিজ্ঞান-সম্মত কারণ আছে। মানুষের মন ও ব্যবহার অনেক বেশী জটিল, অনেক বেশী বিচিত্র। কিন্তু পশুর জীবন তুলনায় অনেকটাই সরল ও এক-ধরণের। তাই মনের প্রাথমিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও ব্যবহার জানতে হলে, প্রথম পশুদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সুফল লাভের আশা বেশী। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে যে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা করতেই হবে। কিন্তু ঠিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পশুর 'ব্যবহারকে' বিশ্লেষণ করলে চলবে না। [৫]

বিবিধ পরীক্ষাগুলির ফলে, শেখা সম্বন্ধে যে সব বিভিন্ন মত প্রচলিত হয়, তাদের মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা যায়। (১) সংযোগসূত্র স্থাপন মতবাদ (Connectionism) অথবা থর্ণডাইকের ভুল সংশোধন করে শেখা মতবাদ (Trial and error learning), (২) উদ্দীপকের সাহায্যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি মতবাদ (Conditioned reflex), (৩) সমগ্রতাবাদ বা অন্তর্দৃষ্টির ফলে শেখা মতবাদ (Gestalt or the Field theory of Learning or the theory of Learning by insight). প্রথম মতবাদের সুস্পষ্ট প্রচার করেন থর্ণডাইক ; দ্বিতীয় মতবাদের আবিষ্কর্তা প্যাভ্‌লভ্, এবং বেখ্‌টেরেভ (এই মতবাদ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে)। এবং তৃতীয় মতের সমর্থকদের মধ্যে কোয়হ্‌লার, কফ্‌কা, লিউয়িনের নাম সুপ্রসিদ্ধ।

১। যোগসূত্র স্থাপনের মতবাদ—Connectionism or the bond theory of learning or learning by trial and error— থর্ণডাইক শেখার সরলতম মূল সূত্রটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, যুক্তি বা বুদ্ধি সচেতনভাবে কাজ করে। থর্ণডাইক শিক্ষা ব্যাপারটিকে উচ্চতর অবস্থা দ্বারা নিম্নতর অবস্থার ব্যাখ্যা না করে

৫। In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale.

Lloyd Morgan. An introduction to Comparative Psychology. P. 59

শিক্ষার সরলতম অবস্থার আবিষ্কার করে, ধীরে ধীরে উচ্চতর মানসিক অবস্থার ক্রমবিকাশের দ্বারা ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, ব্যবহারকে বুঝতে হলে, তাহার সরলতম বা মৌলিক অবস্থাকে প্রথম বুঝতে হবে। তার পর কি ভাবে ঐ প্রক্রিয়াগুলি সংযুক্ত হয়ে জটিলতর হয়ে উঠে, তা আলোচনার বিষয় হবে। এই কারণে তিনি ইতর প্রাণীর স্তর থেকে শেখার প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেন, এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ 'শেখা' সমস্যাটি মনোবিজ্ঞানে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে, থর্ণডাইকের ১৯১১ সালে 'Animal intelligence' পুস্তকটি প্রকাশনার পরেই।

থর্ণডাইক ক্ষুধার্ত বিড়াল, কুকুর ও মুরগীর উপর অনেক পরীক্ষা করেন। ক্ষুধার্ত বিড়ালের উপর পরীক্ষাটিই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি বিশেষ ধরণের খাঁচাতে (puzzle box) আটকে রাখা হয়। বিড়ালটি দেখতে পায়, এমন জায়গায় খাঁচার বাইরে খাদ্য রাখা হয়। খাঁচার দরজাটা একটা সহজ ছিটকিনি দিয়ে বা দড়ি দিয়ে আটকান। বিড়ালটি প্রথমে এলোপাথারী ভাবে খাঁচা থেকে বের হয়ে আসবার জন্যে চেষ্টা সুরু করে। আঁচড় কামড়, ছুটাছুটি, গর্জন, খাঁচার ভিতর দিয়ে পা গলান, ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবহারই দেখা দিল। হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে, একবার থাবা দিয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলল, এবং বের হয়ে এলো।[৬] ওকে সামান্য একটু খাদ্য দেওয়া হল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার খাঁচায় পোরা হল। এই ভাবে, অনেক বারই তাকে খাঁচায় বন্দী করা হয়। প্রতিবারই একই ধরণের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু ক্রমশঃ ঐ এলোপাথারী আঁচড় ও কামড় কমে আসতে লাগল, এবং শেষে বিড়ালটি খাঁচায় পুরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, দরজাটি খুলে বের হতে সক্ষম হল। সাধারণতঃ, একটি বিড়াল ২০ থেকে ২৫ বার চেষ্টার ফলে, বের হয়ে আসতে পারে, এবং এতে প্রায় ঘণ্টাটাক্ সময় লাগে, দেখা গিয়েছে। নীচে

৬। The cat shows evident signs of discomfort and an impulse to escape from confinement. It tries to squeeze through any opening ; it claws and bites at the bars or wire ; it thrusts its paws out through any opening and claws at every thing it reaches ; it continues its efforts when it strikes any thing loose or shaky ; it may claw at thing within the box. Thorndike. Animal intelligence P. 35

প্রতিবারের পরীক্ষায় (trial) কতটা করে সময় লেগেছে তার একটি রেখাচিত্র দেওয়া গেল।

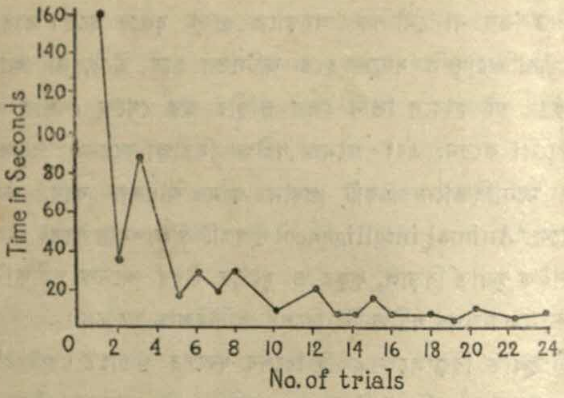

Fig 53. Learning Curve of hungry cat. From Thorndike—Animal intelligence.

এই রেখাচিত্র থেকে দেখা যায়, যে চব্বিশবার চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে বিড়ালটির দরজা খোলার কৌশল শিখতে। প্রথম দিকে সময় অনেক বেশী লেগেছে, পরে ধীরে সময় কমে আসছে, এবং বক্র রেখাটি মসৃন গতি লাভ করেছে। এই গ্রাফ্টি সকল প্রাণীর অনুরূপ পরিবেশে শিক্ষা বিষয়ে ব্যবহারের একটি প্রতীক বললে, অত্যুক্তি হয় না। এবং এই প্রকার ব্যবহারকেই 'trial and error' অথবা 'trial and success' দ্বারা শিক্ষার উদাহরণ বলা চলে।

বিড়ালের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে থর্ণডাইক সিদ্ধান্ত করলেন, যে বিড়ালটির ব্যবহার বুদ্ধি বা বিচারগত নয়। এটা বহুলাংশে আকস্মিক এবং যান্ত্রিক ব্যাপার। তিনি একে বলেছেন, **'trial and error learning'**—ভুল সংশোধন করে শেখা। এখানে অজানা থেকে জানার পথে গমনে কোন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-রূপ অন্তর্দৃষ্টি নেই। এখানে শিক্ষার বক্র রেখাটি ধীর গতিতে মসৃণভাবে নিম্নগতি লাভ করেছে, অর্থাৎ ভুলের সংখ্যা একবারেই কমে যায় নি, ধীরে ধীরে কমেছে। যদি বিড়াল বিচার করতে সক্ষম হত, তবে একবার ঠিক সমাধান লাভের পর, দ্বিতীয় বার ভুলের সম্ভাবনা থাকত না। বিড়ালটির

ব্যবহারে বুদ্ধি, বিচার বা উচ্চতর মননশীলতার কোন পরিচয়ই ছিল না—যেমন, একটানা মনঃসংযোগ, ফল লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টার বিবিধ পরিবর্তন, কতটা ফল লাভ হল তার হিসাব, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, অবস্থার সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার—এ সব কিছুই তার ব্যবহারে দেখা যায় নি। সুতরাং থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন, যে বিড়ালটি 'trial and error' বা ভুল ও ভ্রান্তির পথে চলে শিখেছে। এই শেখা একাধারে আকস্মিক ও যান্ত্রিক। এটা আকস্মিক (random or chance learning), কারণ hit or miss' উপায়ে চলে হঠাৎ সমাধানটি পাওয়া গেছে,—পূর্ব পরিকল্পনা করে, চিন্তা করে সমাধান লাভ হয় নি। এ শেখা যান্ত্রিক (mechanical) এবং অন্ধ, কারণ সমস্তার সামগ্রিক রূপ প্রাণী দেখতে পায় না, এবং আকস্মিক ভাবে, সমাধানটি পেলেও, তা পুনরায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাতে পারে নি। এখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সামঞ্জস্যবিধান সম্বন্ধে সচেতন নেই।[৭]

১৯৩২ সাল পর্যন্ত থর্নডাইকের লেখায় 'শেখা প্রক্রিয়ার' এরূপ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই আমরা পাই। তিনি মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই নীতির সাহায্যে শিক্ষা ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। Stimulus বা উদ্দীপক এবং response বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক ঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের নামই হল 'শেখা'—establishment of the right response to the right stimulus. যেমন, ৫+৪ এই উদ্দীপকের ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া হল ৯। শেখা অর্থ, এই ঠিক প্রতিক্রিয়াটি শেখার পথের ভুলগুলি দূর করতে হবে। এখানে মননশীলতা না স্বীকার করলেও চলে। বাস্তবিক পক্ষে বিহেভিয়ারিষ্ট মনস্তাত্ত্বিকেরা মন বা অন্তঃকরণকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁরা বলেন, মানুষের সমস্ত জীবনটা হচ্ছে, অসংখ্য উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার (S-R) সমষ্টি। আর শেখাও একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ-স্থাপন মাত্র। অতএব থর্নডাইকের 'chance learning' এর ব্যাখ্যা, তাঁরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। এই

৭। গ্যারেট তাই বলেছেন—"Such learning begins as a varied hit or miss process and continues as such, until the successful response is hit upon, as say, "by accident", After this, elmination of the unsuccessful responses begins, together with a gradual building-in of the successful reactions.

Garrett—Great Experiments in Psychology, P. 45

ঠেকে ঠেকে শেখাকে বিশ্লেষণ করলে, সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশ পাই। প্রথমতঃ যে শেখে তার একটি উদ্দেশ্য থাকে। বিড়ালের বেলাতে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা, ও খাদ্য লাভ করা, এই জৈব উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্য লাভের জন্যে প্রাণী তার ক্ষমতানুযায়ী নানা প্রকার ক্রিয়া ব্যবহার করে। তৃতীয়তঃ, এদের মধ্যে কোন একটি প্রতিক্রিয়া সাফল্যের সৃষ্টি করে (ছিটকিনি খুলে বের হয়ে আসা), এবং খাদ্য লাভ হয়। চতুর্থতঃ, উদ্দেশ্য লাভে সফল হলে, বা পুরস্কৃত হলে, ব্যবহারটি ভাল করে শেখা হয়। পঞ্চমতঃ, নিষ্ফল ব্যবহার বা ভুলগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়। এইজন্যে এই ধরণের শেখাকে 'trial and error learning, না বলে 'trial and success learning' বললে, ব্যাখ্যা আরো যুক্তি-সঙ্গত হয়, কারণ সাফল্যের ফলেই ভ্রান্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়।[৮]

প্রাণীদের ঠেকে ঠেকে শেখা কি সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক? থর্ণডাইক প্রথমে যখন তাঁর যোগসূত্রস্থাপন মতবাদ প্রকাশ করেন, তখন 'শেখা' ব্যাপারটার সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তিনি দেন। সমস্যার সমাধানটি আকস্মিক ভাবেই উপস্থিত হয়। এবং পশুদের ক্ষেত্র থেকে মানুষের ক্ষেত্রে, শেখার একই সূত্রকে তিনি প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, তাঁর শেখার ব্যাখ্যার মধ্যে মননশীলতার কোন স্থান নেই। কারণ পরবর্ত্তীকালে, তাঁর মতবাদ বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, যদিও তিনি নিজে তাঁর মতের একটা যুক্তিগত পরিণতিতে (logical end) ঠিক কখনও উপনীত হন নাই। গেইট্‌স, উডওয়ার্থ প্রমুখ 'stimulus-response' মতবাদের সমর্থকগণ, থর্ণডাইকের 'trial and error learning' পুনরায় বিশ্লেষণ করেন। তাতে দেখা যায়, শেখার মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং সাফল্য ও অসাফল্য বোধের ফলে পদ্ধতির পরিবর্তন, বুদ্ধির এই উভয় লক্ষণই থাকে,—বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। উড্‌ওয়ার্থ থর্ণডাইকের 'trial and error' শেখার পদ্ধতিকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সূত্র দিয়ে নূতন করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর দেখেছেন।

৮। Learning—Carl. I. Hovland of Yale Univ. Foundations of Psychology. Boring, Langfield, Weld. P. 146

(১) একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনের প্রস্তুতি, (২) শেষ উদ্দেশ্য পর্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কার দেখতে না পারা, (৩) সমস্যা সমাধানের জন্য অবস্থার চারিদিক অস্পষ্টভাবে ঘুরে দেখা, (৪) অস্পষ্ট বিচারই হউক, বা আকস্মিক ভাবেই হউক, কোন একদিকে একটু পথের ইঙ্গিত পাওয়া, (৫) এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার অপটু চেষ্টা, (৬) কোন একটা পথ ব্যর্থ হলে, সে পথ ছেড়ে, অন্য পথের ইঙ্গিত ধরে চেষ্টা, (৭) সর্বশেষ, একটি সফল পথের অনুসন্ধান, এবং সেই সূত্র ধরে উদ্দেশ্যে পৌঁছা। প্রাণী স্পষ্ট ভাবে উদ্দেশ্যে পৌঁছবার পথ যখন পায় না, তখনই পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন করে শিখবার রীতি গ্রহণ করে। সে হিসাবে কিছু 'অন্ধতা' আছে এই পদ্ধতিতে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। কতদূর অগ্রসর হয়ে, অনেক সময় পিছ নর পথটার তাৎপর্য্য সে বুঝতে পারে। এটাকে উড্‌ওয়ার্থ পশ্চাৎদৃষ্টি বা hind sight বলেছেন।

আমরা দেখব, থর্ণডাইক পরে তাঁর মতবাদের মধ্যে নানা নূতন ধারণা (যেমন mental system, belongingness ইত্যাদি) সংযোজন করেন, ফলে তাঁর সংযোগ মতবাদের পশ্চাতে যে যান্ত্রিক বা reflex ধারণা ছিল, তা অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

থর্ণডাইকের শিক্ষার তিনটি সূত্র—পশুদের উপর নানাবিধ পরীক্ষার ফলে থর্ণডাইক শেখার তিনটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন—(১) **ফল লাভের সূত্র** (The law of effect), (২) **পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র** (The law of exercise) (৩) **উন্মুখতার সূত্র**—The law of readiness). এই তিনটি প্রধান সূত্র ছাড়া তিনি আরো পাঁচটি অপ্রধান সূত্রও আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রেও বিশেষ মূল্যবান। এই সূত্রগুলি এমন কতগুলি সাধারণ অবস্থা বা common conditions, যা শেখার সময় সর্বদাই দেখা যায়। কাজেই এদের শিক্ষার নিয়ম বা laws of learning বলা হয়।

ফল লাভের সূত্র—The law of effect—ক্ষুধার্ত বিড়ালটি খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে পারলেই, একটি পুরস্কার পায়—খাদ্য। এই ফললাভের আশায় সে চেষ্টা করে ছিট্‌কিনিটি খুলে ফেলতে; এবং যে কৌশলটী ফললাভের পক্ষে সহায়ক, সেইটিই তাহার মনে দাগ কেটে বসে, এবং ক্রমশঃ ভুল অঙ্গ সঞ্চালনগুলি কমে আসে। যে কাজের ফল প্রীতিপ্রদ, সে কাজ

স্বভাবতঃই বারে বারে করা হয়; ফলে সেটি মনে গভীর হয়ে বসে যায়,—সেটি শেখা হয়। আর যার ফল অপ্রীতিকর, যার পরিণতি অসাফল্য, নিরাশা ও বিরক্তি,—তাদের মন পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ, প্রীতিকর ক্রিয়ার বেলায়, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধটি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে; অপ্রীতিকর ক্রিয়ার বেলায় প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটি মন থেকে বাইরে ঠেলে ফেলা হয়,—"The one stamps in the connection and the other stamps it out" পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদেরা জানতেন যে একটা কাজ বারে বারে করলে কাজটি শেখা হয়। কিন্তু কেন একটা কাজ বারে বারে করা হয়, থর্ণডাইকের নিয়মে তার একটি মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ঘোনাকে জিজ্ঞাসা করা হল ৫+৪=কত? সে উত্তর দিল, 'ছয়'। অমনি তার কপালে বকুনী ও কানমলা জুটল। সে বুঝল, এই উত্তরটা ভুল। সে এটাকে পরিত্যাগ করে সঠিক উত্তরে মনোনিবেশ করল। ফললাভের সূত্রকে থর্ণডাইক ১৯১৩ সালে তাঁর 'এডুকেশন্যাল্ সাইকলজী'তে এইভাবে ব্যক্ত করেন, "একটা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যখন পরিবর্তনশীল একটি সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং তার সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে, যদি একটি সুখকর অবস্থা আসে, তা হলে ঐ সংযোগ-সূত্র দৃঢ়তর হয়; এবং যদি কোন সংযোগসূত্র স্থাপনের সঙ্গে বা পরে একটা বিরক্তিকর অবস্থা আসে, তা হলে সে সংযোগসূত্র শিথিল হয়।"[১]

প্রাণীর পক্ষে কতগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই তৃপ্তিকর (original satisfiers), আর কতগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর (original annoyers)। জৈব প্রয়োজনেই, যা সুফলপ্রদ, তা স্বভাবতঃ তৃপ্তিকরও বটে; যা কুফলপ্রদ বা বেদনাদায়ক, তা স্বভাবতঃ অপ্রীতিকর। যেমন, ক্ষুধার্ত প্রাণীর জীবনধারণের

১ "When a modifiable connection between a situation and a response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased; when made and accompained or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased.

"By a satisfying state of affairs is meant one, which the animal does nothing to avoid, often doing things which maintain or renew it. By an annoying state of affairs is meant one, which the animal does nothing to preserve, often doing things which put an end to it."—Thorndike—Educational Psychology. Vol II.

পক্ষে খাদ্য প্রয়োজনীয় ও প্রীতিপ্রদ, আর আবদ্ধ হয়ে থাকা অনিষ্টকর ও অপ্রীতিপ্রদ। তাই যে ক্রিয়া খাদ্য আহরণ দ্বারা ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়, প্রাণী তা শেখে ; যে ক্রিয়া তাকে আবদ্ধ অবস্থায় ফেলে, তা সে এড়ায়। স্বভাবতঃই প্রীতিপ্রদ, এবং স্বভাবতঃই অতৃপ্তিকর, এমন কয়েকটি অবস্থা নিয়ে থর্নডাইক্ প্রথম পরীক্ষাগুলি করেন, এবং যে নিয়মগুলি জীবনের এই মৌলিক অবস্থায় প্রযোজ্য, তা সাধারণ ভাবে সকল শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এই সিদ্ধান্ত তিনি করেন, এবং কোন্ কাজটি প্রীতিপ্রদ এবং কোন্‌টি নয়, তা বুঝতে তিনি বিবর্তনবাদের (evolution) সাহায্য গ্রহণ করেন।

কিন্তু প্রথম পরীক্ষাগুলির ফলে তিনি মনে করেছিলেন, যে যা তৃপ্তিদায়ক, এবং যা বিরক্তিকর, সংযোগ স্থাপন এবং নিরসনের পক্ষে তাদের প্রভাব সমান। কিন্তু পরে বহু পরীক্ষার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, যে সাফল্য এবং তৃপ্তি শেখাকে যত সাহায্য করে, অসাফল্য বা বিরক্তি ঠিক ততটা বাধা দেয় না। সুতরাং শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে প্রশংসা বা পুরস্কার দিয়ে যতটা সুফল পাওয়া যায়, তাড়না বা তিরস্কারের সাহায্যে ঠিক সেই অনুপাতে ভুল সংশোধন করা যায় না। তিনি নানা প্রকার পুরস্কারকে প্রেষণা (incentives) হিসাবে ব্যবহার করেন। মানুষের ক্ষেত্রে 'ঠিক—ভুল' ঘোষণা ও অর্থপ্রাপ্তিকে পুরস্কার হিসাবে ব্যবহার করে দেখেন, যে 'ঠিক হয়েছে', এই ঘোষণার ফলে সংযোগ-সূত্রটি যে অনুপাতে দৃঢ় হয়, 'ভুল হয়েছে' এই ঘোষণার ফলে সংযোগ সূত্র, সেই অনুপাতে শিথিল হয় না। তিরস্কারের ফলে ব্যক্তি হতোদ্যম হয় এবং শেখার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় [১০] (গরজ-আগ্রহ-প্রেষণা অধ্যায় দেখ)।

১৯৩২ সালে **Fundamentals of Learning** পুস্তকে তিনি ফললাভের সূত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে প্রকাশ করলেন। প্রথমতঃ, একটা সংযোগের ফলে যখন তৃপ্তি জন্মে, তখন সংযোগসূত্রটি দৃঢ়তর হবে এটা নিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, একই অবস্থায় সংযোগসূত্রের ফলে যখন বিরক্তি জন্মে, সেই বিরক্তির ফলে সূত্রটি সমভাবে শিথিল হবে, একথা বলা যায় না। তৃতীয়তঃ, যখন

১০ "There is not a particle of evidence that the announcement of 'wrong' weakened these connections enough to counterbalance the strength they gained from just occuring. The wrong connections wane in relative frequency, not because that they weaken intrinsically but because they are supplanted by right connections."

বিরক্তির ফলে, সংযোগসূত্রটি শিথিল হয়, বিরক্তির সেই প্রভাবটি, অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে কাজ না করে', অপ্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করে। [১১]

বর্তমানে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পুরস্কার যত বেশী হয়, কাজের আগ্রহও (motivation) তত বেশী হয়, এবং আগ্রহ বেশী হওয়ার ফলে, শেখাও সহজে হয়। একে থর্ণডাইক্ Law of intensity বলেছেন। এও প্রমাণিত হয়েছে, যে প্রতিক্রিয়া ও পুরস্কার লাভের মধ্যে, সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, সংযোগ-সূত্র তত গভীরতর হয়।[১২]

হাল্ থর্ণডাইকের সূত্র ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এবং এই সূত্রকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি এই সূত্রের নূতন নামকরণ করেন। the Law of Reinforcement.

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র—The Law of Exercise—যখন কোন উদ্দীপকের সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যত বারে বারে সেই কাজটি করা যায়, তত বেশী প্রতিক্রিয়াটি দৃঢ়তর করা হয়। কথায় বলে, "ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়", আর "অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস।" সুতরাং এই সূত্রটির দুইটি অংশ আছে,—একটি ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তি (use) সম্বন্ধে, অপরটি অব্যবহার বা পুনরাবৃত্তির অভাব (disuse) সম্বন্ধে। থর্ণডাইকের ভাষায়, "কোন অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তনশীল একটি সংযোগ স্থাপিত হলে, অন্য সব অবস্থা সমান থাকলে, অভ্যাসের ফলে সেই সংযোগসূত্র দৃঢ়তর হবে। কোন অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, অনেকদিন যাবৎ যদি সংযোগ স্থাপিত না হয়, তা হলে অনভ্যাসের ফলে ঐ সংযোগসূত্র শিথিল হবে।" [১৩]

---

১১ "First, a satisfying after-effect which belongs to a connection can be relied on to strengthen the connection Second, an annoying after-effect under the same conditions has no such uniform weakening effect. Third, when it does so, its method of action, perhaps, is always indirect."

১২ "The closeness of connection between the satisfying state of affairs, and the bond it effects, may be due to close temporal sequence. Other things being equal, the same degree of satisfyingness will act more strongly than a bond made two seconds previously, than by one made two minutes previously'.

১৩ "When a modifiable connection is made between a situation and a response, that connection's strength is, other things being equal, increased."

"When a modifiable connection is not made between a situation and a response for a length of time, the connection's strength is decreased."

ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্রকে শেখার সর্বপ্রধান সূত্র বলে গ্রহণ করেন। তিনি ফললাভের সূত্রকে একটি আলাদা সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হন নি, কারণ এই সূত্রটি প্রীতি ও বিরক্তি রূপ মানসিক অবস্থা স্বীকার করে, কিন্তু বিহেভিয়ারিষ্ট হিসাবে তিনি মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। তিনি বলেন, শেখা হয় বারে বারে ক্রিয়াটি করবার ফলে, (frequency), এবং যে কাজটি এইমাত্র করা হয়, তা-ই বেশী মনে থাকে (recency)। তিনি বলেন যে বেড়ালটি ছিট্‌কিনি খুলতে শিখেছিল, তার কারণ সে ঐ কাজটি বারে বারে করেছে; সফলতার সঙ্গে বিড়ালের শেখার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ওয়াট্‌সনের যুক্তি সত্য নয়, কারণ বিড়াল অনেক বিফল ছুটাছুটি এবং অঙ্গসঞ্চালন করেছে, সেগুলিও বহুবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু যে প্রতিক্রিয়াটি সফলতা এনেছিল, তাই সে শিখল, অন্যগুলি নয়।

ওয়াটসনের যুক্তি যে সত্য নয়, এবং ফলাফলের সূত্রকে যে শেখার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া চলে না, তা প্রমাণিত হয়, মনস্তাত্ত্বিক ডান্‌লাপের নিজের উপর একটি মজার পরীক্ষা (negative practice) থেকে। ডান্‌লাপ্‌ 'the' কথাটি সর্বদাই ভুল করে 'hte' টাইপ করতেন। তিনি একদিন ইচ্ছা করে 'hte' কথাটি, বারে বারে একসঙ্গে প্রায় দুইশত বার টাইপ করলেন। ফলে 'hte' কথাটি তাঁর পক্ষে এমন পীড়া-দায়ক হয়ে ওঠে, যে ভবিষ্যতে 'the' শব্দটি টাইপ করতে, তিনি আর কখনই ভুল করেন না। শুধুমাত্র পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্রটি যদি এখানে কাজ করিত, তবে 'hte' ভুলটি পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে, আরো পাকা হয়ে বসত। ফললাভের সূত্র দিয়েই কেবলমাত্র ঘটনাটির সুব্যাখ্যা চলে।

বস্তুতঃ ফললাভের এবং পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র দুইটিকে একত্র করে, শেখার একটি প্রধান সূত্র রূপে উপস্থাপিত করা যায়। যে ক্রিয়াটি প্রীতিপদ ফলের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা বারে বারে করার ইচ্ছা ব্যক্তির মনে আসে, এবং বারে বারে করার ফলে, তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্তির মনে গেঁথে যায়।

(৩) **উন্মুখতার সূত্র—The Law of Readiness—**যে পড়াটি শেখার বা কাজটি করার জন্য, মনটা উন্মুখ হয়ে আছে, তখন সেই পড়া বা কাজ করবার সুযোগ পেলে, শেখার কাজ স্বচ্ছন্দগতিতে চলে, অন্যথায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

থর্ণডাইক্ বলেন, "যখন দেহমন কোন এক বিষয়ে উন্মুখ হয়, তখন সেই কাজটি করলে তৃপ্তি হয়, এবং না করতে পারলে বিরক্তি ঘটে।" সাধারণভাবে উন্মুখতার তাৎপর্য থর্ণডাইকের নিকট দেহের যান্ত্রিক প্রস্তুতি মাত্র।[১৪]

উপরোক্ত তিনটি প্রধান সূত্র (law) ছাড়াও আরো পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের কথা থর্ণডাইক্ বলেছেন।

(ক) একই উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র—Law of Multiple response to the same external stimulus—ব্যক্তি যখন কোন নূতন অবস্থা, উদ্দীপক বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন যত প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব (অর্জিত ও জন্মগত,) তার সাহায্যে সে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। এই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনটি বর্তমান ক্ষেত্রে উপযুক্ত, তার বাছাই ফললাভের সূত্রের উপর নির্ভর করবে। যতই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, ততই সামান্য উদ্দীপকও বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে।

(খ) মানসিক অবস্থা ও প্রস্তুতির সূত্র—Law of attitude, set or disposition.—ব্যক্তির বর্তমান প্রয়োজন, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে, সে কোন কাজটি এখন করতে পছন্দ করবে বা বিরক্তি বোধ করবে। অর্থাৎ "একটা উদ্দীপকের সম্বন্ধে দেহ-মনের বর্তমান অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রস্তুতিই প্রতিক্রিয়াটি প্রীতিপ্রদ বা অতৃপ্তিকর হবে কিনা, তা নির্দেশ করে দেয়। যেমন ক্ষুধার্ত বিড়াল খাঁচার বাইরে আসার জন্যে ছট্ফট্ করবে, কিন্তু খাওয়ার পরে তৃপ্ত বিড়াল খাঁচায় দিব্যি ঘুমুবে।"

(গ) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র—The Law of partial activity—শিক্ষা যতই উন্নত হবে, ততই সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ ও প্রতি অংশের সঙ্গে অপর অংশের পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে। ফলে বিশেষ অংশটি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে, এবং ঐ বিশেষ অংশের প্রতি বিশেষ প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে। এই সূত্র, বিভিন্ন অংশের পার্থক্য বুঝবার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উপর জোর দিচ্ছে। থর্ণডাইক বলেন, "কোন অবস্থার একটা অংশ

---

১৪ "When any conduction unit is in readiness to conduct, for it to do so, is satisfying. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct, is annoying. When any conduction unit is in readiness to conduct, for it not to do so, is annoying." 27th. Yearbook of N. S. S E.

বা উপাদানই কখন কখন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে, যদিও সমগ্র অবস্থাটি উপস্থিত না থাকতে পারে।"[১৫]

(ঘ) উপমানের সূত্র—**The Law of Assimilation or Analogy,** —শেখা মানেই জ্ঞাত দ্রব্য বা ঘটনাকে সমজাতীয় বা এক ধরণের দ্রব্য ও ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মনের মধ্যে সংযুক্ত করা। এটা সাদৃশ্যের সাহায্যে সামান্যীকরণের (similarity generalisation) ক্ষমতার পরিচায়ক। ব্যক্তি যখন নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন অনুরূপ অবস্থায় সে যে প্রকার ব্যবহার করেছিল, তার সাহায্যে নূতন অবস্থাকে বুঝতে সে চেষ্টা করে।

(ঙ) **The Law of associative shifting**—এই সূত্রটি বস্তুতঃ প্যাভ্‌লভের conditioned response থেকে পৃথক নয়। একটি ঘটনা স্বভাবতঃ একটি প্রতিক্রিয়াকে জাগায়, কিন্তু সেই ঘটনার অনুপস্থিতিতেও সেই প্রতিক্রিয়াই জাগতে পারে, সেই ঘটনার সঙ্গে নিয়ত-সংযুক্ত অন্য কোন অবস্থা দ্বারাও।

পরবর্তীকালে থর্ণডাইক আরো অনেক পরীক্ষা করেন। এবং সকল ক্ষেত্রেই মানুষের উপর এই পরীক্ষাগুলি করা হয়। এই সব গবেষণার ফলে, তাঁর 'trial and error learning' মতবাদ অনেক পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়[১৬] এই নূতন কয়েকটি সূত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল--

(চ) সংযুক্তি বা **Belongingness**—একটি দলের গোষ্ঠীভুক্ত হলে, একটি অংশ একটি সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশ একটি বিশেষ তাৎপর্যের সাহায্যে এক সূত্রে গাঁথা আছে, যার ফলে বাক্যটির অর্থ-গ্রহণে অসুবিধা হয় না। এখানে বাক্যের অংশগুলিও দলভুক্তির ফলে অর্থপূর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে কতগুলি সংখ্যাও একটি বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত হয়ে, একটি দলের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ২, ৪, ৮, ১৬, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি একটি বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত হয়ে, একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে, এবং অপর সাধারণ সংখ্যা থেকে পৃথক হয়েছে; অপর পক্ষে

---

[১৫] Thorndike—Fundamentals of learning.

[১৬] "Numerous additions and modifications were also made and new terms, belongingness, impressiveness, polarity, identifiability, availability, and mental systems found their way into the vocabulary of connectionism.

নয় — শেখার পশ্চাতে আগ্রহ বা motivation থাকা চাই। এ বিষয়ে কার্টরাইট ১৯৩৩ সালে একটি ছোট্ট বই লেখেন—"The Psychology of wants, interests and attitudes", এতে তিনি আগ্রহের তিনটি প্রধান ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথমতঃ, বাইরের পরিবেশ (external situation) অপেক্ষা প্রাণীর মনোগত ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, বৃত্তিগুলি ও আগ্রহ প্রাণীর ব্যবহারের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে অধিকতর কার্যকরী। দ্বিতীয়তঃ, প্রাণীর অভ্যাসগুলোর সঙ্গে তার ইচ্ছা ও আগ্রহ, অথবা পরিবেশ, একসময়ে পরিবর্তিত হতে পারে, তার ফলে, তার [illegible] ব্যবহারটি সিদ্ধ হতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাই 'ঠাণ্ডা'-ই নির্দেশ করে, প্রাণী কোন কার্য করবে, কোন ভঙ্গী পরিহার করবে, কোনটি তার উদ্দিষ্ট এবং কোনটি অবাঞ্ছিত—"motives are the basis of selection and confirmation". এখানে দেখি, [illegible] শুধু শেখা ব্যাপারটিকে [illegible] ও [illegible] প্রতিক্রিয়া বলে মনে করতেন, পরে তাঁর মতবাদ অনেক পরিবর্তিত হয়।

Theory of conditioned response—শুধু আংশিক ব্যাখ্যা।

অনুবর্তনবাদ এবং ব্যবহারবাদ থেকে উদ্ভূত শেখার উপাদানমূলক মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—এই মতবাদগুলির বৈশিষ্ট্যই এই যে, এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণীজগতের নীচের স্তর থেকে অতি সহজ অবস্থায় শেখার সরলতম সূত্রটি বের করার চেষ্টা করছে। একথা ঠিক যে, মানুষের ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসারে প্রাণীদের ব্যবহারের সমপর্যায়ে পড়ে। বিশেষ করে মানুষ যখন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বাইরের প্রভাবকে তার নিজের উপর ক্রিয়া করতে দেয়, তখন তার ব্যবহারে বিচার বা বুদ্ধিপ্রসূত চিন্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শৈশবের ক্রিয়া-কলাপ, [illegible] অনুকরণ ইত্যাদির মধ্যে শেখার এই সরলতম সূত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। বড়দের ক্ষেত্রেও, নানা প্রকার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস [illegible] উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধি পশুর স্তর থেকে অনেক উঁচু। হাতে কলমে কাজ না করেও, শুধু ঘটনাটি চোখে দেখে, বা তার অভাবে, নিছক চিন্তার সাহায্যে, মানুষ সমস্যার [illegible] আবিষ্কার করতে পারে। মানুষ বিভিন্ন

ভাবে শিক্ষা লাভ করে না। মানুষ স্রষ্টা। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি চারুকলা সকল ক্ষেত্রেই মানুষ আপন বুদ্ধি ও সৃজনী শক্তির সাহায্যে পরিবেশকে জয় করে তার পরিবর্তন সাধন করেছে। এই উচ্চতর মননশীলতা, সম্বন্ধের জ্ঞান বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির কোন সুব্যাখ্যা, ব্যবহারবাদের reflex theory, বা অন্ধ trial and error এ মেলে না।

দ্বিতীয়তঃ থর্ণডাইকের ফলাফলের সূত্র, ও প্যাভ্‌লভের conditioned reflex, এ দুই মতের মধ্যেই এ মিল রয়েছে যে, এরা দুজনেই মেনে নেয় যে, শেখাটা অন্ধ—বড় জোর জৈব তাড়না বা প্রয়োজনের (need) তৃপ্তিই একমাত্র শেখার উদ্দেশ্য। চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথে আমরা যে ঠেকে শিখি, তার পশ্চাতের প্রেরণা, শুধু একান্ত বর্তমানের প্রয়োজন মিটান, বা বাইরের পুরস্কার প্রাপ্তির লোভই নয়। মানুষের ব্যবহার উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্ভূত, এবং এই উদ্দেশ্য বা আদর্শটি অনেক ক্ষেত্রেই আপন অন্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত। এক একটি আদর্শের সার্থক রূপায়ণের পথেই মানুষ আবার উচ্চতর আদর্শের পথে অগ্রসর হয়। এই 'levels of aspiration' বাইরের (external) পুরস্কার বা লাভের মোহে নিয়ন্ত্রিত হয় না।

শেখাটা যদি নিশ্চেষ্ট ক্রিয়া হ'ত, তা হ'লে জ্ঞানের অগ্রগতি ঐখানেই থেমে যেত। মানুষের মূল সক্রিয় শক্তি এবং তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বিমূর্ত চিন্তা ও সামান্যী-করণের ক্ষমতায়। এ পথেই মানুষের শিক্ষার এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথম যে অবস্থায় মানুষ শিক্ষালাভ করেছিল, সেই অবস্থার নিগড় থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিতে পেরেছে বলেই বর্তমান যুগের মানুষ শিক্ষার সাধারণ সূত্রগুলিকে আধুনিক যুগের জটিলতর সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

থর্ণডাইক্ ও প্যাভ্‌লভ এ দুইয়ের বিরুদ্ধেই এই সমালোচনা করা যায় যে, তাঁরা প্রাচীন ভ্রান্ত অনুষঙ্গবাদ (associationism) দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত।

কোয়হ্‌লার কৃত ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টা পদ্ধতির সমালোচনা: সমগ্রতা মতবাদ বা ক্ষেত্রতত্ত্ব—The Gestalt or the Field theory of Learning, or the Theory of Learning by Insight.

সমগ্রতাবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ থর্ণডাইকের সংযুক্তিবাদ এবং 'ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টা'র ফলে শেখার ধারণাকে তীব্র সমালোচনা করেন। কফ্‌কা এবং কোয়হলার, বলেন, শেখা একটী অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিমাত্র নয়; এর মধ্যে সমস্যা এবং ক্ষেত্র (field or total situation) সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি (insight) আছে। কফ্‌কা থর্ণডাইক্ কৃত learning curve গুলি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেন। থর্ণডাইকের মতে curve গুলির ধীর মসৃণ ভাবে নিম্নগতি লাভের অর্থ হ'ল, শেখার পদ্ধতি অন্ধ, ইহা ভুল ও ভুল সংশোধনের চেষ্টার উপরে এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের উপরে নির্ভর করে' অগ্রসর হয়। এখানে কোন সমাধান লাভ বা অন্তর্দৃষ্টির ফলে বক্ররেখাটির হঠাৎ নিম্ন-গতি দেখা যায় না, অর্থাৎ ভুলের সংখ্যা হঠাৎ কমে যায় না। কিন্তু কফ্‌কা থর্ণডাইকের কয়েকটি বক্ররেখার মধ্যে হঠাৎ নিম্নগতি (sudden drops) লক্ষ্য করেন। যে সব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি পশুদের

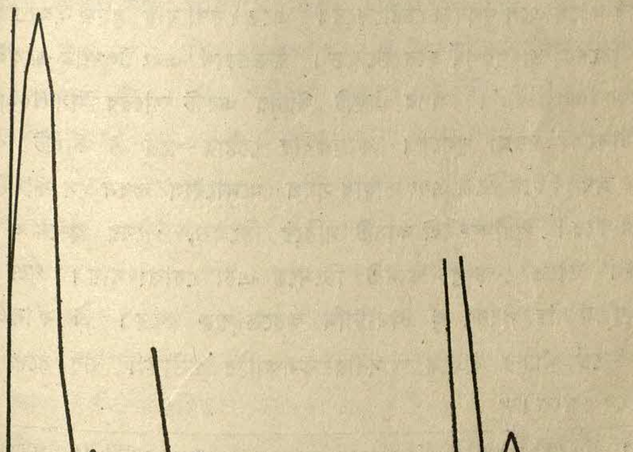

Fig. 54. Sharp descent the Process of learning in a cat—after Thorndike. Koffka—Growth of the Mind P, 182.

পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, সেখানেই এই আকস্মিক নিম্নগতি দেখা যায়। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে থর্ণডাইক্ বলেন যে, এক্ষেত্রে কাজগুলি

আচরণ সহজ ধরনের ছিল, এবং একবারের অভিজ্ঞতাতেই উদ্দীপক ও সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।[১৭]

দ্বিতীয়ত, থর্নডাইক প্রাণীদের ব্যবহারে বুদ্ধির কোন পরিচয় পাননি। তিনি বরং প্রাণীদের 'stupid errors' এর কথা বলেছেন। কফ্কা স্বীকার করেন যে, প্রাণীরা অনেক বোকার মত ভুল করে থাকে। দেখা যায় অনেক সময় খাঁচার দরজা খোলা আছে, তবুও বেড়াল দড়ির ফাঁসটি টানছে। কিন্তু কফ্কা বলেন যে থর্নডাইক্ যে ধরনের Puzzle box বা Maze প্রাণীদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাদের নির্মাণ কৌশল বেশ জটিল ছিল, এবং খাঁচার ভেতর থেকে দরজা খুলবার উপায়ের সম্পূর্ণ ছবি দেখা সম্ভব ছিল না। ঐ প্রাণীদের অবস্থা অনুযায়ী সমস্যাগুলি যথেষ্ট কঠিন ছিল। তবুও ঐ অবস্থাতেও প্রাণী চেষ্টা করেছে, অবস্থাটি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে। একটি বিড়ালকে খাঁচাতে যখন দ্বিতীয়বার বন্দী করা হয়, তখন সে সোজাসুজি দরজার কাছে এসে খুলবার চেষ্টা করে। এতে দেখা যায়, সমগ্র ক্ষেত্রের একটি অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উডওয়ার্থ এবং টলম্যান্ এরই নাম দেন 'Place learning'। আবার একটি খাঁচায় একটি তারের ফাঁস (loop) ছিল, যা টানলেই দরজা খুলবে। কয়েকবার চেষ্টার পরে ঐ ফাঁসটি বিড়ালের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে, এবং তাহার সমগ্র মনোযোগ তখন সে ফাঁসটির প্রতি নিবিষ্ট করে। পরীক্ষক ঐ ফাঁসটি সরিয়ে দিলেও, পূর্বের স্থানে আঁচড়াতে থাকে। তাতে বেড়াল স্থানটি চিনেছে এটা বোঝা যায়। পরে ফাঁসটি যখন খুঁজে পায়, পুনরায় তা টানাটানি করতে শুরু করে। ঐ ফাঁসটি তখন তার কাছে খাঁচার বাইরে আসবার সমগ্রতার প্রতীক। এর সঙ্গে খাবার সম্বন্ধ সে জেনেছে।[১৮]

১৭ He (Thorndike) dismisses sudden learning with the remark that "Of course, where the act resulting from the impulse is very simple, very obvious and very clearly defined, a single experience may make the association perfect, and we have an abrupt descent in the time-curve without needing to suppose inference," from E. L. Thorndike, Animal Intelligence : Experimental studies, 1911. Quoted by Koffka: Growth of the Mind, P 182.

১৮ "Even Thorndike's experiments seem to show, not only that the animal experiences certain vague total situations, but that, in the course of learning, this total situation becomes organised when the

তৃতীয়তঃ, কফ্‌কা থর্নডাইকের Law of Effect কে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'effect' বা ফল শব্দের ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু থর্নডাইক যেভাবে এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে এটা ফলশব্দের সূত্র না হয়ে, তৃপ্তি-শব্দের (Law of satisfaction) সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি প্রতি স্তরে অংশগুলির হতে অংশের সম্বন্ধগুলি শিক্ষার্থীদের বুঝবার ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে কোন ক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে ফল শব্দের এবং তৃপ্তি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ, তা সে কি করে বুঝবে? ফল শব্দের সঙ্গে তৈরি তৃপ্তি না থাকতে পারে, কোহ্‌-লারের একটি শিম্পাঞ্জী প্রমাণ করে দি। সেই শিম্পাঞ্জীটি লাঠি দিয়ে কলা আনবার পর, কাছাকাছি যত কিছু জিনিস ছিল, সবই টেনে আনছিল। এখানে কলা পাওয়ার তৃপ্তি দ্বারাই তার পরবর্তী কাজের ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানে সমস্যা সমাধানের আনন্দটাই লক্ষণীয়। এ ক্রিয়া সম্পূর্ণ অর্থ বুদ্ধিগোচরতার ফল এবং যান্ত্রিক, এমন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত।

শেখা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে হয়—All Learning is due to Insight. শেখা মানে অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্তন। সমগ্রতাবাদীরা (Gestalt psychologists) বলেন, এই পরিবর্তন ঘটে, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। তাঁরা যোগের মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন যে, শেখা ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার টুকরা জোড়া দিয়ে ক্রমে ক্রমে ঘটে, এটা ঠিক নয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে এই মতবাদের ভিত্তি যাতে ঘটে, কোহ্‌লারের কয়েকটি বিখ্যাত পরীক্ষার উপর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আফ্রিকার উপকূলে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত টেনেরিফ্‌ নামক দ্বীপে পাঁচ বছর ধরে শিম্পাঞ্জীদের উপর কোহ্‌লার নানা পরীক্ষা চালান। এদের মধ্যে সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জী সমস্যা-সমাধানে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

একটি বড় খাঁচার মধ্যে শিম্পাঞ্জীটি ছিল। তার ঘরের বাইরে, সে যেখানে

---

loop differentiates itself. ....It is "something to be struck at," or "something to be moved."... ...this shows that neither it nor the movements made with it are without significance to the animal; for the animal has in some way connected its action upon the loop, with the food outside the cage. The theory of an entirely meaningless learning is simply untenable."

Koffka—The Growth of the Mind.

পায় এমন স্থানে, তার প্রিয় খাদ্য কলা রাখা হ'ল। তার ঘরে দুটি বাঁশের লাঠি দেওয়া হ'ল। একটি বেশ মোটা ও বড়, অপরটি সরু ও ছোট। আলাদা ভাবে, দুই লাঠির কোনটির সাহায্যেই, কলা পর্যন্ত নাগাল পাওয়া যায় না। শিম্পাঞ্জী প্রথমতঃ কলা দেখে অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগল। সে লাঠিগুলি লক্ষ্য করল। জালের ফাঁক দিয়ে একটি লাঠি ঢুকিয়ে কলা আনতে চেষ্টা করতে লাগল। পরে আবার দ্বিতীয় লাঠিটি দিয়ে চেষ্টা করল। এবারও পারল না। বারকয়েক চেষ্টা করে যেন হাল ছেড়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে, খাঁচার এক কোণে গিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবার লাঠি দু'খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অল্পক্ষণ পরে নিতান্তই অকস্মাৎ, সে ছোট লাঠিটি বড় লাঠিটির ফাঁকে গুঁজে দিল, এবং দৌড়ে গিয়ে যুক্ত লাঠির সাহায্যে কলাগুলি ঘরে টেনে নিল। পরদিন আবার একই পরীক্ষা করা হ'ল, অল্পক্ষণ লাঠিগুলি নাড়াচাড়া করেই, শিম্পাঞ্জী ঠিক লাঠিগুলি জুড়ে কলা টেনে আনল। কোনও ভুল হল না।[১৯]

এই শেখার ব্যাপারগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? এটা ভুল সংশোধন করে, বারে বারে ঠেকে শেখা নয়। এটা বিচার বিবেচনা-শূন্য, যান্ত্রিক পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফল নয়। আবার মানুষের চিন্তার মত, বুদ্ধিগত যুক্তিমূলক বিচারের সিদ্ধান্তও নয়। হঠাৎ একটা আলোর ঝলকের মত যেন সমগ্র অবস্থাটি প্রাণীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। গেষ্টল্ট মনোবিদ্‌গণ একে 'অন্তর্দৃষ্টির ফলে শিক্ষা' (**learning by insight**) বলেছেন। সমস্ত অবস্থাটি শিম্পাঞ্জী এখানে পূর্ণভাবে দেখতে পাচ্ছে। বাঁশের লাঠি, বাইরে কলা, এ সবই ঐ একই অবস্থার অঙ্গ। বাঁশের টুকরাগুলির মধ্যে ছোট বড় সম্পর্ক, কলা নাগালের বাইরে আছে, বাঁশটি কলা আনার একটি উপায়,—বিভিন্ন অংশের এই তাৎপর্য্যগুলি সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিম্পাঞ্জীর নিকট পরিস্ফুট হওয়ার

---

১৯ "This process of thrusting one stick into another, required that they be treated as functionally different, not as equal in value, Sultan's insight consisted in his recognising that this difference depended upon the relative size of the two sticks. His behaviour could not be called 'insightful' if success in fitting the sticks together had come merely as a result of fumbling with them. It was 'insightful' if he saw which stick could be thrust into the other."

সঙ্গে সঙ্গে, সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। এবং একবার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর, দ্বিতীয়বার শিম্পাঞ্জীটি আর একবারও ভুল করেনি। থর্ণডাইকের খাঁচা ও গোলকধাঁধাঁতে পশুরা অন্ধের মত পথ হাতড়েছে, কারণ অবস্থাটি পূর্ণভাবে তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। কোয়হ্লার স্বীকার করেন, যে প্রাণীর শেখার পশ্চাতে 'চাড়' সৃষ্টি করতে হ'লে, কিছু বাধা থাকার প্রয়োজন আছে। বাধা না থাকলে, প্রাণী সোজা চলে গিয়ে খাদ্য আহরণ করবে, তাতে নূতন কিছু শেখা হয় না। শেখার মধ্যে অপরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করতে হবে। কোয়হ্লার বলেন, যে বাধা থাকবে বটে, কিন্তু তা এমন হবে না, যে সমস্যাটি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রাণীর ক্ষমতার বাইরে থাকবে। সমস্যার সমস্ত অংশগুলি তাঁর নিকট দৃশ্যমান থাকতে হবে, শুধু প্রাণী নিজে ঐ অংশগুলির তাৎপর্য বুঝে সমস্যা সমাধান করবে। কোয়হ্লার ও ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ দুজনেই এ সম্পর্কে একই ধরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন থর্ণডাইক্ বেড়ালকে নিয়ে যে ধরণের পরীক্ষা করেছেন তাতে ওর পক্ষে সমগ্র সমস্যাটি সামনে মেলা ছিল না। তাই বিড়ালের ব্যবহারের মধ্যে ভুল সংশোধন করে' করে', ক্রমে ক্রমে শেখা দেখা গেছে। যদি সমগ্র সমস্যাটি বেড়াল দেখতে পায় এমন সহজ অবস্থায় পরীক্ষাটি করা হ'ত, তাহলে দেখা যেত, বেড়াল হঠাৎ যেন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাধানটি বুঝতে পারছে এবং একবার বোঝা হয়ে গেলে, বেড়াল তার পরে আর ভুল করে না। যেমন ধরা যাক্, একটি ক্ষুধার্ত কুকুর ও তার প্রিয় খাদ্যের মধ্যে একটি খাটো দুপাশ খোলা ছোট বেড়া আছে। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, কুকুর একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্যে অবস্থা দেখেই, বেড়ার খোলা অংশ দিয়ে ঘুরে, বিনা দ্বিধায়ই এক দৌড়ে খাদ্য সংগ্রহ করবে। মুরগীর ছানার বুদ্ধি অনুযায়ী, এ অবস্থাটাও কঠিন, তাই সে তারের বেড়ায় পাখা ঝাপটে মরে। কিন্তু বেড়াটা খুব নীচু হলে সে তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খাবার খেয়ে আসে। **অবস্থা যেখানে প্রাণীর বুদ্ধি অনুযায়ী সহজ, সেখানে শেখার মধ্যে কোন ঠেকে ঠেকে, ভুল প্রতিক্রিয়া বর্জ্জন করে অগ্রসর হওয়া দেখা যায় না।** এখানে নিঃসন্দেহেই প্রায় বলা যায় যে, প্রাণী অবস্থাটা "বুঝেছে" এবং তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া, সেই অন্তর্দৃষ্টিরই ফল। কোয়হ্লার বানর (apes) নিয়ে এবং ক্রেভেস্‌কি নিম্নতর প্রাণী ইঁদুর নিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সেখানেও অবস্থাটা অতিরিক্ত কঠিন না হ'লে, শেখা কাজটার পেছনে

অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে। যেখানেই প্রাণী সত্যি করে 'শেখে' সেখানেই অস্পষ্ট-ভাবে হ'লেও অবস্থাটা বোঝার অবস্থা থাকে, অথবা যাকে বলা হয়েছে "অন্তর্দৃষ্টি," তা থাকেই।[২০]

ম্যাক্‌ডুগাল্‌ ঠিকই বলেছেন যে, বুদ্ধিমান মানুষকেও নিতান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটা জটিল খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে, প্রথম দিকে তার ব্যবহারে দ্বিধা, ভুল ও এলোপাথারী ক্রিয়া দেখা যাবে। কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই ভুল হবে যে, মানুষের শেখা ব্যাপারটা যান্ত্রিক ব্যাপার এবং বুদ্ধির তাতে কোন প্রয়োজন নেই।[২১]

শেখাটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যান্ত্রিক ব্যাপার থর্নডাইকের এই মতকে সমালোচনা করেছেন ড্যাসীল্‌ (Dashiell)-ও কতগুলি পরীক্ষা দিয়ে। থর্নডাইকের খাঁচায় আবদ্ধ বেড়াল, ভ্রম ও ত্রুটি অপসারণ করে করে যখন খাঁচার দরজাটা খুলতে শিখল, তখন তা একটা অন্ধযান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র, তার মধ্যে বুদ্ধির কোন চিহ্ন নেই—এ কথা সত্য হ'লে, বেড়াল খাঁচা থেকে বেরোবার একটি মাত্র পথই শিখবে এবং মাত্র এক ধরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই খাঁচা থেকে বের হওয়া রূপ প্রতিক্রিয়াতে অভ্যস্ত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বেড়াল এ প্রকার পরীক্ষার শেষে এটা মোটামুটি ভাবে বুঝতে শেখে, তার বন্ধনের কারণটা কোথায়, এবং মোটামুটি কি ভাবে খাঁচা থেকে তার মুক্তি ঘটবে। কিন্তু প্রত্যেক বারের প্রতিক্রিয়া তার ঠিক এক রকমের নয়; কখনো বেড়াল

---

২০ Adams. Experimental Studies of Adaptive Behaviour in cats. Comp. Psychol. Monographs, 1929, 9, No. 27.
also ,, A restatement of the problem of learning. Brit. J. Psychol. 1931, 22, 150.

২১ Let us imagine twenty college professors shut in as many cages in a condition of utter hunger, while a table is temptingly spread before the line of cages. And let us suppose that each one can secure his release only by scratching a hole in the ground with his fingernails and rummaging with his nose at the bottom of this hole. The condition would be comparable to those imposed on his cats by Professor Thorndike. Is it not possible that a Martian observer, knowing little of human nature, might infer from the behaviour of the professors that they were creatures of small intelligence much given to random movements and meaningless vociferation? MacDougall—An Outline of Psychology (1923) P. 195.

ডান পায়ের থাবা দিয়ে দরজার ছিটকিনিটি খোলে, কখনো বা বাঁ পায়ের থাবা দিয়ে খোলে, কখনো মাথা দিয়ে ঠেলে খোলে। এতে প্রমাণ হয়, সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে বেড়াল একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে সমর্থ হয়। তার ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের ক্রিয়ার স্পষ্ট যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার অবশ্যই নেই, কিন্তু তার ক্রিয়ার মধ্যেও নিশ্চয়ই অন্তর্দৃষ্টি আছে। থর্নডাইক্ এটা ধরে নিয়েছেন যে, অন্তর্দৃষ্টি জিনিষটা এমন যে এটা কারু মধ্যে সম্পূর্ণ আছে, আর কারু মধ্যে একেবারেই নেই (yes-no classification).

একথা সত্য নয়। অন্তর্দৃষ্টির পরিমাণগত প্রভেদ (degrees of insight) অবশ্যই আছে। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব। ড্যাসীল্ খাঁচায় আবদ্ধ ইঁদুর নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা করেছেন। একটা পরীক্ষায়, একটা গোলকধাঁধাঁর মত খাঁচার প্রবেশপথে ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে রাখা হোল; অন্য দিকে খাঁচার বাইরেই আছে খাবার। কিন্তু এখানে একটি মাত্রই পথ ইঁদুরের সামনে খোলা নেই। কুড়িটি আঁকা বাঁকা সমান দূরত্বপূর্ণ আঁকা বাঁকা পথ আছে। ইঁদুর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে খাবারে পৌঁছবার একটা পথ চিনে নিল। কিন্তু পরের পরীক্ষাগুলিতে ইঁদুর সর্বদা ওই একটি পথেই খাদ্যে গিয়ে পৌঁছে না। সে কিছু পরীক্ষার পরই বুঝতে শেখে, খাদ্যটা **কোন দিকে** (place learning) আছে। কিন্তু ঠিক একটি মাত্র পথই ইঁদুর শিখল তা নয়, সে বিভিন্ন পথ ধরেই খাদ্যে গিয়ে ঠিক পৌঁছতে লাগল। অর্থাৎ ইঁদুরেরও 'শেখা' ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্ধ এবং পুনঃ পুনঃ করণ দ্বারা সুনির্দিষ্ট নয়। ইঁদুরের সামনে দুটি তিনটি পথ প্রথমে খোলা থাকলে এবং মাঝখানে বাধা দিয়ে দুটি পথ বন্ধ করে দিলেও, ইঁদুর পরীক্ষা করে ঠিক পথটি চিনে নেবে এবং যে পথ দুটিতে বাধা আছে, সে পথে আর প্রবেশ করবে না। আবার যদি বাধা একটা সরিয়ে নূতন একটা পথ খুলে দেওয়া যায়, আর আগের খোলা পথটা বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে ইঁদুর কয়েকবার পরীক্ষা করে ঠিক খোলা পথটাই খুঁজে বের করে খাদ্যের কাছে গিয়ে হাজির হবে; প্রথম যে পথটায় গিয়ে খাবার পেয়েছিল সে পথে যাবে না। বাধাটা ডাইনের পথে, বাঁয়ের পথে বা মাঝের পথে সরিয়ে সরিয়েও দেখা যায়, ইঁদুর ঠিক পথটিই অবশেষে চিনে বের করে নেয়, অর্থাৎ সব সময়ই প্রাণীর ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূখী অর্থাৎ কিছুটা বুদ্ধির লক্ষণযুক্ত। এমন কি, খোলা পথের মুখে সবুজ বাতি এবং বাধাযুক্ত পথের সামনে লাল বাতি জ্বেলে পরীক্ষা

করেও দেখা যায় প্যাভ্‌লভের কুকুরের মত ইঁদুরও এগুলির তাৎপর্য অনুযায়ী, তাদের ক্রিয়ার পরিবর্তন করতে পারে। এবং শেখাটা ধীরে ধীরে, ভুল কমে কমে, অগ্রসর হয় না। একবার যখন ঠিক প্রতিক্রিয়া শেখে, তারপর আর প্রায় কোন ভুল প্রাণী করে না।[২২]

অন্তর্দৃষ্টির স্বরূপ কি? যে সূত্রের সাহায্যে গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, শেখার ক্ষেত্রেও ঐ একই সূত্র কাজ করছে। অন্তর্দৃষ্টিকেও এক ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলা চলে। যখন সমস্যাটির পূর্ণ-রূপ মনের মধ্যে স্পষ্ট আলোকিত হয়ে ওঠে এবং খণ্ডাংশগুলির সঙ্গে সমগ্র সমস্যাটির সম্বন্ধ পরিপূর্ণরূপে বোঝা যায়, তাকেই বলে অন্তর্দৃষ্টি। এটা কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নয়। আরোও বিশ্লেষণ করলে, শেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রথমতঃ পাই stimulus বা উদ্দীপক। গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানী এই উদ্দীপককে ব্যবহার-বাদীর মত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। এই উদ্দীপক একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে (background) ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হয়। একে কফ্‌কা, 'a perceived phenomenal situation' বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পরিপ্রেক্ষিত বা ক্ষেত্র বা field ব্যক্তির বর্তমান ইচ্ছা, অনিচ্ছা রুচি ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করবে। এটাই তার কাছে উদ্দীপকের তাৎপর্য্য। সকল অবস্থায়, সকল বস্তু, সমানভাবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কতক অবস্থা ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে, কিছু তার কাছে বিরক্তিকর। এই দুই মিলিয়ে তার পরিবেশ গঠিত হবে। ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমস্যাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ

২২ Where rats were, confronted with two doors, only one of which led to food. The food door was changed irregularly from left to right, but was always marked by a light burning above it. The learning curves of the rats in these experiments differed significantly from those of Thorndike's cats. Since only two choices were open, about 50 per cent of correct responses could be expected by chance alone, and this was in fact the proportion usually obtained in the earlier runs. But when the rise did come, it came in many cases, comparatively suddenly. There was not a slowly increasing proportion of right choices, but a rapid advance from 50 per cent to nearly 100 per cent. success. This result strongly suggests insight as though, after a period of bewilderment, the rats had suddenly "got the idea" of responding to the hurdle or the light and ignoring the right-left position.

Woodworth ; Psychology : a study of Mental life (1940) P. 300.

করে। তার অর্থ ব্যক্তির মনে যে সমতা (equilibrium) বা নিরাসক্ততা ছিল তাতে আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। অর্থাৎ ব্যক্তি সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হ'ল। তৃতীয়তঃ সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মানেই, সমস্যার অপূর্ণতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। এই অপূর্ণতা বোধই ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর করবে।[২৩] এটাই গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত "Law of Pregnance" বা "Principle of Closure এর অনুসৃতি।[২৪] হার্টম্যান অন্তর্দৃষ্টিকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'principle of closure' বা 'pregnance' এর মানসিক প্রতিফলন বলেছেন। তাঁর ভাষায়, শিক্ষা ব্যাপারটা মানে "একটা অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করা। চিত্রটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না, তাই 'সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ঐ অসম্পূর্ণতা শিক্ষার্থীর মনে একটা অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্তির সৃষ্টি করেছে, এবং তার থেকে সে মুক্তি খোঁজে।" [২৫]

এ ভাবে আমরা দেখি সমস্ত শেখাকে গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীগণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হিসাবে দেখেছেন—'All learning is problem-solving.' সমস্যার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলে সমাধানের। সমাধান হওয়া মানে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পূর্ব পটভূমিকা বা রূপটি (configuration) পরিবর্তিত হয়ে আরো অর্থপূর্ণ ও সুন্দরতর হয়ে ওঠা (restructured)। কফ্কা তাই শেখাকে 'reorganisation of the situation, বলে বর্ণনা করেছেন। অজানাকে

---

২৩ "A stimulus upsets an equilibrium on the receptive side of the system; this upset equilibrium results in a movement which tends to bring the system to a new equilibrium." Koffka—Psychologies of 1925.

২৪ "Closure is a special case of the Law of Pragnanz (usually translated "pregnance") or the principle of equilibrium. According to this law, every experience (perceptual or otherwise) tends to complete itself, and to become "as good as possible."

২৫ "Insight is really a kind of sight, i.e. a mode of perception. It is like all psychological processes, a kind of neural or cortical organisation that is established as soon as the organism achieves its purpose, i.e., it is internally apprehended correlate of the closing of an incomplete configuration whose very incompleteness has produced the 'problem', initially by keeping the learner in a state of tension." Hartmann.

ব্যক্তি যখন জয় করে, যখন নূতন সত্য তাহার জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হয়, তখন তার জ্ঞানের একটা সামগ্রিক রূপ পরিবর্তন হয়।

অবশ্য শেখার ব্যাপারটা সবটাই অন্তর্দৃষ্টির ফল একথা বলা যায় না। তাতে অতীত অভিজ্ঞতা এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসেরও স্থান আছে।[২৬]

Learning and task-tension—the learner has needs and the learner is active—Zeigarnik effects.

ব্যক্তির মনে যখন সমস্যার অসম্পূর্ণতা-জনিত একটি অতৃপ্তি ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়, তখনই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সুরু হয়। একে লিউয়িন্ 'task tension,' বলেছেন। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ারই পরিণতির দিকে একটা স্বাভাবিক গতি আছে। একটি অভাববোধের (need) দ্বারা ক্রিয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেই অভাবকে তৃপ্ত করতে পারে এমন শক্তি (Valence) বিশিষ্ট বস্তুর দিকে, ব্যক্তির ক্রিয়া সাধারণতঃ ধাবিত হয়। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়াটি সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অভাববোধ জনিত 'tension' বা অস্বস্তির ভাব চলতে থাকে। জাইগার্নিক্ এই task tension এর মূল্যের উপর অনেক পরীক্ষা করেছেন। কোন কাজে গভীর ভাবে যখন ব্যক্তি মগ্ন থাকে, যেমন মাটি নিয়ে কাজ করতে করতে, মূর্তিটি মোটামুটি যখন 'কুকুর' বা 'ঘোড়ার' আকৃতি নিচ্ছে, ঠিক এমন সময় অভীক্ষক (experimenter) কাজটি বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। যে শিশু মূর্তিটি গড়ছিল সে অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ বন্ধ করে, অন্য কাজে প্রবৃত্ত হয়। তারপর আবার পূর্বেকার অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে শিশুটি ইচ্ছুক হয়। এভাবে আরো নানা প্রকার সমস্যার সমাধানে রত ব্যক্তির কাজে বাধার সৃষ্টি করে দেখা গিয়েছে যে, অসমাপ্ত সমস্যাটি শিশুর মনের অচেতনে অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং নানাভাবে তা তৃপ্তি খোঁজে। গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ভাষায় বলতে গেলে, ঐ অসমাপ্ত ক্রিয়াটি ব্যক্তির মনে একটি 'quasi-need' এর সৃষ্টি করে। এবং ঐ চাহিদা বা অভাব বোধ

---

২৬ Murphy—An organised whole is ultimately built up, and the general form of response may be repeated even when specific reactions which have been learned can no longer occur. Sudden insight in the process of learning is due to reorganisation in the perceptual field and reorganisation of motor responses.

Murphy. A Briefer General Psychology p. 265-66.

ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার অস্বস্তি ও অতৃপ্তি শিক্ষক সৃষ্টি করতে পারলে, বাইরের পুরস্কারের লোভ দেখাবার প্রয়োজন হয় না, এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে তিরস্কার বা শাস্তিরও প্রয়োজন হয় না।[২৭]

অনেক মনোবিজ্ঞানী অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে 'ফল' বা পুরস্কারের প্রতি একটা নিরাসক্ত ভাব লক্ষ্য করেন। প্রাণী কিছুক্ষণের জন্য মনোনিবেশ করে সমাধানের উপায় ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণে,—কিন্তু ফললাভের মুখ্য উদ্দেশ্যে নয়।

Degrees of insight—hindsight & foresight—অনেক সময় সমগ্র সমস্যার রূপ ও সমাধানটি হঠাৎ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এই বিদ্যুতের চমকের মত আকস্মিকতাকে (suddenness) অনেকে অন্তর্দৃষ্টির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। **"যখন ব্যক্তি একটি অবস্থা সমগ্রভাবে দেখে এবং কিছু শেখে, তখন সে শিক্ষাকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ শিক্ষা। সমস্যা সমাধানের বেলায় এই অন্তর্দৃষ্টির মানেই এই যে সমগ্র সমাধানটা হঠাৎ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে।" আমরা খুশী হয়ে বলি, ওঃ বুঝেছি—Eureka, Eureka!** কোন মনোবিদ্ এই খুশীকে বলেছেন—"the aha ! feeling." এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের সামনের পথটি আলোকিত করে তোলে। তাই একে আমরা অগ্রদৃষ্টি বা foresight বলতে পারি। কিন্তু সমগ্র সমস্যাটি আমাদের কাছে হঠাৎ একেবারে পূর্ণভাবে ধরা নাও দিতে পারে। সমগ্র সমাধানটার একটা অস্পষ্ট ধারণার পথ ধরে কিছুটা অগ্রসর হতে পারি, আবার থেমে পশ্চাতের ক্রিয়াগুলির তাৎপর্য্য বুঝি,—আবার সামনে অগ্রসর হই। ক্রমে ক্রমে শেষ সমাধানে পৌঁছতে পারি। এই সমগ্রতার রূপও ধীরে ধীরে বদলিয়ে যায়। যেন একটা ভাঙ্গা ছবি ক্রমে ক্রমে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে চলে। প্রথম ধারণার অস্পষ্টতা শিশুকে উৎসাহ দেয়, স্পষ্টতর ধারণার দিকে অগ্রসর হতে। উডওয়ার্থ একে 'degrees of insight' বলেছেন তিনি বলেন, "এই অন্তর্দৃষ্টি **কখনও বা অগ্রদৃষ্টি (foresight)**, কখনও বা **পশ্চাৎদৃষ্টির (hind**

---

[২৭] Blum Zeigarnic—"On Finished and Unfinished Task." A source book of Gestalt Psychology. ELLIS.

sight) রূপ নেয়। শিম্পাঞ্জী যখন কাঠি দুখানা জোড়া দিয়ে ফলটি পাড়বার জন্যে দৌড়ে গেল, তখন সেটি হল অগ্রদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। অগ্রদৃষ্টির ফলে উদ্দেশ্যে পৌঁছবার পথে অগ্রসর হওয়ার আগেই পথটা (হঠাৎ) দেখা যায়, আর পশ্চাৎদৃষ্টি মানে সমস্যা সমাধানের দিকে একটা পথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে বোঝা যায়, যে পথটি ঠিক। যেখানে একটা সমস্যার সকল দিক খোলাখুলি ভাবে জীবের নিকট উন্মুক্ত থাকে, সেখানে জীবের পক্ষে অগ্রদৃষ্টি সম্ভবপর, কিন্তু যেখানে সমস্যার মূল ও প্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিদৃশ্যমান নয়, সেখানে জীবের বড় জোর কিছুটা পশ্চাৎদৃষ্টি থাকবে, এমন আশা করা যায়।" অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেখাটা অসম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, ক্রমে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির দিকে এগিয়ে চলে।

Good and bad insight—অন্তর্দৃষ্টির ফলে, সমস্যার সমাধানটি সম্পূর্ণ ঠিক নাও হতে পারে। অর্থাৎ সমাধানটির উন্নতি সর্বদাই সম্ভব। এক হিসাবে সমস্ত শিক্ষাই অপূর্ণ, এবং সমস্ত শিক্ষার গতিই অপূর্ব সমাধান থেকে পূর্ণতর সমাধানের দিকে। সমগ্রতাবাদীগণ একে 'Law of precision' বলেছেন। কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, মানুষ সর্বদাই জ্ঞানের পূর্ণতার দিকে চলেছে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা, অন্য কোনখানে' এই ভূমার প্রতি অভিযানই মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। কোন শিক্ষার্থী যখন প্রথম একটি অঙ্কের সূত্র বা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করল, তাও একপ্রকার অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু তা অপূর্ণ ও অস্পষ্ট। শিক্ষক এইখানেই শিশুকে সাহায্য করতে পারেন। তার সমাধানটির ভুল দেখিয়ে দিয়ে, তাকে পূর্ণতর সমাধানের পথের ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন।[২৮] অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে আমরা দেখি সমস্যা সমাধান হয়, ভুল থেকে নির্ভুলে উত্তরণে নয় অপূর্ণ থেকে পূর্ণতর সমাধানের পথে অগ্রসর হয়ে। সমস্যাটির অস্পষ্ট সামগ্রিক রূপ, খণ্ডাংশ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে, স্পষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীর মনে অখণ্ড নিটোল রূপ গ্রহণ করে। "জীবনের অগ্রসরণের মূল ধর্ম হচ্ছে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততায়, অবিভক্ত অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্ট বিভিন্নতায়, বিচ্ছিন্নতা থেকে সংশ্লিষ্টতায়" পরিবর্তন। এতে

---

২৮ "The function of the teacher is, therefore, to restructure the primitive insights of his pupils, and to avoid supporting or merely ignoring 'incorrect' insights."

একীকরণ ও বিশ্লেষণ দুইই হাত ধরাধরি করে চলে"।[২৯] জীবনের ক্রম-বিবর্তনের বেলায় যে কথা সত্য, শেখার বেলায়ও সেই কথা সত্য।

মানবশিশুর ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি—শিম্পাঞ্জীদের উপর কোয়হ্‌লার যে সব পরীক্ষা করেছিলেন, তার অধিকাংশই দুই চার বৎসর বয়সের শিশুর উপর পুনরায় কোয়হ্‌লার ও অলপোর্ট করেছিলেন। কোয়হ্‌লার সিদ্ধান্ত করেন, বানরেরা যেমন, ছোট শিশুরাও তেমনি, অন্তর্দৃষ্টির ফলে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। এখানেও অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃতি ও পরিমাণ শিশুর বয়স ও মানসিক পরিণতির উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন মতের অনুসৃত কয়েকটি প্রয়োজনীয় নীতি এবং সমন্বয়—উপরোক্ত মতবাদগুলি প্রত্যেকটিই শেখার কোন না কোন একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করে। সুতরাং যদিও কোন একটি মতই সর্ব অবস্থায় প্রযোজ্য নয়, তথাপি প্রত্যেকটিই আবার অংশত সত্য। তাই এই মতগুলির মধ্যে আপাত বিরোধ থাকলেও, এদের সমন্বয় অসম্ভব নয়।

সমগ্রতা মতবাদ, শেখার উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে এটাই বোধ করি, শেখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শেখা কতগুলি ধরাবাধা অভ্যাস বা তথ্য অন্ধভাবে সংগ্রহের 'কায়দা' মাত্র নয়। জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শেখার যোগ আছে। তাই যা কিছু এই প্রয়োজনকে মেটাতে পারে, তাতেই জীব উৎসাহিত হয়। একথা থর্ণডাইকও স্বীকার করছেন। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে, সমস্যাগুলিকে ছাত্রের ক্ষেত্র বা পরিবেশের সঙ্গে, তথা তার আগ্রহের সঙ্গে, যুক্ত করা। তার বুদ্ধি ও মানসিক পরিণতি, অতীত শিক্ষাদীক্ষা, এসবই একসঙ্গে তার field, background বা পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আগ্রহের প্রকৃতি বোঝা যায়, এবং শুধু বোঝা নয়,—আগ্রহ সৃষ্টি করা চলে। শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করে সেই অভিমুখে অগ্রসর হতেই বেশী আগ্রহ বোধ করে। এবং আগ্রহ একবার সৃষ্ট হলে আপন স্বাধীন শক্তিতেই সে অগ্রসর হয়ে চলে। অসম্পূর্ণতা বোধ একটি লক্ষ্য হতে লক্ষ্যান্তরে ঠেলে নিয়ে চলে। প্রথম লক্ষ্য বস্তুর উপর আগ্রহ তখন নির্ভর করে না। এটাই হচ্ছে functional autonomy।

[২৯] Kurt Lewin—Field Theory & Experiment in Social Psychology.

শিশুর কাছে শেখা প্রাণবন্ত হয়, যখনই শেখা তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শেখার বিষয়বস্তুকে তার নিকট একটি আনন্দদায়ক সমস্যারূপে উপস্থিত করতে পারলেই, তার কৌতূহল জাগ্রত হবে, ও সমস্যা সমাধানে সে চেষ্টিত হবে। কারণ সেখানে তার প্রাণের সোৎসাহ সম্মতি আছে। এবং সেই চেষ্টার ফলে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। ফললাভের আনন্দ শেখার ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ কার্য্যকরী নীতি, যা এতকাল শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এসেছিলেন। তবে সমস্ত সমস্যার সমাধান সমগ্রতাবাদীর মত অনুযায়ী 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' রূপে নাও আসতে পারে। প্রতি সমাধানের পূর্ব্বে থাকে, পথ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা কিছু চেষ্টা, কিছু ভুল। এখানে থর্ণডাইকের ফলাফলের সার্থকতা নির্ণয় ও ভুল পরিহারের পদ্ধতি আমরা মানুষের ব্যবহারে দেখি। কিন্তু এই পদ্ধতি অন্ধ নয়, তা পশ্চাৎদৃষ্টির আলোতে সমুজ্জল। মানুষের ব্যবহারে 'trial and error' এবং 'insight' উভয়ই যুক্তভাবে দেখা যায়। বিমূর্ত চিন্তা ও বিচারের স্তরেও বিভিন্ন সমাধানের পথ নিয়ে বিচার চলতে পারে।[৩০]

কিন্তু সমস্যার সমাধান একবার হলেই তা চিরকাল মনে থাকবে, এমন নয়। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন। এই অনুশীলনের ফলেই শেখার বস্তুটি মনে গেঁথে যাবে। একদিনে কেউ দক্ষ পিয়ানোবাদক হয় না। সাফল্যের মূলে থাকে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অনুশীলন ও চেষ্টা। এই অনুশীলনের নীতি তখনই সফল হয় যখন তা শিক্ষক মহাশয়ের বেত্র আস্ফালনের ফলে অনুসৃত না হয়ে, আপন আগ্রহে আপন প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হয়।

এই স্বাধীন ভাবে আপন পথে উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষমতা একদিনে জন্মায় না। শিশুর অসংখ্য প্রতিক্রিয়াকে সস্নেহে নিয়ন্ত্রিত করে উপযুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এখানেই আমরা 'conditioned reflex' মতবাদের সারবত্তা উপলব্ধি করি। জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে কিছু নিয়ন্ত্রণ চাই,—ঠিক Conditioning of response চাই—এর সঙ্গে stimulus টির সংযুক্তি চাই। তাই সংক্ষেপে বলা চলে, "শিক্ষাতে আছে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে

---

৩০ An insight is often incorrect. Although it be incorrect, it requently prompts the next move.

উপায়ের সামঞ্জসীকরণ। শিক্ষা ক্রিয়াতে তাই ফল সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে; তাতে ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করা হয়, আর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ঠিক প্রতিক্রিয়াটি স্থাপন করা হয়। শিক্ষাতে থাকে—নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসরণ।" আমেরিকান শিক্ষাবিজ্ঞানী জন ডিউই (Jonn Dewey) বলেন, "শিক্ষা একটি অনুভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।...এতদিন যাবত বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বিদ্যা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই, কারণ সেখানে ছাত্রদের উপর রুটিন বাঁধা কাজ চাপান হয়েছে, তারা যা শিখছে তার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনটি যুক্ত হয়, শেখার, বিষয় তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠে তখনই,—যখন তা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে।" ৩১ শিক্ষকই এমন বিষয় শিক্ষার জন্যে নির্বাচন করবেন যা শিশুর পরিণতি, আগ্রহও উদ্দেশ্যে সব সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৩২

অনুশীলনের প্রভাব ও শেখায় উন্নতি (Effect of practice on learning and improvement) শিক্ষায় পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাসের বিশেষ স্থান আছে। ব্যবহারবাদীর মতে, এটাই শিক্ষার একমাত্র উপায়। যে সব নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জনে পেশী নিয়ন্ত্রণ ও অঙ্গচালনার প্রশ্ন থাকে,—যেমন সাঁতার, সাইকেল চালান, গল্ফ খেলা, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী ইত্যাদি। সে সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে অনুশীলন বা practice একান্ত প্রয়োজনীয়। কর্মে দক্ষতা বা নৈপুণ্য শুধু অভ্যাসেই আসা সম্ভব।

প্রশ্ন এই যে, দক্ষতা বা নৈপুণ্যলাভের গতি ও মাত্রা কি সকল ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির সমান, না এবিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে? আবার, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির হার কি একটানা সমান তালে চলে? আমাদের উন্নতির কি কোন সীমা আছে?

আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

---

৩১ Dewey—Education and Experience. p. 105-6,

৩২ When an interest system has been formed, it not only creates a tensional condition that may be readily aroused, leading to overt conduct in some way satisfying to the interest, but it also acts as a silent agent for selecting and directing any behaviour related to it.
Allport. Personality. P. 281-82.

যেমন চরকায় সুতাকাটা প্রথম প্রথম একহাতে চরকা ঘোরান, আর অন্যহাতে তুলার পাঁজ নিয়ে টাকু থেকে টেনে সুতা বার করা ও গুটান, এদুটি কাজ একসঙ্গে হতে চায় না। এক হাত চলে, তো অপর হাত বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন অভ্যাসের পর, কিন্তু কায়দাটি বেশ আয়ত্তে আসে। তখন **দ্রুত উন্নতি** (spurt) হতে থাকে, দিনের পর দিন, ঘণ্টায় সুতার পরিমাণ বেশী হয়, সুতার জাতও ভাল হতে থাকে। এই উন্নতির মাত্রা কিন্তু সবার সমান হয় না, কেউ তাড়াতাড়ি কৌশলটি আয়ত্ত করেন, কেউ বা বেশী সময় নেয়। আবার একজনের পক্ষেও উন্নতির হার একটানা সমান হয় না। কিছুদিন দ্রুত উন্নতির পর, আবার উন্নতির হার শ্লথ হয়, আর উন্নতি দেখা যায় না। শিক্ষার্থীর মনেও আশানিরাশার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এটা তার পক্ষে কঠিন পরীক্ষার সময়। একে মনস্তাত্ত্বিকেরা শিক্ষার উন্নতির রেখায় **স্থিতাবস্থা** **(plateau)** আখ্যা দিয়েছেন। তখন হয়ত একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সুতা কাটবার একটা উন্নততর কৌশলের সন্ধান দেন। কিছুক্ষণ অভ্যাসের পর দেখা যায়, আবার একটা উন্নতির উর্দ্ধগতি (spurt)। এর ফলে, আবার কিছুদিন বেশ উন্নতি দেখা যায়। তারপর আবার একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে। এ-ভাবে চলতে চলতে কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ পরিণতির দিকে যখন অগ্রসর হয়, তখন একটা নূতন ও **শেষ উত্থম** (**end spurt**) দেখা যায়। সাধারণতঃ শিক্ষায় উন্নতির সঠিক আংকিক পরিমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। দৈহিক নৈপুণ্যের পরিমাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরীক্ষার ফল আমরা জানি। স্ট্যাণ্ডিফোর্ড টরণ্টোর হাইস্কুল অব কমার্স এর টাইপরাইটীং শিক্ষার্থী একহাজার ছাত্রের উপর একটি পরীক্ষার ফল বর্ণনা করেছেন।

স্কুলে তিনবৎসর ধরে, মোট ৩৬০ ঘণ্টা ব্যাপী এই পরীক্ষাটি চালান হয়। প্রতি সপ্তাহের শেষে, অর্থাৎ মোট পাঁচ ঘণ্টা টাইপরাইটিং অভ্যাসের পর, একবার করে প্রত্যেক ছাত্রের টাইপরাইটিং এর গতি (speed) এবং কতটা নির্ভুল ভাবে টাইপ সে করতে পারে (accuracy) তা পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষার সব ফল বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হয়।

১। ছাত্রদের একজনের উন্নতির হারের সঙ্গে অপরের হারের যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। সকলে একই হারে শিখতে পারে না।

২। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আবার তার উন্নতির গতি একটানা সমান নয়।

৩। লম্বা ছুটীর পর, অনভ্যাসে উন্নতি বেশ কিছুটা পিছিয়ে যায়। তবে আবার অল্প কয়েক ঘণ্টা অভ্যাসের পরেই, পূর্বের কুশলতা ফিরে আসে। এতে বুঝা যায় যে অভ্যাসের ফলটা, অনভ্যাসকালেও ছিল,—সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।

৪। প্রথম শিখতে যত দ্বিধা ও বাধা ছিল, তা কাটিয়ে উঠলে, বেশ কিছুদিন দ্রুত একটানা উন্নতি দেখা যায়।

৫। কিন্তু পরে ক্রমশঃই গতি মন্থর হয়ে যায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই, দেখা যায়, এমন একটা সময় আসে, যখন আর উন্নতি হতে চায় না, অভ্যাসেও কোন ফল হয় না। এই স্থিতাবস্থাকে plateau বলা হয়েছে।

শিক্ষার উন্নতির একটি রেখা চিত্র নীচে দেওয়া হল।

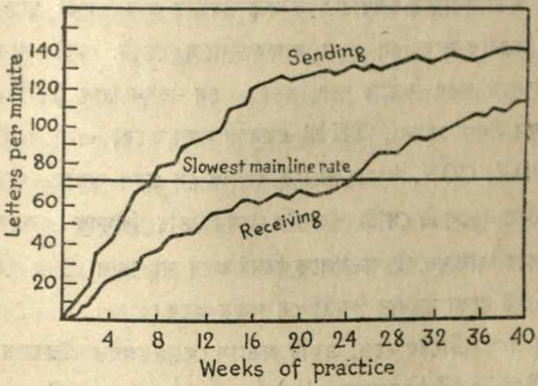

Fig. 55. Practice curves or curves of learning of a student of telegraphy. After Bryan & Harter, from Woodworth & Marquis, Psychology. P. 513, Fig. 127.

অনেকদিন ধরে ক্রমান্বয়ে যদি শিক্ষার গতির একটা হিসাব রাখা যায়, ও সময় সংক্ষেপ এবং নৈপুণ্যের একটি রেখা চিত্র আঁকা যায়, তা হ'লে দেখা যায়, রেখাচিত্রটি একটি উর্ধমুখী অসমান বক্ররেখার আকার ধারণ করে। এতে শিক্ষার উন্নতির উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সবই দেখা যায়। প্রথম জড়তা কাটাতে কিছু সময় লাগে (warming-up period), তারপর দ্রুতগতিতে একটানা উন্নতির পর, ধীরে ধীরে উন্নতির হারের হ্রাস হয়, মাঝে মাঝে রেখাটি সমান্তরাল ভাবে চলে, (plateau), পরে আবার উন্নতি (spurt)। এভাবে চলতে চলতে কোন একসময় আর উন্নতি হয় না।

শিক্ষার উন্নতিতে স্তব্ধতা বা plateau প্রথমে আবিষ্কার করেন, ও এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ব্রায়ান ও হার্টার (Bryan & Harter)। তাঁরা টেলিগ্রাফী শিক্ষার (সংবাদ পাঠান ও সংবাদ গ্রহণ করা) বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁহারা দেখেন, যে কিছু উন্নতির পর একটা স্থানু।বা স্থিতাবস্থা আসে; **সেই অবস্থাটা স্থায়ী হয় না, যদি উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথম শিখবার ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিকে পরিবর্তন করা যায়।** সাধারণতঃ এই পরিবর্ত্তনকেই ঐ plateauর অবসানের কারণ বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন। টেলিগ্রাফীতে শিক্ষার্থী প্রথমতঃ প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা পাঠাতে ও গ্রহণ করতে সুরু করে। মনোযোগ থাকে অক্ষরের প্রতি (letter habit)। ঐ অক্ষরের অভ্যাস গঠিত হওয়ার সময় দ্রুত উন্নতির হার দেখা যায়। আরো তাড়াতাড়ি করবার জন্যে, সে তখন অক্ষরগুলিকে ছোট ছোট শব্দে ও শব্দ সমষ্টিতে সা জয়ে গ্রহণ করতে সুরু করে। সে তখন শুধু T, H, এবং E আলাদা করে লক্ষ্য করেনা, 'THE' একসঙ্গে লক্ষ্য করে, এভাবে ধীরে ধীরে TION, PRE, CON, আরো অনেক শব্দাংশ সে গ্রহণ করতে পারে, পৃথক পৃথক অক্ষরের বদলে ঐ গোটা শব্দগুলি তখন তার শিক্ষার এককে (unit) হয়। এভাবে আবার সেই অভ্যাসকে বিনষ্ট করে বা তার উপর ভিত্তি করে একসঙ্গে একটি বাক্য বুঝবার ক্ষমতা সে অর্জন করে।

ব্রায়ান্ এবং হার্টারের মতে, একটি অভ্যাস থেকে অপর উন্নততর অভ্যাসে যাবার পথটিতে, একটি স্থিতাবস্থা আসে, কারণ প্রথম অভ্যাসটি তার উন্নতির সীমারেখায় পৌছেছে, এবং অপর অভ্যাসটি সবে সুরু হয়েছে, এখনও আয়ত্ত হয় নি, তাই এই আপাতস্থানু অবস্থা। তাঁদের ভাষায় "টেলীগ্রাফী কেবলমাত্র একটি সহজ অভ্যাস নয়, ইহা কয়েকটি ক্রমশঃ জটিলতর অভ্যাসের স্তর বিন্যাস। পরবর্তী জটিলতর অভ্যাস, পূর্ববর্তী সহজ অভ্যাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়। কাজেই শিক্ষার উন্নতির রেখার যে স্থানু অবস্থা, তা শুধু পূর্বের অভ্যাসটি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, তারই সাবধান বাণী। ঐ বাধা থেকে মুক্তি পেলেই উন্নততর ক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।[৩১]

---

[৩১] Bryan and Harter—Studies in the Physiology and Psychology of Telegraphic Language. p 27-53.

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে উন্নতির এই স্থানুঅবস্থা সমস্ত শিক্ষারই একটা লক্ষণ। অবশ্য অনেক অভ্যাস গঠনের বক্ররেখা এই প্রকার রূপধারণ নাও করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় প্রথম দিকে উন্নতির গতি অত্যন্ত ধীর, পরে দ্রুততর। অনেক ক্ষেত্রে আবার বক্ররেখা অনেকটা সোজা একটানা উপরের দিকে চলে। এসব ক্ষেত্রে বলা হয় যে এই প্রকার বক্ররেখা গুলি ঐ বিষয়ে শিক্ষার পূর্ণ ইতিহাস জ্ঞাপন করে না। একটানা সোজা উন্নতির অর্থ এই যে ব্যক্তি পূর্বেই এ বিষয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিল। একেবারে গোড়া থেকে সে এখানে সুরু করে না। একটি পূর্ণ শিক্ষার উন্নতি জ্ঞাপক বক্র রেখায় সাধারণতঃ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সবই দেখা যায়। কেউ কেউ, যেমন Book, এই স্থিতাবস্থার কারণ নির্দেশ করেন বিরক্তি বা Boredom। আবার অনেকের মতে (Millard,) এর কারণ হতে পারে, আগ্রহের অভাব বা 'low motivation.' এই কারণগুলি না থাকলে সাধারণতঃ এক পদ্ধতি থেকে উন্নততর পদ্ধতিতে যাওয়ার পথে এই স্থানু অবস্থা ঘটে এটা ঠিক, এবং অভ্যাসের স্তরভেদ আছে, এটাও সর্বজনস্বীকৃত।

শিক্ষার উন্নতির সীমা—Limits of Learning—শিক্ষায় উন্নতির একটা শেষ সীমা আছে। সকল নৈপুণ্যেরই একটা আদর্শগত চরম সীমা রেখা (ideal limit) আছে। আদর্শের ঐ পরিপূর্ণ মূর্তি, কখনই কাহারো পক্ষে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না।

সাধারণভাবে কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য আয়ত্ত করবার সীমারেখা, মানুষের দেহমনের ক্ষমতার শেষ প্রান্তে আমরা টেনে থাকি। এটাই কোন ব্যক্তির শিখবার চরম দৈহিক (physiological limit) সীমা—যার পর হাজার চেষ্টা করলেও আর উন্নতি হয় না। কার্যতঃ মানুষ কখনই এই চরম সীমা পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তার বাস্তবিক শিখবার সীমা বা practical limit, আরো অনেক নীচে। সীমা মানুষের ক্ষমতা হিসাবে বিভিন্ন হয়ে থাকে, ফলে দক্ষতারও প্রকারভেদ দেখা যায়।

অল্প সময়ে ভাল করে শিখবার উপায়—Factors of economial learning.—এতক্ষণ আমরা শেখার প্রকৃতি ও কি ভাবে শিখি, এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। শেখা মানে, নূতনকে আয়ত্ত করা, অভিজ্ঞতা লাভ করা ও তার ফলে পরবর্তী ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যাওয়া। অতীত অভিজ্ঞতাকে

যখন নূতন অবস্থায়, কাজে লাগাতে পারি, তখনই আমরা কিছু শিখেছি বলে দাবী করতে পারি। এই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়, যখন ব্যক্তির সঙ্গে নূতন অবস্থার সংযোগ ঘটে, এবং সে চেষ্টা করে, ঐ অবস্থার সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে। ফলে ব্যক্তি ও অবস্থা উভয়ই রূপ পরিবর্তন করে। এই সংযোগ ও পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের প্রয়োজন বোধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা রুচি বুদ্ধি এবং ক্ষমতা। এভাবে অনেক কিছু ব্যাপারই শিক্ষার মূলে কাজ করে, যার অভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় না।

এখন প্রশ্ন এই যে কোন্ উপায়গুলিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শেখার সময় বাঁচে, শেখা সহজতর ও কার্য্যকরী হয়, বিস্মৃতির হার কম হয়? এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর তথ্য জানা গিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উপায়গুলি (conditions) ব্যবহার করলে শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হতে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যায়, শেখাটা তাড়াতাড়ি হয় এবং তার ফলও দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেখাটা একটা সামগ্রিক ঘটনা, এর প্রধান তিনটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল শিক্ষার্থী, বিষয়বস্তু, এবং শিখবার পদ্ধতি। এই তিনদিক থেকে সফল শিক্ষার উপায়গুলি আলোচনা করছি।

শিক্ষার্থী—শিখবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির শিখবার ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে, তার বয়স, বুদ্ধি, প্রয়োজনবোধ বা আগ্রহ, দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপরে।

বয়স ও বুদ্ধির পরিণতি—Age & Maturity—যে কাজের জন্যে শিশুর দেহ ও মন তৈরী হয় নি, তা শেখাতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাধারণতঃ দেখা যায় উত্তর কৈশোর পর্য্যন্ত (late teens) ব্যক্তির বুদ্ধির উন্নতির রেখা ঊর্দ্ধমুখী। তার পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখবার ক্ষমতার গতি নিম্নদিকে চলে। একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়সের সঙ্গে শিক্ষার হারের সম্বন্ধ নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হয়। তিনটি দলের উপর পরীক্ষা চলে। ছোটদলের বয়সের সীমা ১২ থেকে ১৭; দ্বিতীয় দলের বয়স ৩৪ থেকে ৫৯; তৃতীয় দলের বয়স ৬০ থেকে ৮২ বৎসর। তাদের সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক বুদ্ধি এবং শেখার ইচ্ছা মোটামুটি সমান। যে সব কাজে অতীতের শিক্ষা ও অভ্যাসকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা চলে, তাতে

অল্পবয়সী ও বেশীবয়সীদের মধ্যে তারতম্য খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অতীতে অর্জিত ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন নূতন করে শেখার বেলায় বেশীবয়সীদের শিক্ষায় উন্নতির হার অত্যন্ত কমের দিকে ছিল। এরকম একটি বিষয় ছিল, ভুল নামতা মুখস্থ করা, যেমন ২ × ৪ ৯, ৫ × ৪ = ১৪ ইত্যাদি। এখানে অতীত অভ্যাস নূতন শিক্ষা বা সংযোগকে বাধা দিয়েছে, এবং ঐ বাধা বয়সের সঙ্গে বাড়ে।[৩৪] আড়াই বৎসর থেকে তিন বৎসরের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার একটা ঝোঁক বর্তমানে দেখা যায়। এতে মা বাবার ছেলেমেয়েকে অতি দ্রুত দিগ্‌গজ পণ্ডিত গ'ড়ে তুলবার অতিরিক্ত আগ্রহই প্রমাণ হয়। বাস্তবিক এতে কিছু লাভ হয় না। যে সব ছেলেমেয়ে ৫ বছর বয়সে স্কুলে প্রথম ভর্তি হয়, তারা অল্প দিনের মধ্যেই বেশী অল্প বয়সে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের ধরে ফেলে। তার কারণ এদের বুদ্ধির স্বাভাবিক পরিণতির ফলে এরা অনেক সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং পূর্ব শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও রুচি—Interests—প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী এক এক জনের এক এক বিষয় শেখার দিকে স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ থাকে। এই স্বাভাবিক মনের গতি অনুযায়ী শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করলে উন্নতি বেশী হয়।

প্রয়োজন বোধ, চাহিদা ও আগ্রহ—Needs, interests attitutes motivation—ব্যক্তির প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শেখার আগ্রহের সুগভীর সম্বন্ধের কথা সমগ্রতাবাদীগণ ও থর্ণডাইক সকলেই স্বীকার করেছেন। মানুষের আদিম আগ্রহ বা জৈব তাড়না ছাড়াও তার শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবের ফলে নানা আগ্রহ, ঔৎসুক্য, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয়। এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ আপনা থেকেই আসে, ও শেখা সহজতর হয়।

শেখার সময়ে মানসিক অবস্থা—Mental dispositions & task tension—শান্ত, অনুদ্বিগ্ন, প্রফুল্ল মন শেখার কাজ সহজ করে। মানসিক উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য মনঃ সংযোগের বিঘ্ন, সুতরাং শেখার পক্ষেও বাধা সৃষ্টি করে। তবে বিষয়বস্তু কিছুটা আয়ত্ত হলে সমাপ্তির দিকে একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ও

---

[৩৪] Hovland. Carl. 1. 'Learning'. Yale Univ. Foundations of Psychology. Ed. Weld, Boring, Langeld.

অতৃপ্তির সৃষ্টি হয় (task tension), তাতে শেখার কাজে সাহায্য হয়। "দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সব সময় ক্ষতিকর, দেহের দিক থেকেও বটে, শিক্ষার দিক থেকেও। তবে কোন একটা নূতন অবস্থায় যখন সমস্যাটার উপর কিছুটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তখন ঐ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য শিখবার হারকে ত্বরান্বিত করে।" [৩৫]

স্বাস্থ্য—সুস্থ ও অনবসন্ন দেহ শেখার কাজে সহায়—রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বদ্ধ বাতাস ও ক্লান্তি শেখার কাজ ব্যাহত করে। কৃত্রিম উত্তেজক—যেমন মদ্য, চা, তামাক, ষ্ট্রিক্নিন্, ক্যাফিন্ নিয়ে শেখার উপর তাদের প্রভাব নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। অতিরিক্ত মাত্রায় মদ স্মৃতিশক্তি ও বিচার বুদ্ধি কমিয়ে দেয়, অল্পমাত্রায় মদ কখন কখন মনোসংযোগের পক্ষে অনুকূল। অধিকাংশ পরীক্ষার ফল, তামাক, সিগারেট জাতীয় ধূমপানের প্রতিকূল। ষ্ট্রিক্নিন্ এবং ক্যাফিন্ অল্পমাত্রায় মনোযোগের সহায়ক। চা, কফি, কোকো ইত্যাদি পানীয়ও পরিমিত মাত্রায় শেখার কাজে সাহায্য করে। তবে দীর্ঘকাল যে কোন উত্তেজক পদার্থের অভ্যাস কিছু না কিছু কুফল উৎপন্ন করে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু—শিক্ষণীয় বস্তু অর্থপূর্ণ হলে, শেখা সহজতর হয়, কারণ সেখানে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) স্থাপন করা যায়। সমগ্রতাবাদ এই অর্থপূর্ণ জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। দেখা গিয়েছে Nonsense Syllable অপেক্ষা অর্থপূর্ণ শব্দ, কবিতা, সংখ্যা, ও গদ্যাংশ তাড়াতাড়ি শেখা যায়। [৩৬] এ বিষয়ে লিওনের (Lyon) একটি পরীক্ষার ফল উল্লেখযোগ্য—

Effect of meaningfulness in learning equal number of units of different materials.

বিষয়বস্তু	২০০ বস্তু (units) শিখতে মিনিটের সংখ্যা
অর্থহীন শব্দ সমষ্টি	৯৩
সংখ্যা	৮৫
শব্দ (গদ্য)	২৪
শব্দ (কবিতা)	১০

[৩৫] Sandiford—Educational Psychology, p. 232

[৩৬] Rate of learning is a direct function of the meaningfulness of the material, provided everything else remains constant.

এখানে দেখা যায় অর্থহীনতার জন্যে non-sense syllables শিখতে সর্বাধিক সময় লেগেছে। বার্টলেট্ তাঁর 'Remembering' পুস্তকে দেখিয়েছে যে non-sense syllable শেখার মধ্যেও অনেক সময় সম্বন্ধ স্থাপনের ও ছন্দ (rhythm) খুঁজে বের করবার চেষ্টা দেখা যায়। ফলে এগুলিও সম্পূর্ণ অর্থহীন থাকে না এজন্য non-sense syllable এর সাহায্যে Ebbinghaus এর স্মৃতি পরীক্ষাকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

এই সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে আমরা সমগ্রতাবাদের Law of configuration ও থর্ণডাইকের 'Belongingness' কাজ করছে, দেখতে পাই।

যে শব্দ বা সংখ্যাগুলি কোন বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা গ্রথিত হয়, যেমন টেবিল-চেয়ার, সবুজ-ঘাস, ইত্যাদি তা শেখা ও মনে রাখা সহজ। এই সম্বন্ধ বা Logical relations লক্ষ্য করা, 'Insightful learning, এর একটি বৈশিষ্ট্য। উড্ওয়ার্থ বলেন, 'ঘটনার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে স মনোযোগ তথ্যানুসন্ধানই' সহজে ভাল করে শিখিবার মূলমন্ত্র। অর্থাৎ একাগ্রতা নিষ্ঠা ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের অভ্যাস শেখার কাজে বেশী প্রয়োজন।

বিষয় বস্তুর তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ নির্ভর করে শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের উপর।

পদ্ধতি—(১) অভ্যাস চাই—অনুশীলনের প্রভাব পূর্বেই আলোচনা করেছি। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ দরকার। একটি কবিতা বারে বারে না পড়লে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় না।

কিন্তু এই অভ্যাস যদি তোতাপাখীর মত অন্ধ আবৃত্তি হয় (cramming or rote-learning) হয়, তা হলে সেই শেখা কখনই ভাল হয় না, এবং বেশীদিন তা মনে থাকে না। এতে পরিশ্রম বেশী, ফলও কম। অর্থ বুঝবার অভ্যাস (logical learning) তাড়াতাড়ি শেখার প্রধান উপায়। অবশ্য যেখানে শিক্ষিতব্য বিষয় অর্থহীন, সেখানে তা আয়ত্ত করতে হলে rote-learning ছাড়া উপায় নেই।

অভ্যাসের পশ্চাতে চাই শিখবার ইচ্ছা বা will to learn ; অর্থাৎ অভ্যাস নিষ্ক্রিয় ও যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি না হয়ে যেন চেষ্টা ও আগ্রহপূর্ণ হয়। তা হলে অল্প সময়ে ও অনায়াসে শেখা যায়। এবিংহজ্ এনিয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করেন। তিনি কতগুলি অর্থহীন শব্দ বার বার আবৃত্তি করেন, শিখবার কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না। পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তিনি একটি শব্দও

শিখতে পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব পরিত্যাগ করে শিখতে হবেই এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনঃসংযোগ করলেন, ফলে অতি অল্প সময়েই শব্দগুলি মুখস্থ করে ফেলতে পারলেন।

(২) **Over-learning**—পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু কতদূর পুনরাবৃত্তি করলে শেখাটি ভাল হয়? সাধারণতঃ যে কয়েকটি পুনরাবৃত্তির ফলে সমস্ত বিষয়বস্তুটি নির্ভুলভাবে মন থেকে বলা যায়, বা বিষয়টি শেখা হয়, তা থেকে বেশী আবৃত্তি করলেই তাকে 'overlearning' বলা হয়। অনুশীলনের মাত্রা সবে-শেখার প্রথম সীমা অতিক্রম করলে, ভাল মনে থাকে। এবিংহজ্ অনুশীলন বা আবৃত্তির সংখ্যার সঙ্গে মনে সংরক্ষণের সম্বন্ধ বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন ৬৪ বার পুনরাবৃত্তির পর শিক্ষার উন্নতির হার কমে যেতে থাকে। দেখা গেছে, শতকরা ৫০ভাগ শেখার পরও পুনরাবৃত্তি হ'লে শেখাটি মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, কিন্তু এর চেয়ে বেশীবার আবৃত্তি, শুধু সময়ের অপব্যয়।

(৩) **অনুশীলন ও বিরতি—Spaced learning**

অভ্যাসের সময়টা শিশুদের পক্ষে একটানা খুব লম্বা হওয়া উচিৎ নয়। তাতে ক্লান্তি আসে, মনোযোগ স্থির থাকে না। তার বয়স, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারে অনুশীলনের সময়ের দৈর্ঘ্য স্থির করতে হয়।

এই অভ্যাসের মধ্যে মধ্যে বিরাম চাই। উড্ওয়ার্থ বলেন, "কোন ফাঁক না দিয়ে, পুনরাবৃত্তি করলে যে ফল পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়, যদি মাঝে মাঝে বিরাম দেওয়া যায়। এই বিরামের দ্বারা শিক্ষার ফলটি মনের মধ্যে পাকা হয়ে বসবার সুযোগ পায় (consolidation)। অনেকক্ষণ পুনরাবৃত্তির পর সামান্য কিছু সময় বিরাম দিলে, সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।" অনুশীলন ও তার মধ্যে বিরামের সম্বন্ধ নিয়ে দুই ব্যক্তির উপর একটি পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল।[৩৭]

	প্রথম ব্যক্তির ফল	দ্বিতীয় ব্যক্তির ফল
দিনে ৮ বার করে ৩ দিন পড়া	৭	১৮
" ৬ " " ৪ " "	৩১	৩৯
" ২ " " ১২ " "	৫৫	৫৩

৩৭ Guilford—General Psychology, p. 403

পরীক্ষার ফল সর্বদাই spaced learning এর অনুকূলে। কতটা বিরাম দিলে সব চেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায়, তা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপরে। যে সব সমস্যা অন্তর্দৃষ্টি ও সম্বন্ধ বুঝবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, সেগুলি মোটামুটি একসঙ্গে (massed practice) পড়ে নেওয়াই ভাল। যেখানে শিক্ষা শুধুই অন্ধ ও যান্ত্রিক, সেখানে বিরতি বেশী কার্যাকরী।

Part vs. Whole method of learning—কোন পড়া বা কাজ শিখতে গেলে, সম্পূর্ণভাবে সবটা শিখলে ধারণা স্পষ্ট হয়। একটি কবিতা শিখতে হলে সমগ্র কবিতাটি একসঙ্গে কয়েকবার পড়লে শেখা ভাল হয়। উড্‌ওয়ার্থ বলেন "একটা বড় কাজ বা পড়া শিখতে গেলে, সবটা একেবারে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলেই সাধারণতঃ ভাল ফল পাওয়া যায়। কাজটা বা পড়াটা টুকরো টুকরো করে আংশিকভাবে শিখিবার চেষ্টা করলে ফল ভাল হয়না, যদিও সব সময় এটা সত্য নয়।

একটি পরীক্ষার ফল দেওয়া হল। ২৪০ লাইনের একটা পড়া একসঙ্গে ও আংশিকভাবে শেখার ফল।

পদ্ধতি	দিনের হিসাবে মোট সময়	মোট কত মিনিটে শেখা হল
একদিনে ৩০ লাইন করে শেখা, যতদিনে না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়	১২ দিন	৪৩১ মিঃ
দিনে ৩ বার সমগ্র পড়াটি পড়া, যতদিনে না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়	১০ দিন	৩৪৮ মিঃ

এখানে দেখা যায়, গোটা কবিতা বারে বারে পড়ে মুখস্থ করতে, মোট ৮৩ মিনিট সময় কম লেগেছে।

একে অবশ্যই একটি মোটামুটি সত্য নিয়ম বলা যায়। নূতন শিক্ষার্থী খুব বড় কোন কাজ, একসঙ্গে আয়ত্ত করতে সাহস পায় না। নিজ সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞান, আংশিক পদ্ধতির পক্ষে একটি বড় গুণ। অল্প অল্প করে শিখলে ব্যক্তি জানতে

পারে যে তার শেখার ক্ষমতা আছে; নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তার সাফল্যের পক্ষে সহায়ক হয়। তবে ছোট ছোট অংশে ভাগ করবার আগে লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন প্রতি অংশই কোন একটি পূর্ণ ধারণা দেয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, তাহাদের পক্ষে এই part method ই বিশেষ উপযুক্ত। কিন্তু টুকুরো টুকরো করে শিখে, শেষে আবার সবটা এক সঙ্গে পড়া দরকার। তা হ'লে শেখাটার মধ্যে ফাঁক থাকে না।

৫। সরব আবৃত্তি (Recitation) শেখার পক্ষে সহায়ক—সরব আবৃত্তিতে কান ও চোখ সম্মিলিত ভাবে মনোযোগকে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিষয় বস্তুটি চোখে দেখা ও পড়ার সঙ্গে, কানে তার উচ্চারণ শোনা যায়। এই যুগপৎ সংযুক্তি (sense modality) মনে রাখার পক্ষে বা অনুষঙ্গ স্থাপনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারে, সে কতটা শিখছে। এই যাচাই-এর মূল্য অনেক। গেইট্‌স এ বিষয়ে একটি পরীক্ষা করেন। ১৬টি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি ও ১৭০টি শব্দ-সম্বলিত ছোট ছোট জীবনী ছিল বিষয়বস্তু। নীরবে পড়া ও সরব আবৃত্তি এই দুই পদ্ধতিতে ঐ উভয় শেখার একটি তুলনামূলক গবেষণা তিনি করেন।[৩৮]

পড়ার সময়	অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি বিষয় মনে সংরক্ষণের শতকরা হার		ছোট জীবনী মনে সংরক্ষণের শতকরা হার	
	সঙ্গে সঙ্গেই	৪ ঘণ্টা পরে	সঙ্গে সঙ্গেই	৪ ঘণ্টা পরে
সমস্ত ক্ষণ নীরবে পড়া	৩৫	১৫	৩৫	১৬
১/৫ সময় আবৃত্তি	৫০	২৬	৩৭	১৯
২/৫ " "	৫৪	২৮	৪১	২৫
৩/৫ " "	৫৭	২৭	৪২	২৬
৪/৫ " "	৭৪	৪৮	৪২	২৬

এখানে অর্থহীন বর্ণ সমষ্টির ক্ষেত্রে সরব আবৃত্তি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

৬। Importance of effect in learning—কাজ বা পড়া শেখার কাজ বিশেষ কার্য্যকরী হয়, যদি প্রশংসা, উৎসাহ বা কোন প্রকার পুরস্কার

৩৮ Gates. Educational Psycholagy p. 304

জনিত তৃপ্তি এর ফলে লাভ হয়। এটা ফললাভের সূত্রের মূল কথা। সাফল্য উৎসাহের সঞ্চার করে। তাই যে কাজ আমরা ভাল পারি, সেটা স্বভাবতঃই আমরা অভ্যাস করি।

৭। **Collateral learning**—যারা ভাল ছাত্র, যারা ভাল শিখতে চায়, তারা যেটুকু শিখতে হবে, শুধু মাত্র সেটুকু শিখেই সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের সে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ঔৎসুক্য থাকে। এতে শিক্ষিতব্য বিষয়টি বৃহত্তর ভূমিতে স্থাপিত হয়ে অধিকতর তাৎপর্য লাভ করে এবং পরিচিতের সংযোগসূত্রে মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, শেখাটা অনেক বেশী তৃপ্তিকর হয়।[৩৯]

---

[৩৯] Perhaps the greatest of all pedagogical fallacies is the notion that a person learns only the particular thing, he is studying at the time Collateral learning in the way of formation of enduring attitudes of likes and dislikes, may be and often is, much more important than the spelling lesson or lesson in geography, that is learned.

Deway. Education and Experience p. 49.

চতুর্দশ অধ্যায়

শিক্ষায় সংক্রামণ—Transfer of Training.

যখনই আমরা কিছু শিখি বা শেখাই তখন এই ভরসা আমাদের থাকে যে যা শেখা হোল, কিছু পরিবর্তিত অবস্থায়ও সে শিক্ষা কাজে লাগবে। যে ছেলে যত্ন করে অঙ্ক শিখলো, সে সম্ভবতঃ বড় হয়ে যখন ব্যবসা চালাবে তখন সাবধানতা, নির্ভুলতা ইত্যাদি যে গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল, সে গুণগুলি দ্বারা উপকৃত হবে। এটা সাধারণ ভাবে সত্য যে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। কতগুলি প্রশ্ন এ সম্বন্ধে জাগে, যেমন, এক বিষয়ে শিক্ষার দ্বারা যে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত হোল তা কি ভবিষ্যতে অনুরূপ বিষয়েই কার্যকরী হবে, না তা সাধারণ ভাবে সর্ব-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? হারমোনিয়াম বাজাতে শিখলে, সে শিক্ষাটা পিয়ানো বাজনা শেখায় যেমন কাজে লাগবে, তেমনি কর্ণেট বাজানো শেখার বেলাও কাজে লাগবে? অথবা কাঠ র‍্যাঁদা করা শেখার বেলাও? মানসিক বৃত্তির কোন এক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অন্য বৃত্তির বেলায়ও কাজে লাগবে কি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা এদের কোন একটির চর্চায় মনের অন্য বৃত্তিরও উৎকর্ষ ঘটে কি? যদি এটা সত্য হয়, তবে আরো এগিয়ে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে মৌলিকতা, উপস্থিতবুদ্ধি, ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত প্রধান উপাদানগুলি কি কোন এক বিষয়ের শিক্ষা দ্বারাই আয়ত্ত হতে পারে? এবং যদি পারা যায় তবে সে বিষয়গুলি কি? কি সে বিশেষ শিক্ষার উপায়? এবং এ শিক্ষার উপযোগিতার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত?

এক বিষয়ে শিক্ষার প্রভাব অন্য বিষয়েও যে বিস্তার তাকেই আমরা বলি ফর্মাল ট্রেণিং বা শিক্ষায় সংক্রামণ (transfer of training)। এ প্রভাব অনুকূল বা প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে। যদি গান শিখলে নাচ শেখার বেলায় তা সহায়ক হয়, তবে তাকে বলা হয় ইতিবাচক সংক্রামণ (পজিটিভ্ ট্রান্সফার)। আবার এক ধরণের কি-বোর্ডে (Key-board) টাইপ করতে শিখলে, ভিন্ন ভাবে

সাজানো কি-বোর্ড-ওয়ালা টাইপ-রাইটারে কাজ করতে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধাই হয়—শিক্ষার এই প্রতিকূল প্রভাবকে বলা হয় নেতিবাচক সংক্রামণ (নেগেটিভ্ ট্রান্সফার)।[১]

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রকম সংক্রামণ ঘটে। কতগুলি বিষয় আছে যাদের শিক্ষায় মনের অনেক সদবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পেশী সঞ্চালন দ্বারা যেমন দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য আয়ত্ত হয়, তেমনি মনের পেশীগুলিও উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা দৃঢ় ও সবল হয়, এবং তার প্রত্যক্ষ ফল মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক সদবৃত্তির পুষ্টি ও উন্নতি।[২] এ মতবাদকে ট্রান্সফার অব-ট্রেনিং, মেণ্টাল ডিসিপ্লিন্, ফর্মাল ডিসিপ্লিন্, ফর্মাল ট্রেনিং ইত্যাদি আরো নাম দেওয়া হয়েছে। থর্ণডাইক্ এই মতবাদের সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "সাধারণতঃ এ কথা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে মনের কতগুলি মৌলিক বৃত্তি আছে, যথা—নিভুর্লতা, দ্রুততা, প্রভেদবোধ, স্মৃতি, নিরীক্ষা, মনোযোগ, নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি। এগুলির যে কোন বিষয় নিয়েই আমরা কাজ করি না কেন, সর্বদাই একই প্রকার থাকে। এবং এ বৃত্তিগুলি কতগুলি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা অনেকটা পরিমাণে পরিবর্তন করা চলে, এবং এ পরিবর্তনগুলি অন্য বিষয় শিক্ষার বেলায়ও কার্যকরী হয়। কাজেই কোন এক বিষয়ে কাজটি সুসম্পন্ন করবার শিক্ষাটি আয়ত্ত করলে অদৃশ্য ভাবে সেই শিক্ষার কৌশলটি অন্য যে বিষয়ে বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে দৃশ্যতঃ কোন সাদৃশ্য নাই, সেখানেও কাজে লাগে।"[৩]

এক বুড়ো হেডমাষ্টার ছিলেন, তিনি আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্যে রোজ স্মাইল্‌সের 'সেলফ্-হেলপ্' থেকে পঞ্চাশ লাইন মুখস্থ করতে দিতেন। এই একই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিলেতে স্কুলগুলিতে ল্যাটিন, অংক ও ব্যাকরণ শেখার উপর জোর দেওয়া হত। তাঁরা বলতেন, ল্যাটিন ব্যাকরণের শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি সূক্ষ্ম খুটিনাটি শিখতে অভ্যস্ত হলে অন্য সব বিষয়েও ছাত্রদের

---

১ Boring Langfeld and Weld—Foundations of Psychology, p. 177.

২ Garrett—Great Experiments in Psychology p. 52

৩ Thorndike—Quoted by Hamley in "The cognitive aspects of transfer of training"—Report of Consultative Committee on Secondary Education. H. M. S. O. 1938.

মনোযোগ ও খুটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি বাড়বে। এ বিষয়গুলির অনুশীলন সে সে বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি তো করেই, তা ছাড়া মনের ক্ষমতাই এদের চর্চায় বেড়ে যায়। শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে কি বিষয় শেখা হচ্ছে, সেটা প্রধান কথা নয়—আসল কাজ হচ্ছে মনের গড়নটাই (form) তৈরী করে তোলা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলিতে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে স্কুলে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে। ল্যাটিন্, গ্রীক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণের পরিবর্তে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব হয়। যাঁরা এ প্রস্তাব করেন, তাঁরা বলেন, এ সব পুরাণো ভাষা জীবনের কোন প্রয়োজনে আসে না। এ শিক্ষায় ছাত্ররা কোন রস পায় না, তাদের কোন উপকার হয় না। তারা শুধু পরীক্ষা পাশের তাগিদে এ বিষয়গুলি না বুঝেই মুখস্থ করে। এর উত্তরে মিঃ আর্থার সিজ্‌উইক্ এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, খুটিনাটি বিষয়ে নির্ভুলতা (accuracy), মনের সূক্ষ্মবৃত্তির বিকাশ subtlety), তাৎপর্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির (sense and judgment) উদ্বোধন, এই সব প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বারা যতটা হতে পারে এমন আর কিছুতেই হতে পারে না। "অংক সম্পর্কে বলা হোল, এতে মনোযোগের উপর প্রভুত্ব জন্মে, শুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ে।" সেই সময় থেকেই শিক্ষায় সংক্রামণ সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়েছিল।

শিক্ষায় সংক্রামণ মতবাদের পিছনে মনের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে একটি বহুল প্রচারিত অথচ ভুল ধারণা আছে। এ ধারণা হচ্ছে, মন একটা জটিল যন্ত্রের মত, তার অনেকগুলি বিন্যস্ত অংশ বা শক্তি (faculties) আছে—যথা মনোযোগ, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি। এদের যে কোন বৃত্তি অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় এবং একবার আয়ত্ত হলে এর ফল জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় কার্যকরী হয়। তাই শিক্ষাবিদের একটি কাজ হবে এমন কতগুলি বিষয়, উপায় বা কৌশল বেছে নেওয়া, যার মধ্য দিয়ে মনের বৃত্তিগুলির সতেজতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্কুলের অবশ্য-পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটির এ গুণ বিশেষ পরিমাণে আছে বলেই শিক্ষকের চোখে এ বিষয়গুলির মূল্য সমধিক।

দ্বিতীয় আর একটি বিশ্বাসও এই ধারণার পেছনে আছে—সেটি হচ্ছে যে, বিষয়টি যত শক্ত ও নীরস হবে তার মনের শক্তি গঠনের (mental disipline) ক্ষমতা তত বেশী। মন হচ্ছে পাগলা ঘোড়া তাকে কঠিন চাবুক দিয়েই শাসনে রাখতে হয়। শিক্ষা হচ্ছে তিক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধের মত। তাই অঙ্ক ও ল্যাটিন ব্যাকরণের মত 'দাওয়াই' আর কোথায় মিলবে ?

এ দুটি বিশ্বাসই কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে।

বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে, মন একটি বস্তু নয় কতগুলি বিচ্ছিন্ন বৃত্তির সমন্বয়ও নয়—মন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীল ব্যবহার, আবেগ ও উদ্যমের ধারা। যে ব্যবহার ও ক্রিয়ার মধ্যে গভীর মিল ও সংযোগ আছে, সেগুলি পরস্পর প্রভাবিত করে ; যেখানে ক্রিয়া বা ব্যবহারের গঠনে, বিষয়বস্তুতে বা পদ্ধতির মধ্যে মিল বা ঐক্য আছে সেখানে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষার সহায়ক হয়। যেমন, ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষার গঠনে, উৎপাদনে, প্রয়োগ-রীতিতে অনেক মিল আছে—তাই ল্যাটিন ভাষা ভাল করে শিখলে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ল্যাটিন ভাষার মধ্যেই কোন যাদু নেই। তেমনি অঙ্ক ভাল শিখলে পদার্থবিদ্যা (Physics) ও পূর্তবিদ্যা (Engineering) শিক্ষায় সাহায্য হয়, কিন্তু ব্যাকরণ শিখলে রসায়ন শাস্ত্র শেখা সহজ হয় না। কাজেই সংক্রামণ ঘটে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে দুটি বিষয়ে মিল বা ঐক্য আছে।

অবশ্য সাধারণ ভাবেও সংক্রামণ ঘটে। মনোযোগের অভ্যাস, গুছিয়ে কাজ করার অভ্যাস, সাবধানতা এ সব গুণ যে কোন কাজ নিয়েই আয়ত্ত হোক না কেন, তা মনের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং যে কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক অভ্যাস গঠনের মধ্যেই কিছু সাধারণ উপাদান থাকে এবং এরকম ব্যাপক অর্থে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংক্রামক।

কিন্তু যেখানে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে মোটেই মিল নেই, বরং বৈপরীত্য বা বিরোধ আছে সেখানে বিশেষ একটি অভ্যাস বা কৌশল শিক্ষা অন্য একটি ক্রিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে। যাঁরা ডান ধারে ষ্টিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালিয়ে অভ্যস্ত তাঁদের হঠাৎ বাঁ হাতের ষ্টিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালাতে প্রথম প্রথম অসুবিধাই হবে। ওয়াইলি সাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা

করেও দেখেছেন সেখানেও এই প্রতিকূল সংক্রামণ ঘটে। এবং তিনি এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্বের অভ্যাস সহায়ক, কিন্তু পূর্বঅভ্যস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন প্রতিক্রিয়ার দাবী সেখানে আসে, সেখানে বাধা ও অসুবিধা সৃষ্টিই স্বাভাবিক।[৪]

আবার যেখানে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে মিলও নাই, বিরোধও নাই, সেখানে একটি শিক্ষার দ্বারা অন্যটি সামান্যই প্রভাবিত হয়।

এ সংক্রমণের ক্রিয়াটি যান্ত্রিকভাবে ঘটে না। সংক্রামণের কৌশল বিষয়-বস্তুর মধ্যে নেই। জাড্ (Judd) বলেছেন, "এসব কোন বিষয়ের মধ্যে এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে এতে সাধারণ ভাবে মনের ক্ষমতা বাড়বে। যদি এর ফলে কোন সংক্রামণ ঘটে, সেটা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না, বিষয়বস্তুর পরিবেশন পদ্ধতি এবং ছাত্রের সক্রিয়তা কতটা উদ্বুদ্ধ হবে, তার উপর নির্ভর করে। এটা মোটেই মিথ্যা নয়, যে কোন বিষয়েই ছাত্রের বিচারবুদ্ধি ও সমন্বয়ী ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দিলে, তা সাধারণ ভাবে তার মানসিক উৎকর্ষ বিধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। এবং একথাও সত্য, যে কোন বিষয়ে কেবলমাত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান দানের উপর জোর দিলে তা শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমন্বয় ক্ষমতা বৃদ্ধি (**generalisation of experience**) তার উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়।[৫]

পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয়, কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় এ ক'টি অভ্যাস ছাত্রদের মনে তৈরী করে দেওয়াই হচ্ছে সুশিক্ষার উদ্দেশ্য। যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করে এ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মানে সে বিশেষ বিষয়ে কতগুলি তথ্য (information) ছাত্রদের মনের সামনে ধরে দেওয়াই নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূল সূত্রটি অনুসন্ধানের অভ্যাসকে জাগরিত করতে যে শিক্ষক সক্ষম, তিনিই সার্থক শিক্ষক।

সাধারণভাবে স্মৃতিশক্তি কোন একটি বিশেষ বিষয় আয়ত্ত করলে বেড়ে যায় না। তবে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি কতগুলি মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত

৪ Wylie—An Experimental Study of Transfer of Responses in white rats. Behev. Monog. 3. p. 16,

৫ Judd—Psychology of Secondary Education Ch. XIX.

করা যায়, তা হলে পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয় তখনই, যখন পরবর্তী শিক্ষার বিষয়ে অনুরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নূতন শিক্ষার বিষয়ে যদি বিপরীত উপাদান থাকে বা বিপরীত অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, তবে পূর্বের শিক্ষা বরং নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

যেখানে সংক্রামণ ঘটে, সেখানে তার মূলে আছে (১) বিষয়বস্তুর উপাদানে মিল (২) ক্রিয়ার কৌশল, কায়দা বা দক্ষতার মিল (৩) মূল নীতিগত মিল বা অভ্যাসের মিল (৪) অথবা এদের কয়েকটি বা সব কটির মিল। এ বিষয়ে গেট্স, রবার্টস্, কেটোনা ও শ্লেইটেরও একই মত।

শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে পরীক্ষা—পূর্বে বলেছি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ মতবাদ প্রচলিত ছিল, যে কোন এক বিষয় মুখস্থ করবার অভ্যাস করলে, সে অভ্যাস দ্বারা অন্য যে কোন বিষয় মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ বিষয়ে ১৮৯০ সালে উইলিয়ম্ জেমসের পরীক্ষাই বোধ হয় প্রথম। প্রথম তিনি ভিক্টর হুগোর 'স্যাটের' (Satire) বই থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন। কতটা সময় লাগল সেটা তিনি লিখে রাখলেন। এর পর তিনি একমাসের উপর ধরে মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' কবিতাটি মুখস্থ করলেন। এবার তিনি আবার 'স্যাটের'-এর আরো ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, এবার প্রথম বারের চেয়ে তাঁর সময় বেশী লাগল--অর্থাৎ বোঝা গেল এতে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায় নি। অবশ্য জেম্সের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু তাঁর পরীক্ষা প্রাচীন মতবাদকে প্রথম ধাক্কা দেয়। ৬

জেম্সের পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করে, তারপর থেকে আরো বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। এগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করা যায় (১) প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা (২) স্মৃতি, যুক্তি, বিবেচনা ইত্যাদি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা এবং (৩) শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে পরীক্ষা।

প্রথম দলে থর্ণডাইক্ ও উড্ওয়ার্থের কতগুলি পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ পরীক্ষার ফলও প্রাচীন মতবাদের বিরোধী। প্রথমে এক দল ছেলেকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভেদ বোধ বিষয়ে (sense discrimination) শিক্ষা দেওয়া

৬ Boring Langfeld and Weld—Foundations of Psychology p. 178.

হয়। এর পর এদের অন্য কতগুলি প্রভেদ বোধ যথা (১) বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আয়তন নির্ধারণ, বিভিন্ন রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়, বিভিন্ন ওজনের পার্থক্য ও একটি ছাপার পৃষ্ঠার থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট কতগুলি অক্ষর বা শব্দ বেছে বের করা ও কেটে দেওয়া নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন যে, যেখানে বাহ্য কিছু মিল আছে, সে ক্ষেত্রেও প্রথম শিক্ষা দ্বারা নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সামান্যই হয়েছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ব শিক্ষা বাধা স্বরূপই হয়েছে।

এ পরীক্ষার ভিত্তিতে থর্ণডাইক প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে এই মত প্রকাশ করলেন যে যেখানে পুরাতন শেখা বিষয়ের সঙ্গে নূতন বিষয়ের ঐক্য থাকবে, সেখানেই কেবল অনুকূল সংক্রামণ ঘটে (**Theory of identical elements**) এবং সংক্রামণের পরিমাণ কতটা হবে তাও নির্ভর করবে দুই বিষয়ের মধ্যে উপাদানের ঐক্য কতটা, তার উপর।[৭]

এর পর এ বিষয় নিয়ে বহু পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক অঙ্গের শিক্ষা দ্বারা অন্য একটি অঙ্গের কার্যদক্ষতার উন্নতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। একে **ক্রস্ এডুকেশন্** বা **বাইল্যাটারাল্ ট্র্যান্সফার** বলা হয়। স্ক্রীপ্‌চার বাঁ হাতে দিয়ে শক্ত করে জিনিষ ধরার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেখলেন, তাতে ডান হাতের ক্ষমতাও (grip strength) কিছু বাড়ে। উড্‌ওয়ার্থ একটি বিন্দুকে বাঁ হাতে পেন্সিলের ডগা দিয়ে বিদ্ধ করা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ডান হাত দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষায়ও কিছুটা উন্নতি হয়। ভুলের পরিমাণ কমে। বাঁ হাতে যতটা নিপুণতা বাড়লো, সে তুলনায় ডান হাতের নিপুণতা বাড়ল শতকরা ৫০%। ব্রাউনেল্, স্লেইট্, ইউয়ার্ট ইত্যাদি সকলের পরীক্ষায়ই এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এক অঙ্গ যে জাতীয় ক্রিয়ায় দক্ষতা লাভ করল সেই জাতীয় ক্রিয়াতেই অনুরূপ অন্য অঙ্গ অভ্যাস ব্যতিরেকেও কিঞ্চিৎ দক্ষতা অর্জন করে। আয়নায় ছায়া দেখে একটা

---

৭ থর্ণডাইকের মতে "a change in one mental function alters any other only in so far as the two functions have, as factors, indentical elements. The change in the second elements is, in amount, that due to the change in the elements common to it and the first."

ছয়কোণা তারার ছবির চারপাশে অনুরূপ একটা তারা ডান হাত দিয়ে নির্ভুল আঁকতে শিখলে, তারপর বাঁ হাতে দিয়ে সে তারাটা আঁকা অনেকটা সহজ হয়। ইউয়ার্টের পরীক্ষায় দেখা যায়, যে এতে ৬০% সময়সংক্ষেপ হয়।[৮]

ধাঁধাঁর রাস্তা শেখা (maze-learning) নিয়ে ওয়েল্ড পরীক্ষা করে দেখলেন, এক জাতীয় ধাঁধাঁর রাস্তা শেখাটা যাদের হয়ে গেল, তাদের অনুরূপ একটা ধাঁধাঁ দিলে, যারা কোনদিন এ জাতীয় শিক্ষালাভ করেনি তাদের তুলনায় পূর্ববর্তী দলের ৬৮% কম বার অভ্যাস করা দরকার হয়। তাদের ভুল ৮৯% কম হয়, এবং তাদের সময় ৮৭% কম লাগে।[৯]

স্মৃতি শক্তির সংক্রামণ নিয়েই বেশী পরীক্ষা হয়েছে। জেম্‌সের পরীক্ষার কথা বলেছি। উইন্চ্ কবিতা মুখস্থ করাটা ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে কতটা সহায়ক হয় তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সংক্রামণের পরিমাণ সামান্য মাত্র। এবার্ট ও ময়ম্যান্ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি (nonsense syllables) নিয়ে পরীক্ষা করেও অনুরূপ ফল পেলেন

স্ল্ইট্ জটিলতর কতগুলি পরীক্ষা করলেন। তিনি চাইলেন কবিতা, অঙ্কের আর্য্যা, এবং গদ্য বাক্যার্থ মুখস্থ করে সাধারণ ভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে। কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না।

এ সমস্ত ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল থর্ণডাইকের উপাদানের ঐক্যসূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। থর্ণডাইক্ বলেছিলেন, অনুকূল সংক্রামণ যেখানে ঘটে, সেখানে শিক্ষিত বিষয়ের উপাদানে ঐক্য থাকে—সংক্রামণটা সাধারণ নয়,—বিশেষ (specific)।

কিন্তু জাড্ অনেকগুলি পরীক্ষার পর থর্ণডাইক্ থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁর মতে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নূতন অভিজ্ঞতার স্বাঙ্গীকরণ, পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল নির্ণয়করণ, নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার। শিক্ষার বিষয় বা উপাদানের ঐক্যই সংক্রামণের কারণ নয়। সক্রিয় উৎসুক মন যখন শিক্ষার পদ্ধতি, চিন্তার

---

৮ Ewart—Bilateral transfer in mirror drawing. Peg—Sem. 1926. 33. pp. 255-49.

৯ L. W. Weld— Transfer,of training of retro-action. Pey. MonogI. 1917, 24, No. 104, 18.

প্রণালী, শিক্ষার অভ্যাসের মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার করতে পারে তখনই পুরাতন শিক্ষা নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। জাড্ বলেন, 'বিজ্ঞান শিক্ষা যেখানে কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য আয়ত্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে তা নিষ্ফল। অঙ্ক শেখাও নিষ্ফল হয়, যদি কতগুলি যান্ত্রিক প্রণালীই মাত্র শেখা হয়, এবং যদি ছাত্র না বুঝতে পারে অঙ্কের সূত্রগুলি বা প্রণালীগুলি জীবনের কোন প্রয়োজনে লাগে।…ছাত্রকে এই ভাবেই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি কি করে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রাণবন্ত ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। ছাত্রকে এই শিক্ষাই দিতে হবে যে, মনঃসংযোগ, যুক্তিগত বিশ্লেষণ, ছিন্নাংশ-গুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার,—এরা হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক অভ্যাস। এ অভ্যাস গঠিত হলে এক বিষয়ে যে লাভ বা সুবিধা হ'ল তা ভবিষ্যতে বিভিন্ন চিন্তা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে।"[১০]

এ বিষয়ে জাডের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষার উল্লেখ করা হচ্ছে। দু দল ছাত্রকে চৌবাচ্চার জলের নীচে রক্ষিত কোন দ্রব্যকে তীর দিয়ে বিঁধতে দেওয়া হল। একদল ছেলে জলের মধ্যে আলো যে বেঁকে যায় সে কথাটা জানত না। তারা বারে বারে চেষ্টা করে লক্ষ্য ভেদ করতে শিখল। অপর দলকে প্রতিসরণের (Refraction) বৈজ্ঞানিক সূত্রটি পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমবার লক্ষ্য-বিদ্ধ করতে উভয় দলেরই প্রায় সমান সময় লাগল। দ্বিতীয় বার, জলের পরিমাণ বদলে দেওয়া হল। প্রথম দল পূর্ব প্রথায়ই তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু নূতন অবস্থায় তাদের পূর্ব অভ্যাস বিশেষ কাজে এল না, সম্পূর্ণ নূতন করেই আবার লক্ষ্য বিদ্ধ করা শিখতে হল। কিন্তু দ্বিতীয় দলকে জলের মধ্যে আলোর প্রতিসরণ ব্যাপারটি আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নূতন ও পরিবর্তিত অবস্থায় তারা হিসাব করে নূতন ভাবে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে অল্প সময়েই সমর্থ হলো। এখানে শিক্ষা সার্থক, কারণ এখানে ঘটেছে অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Generalisation of Experience)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বার্ট ইত্যাদি কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ সংক্রামণ ব্যাপারে আগ্রহ, ইচ্ছা, মনোযোগ, সাফল্য-

---

[১০] Judd—Psychology of Sec. Education. Ch. XIX—Quoted by Gates in Educational Psychology, p. 500.

জনিত উৎসাহ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার উপর জোর দেন। ব্যক্তি-চরিত্র, তার বুদ্ধি ও আগ্রহ ইত্যাদি এ ব্যাপারে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।[১১] অলপোর্ট এই দলে। তিনি থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' মতবাদকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, মনকে কতগুলি টুকরো টুকরো ব্যবহার বা অভ্যাসে ভাগ করাটা ঠিক নয়, এবং নিতান্ত শিশু বা অপরিণতরাই কেবল নির্দিষ্ট অভ্যাস ব্যবহার দ্বারা শেখে, কারণ তাদের মন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্রটি আবিষ্কারে অসমর্থ।

এই মতগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। অধ্যাপক হ্যামলির মতে সাধারণতঃ যে ভাবে থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' কথাটি ব্যবহার করা হয়, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এ কথাটির অর্থ ব্যাপকতর করলে থর্ণডাইকের মতের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার কারণ দূর করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, উপাদানের ঐক্য হচ্ছে, মানসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য। সে ঐক্য যে বিষয়গতই হবে এমন কোন কথা নেই। এ ঐক্য প্রণালী, অভ্যাস ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যও হতে পারে—সেগুলি গেষ্টল্টের ভাষায় 'ক্রিয়ার বা ব্যবহারের সমতা (functionally similar)[১২] উড্ওয়ার্থ মন্তব্য করেছেন "থর্ণডাইকের মতবাদের তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা কৌশলেরই সংক্রামণ ঘটে। ক্রিয়াটি সরলও হতে পারে, জটিলও হতে পারে। ঐক্যটি বিষয়ের উপাদানগত, এরকম সংকীর্ণ অর্থ করলেই গোলযোগ হয় এবং উপাদানগত ঐক্য (identical elements) কথাটির পরিবর্তে ভাবগত ঐক্য (identical components) বললে বোধ হয় গোলযোগটা এড়ানো যেতে পারে,"[১৩] পীল্ বলছেন, 'এটা খুবই স্পষ্ট যে উপাদানগত বা ভাবগত ঐক্যটির যে বন্ধন, তা আবেগ-চালিত মনই জোগান দিচ্ছে,—অবশ্য তা ছাড়া বিষয়বস্তুর মধ্যেও মিল থাকতে পারে। ইচ্ছা, আগ্রহ, আবেগের মিল সংক্রামণের জন্যে দায়ী, তা ছাড়া উন্নততর বুদ্ধিদ্বারা সম্বন্ধ আবিষ্কার, মিলের অনুসন্ধান, সাধারণ সূত্র বা বিষয় আয়ত্তীকরণের কৌশল ইত্যাদি সংক্রামণের সহায়ক হয়। অর্থাৎ উপাদানের ঐক্য বা সূত্রটি—অবস্থা

---

১১ Garrett—Great Experiments in Psychology.

১২ Hamley—The cognitive aspects of Transfer of Training are common elements in the objective situations. They are methods, procedure, and ideals that are in the Gestalt sense 'functionally similar.'

১৩ Woodworth—Experimental psychology, P. 177.

বা বিষয়ে যেমন থাকে, তেমন থাকে শিক্ষার্থীর মনে। কাজেই সংক্রামণ বিষয়ের ঐক্যের উপর নির্ভরশীল, অথবা ব্যক্তির বুদ্ধি, ইচ্ছা, আগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এই দুই মতের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই।[১৪]

সংক্রামণ সম্বন্ধে উড্রোর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা উচিত। এ জাতীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন, তার ফলে, তাঁর পরীক্ষার ফল পূর্ববর্তীদের পরীক্ষার ফলের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অন্যান্য পরীক্ষায় মাত্র দুটি দল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়—একদল যারা পূর্বে কোন শিক্ষা পায়নি এবং আর একদল যারা কোন বিশেষ শিক্ষালাভ করেছে। এই দুই দলের মধ্যে শিক্ষার সময়ের প্রভেদ অথবা ভুলের পরিমাণের প্রভেদ দিয়ে কতটা সংক্রামণ হোল তা বিচার করা হোত। উড্রো নিলেন তিনটি দল। উড্রোর একটি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক্। পরীক্ষাটা হোল, কবিতা মুখস্থ ব্যাপারে কতটা সংক্রামণ হয় এবং কি অবস্থায় সংক্রামণ সবচেয়ে বেশী হয় তা নিয়ে। ১০৬ জন ছাত্রের এক দল (control group) নেওয়া হোল, তাদের প্রথমে একবার ও পরে সকলের সঙ্গে শেষে আর একবার পরীক্ষা নেওয়া হোল। কোন মুখস্থের অভ্যাস করাবার চেষ্টা করা হোল না। ৩৪ জন ছাত্রের আর এক দলকে (practice group) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে সাধারণ ভাবে পুরাতন প্রথার (rote) কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করানো হোল। ৪২ জন ছাত্রের আর একটি দলকে (training group) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়, অর্থের দিকে দৃষ্টি, সমগ্রটি এক সঙ্গে শেখা, ছন্দ ও মিলের ব্যবহার ইত্যাদি মুখস্থের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শেখানো হয়েছিল। এবার প্রথম ও শেষ পরীক্ষার ফলের তুলনা করে দেখা গেল, প্রথম দলের তুলনায় দ্বিতীয় দলের উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তৃতীয় দলের উন্নতির হার অনেকটা বেশী (৩১·৬%)। এতে জাডের অভিমতই সমর্থিত হয় যে সংক্রামণ তখনই উল্লেখযোগ্য, যেখানে সচেতন ভাবে অভিজ্ঞতার পশ্চাতে মূল সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত ও অনুসৃত হয় (generalisation of experience)।[১৫]

---

১৪ Peel—The Psychological Basis of Education. p. 67.

১৫ Garrett—Great Experiments in Psychology.

কোন্ কোন্ অবস্থা সর্বাধিক পরিমাণ সংক্রামণের অনুকূল ?

পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষাগুলি থেকে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি—

(১) **বোধহীন যান্ত্রিক মুখস্থের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায় না। যেখানে অর্থবোধ থাকে, যেখানে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ পরিষ্কার করে উপলব্ধি হয় সেখানেই সংক্রামণ সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে।**

(২) বুদ্ধির উৎকর্ষের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। দুইটি বিষয়ের মধ্যে অনেকখানি ঐক্য থাকতে পারে—কিন্তু কেবল মাত্র তার উপর সংক্রামণ নির্ভর করে না। **যাদের বুদ্ধি বেশী, যারা বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সক্ষম,** যারা চট্ করে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিল ও প্রভেদ লক্ষ্য করতে পারে—**তারাই ভাল মুখস্থ করতে পারবে এবং যা মুখস্থ হোল তা ভবিষ্যতে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে।**

গেষ্টল্ট-বাদীরাও এ কথাই বলেন। শিক্ষা মানেই হচ্ছে—সমগ্রতাবোধ—বিচ্ছিন্ন অংশকে সমগ্রের মধ্যে সংবদ্ধ করে দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি (insightful learning)। পীল্ বলছেন—শিক্ষার বোধের দিকটা যখন বিচার করা যায় তখন দেখা যায়, শিক্ষায় সংক্রামণ তখনই ঘটে যখন সক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্নাংশ গুলিকে সমগ্রতার মধ্যে সংবদ্ধ করা হয় এবং তখনই এক বিষয়ের শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে।"[১৬]

(৩) **বুদ্ধি যে বিভিন্ন অংশগুলিকে একটি সমগ্রতায় সংহত করতে পারে তার পশ্চাতে থাকে ব্যক্তির আগ্রহ। সংক্রামণ ব্যাপারটাকে শুধু বুদ্ধির ক্রিয়া মনে করলে ভুল হবে, তার মধ্যে আবেগ ইচ্ছাও অবশ্যই থাকতে হবে।** কখনো কখনো এই দিকটা উপেক্ষিত হয় বলেই থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' রূপ সূত্রের ব্যাখ্যাটি একপেশে হয়ে পড়ে।

(৪) সংক্রামণ ক্রিয়াটা যান্ত্রিক নয়—এখানে নূতন অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে খাপ খাইয়ে নেবার কথাটা ভুললে চলবে না। **সংক্রামণ যেখানে ঘটেছে—সেখানে অতীত শিক্ষাকে হুবহু ব্যবহার করা**

১৬ Peel—The Psychological Basis of Education, p. 67

হচ্ছে না, নূতন করে কিছুটা ঢেলে সাজতে হয়। ওরাটা (Orata) দেখিয়েছেন, একটা পদ্ধতি শিক্ষাকে নিতান্ত 'মাছি মারা কেরাণী'র মত ভবিষ্যতে ব্যবহার করলে, অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা সামান্যই লাভবান হওয়া যায়। নূতন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে অতীত শিক্ষাকে প্রয়োজন মত কিছু বদলে সাধারণ মূলসূত্রটি ব্যবহার করতে জানলেই সবচেয়ে বেশী হওয়া যায়।

সংক্রামণ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির তুলনামূলক মূল্য বিচার—

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য, মনের কতগুলি বাঞ্ছনীয় ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধি। এরি নাম হচ্ছে ফর্মাল ট্রেনিং। পূর্বেই বলেছি অতীতে বিলেতের স্কুলগুলিতে ল্যাটিন শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হ'ত। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার কতগুলি অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে। এ ভাষা শিক্ষার ফলে চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, গঠিত ও উন্নীত হয়। ক্রমশঃ এ মত পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ দেখা যাচ্ছে এ মতের পেছনে সত্য বেশী নেই বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তা জানা যাচ্ছে। বর্তমান কালে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ (curricula) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। তার কিছু আলোচনা করা যাক।

১৯২৪ সালে থর্ণডাইক ক্লাশ নাইন্, টেন্, ও ইলেভেন্-এর ৮,৫৬৪ জন ছাত্রকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। বিশেষ করে ল্যাটিন্ সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে উচ্চাশা পোষণ করতেন তা কতটা সত্য এবং আদৌ সত্য কিনা, তাও এই জটিল বহু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। পরীক্ষার ফল ল্যাটিন পন্থীদের অনুকূল হয়নি। সাড়ে আট হাজারের উপরে ছাত্রকে পরীক্ষা করে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা আবার নূতন ৫০০ হাজার ছাত্রের বেলায় ব্যবহার করে ফলটা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—তাই এ পরীক্ষার ফল আমরা নির্ভর যোগ্য বলে' গ্রহণ করতে পারি। থর্ণডাইক পরীক্ষার জন্যে যে প্রণালী ব্যবহার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে এই রকম। তিনি প্রত্যেক ক্লাশের ছেলেদেরই দুটি দল করেছিলেন। দুটি দলের ছাত্রদের কতগুলি বিষয় ছিল সাধারণ, যেমন ইংরেজী, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। কিন্তু

এক দলের ছেলেরা নিয়েছিল ল্যাটিন, আর একদল নিয়েছিল পদার্থবিদ্যা। এই পরীক্ষাতে দেখা হোল ল্যাটিন বা পদার্থবিদ্যা শেখার ফলে তাদের অন্যান্য বিষয়ে কতটা উন্নতি হোল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নানা স্কুল পাঠ্য বিষয় নিয়েই পরীক্ষা করে তাদের তুলনামূলক মূল্য নিরূপণ করা হোল। এ পরীক্ষার ফলে জানা যায়, অঙ্কশিক্ষা বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুকূল, তার পরেই আসে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান যেমন পৌর-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি। ল্যাটিনের মূল্য এদের নীচে। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার ফল ল্যাটিন শিক্ষার কাছাকাছি। সেলাই, ষ্টেনোগ্রাফী, হাতের কাজ, অভিনয় এদের মূল্য ল্যাটিনের নীচে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শেষোক্ত বিষয়গুলি অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পক্ষে বরং বাধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রামণ যেটা ঘটে, সেটা প্রতিকূল বা নেতিবাচক (negative) [১৭]

এসব পরীক্ষায় দেখা গেছে যে যদিও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ বিষয়ে প্রভেদ আপেক্ষিকভাবে একই থাকছে সংক্রামণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় (statistically not significant)। এক বছরের শিক্ষার ফলে ছাত্রের যে মানসিক উন্নতি ঘটল তা বহুলাংশে নির্ভর করছে ছাত্রের জন্মগত শক্তি ও বুদ্ধির উপরে, এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপরে। **বিশেষ কোন বিষয়ের কোন অতিরিক্ত মূল্য নেই।** ল্যাটিন্ যাঁরা বিদ্যালয়ে যত্ন করে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হয়েছিলেন, তাই বোঝা যায় ল্যাটিনের বিশেষ মূল্য আছে,—এর উত্তরে থর্নডাইক দেখালেন যে **ক্লাশের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান ছাত্র তাঁরাই ল্যাটিন্ ও অংক নেয়; কাজেই তাদের**

---

[১৭] Relative value of a year's training in various high school subjects in increasing "Ability to think."

Subject groups	Weighted average differences (Relative influence)
1. Algebra, geometry, trigonometry, etc, ...	2·99
2. Civics, economics, psychology, sociology ...	2·89
3. Physics, chemistry, general Science. ...	2·71
4. Arthmetic and book-keeping	2·60
5. Physical training	-·83
6. Latin, French	-·79
7. Cooking, Sewing, Stenography	-·14
8. Biology, zoology, botany	-·15
9. Dramatic art	-·48

উন্নতির জন্যে দায়ী ল্যাটিন্ বা অংক নয় তার জন্যে দায়ী হচ্ছে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি, উৎসাহ, মনোযোগ ইত্যাদি। স্যাণ্ডিফোর্ড এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "এরা ছিল বুদ্ধিমান মানুষ, এবং এঁরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন শুধু বি-এ অনার্স ও ল্যাটিন্ শেখায়ই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ল্যাটিন্ ভাষার মধ্য দিয়ে এরা অন্যের তুলনায় বুদ্ধিমান, এটা শুধু জানা গিয়েছিল। প্রকৃতিই এঁদের সৃষ্টি করেছিল বুদ্ধিমান করে। যদি ল্যাটিনের পরিবর্তে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের চর্চা প্রচলিত থাকতো তবে এককথাই মনে হত যে বিজ্ঞান চর্চাই এঁদের বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য দায়ী।[১৮]

এ জাতীয় বিভিন্ন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে উড্ওয়ার্থ ও মারকিস্ সিদ্ধান্ত কচ্ছেন'…"এটা প্রমাণিত হয়েছে, এক বিষয়ে শিক্ষা দ্বারা অন্যবিষয়ে আপনিই পারদর্শিতা আসবে, এ সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নয়। **যে সংক্রামণটা সাফল্যের সঙ্গে ঘটে সেটা একটা সাধারণ শক্তি নয়,—সেটা একটা নির্দিষ্ট কিছু, যেটা নির্দিষ্ট করে দেখানো চলে, যেমন একটা নীতি (principle) বা একটা সু-অভ্যাস বা দৃষ্টিভঙ্গী বা একটা সফল কৌশল (technique**।[১৯]

আমেরিকার নূতন শিক্ষানীতিতে সাধারণভাবে মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা না করে' যে বিষয় বা কৌশল শেখাতে হবে তাই সোজাসুজি শেখানো বেশী ভালো মনে করা হয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ফর্মাল ট্রেনিং-এর মোহটা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। আমেরিকায় ডিউই নূতন শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী—তিনি ফর্মাল ট্রেনিং মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের যাদু মন্ত্রের শক্তি আছে, এটা অবিশ্বাস্য কথা। এমন হতেই পারে না, যে কতগুলি এমন অদ্ভূত ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয় আছে যা ডোজ মেপে শিশুকে গিলিয়ে দিলেই সে ভবিষ্যতে দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে। প্রত্যেক বিষয়ই শিশুর মনের গুণগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করতে পারে। সে বিষয় তার আগ্রহকে জাগ্রত করে, তার চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে, তাই তার মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সহায়ক। শুধু বিষয় বস্তুটাই এখানে প্রধান নয়। শিশুর মন কতটা গ্রহণ করবার উপযোগী, কোনদিকে তার

---

১৮ Sandiford—Educational Psycholgy, P. 276

১৯ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 575-76

স্বাভাবিক ঝোঁক, এ বিষয়ে শিক্ষক যদি মনোযোগী না হন, তা হলে বিষয়বস্তু মূল্যবান্ হলেও শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। শিক্ষককে জানতে হবে শিশুর মনকে জানার আর বিষয়বস্তু সরস করে পরিবেশনের কৌশল।[২০]

আধুনিক শিক্ষানীতির উপর সংক্রামণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল—

পূর্বেই বলা হয়েছে, যেমন, থর্ণডাইক, উডওয়ার্থ এদের পরীক্ষার ফলে বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচনে ল্যাটিন্ বা ব্যাকরণের প্রাধান্য লোপ পেয়েছে। বরং বর্তমান কালে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়-নির্বাচনের দাবী প্রবল হয়েছে। ল্যাটিন্ বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুটিনাটি তথ্য সব ছাত্রের জন্যই অবশ্য-শিক্ষণীয় করতে হবে, তার কোন মানে নেই। যে বিদ্যা বা নিপুণতা জীবনে সব চেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে তা শেখালেই সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় নিবারিত হবে। যেমন বর্গমূল নির্ধারণ শেখানো। অধিকাংশ মানুষের বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারের সুযোগ হয় না। তাই অংক শেখাতে গিয়ে সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্যে এ শিক্ষা আবশ্যিক করবার কোন মানে নেই। তার চেয়ে অংকের যে পদ্ধতিগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, সেগুলিই সাধারণ ছাত্রদের শেখানোর উপর জোর দেওয়া দরকার। এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ-কর্মগুলি নিয়েই অংকের সমস্যাগুলি গড়ে ওঠা দরকার। এগুলি হচ্ছে স্যাণ্ডিফোর্ডের ভাষায় 'মিনিমাম্ এসেন্সিয়ালস্'—এগুলি না শিখলেই নয়। অবশ্য যাদের বিশেষ বিশেষ ঝোঁক বা রুচি আছে, তাদের সে বিষয়ের খুটিনাটি শিখতেই হবে। তা ছাড়া কতগুলি বাঞ্ছনীয় মানবিক বৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গী গঠন সমস্ত শিক্ষারই গৌণ উদ্দেশ্য এবং তা যে কোন বিষয় অবলম্বন করেই শেখানো যেতে পারে।

থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' নীতি, বর্তমানে শিক্ষাকে সমাজ-প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত (social utility) করতে হবে এই প্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলা যেতে পারে। যেখানে উপাদানের ঐক্য সর্বাধিক, সেখানেই শিক্ষার সার্থক সংক্রামণও সবচেয়ে বেশী, একথা যদি সত্য হয় তবে এটা শিক্ষাবিদ্‌দের দেখা উচিত, যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমস্যার মিল থাকে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে ধৈর্য, নির্ভুলতা, সততা, নিষ্ঠা,

২০ John Dewey—Experience & Education. pp. 45-46

উদ্যম, ইত্যাদি যে সদ্‌গুণগুলির প্রয়োজন হয় এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি সমস্যা সমাধানের সহায়ক, সেগুলি যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই বাস্তবিক আয়ত্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষা প্রণালীও সে অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।[২১]

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন পদ্ধতি শিক্ষার সমালোচনায় একথা ঠিকই বলা হোত যে সে শিক্ষা নিতান্তই বই-পুস্তক-ঘেঁষা ও অবাস্তব। স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন্ 'দ্য ফিউচার ইন্ এডুকেশন' পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"আমাদের বর্তমান শিক্ষাটা হচ্ছে এইরকম; ডাক্তারেরা কতগুলি ধরাবাঁধা ঔষুধ দিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যান, ভবিষ্যতে রোগীর স্বাস্থ্যের উপর এর কি ফল হবে, এটা তাঁরা চিন্তাও করেন না। এতে করে অল্প কিছুসংখ্যক রোগীর রোগ সারে। তারা উপকৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই এ চিকিৎসায় উপকৃত হয় না, এবং যখন তারা ডাক্তারখানা ত্যাগ করে তখন ভবিষ্যতে আর তারা এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে বা ডাক্তারী ঔষুধ খেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়, যদিও ডাক্তার অবশ্য মনে করেন, এ ওষুধগুলি রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকারী।...প্রধান প্রশ্ন এ নয় যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে কি বিষয় কতটা শিখলো বা শিখলো না—প্রধান প্রশ্ন হোল ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কি রুচি, শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী তারা আয়ত্ত করল।"[২২] আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে এ-সমালোচনা আজও সত্য।

আমেরিকার ডিউই ও কিল্‌প্যাট্রিকের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার প্রণালী যাতে জীবন-কেন্দ্রিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই 'প্রোজেক্ট মেথড্, আবিষ্কার করেছেন। এতে করে শিশুরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের জীবন সমস্যা সমাধানেই অভ্যস্ত

---

২১ "The transfer of methods of attack of knowledge and insights, techniques of learning and problem-solving, interest, poise, habits and ideals of caution, honesty, accuracy, thoroughness, initiative etc, to the situations of life wiil be large, supposedly to the degree that the subject-matter and activities of the class-room are similar to those encountered in life outside the school."

২২ Sir Richard Livingstone—The Future in Education—Preface.

হয়। যেমন তারা স্কুলেই পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর চালাতে শেখে—সবজী বাগান, ফুলের বাগান করে, ছোটখাট পাখী বা জন্তু পালন করতে শেখে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে আধুনিক পরীক্ষা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে। ল্যাটিন্ মুখস্থ করলে ছাত্রদের মনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং তাতে তারা ভবিষ্যত জীবনে দিগ্‌গজ হবে, এ বিশ্বাস বদলে গেছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাস করছেন 'যতই বিদ্যালয়ের সমস্যা, ক্রিয়া, উদ্দেশ্য, কৌশল, অভ্যাসও আদর্শ বাস্তব জীবনের সমস্যা, ক্রিয়া ইত্যাদির অনুরূপ হবে, ততই ঘটবে শিক্ষার সার্থক সংক্রামণ এবং ততই বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে।[২৩]

শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে ডিউইর মত—যাঁরা শিক্ষায় প্রাচীন-পন্থী তাঁরা এক শিক্ষাদ্বারা অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধির নীতিতে বিশ্বাসী। এঁরা বলেন কতগুলি বিষয় শিশুর মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। যেমন অংক কষলে মানসিক একাগ্রতা বাড়ে, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণতর হয়, বিচার-বুদ্ধি নির্ভুল হয়।

ডিউই শিক্ষায় নব্য পন্থায় বিশ্বাসী। তিনি প্রাচীন ফর্মাল্ ডিসিপ্লিন্ মতবাদে অনাস্থাশীল। তিনি বলেন কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের যাদুমন্ত্রের শক্তি আছে, এটা বিশ্বাস করা চলে না। যে শিক্ষক নিজের বিদ্যার বোঝা শিক্ষার্থীর ঘাড়ে নির্বিচারে চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন, তিনি তো অন্ধ। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির গলদ এইখানে যে তা বাইরের বিষয়কেই বেশী মর্যাদা দেয়।[২৪] শিশুর সাধ্য, প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি তা অনেকটা উদাসীন।

---

২৩ Gates Jersild etc. Educational Psychology p. 496.

২৪ Failure to take into account adaptation to the needs and capacities of individuals was the source of the idea that certain subjects and certain methods are intrinsically cultural or intrinsically good for mental discipline.. The notion that some subjects and methods and the acquaintance with certain facts and truths possess educational value in and of themselves is the reason why traditional education reduced the materials of education so largely to a diet of predigested materials. According to this notion, it was enough to regulate the quantity and difficulty of the material provided...If the pupil left it instead of taking it, if he engaged in physical truancy or in the mental

প্রাচীন পদ্ধতি যেন এটা ধরেই নেয়, যে শিশু শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহশীল। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করে কঠোর হয়ে বিদ্যারূপ চিরতার নির্য্যাস জোর করেই গেলানো। বলাই বাহুল্য, ডিউই এ মতের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাঁর মতে শিক্ষকের অধিকতর অভিজ্ঞতার মূল্য তো এইখানেই যে তিনি শিশুর অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সক্ষম, এবং তাঁর সংবেদনশীল মন দিয়ে তিনি বুঝবেন, কোথায় শিশুর আগ্রহ, কোথায় তার অসুবিধা, কি তার প্রয়োজন। বিষয়-বস্তু বড় কথা নয়,—বড় কথা শিশুর মনকে তা গ্রহণের উপযোগী করা এবং সে দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই নব্য (progressive) শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

truancy of mind-wandering he was held to be at fault. No question was raised as to whether the trouble might not lie in the subject matter or in the way in which it was offered. Dewey—Experience and Education. pp. 45-46.

পঞ্চদশ অধ্যায়

অভ্যাস (Habit)

গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে, বিশ্ববাবুর ডান হাতটা অবশ হয়ে গেল। বাঁ হাতে দাঁড়ি কামাতে, প্রথম প্রথম, খুবই অসুবিধা হত। ছ মাস পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর, এখন বাঁ হাতে দাড়ি কামানো, খাওয়া, এমন কি নাম দস্তখত করাও বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন অনায়াসেই তিনি এ কাজগুলি বাঁ হাতেই করেন।

সেদিন কাগজে আল্‌জেরিয়ার শ্বেতবিদ্রোহী দলের (O. A. S.) নেতা, জেনারেল সাঁলা, কি করে ধরা পড়লেন, তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। জেনারেল সাঁলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্যের জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। তিনি নাম পালটিয়ে, জাল Identity papers নিয়ে, ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি আলজিরীয়ার প্রান্তে, এক শহরের এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাবার জন্য ঢুকে খাবার অর্ডার দিলেন। সরকারী এক গুপ্তচরের, চেহারা দেখে সন্দেহ হওয়াতে, সে নিতান্তই যেন ঘুরতে ঘুরতে সাঁলার টেবিলে এসে বসে, তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সে লক্ষ্য করল, সাঁলা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন। গুপ্তচর এটা জানত যে সাঁলা মার্মালেড খুব পছন্দ করেন। ওয়েটার কাছে আসতে, হঠাৎ গুপ্তচর হেসে অনুরোধ করলেন "Have a marmalade, General !" সাঁলা মাথা নীচু করে খাচ্ছিলেন, এবার মাথা তুলে ঘাড় নেড়ে হেসে সম্মতি দিলেন। গুপ্তচরের আর সন্দেহ রইল না। সে ইঙ্গিত করা মাত্র, ছদ্মবেশী সশস্ত্র প্রহরীরা সাঁলাকে গ্রেপ্তার করল।

এ উদাহরণ থেকে বোঝা যায় অভ্যস্ত কাজ মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে (second nature) পরিণত হয়। অভ্যস্ত কাজ ভাবনা চিন্তা ছাড়াই অনায়াসে আমরা করতে পারি।

অভ্যাসের সংজ্ঞা—Definition of habit—থর্ণডাইক্ বলেছেন "অভ্যাস কতগুলি ক্রিয়ার কৌশল **বা** ভঙ্গী, যা **অনুশীলন** ও অভিজ্ঞতার ফলে অংশতঃ

বা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়।[১] ড্রেভারের সংজ্ঞা হচ্ছে "অভ্যাস একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, যা সাধারণতঃ শিক্ষা ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত হয়; এ শব্দটি ঠিক ঠিক ভাবে, দৈহিকক্রিয়ার বেলায়ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কিন্তু কখনো কখনো ব্যাপকতর অর্থে, চিন্তার অভ্যাস বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, তখন দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) কথাটি ব্যবহার করাই উচিত।"[২]

অভ্যাসের, তা হলে দুটি মূল লক্ষণ। অভ্যাস চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত হয়। এর জন্য শিক্ষা ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন। সুমিত্রার সাইকেল চড়ার অভ্যাস আয়ত্ত হওয়ার পেছনে আছে বহু আঘাত, পতন, শাড়ী ছেঁড়া, বকুনী খাওয়ার ইতিহাস। গান আয়ত্ত করতে কতটা কসরৎ, কতটা আত্মধিক্কার, আর প্রতিবেশীদের কতটা অভিসম্পাত সহ্য করতে হয়, সেটা যে কোন গুণী গাইয়েই তা বলতে পারবেন। সদভ্যাসগুলিতো আয়াসলব্ধ বটেই, কদভ্যাসগুলিও আয়ত্ত করতে পরিশ্রম চাই। ছেলেরা যারা ঝানু সিগারেটখোর, আর মেয়েরা যাদের চা-টা চাই-ই, তারা সবাই জানে, গোড়াতে ব্যাপারটা সুখকর ছিল না, চেষ্টা করেই শিখতে হয়েছে। অভ্যাসটা তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথমে চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

অভ্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণ এই, যে অভ্যস্ত ক্রিয়া যান্ত্রিক। তা অনায়াসে সম্পাদিত হয়। এ কার্যসম্পাদনে কোন চিন্তা, ভাবনার কোন প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই বলা হয়—Habit is second nature. আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়ার অনেকগুলিই অভ্যাসবশতঃ, বিনা আয়াসে, আমরা করি। আমরা হাঁটি, কথা বলি, খাই, কাপড় জামা পড়ি। জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ শক্তি স্নায়বিক শক্তি। দৈনিক বহু কাজে আমরা এ শক্তির ব্যবহার সংকুচিত করে, জীবনের গুরুতর কাজের (যেখানে বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনার প্রয়োজন) জন্য এই শক্তির সংরক্ষণ করি। তাই; এই অভ্যস্ত কাজগুলি অন্য বুদ্ধিচালিত কাজগুলির পথে বাধা জন্মায় না। সাইকেল চালাতে চালাতে, তুমি কেমিষ্ট্রির জটিল ফর্মূলা স্মরণ করতে পার, অথবা শাড়ী পরে, মুখে পাউডার ঘসতে ঘসতে, তোমার জন্মদিনে কোন্ কোন্ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করবে, তার ফর্দটা তৈরী করতে পার। "অভ্যস্ত ক্রিয়ার সবটা

১। Thorndike—Educational Psychology, p. 16
২। Drever—Dictionary of Psychology, p. 112

অংশই, সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে, সব সময় করা যায় না,—বিশেষতঃ কাজটি যদি দীর্ঘ ও জটিল হয়। সে ক্ষেত্রেও, এ কাজের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি যান্ত্রিকভাবে, বিনা মনোযোগে করা সম্ভব হয়। "মনোযোগ ব্যতিরেকে অভ্যস্তক্রিয়া যে চলতে পারে, তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এমন ক্রিয়া, যেখানে মন অন্যত্র নিযুক্ত, যেমন কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে একজন উল্ বুনছে বা একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, অথবা মন যখন অন্যচিন্তায় নিমগ্ন, তখন লোকজন গাড়ীঘোড়াপূর্ণ রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা লক্ষ্যণীয়, যে এ সব ক্ষেত্রে মনোযোগ সম্পূর্ণই অন্য কাজে রয়েছে, এমন নয়।...অন্যমনস্কভাবে যিনি রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছেন, তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত নন যে, তিনি লোকজন সমাকীর্ণ রাস্তায় আছেন, ও পথ চলছেন। তবে এটা জোর করেই বলা চলে যে তাঁর নিজস্ব ও চতুষ্পার্শ্বের ক্রিয়া ও ঘটনার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় মনোযোগ নেই। এই যে তফাৎটা, এটা দিয়ে আমরা আর কতগুলি অভ্যাসকে বুঝিতে পারব, যেগুলি বহু অনুশীলন সত্বেও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে উঠে নি। সবচেয়ে ওস্তাদ তলোয়ারবাজও ডুয়েল লড়বার সময়, অন্য অবান্তর বিষয়ে মন দিতে পারে না। বরং, তখন তার সদাজাগ্রত মনোযোগ থাকা চাই। এর কারণ হচ্ছে, এখানে তলোয়ার চালনক্রিয়ার কয়েকটি খণ্ড-অংশই মাত্র সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়েছে।"[৩] ষ্টাউটের মতে সহজক্রিয়ার বেলায় যেমন, অভ্যাসের বেলায়ও তেমনি, মনোযোগ ও বুদ্ধি কিছু পরিমাণ উপস্থিত থাকেই। অভ্যাসগঠন পরবর্তী ক্রিয়া সম্পাদনের পক্ষে সহায়ক। পূর্বে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া (মস্তিকের স্নায়ু-সূত্রগুলিতে) কিছুটা প্রবণতা রেখে যায়, যার ফলে উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির জন্যে পরবর্তীক্রিয়ার অনুষ্ঠান সহজতর হয়। যখন এই সহজীকরণ এমন অবস্থায় পৌছায় যে আর সচেতন উদ্যমের প্রয়োজন হয় না, তখনই এটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তি—The physiological basis of habit
যখনই আমরা কোন কাজ করি, তখনই মস্তিষ্কের নিউরগুলি সক্রিয় হয়, এবং তাদের শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে, বৈদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হয়। প্রথম

৩ Stout. Anatlytic Psychology p. 227
৪ Stout. Manual of Psychology p. 423

কোন নূতন ক্রিয়া সম্পাদনকালে, নিউরন্‌গুলির সন্ধিস্থল (synapse) গুলিতে কিছু বাধা অতিক্রম করতে হয়। স্নায়ুপদার্থ নমনীয় (plastic)। সুতরাং একবার কোন স্নায়বিক শক্তি স্নায়ুসূত্রের কোন নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হলে, শৃংখলিত নিউরণগুলি তার দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়, এবং স্নায়ুসন্ধির (synapse) বাধাও অতিক্রান্ত হয় ; তার ফলে, অনুরূপ অবস্থায় স্নায়বিক শক্তির একই পথে

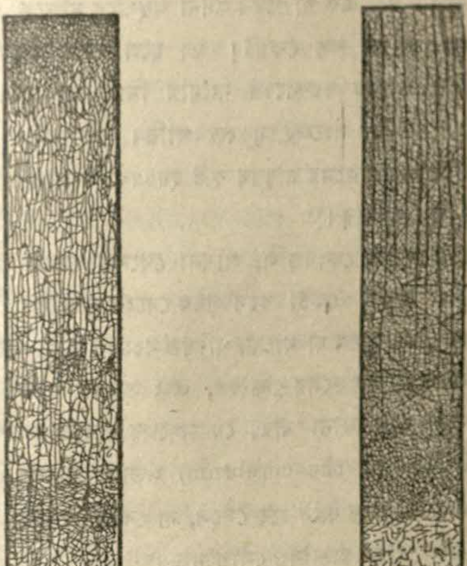

Fig. 48. মনুষ্য মস্তিষ্কের সামান্য একটু অংশের বহুগুণ বর্ধিত ছবি। এতে বোঝা যাবে স্নায়ুমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ গঠন ও তাদের পরস্পর সংযোগ কি ভীষণ জটিল। বাঁ দিকের ছবিতে স্নায়ুকোষ, ডেন্‌ড্রেন্ ও অল্প কয়টি এ্যাকসন্ দেখানো হয়েছে। ডানের ছবিতে এ্যাক্‌সন্ ও তাদের শাখা প্রশাখা সহ দেখা যাচ্ছে। এই দুটি ছবি একটি অন্যটির উপর উপস্থাপন করলে মস্তিষ্কের সামান্য একটু ক্ষেত্রে এ্যাক্‌সন্ ও ডেন্‌ড্রন্‌গুলি কি জটিলভাবে জড়িয়ে থাকে তার আভাস পাওয়া যাবে। অভ্যাসগঠন কালে স্নায়ুসূত্রগুলির মধ্যে সংযোগের জটিলতা সর্বাধিক। Ramon, y Cajal

প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই দ্বিতীয়বার অনুরূপক্রিয়া অনেকটা সহজ হয়। বারে বারে একই পথে স্নায়বিকশক্তি সঞ্চরণের ফলে, পথটা (nerve path) পাকা হয়। এরই নাম অভ্যাস। আবার এই পথ অনেকদিন

ব্যবহৃত না হলে স্নায়ু-পথের রেখাটা অস্পষ্ট হয়, স্নায়ুসন্ধির বাধা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। "প্রত্যেক স্নায়ুসন্ধিতে স্নায়বিকশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্নায়বিক শক্তি-তরঙ্গের একটির পর একটির ধাক্কায় স্নায়ুসন্ধির বাধা ভেঙে ফেলার নামই হল অভ্যাস গঠন। স্নায়বিক শক্তি যতই প্রচণ্ড হবে, এবং যতই বারে বারে স্নায়ুসন্ধিতে এসে ধাক্কা মারবে, ততই বাধাটা দ্রুত ভেঙে যাবে, অর্থাৎ অভ্যাস গঠিত হবে।"[৬] এক পণ্ডিতের গণনা অনুসারে মস্তিষ্কে স্নায়ু-কোষ বা নিউরণের সংখ্যা এগারো শত কোটি! তা হলে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর কোটি কোটি কোষ এবং তাদের পরস্পরের সংযোগ মিলে ব্যাপারটা কি অসম্ভব রকম জটিল, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কি করে এই স্নায়ুসূত্রের অরণ্যের মধ্য দিয়ে সহস্র রকমের স্নায়ুপথ সৃষ্টি হয় এবং অভ্যাস গঠিত হয়, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার।[৭]

দেহের অন্যান্য অংশের কোষগুলি, আপনা থেকেই ভেঙে ভেঙে, সংখ্যায় বেড়ে যায়। এই জন্যই, একটা বয়স পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের সংখ্যা, জন্মকালে যা থাকে, পরিণত বয়সেও তাই থাকে। তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না বটে, আয়তনের বৃদ্ধি হয়, এবং তাদের শক্তি ও সক্রিয়তাও বাড়ে। পরীক্ষার ফলে জানা যায়, যে মগজের সর্বোচ্চ অংশের সম্মুখভাগই (the frontal lobe of the cerebrum) অভ্যাস গঠনের বেলায় বিশেষ ভাবে সক্রিয়, এবং এই অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে, বা কেটে ফেললে, নূতন অভ্যাস গঠিত হয় না, এবং পুরাতন অভ্যাসও লোপ পায়।[৮]

সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস—Instinct and habit—সহজক্রিয়া এবং অভ্যাস দুইই অনায়াসে সম্পন্ন হয়। দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি পরিচালনা নিষ্প্রয়োজন, (ষ্টাউট্ ইত্যাদি একথা স্বীকার করেন না)। এবং দুই ক্ষেত্রেই ক্রিয়া মোটামুটি যান্ত্রিক এবং নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অভ্যাসের গোড়াতে থাকে ব্যক্তির সচেতন ও সচেষ্ট ক্রিয়া। ব্যক্তিকে প্রথমে ক্রিয়াটি নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু সহজক্রিয়া ব্যক্তিগত, এবং বংশানুক্রমের ধারায় প্রাণী এটা

৫ Wm James—Priciples of Psychology Vol 1. p 105

৬ P. Sandiford—Mental and Physical Life of School children, p 144

৭ Verworn—Address to the Meeting of the British Association. Dundee, 1912

৮ Franz—The Frontal lobes ; Archives of Psyhology, 1907—No 2

বিনা শিক্ষায়ই সুষ্ঠ ভাবে করতে সক্ষম হয়। কেউ কেউ তাই Instinct-কে বলেছেন—Racial habit। কিন্তু এই বিবরণ আপত্তিজনক কারণ habit বা অভ্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে প্রথমে এই ক্রিয়া সচেতন চেষ্টা দ্বারাই আয়ত্ত করতে হয়, কিন্তু সহজক্রিয়া হচ্ছে, 'অশিক্ষিত পটুত্ব।' অভ্যস্ত ক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক হয় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমরা বলেছি সহজ ক্রিয়া সহজাত, আর অভ্যাস হচ্ছে চেষ্টার্জিত। কিন্তু মানুষের বেলায় অন্ততঃ, একটা মুস্কিল দাঁড়ায় এই যে, তার প্রায় প্রত্যেকটা কাজের কতকটা অংশ হচ্ছে জন্মগত দৈহিক গঠনের ফল, আবার কতকটা অংশ হচ্ছে অর্জিত। এই দুইয়ের মধ্যে পাকাপাকি সীমারেখা না থাকাতে, একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থেকে যায়। খাওয়াটাকে আমরা বলি অভ্যাস, কিন্তু এ ক্রিয়াটি তো খাদ্যআহরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি-রূপ সহজ প্রবৃত্তিজাত। এদের পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট পেশী ও স্নায়বিক সম্বন্ধ জন্মগত বলেই, খাওয়া কাজটা এত সহজে (?) শিশু শিখতে পারে। ঝাগড়াটা বাস্তবিক পক্ষে ঘটনার স্বরূপ নিয়ে নয়, তাদের নাম ও বিবরণ নিয়ে। যদি প্রত্যেক কাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রভেদটা স্মরণ রাখি, এবং একথাও স্মরণ রাখি, যে সমস্ত অভ্যাসের পিছনেই একটা অশিক্ষিত ও জন্মগত দেহ-যন্ত্রের গঠন থাকবে, এবং সমগ্র কাজটাকে অভ্যাস বা সহজক্রিয়া যে নামই দেই না কেন, বাস্তবিকপক্ষে তাদের দুইটি অংশ আছে এবং যে অংশ প্রধান সে অনুসারেই ক্রিয়াটির নাম-হয়, এ কথা মনে রাখলে গোলযোগটা মিটতে পারে।[৯]

অভ্যাসের দ্বারা, সহজক্রিয়ার গণ্ডী বা বস্তু নির্দিষ্ট বা সীমিত হয়। কখনও বা অভ্যাসের দ্বারা এর ক্ষেত্র বর্ধিত হয়। আবার কখনো দেখা যায়, অভ্যাস সহজপ্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়। অভ্যাসের ফলে, একটি পাখী প্রতি বৎসর একটি বিশেষ গাছের ডালেই বাসা বানায়। আমরা যে দিনের মধ্যে দুবার ক্ষুধার্ত বোধ করি, তার সবটাই অন্ধ প্রবৃত্তিজাত নয়, এটা অনেকটা অভ্যাসের উপরও নির্ভর করে। আমাদের দেশে, বহু দরিদ্র ব্যক্তি দিনে একবারই মাত্র খায়, একবারই তারা ক্ষুধা বোধ করতে অভ্যস্ত হয়েছে বলেই,

৯ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 306-7

এমন ঘটে। আবার উচ্চবিত্ত 'সাহেব মানুষ'দের, পাঁচবার দিনের মধ্যে খিদে পায়, এবং পাঁচবার না খেলে, তাদের কষ্ট হয়।[১০]

অভ্যাস এবং শিক্ষার ফলে, যে বস্তু বা ঘটনা কোন তীব্র আবেগ স্বাভাবিক ভাবে জাগায়, তার সঙ্গে সংযুক্ত কোন ঘটনা বা চিহ্নও সেই আবেগ জাগিয়ে উপযুক্ত সহজক্রিয়া উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রু-বিমান থেকে বোমা পড়তে সুরু হলে, মানুষ ভয় পেয়ে, 'সেল্টারে' আশ্রয় নিত,—কুকুর, বেড়ালও তাই করত। এর পর বিপদ-সূচক 'সাইরেন্, বাজলেই কুকুর ও বিড়াল মানুষের সঙ্গে সেল্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত হল। লণ্ডনে উপর্যুপরি কয়েকদিন রাত দুটোর সময় বোমা পড়ার পর দেখা গেল, শত্রু বিমান না দেখা দিলেও, রাত দুটোর সময় কুকুরগুলি চঞ্চল হয়ে চীৎকার করতে থাকত।

অভ্যাসের ফলে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সহজ প্রবৃত্তি কতগুলি একত্র হয়েও জটিল প্রবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে। এসম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত স্মরণ করা যেতে পারে।

জেম্‌সের মতে, সহজ প্রবৃত্তির চেয়ে অভ্যাসের শক্তি প্রবলতর, এবং তিনি মনে করেন, যে অভ্যাস দ্বারা সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি দুইটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন (১) অভ্যাস দ্বারা সহজ ক্রিয়ার নিরোধ এবং (২) সহজ ক্রিয়ার অনিত্যতা।

পুরস্কার তিরস্কারের সাহায্যে কুকুর বিড়াল ইত্যাদি পোষমানা প্রাণীকে ঘরের মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদি নোংরা কাজগুলি না করতে, শিক্ষা দেওয়া যায়।

ঘোড়া গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। এটা স্বাভাবিক ও সহজক্রিয়া। কিন্তু যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যে তখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রেও গোলাগুলির মধ্যে স্থির থাকে। আমরা দেখেছি যে conditioned learning-এর এ একটি মূলসূত্র যে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা, একটি কৃত্রিম বিকল্প উত্তেজকের সাহায্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়। জেমস্ এই কথার উপরই বিশের জোর দেন যে অভ্যাস গঠন দ্বারা সহজপ্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াকে যথেষ্ট পরিবর্তন করা যায়, এমন কি তাদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদসাধনও করা যায়।

১০ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 306

২। জেম্‌সের দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে, যে সমস্ত সহজ প্রবৃত্তিই ক্ষণস্থায়ী। তারা প্রাণীর দেহের বিশেষ অবস্থায়, কতগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রয়োজন মিটে গেলেই তারা লুপ্ত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সঙ্গমেচ্ছা স্তন্যপান ইত্যাদি সহজ প্রবৃত্তি, দেহের বিশেষ অবস্থায়, কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রয়োজন মিটিয়েই শান্ত হয়। কিন্তু একথা অংশতই সত্য। কারণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সঙ্গমেচ্ছা, পাখীর বাসা তৈরী করা ইত্যাদি প্রবৃত্তি যতদিন প্রাণী বেঁচে থাকে, ততদিন বারে বারে দেখা দেবে। এগুলিকে তাই ক্ষণিক বলা চলে না। অবশ্য শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তি শৈশব অতিক্রান্ত হলেই অন্তর্হিত হয়,—তার কারণ এই নয় যে তার ক্ষুধা, তৃষ্ণার প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়; তার কারণ দেহের পরিণত অবস্থায়, তার অন্য কঠিন খাদ্য গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া অভ্যাসদ্বারা, চেষ্টাদ্বারা জীবনের মৌল প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ রোধ করা যায় না। উপযুক্ত ঋতুতে পশু পক্ষীর স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছার তৃপ্তির সুযোগ না দিলে, তারা কখনও কখনও ছটফট্ করে মারা যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্বন্ধে একথা সত্য, তা বলবার প্রয়োজনই নেই।

অভ্যাসের সুফল ও কুফল—Uses and abuses of habit—অভ্যাস স্নায়বিক শক্তির অপচয় নিবারণ করে। দৈহিক ছোটখাটো অধিকাংশ কাজ অভ্যস্ত হয় বলেই, জীবনের গুরুতর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ ঘটে। অভ্যাস সময় বাঁচায়, কাজের শ্রম কমায়। সভ্য পরিণত মানুষের সামাজিক জীবনের মূলে আছে, কতকগুলি রীতি, নীতি, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ব্যবহার—সেগুলি সবই অভ্যাসগত। সরস্বতী পূজোর দিন ভোরে উঠে স্নান কর, সকলে মিলে অঞ্জলি দাও, লোকভর্তি ট্রামে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে, তোমরা দুই বন্ধু তোমাদের জায়গা তাদের ছেড়ে দাও; তোমরা মেয়েরা গুরুজনের সামনে আঁচল দিয়ে অনাবৃত পিঠটা ঢেকে দাও। এ সমস্ত অভ্যাসের নামই রুচিসম্মত সামাজিক ব্যবহার। এদের উদ্দেশ্য সমাজের শৃংখলা রক্ষা, পরস্পরের ব্যবহার প্রীতিপূর্ণ করে তোলা। লেখাপড়া শেখার মধ্যেও আছে অনেকখানি মুখস্থ করার কাজ,—যা অভ্যাসগত।

কিন্তু অভ্যাস সব সময়ই উপকারী, এমন নয়। অভ্যাসের মধ্যে আছে, দাসত্ব, ক্ষণকালের জন্য হলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন। ফ্যাসান্ মানেই তো গোষ্ঠীগত অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ। যা বহুদিনের

চেষ্টায় অভ্যস্ত হল, তা প্রয়োজন হলে, পরিবর্তন করা কঠিন। সরকার বলেন দেশে চাউলের অভাব, কিন্তু গম আছে প্রচুর, কাজেই অন্নভোজী বঙ্গ সন্তানেরা যেন একবেলা অন্ততঃ রুটি খান; রুটি অধিকতর পুষ্টিকরও বটে। কিন্তু এ উপদেশ বধির কর্ণের উপরই পতিত হয়। কর্তারা বলবেন, চায়ের দাম বেড়েছে, 'চা'টা ছেড়ে দাও'। অমনি গৃহিণী হুংকার দিয়ে বললেন, "তার চেয়ে তোমার ওই 'মুয়ে আগুন' সিগারেট্-টা বাদ দিলে সংসারে দুটো পয়সা সাশ্রয় হয়।"

ক্রিয়ার যেমন অভ্যাস আছে, তেমনি আছে চিন্তার অভ্যাস। যারা প্রাচীন, তাই তাঁরা নবীনদের মতামতকে সন্দেহের চোখে দেখেন, বিরক্ত হন। জীবনের ধর্ম—পরিবর্তন, নমনীয়তা, নূতন পথে অগ্রগমন; কিন্তু অভ্যাসের ধর্ম—সংরক্ষণ, গতানুগতিকতা। তাঁই যাঁরা সংস্কারপন্থী, বিপ্লবে বিশ্বাসী, যেমন, শ', বার্ট্রাণ্ড রাসেল্, সুভাষচন্দ্র তাঁরা অভ্যাসের নিগড়কে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁরা বলবেন, পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগমনে তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ অবদান, যাঁরা প্রাচীন অভ্যাসদাসত্বকে অস্বীকার করেছেন,—যেমন মার্টিন লুথার, বেকন্, রামমোহন রায়। আবার যাঁরা সংরক্ষণশীল, তাঁরা বলেন জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, চাই সাধনা। যা শ্রেষ্ঠ মূল্য, তাই প্রাচীন। মানুষকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়,—আদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা। আদর্শ ও নীতি যা, তা নিত্য; তা ফ্যাসানের ঢংয়ের মত নিত্য পরিবর্তিত হয় না। সমাজের সংরক্ষণেই মানবের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল।...এই দুই মতের মধ্যেই সত্য আছে,—আবার এই দুই মতের মধ্যেই আছে, একদেশ-দর্শিতা। যে নূতনকে গ্রহণ করতে পারল না, যে সাহস করে অভ্যস্তপথ, অভ্যস্তচিন্তা ছেড়ে নূতন পরীক্ষা, নূতন ফলপ্রসূ দুর্গম পথে চলতে শিখল না, সে তো কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভীরু, অলস, কাপুরুষ। আবার এ কথাও সত্য, যে কতগুলি মূল্যবোধ (values), কতগুলি নীতি ও আদর্শকে মেনে নিতেই হবে। জীবনের একটি ধ্রুবকেন্দ্র না থাকলে, সু-অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত আত্মসংযম না থাকলে, প্রতি মুহূর্তের নিত্য নূতন উত্তেজনায় চঞ্চল হলে সবল মনুষ্যত্বের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। তাই সর্বোৎকৃষ্ট মত হচ্ছে, এই দুই আপাতবিরোধী মতের সুসমন্বয়—মধ্যপন্থাই উত্তমপন্থা।

কু-অভ্যাস বিদূরণ সম্পর্কে জেম্‌সের কয়েকটি উপদেশ—জেম্‌সের মতে, শিক্ষার প্রধান কাজ—সু-অভ্যাস গঠন। বাল্যকাল থেকে যাতে শিশু সু-অভ্যাস আয়ত্ত করে, এ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষককে বিশেষ যত্নবান্ হতে

হবে। এবিষয়ে শৈথিল্য পাপ। শিশুর কু-অভ্যাস দেখলে, কঠোর অথচ স্নেহশীল শাসন দ্বারাই, তার সংশোধন করতে হবে। কিন্তু কেবল বাইরের শাসনদ্বারা, কু-অভ্যাস বিদূরিত হতে পারে না।

ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যম ও আগ্রহ ভিন্ন, এ বিষয়ে সাফল্য অসম্ভব। ব্যক্তিকে তাই এ কয়টি কথা স্মরণ রাখতে হবে।

১। মাঝে মাঝেই আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, সে কোন্ কোন্ কু-অভ্যাসের দাস।

২। কোন্ অভ্যাস বদভ্যাস এটা বুঝতে পারা গেলেই তা বিদূরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ ত্যাগের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখানে নরম হলে চলবে না। সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস যদি ছাড়তে চাও তো এ বলে মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, যে ধীরে ধীরে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে, শেষে এটা ছেড়ে দেবে। এ ভাবে নিজের দুর্বলতাকে যদি নানা অজুহাতে প্রশ্রয় দাও, তবে কখনই এ অভ্যাসটি ছাড়তে পারবে না। ঝপ্ করে দৃঢ়চিত্তে, একবারেই, তা **এখনই**, ছাড়তে হবে। প্রথমে কিছু কষ্ট হবে, তা অগ্রাহ্য করতে হবে।

৩। প্রলোভনের দ্রব্য থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। পরিনিন্দার কু-অভ্যাস ছাড়তে চাও তো, পরিচর্চার যে অভ্যস্ত আড্ডাটি, তাও ছাড়তে হবে। মনের রুচিটিরই পরিবর্তন করতে হবে।

৪। বদঅভ্যাস চিরতরে ছাড়তে হলে, তার বিপরীত কোন সদভ্যাস, চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে। পরনিন্দার আড্ডা ছেড়ে গানের স্কুল, সেলাইর ক্লাসে ভর্তি হও, সাহিত্যচর্চায় রস পেতে চেষ্টা কর, স্বাস্থ্যকর খেলাধূলায় লেগে যাও।

৫। যখনই সুযোগ পাবে, প্রয়োজন না থাকলেও, সদভ্যাসটি আচরণ করবে। স্কাউট্‌দের তাই নিয়ম,—প্রতিদিনই কোন না কোন দয়া, দাক্ষিণ্য, তা যত সামান্যই হোক্, আচরণ করবে। এমন করেই ক্রমে ক্রমে সেবা-বুদ্ধি, স্বভাবজ হয়ে দাঁড়াবে।[১১]

সমস্ত আদর্শ উপদেশের মত জেম্‌সের উপদেশও মূল্যবান্। তবে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, তার পালন ততটা সহজ নয়। কিন্তু জেমস্ শুধু উপদেশই

[১১] James. Principles of Psychology. vol. II.

দেন নি। কি করে সে উপদেশ কার্যকরী করতে হবে, তারও নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্প্রতিকালে মন্দ অভ্যাস দূরীকরণ বিষয়ে কিছু অভিনব পরীক্ষা হয়েছে। অনেকে বলেন, মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়াতে হলে, তার পরিবর্তে 'নীরা' বা Coca-Cola জাতীয় অ-মাদক অথচ আকর্ষণীয় কোন পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সিগারেট ছাড়তে হলে, তার পরিবর্তে নস্য ব্যবহার করা যেতে পারে। Salvation Armyর স্বেচ্ছাসেবকেরা ইংলণ্ডের বন্দরে আগত পানাসক্ত নাবিকদের মদ্যশালা থেকে দূরে রাখবার জন্যে, পরিচ্ছন্ন ক্লাব, নাচ গান, সস্তা খাদ্য এবং বাইবেল ক্লাশের ব্যবস্থা করে অনেক সময় সুফল পেয়েছেন।

কিন্তু এ চিকিৎসা অনেকটা বাহ্য। ফ্রয়েড্-পন্থীরা বলেন যে, মদ্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতি কোন ব্যক্তি যখন আসক্ত হয়, তখন বুঝতে হবে, তার অবচেতন মনে কোন দ্বন্দ্ব ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সে সর্বনাশের পথে নেমেছে। সুতরাং মনোবিকলন দ্বারা তার অশান্তির মূল আবিষ্কার করতে পারলে, তবেই তার সুচিকিৎসা হতে পারে। অনেক সময় post-hypnotic suggestion দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। ঘুমের অব্যবহিত পূর্বে, ব্যক্তি নিজের মনে সংকল্পটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেও, কখনো কখনো সুফল পেতে পারে।

মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কু-অভ্যাস দূরীকরণের একটি অভিনব সফল পরীক্ষা করেন, ডান্‌লাপ্‌। তিনি the কথাটিকে 'hte' টাইপ করতেন। এ ভুল দূর করার জন্যে একদিন অত্যন্ত সচেতনভাবে, তিনি অনেকবার ইচ্ছা করেই 'hte', এরকম টাইপ করলেন। এতে hte তাঁর কাছে এতই অপ্রীতিকর হ'ল যে একদিনের এই চেষ্টাতেই তাঁর ভুল অভ্যাসটি দূর হল।

আর একটি পরীক্ষা। কয়েকটি ঘোর মদ্যপায়ীকে মদ্যপানের পূর্বেই emetine জাতীয় ভেষজ দেওয়া হল। ফলে, কিছুকাল পরেই তাদের বিষম বমনোদ্রেক হতে থাকে। কয়েকদিন এই পরীক্ষার পরে, মদ্যপানের সঙ্গে বমনের বিরক্তিকর অনুভূতি এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেল যে, মদ্যপানের ধারণাও তাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হত। ব্যক্তির সক্রিয় ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা বদভ্যাস বিদূরণই বাস্তবিক স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

ডিউইর মতে অভ্যাসের স্বরূপ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল্য নিরূপণ—ডিউইর মতে অভ্যাস একটা স্থিতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয়। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো তার যোগ রয়েছেই, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গেও। কারণ, কোন অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ হতে থাকলে তবেই সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে। অভ্যাসের দ্বারা একটা কৌশল বা নিপুণতা অর্জিত হয়। আমরা অনেক সময় মনে করি, সেখানেই অভ্যাসের শেষ। কিন্তু ডিউই এই কথাটায়ই জোর দিতে চান যে, অভ্যাসের প্রভাব রয়েছে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার উপরও। এটাকে তিনি বলেছেন, ধারাবাহিকতার নীতি (the principle of continuity)। যে অভ্যাস অর্জন করে, তার মনের ও দেহের গঠনের বা ধারার পরিবর্তন হয়, এবং প্রত্যেক অভ্যাসই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে প্রভাবান্বিত করে।

অভ্যাসের মূল চরিত্রই এই যে, অনুশীলিত প্রয়োগের অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে পরিবর্তিত করে, সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা এর ফলে পরিবর্তিত হয়।

সাধারণভাবে অভ্যাসকে কতগুলি নির্দিষ্টভাবে কৃত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ দৃষ্টিতে দেখলে অভ্যাস অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার তা বোঝা যাবে।···অভ্যাসের মধ্যেই অন্তর্গত অনুভূতি ও বুদ্ধির নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গঠন।[১২]

শিক্ষার কাজ হচ্ছে এ রকম এ্যটিট্যুড্স, দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রবণতা সৃষ্টি করা। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সদভ্যাস গঠনের উপর জোর দেওয়াটা স্বাভাবিক। সব শিক্ষাব্রতীই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু সদভ্যাসের নিজস্ব কোন মূল্য নেই—এটা একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্যটি কি ? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে,

ডিউইর মতে অভ্যাসের মূল্য নিরূপণ

ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে নিজ ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে যুক্ত করা। সমস্ত শিক্ষা বা সদভ্যাস এই উদ্দেশ্যমূলক বা instrumental। ডিউইর জীবন-দর্শনকে তাই উদ্দেশ্যবাদী বলা হয়।

শিক্ষকের দৃষ্টিতে সে অভ্যাসই সদভ্যাস, যা ভবিষ্যতে ব্যক্তির সুষ্ঠ ও

---

১২ John Dewey—Experience and Education, pp. 25-26

সম্পূর্ণতর ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে বা উৎসাহিত করে। ডিউই শিক্ষায় প্রগতিবাদীদের (progressive) দলে। তাঁর মতে সমস্ত শিক্ষার মূল—অভিজ্ঞতা, শিক্ষালাভের মাধ্যম—অভিজ্ঞতা, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও—অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। এ্যাব্রাহাম্ লিন্‌কন্—গণতন্ত্রবাদ বা democracyর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন জনগণের কল্যাণে ও জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। ডিউই ও তেমনি শিক্ষার আদর্শকে সংজ্ঞা দিয়েছেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ।[১৩]

কিন্তু শিক্ষকের কাছে সব অভিজ্ঞতাই কি সমান দামী? বেন্‌থামের ভাষায়, হাল্কা কাঠির খেলা, আর কাব্যচর্চ্চার একই মূল্য? এবং কেবল মাত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা অভ্যাস সৃষ্টি ও নৈপুণ্য লাভই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। "কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত" হওয়াও অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস গঠন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অভ্যাসের ফলে কোন ব্যক্তি সিঁদেল চুরিতে বা ডাকাতিতে অথবা বজ্জাতিতে আরো 'ঝানু' হতে পারে।[১৪]

তা হ'লে এ প্রশ্নের মীমাংসা দরকার, সদভ্যাস কাকে বলা যাবে? অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব ডিউই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সে অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসই শিক্ষার অনুকূল বা educative, যা ব্যক্তির দেহ বা মনের গঠনকে পরিবর্তন করে এমন ভাবে, যাতে ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ, পূর্ণতর অভিজ্ঞতার পথ সুগম হয়। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা আপাতরম্য কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনকে বিকারগ্রস্ত, পঙ্গু বা সংকীর্ণতর করে তা শিক্ষার প্রতিকূল, বা mis-educative। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর মানসিক একাগ্রতা ও সমন্বয়ের সহায়ক তাকে শিক্ষক বেশী দাম দেবেন। যা তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে, বিভক্ত করে,—নিজ বা সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিহীন করে, তা শিক্ষক পরিহার করবেন। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর মনকে, ভবিষ্যৎ ও নূতনকে জানতে উৎসাহিত করে, যে অভিজ্ঞতা "সবার রংএ রং মেশাতে" শিশুকে অগ্রসর করে, যে অভিজ্ঞতা তার জীবনকে বিস্তার লাভ করতে সাহায্য করে, তা সুশিক্ষার অঙ্গ। আর যে অভিজ্ঞতা শিশুর

১৩ John Dewey—Experience and Education. p. 19

১৪ John Dewey—Experience and Education, p. 20

মনকে বিহ্বল করে, আত্মকেন্দ্রিক করে, পরের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্মম করে তোলে—তা কুশিক্ষা। [১৫] যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস, বুদ্ধি এ স্থৈর্য্যদান করতে পারে, তা সুশিক্ষা ; যা শিশুর মনকে অজানা ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে ভীরু বা উদাসীন করে তোলে, তা কুশিক্ষা।

১৫ Any experience is mis-educative that has the effect of arresting or distoring the growth of further experience. Anexperience may be such as to engender callousness ; it may result in lack of sensitivity and of responsiveness. Then the possibilities of having richer experience in the future are restricted. Again, a given experience may increase a person's automatic skill in a particular direction and yet tend to land him in a groove or rut ; the effect again. is to narrow the field of further experience. An experience may be immediately enjoyable and yet promote the formation of slack and careless attitude ; this attitude then operates to modify the quality of subsequent experiences, so as to prevent a person from getting out of them what they have to give. Again experiences may be so disconnected from one another that, while each is agreeable or even exciting in itself, they are not linked cumulatively to one another. Energy is then dissipated, and a person becomes scatter-brained. Each experience may be lively, vivid, and "interesting" and yet their disconnectedness may artificially generate dispersive, disintegrated, centrifugal habits. The consequence of the formation of such habits is the inability to control future experience. —John Dewey, Experience Education, p. 13-14.

ষোড়শ অধ্যায়

অনুকরণ (Imitation)

যখন ছোট ছিলাম তখন একটি গল্প পড়েছিলাম যে একজন পথিক দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করার সময় পথশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে একটি নারিকেলকুঞ্জে প্রবেশ করলেন। গাছে প্রচুর নারিকেল ফলে আছে কিন্তু তিনি গাছে চড়তে জানেন না, তাই পিপাসা নিবারণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি দেখলেন একদল বানর একটি নারিকেল গাছের মাথায় বসে আছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর দেখাদেখি বানরেরা গাছ থেকে নারিকেল ছুঁড়ে নীচে ফেলতে লাগলো। পথিক তখন তাঁর ইচ্ছামত নারিকেল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্ত হলেন। লেখক নিশ্চয় বানরের অনুকরণ-প্রিয়তা আর নরের বুদ্ধির কথাই এ গল্পের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু বানরই অনুকরণপ্রিয় নয়। নরও যথেষ্ট অনুকরণ-পটু। সম্ভবত, মানবশিশু তার শিক্ষার অধিকাংশই আয়ত্ত করে অনুকরণের দ্বারা। হাসি, কান্না, খেলা, কথা বলা, খেতে শেখা এ সবই অনুকরণের ফল। এ অনুকরণ অনেক সময়ই হয় অচেতনভাবে। কিন্তু মানুষ বড় হয়েও অনুকরণ করে,—তা করে স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে।

অনুকরণ কাকে বলে? অনুকরণ মানে, দেখে শেখা। একজনকে কোন একটা কাজ করতে দেখে সে রকম কাজ করবার চেষ্টা। ড্রেভার সংজ্ঞা দিচ্ছেন "একটা কাজ অন্যকে করতে দেখে, করা ; একাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং একাজ শুরু হয় অন্য কাউকে কাজটি করতে দেখে।"[১]

শিক্ষায় অনুকরণের কি স্থান এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্যারেট অনুকরণের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে যখন কোন ব্যক্তি বা পশু অপর কোন ব্যক্তি বা পশুকে কোন কাজ করতে দেখে, এবং অনুরূপ একটি কাজ করার চেষ্টা করে, তখনই তাকে অনুকরণ বলা চলে। অনুকরণের কয়েকটি

১ James Drever—A Dictionary of Psychology, p. 128

বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ যে কাজটিকে অনুকরণ করা হবে, তা ব্যক্তির সম্পূর্ণ অপরিচিত হবে, এবং ক্রিয়াটি তার অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ হবে না; দ্বিতীয়তঃ কাজটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি তার অনুরূপ কাজ করবে। ক্রিয়াতে কোন প্রকার ভ্রম ও ভ্রমসংশোধনের স্থান থাকবে না; তৃতীয়তঃ অনুকৃত কাজটি ও যার অনুকরণ করা হোল, এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকবে, যাতে একটিকে অপরের অনুকরণ বলে বোঝা যায়।

কাজেই অনুকরণ একটা সামাজিক ক্রিয়া—দশজনের প্রভাবে ব্যক্তি যে প্রভাবান্বিত হচ্ছে—তারই প্রমাণ। এর থেকেই তো ফ্যাশান সৃষ্টি হয়। ওর ক্লাসের অনেক ছেলে হাওয়াই সার্ট পরে, তাই অশোকও পরে হাওয়াই সার্ট। অনুকরণটা অন্যের চোখে সামাজিক ক্রিয়া, কিন্তু যে অনুকরণ করে সে সব সময় এটাকে সে দৃষ্টিতে দেখে না। সে ভাবে এটা তার নিজস্ব কর্ম। শিশুর কাছে এটার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, সে হচ্ছে, সে কর্মে তার নিজের আগ্রহ ও আনন্দ। শিশুর দিক থেকে এই অনুকরণ ক্রিয়া তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। সে অনুকরণ করে, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে অনুরূপ ভাবে সম্প্রসারণ করবে এই ইচ্ছায়।[২]

একটি শিশু ক্ষুধার্ত, তার খাবার সময়ও হয়েছে—তখন সে দেখলে অন্যেরা খাচ্ছে এবং সেও খেতে শুরু করে দিলে। এটা কি অনুকরণ বলব? এটা ঠিক অনুকরণ নয়। কারণ এখানে তার খাওয়ার মূল তাগিদটা এসেছে তার নিজের ভেতর থেকেই—ক্ষুধা-বোধ তার জেগেছে, সে জানে খাওয়া কাকে বলে, সে জানে, কি করে খেতে হয়। যদি সে অন্য শিশুদের এখানে খেতে নাও দেখতো, তবু সে সম্ভবত তখন খেতে বসতো। অন্যকে খেতে দেখে তার খাওয়াটা ত্বরান্বিত হয়েছে—এই পর্যন্ত। এটাকে ইঙ্গিত (suggestion) বলতে পারি। অন্যের খাওয়াটা তার নিজের খাওয়ার ইঙ্গিত করেছে মাত্র। কিন্তু যদি সে খেতে বসে লক্ষ্য করে থাকে, মাসীমা কেমন সুন্দর আলতোভাবে খাচ্চে,—আর তা দেখে তার সখ হয়, তেমনি পরিচ্ছন্নভাবে খেতে, তা হ'লে সেটা হবে বাস্তবিক অনুকরণ। আরো বেশী অনুকরণ হবে, যদি সে এমন একটা কাজ করতে চেষ্টা করতো, অন্যের কাজ দেখে, যেটা সে আগে করেনি। যেমন অশোক লেকে দেখলো শিক্ষিত সাঁতারুরা কেমন

[২] Sandiford—The Mental and Physical Life of School Children, p, 211.

করে জলে ঝাঁপ (dive) দেয়। সে আগে কোনদিন ডাইভ্ দেয়নি—সে তা শিখতে চেষ্টা করলো। এটা অনুকরণ।

অনুকরণের মূল তা হ'লে সহজাত সংস্কারে। তাই পশুদের মধ্যেও অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ছোট মুরগীর ছানা মার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে ঘোরে, মাটি থেকে খাদ্য খুঁটে খায়, মার দেখাদেখি। প্রবৃত্তিটা এবং প্রবৃত্তির প্রকাশের দৈহিক ব্যবস্থাটা জন্মগত—তবে বারে বারে অনুকরণের দ্বারা ক্রিয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেটা সুসম্পন্ন হয়। পশুদের সমাজ-জীবন বহুলাংশে অনুকরণ-সাপেক্ষ। পশুর অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous), বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত নয়। মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব, যার মধ্যে আমরা সচেতনভাবে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ অনুকরণের ব্যবহার দেখতে পাই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত পরম উপভোগ্য শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ 'চিত্রগ্রীব' (Gay-neck) একটি পোষা পারাবতের কাহিনী। তাতে চিত্রগ্রীব কি করে তার মাকে দেখে দেখে ক্রমে ক্রমে উড়তে শিখলো, বাজপাখীর ছোঁ থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখলো তার সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ এই পাখীর বিবরণটিতে মানুষের মনের প্রতিফলন (anthropomorphism) দেখা যায়। থর্ণডাইক্ ও স্মল্ পশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রাণীরা তাদের অন্য সঙ্গীদের কোন নূতন কাজ, যেমন খাঁচার দরজা খোলা ইত্যাদি করতে দেখে শেখে না। যেসব প্রাণী এ রকম দেখবার সুযোগ পায়নি, তাদের চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি সে কাজ করতে শেখে না।"[৩] থর্ণডাইক্ দেখেছিলেন যে একটা বেড়ালকে যতবারই অন্য বেড়াল দিয়ে খাঁচা খোলা কায়দাটা দেখান হোক না কেন, সে কিছুতেই শুধুমাত্র দেখে বা অনুকরণ করে শিখতে পারে না। একটা বানরকে একবার একাদিক্রমে পনের বার একটি খাবারের বাক্স খোলা দেখান হয়েছিল, কিন্তু তবু সে খুলতে শেখেনি। তিনি এর থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে অনুকরণের সাহায্যে পশুরা শেখে না, তারা শুধু hit or miss বা trial & error পদ্ধতির সাহায্যেই শেখে।[৪] কাজেই পশুরা অনুকরণের

---

৩ Thorndike. Animal Intelligence. p. 23.

৪ Nothing in my experience with these animals, then favours the hypothesis that they have any general ability to learn to do things from seeing others do them. Ibid. p. 24

যারা নূতন কিছু শিখতে পারে না ; যে প্রবৃত্তিটা তাদের সহজাত, যেটা ক্রিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার তাগিদ তার ভেতরেই আছে, অনুকরণ তাকে ত্বরান্বিত করতে পারে, হয়তো ক্রিয়ার ধরণটা কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু মানুষের বেলায় অনুকরণ নূতন কর্মের পথ দেখাতে পারে এবং তা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যীকরণের কাজে সাহায্য করে। "অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে অনুকরণ পর্বে যে ক্ষমতা সুপ্ত ছিল তাকে বিকশিত করে এমন ভাবে, যাতে তার জগতে টিকে থাকার সহায়তা হয় ; কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে অনুকরণ অসংখ্য বিভিন্ন ধরণের নূতন ক্রিয়া অথবা বিভিন্ন ধরণের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যীকরণের সহায়ক হয়।"[৫]

অনুকরণের স্তরভেদ ও এর বিভিন্ন রূপ—Development of Imitation and its different forms—অনুকরণ অচেতন বা সচেতন দুই-ই হ'তে পারে এবং মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণের রূপও পরিবর্তিত হয়। এই বিকাশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর কার্কপ্যাট্রিক লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এই স্তরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

১। **যান্ত্রিক অনুকরণ (Reflex Imitation)**—শিশু অন্য শিশুকে হাসতে দেখলে হাসে, কাঁদতে দেখলে কাঁদে, পাখীর ঝাঁকের একটি উড়তে সুরু করলে সবশুদ্ধ উড়ে চলে,—এতে কোন তাৎপর্য্যবোধ বা বিশ্লেষণ নেই, মনন বা বিচার তো নেই-ই। শিশু এক বছর পর্যন্ত এ ধরণের অনুকরণই করে থাকে। নিম্নস্তরের পশুরা এ স্তরের বেশী উপরে উঠতে পারে না। পরিণত বয়সেও আমরা এ শ্রেণীর অনুকরণ দেখি। শিক্ষক বেশ প্রসন্ন মনে হাসিমুখে ক্লাসে এলে ছাত্রদের মুখেও হাসি ফুটে। আবার কেউ চটে কথা বললে, আমরা চটেই তার জবাব দিই।

২। **স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুকরণ (Spontaneous Imitation)**—শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই তার চার পাশের সব জিনিষ অনুকরণ করে। এতে সচেতন বিশ্লেষণ নেই—ঠিক যেমনটি দেখেছে, যেমনটি শুনেছে, তেমনি তেমনি সবটাই সে করছে। "মোরগের ডাক থেকে সুরু করে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসিল্, সাপের এঁকে বেঁকে চলা থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণের ভঙ্গী সব কিছুই শিশু অনুকরণ

৫ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study ; pp. 130-131.

করে।"[৬] এ অনুকরণ কিন্তু আকস্মিক নয়, এখানে মনোনিবেশ আছে। যা মনকে আকর্ষণ করে না, তা এ স্তরে শিশু অনুকরণ করে না। কাজেই শিশুর মানসিক বিকাশ অনুযায়ী তার অনুকরণের বস্তু বিভিন্ন। খুব ছোট যারা, তারা পশু বা অন্য শিশুদের অনুকরণ করে, আর যে সব শিশুরা একটু বড় হয়েছে তারা অনুকরণ করে বয়স্কদের চালচলন ভঙ্গী। পাঁচ বছর পর্যন্ত এ ধরণের অনুকরণের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ দেখা যায়। "সাধারণতঃ যে উদ্দীপক অনুকরণের কারণ, তা কোন প্রত্যক্ষ বস্তু।……ছোট শিশুর ভৌগোলিক বা সামাজিক পরিবেশে যা সব ঘটে, তার কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এ সমস্তই অনুকরণের দ্বারা সে আপনার করে নেয়, এবং তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে……স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ ক্রমশঃ অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমেই অধিকতর জটিল ক্রিয়াতে পরিণত হয়। এবং তা ছাড়া এ অনুকরণ শুধু প্রত্যক্ষ বস্তুকে অনুসরণ করে না, প্রতিরূপের (images) প্রতিক্রিয়া হিসাবেও আসে।"[৭]

৩। **নাটকীয় বা গঠনাত্মক অনুকরণ (Dramatic or Constructive Imitation)**—শিশু আর একটু বড় হ'লে অতীত অনুকরণের বস্তু বা ঘটনাকে কল্পনায় নানা নূতনভাবে সাজিয়ে তা অনুকরণ করে। এ স্তরে 'মনে করো যেন'র (make-believe) প্রভাব খুব বেশী। মীনু তার পুতুলকে বিছানায় শুইয়ে কাঁথা ঢাকা দেয়, বাতাস করে, মুখ কালো করে বলে, "খুকুর আমার বড্ড জ্বর এসেচে খুব মাথা ধরেছে, আজ আর খুকুকে রাত্তিরে ভাত দেব না। আবার খুব চিন্তিত হয়ে বলে, "ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দিতে হবে, আমার কি ছাই এতটুকু শান্তি আছে!" বলাই বাহুল্য, তার নিজ সংসার বা প্রতিবেশীর পরিবার থেকে সে তার কল্পনা দ্বারা অনুকরণের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুত বিভূতি মুখোপাধ্যায় বহু গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি এঁকেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের মত এ অনুকরণ আক্ষরিক নয়; এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নূতন ও অশ্রুতপূর্ব নানা আকারের ভেঙেচুরে গড়ে।[৮] সাধারণতঃ তিন বছরের পর

৬ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 131.
৭ Kirpatrik—Fundamentals of Child Study, p. 136.
৮ Sandiford—Mental and Physical Life of School Children, p. 212

এ জাতীয় অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপূর্ণ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও লোপ পায় না। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় 'কচি' সাজতে সাধ দেখা যায়।

এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (imaginary companions) সৃষ্টি করে। তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা তর্ক কলহও চলে। অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙ্গীর কথাবার্তায় ফুটিয়ে তোলে।

৪। **সচেষ্ট অনুকরণ (Voluntary Imitation)**—এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, সচেষ্ট অনুকরণ। এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অনুকরণ করা হয়। এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অনুকরণের উপরেই বিদ্যালয়ে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে আঁকলে, শিক্ষকের প্রশংসা অর্জন করা যায়, তাই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের আঁকবার পদ্ধতিটি অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাক্যরচনা করতে এইভাবেই শিশুরা শেখে। সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমতা **কতকটা** অগ্রসর হয়েছে। ভ্যালেন্টাইন্ একে বলেছেন deliberate or purposive imitation।

৫। **ভাবচালিত সচেষ্ট অনুকরণ (Idealistic Imitation)**—এটি অনুকরণের সর্ব্বোচ্চ স্তর। একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে শিশু সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট্ (Stout) বলেছেন চিন্তা ও বিচারজাত অনুকরণ (deliberative imitation)। এ স্তরে বিশ্লেষণ, সমন্বয়, বস্তুবিবর্জিত মনন ইত্যাদি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে বিচার আছে গ্রহণ বর্জন আছে। ইহা ধারণা (concept) বাহিত এবং বিচার বিবেচনা-নির্ভর। যেমন ক্রিকেট বা অন্যান্য খেলার ধরণ (style) বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিচার-সাপেক্ষ এবং পরবর্তী অনুকরণের সময় যে পদ্ধতিটি নির্ভুল বা আদর্শ বিবেচিত হয় তাই অনুসৃত হয়ে থাকে। বয়স্ক মানুষের জীবনে এ ধরণের অনুকরণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের উপযোগিতা—Educational use of Imitation—শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ একটি মূল্যবান উপাদান। শিশু

অনুকরণ-প্রিয় তাই শিক্ষার কাজটা সহজ হয়। অনুকরণ সহজাত সাধারণ প্রবৃত্তি—তাই অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তির মত একেও কাজে লাগানো যেতে পারে। সুশিক্ষক এ কথা জানেন, কাজেই শিশুর সামনে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অনেক সময়, আমরা বড়রা, এ কথাটা ভুলে যাই যে শিশু অত্যন্ত কৌতূহলী ও অনুকরণ-পটু। তাদের চলা ফেরা, হাব ভাব এমন কি চিন্তাও বহুল পরিমাণে আমাদের বড়দের আচরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত। এটা অনেক সময় দেখেছি—মায়েরা তাঁদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অত্যন্ত অশোভন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—বা অভিভাবকরা তাদের সামনে অসংযত আচরণ করছেন। তাঁরা নিজেদের চোখ ঠারেন "ওরা কিছু বোঝে না।" ওরা স্পষ্ট বুঝতে না পারে, কিন্তু ওরা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে, অনুকরণ করে, অভ্যাস করে, এবং কু-অভ্যাস আয়ত্ত করে। ঠাকুরদাদা আদর করে নাতিকে তামাক খাওয়ার অনুকরণ করতে উৎসাহিত করছেন, পিতা পুত্রীকে আদর করে, "সারে জাঁহা" গান অনুকরণ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এ রকম উদাহরণ আমাদের দেশে বিরল নয়। এ যে কত বড় নির্বুদ্ধিতা তা না আলোচনা করলেও চলে। শিশুর চারপাশের পরিবেশটি যদি পরিচ্ছন্ন হয় তবে সেখানে শিশু সহজেই সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে। যেখানে শিশুর চারপাশে রয়েছে কদর্যতা, কলহ, মিথ্যাচার, নীচতা ও নৃশংসতা সেখানে কচি শিশুর মনটি বিকৃত হবেই। তাই শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর সামনে অনুকরণযোগ্য সুন্দর দ্রব্য, সুন্দর ঘটনা ধরে দিতে হবে। প্রথম কয়টি বছরে শিশু যা অনুকরণ করতে শেখে তা দিয়ে বহুলাংশে তার পরবর্তী চরিত্র গঠিত হয়। প্রথম কয়টি বছরের ভুল, পরে বহু চেষ্টায়ও সংশোধন করা সম্ভব হয় না। তৎক্ষণাৎ অনুকরণ (Reflex) বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ (Spontaneous imitation)—খুব অল্পই পরিচালনা করা যায়। এ স্তরে এটাই দেখা দরকার, ভুল অসুন্দর ও অন্যায় দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে যেন বেশী না আসে। নাটকীয় অনুকরণের স্তরেও শিশুকে বেশী বাধা দেওয়া ঠিক নয়, তবে দেখতে হবে যেন সে কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখাটা একেবারে ভুলে না যায়। ফ্রোয়েবেল শিশুর মনের এ স্তরটির গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাঁর অনুগামীরা শিশুর জীবনে কল্পনা-রঞ্জিত অনুকরণের প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহ করবার পক্ষপাতী।

বর্তমানে অনেক শিশুমনোবিজ্ঞানী কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে মূল্যবান শিক্ষার সহায় ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অনুকূল এমন মত প্রকাশ করেছেন। অনুকরণের প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী, এই মতকে পার্সি নান্ বিশেষ ভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাজের মধ্যেও তাঁদের সমসাময়িক চিন্তাধারার যথেষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকেই আমরা সম্পূর্ণ নূতন পথের দিশারী আখ্যা দিতে পারি না।* কিন্তু শিশু কি শুধুই অনুকরণ করবে—অন্ধভাবে শুধুই অনুসরণ করবে? তা হ'লে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে কি করে?

শিশুর জীবনের প্রথম স্তরে অনুকরণ ছাড়া শেখাবার কোন পথ নেই। গোড়াপত্তন হবে দাগা বুলিয়েই, তার পরে আসবে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব (Individuality) বিকাশের প্রশ্ন। শিশু শিক্ষার গতিকে অন্ধ অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে সচেতন উদ্দেশ্যমুখী বা আদর্শমুখী করতে হবে—এটাই হবে শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেশ্য। যা ছিল অচেতন অভ্যাস, তাকে পরিণত করতে হবে—সচেষ্ট আদর্শ অনুসরণের উৎসাহে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবন—(Suggestion) শিশু সচেতন ও অচেতন অনুকরণ দ্বারা অপরের কাছ থেকে শেখে। শিক্ষক, পিতামাতা, বা অন্যান্য গুরুজন যাদের শিশু ভালবাসে বা বিশ্বাস করে, তাদের কাছ থেকে অনেক সহজে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে। এই যে বিনা বিচারে প্রিয় ব্যক্তির বাক্য, ইঙ্গিত বা আচরণ থেকে শিশু শিক্ষাগ্রহণ করে, এর পশ্চাতে যে বাধ্যতার মনোভাব থাকে তাকে অভিভাবন (suggestion) বলা হয়।[১০] অভিভাবনের বলে ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে তা স্বেচ্ছাকৃত (willed) নয়, বাহির থেকে নির্দেশিত।[১১]

---

* The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of self assertion. In his earlier works we cannot distinguish the voice of Shakespeare from the voices of his contemporaries. Imitation, at first biological, then reflective, is, in fact, but the first stage in the creation of individuality, and the richer the scope for imitation the richer the developed individuality will be.

Nunn, T. P.—Education, its data and Principles, Ch, on Mimesis

১০ Griffith. An Introduction to Applied Psychology. p. 348

১১ একটি ছোট ছেলে বাল্যকালে বড় নিষ্ঠুর ছিল। সে কুকুর বেড়াল ইত্যাদি প্রাণী দেখলেই তাদের তাড়া করত ও লাঠি দিয়ে আঘাত করত। তার সাত বৎসর বয়সের সময় সে একটি বেড়াল

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবনের অনেকখানি স্থান আছে। প্রত্যক্ষ আদেশ দিয়ে যে কাজ হয় না, ইঙ্গিতে অভিভাবনে সে কাজ অনেক সহজে আদায় করা যায়। পিতামাতা, শিক্ষকের উপর শিশুর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা অপরিসীম। এবং তাঁদের খুসী করবার জন্যে শিশু অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত। যাকে শিশু ভালবাসে তিনি কোন ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেই (কোন আদেশের প্রয়োজন নেই) শিশু নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা দ্বারা তা পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। ইস্কুলের যে 'দিদিমণি'কে শর্মিষ্ঠা ভালবাসে তাঁর অসুখ করলে, তাঁর জন্যে বাড়ী থেকে আচার চুরি করে সে এনে দেয়। শিক্ষক ও পিতামাতার একটু সস্নেহ উৎসাহ বাক্যে শিশু উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সুপ্ত শক্তি বা নিপুণতা প্রকাশের জন্যে ব্যগ্র হয়। সুশিক্ষক তাই শিশুকে আত্মউন্মোচনে আগ্রহী করে তুলবার জন্যে প্রত্যক্ষ আদেশের চেয়ে অভিভাবনের উপর বেশী নির্ভর করেন।

মোহগ্রস্ত অবস্থায় (in a hypnotic trance) ব্যক্তি চিকিৎসকের ইঙ্গিত অনুযায়ী অনেক কাজ ঠিক ঠিক (ইঙ্গিত অনুযায়ী) করে, যদিও মোহাবস্থা ছিন্ন হলে রোগী সে কথা কিছুই স্মরণ করতে পারে না। এই অভিভাবন সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি মানসিক রোগের চিকিৎকেরা অনেক সময় প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করেন। এর সাহায্যে কখনো কখনো রোগীর নিরুদ্ধ কামনা বা স্মৃতি মুক্তি পায় এবং রোগী তাতে আরাম হয়।[১২]

সম্প্রতি কদভ্যাস দূর করবার ব্যাপারে অভিভাবনের সফল ব্যবহার বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শিশুদের একটি বোর্ডিংয়ে অনেকগুলি ছেলেই দাঁত দিয়ে নখ কামড়ায় (nail biting) দেখা গেল।

ছানাকে এমন বেদম প্রহার করেছিল যে তার পিঠ ভেঙে যায় এবং সেটা মরে যায়। ছেলেটি বড় হ'লে হঠাৎ তার মানসিক বিকার দেখা দেয়। তার মেরুদণ্ডে অসহ্য ব্যথা হয় এবং বেড়াল দেখলেই সে ভয়ে কাঁপতে থাকত। চিকিৎসক তাঁর বাল্যকালে বেড়াল ছানার প্রতি নিষ্ঠুরতার কাহিনীটি জানতে পারেন। তিনি রোগীটিকে সংবেশিত করে (hypnotised) বললেন, "তুমি পাঁচ মিনিট বাদে পাশের ঘরে পশ্চিমের দেওয়ালে যে সেল্‌ফ আছে, তার দ্বিতীয় তাকের কৌটো থেকে চাবি নিয়ে বসবার ঘরের আলমারীর সকলের উপরের তাকে যে বেড়াল ছানা (পুতুল) আছে, তা বের করে, আলমারী বন্ধ করে চাবি আগের জায়গায় রেখে আসবে। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বেড়াল ছানাকে পিঠের ব্যাথার জায়গার ওপর রেখে ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। তারপর তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে উঠে দেখবে তোমার ব্যথা সেরে গেছে। বাস্তবিক পক্ষে রোগীটি আবিষ্ট অবস্থায় চিকিৎসক ঠিক যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমন তেমন ব বহারই করেছিল এবং বাস্তবিকই এর পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

১২ Eysenck, Uses and abuses of Psychology. pp. 215-216

শাস্তি দিয়ে, তিরস্কার করে, বা উপদেশ দিয়ে এই অভ্যাস দূর করা গেল না। শিক্ষকেরা এবার একটি পরীক্ষায় রত হলেন। তাঁরা এই নখ কামড়ানো ছেলেদের কোন রকম বাছাই না করে ছুটো সমান দলে ভাগ করে এদের ছুটি পৃথক ঘরে শোবার ব্যবস্থা করলেন। এক দলকে কোন শাস্তি বা উপদেশ কিছু দেওয়া হ'ল না, কোন চিকিৎসাও কিছু করা হোল না। আর একটি ঘরে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে, খুব ধীরে ধীরে, অনুচ্চ স্বরে এই রেকর্ডটি দশ মিনিট ধরে বাজানো হত "দাঁতে নখ কামড়ানো অতি বিশ্রী অভ্যাস। কাল থেকে আমি আর দাঁত দিয়ে নখ কামড়াবো না। আর কখনো আমি এ অভ্যাসের দাস হব না।" একমাস রোজ সেই ঘরের ছেলেদের ঘুমের মধ্যে এই রেকর্ডটি বাজিয়ে শোনানো হয়। আশ্চর্যের কথা একমাস পরে সেই ঘরের ছেলেরা অনেকেই এই অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছে দেখা গেল।[১৩]

ইতিহাসের তারিখ বিজ্ঞানের ফর্মুলা, দেহের অস্থিগুলির নাম ও সংস্থান অর্থাৎ যে সমস্ত জ্ঞান পুনঃ পুনঃ পাঠ দ্বারা বিশেষ ভাবে মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে সেগুলি ঘুমের মধ্যে রেকর্ডে বাজিয়ে শোনালে অভিভাবনের সুফল পাওয়া যায় আমেরিকার অনেকগুলি পরীক্ষার ফলে এমন দাবী করা হচ্ছে। এ সব দাবীর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও এ দাবী সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়।

---

১৩ Page Abnormal Psychology

সপ্তদশ অধ্যায়

বুদ্ধির প্রকৃতি ও বুদ্ধির কাজ

বুদ্ধি কি? 'বুদ্ধি' কথাটা সর্বদাই আমরা ব্যবহার কচ্ছি, কিন্তু 'বুদ্ধি কি?' 'বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি?' এ প্রশ্নের জবাব একেবারেই সহজ নয়। মনোবিদ্‌রা নানা দিক থেকেই প্রশ্নটি আলোচনা করে' এ কথা মানছেন যে, বুদ্ধি কি কাজ করে (function) সেটা অনেকটা নির্ভুল ভাবে বলা যায় কিন্তু বুদ্ধি কি জাতীয় শক্তি সেটা বলা শক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক মনোবিদেরা বুদ্ধিকে একটা বস্তু বা শক্তি হিসাবে না দেখে ক্রিয়া বা ব্যবহারের একটা গুণগত উৎকর্ষের সূচক হিসাবেই দেখছেন।[১] এটা সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে যে মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যে ছেলে চট্‌পট্‌ পড়া তৈরী করে নিতে পারে তার বুদ্ধি আছে; যে বৌটি অল্প খরচেও সংসার গুছিয়ে চালাতে পারে তার বুদ্ধি আছে; যে যুবক তার মোটরের কলকব্জা বিকল হ'লে বিকল্প উপাদান দিয়ে তা তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিতে পারে, তারও বুদ্ধি আছে; আবার যে মেয়ে রং তুলি দিয়ে নিজে নিজেই বেশ ছবি আঁকতে পারে তারও বুদ্ধি আছে।

বুদ্ধি কি কাজ করে? ক্যাটেল্ এই সুন্দর কথাটি বলেছিলেন যে বুদ্ধি যে কাজ করে, তা দিয়েই বুদ্ধির পরিচয়—Intelligence is what intelligence does. বুদ্ধি কি কাজ করে, এ নিয়ে পণ্ডিতেরা নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন, এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের ফলে তাঁদের বুদ্ধির সংজ্ঞাও পৃথক ও বিভিন্ন হয়েচে।

বুদ্ধি আমাদের কি কি কাজে লাগে তাই কিছু আলোচনা করা যাক।

---

১ The modern view of intelligence is not to view it as a thing, a force which men have, but a certain level of functional excellence, which they display when they are actually put put into a wide variety of stimulus situations. It is easy to see that small children do not adjust themselves to their environment quite as competently as adults do. And this difference may be described as a difference in intelligence. Griffith. An Introduction to Applied Psychology. p. 388.

(ক) বুদ্ধি থাকলে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি। মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধি পোকার চেয়ে বেশী, কারণ আগুনে হাত দিয়ে বুদ্ধিমান শিশু শিখেছে যে আগুন হাত পোড়ায়। পোকার পাখা পুড়লেও সে আবার আগুনে ঝাঁপ দেয় কারণ সে নির্বোধ। তাই খুব সাধারণ ভাবেই বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়া হয়, the ability to profit by experience. অথবা একথাটা কিছু অন্য ভাবে ক্যাটেল্ বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে নূতন নৈপুণ্য লাভের স্বাভাবিক ক্ষমতা। বুদ্ধি আছে বলেই আমরা শিখতে পারি এবং বুদ্ধির সুন্দর চমকপ্রদ সংজ্ঞা তিনি দিলেন, the capacity to acquire capacity.

(খ) বুদ্ধি থাকলেই আমরা নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারি। অনেক নিম্নস্তরের প্রাণী আছে, যাদের ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক ও অন্ধ অর্থাৎ তারা সব অবস্থাতে একই ভাবে ক্রিয়া করে। অবস্থার পরিবর্তন হ'লেও সে অনুযায়ী তাদের প্রতিক্রিয়ার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন সাধন তারা করতে পারে না। এ সব প্রাণীকে তাই বুদ্ধিমান্ বলতে পারি না। কিন্তু অনেক মানব শিশুই এটুকু বোঝে যে বাড়ীতে মায়ের কাছে যে আবদার খাটে, স্কুলে 'আন্টি'র কাছে সে আবদার খাটবে না। শীতকালে আমরা লেপ গায়ে দি, কিন্তু গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে ফ্যান্ খুলে ঘুমুই। এতে আছে বুদ্ধির পরিচয়। তাই সিরিল্ বার্ট বলেছেন বুদ্ধি হচ্ছে নূতন অবস্থা বা নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দেহ মনের নূতন করে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা—the power of readjustment to relatively novel situations by organising new psycho-physical combinations.

(গ) বুদ্ধি থাকলে আমরা বর্তমানের সমস্যার যেমন সন্তোষজনক সমাধান করতে পারি, তেমনি ভবিষ্যৎ সমস্যা কি করে সমাধান করতে হবে সে ধারণাও করতে পারি। যে এটা যত বেশী পারে, তার বুদ্ধিও তত বেশী। তাই গডার্ড বুদ্ধির সংজ্ঞা দিলেন—the degree of availabality of one's experiences for the solution of immediate problems and the anticipation of future ones.

(ঘ) উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সমন্বয় করতে গেলেই বুদ্ধি চাই। আমাদের বুদ্ধি আছে বলেই, বাগান করবার জন্যে নি কোদাল, নিড়েন, জলের ঝাড় আর লেখাপড়া করার সময় নি, খাতা, কলম, বই, ম্যাপ ইত্যাদি। যে

অবস্থানুযায়ী যত বেশী এই সামঞ্জস্যসাধনে সমর্থ, সে তত বুদ্ধিমান্। আর এর বিপরীত হলেই মানুষটিকে বলি বোকা। কাজেই বুদ্ধির এটি অতি সাধারণ একটি সংজ্ঞা—the ability to correlate means and end.

(ঙ) উপরে বুদ্ধির যে ক্রিয়াগুলির কথা বলা হোল সেগুলি বাস্তব বাহ্য সমস্যা সমাধানের কাজে লাগে। কিন্তু বুদ্ধি তো সাংসারিক সমস্যা সমাধানের কাজেই শুধু লাগে না। আমাদের চিন্তাজগতের সমস্যা সমাধানে এর কাজ আরো অনেক বেশী। এই কাজের জন্যে চাই আপাতবিচ্ছিন্নের মধ্যে যোগ-সূত্র আবিষ্কারের ক্ষমতা, বহু বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য সাধনের ক্ষমতা, সূক্ষ্ম-প্রভেদ লক্ষ্য করার ক্ষমতা, তুলনা করার ক্ষমতা, শ্রেণী করণের ক্ষমতা, যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। বুদ্ধির এই লক্ষণগুলিকে স্পীয়ারম্যান্ বলেছেন সাধারণ বুদ্ধি।

(চ) বুদ্ধি দ্রুত অর্থগ্রহণ, দীর্ঘকাল এবং সফলভাবে স্মরণ রাখতে এবং তাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

(ছ) শব্দের ব্যবহারে কুশলতা বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

(জ) বিভিন্ন বিষয়ে বা বিভিন্ন কাজে বা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করতে হলেও বুদ্ধি চাই।

(ঝ) বস্তু থেকে নির্বস্তুক বিষয়ে, বিশেষ থেকে সামান্যে চিন্তায় যে যত সক্ষম, সে তত উচ্চশক্তি বুদ্ধির অধিকারী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। টারম্যান্ তাই বলেছেন—an individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking.

বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র মননক্রিয়া যথা প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, মনোযোগ, তাৎপর্যবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান, নৈতিকধারণা এ সমস্তেরই সহায়ক উপাদান হচ্ছে বুদ্ধি। সকল যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও ক্ষমতা, এবং মননশীলতা, পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ, সমগ্রতাবোধ, এমন কি সুসংযত প্রক্ষোভ, সু-পরিচালিত উদ্যম অধ্যবসায়, একাগ্রতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন এবং এর প্রত্যেকটি বিষয়েই বুদ্ধি একটি অপরিহার্য মৌলিক উপাদান। তাই বিনের সংজ্ঞা সত্য যে, Intelligence is the completeness of understanding, inventiveness, persistance in a given task, critical judgment.

বুদ্ধি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানেরই অস্ত্রমাত্র নয়। ব্যক্তির ব্যবহার যাতে

সমাজসঙ্গত হয় তার বিচার এবং তার নিয়ন্ত্রণের জন্যও বুদ্ধি বিশেষভাবে সহায়ক। থার্সটোন্ বুদ্ধির এই সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বুদ্ধি হোল সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের অনুগামী করে ব্যবহারের সামর্থ্য—the capacity for making the instincts socially advantageous.

বুদ্ধি যে নানাপ্রকার কাজ করে তা লক্ষ্য করে, গেটস্ বুদ্ধির একটি চূড়ান্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন:—বুদ্ধি হচ্ছে মৌলিক কতগুলি শক্তি বা সামর্থ্যের সমবায় বা সমন্বয়; এ সামর্থ্যগুলি হচ্ছে শিক্ষালাভের ক্ষমতা, প্রধান ও সূক্ষ্ম তথ্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা। বিশেষ করে এ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় নির্বস্তুক বিষয়ের তাৎপর্য গ্রহণে। বুদ্ধি যার আছে সে তৎপরতার সঙ্গে ও নির্ভুল-ভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে; সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ও তার সমাধানের উপযোগী মানসিক শক্তির সুসংযমের ক্ষমতা এবং নূতন অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতা সংশোধন বা পরিবর্তন করে ব্যবহার করবার নমনীয়তা তার থাকে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে বিনের মত তিনিও বুদ্ধিকে বহু শক্তি বা সামর্থ্যের সমবায় বা সংমিশ্রণ বলেই গ্রহণ করেছেন।

পূর্বের আলোচনায় মানসিক দিক থেকে (subjectively) বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়া হল। মস্তিষ্ক বা মগজকে (central nervous system) আমরা বুদ্ধির ইন্দ্রিয় বলতে পারি এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, বুদ্ধি মগজের ব্যাপার—a function of the central nervous system. যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্নায়ুগুলির সংযোগ সুসংযত ও বহুক্ষণস্থায়ী সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তার বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কিন্তু যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্নায়বিক সংযোগগুলি সহজে হয় না, হলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, অথবা সংযোগ শিগ্‌গিরই নষ্ট হয়ে যায়, সে নিশ্চয়ই নির্বোধ ও ক্ষীণবুদ্ধি।

বুদ্ধিকে নানা মননক্রিয়ার সঙ্গেই যুক্ত করে দেখার দিকে প্রাচীনদের ঝোঁক আছে কিন্তু আধুনিক কোন কোন মনোবিদ যন্ত্রচালনা এবং সূক্ষ্ম পেশী ক্রিয়ার পারদর্শিতাকে বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ মনে করেন। লেখাপড়ায় ভাল হলেই শুধু বুদ্ধি প্রমাণিত হয় তা নয়। যন্ত্র ব্যবহারে অথবা দেহের ইন্দ্রিয় বা পেশীর সফল ব্যবহারে যে শ্রমিক সমর্থ, সেও অবশ্যই বুদ্ধিমান।

জীবন যুদ্ধে টিঁকে থাকতে বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক। যে সচেতন কাজ যত বেশী জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী, তা তত বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক।

থর্ণডাইক্ বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজে বুদ্ধিকে শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া physiological funtion বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিকে দিয়েও তিনি একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে সংযোগ সৃষ্টির ক্ষমতাই বুদ্ধির পরিচায়ক। সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলেছেন যে কোন সংযোগ-সৃষ্টি অপেক্ষা উদ্দেশ্য-মুখীন বা সমস্যার সমাধানকল্পে সংযোগ স্থাপন উন্নততর বুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি বলছেন," স্থান কাল পাত্র বিশেষে উপযুক্ত কর্তব্যটি খুঁজে নেবার ক্ষমতার নাম বুদ্ধি"—The power of good response।" থর্ণডাইক্, বুদ্ধির একটি প্রধান লক্ষণ-বস্তুবিবর্জিত চিন্তা, টারম্যানের এই কথাটির সঙ্গেও একমত। তিনি নানা পরীক্ষার দ্বারা এ সংজ্ঞাকে আরো বিশদ করে বললেন, কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপের তিনটি প্রধান উপাদান (১) উচ্চতা (altitude)—যে যত কঠিন কাজ করতে পারে তার বুদ্ধি তত উঁচু (২) বিস্তার (breadth)—একই রকম কঠিন কাজ যে যত বেশী পরিমাণ করতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। (৩) দ্রুততা (speed)—একই রকম কঠিন কাজ যে যত দ্রুত করতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। এর মধ্যে প্রথম লক্ষণটিই বুদ্ধির পরিমাপের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়।

কোফ্কা (Koffka) ইত্যাদি গেষ্টল্ট মতবাদীরা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমন্বয়ের শক্তিকেই বুদ্ধির লক্ষণ বলেছেন।

স্পীয়ারম্যানের মতে সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে তিনটি ক্ষমতা যুক্ত হয়ে আছে। (১) নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা—the ability to observe one's own mental processes. (২) প্রত্যক্ষলব্ধ বা চিন্তালব্ধ জ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে গভীর সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা—the ability to discover essenial relations between items of knowledge, either perceived or thought of. (৩) বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ স্থাপন (বিপরীত বা অনুরূপ) করবার ক্ষমতা—the ability to educe correlates.

এই তিনটি ক্ষমতাকে তিনি **জ্ঞান লাভের সূত্র** (**neogenetic laws**) বলে বিবৃত করেছেন। এরা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধির তিনটি প্রধানসূত্র। প্রথমটির কাজ হচ্ছে—অভিজ্ঞতার তাৎপর্যবোধ—apprehension of experience :

দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে সম্বন্ধ নির্ণয়—education of relations ; তৃতীয়টির কাজ হচ্ছে,—কোন ঘটনা, দ্রব্য বা গুণের বিপরীত বা অনুরূপ বলিতে পারা—education of correlates. [২]

বিভিন্ন সংজ্ঞার তুলনামূলক বিচার

আপাত-বিরোধী এই সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটিই বুদ্ধির কোন না কোন বিশেষ লক্ষণের উপর জোর দিয়েছে, যার সত্যতা অনস্বীকার্য, কিন্তু অনেক সংজ্ঞাই অসম্পূর্ণ।

বার্ট, ষ্টার্ণ বা গডার্ডের সংজ্ঞা যে "বুদ্ধি হচ্ছে নূতন অবস্থার সঙ্গে দেহ-মনকে মানিয়ে নেওয়া", এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, যে এই মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা একটা অবিমিশ্র সহজ ক্ষমতা নয়—বরং বলা যায় নূতন কোন সমস্যা সমাধান করতে অনেক রকমের ক্ষমতা দরকার। তা ছাড়া সব রকম সমস্যা সমাধানের জন্যে ঠিক একই রকম বুদ্ধি প্রয়োজন হয় না ; যেমন অঙ্কের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে যে বুদ্ধি, নূতন গানের সুর লিখতে ঠিক সেই বুদ্ধিই কাজ করে না। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি এ সব বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্য দিয়ে কাজ করে তা ঠিক। কাজেই নূতন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও বুদ্ধি, ঠিক এক জিনিষ নয় যদিও নূতন সমস্যা সমাধান করতে গেলেই বুদ্ধির দরকার। টারম্যান্‌এর সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (যা বস্তুবিবর্জিত নয়) তাৎপর্য গ্রহণ করতে গেলেও নিশ্চয়ই বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি সর্বদা বস্তুবিবর্জিত বা abstract হতে হবে এমন নয়। Perceptual level বা বস্তুগত অভিজ্ঞতার মধ্যেও যে বুদ্ধির পরিচয় মেলে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নানাবিধ বুদ্ধির অভীক্ষা যা বস্তুর আকারের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত, যেমন র‍্যাভেনের Progressive Matrices. তবে একটা অবশ্যই ঠিক যে বস্তুবিবর্জিত চিন্তার ক্ষমতা উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যার এ ক্ষমতাটি যত বেশী, তাকে তত বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন বলা চলে।

তাছাড়া চিন্তা যদি উদ্দেশ্যমুখী না হয়, তা হ'লে তাকে বুদ্ধি বলা চলে না। স্পীয়ারম্যান-এর বুদ্ধির বিবরণ অনেক বিশদ এবং পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির থেকে অনেক ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু তাঁর বুদ্ধির প্রথম লক্ষণটি দ্বিতীয় লক্ষণ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য, ঘটনা বা গুণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে

২ Spearman—The Nature of Intelligence. p. 552

গেলে নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। স্পীয়ারম্যান্ নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন "দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষমতা দুইটি, যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা গেছে, তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তাদের সম্বন্ধেই 'বুদ্ধি' নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য।" আবার বলেছেন "প্রথম ক্ষমতাটি স্পষ্টতঃই বুদ্ধির লক্ষণ বলে দাবী করার ক্ষমতা সবচেয়ে কম রাখে"[৩] স্পীয়ারম্যানের বিবরণে আর একটি ত্রুটি রয়ে গেছে, তিনি যে ক্ষমতাগুলির কথা বুদ্ধির লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন তার একটা উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্য থাকা চাই, এ কথাটি তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি।

কাজেই সব কথা বিবেচনা করে রেক্স এবং মার্গারেট নাইটের সঙ্গে আমরা সর্বশেষ নিম্নলিখিত বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে পারি। উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী অন্বয়ীকরণের ক্ষমতাকে বলে বুদ্ধি"—"Intelligence is the capacity for relational constructive thinking, directed towards the attainment of some end."

নীচের তিনটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের সংজ্ঞাটির উপযোগিতা বোঝা যাবে। এই তিনটি উদাহরণই এমন যে, সবাই স্বীকার করবেন যে এরকম কাজে বুদ্ধি দরকার এবং বুদ্ধির মাপ করতে এ রকম উদাহরণই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১। একটি শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, ''সাপ গরু ও চড়ুই পাখী এই তিনের মিল আছে কিসে?" এবং সে উত্তর করে "এদের সবারই প্রাণ আছে,"—তাহ'লে সে বুদ্ধিমান্। এখানে সে সম্বন্ধনির্ণায়ক, গঠনাত্মক ও ও উদ্দেশ্যমূলক চিন্তার পরিচয় দিয়েছে।

২। শিশুকে প্রশ্ন করা হোল, "ঠাণ্ডার উল্টো কি?" সে জবাব দিলে "গরম।" এ ছেলেকেও বলি বুদ্ধিমান্। এ ক্ষেত্রেও সে পূর্ববৎ সম্বন্ধনির্ণায়ক গঠনাত্মক চিন্তার (education of correlates) পরিচয় দিচ্ছে।

৩। শিশুকে প্রশ্ন করা হোল "দুধ সাদা, তাহলে রক্ত কি?" সে বল্ল, লাল।" এ ছেলেও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, এখানেও দেখতে পাচ্ছি সে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং কোন গুণ বা দ্রব্যের অনুরূপ কি, তা বলতে পারে। তার চিন্তা গঠনাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক। আমাদের সংজ্ঞার উপরোক্ত লক্ষণগুলি উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের বেলায় আরো বেশী প্রযোজ্য।

---

৩ Spearman—The Nature of Intelligence. p. 582

বুদ্ধি কি? এই প্রশ্নের নির্বস্তুক জবাব খুবই কঠিন। তবে বুদ্ধির নানা অভীক্ষাগুলি বিশ্লেষণ করে,' কি তারা পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, তার একটা ধারণা করা যেতে পারে। সংশোধিত ষ্টান্‌ফোর্ড বিনে স্কেলে ১২৯ দফা পরীক্ষা আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে পরিচিত দ্রব্য বা ঘটনা মনের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত করা বিষয়ে; কতগুলি হচ্ছে অঙ্কের সম্বন্ধ ও নিয়মের উপর নির্ভর করে বিচার বিবেচনা দ্বারা কিছু বাস্তব সমস্যার সমাধান বিষয়ে; কতগুলি পরীক্ষায় নির্বস্তুক এবং সার্বিক ধারণার ব্যবহার প্রয়োজন, যেমন, দয়া, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি শব্দের সংজ্ঞার্থজ্ঞাপন; আবার বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন, পশম, তুলা এবং চামড়া তাদের মধ্যে মিল কোথায় তা বুঝতে পারার শক্তি, অথবা কতগুলি অনেকটা একপ্রকার দ্রব্য বা অবস্থার মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করার শক্তি, যেমন, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে প্রভেদ; আবার কখনো একটা ছোট কাহিনী, বা বিবরণ ছবির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য মনের মধ্যে গ্রহণ করবার শক্তি। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে বিনের অভীক্ষায় এমন কতগুলি কাজ নির্বাচন করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে মনের জটিল ও নির্বস্তুক শিক্ষা গ্রহণের শক্তির পরিচয় মেলে। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার মানসিক ক্ষমতা, নূতন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোন সমস্যার মূল বুঝতে পারার ক্ষমতা, মনের মধ্যে বিভিন্ন ধারণাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা, চিন্তা ও যুক্তিদ্বারা সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ইত্যাদির মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাজগুলি এমন ভাবেই বাছাই করা করেছে যে ওগুলির মধ্য দিয়ে মনের বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অবিলম্বে অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা, অবস্থা অনুযায়ী উপায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা, নির্ভুল জ্ঞানলাভ এবং লব্ধজ্ঞানকে কাজে লাগবার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে, অর্থাৎ বুদ্ধির পরিচয় মিলবে, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। এ অভীক্ষাগুলি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে বিনে ইত্যাদি মনে করেন এই সমস্ত বিভিন্নমুখী মানসিক ক্ষমতার নামই বুদ্ধি।

গেট্‌স্ জারসিল্ড ইত্যাদি পণ্ডিতেরা বুদ্ধির সংজ্ঞা তাই দিচ্ছেন—বুদ্ধি হচ্ছে মানসিক বহুশক্তির এক জীবন্ত সমাহার। এ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে দ্রুত শিক্ষাগ্রহণ, বিভিন্ন দ্রব্য ও ঘটনাকে বহু সম্বন্ধের মধ্যে তাদের ঐক্যসূত্রে ধরে রাখবার সামর্থ্যে, জটিল ও নির্বস্তুক ধারণা করবার নিপুণতায়, দ্রুত সিদ্ধান্ত

গ্রহণে, সমস্যার সমাধানে এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে শাসন নিয়ন্ত্রণে এবং পরিবর্তনের শক্তিতে এবং সমস্যা সমাধানে নির্ভুল পথ নির্বাচনে। [৪] বিনে, টারম্যান্ ইত্যাদি মনোবিদ্ বুদ্ধিকে মূলতঃ জন্মগত বলে স্বীকার করেছেন।

বুদ্ধি এক না বহু ? কারো কারো দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যাপারে মাথা বেশ খোলে, কিন্তু ইতিহাসে সে পায় 'গোল্লা'। আবার কেউ অঙ্কে বেশ ভাল, কিন্তু সাহিত্যে বেজায় কাঁচা। তাহ'লে বুদ্ধি জিনিষটা কি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি ? এবং নানারকমের বুদ্ধি আছে ?

আবার দেখি যার সাধারণ বুদ্ধি (common sense) যথেষ্ট আছে, সে বিভিন্ন ব্যাপারেই যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। চট্‌পটে চালাক ছেলে দিয়ে সব বিষয়েই কাজ ভালো চলে।

এ নিয়ে প্রধানতঃ দু'রকমের মত আছে। একটা হচ্ছে স্পীয়ারম্যান্ (Spearman) আর তার অনুগামীদের, আর একটা হচ্ছে থর্ণডাইক্, থার্সটোন্ প্রমুখ আমেরিকান্ মনস্তাত্ত্বিকদের। এ ছাড়া একটি মাঝামাঝি দল আছে বার্ট, ভার্ণন, টম্‌সন, কেলী প্রমুখ ব্যক্তিদের। সংক্ষেপে মতগুলি আলোচনা করছি।

স্পীয়ারম্যান্ ও তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two-factor theory)

স্পীয়ারম্যান্ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ বুদ্ধি (g) আছে, সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই সেই বুদ্ধির পরিচয় ও প্রকাশ পাওয়া যায়। এর পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক রকম। একে তিনি নাম দিয়েছেন (general intelligence)। একই ব্যক্তির 'g' নির্দিষ্ট বা constant। আবার বিভিন্ন ধরণের কাজে 'g' ছাড়াও ঐ বিশেষ কাজের উপযোগী বিশেষ বুদ্ধি প্রয়োজন। একে তিনি নাম দিলেন 's' (special abilities)

এক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন কাজের বিশেষ বুদ্ধির "s" (special ability) পরিমাণে প্রভূত তারতম্য থাকতে পারে। বাজনা বাজাতে তার "s" নগণ্য হতে পারে, কিন্তু অংক কষায় তার 's' উঁচু হতে পারে ; তা হলেও সমস্ত বিশেষ বুদ্ধি "s" এর মধ্য দিয়ে 'g' কাজ কচ্ছে। কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির সাফল্য তার "g" আর "s"-এর সম্মিলিত গুণফলের উপরই নির্ভর

৪ Gates, Jersild, and others.—Educational Psychology. p. 225.

করে। এই "g" আছে বলেই একই ব্যক্তির বিভিন্ন কাজের মধ্যে মোটামুটি একটি positive correlation পাওয়া যায়।

অর্থাৎ স্পীয়ারম্যানের মতে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজকে 'g' এবং 's'—এই দুই factor-এ বিশ্লেষণ করা যায়। বীজগণিতের ভাষায় একটি বুদ্ধি অভীক্ষার (test) ফলাফলকে (score) এ ভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$S \text{ (score)} = a_1 g + a_2 s, \cdots\cdots$$

এখানে a_1 এবং a_2 যথাক্রমে সাধারণ বুদ্ধি ও বিশেষ বুদ্ধির পরিমাণকে (weight or load) বোঝাচ্ছে।

স্পীয়ারম্যানের এই দ্বি-উপাদান মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবেই **আংকিক ভিত্তির** উপর রচিত। বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতার পরিমাপক অভীক্ষা বা test গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation coefficient) কষে দেখা গেল যে তাদের অন্তর্নিহিত মিল ও অমিলগুলি একটি g-factor ও s-factor এর গুণফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। একটি test এর ফলাফলের সঙ্গে অপর test এর ফলাফলের মিলের জন্য (test's communality) g-factor দায়ী, এবং অমিলের জন্য (test's specificity) s-factor দায়ী। যে ধরণের test-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, একই ব্যক্তির g-factor সর্বদাই একই থাকে।

g-factor কে মাপা যায়, বিভিন্ন ability মাপক test গুলির correlation এর মধ্য দিয়ে। সকল প্রকার test-ই সমান ভাবে g-factor কে মাপ করে না অর্থাৎ তাদের "g" সংমিশ্রণ (saturation) সমান নয়। এবিষয়ে স্পীয়ারম্যান্ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ 'g'র ক্ষেত্রের প্রকৃত বিস্তার নির্ধারণ করা, এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্রিয়া ও কৌশলের মধ্যে 'g' এবং 's' এর সম্বন্ধ ও তাদের কার কতটা গুরুত্ব তা নির্ণয় করা। কতকগুলি ফল নীচে দেওয়া হল—

অঙ্কে (Mathematics) সাফল্য 'g' এর ওপর ৯ গুণ নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় (classics) সাফল্য 'g' এর ওপর ৯.৫ গুণ নির্ভরশীল।

যুক্তিতে (correct inference) সাফল্য 'g'এর ওপর ৪ গুণ নির্ভরশীল।

সঙ্গীতে (music) সাফল্য 'g' এর ওপর ৩ গুণ নির্ভরশীল।

অংকনে (drawing) সাফল্য 'g'র ওপর ½ গুণ নির্ভরশীল।

অর্থাৎ সমান আগ্রহ ও সুযোগ যদি দুই ক্ষেত্রে থাকে, তবে অংক বা বিভিন্ন ভাষায় সাফল্য, সঙ্গীত বা অংকনের সাফল্যের চেয়ে অধিকতর সাধারণ বুদ্ধির নির্দেশক। সাধারণভাবে স্পীয়ারম্যান্ দেখিয়েছেন, যে টেষ্টগুলি সম্বন্ধসূচক চিন্তার (relational thinking) প্রাধান্য দেয়, তাদের 'g' সংমিশ্রন (saturation) সবচেয়ে বেশী। অপর পক্ষে যে সব টেষ্ট শুধু অন্ধ যান্ত্রিক মুখস্থের ক্ষমতার মাপ গ্রহণ করে, তাদের 'g' সংমিশ্রন খুব কম। ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং অনুরূপ বিষয়গুলির টেষ্ট প্রচুর 'g' সংমিশ্রনের পরিচয় দেয়। কারিগরী বিদ্যা, গান, অংকন প্রভৃতিতে s-factorই প্রধান, g সংমিশ্রণ সামান্যই। সুতরাং 'g' factor এর পরিমাপ করতে হলে সমজাতীয় টেষ্ট বেছে নিতে হবে, যাদের 's' সংমিশ্রণ কম এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation co-efficient) কষলে s-factor বিলুপ্ত হয়ে প্রায় বিশুদ্ধ 'g' এর মাপ পাওয়া যাবে।

নানা পরীক্ষার ফলে তিনি জেনেছিলেন যে স্বতঃবিরোধিতা বা অদ্ভুতত্ব ধরতে পারার ক্ষমতা (Detection of absurdities) (২) অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করবার ক্ষমতা (Completion test), (৩) শ্রেণী বিভাগের ক্ষমতা (Classification), (৪) বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ক্ষমতা (Inference) এবং (৫) সমতা দর্শনের ক্ষমতার (Analogies) মধ্য দিয়ে 'g'র পরিচয় সবচেয়ে বেশী প রমাণে পাওয়া যায়।'

বুদ্ধির জোট-বাঁধা অথবা Group factor মতবাদ

কিন্তু এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে একথা প্রমাণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধি (s) সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নয়। কতগুলি বিশেষ বুদ্ধির মধ্যে যেন ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। এই মিলটা শুধু সাধারণ বুদ্ধিতে মিল নয়। এমন কি একটাই মাত্র সাধারণ বুদ্ধি সমস্ত নিপুণতা বা মানসিক সামর্থ্যের পশ্চাতে ক্রিয়া কচ্ছে একথাটা থার্সষ্টোন্ অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন এটাই বরঞ্চ সত্য যে কতগুলি বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি যেন এক একটা জোট বেঁধে আছে (group-factor)। এই এক জোটের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গুণগুলির মধ্যে অনেকটা মিল (high positive correlation) লক্ষ্যণীয়। আবার এক জোট

বাঁধা বুদ্ধিগুলির সঙ্গে অন্য জোটের অন্তর্গত বুদ্ধিগুলির তেমন মিল নেই। কাজেই যে কোন বিষয়ে কুশলতা, সাধারণ বুদ্ধি (g), জোট বাধা বুদ্ধির দল (f) এবং বিশেষ বুদ্ধি 's'এই তিন প্রকার বুদ্ধির সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। নানা গবেষণার ফলে সাতটি বুদ্ধির জোটের (group factors) অস্তিত্ব থার্স্টোন্ স্বীকার করলেন (১) বাক্য ব্যবহার এবং বাক্যের অর্থ গ্রহণে কুশলতা—Verbal ability (২) সংখ্যা ব্যবহারে কুশলতা—Numerical ability গণিত বিষয়ে জ্ঞানে এই জোটটির বিশেষ কার্যকারিতা আছে, কিন্তু জ্যামিতি বা বীজগণিতে এর ততটা প্রভাব নেই। (৩) দেশে বা স্থান বিষয়ে বিভিন্ন সম্বন্ধ পরিষ্কার করে এবং সহজে বোঝার কুশলতা—The ability to grasp spatial relationships. (৪) শব্দ ব্যবহারে দ্রুততা ও স্বচ্ছন্দতা Word fluency. (৫) মনে রাখবার ক্ষমতা—Memory. (৬) যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা—Reasoning. এবং (৭) দ্রুত-প্রত্যক্ষদ্বারা অর্থগ্রহণের ক্ষমতা—Perceptual speed.

ভার্ণন ও বার্ট এই কতগুলি ছাড়াও আরও কয়টি দলবাঁধা বুদ্ধি (group factors) মেনেছেন, যেমন (১) যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা—Mechanical ability (২) সুর, তাল, লয়, ছন্দ বোধের ক্ষমতা—Musical ability (৩) অনেকক্ষণ ধরে লেখা পড়া বা চিন্তার কাজ করতে পারার ক্ষমতা The capacity for sustained intellectual effort (৪) এক ধরণের কাজ থেকে অনায়াসে অন্য ধরণের কাজ বা চিন্তায় নিজেকে নিয়োগ করার ক্ষমতা—Ability to change quickly and effectively from one mental task or train of thought to another.

এই আবিষ্কার গুলি শিক্ষাব্রতীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে শিক্ষকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি (general intellgence) চর্চ্চার উপরই জোর দিতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন কোন এক-বিষয়ে স্মৃতি বা বুদ্ধি বাড়াতে পারলে, তা অন্য বিষয়েও সংক্রামিত হ'বে (শিক্ষায় সংক্রামণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আবার নানা শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষার দিকে যখন ঝোঁক গেল, তখন শিক্ষকেরা বিশেষ বুদ্ধি বা কুশলতা চর্চাকেই প্রধান শিক্ষণীয় বস্তু বলে মনে করতেন।

কিন্তু বর্তমানে এটা দেখা যাচ্ছে, যা পূর্বে সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর বলে মনে

করা হ'ত, তা বাস্তবিক পক্ষে কোন একটি জোট বাঁধা বুদ্ধির কাজ। আর এটাও দেখা যাচ্ছে শুধুই বিশেষ বুদ্ধি চর্চায় যতটা সুফল হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যায় একত্র জোট বাধা বিশেষ বুদ্ধিগুলির সাধারণ ঐক্য সূত্রের উপর জোর দিয়ে। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে জোট-বাঁধা বুদ্ধির চর্চা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা লাভ করেছে। [৫]

একাধিক উপাদান তত্ত্ব (Multi-factor theory) থার্স্টোন্ থর্ণডাইকের বুদ্ধির একাধিক উপাদান তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু থর্ণডাইক্ প্রতি কাজের মধ্যেই একটি বিশেষ বুদ্ধির প্রকাশকে দেখেছেন। থার্স্টোন্ যদিও একটি সাধারণ বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, কিন্তু থর্ণডাইকের মত প্রতিটি কাজই এক একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক ক্ষমতার প্রকাশ, এ মত তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি centre of gravity নামক factor analysis এর একটি বিশেষ পদ্ধতি দিয়ে নানাবিধ টেষ্টের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করেছেন। স্পীয়ার-ম্যানের মত অনুযায়ী সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ পজিটিভ ছিল তবে কতকগুলি টেষ্টের ফল অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে একটি দল গঠন (cluster) করেছিল। তাই থার্স্টোন্ ধারণা করলেন যে প্রতি টেষ্টের দল কোন বিশেষ মানসিক ক্ষমতাকে (primary mental ability) পরিমাপ করছে।

উপরোক্ত তিনটি মতবাদকে চিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়।

Factors

Test	g	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6
1	*	*					
2	*		*				
3	*			*			
4	*				*		
5	*					*	
6	*						*

স্পীয়ারম্যান্

প্রথম ছকটিতে ছয়টি টেষ্টই g-factor ও একটি করে s-factor পরিমাপ

[৫] Thomson—Factorial analysis of Human Abilities.

Factors

g	g_1	g_2	g_3...	s_1	s_2
*	*		*	*	
*	*				*
*		*			
*	*	*	*		
*	*	*	*		
*		*			

টমসন্ ও বার্ট

Factors

test	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	s_1...
1	*		*			*		
2	*			*		*	*	*
3		*	*			*	*	
4	*	*		*	*			
5		*	*	*	*		*	
6			*		*			

থার্স্টোন্

করছে। দ্বিতীয় চিত্রে প্রত্যেক টেষ্টের মধ্যে g-factor এর প্রকাশ ও নিজস্ব s-factor দেখা যাচ্ছে, অধিকন্তু কতগুলি টেষ্টে কয়েকটি দলগত শক্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, যেমন g_1, g_2, g_3 ইত্যাদি। তৃতীয় চিত্রে টেষ্টগুলি মনের প্রাথমিক সাতটি শক্তিকে কমবেশী অনুপাতে পরিমাপ করছে, কিন্তু কোন টেষ্টই সব কয়টি মানসিক শক্তিকে মাপ করছে না, অর্থাৎ যে কোনও একটি বিশেষ মানসিক শক্তি সবগুলি টেষ্টের ফলের মধ্যেই উপস্থিত আছে, এমন নয়। বিভিন্ন টেষ্টের correlationগুলি ঐ সাতটি মানসিক উপাদানের মধ্যে বিশ্লেষিত হবার পর যা বাকী (residue) থাকবে, তা ঐ টেষ্টের নিজস্ব s-factor।

বুদ্ধিকে সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে বুদ্ধির পরিমাপক টেষ্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ আংকিক উপায়ে বুদ্ধির প্রকৃতি নিরূপণের পন্থা স্পীয়ারম্যান্ই প্রথম প্রদর্শন করেন। শিশুদের মানসিক গঠন বুঝতে স্পীয়ার-

ম্যানের সাধারণ বুদ্ধির (g) ধারণা বেশী কার্যকরী, এবং বার্ট ও থার্সটোনের একাধিক ক্ষমতার কল্পনা বয়স্কদের ক্ষমতা মাপের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। কারণ ছোটদের বুদ্ধি অনেকটাই অবিভক্ত (un-differentiated) তা স্পষ্ট বিভিন্নতার পথ তখনও ধরে না, ফলে তারা ভাল হলে মোটামুটি সব বিষয়েই ভাল নম্বর পায়, মন্দ হলে আবার মোটামুটি সব বিষয়েই খারাপ ফল করে। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে, তার মানসিকতা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততার, অবিভক্ত অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্ট বিভিন্নতার পথে এগিয়ে চলে,, নানা কাজে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, নানা দিকে তার আগ্রহের প্রকাশ দেখা দেয়, কেউ অংক বেশী পছন্দ করে, কেউ বা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, কারো বা ঝোঁক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার প্রতি। সাধারণ বুদ্ধি তখন অনেকটাই নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে যায়, এবং সেই প্রবাহের ধারা সর্বত্র সমান নয়, সুতরাং এডুকেশনাল এবং ভোকেশনাল পথনির্দেশের জন্য থার্সটোন্ ও বার্টের group factors বা primary mental ability মাপক টেষ্টই অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুদ্ধি পরিমাপের গুরুত্ব—মনোবিদের কাছে এই বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিরই গুরুত্ব আছে এবং আধুনিক শিক্ষাবিদের কাছে এই 'কেজো' প্রশ্নটিই সবচেয়ে জরুরী, কি করে এদের আমরা শিক্ষার কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এ কাজটি করতে গেলেই নির্ভুল পরিমাপের প্রশ্ন আসে। ১৯০৪ সালের ফরাসীদেশে বিনে ও সাইমন প্রথম বুদ্ধির মান বা অভীক্ষার (Intelligence test) যে সূত্রপাত করেন তা ক্রমেই নানাভাবে সংশোধিত হয়ে বুদ্ধির নানাদিক নানাভাবে বুদ্ধি পরিমাপের হাজারো রকমের ব্যবস্থা হয়েছে।

বুদ্ধির অভীক্ষার সূত্রপাত—গোড়ার দিকে যে সব অভীক্ষা পদ্ধতি সৃষ্টি হয় তার উদ্দেশ্য ছিল 'সাধারণ বুদ্ধি'র পরিমাপ। বিনের উদ্দেশ্য তাই ছিল, স্পীয়ারমানেরও তাই। কিন্তু ক্রমেই বিশেষ বুদ্ধি ও নানা বুদ্ধির জোট-এর দিকে মনোবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ হতে লাগলো এবং বিভিন্ন বুদ্ধি ও কুশলতার নানা প্রকারের অভীক্ষা, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সৃষ্টি হতে লাগল।

কিন্তু গোড়াতে যে বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি রচিত হয়েছিল তাতে সাধারণ বুদ্ধি চেনবার লক্ষণ কি ধরা হয়েছিল? এটা সবাই বুঝেছিলেন

যে বুদ্ধি হচ্ছে জীবনের নানা বাস্তব সমস্যা সমাধানের উপযোগী মনের মৌলিক একটি সফল অস্ত্র বা শক্তি। প্রাণীকে বাঁচতে হলেই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে হয়। এই সঙ্গতি সাধন উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা করে অন্ধ সহজ সংস্কারের (instinct) সাহায্যে। কিন্তু যতই প্রাণীর জীবন জটিল-তর হ'তে থাকে, তার সমস্যাগুলি কঠিনতর হতে থাকে, ততই দেখা যায় অন্ধ সংস্কার দ্বারা কাজ চলে না। তখন দরকার হয় অবস্থার বিশ্লেষণ, তুলনাদ্বারা ঐক্য ও পার্থক্য বিচার, নানা প্রকারের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। মনের এই যে সচেতন শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলি তারই সাধারণ নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি হচ্ছে মনের সেই শক্তি যা দিয়ে অবস্থা অনুযায়ী বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্যে মন দ্রব্য বা ঘটনার বিভিন্নগুণের প্রভেদ ও সম্বন্ধ বুঝতে পারে এবং নূতন পরিবর্তিত অবস্থায় পুরাতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই সম্বন্ধগুলি নূতন করে, প্রয়োজন হলে কিছু পরিবর্তন করে প্রয়োগ করতে পারে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE.
CALCUTTA-27

অষ্টাদশ অধ্যায়

বুদ্ধির পরিমাপ—Tests of Intelligence

বুদ্ধির পরিমাপ—আগেকার দিনের স্থূল এবং হাস্যকর বুদ্ধি পরিমাপের উপায়গুলির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। তারপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধি পরিমাপ করিবার প্রথম যে চেষ্টাগুলি হয় সেগুলিও সফল হয়নি। চেহারা দেখে (ল্যাভেটর্ ১৭৭২) বা মাথার গড়ন দেখে (গল্ ১৮১০) বুদ্ধির বিচার, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল ভ্রান্ত। হাতের লেখা, বানান বা চটপট হিসাবে পারদর্শিতা দিয়ে বুদ্ধির বিচার হয় না, কারণ অনেক বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ লোকের হাতের লেখা জঘন্য, বানানে আর মৌখিক হিসাবে তাদের বহু ভুল হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা (sense acuity)—যা মাপা যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে (উত্তেজকের কত পরে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদন হয়,—যেমন ২৫ ফিট দূরে একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হোল, এবং ষ্টপ ওয়াচ্ টিপে সময়টা নির্ধারণ করা হোল,—আবার অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ষ্টপ্ওয়াচ্ টেপা হল। দেখা গেল এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় দুই ঘটনার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, সব মানুষের প্রতিক্রিয়ার সময়—reaction time—সমান নয়, সব ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার সময়ও সমান; নয়) বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতার পরীক্ষা (চোখের সমানে একই রংএর সামান্য পৃথক কয়েকটি কার্ড একসঙ্গে বা একটি পর একটি রাখা হোল বা দেখান হোল এবং তফাৎটা অনুভূত হলে তৎক্ষণাৎ বলতে বলা হলো,—দেখা গেল সকলের ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা সমান নয়) দিয়েও বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence Test) প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনে (Binet) তাঁর সহকর্মী সাইমন্ (Simon) এর সাহায্যে, ১৯০৪ সালে। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিশুদের শ্রেণী বিভাগ (gradation) করা, এবং ক্ষীণবুদ্ধি (feeble-minded) ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান নির্ণয় করা। তাঁরা এ নিয়ে বহু পরীক্ষা চালান। আরো বহু পরিবর্তন করে ১৯১০ সালের কাছাকাছি

সাইমন্ বিনের আদর্শ মাপ (Simon-Binet Standard test) য়ুরোপের বহু দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে। ১৯১১ সালে বিনে মারা যান, কিন্তু বুদ্ধি পরিমাপের যে ধারা তিনি প্রবর্তন করে যান, তা অনুসরণ করে আরো নানা রকমের বুদ্ধির পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মাণী এই পরীক্ষা ব্যাপারে য়ুরোপে অগ্রণী। তারপর আমেরিকাতে এ ঢেউ এসে পৌছানর পর, এত নানা রকম পরীক্ষা চলতে থাকে এবং এত রকমারী পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয় যে এখন শতাধিক Tests (নানা প্রকারের) প্রচলিত হয়েছে।

বিনে দেখেছিলেন বুদ্ধি ব্যাপারটা এমন নয় যে কারু আছে, আর কারু একেবারেই নেই। অর্থাৎ এটা যাকে বলে 'yes—no' classification, তা নয়। বুদ্ধির তারতম্য আছে। আর একটা জিনিষ সবাই জানে, বুদ্ধির সঙ্গে বয়সের একটা সম্বন্ধ আছে। কাজেই "ওই ছেলেটা বুদ্ধিমান্" এ কথাটা খুব স্পষ্ট নয়। বুদ্ধি ব্যাপারটা তুলনামূলক (relative), কাজেই কোন ছেলেকে বুদ্ধিমান্ বললে তখনই একথাটা আসবে, "কার তুলনায় বুদ্ধিমান্?" সুতরাং বুদ্ধির একটি মাপকাঠি চাই। যে ছেলেটাকে বুদ্ধিমান্ বলচি, যদি দেখা যায় সেই বয়সের অধিকাংশ ছেলের তুলনায় তার বুদ্ধি বেশী, তা হলেই "ছেলেটি বুদ্ধিমান্" কথার বৈজ্ঞানিক মানে হয়। কিন্তু তার পরেও কথা থাকে সেই বয়সের ছেলেদের তুলনায় তার বুদ্ধি কতটা বেশী? এটা মাপা যাবে কি করে? বিনে আর একটা জিনিষ দেখলেন কেবল একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে বুদ্ধির তৌল করা চলে না। কাজেই অনেকগুলি পরীক্ষা করে স্কেল্ তৈরী করতে হবে। তিনি একাগ্রতা ও মনোযোগ, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও যুক্তিশীলতাকে তাঁর Test-এর বিষয় (item) নির্বাচনে প্রাধান্য দেন। তিনি প্রথমে একই বয়সের নানা শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে নিয়ে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন এমন একটা মান, যেটা সে বয়সের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাপ বলে ধরা যেতে পারে। এই রকম করে বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন মান তৈরী করা হোল। তিনি ৩ বছর থেকে ১৫ বছরের মান বা standard নির্ধারণ করে বিনে স্কেল—তৈরী করলেন। বিনে বুদ্ধির মাপ করলেন মনের পরিণতি (Mental Age) দিয়ে। একটা ছেলের মনের পরিণতি ৯ বৎসর বললে বোঝা গেল, তার বুদ্ধিটা নয় বছরের ছেলের মত, তার বাস্তবিক বয়স যাই হোক্। তিনি মনের পরিণতি বা Mental Age দিয়ে বুদ্ধি মাপবার রীতি

প্রচলন করলেন। বিনের মতে নয় বছরের নীচে কোন ছেলের মানসিক পরিণতির বয়স তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে দু-বৎসর কম হলে, বুঝতে হবে, সে ছেলে বোকা। আর নয় বছরের উপরে, মানসিক পরিণতির বয়স তিন বৎসর কম হলে, তবেই তাকে বোকা বলা যায়। ট্যারম্যান্ বললেন, তা হলে বুদ্ধি মাপতে হলে, মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত বয়সের সম্বন্ধটা একত্র করে প্রকাশ করে দেখানো দরকার। এটাকে বলা হয় আই. কিউ. (I. Q.) বা বুদ্ধ্যঙ্ক। বুদ্ধি মাপবার এ আংকিক পদ্ধতি প্রচলন করলেন টারম্যান্। অবশ্য তাঁর আগে I. Q. কথাটা ব্যবহার করেছিলেন জার্মান মনোবিজ্ঞানী স্টার্ণ (Stern)। নয় বছরের ছেলেদের জন্যে নির্দিষ্ট মানের উদাহরণ দেওয়া যাক—"কাঠ ও কয়লার মধ্যে মিল আর প্রভেদ বলতে হবে; এ রকম ৪ জোড়া জিনিষকে তুলনা করে তাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলতে পারা চাই।" এখন মনে করা যাক, আমরা যে ছেলেকে বুদ্ধিমান বলছি তার বয়স হচ্ছে আট। কিন্তু সে ৯ বছরের নির্দিষ্ট মানের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারছে। তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে তার বাস্তবিক বয়স ৮ হলেও তার মনের বা বুদ্ধির পরিণতি হচ্ছে ৯ বছরের, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, ৮ বছরের হলেও তার বুদ্ধি ৯ বছরের মত। এ কথাটাকেই অংকে প্রকাশ করলেন ট্যারমান্, বললেন ছেলের বুদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient (সংক্ষেপে I. Q.) হোল $\frac{৯}{৮}$ অথবা ১·১২। যে ছেলে সাধারণ (Average) তার I. Q. হোল $\frac{৮}{৮}$ = ১·০০। দশমিক বিন্দু বাদ দিলে দাঁড়ায় সাধারণ ছেলের I. Q. = ১০০। আর পূর্বোক্ত বুদ্ধিমান ছেলেটির I. Q. = ১১২। I. Q. বের করবার পদ্ধতি হচ্ছে মানসিক বয়সকে (Mental Age) এমনি বয়স (Chronological Age) দিয়ে ভাগ করে, ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যে ১০০ দিয়ে গুণ করা।

$$I.Q. = \frac{M.A.}{C.A.} \times 100.$$

Terman-Merrill Revision of Binet test সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। এই টেষ্টে দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রতি ছয় মাসের জন্য ছয়টি করে টেষ্টের ব্যবস্থা আছে, এবং তাতে প্রতি টেষ্টের জন্যে এক মাস করে বয়স হিসাব করা হয়। ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসরের

জন্য ছয়টি করে টেষ্ট আছে, সেজন্য প্রতি টেষ্টের মূল্য দুই মাস বয়স হিসাব করতে হবে। এর উর্ধ্বে প্রতি টেষ্টের মূল্য আরো বেড়ে গেছে।

ধর, একটি চার বৎসর দুই মাস বয়সের ছেলে (৪-২) তিন বৎসর বয়সের সব টেষ্ট পাশ করেছে, পাঁচটি ৩½ বৎসরের, তিনটি ৪ বৎসরের, দুইটি ৪½ বৎসরের, দুইটি ৫ বৎসরের এবং একটি ৬ বৎসর বয়সের টেষ্ট পাশ করেছে, তার মোট মানসিক বয়স এভাবে হিসাব করতে হবে :

				বৎসর	মাস
৩ বৎসর,	সব পাশ,	নিম্নতম বয়ঃসীমা		৩	—
৩½ "	৫টি		১ মাস মূল্য হিঃ		৫
৪ "	৩টি	"	"		৩
৪½ "	২টি	"	"		২
৫ "	২টি	"	"		২
৬ "	১টি	"	২ মাস		২
				৩ বৎসর	১৪ মাস

অথবা মানসিক বয়স = ৪-২

তাহলে বুদ্ধ্যঙ্ক হবে :

ছেলেটির আসল বয়স ৪-২ ; মানসিক বয়স ৪-২ ; ;

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{M. A.}}{\text{C. A.}} \times 100 = \frac{4\text{-}2}{4\text{-}2} \times 100 = 100$$

১৯১১ সালে বিনে টেষ্টের যে পরিবর্তিত রূপ রেখে যান, তার একটি সংক্ষিপ্তসার নীচে দিচ্ছি—

৩ বৎসর বয়স—

(১) নাক, চোখ ও মুখ, ইত্যাদি অঙ্গের নাম বলা
(২) দুটি সংখ্যা পুনরুক্তি
(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিষ আছে তার নাম বলা
(৪) পদবী বলা
(৫) ছয়টি কথা যুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি।

৪ বৎসর বয়স—

(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তা বলা

(২) চাবী, ছুরি ও পয়সা (penny) দেখে নাম বলা

(৩) তিনটি সংখ্যার পুনরুক্তি

(৪) দুটি সরলরেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা

৫ বৎসর বয়স—

(১) দুটি জিনিষের ওজন তুলনা করা

(২) একটি চৌকোণা ক্ষেত্র আঁকা আছে, অনুরূপ একটি চৌকোণা ক্ষেত্র আঁকা

(৩) দশটি কথাযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি

(৪) চারটি পেনী গোণা

(৫) একটি দ্বিখণ্ডিত চৌকোণাকে জোড়া

৬ বৎসর বয়স—

(১) সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলা

(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা

(৩) একটি রুহিতনের আকৃতি দেখে আঁকা

(৪) তেরটি পেনী গণনা

(৫) কয়েকটি ছবি দেখে সুন্দর ও কুৎসিত নিরূপণ

৭ বৎসর বয়স—

(১) ডান হাত বাঁ কাণ দেখান

(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া

(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ পর পর প্রতিপালন

(৪) ছয়টি মুদ্রার মোট মূল্য গণনা, তার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা

(৫) চারটি প্রধান রংএর নাম বলা

৮ বৎসর বয়স—

(১) স্মৃতি থেকে দুটি বস্তুর তুলনা

(২) ২০ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা

(৩) ছবির মধ্যে বাদ পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা

(৪) বার ও তারিখ বলা

(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি

৯ বৎসর বয়স—

(১) মুদ্রার খুচরো হিসাব করা

(২) শব্দার্থ বলা

(৩) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চেনা।

(৪) পর্যায়ক্রমে মাসের নাম বলা

(৫) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ গ্রহণ ও উত্তর দেওয়া

১০ বৎসর বয়স—

(১) ওজন অনুসারে পাঁচটি ব্লক সাজান

(২) দুটি ছবি দেখে স্মৃতি থেকে আঁকা

(৩) অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবতা প্রদর্শন

(৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্থ গ্রহণ ও উত্তর দেওয়া

(৫) তিনটি শব্দ দেওয়া আছে, ঐ তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা

১১ বৎসর বয়স—

(১) রেখার দৈর্ঘ্য তুলনা সম্বন্ধে অপরের মত গ্রহণ না করে নিজে বলা

(২) তিনটি প্রদত্ত শব্দ নিয়ে একটি বাক্য রচনা

(৩) তিন মিনিটে ষাটটি শব্দ বলা

(৪) তিনটি বিমূর্ত (abstract) শব্দের ভাবার্থ বলা

(৫) একটি এলোমেলো ভাবে সাজান বাক্যের অর্থ বলা

১৫ বৎসর বয়স—

(১) সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি

(২) এক মিনিটে একটি শব্দের সঙ্গে মিল রেখে তিনটি শব্দ বলা

(৩) ২৬টি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি

(৪) ছবি দেখে অর্থ বলা

(৫) ভাবার্থ বলা

পূর্ণবয়স্কদের জন্য—

(১) কাগজ কাটার কয়েকটি সমস্যার সমাধান

(২) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় পুনর্গঠন

(৩) বিমূর্ত শব্দগুলির পার্থক্য নিরূপণ

(৪) প্রেসিডেন্ট ও রাজার মধ্যে তিন ভাবে পার্থক্য নিরূপণ

(৫) পড়ে শোনান একটি গল্পাংশের সংক্ষিপ্তসার বলা

এই স্কেলে ৫৪টি টেষ্ট আছে। বিনে চেষ্টা করেছিলেন, এমন টেষ্ট্ আইটেম্ দিতে, যার প্রয়োগ পদ্ধতি সরল, বা সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধির বিবিধ প্রকাশকে মাপ করে, এবং যা বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়।

বিনে-সাইমন বুদ্ধি-পরিমাপক স্কেলের সংস্কার হয় ১৯১৬ সালে ষ্টানফোর্ড রিভিশনে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই ষ্টান্‌ফোর্ড রিভিশন্‌ই বুদ্ধি পরীক্ষার মোটামুটি সর্বত্র-গ্রাহ্য স্কেল্ ছিল। কিন্তু বহু বৎসর ব্যবহার ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এর অনেক দোষ-ত্রুটি অপূর্ণতা ধরা পড়েছে। পাঁচ বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের বুদ্ধির পরীক্ষার উপায় হিসাবে ষ্টান্‌ফোর্ড রিভিশন্ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দশ বছরের উপরের বয়স্কদের পরীক্ষায় ক্রমশই এ স্কেল্ অ-নির্ভরযোগ্য। একেবারে ছোট বয়সের বাচ্চাদের বুদ্ধি পরীক্ষার বেলায়ও এ স্কেল সব সময় উপযোগী নয়, কারণ বিনে-সাইমন্ স্কেলের মত এ স্কেলও অনেকাংশে ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল (verbal test)। আর শিশুদের পরীক্ষার বেলায় নানা কাজ করার পরীক্ষা (Performance test) অধিকতর আকর্ষণীয় ও তাদের পক্ষে উপযোগী। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টান্‌ফোর্ড রিভিশন্ স্কেলের দ্বারা যে ফল পাওয়া যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ সত্য ছিল না (low validity)। এ পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া ব্যাপারটাও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ গোলমেলে ছিল (difficulty of scoring)। এ সব কারণে টারম্যান্ ষ্টান্‌ফোর্ড-রিভিশন্‌কে আবার নূতন ক'রে সংস্কারের কাজে হাত দেন। দশ বৎসর পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর ১৯৩৭ সালে নূতন স্কেল্ প্রকাশ করেন।

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা

এ কাজে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন ডাঃ মেরিল। বর্তমান সময়ে এই নূতন স্কেলই আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[১] এ স্কেল্ দুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। একটিকে বলা হয় এল্. ফর্ম (L. form) আর একটিকে বলা হয় এম্. ফর্ম (M. form)। দুইটি অংশের পরীক্ষার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও একই বয়সের পক্ষে তারা সমান কঠিন বা সমান সহজ। এ দুটি ফর্মই প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় ব্যবহার্য এবং দুটিতেই বুদ্ধির মাপে একই ফল

১ অভীক্ষাগুলির বিশদ বিবরণের জন্য Anne Anastasi, Freeman ও Ballard দ্রষ্টব্য।

পাওয়া উচিত। এল্ ফর্ম বিনের মূল স্কেলের ভিত্তিতে গড়া ; এম্ ফর্মএ হাতের কাজের পরীক্ষা বেশী। এ নতুন স্কেলে পরীক্ষার বিষয় (test items) আগের স্কেলের তুলনায় অনেক বেশী। বিনের প্রথম স্কেলে পরীক্ষার বিষয় ছিল ৫৪। ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিসানে তা বেড়ে হয় ৯০, আর এই নবতম সংস্কারে পরীক্ষার বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৯টিতে। এ নতুন রিভিসানে প্রাপ্ত বয়স্কদের পরীক্ষার স্কেল নতুন করে তৈরী করা হয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়ে, আর যাঁরা অসামান্য বুদ্ধি বা প্রতিভার অধিকারী, এ দুই শ্রেণীর অ-সাধারণ ছেলে-মেয়েদেরই বুদ্ধি পরিমাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এ স্কেলের বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধি পরিমাপক প্রশ্নমালার (এল্ ও এম্ দুই ফর্মেরই) কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে।

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এল্. ফর্ম)

১। সূতো পরানো

উপকরণ : একটি বাক্সে এক রঙের ৪৮টি পুঁতি বা মাঝখানে ফুটো কাঠের টুকরো, ১৬টি গোল, ১৬টি চৌকা, আর ১৬টি লম্বাগোল (cylindrical), আর এক জোড়া ১৮ ইঞ্চি লম্বা জুতো বাঁধবার ফিতে।

ব্যবহার : পরীক্ষক একটি জুতোর ফিতে নিয়ে, প্রত্যেক আকারের একটি পুঁতি ফিতেতে একটার পর একটা গাঁথবেন এবং বলবেন "এসো আমরা এই খেলাটা খেলি, দেখো।" শিশুকে আর একটি ফিতে দেবেন এবং তাকে পুঁতিগুলি গাঁথতে উৎসাহ দেবেন। শিশু যদি কোন এক বিশেষ আকারের পুঁতি বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পরীক্ষক তাকে বলবেন, যে-কোন আকারের পুঁতি হলেই চলবে। সময় দু মিনিট।

নম্বর দেওয়া : ৪টি পুঁতি গাঁথতে হবে। প্রত্যেক গাঁথা পুঁতির জন্য এক নম্বর।

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নাম-করণ

উপকরণ : সাধারণ পরিচিত দ্রব্যের ১৮টি ছবির কার্ড। প্রত্যেকটি কার্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া।

ব্যবহার : পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা করে শিশুকে দেখাবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, "এটা কি? এটার নাম কি?"

নম্বর দেওয়া : +১২ নম্বর।

৩। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন—পুল তৈরী

উপকরণ ঃ ১২টি ১ ইঞ্চি চৌকা টুকরো (wooden blocks)

ব্যবহার—পরীক্ষক শিশুর সামনে এলোমেলো ভাবে টুকরোগুলি ছড়িয়ে দেবেন। তারপর শিশুর নাগালের বাইরে তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে পুল তৈরী করে দেখাবেন আর বলবেন, "দেখো তো, এরকম তৈরী করতে পারো কিনা"। একটা জায়গা দেখিয়ে বলবেন, "ঠিক এইখানে তৈরী করো।" পরীক্ষকের তৈরী পুল শিশুর সামনে থাকবে। প্রয়োজন হ'লে পরীক্ষক একাধিকবার তৈরী করে দেখাবেন।

নম্বর দেওয়া ঃ শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হলেও নম্বর পাবে। না পড়ে গেলেই হবে। নিচের দুটি কাঠের টুকরো লাগালাগি থাকলে চলবে না। দুটি টুকরোর মাঝখানে ফাঁক থাকবে, আর দুটি টুকরোর উপরে ভর করে আর একটি থাকবে। যদি পুল তৈরী করার পর আরো উঁচু করে টুকরোগুলি সাজায়, তা হলেও নম্বর পাবে।

পরীক্ষকের আদেশের পর পুলটি তৈরী করবে। পরীক্ষার মধ্যে অন্য সময় যদি নিজে নিজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পুল গড়ে, তা হলে নম্বর পাবে না।

৪। ছবির স্মৃতি

উপকরণ ঃ জানোয়ারের ছবি আঁকা চারটি কার্ড।

ব্যবহার ঃ প্রথম ছবি দেখিয়ে "এটি কি? হাঁ, এটি গরু।" শিশু নাম না জানলে বা ঠিক বলতে না পারলে, পরীক্ষক ঠিক নামটি বলে দেবেন।

এবার ছবিটি সরিয়ে নিয়ে, অন্য ছবি দেখাবার আগে বলবেন, "এবার আমরা গরুর ছবিটি খুঁজে বের করব।" সব ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক, "গরুর ছবি কোনটি? প্রয়োজন হলে বলবেন "আমাকে ঐ ছবিটি দেখাও বা ছবিটির উপর তোমার আঙ্গুল রাখ।"

এরকম করে দ্বিতীয় ছবি দেখিয়ে জন্তুর নাম জিজ্ঞাসা করবেন। শিশু নাম না জানলে, নাম বলে দেবেন। ছবিটি সরিয়ে অন্য ছবি দেখবার আগে বলবেন, "আমরা গরু ও ঘোড়া খুঁজে বের করব।" সব ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক "গরুর ছবি কোনটি? ঘোড়ার ছবি কোনটি?"

নম্বর দেওয়া ঃ +১। শিশুর ঠিক ঠিক ছবিটি দেখানো চাই। যেটা দেখাতে বলা হোল তা ছাড়া অন্য জিনিষ দেখালে নম্বর—(বিয়োগ) হবে।

৫। একটি বৃত্ত দেখে অংকন করা

উপকরণ ঃ একটি ছোট কপি বইয়ে বৃত্ত ছাপা আছে।

ব্যবহার ঃ শিশুকে একটি পেন্সিল দেবেন, তারপর বৃত্তটি দেখিয়ে বলবেন, "ঠিক এ রকম আর একটি আঁক। ঠিক এই জায়গাটায় আঁক।" তিন বার তাকে চেষ্টা করতে দিন। তিন বারই স্পষ্ট করে আদেশ দিন "ঠিক এ রকম আর একটি আঁক। ঠিক এ জায়গাটায়।" শিশুকে বৃত্তটির দাগে দাগে আঁকতে দেবেন না।

নম্বর দেওয়া ঃ + ১ নম্বর।

৬। তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তি করা

ব্যবহার ঃ পরীক্ষক বলবেন "শোন, বল, ৪-২।" "এবার বল, ৬-৪-১"। ইত্যাদি।

(ক) ৬-৪-১, (খ) ৩-৫-২, (গ) ৮-৩-৭

পরীক্ষক প্রত্যেকটি সংখ্যা সমান জোর দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে একটি করে।

নম্বর দেওয়া ঃ +১। একবার পড়ার পর সব কয়টি সংখ্যা নির্ভুল ভাবে শুনে শুনে উচ্চারণ করা চাই।

অথবা

কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত বসাতে হবে।

উপকরণ ঃ ফুটো করা বিভিন্ন আকারে কাঠের টুকরো বসানো কাঠের বোর্ড (Form board)

ব্যবহার ঃ ত্রিকোণাকার বোর্ডটি ভূমির দিকটি শিশুর দিকে দিয়ে একটি একটি করে টুকরো বোর্ড থেকে খুলে আনবেন। শিশু পরীক্ষকের কাজ লক্ষ্য করবে। এবার কাঠের টুকরোগুলি ত্রিভুজাকার বোর্ডটির পাশে পাশে সাজিয়ে বোর্ডটি ঘুরিয়ে ত্রিভুজাকার বোর্ডটির শীর্ষ শিশুর দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষক বলবেন, "এবার কাঠের টুকরাগুলি বোর্ডের ফুটোর মধ্যে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখো।"

সময়ের নির্দিষ্ট সীমা নেই। দুবার পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়বারেও প্রথম বারের মতই আদেশ দিতে হবে।

নম্বর দেওয়া ঃ +২। তিনটি কাঠের টুকরোই যথাস্থানে বসাতে হবে।

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এম. ফর্ম)

১। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন ঃ পুল তৈরী, এল ফর্মের মতই।

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নামকরণ ঃ এল ফর্মের মত, তবে এখানে ছবির কার্ডের সংখ্যা ১৭টি। এবং নম্বর+১০।

৩। ব্যবহারের দ্বারা দ্রব্য চেনা ঃ

উপকরণ ঃ একটা কার্ডে ছোট ছোট সংসারের নিত্যব্যবহৃত দ্রব্য যেমন, ষ্টোভ, বিছানা, পাইপ, চেয়ার, ধূলো ফেলবার পাত্র, কাঁচি ইত্যাদি।

ব্যবহার ঃ শিশুকে কার্ডে আটকানো ছ'টি ছোট ছোট দ্রব্য দেখিয়ে পরীক্ষক বলবেন, "আমাকে দেখাও কোনটি—" অথবা "এর মধ্যে কোনটি— ?"

(ক)—যাতে আমরা রাঁধি।

(খ)—যাতে আমরা ঘুমাই।

(গ)—যা দিয়ে ধুমপান করি।

(ঘ)—যাতে আমরা বসি।

(ঙ)—যাতে আমরা ধূলো ঝেড়ে ফেলি।

(চ)—যা দিয়ে আমরা কাটি।

নম্বর দেওয়া ঃ +৫। শিশুর ঠিক ঠিক জিনিষটি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো চাই। নম্বর বিয়োগ (—) হবে, যদি ভুল জিনিষটিকে দেখায়, নাম ঠিক ঠিক বলতে পারলেও।

৪। খাড়াখাড়ি একটি রেখা অঙ্কন।

ব্যবহার ঃ পরীক্ষক শিশুকে পেন্সিল কাগজ দেবেন। তার কাগজে একটি খাড়াখাড়ি রেখা এঁকে বলবেন "এরকম একটি আঁকো, এইখানটায় আঁকো।" একবার শুধু এঁকে দেখাবেন। পরীক্ষাও একবার মাত্র।

নম্বর দেওয়া ঃ মোটামুটি একটি মাত্র খাড়া রেখা হওয়া চাই। হিজিবিজি অনেকগুলি রেখা হলে নম্বর বিয়োগ হবে।

৫। দ্রব্যের নাম বলা।

উপকরণ ঃ জুতো, ঘড়ি, টেলিফোন, নিশান, ছুরি, ষ্টোভ।

ব্যবহার ঃ এক একটি করে দ্রব্য শিশুর সামনে ধরবেন, শিশুকে প্রত্যেক দ্রব্যের নাম বলতে বলবেন। জিজ্ঞাসা করবেন "এটি কি? এটির মানে কি?"

এভাবে একটির পর একটি জিনিষ শিশুর সামনে ধরতে হবে (ক) জুতা (খ) ঘড়ি (গ) টেলিফোন (ঘ) নিশান (ঙ) ছুরি (চ) ষ্টোভ।

নম্বর দেওয়া ঃ +৫।

তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তি—এল্ ফর্মের মতই, তবে সংখ্যাগুলি বিভিন্ন যথা, (ক) ৭-৪-৯ (খ) ৯-৬-১ (গ) ২-৫-৩

অথবা

কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত বসাতে হবে (এল্ ফর্মের মতই) [২]

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষা—প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষায় সাধারণত এ কয়টি বিষয় থাকে। (প্রধানত রেক্স নাইট্-এর ইন্‌টেলিজেন্স্ অ্যাণ্ড ইন্‌টেলিজেন্স্ টেষ্ট থেকে সংগৃহীত)

(১) বিমূর্ত শব্দের অর্থবোধ (Abstract words)—যেমন সততা, মিষ্টত্ব, ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি শব্দ দিয়ে কি বোঝায় তা প্রকাশ করতে বলা হয়।

(২) সমস্যার-সমাধান—যেমন,

(i) তিনজন শ্রমিক যদি এক মিনিটে সাতাশটি বাক্স তৈরী করতে পারে, তাহলে পাঁচজন শ্রমিক সাত মিনিটে কয়টি করতে পারবে? (ii) একজন ব্যক্তিকে একটি পাঁচ সের জল ধরে এমন ও আর একটি তিন সের জল ধরে এরূপ মাপের দুটী পাত্র দিয়ে বলা হল, দু'সের দুধ আনতে,—সে কি ভাবে ঠিক মাপ করে আনবে?

(৩) শ্রেণীবিভাগ (Classification) কতগুলো শব্দ দেওয়া থাকবে, যারা একই বিশেষ দলভুক্ত; শুধু এমন একটি শব্দ থাকবে, যা ঐ দলের নয়। সেটিকে বের করতে হবে। যেমন, সেতার, বীণা, এস্রাজ, চেয়ার, বেহালা।

(৪) বিপরীত উপমা (Opposite analogies)—তিনটি শব্দ দেওয়া থাকবে, প্রথম দুইটির মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকবে, তৃতীয় শব্দটির সঙ্গে ঠিক ঐ প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান, এমন চতুর্থ শব্দটি খুঁজে বার করতে হবে। যেমন রোদ উঠলে ভেজা জিনিষ শুকোয়, বৃষ্টি নামলে—(মেঘ হয়, জল পড়ে শুকনো জিনিষ ভেজে, নদী হয়, ব্যাঙ ডাকে।)

[২] Terman & Merrill—Measuring Intelligence বই থেকে।

(৫) সাধারণ জ্ঞান :—বড়দের বুদ্ধি বাড়বার সীমা পার হয়ে গেলে বুদ্ধি বাড়ে না (Longitudinally) ; কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বাড়ে (Horizontal growth)। সাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক প্রশ্নের নমুনা—

(১) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন ?

(২) পাকিস্তানের স্রষ্টা কে ?

(৩) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ কোনটি ?

(৪) রেড্ গার্ডস্ কারা ?

(৫) কেন লোকেরা কর দেবে ?

শূন্যস্থান পূরণ ও বাক্য রচনা

একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে পূর্ণ করা, যেমন (১) মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী যার চিন্তা করার——আছে। (২) জাহাজ ডুবির পর (i)——যখন (ii)——দেখল, তখন তারা (iii)——বোধ করল, কারণ (iv)——আসার সম্ভাবনা ছিল।

(i) পুলিশের দল, ভ্রমণকারিগণ, নাবিকরা, সামুদ্রিক পাখী।

(ii) আগুন, খাবার, বৃষ্টি, পার।

(iii) রাগ, স্বস্তি, আনন্দ, আগ্রহ।

(iv) ঝড়, মাছ, বন্দর, ডাকাত।

সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার কৌশল—(Codes) উদাহরণ,

সাংকেতিক ভাষা—DPNF UP DBMDVUUB

আসল অর্থ—COME TO CALCUTTA

এখানে বর্ণমালা অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষরের পরের অক্ষরটি ব্যবহার করাই হল সংকেত।

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষা

(৬) বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ বার করা। (Number Series)—যেমন

1	3	4	—	6	8
3	9	12	21	18	—

এই সংখ্যারাশির উপরে ও নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি সম্বন্ধ বর্তমান। সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী শূন্য স্থানগুলিতে সংখ্যা বসাতে হবে।

(৭) মৌলিক প্রভেদ বোধ (Essential differences)—যেমন, বীজ ও ডিম, ভস্মীভূত ও দ্রবীভূত ইত্যাদি।

(৮) দিক নির্ণয়—যেমন (১) মনে কর, তুমি উত্তর দিকে যাচ্ছ, তারপর প্রথমে ডানদিকে ঘুরলে, তারপর আবার ডানদিকে, তারপর বাঁয়ে ঘুরলে। এখন তুমি কোনদিকে যাচ্ছ?

(৯) প্রবাদবাক্যের অর্থবোধ—যথা, 'গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায় না' কেন?

কিভাবে বিনের বুদ্ধির মাপ প্রয়োগ করা হয়? ১৯০৫ সালে বিনে সাইমনের সহযোগিতায় প্রথম বুদ্ধি পরিমাপক স্কেল্ প্রকাশ করেন। এই স্কেলে বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত কতগুলি প্রশ্নমালা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক শিশুর মানসিক পরিণতি (Mental age) কতটা তা পরিমাপ করা। কি করে এই স্কেল্ প্রয়োগ করা হ'ত? এক ঘরে অভীক্ষক (tester) বসে আছেন, সেখানে ছেলেটিকে নিয়ে আসা হ'ল। অভীক্ষকের কাছে কিছু প্রশ্নপত্র ও নম্বর দেবার কিছু কাগজপত্র এবং সাধারণ কিছু যন্ত্র থাকে। শিশুর সঙ্গে পরিচয় হলে, অভীক্ষক শিশুকে কতগুলি সহজ প্রশ্ন করেন যা সে বিনা আয়াসেই উত্তর দিতে পারে। এতে শিশুর সঙ্কোচ ও জড়তা কেটে যায়। শিশুর সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বিবরণ অভীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছিল (যথা, তার বংশপরিচয়, বয়স, কোন্ ক্লাশে পড়ে ইত্যাদি)। ধরা যাক্, ছেলেটির বয়স আট বৎসর। ক্লাশে পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকে। অভীক্ষক তার বুদ্ধির সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করে, ছয় বছরের উপযুক্ত ছয়টি প্রশ্ন তাকে করলেন। সে সব কয়টি প্রশ্নই জবাব দিতে পারলো। তা হ'লে ছয় বৎসরটাকে ধরা যেতে পারে তার সর্বনিম্ন বুদ্ধির সীমা (basal age)। এবার তিনি শিশুকে সাত বৎসরের উপযোগী স্কেলে নির্দিষ্ট ছয়টি প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে সে তিনটির জবাব দিতে পারলো। এর পর তাকে আট বৎসরের উপযোগী ছয়টি প্রশ্ন করা হোল, তার মাত্র একটি প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারলো। এবার নয় বৎসরের উপযোগী ছয়টি প্রশ্ন করা হ'লে সে একটিরও জবাব দিতে পারলো না। কাজেই বোঝা গেল তার বুদ্ধির পরিণতি বা সীমা আট বৎসরের নীচে। কিন্তু কতটা নীচে তা বোঝা যাবে কি করে? বিনের স্কেল্ অনুযায়ী শিশুর সর্বনিম্ন বুদ্ধির সীমা ৭২ মাস (৬ বৎসর) এর সঙ্গে উচ্চতর বয়সের যে কয়টি প্রশ্ন সে উত্তর দিতে পারবে তার প্রত্যেকটির জন্যে তার বুদ্ধির পরিণতি

২ মাস ধ'রে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ এই ছেলের ৬ বৎসরের মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে, সাত বৎসরের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে সাফল্যের জন্য ৩×২ =৬ মাস; এবং আট বৎসরের একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো দিতে পারার জন্যে আরো দুই মাস, অর্থাৎ মোট আট মাস (৬+২) যোগ করা হোল। কাজেই তার ৭২ মাস সর্বনিম্ন বুদ্ধির সীমার সঙ্গে যোগ করে বিনের হিসাব অনুযায়ী এ ছেলের মানসিক বয়স বাহাত্তর মাস+আট মাস=আশি মাস অথবা ছয় বৎসর আট মাস। বিনের বুদ্ধির মাপে শিশুর মানসিক পরিণতি তার বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে যুক্ত করে হিসাবে দেখানো হোত না। এতে শুধু বলা হোত এই ছেলের মানসিক পরিণতি আশি মাস। ওই ছেলের পরিণতি ছিয়াশী মাস। আর ওর নব্বই মাস। কিন্তু বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই শুধু বুঝতে পারা যায়, শিশুটি বুদ্ধির দিক থেকে যথাযথ, না পিছিয়ে আছে, না উপরে। এই কাজটিই করলেন টারম্যান্। তিনি বললেন যে ছেলের মানসিক পরিণতি ৭২ মাস। তার বাস্তবিক বয়সও (Chronological Age) যদি ৭২ মাস হয় তবে বোঝা যাবে তার বুদ্ধি যথাযথ। যদি তার মানসিক বয়স হয় ৬৪, আর বাস্তবিক বয়স হয় ৭২ মাস, তা হ'লে বুঝতে হবে বুদ্ধির দিক থেকে সে কিছু হীন। আবার যদি তার মানসিক পরিণতি হয় ৮০ মাস, আর বাস্তবিক বয়স হয় ৭২ মাস, তবে সে বুদ্ধির দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। ছেলেটি কতটা নিকৃষ্ট বা কতটা উৎকৃষ্ট তা আঙ্কিক সহজ উপায়ে মাপবার উপায় করলেন ষ্টার্ণ ও টারম্যান্। এরই নাম বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. নির্ণয়।

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণের অভীক্ষার গুরুত্ব : বৈজ্ঞানিক ও পরিমাণগতভাবে বুদ্ধি পরিমাপের যে প্রণালী বিনে ও টারম্যান্ প্রচলন করলেন, তার গুরুত্ব সামান্য নয়। এটির প্রয়োগ সহজ এবং যদি স্কেলে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলি বাস্তবিক পক্ষেই সেই সেই বয়সের মানসিক পরিণতি অনুযায়ী হয়ে থাকে (valid) এবং উপযুক্ত যত্ন ও কিছুটা দীর্ঘকাল ধরে এ অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তার ফল মোটামুটি নির্ভরযোগ্য (reliable)। যাতে স্কেলের প্রশ্নগুলি সেই সেই বয়সের পক্ষে উপযোগী হয়, সেজন্যে বিনে বহু শত একই বয়সের শিশুদের প্রশ্ন করে করে এক একটি বয়সের স্কেল্ তৈরী করেছিলেন এবং স্কেল্ আরো অনেক নূতন শিশুর উপর প্রয়োগ করে তার সত্যতা যাচাই করেছিলেন। তিনি পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

অনেকবার এর সংশোধন করেন। এর পরে আরো বহু অভীক্ষক এ অভীক্ষাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে এদের প্রয়োগ করে এদের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

নানা সংশোধনের পরে এখন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির যে রূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা হয় যে কোন ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান্ এ অভীক্ষাগুলির দ্বারা মোটামুটিভাবে তা জানা যায়। অর্থাৎ এ অভীক্ষাগুলি নির্ভরযোগ্য এ কথা বলা যায়। সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে এবং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে এটা দেখা গেছে যে, এ সব অভীক্ষার ফলে যাদের বুদ্ধিমান্ বলে জানা গেছে, বাস্তব জীবনে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রেও তারা নিজেদের বুদ্ধিমান্ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অভীক্ষার ফলে যাদের সাধারণের চেয়ে হীনবুদ্ধি বলে জানা গেছে, তারা কর্মক্ষেত্রেও খুব সাফল্য অর্জন করেনি। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় এ অভীক্ষাগুলির উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তখন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে) নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীতে সহস্র সহস্র লোক বিভিন্ন কাজের জন্যে দ্রুত বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সে সময় এই বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির যেমন ব্যাপক প্রয়োজন ও বাস্তব মূল্য পরীক্ষা হয় তেমন নতুন নতুন অভীক্ষা এবং পুরাতন অভীক্ষাগুলির সংশোধন এবং বুদ্ধির পরিমাপ বিষয়ে নানা গবেষণাও এ সময় থেকে প্রবলতর উদ্যমে সুরু হয়। পূর্বের অভীক্ষাগুলি শিশুদের বুদ্ধিমাপের পক্ষেই (৫ থেকে ১১ বৎসর) নির্ভরযোগ্য ছিল। কিন্তু ক্রমেই অভীক্ষাগুলির উন্নতি সাধন জটিলতা বৃদ্ধি ও সংস্কার দ্বারা এখন প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষারও নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। ওয়েক্স্লার বেলেভিউ অভীক্ষা এদের মধ্যে অন্যতম। এখন নানা প্রয়োজন অনুযায়ী নানা প্রকার বুদ্ধির অভীক্ষা প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে যে সব শিশু হীনবুদ্ধি এবং যারা প্রতিভাসম্পন্ন যারা সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং যারা শারীরিক ও মানসিক নানা বিকারগ্রস্ত তাদের পৃথক পৃথক উপায়ে বুদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। রুচি ও প্রবণতা এবং সামর্থ্য পরিমাপেরও বহু নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিক্ষা ব্যাপারে ভাল মন্দ মাঝারী হিসাবে ছাত্র বাছাইর বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্তমানে শিক্ষার আদর্শ হোল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা

করা। বুদ্ধি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ দিক। কোন্ ছাত্র বুদ্ধিতে কতটা উঁচু বা নীচু, এটা জানা থাকলে শিক্ষণ বিষয়ে নির্দেশদান সহজ হয়।

কিন্তু এই বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা পোষণ করাও সঙ্গত নয়। বুদ্ধির একটি মাত্র অভীক্ষার প্রয়োগে ব্যক্তির বুদ্ধির প্রকৃত মাপ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বুদ্ধি বহুলাংশে জন্মগত ও নির্দিষ্ট হলেও সুশিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের উপর বুদ্ধির বিকাশ নির্ভরশীল এতেও কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি মোটামুটিভাবে ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা কতটা আছে তাই নির্দেশ করতে পারে মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কোন ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ কতটা হবে, তা নির্ভর করবে ব্যক্তির চারিত্রিক গুণ, সুযোগ, পরিবেশ ও শিক্ষার উপরে। বুদ্ধির মাপ দিয়ে ব্যক্তিত্বের একটা মোটামুটি খসড়া পাওয়া যায় সত্য কিন্তু এতে সমগ্র ব্যক্তিটির পরিচয় মেলে না।*

তা ছাড়া, যে পদ্ধতিতে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয়, তাতে এই আর একটা মস্ত অসুবিধা হচ্ছে যে দুটি ছেলের একই বুদ্ধ্যঙ্ক হলেও, দুজনে সমান বুদ্ধিমান্, এ কথা প্রমাণ হয় না। ধরা যাক্ দুটি ছেলেরই সমান বয়স। এবং দুজনেই পাঁচ বৎসরের উপযোগী সব প্রশ্নগুলিরই জবাব দিতে পেরেছে। কাজেই তাদের নিম্নতম বুদ্ধির সীমা পাঁচ বৎসর = ৬০ মাস। প্রথম ছেলেটি ছয় বৎসরের উপযোগী পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে এবং সাত বৎসরের উপযোগী একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে। কাজেই তার মানসিক পরিণতির (Mental age) মাপ হচ্ছে ৬০ মাস + ১০ মাস + ২ মাস = ৭২ মাস। ছেলেটির বাস্তবিক বয়স ৭২ মাস। কাজেই তার বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে $\frac{৭২}{৭২}$ × ১০০ = ১০০

দ্বিতীয় ছেলেটিরও নিম্নতম বুদ্ধির সীমা ৬০ মাস। সেও পাঁচ বৎসরের উপযোগী সব প্রশ্নগুলিরই ঠিক জবাব দিয়েছে। তার উপর সে ছয় বৎসরের উপযোগী দুটি প্রশ্ন, সাত বৎসরের উপযোগী একটি প্রশ্ন, আট বৎসরের উপযোগী দুটি প্রশ্ন, এমন কি, নয় বৎসরের উপযোগী একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে। কাজেই তার মানসিক পরিণতির মাপ হচ্ছে ৬০ + ৪ + ২ + ৪ + ২ = ৭২ মাস। এই ছেলেরও বাস্তবিক বয়স হচ্ছে ৭২ মাস। কাজেই এ ছেলেরও বুদ্ধ্যঙ্ক দাঁড়াচ্ছে $\frac{৭২}{৭২}$ × ১০০ = ১০০

কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্ক এক হলেও, দুটি ছেলের বুদ্ধির মাপ কি এক? স্পষ্টতঃই দেখা

* Murphy. A Briefor General Psychology. p. 371

যাচ্ছে এদের বুদ্ধির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। প্রথম ছেলেটির বুদ্ধির মধ্যে অনেকটা সমতা (uniformity) রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় ছেলের বুদ্ধিটা তুলনায় অসমান (uneven)। কাজেই সূচক দিয়ে একটি বিশেষ অভীক্ষানুযায়ী কোন ব্যক্তির সামর্থ্যের যোগফল এবং তার প্রকৃত বয়সের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা বোঝা গেলেও বুদ্ধির গুণগত বা প্রকৃতিগত মাপটা ঠিক পাওয়া যায় না। দুটি ছেলের সূচক সমান হলেও, একজনের বুদ্ধি কোন একদিকে বা বিষয়ে অন্যের তুলনায় বেশী এবং আরেকদিকে তা কম হতে পারে, কাজেই দুটি ছেলের বুদ্ধিতে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকতে পারে, যা বুদ্ধির অভীক্ষায় ধরা পড়ে না।[১]

নানা ধরণের বুদ্ধির অভীক্ষা—বিনে যখন বুদ্ধির অভীক্ষার প্রথম স্কেল্ তৈরী করেছিলেন তখন তিনি ৫ থেকে ১১ বৎসর বয়সের ছেলে মেয়েদের বুদ্ধির পরিমাপের কথাই চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু বিনের স্কেলের সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে এই স্কেল্ কি করে আরো ছোটদের বেলায় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপের উপযোগী করে প্রস্তুত করা যায় সে চিন্তাও অনেকে করতে থাকেন। কুহ্ল্ম্যান্ ২ বছরের থেকে ৫ বছরের শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের উপযোগী বিনে স্কেলের অনুরূপ স্কেল ১৯১২ সালে প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালে একবার এবং ১৯৩৯ সালে আর একবার এই স্কেলের সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয়। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগের বয়সের (Pre-school age) ছেলেদের বুদ্ধি মাপবার উপযোগী আরো অনেক অভীক্ষা রচিত হয়েছে। মেরিল্-পামার্ স্কেল্ আঠারো মাস বয়স থেকে সাড়ে পাঁচ বৎসর বয়সের উপযোগী ৯৩টি পরীক্ষা বিষয় (items) সম্বলিত একটি অভীক্ষা। অনুরূপ একটি অভীক্ষা হচ্ছে মিনেসোটা প্রি-স্কুল্-স্কেল্। এ স্কেলও আঠারো মাস বয়স থেকে পাঁচ বৎসরের ছেলে মেয়েদের উপযোগী এবং এ অভীক্ষার দুটি পৃথক রূপ (forms) আছে। গেসেল্, স্কিডিউল্ অব্ চাইল্ড্ ডেভেলপ্মেণ্ট্ এ বিষয়ে আরো অগ্রসর হয়েছে। এ অভীক্ষায় চার সপ্তাহের থেকে ছাপান্ন সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুদের পেশী ও অঙ্গ সঞ্চালন, দৈহিক পরিণতি ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে একেবারে ছোট শিশুদের বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। একেবারে ছোটদের ভাষার উপর অধিকার অসম্পূর্ণ, সুতরাং তাদের বুদ্ধির পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি খুব উপযোগী নয়। তাই অন্যভাবে তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করতে হয়। যেমন ক্যাল্ এ্যামস্টাইন্ শিশুর জোকা-

১ Murphy, A Briefer General Psychology. p. 371.

বুলারী টেষ্টে পঁয়তাল্লিশটি পরিচিত দ্রব্যের ছবি ছেলের সামনে খুলে ধরা হয়। তারপর শিশুকে দ্রব্যের নাম ক'রে দ্রব্যের ছবি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বলা হয়। তার সাফল্য বা অসাফল্য অনুযায়ী তার বুদ্ধির মাপ পাওয়া যায়।

গুডেনাকের মানুষের ছবি আঁকার পরীক্ষার মধ্য দিয়েও শিশুর বুদ্ধি বা মানসিক পরিণতির মোটামুটি পরিচয় মেলে।

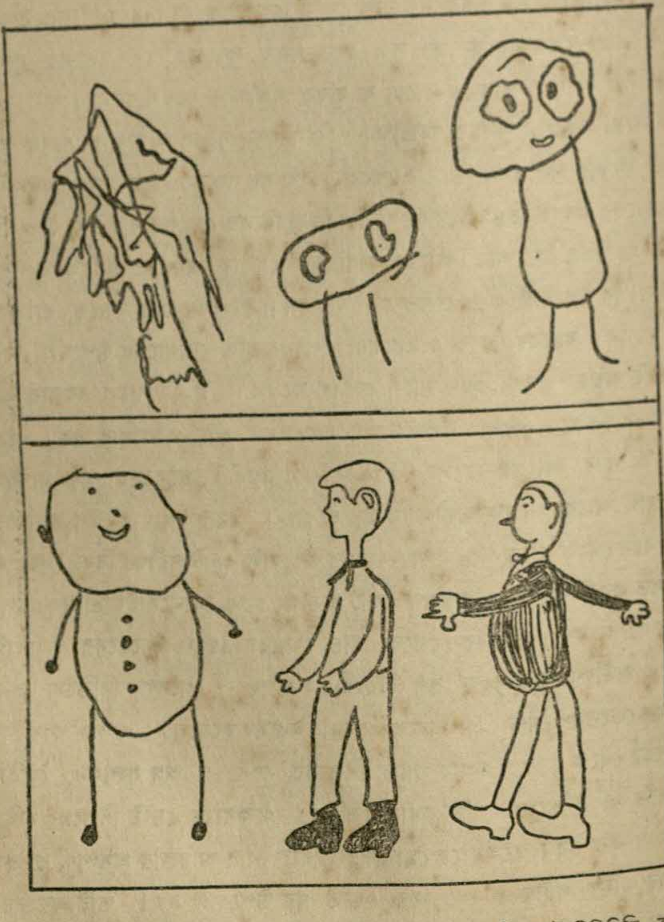

শিশুর মানুষ আঁকার মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধির পরিচয় পাই—প্রথম ছবি শুধুই হিজিবিজি, ক্রমেই শিশুর অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—মেজারমেন্ট অব ইন্‌টেলিজেন্স, বাই ড্রইংস্ হইতে

কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির মাপ—বুদ্ধি তো শুধু লেখা পড়াই নয়, কাজের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়। শিশুরা ভাষায় শুদ্ধভাবে ভাব প্রকাশ করে নিজেদের বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। অশিক্ষিত লোকেরাও তাই। এদের বুদ্ধির পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন ধরণের পার্ফরমেন্স্ টেষ্ট বিশেষ উপযোগী। গুডেনাফের মানুষ আঁকার মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা এই ধরণের একটি পরীক্ষা। পিণ্ট্নারের ফর্মবোর্ড টেষ্ট-এ একটি কাঠের বোর্ডে নানা আকারের ফোকর কাটা আছে। সেই কাঠের টুক্রোগুলি এলোমেলো ভাবে নীচে জড়ো করা আছে। ছেলেকে বলা হবে, সেই কাটা টুকরোগুলি যথাযথ ভাবে কাঠের বোর্ডে বসিয়ে দেওয়া। চটপট, ভুল না করে যে ছেলে যতটা তাড়াতাড়ি এই কাজটি করতে পারবে, সে ছেলে ততটা বুদ্ধিমান্, এটা বোঝা যাবে। এতে যে শুধু অঙ্গসঞ্চালনে তৎপরতাই বোঝা যাচ্ছে তা নয়। এ দিয়ে বিভিন্ন আকারের পার্থক্য, তাদের সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্যামিতিক দেশ বিষয়ক প্রত্যক্ষণের শক্তিরও পরিমাপ হচ্ছে। এবং এ প্রকার প্রত্যক্ষণের শক্তি বুদ্ধির একটি নির্ভুল পরিচায়ক।[৫]

এ জাতীয় পরীক্ষা বয়স অনুযায়ী ক্রমশঃ কঠিন হয়, বেশী জটিল হয় এবং শুধু আকার নয় দ্রব্যের বা তার অংশের ক্রিয়া (function) অনুযায়ী কোন ছবির টুকরোগুলিকে যথাযথ ভাবে বসিয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ-পূর্ণ ছবি গড়ে তুলতে অথবা অসম্পূর্ণ এক ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। এ জাতীয় একটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল পরীক্ষা হচ্ছে "Ship test"। এখানে একটি জাহাজের ছবি সমান করে ২৪টি চৌকোতে কেটে ২৪টি কিউব ব্লকের (ঘনত্ব সম্পন্ন ছয় তল বিশিষ্ট কাঠের চৌকা খণ্ড) গায়ে ওলট পালট করে আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। এবার শিশুকে বলা হল কাঠের চৌকোগুলোর তলগুলো যথাযথভাবে সাজিয়ে সম্পূর্ণ জাহাজের ছবিটি আবার গড়ে তোলা। জিগস্ পাজ্‌ল্ (zigsaw puzzle)-এও একই ভাবে একটা ছবির এলোমেলো ভাবে কাটা অংশগুলিকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটি পুনর্গঠন করতে বলা হয়। 'পোর্টিউস্ মেজ্ টেষ্ট'-এ গোল্‌ক ধাঁধাঁ এঁকে, কি করে ধাঁধাঁর বাইরের বেড়ান আঁকা বাঁকা অনেক বাধাপূর্ণ রাস্তা খুঁজে শেষ পর্যন্ত ধাঁধাঁর মধ্য স্থলে ইঁদুরকে গিয়ে ধরতে পারবে, পেন্সিল দিয়ে ধাঁধাঁর মধ্যে সেই নির্ভুল পথ রেখা এঁকে দেখাতে হয়। এই ধাঁধাঁর খেলার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষার অনেক রকমের আছে।

---

৫ Murphy. A Briefer General Psychology pp. 372-73.

কিন্তু এ জাতীয় সমস্ত পরীক্ষারই উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজে দক্ষতার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ। চার থেকে ষোল বৎসরের ছেলেদের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যে পিণ্টনার্-প্যাটারসন্ পনেরোটি ফর্মবোর্ড পরীক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে এই অভীক্ষারই একটি সংক্ষিপ্ততর রূপ আবিষ্কার করেন পিণ্টনার ও হিলড্রেথ্। আর্থার্ পয়েণ্ট্ স্কেল্ অব্ পারফরমেন্স্ টেষ্টে ফর্মবোর্ড ছাড়াও, কাটা ছবি সম্পূর্ণ করা, ব্লক ডিজাইন্ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কলকজা বা

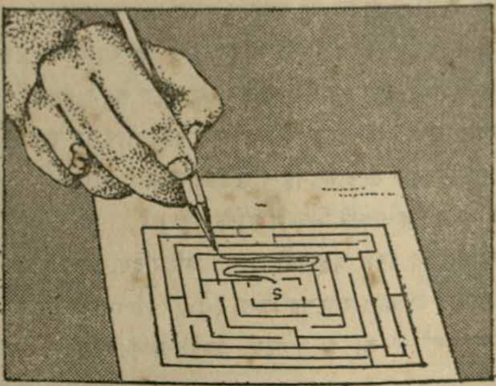

The Kohs Block Design Test as used in the Wechsler-Bellevue Scales. Munn. Psychology. p. 61

জিনিষের বিচ্ছিন্ন অংশ আবার জুড়ে সম্পূর্ণ করা ইত্যাদিও বুদ্ধি পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। কর্ণেল-কক্স পারফরমেন্স টেষ্ট এবং লেইটার ইনটারন্যাস্নাল্ পারফরমেন্স স্কেল ও একই জাতীয় পরিমাপের সফল বুদ্ধি পরীক্ষা। ৬

ওয়েক্স্লার বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স টেষ্ট্ প্রাপ্ত-বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষার উপযোগী একটি আধুনিক সফল অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় বিনের অভীক্ষার অনুরূপ প্রশ্নোত্তর (verbal tests) যেমন আছে, তেমনি কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষাও আছে। এই অভীক্ষায় ব্যক্তির বুদ্ধির মাপ Percentile

৬ Munn. *Psychology*. p. 61.

(শতকরা কত দশকের উপরে তার স্থান) দিয়ে উল্লেখ করা হয়, I. Q. দিয়ে নয়।[৭]

কাজের ভিতর দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা (performance tests) প্রশ্নোত্তর ও ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অভীক্ষার (verbal tests) বিকল্প নয়,—

মেয়েটি তার সামনে আঁকা ছক অনুযায়ী ব্লকগুলি সাজাচ্ছে। এটি কিছু কঠিন পরীক্ষা এবং উচ্চতর বুদ্ধির পরিমাপক—Munn. Psychology p. 41 ছবি অনুসরণে
Kohs Block Design Test as used in the Wechsler Scales

পরিপূরক। বুদ্ধি একটি সরল অবিভাজ্য শক্তি নয়,—তা বহু বিভিন্ন দিকে সামর্থ্য ও নিপুণতার সমন্বয়। সুতরাং কেবল মাত্র এক জাতীয় অভীক্ষা দ্বারাই ব্যক্তির বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত অভীক্ষাতেই নিতান্ত সোজা থেকে সুরু করে ক্রমশঃ কঠিন বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের অভীক্ষা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ দ্বারাই নির্ভুল ভাবে জানতে পারা যেতে পারে কোন এক ব্যক্তি ঠিক কতটা বুদ্ধির অধিকারী।[৮]

৭ Murphy. Introduction to General Psychology p. 335.
৮ Gates Jersild & others, Educational Psychology, p. 217

এটাও অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, সমস্ত অভীক্ষার সাফল্য অভিজ্ঞ, অভীক্ষা ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন, সৎ পরীক্ষকদের উপযুক্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির অভীক্ষা আনাড়ীর ব্যাপার নয় এবং এখানে আন্দাজের (hunches) স্থান সামান্য। তবে বুদ্ধি-দীপ্ত স্বজ্ঞা (intuition) অনেক সময় জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ব্যবহার গতানুগতিক ও যান্ত্রিক ভাবে করে', তা দ্বারা খুব সুফল লাভের আশা অতিশয় সামান্য। [৯]

দলগত পরীক্ষা (Group tests)—ব্যক্তিগত অভীক্ষাগুলি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। এ অভীক্ষাগুলির প্রয়োগে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষকের পক্ষে বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন। যেখানে এক সঙ্গে বহু মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে বাছাই করা দরকার, সেখানে বিশেষ ধরণের ব্যক্তিগত অভীক্ষাগুলি অনুপযুক্ত। বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় বহু লক্ষ মানুষ যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করবার জরুরী প্রয়োজনে আর্মি আল্‌ফা টেষ্ট প্রবর্তিত হয়। এটি ভাষাজ্ঞানভিত্তিক অভীক্ষা। এতে কিছু প্রশ্ন ছেপে এবং উত্তরের জন্য সাদা জায়গা রেখে ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে এক সঙ্গে অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাদের লিখিত উত্তরগুলি সংগ্রহ করে কতগুলি সহজ নিয়ম অনুসরণ করে, অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ অভীক্ষকও নম্বর দিয়ে পরীক্ষিত ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারতেন। যাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব (অশিক্ষিত বা বিদেশী ব্যক্তি) তাদের জন্য আর্মি বিটা টেষ্টের প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অভীক্ষাগুলির অনেক উন্নতি সাধন করে আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেশ্যন্ টেষ্ট (A G C T)-এর প্রচলন হয়। এ টেষ্টের মধ্যে ভাষাজ্ঞান ও কাজে নিপুণতা সম্মিলিতভাবে এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই বুদ্ধির বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। দুইয়ের বেলাতেই বিভিন্নধরণের প্রশ্ন বা কাজের মধ্যদিয়েই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা হয়। এই বুদ্ধির অভীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে অ্যামেরিকার সেনা-বিভাগের প্রত্যেকটি অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই অভীক্ষা অনুযায়ী বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়েছে ; ১৯৪৫ সালে এই অভীক্ষার একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে এই অভীক্ষার মূল্য বিচার ব্যবস্থার এমন উন্নতি

---

৯ Gates, Jersild & others. Educational Psychology. p. 236

সাধিত হয়েছে যে বৈদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত ব্যক্তির উত্তর বা কাজের নম্বর লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।[১০] দলগত বুদ্ধি পরীক্ষার মধ্যে Otis Group test, Terman group test of mental abilities, National Intelligence test, Haggerty Delta II ইত্যাদি অভীক্ষাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

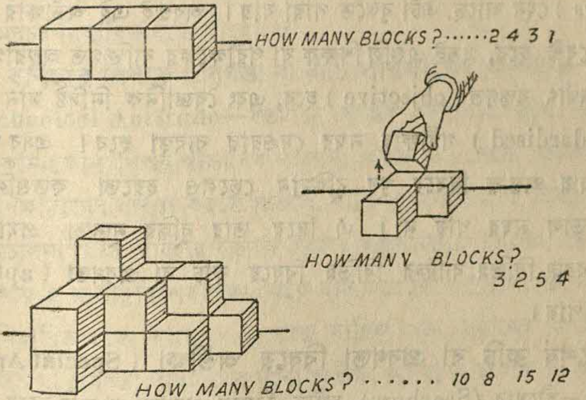

AGCT অভীক্ষার একটি item এর অংশ। ছবি দেখে বলতে হবে ক'টি ব্লক আছে

বিভিন্ন শিক্ষিতব্য বিষয়ে সামর্থ্য বা পারদর্শিতার পরিমাপ (Achievement tests)—

এই অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন পঠিতব্য বিষয় বা কাজে কোন ব্যক্তির সামর্থ্য বা যোগ্যতা কতটা, তা পরিমাপ করবার উপায়। এগুলিকে ঠিক বুদ্ধির পরীক্ষা বলা যায় না, যদিও সাধারণ বুদ্ধির মাপের ফলের সঙ্গে এই পরীক্ষার ফলের মাপের ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ (positive correlation) আছে। এই অভীক্ষাগুলি বিশেষ বিশেষ দিকে ব্যক্তির পারদর্শিতা পরীক্ষা করে। অর্থাৎ এদের মধ্য দিয়ে স্পীয়ারম্যান্ যাকে special intelligence বা s বলেছেন, তার মাপ পাওয়া যায়। অবশ্য এটাও দেখা যায় যে যারা বিদ্যালয়ে পঠিতব্য সব বিষয়ে ভাল নম্বর পায়, তাদের বুদ্ধ্যঙ্কও বেশ উঁচু। অর্থাৎ স্পীয়ারম্যান্ যাকে general intelligence বা g বলেছেন, তা যে বিভিন্ন বিষয়গুলিতে পারদর্শিতার মধ্য দিয়ে সাধারণ সূত্র হিসাবে ক্রিয়া করে, তার প্রমাণ মিলে। এটাও অনেক সময়

১০ Munn. Psychology. pp. 74-75

দেখা যায় কতগুলি বিষয়ে ব্যক্তির উৎকর্ষ লক্ষণীয় হলেও, সে অন্য বিষয়ে তত পারদর্শী নয়—যেমন যে ছেলে অংকে ভাল, সে বিজ্ঞান বিষয়গুলিতেও ভাল, কিন্তু ভাষা বা ইতিহাসে সে তেমন ভাল নম্বর পায় না। আবার অন্য কিছু ছেলে আছে যারা সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানে ভাল নম্বর পায়, এবং তারা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানেও ভাল। এর থেকে বুদ্ধির কয়েকটি জোট বাঁধা (group factors) যেন আছে, এটা বুঝতে পারা যায়। অবশ্যই এই অভীক্ষার মূল্যগুলি ততই বেশী হবে, যতই এগুলি শিক্ষক বা পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ-মুক্ত অর্থাৎ বস্তুগত (objective) হবে, এবং বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী (standardised) পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এসব অভীক্ষায় দেখা যায় অন্যান্য বিষয়ে খুব বুদ্ধিমান ছেলেও হয়তো কতগুলি বিষয়ে মোটে ভাল নম্বর পায় না। এ দিয়ে তার বুদ্ধির ন্যূনতা প্রমাণিত হয় না। বরঞ্চ বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে রুচি বা প্রবণতা (aptitude) প্রকাশ পায়।

বিশেষ রুচি বা প্রবণতা বিষয়ে অভীক্ষা (Special Aptitude tests)—সীসোর (Seashore) সঙ্গীত বিষয়ে প্রবণতা বা রুচি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই প্রবণতা একটি সরল অবিভাজ্য শক্তি নয়। এর মধ্যে সুর, তাল, লয় ও ছন্দ বোধ ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান উপাদান আছে। এর মধ্যে কোন একটি উপাদানের অভাব থাকলে, অন্য সব উপাদান থাকা সত্ত্বেও এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করলেও ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে না। এই রুচি বা প্রবণতা মূলতঃ জন্মগত, কিন্তু শিক্ষা, সুপরিচালনা ও অধ্যবসায় দ্বারা এই শক্তির উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, কিন্তু এই শক্তি সৃষ্টি করা যায় না।

সী-সোরে-র সঙ্গীতে রুচি বিষয়ক অভীক্ষা—তিনি musical talent পরিমাপের উপযোগী কতগুলি অভীক্ষা (tests) তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় আবিষ্কার করেছেন। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা এ অভীক্ষাগুলির একাধিকবার সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে দুই পর্যায়ে এই অভীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পর্যায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণভাবে সঙ্গীতে প্রবণতা পরিমাণের জন্য, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অভীক্ষা যাঁরা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র বা যারা শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ

করেছেন তাঁদের জন্য।[১১] এ অভীক্ষা গুলির দ্বারা কারা সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত, তা যেমন বাছাই করা যায়, তেমনি শিক্ষা গ্রহণ দ্বারা কে কতটা উপকৃত হবে সে সম্ভাবনারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বিশেষ করে, সী-সোরের অভীক্ষাগুলি সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে কারা একেবারেই অনুপযোগী তা বাছাই করার কাজে যথেষ্ট সহায়ক। এ দ্বারা বহু অনাবশ্যক শক্তির অপচয় নিবারিত হতে পারে।[১২]

যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ে প্রবণতা বা রুচি পরিমাপের অভীক্ষা—Tests for Mechanical Aptitude—বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যন্ত্রচালনা বিষয়ে কোন কোন শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তা জেনে, তাদের সেই বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারলে, ব্যক্তি ও সমাজ দুইই উপকৃত হয়। যারা যন্ত্রচালনা ও যন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অনুপযোগী, তাদের গোড়াতেই বাছাই করে এ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারলে, বহু অনাবশ্যক অপচয় নিবারিত হতে পারে। এ যন্ত্রে যান্ত্রিক সভ্য সমাজের প্রয়োজনেই যান্ত্রিক রুচি বা প্রবণতা পরিমাপের নানা অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেও দেখা গেছে সঙ্গীতে রুচির মত এই যান্ত্রিক প্রবণতাও মূলতঃ জন্মগত এবং এটি একটি একক বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়—বরঞ্চ কতগুলি উপাদান এতে যেন জোট বেঁধে আছে। দেশগত বিভিন্ন আকার ও সম্বন্ধ বিষয়ে সহজবোধ (natural aptitude to understand different spatial forms and relations), যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া বুঝবার ক্ষমতা, পেশী, বিশেষতঃ অঙ্গুলির সূক্ষ্ম সঞ্চালন বিষয়ে সহজ কুশলতা, এরকম কতগুলি গুণ যার মধ্যে না থাকে সে কখনও উৎকৃষ্ট যন্ত্রবিদ্ হতে পারে না। এ বিষয়ে বহু অভীক্ষা গঠিত এবং পরীক্ষিত হয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আমেরিকার নিম্নলিখিত অভীক্ষা কয়টি সুপরিচিত—ম্যাক্‌কোয়ারী টেষ্ট অব্ মেকানিক্যাল্ এবিলিটি। বেনেট্‌ টেষ্ট অব্ মেকানিক্যাল্ কম্প্রিহেন্‌শন, ডেট্রয়েট্ মেকানিক্যাল্ এ্যাপ্‌টিচ্যুড্ এগজামিনেশন্, ও'রুরকে মেকানিক্যাল্ এ্যাপ্‌টিচ্যুড্,

---

[১১] Saetvit, Lewis and Seashore—Revision of the Seashore Measures of Musical Talents. University of Iowa Studies. 1940, No, 65

[১২] Gates, Jersild & others, Educational Psychology. pp. 261-62

টেষ্ট, মিনেসোটা টেষ্ট ইত্যাদি। মিনেসোটা টেষ্টে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা থাকে—

(১) কাগজ দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকারের সাদৃশ্য ও প্রভেদ বোধের ক্ষমতা—Paper formboard tests

(২) বিভিন্ন দেশ-বিষয়ক জ্যামিতিক আকার ও সম্বন্ধ-বিষয়ক বোধ—Spatial relations tests

(৩) যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পুনরায় একত্র করে যন্ত্রটির পুনর্গঠন বিষয়ক পরীক্ষা—Assembly tests

(৪) আগ্রহ-অনাগ্রহ বিশ্লেষণের পরীক্ষা—Interest analysis test

(৫) বিভিন্ন আকারের ব্লক এক বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে সব চেয়ে কম জায়গায় গুছিয়ে নেওয়া—Packing blocks test.

(৬) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কার্ড বা ছবি আলাদা আলাদা করে বিষয় বা স্থান অনুযায়ী গুছিয়ে রাখা—Card sorting test.

শেষ দুটি পরীক্ষায় দ্রুত নির্ভুল পেশী ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের কুশলতার পরিমাপ করা যায়। ১৩

শিল্পকর্ম ও রুচিবোধ সম্পর্কে প্রবণতার অভীক্ষা—Tests for Artistic Aptitude—কোন কোন ছেলেমেয়ের অল্প বয়স থেকে ছবি আঁকা, পুতুল গড়া, সেলাই ইত্যাদির দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের এই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা দিলে, এরা এ সব বিষয়ে ভবিষ্যতে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সুতরাং মনোবিজ্ঞানীরা এ জাতীয় প্রবণতার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে নানা অভীক্ষা আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি মাত্র পরীক্ষার নাম কচ্ছি—ম্যাক্এ্যাডোরি আর্ট টেষ্ট, লেবেরেঞ্জ টেষ্টস্ অব ফাণ্ডামেণ্টাল্ এবিলিটিজ অব ভিসুয়াল আর্ট, এবং মেয়ার-সীসোর আর্ট যাজমেণ্ট টেষ্ট। সর্বশেষ অভীক্ষায় ১২৫ জোড়া শিল্পকর্মের নিদর্শন ছাত্রের কাছে দেওয়া হয়। এর প্রত্যেকটিতে একটি শিল্পকর্ম কোন বিখ্যাত শিল্পীর কাজ। পরীক্ষার্থী ছাত্রকে এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি বেছে বের করতে বলা হয়। এতে তাদের শিল্প রুচির পরিচয় মিলে। ম্যাক্এ্যাডোরী

১৩ Manual of Directions—Minnesota Mechanical Ability Tests. University of Minnesota Press. 1930

অভীক্ষায়ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের উৎকর্ষ ছাত্র কতটা বুঝতে পারে তার পরিমাপ হয়। কিন্তু এখানেও দেখা যায় রুচিবোধ ও শিল্পপ্রবণতা একটি পৃথক অবিচ্ছিন্ন বিশেষ ক্ষমতা (special ability) নয়। এই ক্ষমতা অনেকগুলি নিপুণতা বা প্রবণতার জোট বাঁধা অবস্থা (group factors)। এ অভীক্ষা গুলির প্রত্যেকটিতেই শিল্পকর্মের এক একটি দিকে জোর দেওয়া হয়, সেই জন্যেই এখন পর্যন্ত সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোন অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয় নি। [১৪]

দৈহিক শক্তি পরিমাপের অভীক্ষা—পাশ্চাত্য দেশে খেলাধুলা, স্পোর্টস্, ও এ্যাথ্‌লেটিক্‌স-এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সে জন্যে দৈহিক শক্তি ও স্বচ্ছন্দ (body balance) বিষয়ক বহু অভীক্ষা আছে। এ সব অভীক্ষায় পেশীর শক্তি, দেহসঞ্চালনে সুসম ছন্দ, শ্বাসযন্ত্রের শক্তি (lung capacity, দম) মুষ্টির দৃঢ়তা (strength of grip), পৃষ্ঠদেশের বল এবং দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে নৈপুণ্য বিবেচনা করে, দৈহিক বলের পরিমাপ করা হয়। রোজার্স ফিজিক্যাল্ কেপাসিটি টেষ্টস্ এবং ব্রেস্ মোটর্ এবিলিটি টেষ্টস্ এ অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রধান। বুদ্ধির অভীক্ষার মত এক্ষেত্রেও দেখা যায় কেবল একটিমাত্র পরীক্ষাদ্বারা পরিমাপ সন্তোষজনক ভাবে করা যায় না। দৈহিক বল ও বুদ্ধির মধ্যে খুব নিকট ইতিবাচক মিল (high positive correlation) না থাকলেও, তারা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এমনও নয়।

বিভিন্ন ব্যবসায়ে বা জীবিকা বিষয়ক কর্মে প্রবণতা বা কুশলতা পরিমাপের অভীক্ষা—বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসায় বা কাজকর্ম বিষয়ে কারা উপযুক্ত, এ বিষয়ে পরীক্ষার জন্যও নানা ট্রেড্ টেষ্ট্ আছে এবং আরো বহুতর টেষ্ট্ আছে। এর মধ্যে নিচে বিশেষ বিশেষ কাজে কে কেমন উপযোগী তা পরীক্ষার জন্যে কয়েকটি মাত্র অভীক্ষার নাম দেওয়া হ'ল।

এ্যান্ড্র'র মিনেসোটা ক্লেরিক্যাল্ টেষ্ট
মস্ ও হাণ্টের এ্যাপ্‌টিচ্যুড্ টেষ্ট ফর্ নার্সিং
মসের স্কল্যাস্টিক্ এ্যাপ্‌টিচ্যুড্ টেষ্ট ফর্ মেডিক্যাল্ ষ্টুডেণ্টস্
ফেরসন্ ও ষ্টডার্ড ল্য এ্যাপটিচ্যুড্ এগ্‌জামিনেশন্

১৪ Gates, Jersild & Others. Educational Psychology. p. 263

কক্‌স্ ও অরলিয়ানস্ প্রগ্‌নোসিস্ টেষ্ট অব টিচীং এবিলিটি

যাইভ্-ষ্ট্যান্‌ফোর্ড সায়েন্টিফিক্ এ্যাপ্‌টিট্যুড্ টেষ্ট

মস্, উইলি, লোম্যান্ ও মিড্‌ল্‌টনের জর্জওয়াশিংটন্ টেষ্ট অব্ এবিলিটি টু সেল্

টার্স শর্টহ্যাণ্ড এ্যাপটিট্যুড্ টেষ্ট

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে অভীক্ষা—Prognosis Tests—সমস্ত বুদ্ধির অভীক্ষারই উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বর্তমান শক্তি বা নিপুণতা পরীক্ষা নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও পরীক্ষা। সব পিতা মাতাই এটা জানতে চান তাদের সন্তানেরা কোন্ জীবিকা বা কাজ নির্বাচন করলে তাদের সব চেয়ে বেশী সফল হওয়ার সম্ভাবনা। এটা জানতে পারলে বহু অপচয় ও মনস্তাপ নিবারিত হ'তে পারে। এজন্যে ছাত্রদের আগ্রহ কার কোন দিকে, সেটা আগে থাকতেই জানতে পারলে ভাল হয়। এ জন্যে অনেক অভীক্ষা নির্মিত হয়েছে। এ অভীক্ষা গুলিতে ছাত্রদের আগ্রহের গতি কোন দিকে তা জানা যায়। কিন্তু কার কোন বিশেষ দিকে শক্তি সামর্থ্য (special abilities) আছে তার কোন পরিমাপ এই অভীক্ষাগুলি দিয়ে হয় না। ব্যাপক গবেষণার ফলে কয়েকটি সফল অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান ক'টি হচ্ছে

ষ্ট্রং-এর ভোকেশ্যনাল্ ইন্‌টারেষ্ট ব্ল্যাঙ্ক্

ক্লীটন্-এর ভোকেশ্যনাল্ ইন্‌টারেষ্ট ইন্‌ভেন্‌টোরী

লী এবং থর্প-এর অক্যুপেশ্যনাল্ পার্সোনালিটি ইন্‌ভেন্‌টোরী

ব্রেইনার্ড-এর স্পেসিফিক্ ইন্‌ভেন্‌টোরী

ডজ-এর অকুপেশ্যনাল পার্সোনালিটি ইন্‌ভেন্‌টোরী

ওয়ালার এবং প্রেসীর অকুপেশ্যনাল্ ওরিয়েণ্টেশ্যন্ ইন্‌কোয়ারী

অরলিএন্স এ্যাল্‌জেব্‌রা প্রোগ্‌নোসিস্ টেষ্ট একটি সফল সুপরিচিত অভীক্ষা; এর অন্তর্গত রয়েছে বারোটি উপ-অভীক্ষা। গোড়াতে গণিতের মৌলিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা সুরু হয়। পরে বীজগণিতের মূল বিষয় নিয়ে ছোট ছোট কয়েকটি পাঠের পর প্রত্যেকটি বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রের বীজ-গণিতে ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সাফল্য সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভুল ধারণা করা যায়। সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এ জাতীয় অভীক্ষাগুলির সাফল্য কেবলমাত্র কোন্ ছাত্রের কোন্ জীবিকা বা কাজের দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে তা জানলেই

চলে না, বিনে জাতীয় বুদ্ধি পরীক্ষা বা অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষারও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।[১৫]

প্রস্তুতি বিষয় অভীক্ষা—Readiness test : আধুনিক মনোবিদেরা বলেন যে কোন্ শিক্ষা শিশুর গ্রহণের উপযোগী তা নির্ভর করে তার দৈহিক মানসিক পরিণতির উপর। বিশেষ বিশেষ পরিণতির স্তরে শিশু বিশেষ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী। সেই প্রস্তুতির স্তরে শিশু না পৌছলে, সেই শিক্ষা তাকে দিয়ে কোন লাভ হয় না কারণ, তা সে গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই অভীক্ষা গুলি কল্পিত হয়েছে, যার দ্বারা শিশুর বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের প্রস্তুতি পরিমাপ করা যায়। এরকম কতগুলি অভীক্ষার নাম দেওয়া হ'ল। এর মধ্যে বই পড়তে পারা বিষয়ে প্রস্তুতির (Reading Readiness) অভীক্ষাগুলি সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছে। গেট্স্-এর রীডিং রেডিনেস্ টেষ্ট্ শিশুরা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সময়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত পাঁচটি পরীক্ষা আছে।

(১) পিক্চার-ডাইরেক্স্যন্ টেষ্ট—শিশুর সামনে কতগুলি পরিচিত ছবি দিয়ে সেই ছবিগুলি চিহ্নিত করা বিষয়ে কতগুলি সহজ নির্দেশ দেওয়া হয় যেমন, মেয়েটির ডান কানের ফুলটি দেখাও, ব্যাটের হাতল কোথায়? ইত্যাদি। এ পরীক্ষা দ্বারা শিশু ছবিগুলির মানে কতটা বুঝতে পারে, এ যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সে নির্দেশ পালন বিষয়ে সে কতটা প্রস্তুত হয়েছে।

(২) ওয়ার্ড ম্যাচিং টেষ্ট—একটা পাতায় কতগুলি শব্দ পৃথক পৃথক ছাপা আছে। শিশু সেই শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি এক ধরণের সেগুলি দেখাবে—যেমন, cat bat rat ইত্যাদি।

(৩) ওয়ার্ড কার্ড পারসেপ্শন্ টেষ্ট—এক পৃষ্ঠায় ছোট অক্ষরে কতগুলি সহজ শব্দ ছাপা আছে। আর একটি কার্ডে সেই শব্দ গুলিই বড় অক্ষরে ভিন্ন ভাবে ছাপানো আছে। প্রথম কার্ডটি পাঁচ সেকেণ্ড দেখার পর দ্বিতীয় কার্ডটি শিশুকে দেওয়া হয় এবং দেখা হয় সে প্রথম কার্ডের শব্দগুলি চিনে বার করতে পারে কিনা।

(৪) রাইমিং টেষ্ট—এতে পরীক্ষা করা হয় যে শব্দগুলির উচ্চারণ একই ধরণের শিশু তাদের মধ্যে মিলটা ধরতে পারে কিনা।

১৫ Gates, Jersiid & Others—Educational Psychology. p. 266

(৫) লেটার এ্যাণ্ড নাম্বার রীডিং টেষ্ট—এর দ্বারা একেবারে ছোটদের অক্ষর পরিচয় কতটা হয়েছে এবং ১০ এর নীচে সংখ্যা তারা কতটা চিনতে পারে তা পরীক্ষা করা হয়।

এ অভীক্ষাগুলির সাফল্য এ থেকেই বোঝা যায় যে ভর্তির সময় প্রথম পরীক্ষায় কোন শিশু যে নম্বর পায় এবং বছরের মাঝামাঝি আবার সেই পরীক্ষা করে সে যে নম্বর পায়, এই দুয়ের মধ্যে ইতিবাচক মিলের পরিমাণ (positive correlation) ৭৪ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ এ পরীক্ষা দ্বারা শিশুর বই পড়া-রূপ ক্রিয়ায় সে ভবিষ্যৎ কতটা সফল হবে, তার মোটামুটি বেশ একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

অভীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ মান নির্ণয়—Standardization of Tests— বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং নানা রকম বুদ্ধি বিচারের কথা বলা হ'ল। কিন্তু যে মাপকাঠি দিয়ে বুদ্ধি মাপা হবে—সেটা নির্ভুল হওয়া চাই। তা না হ'লে সমস্ত বিচারটাই ব্যর্থ হবে। কাজেই বিভিন্ন টেষ্টগুলোও পুনঃ পুনঃ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে মাপকাঠিতে কোন গোলযোগ নেই। কোন মাপকাঠি গৃহীত হওয়ার আগে নীচের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে:

১। **সত্যতা—Validity—**অর্থাৎ মাপকাঠিটি যার মাপকাঠি বলে পরিচিত, সেই জিনিষই সত্যি মাপছে কিনা সেটা দেখতে হবে। যেটা বুদ্ধির মাপকাঠি বলে দাবী কচ্ছে, সেটা সত্যই বুদ্ধিই মাপছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। অভীক্ষার সত্যতা দিয়ে বোঝায়, যে জিনিষটি সেই অভীক্ষা পরিমাপ করতে চাচ্ছে, তা সত্যি সে অভীক্ষায় মাপা হচ্ছে। যদি অভীক্ষাটা হয় বুদ্ধির, তবে দেখতে হবে তা' বুদ্ধিকেই সত্যি মাপছে। বুদ্ধি বিষয়ে যে প্রশ্ন করা হবে বা যে কাজ দেওয়া হবে, তাতে বুদ্ধিরই পরীক্ষা হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক মত হওয়া চাই। একটা বুদ্ধির অভীক্ষায় ছাত্রের বুদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে যদি বিচার থাকে, তবে সে অভীক্ষা সত্য বলে গৃহীত হবে তখনই, যখন দেখা যাবে ভবিষ্যতে সত্যিই ছাত্রটির বুদ্ধির সেই রকম পরিণতিই ঘটেছে।

২। **নির্ভরযোগ্যতা—Reliability—**মাপকাঠির মাপটা নির্ভুল হওয়া চাই। যে মাপটা নির্ভুল তার উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি। নিম্নলিখিতভাবে অভীক্ষার নির্ভুলতা বিচার করা হয়। "একই অভীক্ষা অল্পদিন

বাদে বাদে অন্ততঃ দুবার, একই ছাত্রের ওপর ব্যবহার করে, বিচারের ফল যদি একই রকম হয় (high co-efficient of correlation) তবে পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। অথবা একই পরীক্ষার দুটি অংশ, যেমন টারম্যান্-মেরিল্ সংশোধিত টেষ্টের এল (L) আর এম (M) ফর্ম, একই দল ছাত্রের উপর ব্যবহার করে যদি একই রকম ফল হয়, তবে অভীক্ষাটি ভাল। যদি দুই অভীক্ষার ফলের মিলের পরিমাণ (co-efficient of correlation) ০.৯০র নীচে হয়, তবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত।" গ্যারেট্ ও টমসন্ এইভাবে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের কথা বলেছেন। স্পীয়ারম্যান্ খুঁটিনাটি বহু হিসাব-সম্বলিত অন্য পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

৩। **বস্তুনিষ্ঠা বা নৈর্ব্যক্তিকতা—Objectivity**—ব্যক্তিগত মতামত বা সংস্কার যাতে মাপকাঠিকে বিকৃত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। "বস্তুনিষ্ঠা বলতে আমরা বুঝি পরীক্ষাটি যে পরিমাণে ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা অ-প্রভাবান্বিত।" আমেরিকার বুদ্ধির পরীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় নিগ্রোদের গড় বুদ্ধির পরিমাণ (Average Intelligence Quotient) শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম। পরীক্ষকদের জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি যদি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে, পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয় নি।

৪। **ব্যবহারের সহজতা**—Ease of administration and scoring—টেষ্ট এমন হওয়া চাই যাতে এটা পরীক্ষার কাজে সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নম্বর দেওয়ার ব্যাপারটা খুব বেশী গোলমেলে হ'লে সেটা অভীক্ষার ত্রুটি বলেই বিবেচিত হবে।

৫। **শ্রেণী বিভাগের উপযুক্ততা**—Satisfactoriness of the norms—যে শ্রেণীর বা বয়সের বা দলের মাপ হিসাবে অভীক্ষাটি ব্যবহার করা হবে—ঠিক ঠিক তার উপযোগী হওয়া চাই। যেমন, ধরা যাক্ সাত বছরের ছেলেদের উপযুক্ত একটা টেষ্ট (to determine the Mental Age of 7 yrs. old children) তৈরী করতে হবে। যদি দেখা গেল শতকরা ৭০ জনই সে পরীক্ষায় ফেল করছে বা শতকরা ৯০ জনই সহজে পাশ করে যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই বোঝা যাবে—যে মাপটা সে বয়সের ঠিক উপযুক্ত হয় নি। এটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অথচ এটি না হলে টেষ্টটা মূল্যহীন হয়ে যাবে। সাত

বছর বয়সের জন্য টেষ্ট তৈরী করতে হ'লে অ-বাছাই করা নানা জাতের ৭ বছরের অনেক ছেলে নিয়ে একটা গড় বুদ্ধির পরিমাণ (the Median or Average score) স্থির করতে হবে। এরকম ৫০০ ছেলে পরীক্ষা করে গড় বুদ্ধির অঙ্ক (Median Score) স্থির করা গেল। কিন্তু আরও ৩০০ ছেলে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় গড় বুদ্ধির অঙ্কের তফাত হচ্ছে, তাহ'লে বুঝতে হবে—পরীক্ষাটা তখনও সন্তোষজনক (satisfactory) নয়। এ রকম বারে বারে পরীক্ষা করে যে পর্যন্ত না একটা নির্দিষ্ট (constant) গড়-বুদ্ধির অঙ্ক পাওয়া যায়, সে পর্যন্ত অভীক্ষাটা গ্রহণযোগ্য হবে না।

একটা দলের উপযোগী টেষ্ট তৈরী করবার সময় দেখতে হবে তার প্রশ্নগুলো কোন একটা দলের অনুকূল না হয়। সিনেমা বা খেলাধূলা সংক্রান্ত প্রশ্ন (যাতে শহুরে ছেলেদের আগ্রহ বেশী) যদি একটা টেষ্টে প্রাধান্য লাভ করে, তাহ'লে সেই টেষ্টে শহুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান বলে প্রমাণিত হবে ; কিন্তু তাহ'লে টেষ্টটা একপেশে হোল, এটা উচিত (fair) হোল না, এবং এর ফলটা বৈজ্ঞানিক ভাবে গৃহীত হ'তে পারে না। তাই টেষ্টগুলো যাতে সর্বজনগ্রহণযোগ্য (standardised) হয়, সে জন্যে কতটা পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দৃষ্টি থাকা দরকার, তা নীচে উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে। কথাগুলো টারম্যান্-মেরিল্ সংস্করণে কি করে মান নির্দিষ্ট করা হোল, সে সম্পর্কে। "এই সংশোধনে (বিনে'র জীবিতকালে তিনবার তিনি তাঁর স্কেল সংশোধন করেন) পরীক্ষকেরা প্রাক্-বিদ্যালয় বয়স থেকে, পরিণত যৌবন বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন নানা প্রকারের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমস্যা (test items) সংগ্রহ করেন, যার সংখ্যা কয়েক সহস্র। এগুলির মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করা হোল, সেগুলি প্রথমতঃ ১,৫০০ ছাত্রদের উপর পরীক্ষা করা হোল। এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সে বয়সের ছেলেদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে অক্ষম হোল, সেগুলি ছাটাই করা হোল। কারণ কোন পরীক্ষা সফল হতে গেলে, এবং বুদ্ধির নির্ভুল মাপ পেতে গেলে যাদের পরীক্ষা করা হবে, তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কোন উত্তরের নম্বর দেওয়ার বেলায় যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বর বিভিন্ন হোল, তা হ'লে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির সংশোধন করা হোল। একটা প্রশ্ন যদি এমন হোল, যে ৭ বছরের অল্প কয়টি ছাত্র মাত্র তার উত্তর দিতে পারল, আট বছরের প্রায় অর্ধেক ছেলে তার উত্তর দিতে পারল, এবং নয়

বছরের প্রায় সব ছেলেই তার উত্তর দিতে পারল, তাহলে বোঝা গেল প্রশ্নটি যাদের মানসিক বয়স ৮ বৎসর তাদের উপযোগী। ১৫০০ ছাত্রদের যে সহস্র প্রশ্নগুলো দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বাছাই করে দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্যে ৪০০ প্রশ্ন নেওয়া হোল। এবার ২ বছর থেকে স্বরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আরো ৩০০০ শ্বেতকায় অ্যামেরিক্যান্ ছাত্রদের ওপর ব্যবহার করা হোল। এ ছাত্ররা যদিও আমেরিকায়ই জন্মেছে তবু এদের বংশ ও জাতি বিভিন্ন। সমগ্র দেশের জন্য যাতে পরীক্ষাগুলো উপযোগী হয়, সে জন্য ভারমণ্ট ও ভার্জিনিয়া থেকে ক্যালিফর্নিয়া পর্যন্ত ১১টি ষ্টেট্ থেকে পরীক্ষার জন্য ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। দেশের শ্বেতকায় অধিবাসীদের যে অনুপাত গ্রাম ও সহর অঞ্চলে আছে এবং বিভিন্ন জীবিকা অনুযায়ী দেশের অধিবাসীরা ছড়িয়ে আছে সেই অনুপাতেই বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন পরিবার থেকে ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। এই দ্বিতীয় পরীক্ষার পরে ১২৯টি প্রশ্ন ও সমস্যাযুক্ত দুটি পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হোল। এ পরীক্ষাগুলোর মান বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দিষ্ট হোল এবং তা বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মানসিক পরিণতি (Mental Age) মাপের উপযোগী বিবেচিত হোল।...এমন কি এখনও আমরা আশা করতে পারি না যে পরীক্ষা-গুলি সম্পূর্ণ ও সার্থক।" [১৬]

বুদ্ধির স্তরবিভাগ—Levels of Intelligence—আমের মধ্যে যেমন জাতের প্রভেদ আছে, মানুষের বুদ্ধিরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে। আমের মধ্যে ল্যাংড়া আম কুলীন জাতের, কিন্তু গুটির আম নিতান্ত বন্যজ। তেমনি বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) দিয়ে বা মানসিক বয়স (M. A.) দিয়ে বুদ্ধির আমরা জাতি বিচার করি। যারা খুব উচু জাতের বুদ্ধিসম্পন্ন, যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এর ওপরে অথবা যাদের মানসিক বয়স ২৪ বৎসর, তাদের আমরা বলি প্রতিভাবান্ (Genius) ; যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫-এর ওপরে, কিন্তু ১৪০-এর নীচে, তাদের বলি Superior ; যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা কাছাকাছি, তারা হোল Normal বা Average। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০, তাদের নীচ জাতের বুদ্ধি, তাদের বলি ক্ষীণবুদ্ধি (Morons, feeble-minded) ; তার চেয়েও যারা বুদ্ধিতে খাটো যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০, তারা জড়বুদ্ধি (Imbecile)। তার চেয়েও যারা নীচুতে, একেবারেই হাবা, তাদের বলি নির্বোধ (Idiots)। তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০,

১৬ G. G. Thomson. Child Psychology

বা কাছাকাছি। এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়, সর্বজন-গৃহীতও নয়। তবে বুদ্ধির যে জাতের তফাত আছে এটা সকলেই স্বীকার করেন। উপরের শ্রেণী বিভাগটি উড্‌ওয়ার্থের মত অনুযায়ী। টম্সন-এর শ্রেণী-বিভাগ নীচে দেওয়া হোল। এটা টারম্যানেরও মতানুসারী।

বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)	শ্রেণী
১৪০ এর ওপর	প্রায়-প্রতিভা বা প্রতিভা
১২০—১৪০	অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি
১১০—১২০	তীক্ষ্ণবুদ্ধি
৯০—১১০	সাধারণ বা মোটামুটি বুদ্ধি
৮০—৯০	বুদ্ধির ন্যূনতা—একেবারে ক্ষীণবুদ্ধি বলা যায় না
৭০ – ৮০	সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যূনতম, ক্ষীণবুদ্ধিই বলা যায়
৭০এর নীচে	নিশ্চিতভাবে ক্ষীণবুদ্ধি

ক্ষীণবুদ্ধির মধ্যে ৭০ থেকে ৫০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের বলে মোরোন্স, ২০।২৫ থেকে ৫০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা হোল জড়বুদ্ধি (imbeciles) আর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০।২৫ এর নীচে, তারা একেবারেই নির্বোধ (idiots)।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা—**Constancy of the I. Q.**—এই জাত-বিচার করে দেখা যায় যে এ বিভেদটা পাকা, অর্থাৎ যারা জড়বুদ্ধি (Imbecile) বা ক্ষীণবুদ্ধি (Morons) তাদের শত চেষ্টা করেও তীক্ষ্ণধী বা প্রতিভাবান্ করা যায় না (Superior or Genius)—"গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না।" অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় প্রতিকূল অবস্থা, যেমন অসুখ, ইন্দ্রিয়ের কোন ত্রুটি, অভিভাবক বা শিক্ষকের দুর্ব্যবহার বা সহানুভূতির অভাব বা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি কারণে বুদ্ধির উপযুক্ত বিকাশে বাধা ঘটে। শিক্ষকের তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার যে কোন ছেলে এ রকম কোন আকস্মিক বা অবান্তর কারণে পিছিয়ে আছে কিনা। শিক্ষকের শিক্ষার গুণে ছাত্রদের উন্নতি ঘটে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট বুদ্ধির সীমা আছে, তার ওপরে সে উঠতে পারে না। সেইজন্য বুদ্ধির পরীক্ষা বিশেষ দরকারী, আর বিশেষ যত্ন করে, বিভিন্ন উপায়ে, কিছু দিন বাদ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে ছেলেদের বুদ্ধ্যঙ্ক ঠিক করতে হবে। যদি পরীক্ষাটা নির্ভরযোগ্য

হয় তাহ'লে দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ্যঙ্ক সামান্য বাড়লে কমলেও মোটামুটি একই থাকে। বহু সহস্র ছেলেকে বহুবার পরীক্ষা করে এ ফলটি পাওয়া গেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। একটি মেয়ের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬ বছরে পাঁচবার মাপা গেল—নীচের ফলটা থেকে দেখা যাবে তার বুদ্ধ্যঙ্কের খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি।

	বাস্তবিক বয়স	মানসিক বয়স	বুদ্ধ্যঙ্ক
প্রথম পরীক্ষা	৬ বৎসর ৮ মাস	৫ বৎসর ৯ মাস	৮৬
দ্বিতীয় „	৭ „ ১ „	৫ „ ৪ „	৭৫
তৃতীয় „	৮ „ ২ „	৬ „ ১০ „	৮৪
চতুর্থ „	৮ „ ৭ „	৭ „ ০ „	৮২
পঞ্চম „	১২ „ ১০ „	৯ „ ১০ „	৭৭

বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বুদ্ধ্যঙ্ক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। দুঃখ বা উদ্বেগজনক পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থা বর্তমান থাকলে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই বুদ্ধ্যঙ্কের অবনতি ঘটে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী কিন্তু রাশিয়াতে তার বিপরীত। তারা তাই এই বুদ্ধির পরীক্ষার ওপর সামান্য গুরুত্বই আরোপ করে থাকেন।[১৭]

বুদ্ধির দুরকমের বৃদ্ধি—উচ্চতায় ও বিস্তারে—Vertical and horizontal growth in intelligence—যদিও বুদ্ধির আকৃতির (Quality) বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু তার পরিমাণ (Quantity) নিশ্চয়ই বাড়ানো চলে। এই বৃদ্ধির দিকটাকে থর্নডাইক বলেছেন বুদ্ধির বিস্তার (Horizontal growth in intelligence)। একটি

১৭ Burks—On the relative contributions of nature and nurture to average group differences in intelligence. Proc. Nat. Acad. Sci. 1938 24. pp. 276-282. Stoddard.—The Meaning of Intelligence ; The thirtyninth N. S. S. E. Year Book ; Newman, H. F., Freeman, F. N., and Holzinger, K. J.—Twins : a study of heredity and environment ; Honzik. M. P., Macfarlane, J. W., and Allen, L.—The stability of mental test performance between two and eighteen years. J. Exp. Edn. 1948, 17, pp. 309-324 ; Beatrice King—Russia goes to school ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক, ধরা যাক ৯৫। শিক্ষক যত্ন করলে হয়তো তার বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ হবে না, কিন্তু তার বুদ্ধির বিস্তার নিশ্চয়ই বাড়ানো যাবে। তাই বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়, এ আবিষ্কারে উদ্যোগী শিক্ষকের নিরাশ হওয়ার সঙ্গত কারণ নেই। শিক্ষকের চেষ্টায় ছাত্রের বুদ্ধির বিস্তার ঘটানো যাবেই। অবশ্য এটা দেখা যায় যে; যাদের বুদ্ধির জাতটা ভালো, তাদের বুদ্ধির বিস্তারের সম্ভাবনাও বেশী।[১৮] এ সম্বন্ধটা স্যাণ্ডিফোর্ড নীচের ছবিতে বোঝাতে চেয়েছেন।

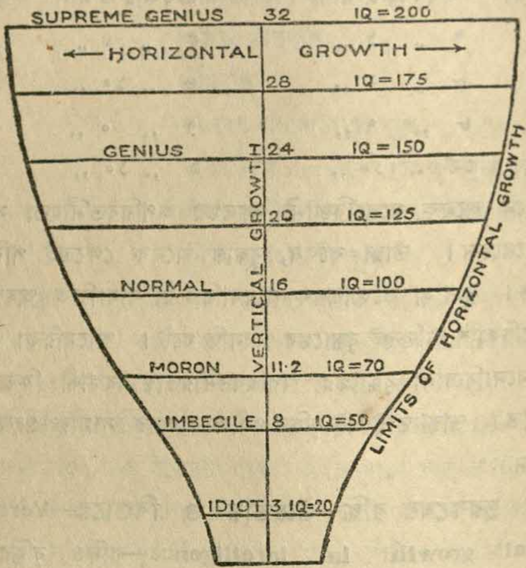

Vertical and horizontal growth of intelligence—
Sandiford—Educational Psychology. p. 150. Fig. 36
—Longmans Green & Co.

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি সম্বন্ধে 'উচ্চতা' বা 'বিস্তার' এরকম কথা ব্যবহারের বিরোধী। তাঁরা বলেন, এতে করে এ রকম একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে বুদ্ধি বুঝি একটা বস্তু। তাঁরা বুদ্ধির বিস্তার কথার পরিবর্তে বুদ্ধির পরিপক্কতা (maturation) বলার পক্ষপাতী।

বুদ্ধির উন্নতির সীমা—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতি (vertical growth) হয়, কিন্তু সেটার একটা সীমা আছে। দেখা যায় ৫।৬ বছরের পর

১৮ Sandiford. Educational Psychology. p. 150

থেকে বুদ্ধি দ্রুত বাড়তে থাকে ১৩।১৪ বৎসর পর্যন্ত, তারপর অধিকাংশেরই ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি প্রায় বাড়েই না বা সামান্যই বাড়ে। কাজেই সাধারণতঃ বলা যেতে পারে মানুষের বুদ্ধির সীমা ১৬ বৎসর। ১৬ বৎসর মানসিক পরিণতিই (Mental Age) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ-মানুষের (Average) বুদ্ধির শেষ সীমা। তারপর বছর গুণে বৎসর (Chronological Age) বেড়ে গেলেও মানসিক পরিণতি ১৬ই থেকে যায় বা সামান্যই বাড়ে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বুদ্ধির উন্নতি ৩০।৩১ বছর বয়স পর্যন্ত হয় দেখা গেছে। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত বুদ্ধি প্রায় এক অবস্থায়ই থাকে। শেষে বুড়ো বয়সে "ভীমরতি ধরে"—মানে বুদ্ধি তখন কমতে থাকে, আর তার বিকৃতি ঘটে। যাদের বুদ্ধির জাতটা ভাল তাদের পরিণতিও হয় সাধারণের চেয়ে বেশীদিন ধরে, আর যাদের বুদ্ধির জাতটা খারাপ তাদের বুদ্ধির শেষসীমায় পৌঁছে যায় অনেক আগে। তাই দেখা যায় যারা বোকা, তারা অল্প বয়সেই "পেকে ওঠে।"[১৯] নীচের ছবিতে জিনিষটা বোঝানো হয়েছে।

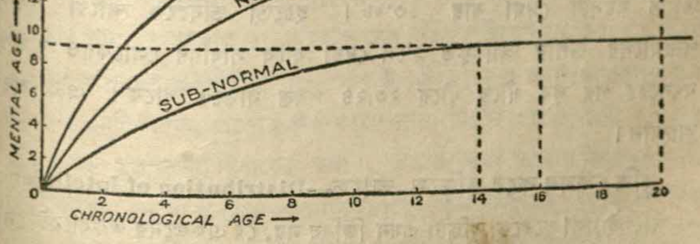

Fig. 25. Curve of the growth of different grades of intelligence
Sandiford—Educational Psychology, p. 148, Fig. 35
—Longmans Green & Co.

[১৯] Sandiford. Educational Psychology. p. 148.

পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধির স্কেল্ নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করে এখন পর্যন্ত যে স্কেল্‌গুলি তৈরী করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের পরিণত বয়সের বুদ্ধির মাপ ১৬ বৎসরের নবযুবকের সমান। হয়তো এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, হয়তো পরিণত বয়সেও বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু তা মাপবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আমাদের এখনও জানা নেই। বুদ্ধির পরিণতি বোঝার জন্ম যে বক্ররেখাগুলি ব্যবহার করা হোল তাদের মানে এ নয়, যে ১৬ বৎসরের ছেলে যা জানে, বৎসরের পরিণত মানুষ তার চেয়ে বেশী কিছু জানে না। এ দিয়ে শুধু এই বোঝাচ্ছে যে বুদ্ধির যে সব ক্রিয়াকে বুদ্ধির প্রচলিত নানা মাপ দিয়ে আমরা বিচার করি, তাতে পরিণত বয়স্ক মানুষ আর ষোল বছরের ছেলের সফলতা সমান। অবশ্য ১৬ বৎসর সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিণতির শেষ সীমা হলেও, বুদ্ধির বিস্তার ও সুসম্বদ্ধতা যে বাড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, আমরা দেখব যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এক জিনিষ নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করবার ক্ষমতা বাড়ে। এখানে ১৬ বছরের ছেলের চেয়ে ৪০ বৎসরের পরিণত মানুষের উৎকর্ষ। যতগুলো অভীক্ষা প্রচলিত আছে সবগুলোতেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিণতি ঘটে ১৫ থেকে ১৮র মধ্যে। বিনের অভীক্ষায় পরিণতির বয়স হচ্ছে ১৫, টারম্যানের অভীক্ষায় ১৬, ব্যালার্ডের অভীক্ষায় ১৬, ওটিস্ এবং মন্‌রো দুজনের অভীক্ষায়ই ১৮, ডল্-এর অভীক্ষায় এ বয়সটা কমে ১২তে দাঁড়ায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের আলফা বীটা টেষ্টের ফলও প্রায় অনুরূপ, তাতে বয়সটা দেখা যায় ১৩·০৮। হয়তো ভবিষ্যতে আরো সূক্ষ্মতর পরিমাপের উপায় আবিষ্কৃত হ'লে দেখা যাবে সাধারণ লোকেরও বুদ্ধি ১৬ বৎসরের পর খুব ধীরে ধীরে ২৩।২৪ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এটা অবশ্য অনুমান।

বুদ্ধি কেমন করে ছড়িয়ে আছে—Distribution of Intelligence —আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধিটা এমন জিনিষ নয়, যে একজনের একবারেই নেই, আর একজনের আছে। বুদ্ধিটা নানা জনের নানা মাপের। কাজেই একটা বৃহৎ আবাছাই করা জনসংখ্যার বুদ্ধির মাপ করলে দেখা যাবে, শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি হচ্ছে মাঝারি, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০র মধ্যে। বাকী সংখ্যা ক্রমে কমে কমে একদিকে নির্বোধ বা হাবা (idiots) পর্যন্ত এবং

অন্যদিকে অত্যন্ত প্রতিভাশালী (Superior, Genius) পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে; এই ছড়িয়ে থাকার ক্রমটা রস্-এর মতে নিম্নলিখিত রূপ—[২০]

বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)	তাৎপর্য	লোকসংখ্যার শতকরা হার
১৪৩ এবং তার ওপর	অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি	½
১৩১—১৪২	তীক্ষ্ণ বুদ্ধি	২½
১১৯—১৩০	উজ্জ্বল	১০
১০৭—১১৮	সাধারণের চেয়ে উর্ধ্বে	২১
৯৪—১০৬	সাধারণ	৩২
৮২—৯৩	সাধারণের নীচে	২১
৭০—৮১	বুদ্ধির ন্যূনতা	১০
৫৮—৬৯	সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যূনতা	২½
৫৭—এবং নীচে	ক্ষীণ বুদ্ধি	½

বুদ্ধি ও পেশা—Intelligence and Occupation—সব কাজের জন্যই একটা ন্যূনতম পরিমাণ বুদ্ধি চাই। কিন্তু কোন কোন কাজে বুদ্ধি অন্য কাজের তুলনায় বেশী দরকার। মোটামুটি দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান লোকেরা হন ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার, বৃহৎ ব্যবসায়ী, কেমিষ্ট, শিক্ষক ইত্যাদি। যারা শিক্ষিত কারিগর তারাও বুদ্ধিমান; কিন্তু উপরের শ্রেণীর তুলনায় অতটা নন। যারা দিনমজুর তাদের বুদ্ধির জাতটা সবের তুলনায় খাটো। উডওয়ার্থ বলছেন, "গড় তুলনা করলে এটা নিশ্চিত দেখা যায় যে, বুদ্ধির পরীক্ষায় সবচেয়ে উঁচু স্থান অধিকার করেন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা। হিসাবরক্ষক এবং কেরাণীরাও বেশ উঁচু স্থান পান, কলকব্জার কারিগররাও বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেন, সবচেয়ে নীচুতে থাকেন অশিক্ষিত শ্রমজীবীরা"।[২১] অবিশ্যি এটা দ্বারা এ কথা বোঝাচ্ছে না যে প্রত্যেক এন্‌জিনীয়ার, প্রত্যেক কল-কারখানার মিস্ত্রীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। এটা হচ্ছে গড়পড়তা হিসাবের কথা। একথা লক্ষ্য করবার বিষয় যে স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরাও মোটামুটিভাবে মুটে-মজুরদের সন্তানদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। নীচের তালিকা থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তালিকাটা

---

২০ Ross. Basic Psychology

২১ Woodworth and Marquis. Psychology

তৈরী করেছেন টারম্যান্ ও মেরিল্ আমেরিকার জনসংখ্যা অনুসন্ধান করে। পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার—

পিতার জীবিকা	শিশুর গড় বুদ্ধির হার
১। স্বাধীন ব্যবসায়ী	১১৬
২। অর্ধ-স্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক	১১১
৩। কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী	১০৭
৪। গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি	৯৫
৫। অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের কেরাণী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি	১০৪
৬। সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক	৯৯
৭। সহর ও গ্রামের দিন মজুর	৯৬

এর কতটা বংশপরম্পরার (heredity) ফল, কতটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environment) ফল, সেটা গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এ দুটো শক্তিই এখানে কাজ কচ্ছে।

সহর ও গ্রামে বুদ্ধির তারতম্য—Urban and Rural Intelligence—সাধারণত দেখা যায়, শহুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান্। মোটামুটি তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক কিছুটা বেশী। শহরের ছেলেদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে ১০০ বা তার কিছু ওপরে, গ্রামের ছেলেদের গড় হচ্ছে ৯০ থেকে ৯৫। তবে গ্রামে যেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানের ছেলেরা শহরের ছেলের তুলনায় বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যায় না।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য—Intelligence in different races—আমেরিকায় এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, মোটামুটিভাবে সব দেশের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি সমান,—তবুও যেন কিছু ইতর-বিশেষ আছে। নীচে পরীক্ষার ফল দেওয়া হল—

শ্বেত আমেরিকান্ পিতার সন্তান—	১০০
চীন ও জাপানী পিতামাতার সন্তান	১০১
রেড্ইণ্ডিয়ানদের সন্তান	৮৬
নিগ্রো পিতামাতার সন্তান	৮৩

আবার দেখা যায় য়ুরোপ থেকে যারা আমেরিকা এসেছে—তাদের বিভিন্ন

দেশের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তফাত রয়েছে—জার্মান ও ইহুদী ছেলেমেয়েরা ফ্রান্স ও ইটালী দেশ থেকে আগত ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান। এ সমস্ত পরীক্ষা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো অনেক পরীক্ষা না করে মত স্থির করা ঠিক হবে না। হিট্‌লার-এর জার্মানীতে তাঁরা এই মত প্রচার করেছিলেন যে, জার্মান জাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত (superior race)। প্রত্যেক জাতের মধ্যেই অল্পবিস্তর এ রকম ধারণা রয়েছে। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এ বিশ্বাসটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে গেলে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বুদ্ধির পরীক্ষাগুলো কোন এক দলের পক্ষে অনুকূল না হয়।

বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা

১। মানসিক শক্তির ন্যূনতা বা বিকৃতি নির্ণয়—Diagnosis of mental deficiency—মানসিক বিকৃতি যাদের আছে, অধিকাংশ সময় তাদের বুদ্ধ্যঙ্কে তা ধরা পড়ে। সাধারণ লোকের চেয়ে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক অনেকটা কম দেখা যায়। তা'ছাড়া বুদ্ধির মাপের মধ্যে মোট বুদ্ধির পরিমাণ মাপবার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে নানা রকম কাজে দক্ষতা মাপবার উপায়। কাজেই যাদের মানসিক বিকৃতি আছে তাদের কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ অক্ষমতা আছে, সেটাও বোঝা যায়। তার চিকিৎসার জন্য এটা জানা খুবই দরকার।

২। ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ—The Grading of pupils—বুদ্ধি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ করা ভালো। আমেরিকা ও অন্যান্য অগ্রসর দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরই তাদের বুদ্ধির মাপ নেওয়া হয় এবং বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী মোটামুটি তিন দলে—ভাল, মন্দ, মাঝারি (bright, medium and dull) এই ভাবে ভাগ করা হয়। এই মাপ অনুসারেই তাদের পড়া বা কাজ নির্ধারণ করা হয়। তাতে অনেক অপচয় ও অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়। ক্লাসে কাজও অনেক ভাল হয়। এক একটা দল একরকম বুদ্ধিমান্ (বা বুদ্ধিহীন) ছেলে বা মেয়ে নিয়ে তৈরী করা যেমন উচিত, তেমনি তাদের বয়সও একরকম হলে ভালো হয়। আমাদের দেশে স্কুলগুলিতে কোন রকম বাছাই করা হয় না। নানা বয়সের নানা রকম

বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের জন্য একই পড়া, কাজ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা। এতে ক্লাসের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় কারণ এটা খুব সত্য কথা যে "একটা শ্রেণীর সব চেয়ে নিকৃষ্ট যে ছেলে, সে যতটুকু অগ্রসর হয়, শ্রেণীটি সমগ্রভাবে ততটুকুই অগ্রসর হয়। বুদ্ধিমান্ ছেলেদেরই এতে ক্ষতি হয় বেশী। তারা আলসে ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বোকা ছেলেদের সঙ্গে থেকে চালাক ছেলেরা পিছিয়ে পড়ে এবং তারা মন্থর ও অলসভাবে কাজ করবার অভ্যাস গঠন করে।" এতে বোকা ছেলেদেরও ক্ষতি হয়। সর্বদা ভালো ছেলেদের তুলনায় নিজেদের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে অনেক সময় তারা হিংসুক ও তিক্ত মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজগুলিতে ভর্তি করবার আগে বেশ কড়াকড়ি ভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর ফল মোটামুটিভাবে ভালোই হয়। কখনো কখনো কোন কোন স্কুল বা অভিভাবক তাদের ছাত্রদের কতগুলি বাছাই-করা প্রশ্ন ভালো করে মুখস্থ করিয়ে তাদের এসব কঠিন পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ করে দেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, ভবিষ্যতে গিয়ে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অগৌরব ও নিজেদের কাছেও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাক্‌রে তাঁর 'ট্যালেণ্টস্ এ্যাণ্ড টেম্পারামেণ্টস' বইয়ে এ সম্বন্ধে কতগুলি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন।

৩। শিশু পরিচালনা—Child guidance—শিশুকে পরিচালনা করতে গেলে তার বুদ্ধির মাপটা জানা ভালো। অনেক সময় দেখা যায় বুদ্ধির স্বল্পতা অন্যায় ব্যবহারের মূল কারণ। কিন্তু সব সময় সেটা সত্য না হতে পারে। তার পরিবেশের প্রতিকূলতা বা মানসিক কোন সংঘাত এ জন্যে দায়ী হতে পারে। সেটার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, তা হলেই শিশুকে সংশোধন করা সম্ভব। যে ছেলে বুদ্ধিমান্ তাকে সংশোধন করবার সম্ভাবনা বেশী। বার্ট বলছেন, "বুদ্ধির অভাবই তার দোষ-ত্রুটির প্রধান কারণ হতে পারে এবং বুদ্ধি থাকাটা তাকে সংশোধন করবার একমাত্র আশা" ২২ যারা অসাধারণ বুদ্ধিমান, কখনো কখনো তাদের অ-সাধারণত্বই তাদের বিভ্রান্ত করে। তারা অতিমাত্রায় অভিমানী বা আত্ম সচেতন হওয়ার ফলে বেশী আঘাত পায় এবং কখনো কখনো নিজেদের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়। যাই হোক্, সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি

২২ Cyril Burt. The Young Delinquent

জানা থাকলে ত্রুটিসংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, এবং বুদ্ধির মাপ এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

৪। **ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাচনে সহায়তা—Vocational guidance and selection**—কে কোন্ কাজের যোগ্য তা জানা এবং সে অনুযায়ী বাছাই করা যে দরকার, এটা আমরা সবাই বুঝি। 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সব কাজ একই লোক দিয়ে করানো, মাঝে মাঝে অবস্থা গতিকে দরকার হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা নয়। "যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে" এ প্রবাদটা মিথ্যা নয়। সব কাজেই বুদ্ধি চাই, তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার নেই, এক জাতীয় বুদ্ধিও কাজে লাগে না। এই জন্যে বুদ্ধির পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা, নানা কারিগরী পরীক্ষা, রুচি ও উপযোগিতা পরীক্ষা ইত্যাদি খুব মূল্যবান। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই পরীক্ষাগুলির জন্ম হয়েছে বা উন্নতি হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার (এবং যুদ্ধরত অন্যান্য সব দেশেরই) যুদ্ধের কাজে বহু লক্ষ লোক নিয়ে একটা প্রধান সমস্যা ছিল—মানুষকে কাজের জন্য বাছাই করা আর মানুষ অনুযায়ী কাজ বাছাই করা,—"Fitting the job to the man and fitting the man to the job". কাজ অনুযায়ী মানুষ নেওয়া আর মানুষকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা' এ সমস্যা তো যুদ্ধ-কালীন মাত্র নয়,—এটা সর্বদেশের সর্বকালের সমস্যা। যদি অপচয় নিবারণ করতে হয়,—সব-চেয়ে বেশী কাজ, সবচেয়ে ভালভাবে, সবচেয়ে কম সময়ে পেতে হয়, তবে এ অভীক্ষাগুলির এখনও আরও প্রভূত উন্নতি হওয়া দরকার।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সীমা ও ত্রুটি—Limitations and defects of the Intelligence Tests—এ মাপগুলি এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সুতরাং কোন ব্যক্তির বিচার করতে হলে এগুলিকে চূড়ান্ত বলে মনে করলে ভুল হবে। বুদ্ধি মানুষের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ মাপ এতে পাওয়া যায় না।[২৩] আর আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধির পরিমাপ করতেও একটা মাত্র পরীক্ষা একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই নানা রকমের অভীক্ষা ব্যবহার করে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ক্ষমতা মাপতে হবে। এ মাপগুলি সব

---

২৩ Thompson—Child Psychology.

দেশে ঠিক এক রকম হতে পারে না, এবং এগুলি নির্ভুল নয়, এ কথা মনে রাখা দরকার। পরিবেশের প্রভাব সকলের ওপর সমান নয় এবং পরিবেশকে সম্পূর্ণ করে মাপবার উপায় যে পর্যন্ত না হবে, ততদিন এই বুদ্ধির মাপগুলিও অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী ছাত্রদের দলে ভাগ করার রীতি যে অভ্রান্ত নয়, বর্তমানে নানা গবেষণার ফল এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। বুদ্ধ্যঙ্ক ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনার একটা স্থূল মাপকাঠি মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। দুটি ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক সমান বলে, তাদের মানসিক সামর্থ্য সমান, অথবা মানসিক পরিণতি (maturation) সমান, একথা মনে করে তাদের একই দলে ফেলা সব সময় উচিত নয়। উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি (motivation) করলে অনেক সময় বুদ্ধ্যঙ্কের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। তাই শিক্ষার উন্নতি করতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও ছাত্রের আগ্রহের মূল উৎসের অনুসন্ধান ও তাকে কাজে লাগানো দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মূল্য ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য। এর কোন মাপ শুধু বুদ্ধ্যঙ্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের পরিণতির প্রকৃতি ও ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তাই একই বুদ্ধ্যঙ্কের ছেলেদের একই কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। একই বিষয় তাদের শিক্ষণীয় হলেও প্রত্যেকের প্রকৃতি ও পরিণতির গতি অনুসারে বিষয়ের বিভিন্ন দিকে বেশী বা কম জোর দিতে হবে।[২৪] ছাত্রেরা বিষয়টি অধিগত করবে শিক্ষকের এটাই দৃষ্টি হবে না, তাঁর দৃষ্টি হওয়া উচিত প্রত্যেক ছাত্র তার পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার আগ্রহ যাতে পায়, তা সৃষ্টি করা। "প্রচলিত ইস্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যতই কড়াকড়ি সেখানের ব্যবস্থা করা হোক্ না কেন, প্রত্যেক ছাত্রই স্থায়ীভাবে যা শেখে, তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী। যদি একই বিষয়, একই ভাবে, এক শ্রেণীর সব ছাত্রদের শিখতে হবে, এ আদর্শ ছেড়ে দিয়ে, অন্য আদর্শ গ্রহণ করা যায়, যে প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজস্ব পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী অগ্রসর হ'তে আগ্রহান্বিত করতে হবে, তাহলে, আশ্চর্য মনে হলেও, এটা দেখা যায় যে এতে প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা আলাদা একই জিনিষ শিখিয়ে

---

২৪ C. V. Millard—Child growth and development p. 141-42

দিতে শিক্ষকের যে পরিশ্রম হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম প্রয়োজন হবে।' [২৫]

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা—Knowledge, Intelligence, Wisdom—যে ছেলে জানে হাইড্রোজেন্ ও অক্‌সিজেন্ ২ : ১ এই অনুপাতে মেশালে জল হয়, সে ছেলের, এ বিষয়টিতে অন্ততঃ বিদ্যা আছে। বিদ্যা হচ্ছে নানা বিষয় সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান। যে ছেলে বিদ্বান্, সে অনেক সময়ই বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু বিদ্যা থাকলেও বুদ্ধি না থাকতে পারে। বিদ্যা হচ্ছে জ্ঞান আহরণ, আর বুদ্ধি হচ্ছে আহৃত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মানসিক ক্ষমতা। ব্যালার্ড তাই বুদ্ধিকে বলেছেন "অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার মত মনের সাধারণ ক্ষমতা"। [২৬] একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলেছেন "বিদ্যার কিছু ভিত্তি না থাকলে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হওয়া যায় না, কিন্তু তুমি হয়তো সহজেই বিদ্যা আহরণ করতে পার, তথাপি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিছু না থাকতে পারে।" একজন বিদ্বান্ রাজাকে বলা হোত "খৃষ্টান দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্বান্ মূর্খ—"the wisest fool of Christendom"। রস্ বলছেন, "এতে বোঝা যাবে ঘটনা বা দ্রব্য সম্বন্ধে জানা, আর সে জানাকে ব্যবহার করবার ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য প্রচলিত, তা আমরা মেনে নিচ্ছি। অনেক অনেক গল্পে আমরা দেখতে পাই চালাক চতুর একটি লোক তার সামান্য বিদ্যাকেও কাজে লাগিয়ে বেশ সফলতা লাভ কচ্ছে, আবার তার উল্টো এমন প্রকাণ্ড বিদ্বান্ও আছেন, যিনি তাঁর বিদ্যার ভারেই এমন বিব্রত যে, জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলিও তিনি সমাধানে অসমর্থ।" [২৭] কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা ভাল কাজেও লাগাতে পারি, আবার ভয়ানক খারাপ কাজেও লাগাতে পারি। যার বুদ্ধি তার বিভিন্ন শক্তিকে সুসমঞ্জস ভাবে সংহত করে, এবং কল্যাণপ্রসূ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, তাঁকে বলি প্রজ্ঞাবান্। শুধু জ্ঞান সঞ্চয়, শুধু জ্ঞান আহরণ, শুধু বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় না। যিনি সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেন পরিপূর্ণ সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে, তিনিই লাভ করেছেন সুসম সুপরিণত ব্যক্তিত্ব। তাঁকেই গীতায় বলা হয়েছে স্থিতধীঃ। [২৮]

---

২৫ C. V. Millard—Child growth and development p. 142
২৬ Ballard—Mental Tests
২৭ Ross—Basic Psychology
২৮ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায়

সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রজ্ঞালাভ। একজন প্রাচীন ইংরেজ লেখক লিখেছেন, "জ্ঞানই হচ্ছে প্রধান জিনিষ ; সুতরাং সত্যজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হও এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ কর প্রজ্ঞা"—Wisdom is the principal thing ; therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding."

আমরা বলেছি ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কাজেই পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ় আর ১৬ বৎসরের তরুণ যুবকের বুদ্ধির মান সমান। কিন্তু প্রজ্ঞার দিক দিয়ে প্রৌঢ় যুবকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কোন কোন মনীষী ব্যক্তি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অভিযোগ করে থাকেন যে, এ শুধু বুদ্ধির চর্চার প্রতিই মনোযোগী, কিন্তু প্রাজ্ঞতার প্রতি উদাসীন।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান ছাত্র—Gifted Children

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ বা তারও বেশী স্বভাবতই তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। যারা ক্ষীণবুদ্ধি বা নির্বোধ তাদের শিক্ষারও যেমন সমস্যা আছে, যারা তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান্ তাদের শিক্ষারও তেমনি সমস্যা আছে। তারা অসাধারণ বলেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণের থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন। ট্যারম্যান্ ১০০০ এমন তীক্ষ্ণধী ছেলেদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করে যৌবন পর্যন্ত নানা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা গুণ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল (১৯২১-৪৬) অনুসন্ধান করে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছেন। (১) এ সব ছেলেরা গড়ে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট। তাদের বুদ্ধির হারও দ্রুততর। (২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তারা অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পিছে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশই উচ্চ কলেজী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেখানেও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। (৩) সামাজিক গুণের বিকাশও তাদের মধ্যে অধিকতর। তারা সাধারণত তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মেশে। (৪) চরিত্রের দিক দিয়েও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক স্থৈর্য তাদের মধ্যে বেশী। (৫) তাদের পিতামাতারও সাধারণের তুলনায় বুদ্ধি, সংকল্প, অনুভূতি নীতিজ্ঞান, শারীরিক ও সামাজিক গুণ অধিক দেখা যায়। (৬) উত্তর জীবনেও তাদের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্যণীয়। তবে মানসিক বিকৃতি এদের মধ্যে সাধারণের তুলনায় কম নয়।

হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা বেশী এই রকম ৩১টি ছেলের জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, এরা শিশুকালে অনেক আগে কথা বলতে শেখে, শব্দ ও বাক্যের ওপর দখল এদের বেশী হয়। এরা সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক বেশী বস্তুবর্জিত চিন্তা ও শুদ্ধ প্রতীক (abstract symbols) ব্যবহারে পারদর্শী হয়। এরা কিন্তু খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থ-এর মতে এরা অনেক সময়ই সমাজের সঙ্গে ভাল মানিয়ে চলতে পারে না এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হয় না। তাঁর মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫, তাদেরই সুস্থ ও সু-সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। এর চেয়ে যারা বেশী বুদ্ধিমান সংসার ও সমাজে তাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ট্যারম্যান্ ও হলিংওয়ার্থ দুজনেই তীক্ষ্ণধীদের জন্যে পৃথক উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।[২৯]

বুদ্ধ্যঙ্ক বংশগতি-নির্ভর না পরিবেশ-নির্ভর ? বুদ্ধ্যঙ্ক কতটা বংশগতি-নির্ভর, আর কতটাই বা পরিবেশ-নির্ভর, এটা অঙ্ক কষে' নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহেই বলা যায় এই দুইয়েরই প্রভাব আছে। সব ছেলে (এমন কি, দুই যমজ ভাই বোনও) ঠিক সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। এর অনেকটাই বংশগতির উপর নির্ভর করে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। কিন্তু বুদ্ধির নিকৃষ্ট মূলধন নিয়ে যে জন্মেছে (যার বুদ্ধ্যঙ্ক, ধরা যাক্ ৪৫), তাকে শত চেষ্টা করেও, শত অনুকূল পরিবেশ বা শিক্ষা সত্ত্বেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিতে (বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ বা তার উর্ধ্বে) পরিবর্তিত করতে পারা যাবে না। কিন্তু দেখতে হবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণের অভীক্ষা যেন নির্ভরযোগ্য হয়। অনেক সময় নানা মানসিক কারণে, ব্যক্তি অভীক্ষা গ্রহণের সময় ঠিক তার পূর্ণশক্তির প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। রোগ ভোগ দ্বারাও কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হ্রাস পেতে পারে। হয়তো বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণের সেই বিশেষ অভীক্ষাটি ব্যক্তির পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। হয়তো অন্যভাবে অভীক্ষার ব্যবস্থা হলে সে তার শক্তি ও সম্ভাবনার অনেক ভালো পরিচয় দিতে পারতো। উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে অনেক সময় বুদ্ধির স্ফুরণ হয়।

২৯ Garrison—The psychology of exceptional children.

পিতামাতা শিক্ষকের উৎসাহ এবং সাফল্যের গৌরবেও অনেক সময় ব্যক্তির সুপ্ত-ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে। তাই দেখি, শিক্ষকেরা যে ডারুইন্‌কে নিতান্ত নীচু স্তরের বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র বলেই অবহেলা করেছিলেন, পরবর্তী কালে তিনিই বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপের অভীক্ষাগুলি এখনও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠি নয়। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণে কোন অভীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতার একটি মাপকাঠি হচ্ছে যে কিছু দীর্ঘদিন যাবৎ (তিন বৎসর), কয়েক মাস পর পর পরীক্ষার পর, কোন ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন, উপরে দশ অঙ্ক অথবা নীচে দশ অঙ্কের বেশী হবে না। যে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক নয় বৎসর বয়সে পাওয়া গেল ১২৫, ছয় মাস অন্তর তা সাধারণতঃ ঊর্ধ্বে ১৩৫ ও নিম্নে ১১৫র মধ্যেই থাকে। কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্কের এই আপেক্ষিক অপরিবর্তনীয়তা আপেক্ষিক এবং মোটামুটি ভাবেই সত্য। ৩০

বুদ্ধ্যঙ্ক সম্বন্ধে দু'টি চরম মতই ভ্রান্তঃ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্বন্ধে দু'টি চরম মত আছে। প্রথম মত বলে যে বুদ্ধি বংশগত ও জন্মগত। বুদ্ধিমান্ পিতামাতার ঘরেই বুদ্ধিমান্ সন্তান জন্মে এবং শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির সন্তানদের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্যণীয়। পরিবেশ বা শিক্ষাদ্বারা স্বভাবত বুদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধি সামান্যই হয়ে থাকে। সাধারণত ইংরেজ, জার্মান ইত্যাদি রক্ষণশীল জাতেরা বুদ্ধির বংশগতি-নির্ভরতায় অধিকতর বিশ্বাসী।

বিপরীত মত হচ্ছে, বুদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধি পরিবেশ ও শিক্ষা-নির্ভর। উপযুক্ত সুযোগ, উৎসাহ ও সুপরিচালনা পেলে নিতান্ত নির্বোধ ছেলেও বুদ্ধিমান হয়। 'বনেদী', শ্রেষ্ঠ বংশে বুদ্ধিমান্ ছেলে মেয়ে যে বেশী দেখা যায় তার কারণ, তারা সুশিক্ষা, সুপরিচালনা, অনুকূল পরিবেশ ও অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার দূর করতে পারলে দেখা যাবে সমাজে বর্তমানে যে বিভিন্ন স্তর আছে, তাদের সবখান থেকেই বুদ্ধিমান ছেলে মেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। রাশিয়া ইত্যাদি সাম্যবাদী ও প্রগতিপন্থী দেশগুলি এই চরম মতের পোষক।

কিন্তু এই দুই চরম মতই ভ্রান্ত। বংশগতির প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব। মানুষে মানুষে জন্মগত বুদ্ধির প্রভেদ আছেই। 'বনেদী', 'শ্রেষ্ঠ' পরিবারের সব ছেলেমেয়েই কিছু রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন বা কার্ণেগী হয় না।

৩০ Gates, Jersild and others—Educational Psychology

আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সব ছেলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান হয় না। আবার সাধারণ মানুষের ঘরেও বিদ্যাসাগর, গান্ধীজী লেনিনের মত তীক্ষ্ণ মনীষার জন্ম হয়। বুদ্ধির মূলধন স্বভাব-জাত। এবং ঠাকুর পরিবার, উপেন্দ্রকিশোর রায়ের পরিবার ইংল্যাণ্ডের গ্যাল্‌টন ওয়েজউড্ পরিবারে বহু তীক্ষ্ণধী মানুষের ধারা আমরা লক্ষ্য করি। কাজেই বংশের বা পরিবারের একটা 'ধারা' আছে এটা একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। বিপরীত ভাবে 'জুকস্' এবং 'ক্যালিক্যাক্‌স্' এই দুইটি পরিবারের বংশানুক্রমে নিকৃষ্ট বুদ্ধির ধারা সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। তা ছাড়া দেখা যায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা কিছুটা উন্নতি হলেও নিতান্ত নির্বোধেরা কখনও তীক্ষ্ণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয় না।[৩১]

৩১ একেবারে সম্প্রতি নিম্নজাতীয়প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্লুটামিক্ এসিড্ নিয়মিত প্রয়োগ দ্বারা বুদ্ধির এবং ন্যুক্লিক্ এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে।

Zimmermn, Burgemeister & Putnam—Effect of Glutamic acid on mental functioning in children and in Adolescents. Arch. Neurol. Psychiat 1946, 56, 489-506 ; also, the exciting effect of Glutamic acid upon intelligence in children and adolescents. Amer. J. Psychial, 1947-48, 104, 593-599.

ঊনবিংশ অধ্যায়

অবসাদ ও বিরক্তি—Fatigue & boredom

অবসাদ – **Fatigue**—কোন কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করলে, কতক্ষণ পর দেখা যাবে সে কাজে দক্ষতা বা ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একে আমরা ব'লি ক্লান্তি বা অবসাদ। পাঁচ মাইল একখানা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় হাঁটবার পর, মনে হয় পা দুটো আর চলতে চাইছে না। একঘণ্টা কঠিন অংকের ক্লাস চলার পর দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীরা অংক কষতে আগের চেয়ে অনেক বেশী ভুল করছে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা চোখের কাজ করতে করতে শেষে মনে হয়, চোখে ঝাপসা দেখছি। এ সবই হচ্ছে অবসাদের উদাহরণ। এগুলো থেকেই বোঝা যাবে, অবসন্নতা পেশী সম্পর্কে (Muscular), ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (Sensory), অথবা মন সম্পর্কে (Mental) হতে পারে। অবসাদ সাধারণভাবেও হতে পারে, অথবা বিশেষ একটা ইন্দ্রিয় বা পেশী সম্পর্কেও হতে পারে। সমস্ত দেহই যেন শ্রান্ত বোধ হচ্ছে। এমন মনে হতে পারে; আবার শুধু চোখ দুটোই পরিশ্রান্ত, এমনও হতে পারে। অবশ্য এ দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চোখ দুটো যখন অবসন্ন, সমস্ত দেহেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অবসাদ সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে। একেবারে কোন পরিশ্রম করতেই দেহ-মন আর চাইছে না, এ রকমটা হতে পারে (অবশ্য এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়); আর বিশেষ কোন একটা কাজ করতে যেন আর পারছি না, এমনও মনে হতে পারে। যেমন ধর সারাদিন খেটেখুটে এসে রান্নাটা করতে আর যেন ইচ্ছে করে না। স্যাণ্ডিফোর্ড অবসাদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, "কর্মে দক্ষতার হ্রাস।" মাইকেল ওয়েস্টের সংজ্ঞা হচ্ছে, "পূর্বে কোন কাজ (অনেকক্ষণ বা অনেকবার) করবার ফলে সাময়িক, সাধারণভাবে, অথবা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সম্পূর্ণ বা অংশতঃ কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস।" ম্যাকডুগ্যাল তাঁর 'আউটলাইন্ অব নরম্যাল্ সাইকোলজী' গ্রন্থে লিখছেন, "অবসাদ হচ্ছে এমন একটি কথা যা দিয়ে আমরা বোঝাই দেহ-যন্ত্রের ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের হ্রাস, যা তীব্র ও বহুক্ষণব্যাপী কর্মের ফলে দেখা দেয়, এবং যা কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষ করে নিদ্রার পরে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, এবং দেহযন্ত্র তার পূর্ব কর্মদক্ষতা সম্পূর্ণ ফিরে পায়।"

বিরক্তি—Boredom—বিরক্তির সঙ্গে অবসাদের মিল রয়েছে, সম্বন্ধও আছে, কিন্তু দুটি এক জিনিষ নয়। মাইকেল ওয়েস্ট বিরক্তিকে বলেছেন "দুষ্ট অবসাদ" (false fatigue)। বিরক্তি (Boredom) হচ্ছে কোন একটা কাজ করবার অনিচ্ছা, সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা। স্যাণ্ডিফোর্ড সংজ্ঞা দিচ্ছেন, 'কোন কাজ সম্পর্কে ইচ্ছার অভাব, বা সে কাজ সম্বন্ধে বিমুখতা।" একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধর, অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ব পড়াচ্ছেন—ভদ্রলোকের চেহারা রুক্ষ তেমনি প্রকাশভঙ্গীর অক্ষমতা ; বিষয়টা ও নীরস। দশ মিনিট শোনার পর ক্লাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; মনোযোগ দিচ্ছে না। কতক্ষণ পর শুরু হল হাই তোলা, তারপর সম্পূর্ণ অমনোযোগ ; হয়তো বা কয়েকজন ঘুমিয়েই পড়ল। দশ মিনিটে বাস্তবিক অবসন্ন হওয়ার কারণ নেই, হয়ও না। তবু বিতৃষ্ণার জন্যে যে মিথ্যা অবসাদবোধ, একে বলি, বিরক্তি বা বোরডম্। অবসন্ন হলে কাজে অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা আসে এবং যে কাজে বিতৃষ্ণা, তাতে অবসাদ বোধ হয়, এ কথা সত্যি। তবু দুটি এক জিনিস নয়। কোন একটা কাজে বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও, সে কাজ দক্ষ ও নিপুণভাবে করা যায়। যেমন ধর, কলেজ থেকে ফিরে এসে চুল বাঁধা। এখানে বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু অবসাদ বা কার্যক্ষমতা বা নিপুণতা লোপ পায় নি। আবার যে কাজ ভালো লাগে, যেখানে প্রাণের দরদ আছে, সেখানে অবসন্নতা এলেও বিতৃষ্ণা আসে না। তাই দেখি, মা মাসাধিক যাবৎ রুগ্‌ণ সন্তানের দিবারাত্রি সেবা, ক্লান্ত দেহ সত্ত্বেও প্রসন্নমনে করেন। যখন একটা ক্লাস পরিশ্রম করে' অবসাদগ্রস্ত, তখন আর কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে, সে ক্লাস সমর্থ নয়। বিষয় পরিবর্তন করে সেখানে কোন সুফল লাভের আশা নেই। কিন্তু অংকের ক্লাসে ছেলেরা বিতৃষ্ণ হয়েছে। এখানে ঘণ্টা পড়ার পর, নতুন বিষয়ের ক্লাস তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অবসাদ ও বিরক্তি এক জিনিস নয়।

এক হিসাবে বিতৃষ্ণা এবং অবসাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বিতৃষ্ণা অবসাদের অনেক আগে দেখা দেয়, এবং অনেক দ্রুতবেগে বর্ধিত হয়। বিতৃষ্ণার প্রথম লক্ষণ চঞ্চলতা (মনঃসংযোগের অভাব), তারপর বিরক্তি (irritability), তারপর আসে আলস্য (lethargy) এবং বোধহীনতা (stupidity)। কিন্তু অবসাদের প্রথম অবস্থায়ই আসে বোধহীনতা ও আলস্য

(dullness and heaviness)। বারে বারে চেষ্টা করে বরং কিছুটা সতেজ করে তোলা যায় ইন্দ্রিয়, বা পেশী বা মনকে।

বিতৃষ্ণার কারণ অনেক সময়ই একঘেয়েমী। যেখানে কাজ বৈচিত্র্যহীন, যেখানে প্রাণশক্তি সহজভাবে স্ফূর্ত হতে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাহত হয় বা রুদ্ধ হয়, সেখানে কাজে বিতৃষ্ণা আসে। জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া। তাই একঘেয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, চুপ করে বসে শুনে, তোমাদের মতো যারা অল্পবয়স্ক, তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠো। এখানে দেহের ও মনের স্বাভাবিক গতি ও স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এসেছে বিতৃষ্ণা। বিতৃষ্ণা হচ্ছে জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির বিদ্রোহ (protest)।

অবসাদের মূল কারণ—Causes of fatigue—অবসাদের তিনটি মূল কারণ স্ট্যাণ্ডিফোর্ড নির্দেশ করেছেন।

১। দেহের শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানগুলির ক্ষয়—এ ক্ষয় বিশেষ করে দেখা যায়, পেশীগুলি যে তন্তু (fibres) দিয়ে তৈরী সেগুলিতে, এবং স্নায়ুগুলি (nerves) যে কোষ (cells) দিয়ে তৈরি হয়, তাদের মধ্যে। কোন পেশী দীর্ঘকাল ধরে কাজ করলে যে তন্তু নিয়ে পেশীটি তৈরি হয় তার যে ক্ষয় হয়, তা পূরণ হয় না। সে রকম, স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous system) যে স্নায়ু-কোষ দিয়ে তৈরি হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাদের কোষগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য দেহযন্ত্রের মধ্যেই আশ্চর্য ব্যবস্থা আছে ক্ষয়পূরণের। কিন্তু অতিরিক্ত বা অতি দ্রুত পরিশ্রমের ফলে ক্ষয় অতিমাত্রায় হয়ে গেলে, তা পূরণ হবার সময় হয় না। ফলে দৈহিক বা মানসিক অবসাদ আসে।

২। দেহাভ্যন্তরে পেশী বা স্নায়ুগুলিতে অপচয়জনিত বিষ সঞ্চয়—দেহাভ্যন্তরে দেহের উপাদানগুলিতে কাজের ফলে বিষ সঞ্চয় হয়। এ বিষ দূরীকরণ সুস্থ দেহে স্বভাবতঃই ঘটে থাকে। কিন্তু অবসাদ বোধ হয়, বিষ-সঞ্চয়ের ফলে। অবসাদকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির সাবধানবাণী (nature's warning)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নায়ুসংযোগগুলিই অবসাদের মূল শারীরিক ভিত্তি। শেরিংটন (Sherrington) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বিষ-সঞ্চয়ের ক্রিয়া স্নায়ু-সংযোগেই (synapse) সবচেয়ে বেশী।

৩। অক্সিজেনের অভাব—অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, শক্তি-সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি বিশ্লেষিত (decomposed) হতে পারে না। রক্তের লোহিত

কণিকাগুলি অক্সিজেন বহন করে, এবং তারা এই বিশ্লেষণের কাজ করে দেহের উপাদানগুলি থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। শিরাগুলির পরিবহন কার্যও অক্সিজেন ছাড়া চলে না। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তি বা উত্তাপ সৃষ্টি হতে বাধা হয়। কাজেই দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তির মুক্তিলাভ (release) হয় না, বিষ-সঞ্চয় দূরীভূত হয় না, ক্ষয়-পূরণ হয় না ; সুতরাং অবসাদ আসে।

অবসাদের রাসায়নিক কারণ—এ সম্বন্ধে মাইকেল ওয়েস্ট বলেছেন, "অবসাদে বলদায়ী জটিল পদার্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে, এবং দেহে কতকগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যায়, যেগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে।" উড্ওয়ার্থ ও মারকিস্ পেশীর অবসাদ সম্বন্ধে লিখছেন "পেশী-অবসাদের কিছুটা কারণ হচ্ছে, পেশীতে সঞ্চিত দাহিকা শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ব্যবহার দ্বারা ক্ষয়, আর কিছুটা কারণ হচ্ছে পেশীক্রিয়ার ফলে অপচয়জনিত বিষ-পদার্থ সঞ্চয়, তার মধ্যে একটি প্রধান রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে ল্যাক্টিক্ অ্যাসিড্। অবসাদ উৎপন্ন হলে পেশী ও অস্থিসংযোগ স্থানগুলিতে কিছুটা প্রদাহ (soreness) সৃষ্টি হয় ; তার ফলে সেই পেশীর ক্রিয়া বেদনাদায়ক হয়, এবং কাজ বন্ধ করে বিশ্রামের জন্যেই দেহের আগ্রহ দেখা যায়, যদিও অবশ্য তখনও পেশীগুলিতে আরো ক্রিয়ার শক্তি থাকে।" স্যাণ্ডিফোর্ড ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা অবসাদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দৈহিক ও স্নায়বিক হেতুগুলিই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। ম্যাক্ডুগ্যালের মতে এটা যথেষ্ট নয়। পুরস্কার (incentive) ও আগ্রহসৃষ্টির (motivation) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যেখানে পুরস্কারের আশা আছে, যেখানে আগ্রহ সৃষ্টি সহজ হয়, সেখানে অধিক পরিশ্রমেও ক্লান্তি বা অবসাদ আসে না। অনুভূতির দিক দিয়ে যা অশান্তিকর, তা ক্লান্তিকর। যেখানে জৈবশক্তির ক্রিয়া কোন গভীর অনুভূতির দ্বারা বাধাগ্রস্ত, সেখানেই ক্লান্তির মানসিক কারণটি সৃষ্টি হয়। যেখানে বাধা যত প্রবল সেখানে ক্লান্তির পরিমাণও বেশী। এই কথাটি তিনি প্রকাশ করেছেন একটি ফর্মুলা দিয়ে :—

$$\text{অবসাদের পরিমাণ} = \frac{\text{বাধার পরিমাণ}}{\text{মুক্ত শক্তির পরিমাণ}}$$

(Macdougall—Outline of Abnormal Psychology, p. 59-77)। বর্তমান কালে সমস্ত ক্রিয়ার

fatigue—পেশীর বা স্নায়ুর অবসাদ মাপবার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র বা উপায় ব্যবহার করা হয়।

১। **এস্‌থিসিওমিটার** (Aesthesiometer)—এ যন্ত্র দিয়ে ত্বকের স্পর্শানুভূতি মাপা যায়। অবসাদ যত বাড়ে অনুভূতি তত কমে যায়।

২। **ডাইনামোমিটার** (Dynamometer)—এ যন্ত্র দিয়ে grip বা হাত মুঠ করে কত জোরে ধরা যায় তা কিলোগ্রামে মাপা যায়। অবসাদের সঙ্গে হাতের জোরও কমে।

৩। **এরগোগ্রাফ্** (Ergograph)—এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন মস্তো (Mosso)। এ যন্ত্রে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত একটি টেবিলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর আঙুলের সঙ্গে একটি শক্ত সুতো দিয়ে একটা ওজন কপিকলের (pulley) উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এবার আঙুলটা বারে বারে সংকুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটাকে ওঠাতে-নামাতে হয়। অবসন্ন আঙুল আগের মতো দ্রুত আর ওজনটাকে নামাতে ওঠাতে পারে না। এটা দিয়ে আঙুলের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পরিমাপ করা যায়।

৪। **টোকা দেওয়া পদ্ধতি**—The tapping method—একটা আঙুল বা পেন্সিল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রুত টোকা দিতে হয়। প্রথমে যতটা দ্রুত টোকা দেওয়া যায়, ক্রমে আর ততটা পারা যায় না। এ দিয়ে অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

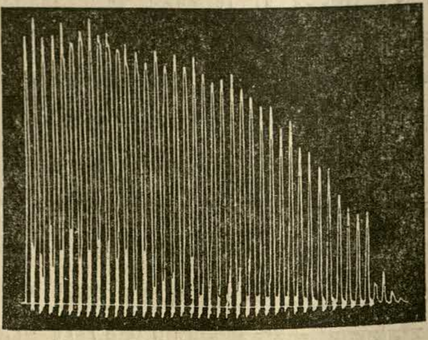

আগেই বলা হয়েছে যে, পেশী ও স্নায়ুর অবসাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু পেশীর অবসাদের পরিমাণ দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপবার চেষ্টা বহু

করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে কলটা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই মস্তো দেহ বা পেশীর অবসাদের মাধ্যমে স্নায়বিক বা মানসিক অবসাদ পরিমাপের যে চেষ্টা করেছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ ও থর্নডাইক্ তার সমালোচনা করেছেন। মানসিক অবসাদ মাপবার জন্যে কতগুলি উপায় চেষ্টা করে দেখা হয়েছে।

অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করা পরীক্ষা—The completion test—যাকে নিয়ে পরীক্ষা করা হবে তাকে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প পড়তে দেওয়া হল। কিন্তু লেখার মধ্যে কতকগুলি কথা বা কথার অংশ বাদ দেওয়া আছে। বলা রইল যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি পূরণ করে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তার পড়ার গতি আগের চেয়ে শিথিল হয়ে এসেছে, শব্দ পূরণ করবার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, তার ভুল হচ্ছে অথবা ফাঁকগুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এর থেকে তার মানসিক অবসাদের মাপ করা যেতে পারে।

FATIGUE CURVE

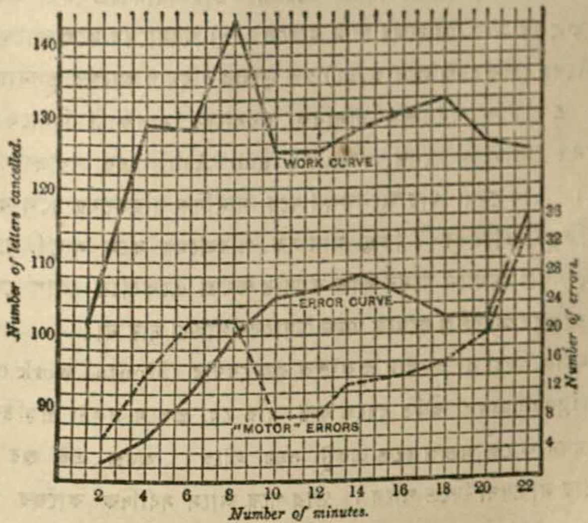

অক্ষর কেটে দেওয়া বা মুছে দেওয়া পরীক্ষা—Cancellation test or letter erasing test—এ পরীক্ষায় বলা থাকে, একটি বইয়ের লেখা পড়তে পড়তে বিশেষ একটা অক্ষর দাগ দিয়ে কেটে কেটে যেতে হবে।

এখানেও তার পড়ার গতির শৈথিল্য, ভুলের পরিমাণ, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি তার মানসিক অবসাদের পরিমাপের উপায়।

শেখা বা মুখস্থ করা নিয়ে পরীক্ষা—The Calculation test or Memorisation test—কোন একটা নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে হয় এবং কতটা সময় লাগে তা দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপা যেতে পারে।

হিসাব দিয়ে পরীক্ষা—The Calculation Test—এ পরীক্ষায় কতগুলি যোগ, বিয়োগ, গুণন ইত্যাদি অংক কষতে দেওয়া হয়। যখন মন অবসন্ন তখন অংকগুলি কষতে অনেক সময় লাগে, অনেক বেশী ভুল হয়। এ দিয়ে অবসাদের পরিমাণ মাপা যায়।

মানসাংক ব্যবহার করে মানসিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন থর্নডাইক্। তারপর কলাম্বিয়া বিশ্ববিত্যালয়ের টিচার্স কলেজের জাপানী ছাত্রী মিস্ আরাই (Miss Arai) মানসিক অবসাদ নির্ধারণ কি করে করা যায় তা নিয়ে উপরোক্ত নানা পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, ব্যক্তির কাজের উৎকর্ষের যথেষ্ট হানি না হলেও (১) অবসাদের ফলে কাজের গড় সময় আগের চেয়ে বেশী লাগছে, (২) গড় ভুলের পরিমাণ আগের তুলনায় বেশী হচ্ছে। এ দু'টিকে তাই তিনি মানসিক অবসাদের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্টার্চ ও অ্যাশ্ (Starch and Ash) এর পরীক্ষার ফলও অনুরূপ। এতে দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরে মানসিক পরিশ্রমের ফলে কাজের উৎকর্ষ কিছুটা হানি হয়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণ মানসিক অবসাদ, অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়েছে বা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

মানসিক ক্রিয়া বা অবসাদ প্রকাশক বক্র রেখার (Mental work curve or Fatigue curve) রীতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রথমে একটা প্রস্তুতির স্তর থাকে, যখন কাজে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে। অবশ্য এই স্তর সবার বক্ররেখায় না দেখা দিতে পারে। তার পরে আসে সর্বাধিক কাজের অবস্থা (the stage of warming up)। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কাজের গতি মন্থর হয়ে আসে, অবসাদের চিহ্ন দেখা দেয়, ভুলের আধিক্য হয়। তবে এর মাঝে মাঝে চেষ্টার দরুণ হঠাৎ উদ্যম (spurt) বা কাজের উন্নতি দেখা দেয়, তবে সে বেশীক্ষণের জন্য নয়। অনেক সময় ক্ষণিক বিশ্রামে বা মানসিক আনন্দের

ফলে কাজের উন্নতি দেখা যায়। তবে থর্নডাইকের মতে এই নিয়মগুলির ক্রিয়া সর্বদা অবসাদের বক্র রেখায় দেখা যায় না।

বিদ্যালয়ের কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ—Fatigue in School—স্কুলের যে কাজ তাতে ছেলেমেয়েরা কি বাস্তবিকই অবসন্ন হয়? এ অভিযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়—স্কুলগুলি 'শিশুপাল-বধে'র কারখানা। কচি কচি ছেলেমেয়েরা বইএর চাপে, পড়ার চাপে, কাজের চাপে হাঁপিয়ে ওঠে, ইত্যাদি। এ নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা আমাদের দেশে হয় নি। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সম্ভবতঃ এ অভিযোগের পেছনে যতটা অন্ধ স্নেহ আছে ততটা বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। সম্ভবতঃ স্কুলের পড়া বা কাজ ছেলেমেয়েদের যতটা অবসন্ন করে তার চেয়ে অনেক বেশী বিরক্ত করে। ক্ষুধার্ত ছাত্রছাত্রী, বদ্ধগৃহ, খেলাধূলা ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, দরিদ্র ও সংসার-যাতনাক্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহহীন শিক্ষা ইত্যাদি বহু কারণেই স্কুলের পড়া ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে না। তারা বিরক্ত (bored) বোধ করবে, ক্লান্ত বোধ করবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ বাস্তবিক অবসন্ন বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আমাদের স্কুলগুলিতেও বিদ্যমান নেই। থর্নডাইক্ এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তও করেছেন যে, স্কুলের সব কাজই ছাত্রছাত্রীদের অবসাদ সৃষ্টি না করেও করা যায়। এটা যে হয় না, তার কারণ অবসাদ নয়, বিরক্তি।

School-work and Fatigue—স্কুলের কোন কোন বিষয় বেশী অবসাদ আনে এ কথা কি সত্যি? ভাগনার (Wagner) এ নিয়ে যে পরীক্ষা করেছেন তাতে মনে হয় এ কথাটা মিথ্যে নয়। অবসাদ জন্মাবার ক্ষমতা অনুসারে তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিষয়কে নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছেন—

অংক	...	১০০
ল্যাটিন্	...	৯১
গ্রীক্	...	৯০
ইতিহাস ও ভূগোল	...	৮৫
ফরাসী ও জার্মান	...	৮২
প্রাণী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান	...	৮০
অংকন ও ধর্মালোচনা	...	৭৭

দেখা যাচ্ছে ভাগনারের দেশে ধর্মালোচনা চিত্রাঙ্কনের মতোই মনোরম! তার কারণ নিশ্চয়ই ধর্মালোচনাটা চলে গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে, উপদেশটা থাকে অন্তে এবং সেটা গৌণ।

অবসাদ দূরীকরণের উপায়—Remedy for fatigue—প্রকৃতি দেহের মধ্যেই ব্যবস্থা করেছে ক্ষয়পূরণের। ক্ষয়পূরণ ও অবসাদ দূর করবার জন্যে প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নিদ্রা। এই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তি-সঞ্চারী উপাদানগুলি নূতন করে গড়ে উঠবার সুযোগ পায় (replenishing the supply of energy-producing compounds), আর সুযোগ পায় দেহ অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সঞ্চিত বিষ বিদূরণের (elimination of waste products by oxidation)। খাদ্য গ্রহণও ক্ষয়পূরণের একটা প্রধান উপায়, বিশেষ করে শর্করা (sugars) জাতীয় খাদ্য। অবসাদ দূর করতে মৃদু উত্তেজক পানীয় চা, কফি এবং স্বল্প ধূমপানও সাহায্য করে থাকে। সঙ্গীত অবসাদ দূরীকরণের সহায়ক। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও শ্রান্তি দূর হয়। মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা শান্ত করতে পারলে দেহ সহজে বিশ্রান্ত হয়। সাময়িক মানসিক অবসাদ, যদি সেটা গুরুতর না হয়, তা হলে বিষয় পরিবর্তনে তা অনেক সময় প্রশমিত হয়। অনেক সময় অবসাদের সঙ্গে দেখা দেয় অমনোযোগিতা, সেটার প্রয়োজন আছে। সেটা হচ্ছে অবসাদের কুফল থেকে দেহের আত্মরক্ষার একটা কৌশল।

আগেই বলা হয়েছে, অবসাদ দূর করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ঘুম। কিন্তু ঠিক কতটা ঘুম কার দরকার, সেটা নির্দিষ্ট করা শক্ত। কোন কোন ছেলে-মেয়ের অনেক বেশী ঘুম দরকার, অন্যদের চেয়ে। হয়তো এর কারণ তারা অন্যদের তুলনায় সহজে অবসন্ন হয়, হয়তো বা তাদের ক্ষয় পূরণ হতে বেশী সময় লাগে, অথবা সম্ভবতঃ ঘুমের মধ্য দিয়ে কি করে সব চেয়ে বেশী বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে, সে অভ্যাস তারা করে নি। কাজেই ঘুমের পরিমাণ দিয়ে শক্তি লাভ কতটা হল তা মাপা যায় না।

অবসাদের কুফল—Dangers of Fatigue—অবসাদ ক্ষয়ের ইঙ্গিত এবং ক্ষয়পূরণের জন্য দেহ ও মনের আবেদন। কাজ করলেই দেহের ক্ষয় অনিবার্য, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই সে ক্ষয়পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষয় যদি এত দ্রুত হয় যে পূরণের অবকাশ থাকে না—অথবা ক্ষয় যদি এত অধিক দূর

অগ্রসর হয়ে থাকে যে পূরণের আর উপায়ই নেই, তা হলে তাতে বিপদ ঘটবেই।

এটা অত্যন্ত সহজ কথা, অবসন্ন দেহ বা মনের কাজ, সুস্থ দেহ ও মনের তুলনায় নিকৃষ্ট হবেই। পরিমাণও কম হবে। ভাল কাজ পেতে হলে চাই সুস্থ উৎসাহপূর্ণ দেহ, ও সতেজ প্রফুল্ল মন। ক্লান্ত দেহ ও মনে যে কাজ করা হবে তাতে ভুল-ভ্রান্তি বেশী থাকবে। অবসাদের ফল, মনঃসংযোগের হ্রাস। এ অবস্থায় স্মরণ রাখবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই অতিরিক্ত অবসাদ যাতে না আসে এবং অবসন্ন দেহ ও মন যাতে আবার সতেজ হয়ে উঠতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অবসন্ন দেহ বা মনে যে কাজ, তাতে কার্য-শক্তির অযথা অপব্যয় ঘটে। সেটা নিতান্তই লোকসান।

দেহের নিজের মধ্যেই অবসাদ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক না হয়ে উঠে, তার ব্যবস্থা রয়েছে। পেশীগুলো অতিমাত্রায় অবসন্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই যে স্নায়ুশিরা গুলো (nerves) পেশীকে চালায়, তারা তাদের কাজ বন্ধ করে। শিরাগুলি যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্যে স্নায়ুসংযোগগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা (resistance) বেড়ে যায়, যাতে বিপদগ্রস্ত শিরাতে আর শক্তি সঞ্চালিত না হতে পারে। আর তা ছাড়া শিরা বা পেশী সম্পূর্ণ অবসন্ন হওয়ার আগেই অবসাদবোধ প্রবল হয়ে দেহকে কাজ থেকে বিরত হতে তাগিদ দেয়। প্রকৃতিতেই রয়েছে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদের কুফল ও তার প্রতিকার— ছাত্রদের অবসাদ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা হল, এবার শিক্ষকের দিকেও একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। অবসন্ন শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষম বাধা, প্রকাণ্ড অপচয়। অবসন্ন অবস্থায় শিক্ষাদান প্রাণহীন কর্তব্যপালনে পর্যবসিত হয়। শিক্ষকের মনোযোগের শৈথিল্য ঘটলে ক্লাশের ছাত্রদেরও শৃংখলার হানি হয়। শিক্ষক খিট্‌খিটে হয়ে বৃথা ছাত্রদের শাসন পীড়ন করেন, তাতে ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধের মর্যাদা ও মাধুর্য নষ্ট হয়। যে শিক্ষকের মন ক্লান্ত, নতুন জ্ঞান আহরণের উৎসাহ তাঁর আসবে কোথা থেকে? আর একই পড়া বারে বারে পড়ানোর বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষকের মনে বিরক্তি আসাও একটু অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। সমাজের পক্ষে এ সমস্যা মোটেও উপেক্ষণীয় নয়,

অথচ এ বিষয়ে এখনও রাষ্ট্র বা সমাজের দৃষ্টি যথেষ্ট জাগ্রত নয়। সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষককে নিত্য অভাব ও অনিরাপত্তাবোধের সর্বনাশা চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাকে বিদ্যা আহরণের ও আত্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে। তাঁর কাজের মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন করা দরকার ছাত্রদের বেলায়। তাঁর কাজ বা পড়ার বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য কিছুটা আনতে হবে। এ সবই ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু সমাজকে নিজের স্বার্থেই এ সার্থক ব্যয়ে অগ্রণী হতে হবে। আমেরিকা আমাদের তুলনায় কত বেশী অগ্রসর এ বিষয়ে। কিন্তু তথাপি তাঁরা এখনও শিক্ষকের অবসাদের বিপদ সম্বন্ধে কত বেশী সচেতন—কত আলোচনা, পরীক্ষা এখনও এ বিষয়ে হচ্ছে। (Millard-Child Development, p. 436) রাশিয়ায়ও এ সুস্থ সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। (Deanna-Levin – Education in Soviet Russia)

অবসাদের প্রয়োজনীয়তা—The value of fatigue—জীবনই কর্ম, কর্মেই দেহ ও মনের ক্ষয়। কিন্তু ক্ষয় না হলে বৃদ্ধি বা বিকাশও তো সম্ভব নয়। ভাঙার মধ্য দিয়েই চলে গড়া। দেহের কোষগুলো যখন ভেঙে যাচ্ছে, তাকে বলে, ক্যাটাবোলিজম্ (Katabolism) আর যখন গড়ে উঠছে তখন তাকে বলে, মেটাবোলিজম্ (Metabolism)। এই ক্যাটাবোলিজম্ ও মেটাবোলিজম্ হাত ধরাধরি করে চলে। যখন ব্যায়াম করি তখন পেশীর শক্তিসঞ্চারী তন্তু ও কোষগুলি ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তার ফলেই পেশীটি পূর্বের চেয়ে সতেজ ও সবল হয়ে উঠছে। যতক্ষণ ক্ষয়পূরণ হতে থাকে—অর্থাৎ ভাঙার চেয়ে গড়াই বেশী হয়, ততক্ষণই দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি। বাল্য ও কৈশোরে তাই ক্যাটাবোলিজম্ ও মেটাবোলিজম্ দুইই দ্রুততর। বৃদ্ধ বয়সে ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষয়টা সব পূরণ হচ্ছে না। কাজেই আসছে জরা, আসছে দুর্বলতা, শীর্ণতা, ও শক্তিহীনতা।

মাইকেল্ ওয়েস্ট-এর ভাষায় বলা যায়, সুস্থ সবল দেহের মধ্যে অবসাদের ক্ষুধা (the hunger for fatigue) রয়েছে। অবসাদের ক্ষুধা মানেই জীবনের বিস্তৃতি ও বিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এটা হচ্ছে জীবনের মূল ধর্ম—"The hunger for fatigue is the hunger for growth and the hunger for growth is the impulse of life itself."

বোর্‌ডম বা বিরক্তির ও হয়তো কিছু প্রয়োজন আছে। প্রাচীনেরা বলেন চুপ করে বসে ধর্মবক্তৃতা শোনাও ছোটদের পক্ষে একটা সুশিক্ষা। এতে আত্ম-সংযম ও আত্মশাসনের অভ্যাস তৈরি হয়। হয়তো কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তবে সত্য যেটুকু আছে, তার চেয়ে মিথ্যা বোধ হয় ঢের বেশী। যেখানে বিরক্তি, সেখানে বোঝা যাচ্ছে কর্মের সহজ স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অবসাদকে যেমন বলা যায় বৃদ্ধির জন্যে আকাঙ্ক্ষা, তেমনি বিরক্তিকে বলা যেতে পারে কর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা। স্কুলে পড়াশুনার যে ব্যবস্থা তাতে অবসাদ নিবারণের দিকে অনেক সময় দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু বিরক্তি বা বোর্‌ডম্ যাতে না আসে, সে দিকে আমরা খুব কমই নজর দিই। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণশক্তির যে অপচয় ঘটে সেটা অধিকাংশ সময়ই ঘটে অবসাদের ফলে নয়, বিরক্তির ফলে। শিশুর যাতে অবসাদ না আসে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিশ্চয়ই কর্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সাবধানতাও ভাল নয়। জীবনে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, মানিয়ে নিয়ে চলার (adaptation to adverse circumstances) শিক্ষাও একটা মস্ত শিক্ষা। তাই ছেলেমেয়েদের নিতান্ত পুতুপুতু করে গড়ে তুললেও ফল ভাল হয় না। দেখা দরকার, প্রকৃত দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি যাতে না হয়। কিন্তু সমস্ত অবসাদ ও বিরক্তির সম্ভাবনা দূর করে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলাটা কিছু নয়। রুশো তাঁর 'এমিল্'-এ শিশুকে 'শক্ত' করে গড়ে তুলবার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত সহজে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ অভ্যাসটা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বিরক্ত হলেই অর্থাৎ "ভাল না লাগলে"ই কাজটা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ, সু-পরামর্শ নয়। বিরক্ত হলেই কার্যক্ষমতা বাস্তবিক খুব হ্রাস নাও পেতে পারে। তাই একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রম করবার, কঠিনকে আয়ত্ত সাহস অর্জন করবারই বয়স, তাতে উৎসাহিত করা, সুশিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু যদি দেখা যায় একটা বিষয় রোজই অধিকাংশ ছাত্রেরই বিরক্তি উৎপাদন করছে তবে শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে এটা বুঝতে হবে এবং তার প্রতিকারও করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত অবসাদ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য—
Some facts regarding fatigue, which have been discovered or established through experiments on fatigue.

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার ফলে অবসাদ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই পেশীর অবসাদ সম্পর্কে মস্তোর এরগোগ্রাফ (Ergograph) যন্ত্র ব্যবহার করে জানা গেছে।

১। কোন পেশী অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে কার্যক্ষমতা প্রথম দিকে দ্রুত কমতে থাকে। তারপর এই শক্তিহ্রাস মন্থর হয়ে আসে—কিন্তু অবসাদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আবার তখন শক্তি দ্রুত হ্রাস পায়।

২। যথোপযুক্ত বিশ্রাম (অনেক সময় ১০ সেকেণ্ড মাত্র) পেলেই পেশী তার পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পায়।

৩। গভীর অবসাদের পরেও যদি পেশী জোর করে কাজ করতে চেষ্টা করে তাহলে তার শক্তি ফিরে পেতে অনেক দেরী হয়।

৪। পেশী যত দ্রুতবেগে এবং যত বারে বারে সঙ্কুচিত হবে—অবসাদও তত দ্রুত আসবে এবং কাজের পরিমাণও তাতে কমতে থাকবে।

৫। পরিশ্রমের ফলে পেশী, শিরা বা স্নায়ুসংযোগক্ষেত্রে যে বিষসঞ্চার হয় তা বিদূরণে যদি বাধা হয়, অথবা ক্ষয়পূরক খাদ্যগ্রহণে যেখানে ত্রুটি ঘটে সেখানে পেশীর ক্ষমতা কমে যায় এবং অবসাদ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ দিন ধরে এটি ঘটলে পেশী স্থায়ীভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে।

৬। কতগুলো পেশী কাজ করে অবসন্ন হয়ে পড়লে, অন্য যে সব পেশী কাজ করে নি, তারাও শ্রান্ত হয় এবং তাদেরও কার্যক্ষমতা কমে যায়।

৭। মানসিক অবসাদ পেশীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৮। চা, কফি, তামাক জাতীয় মৃদু উত্তেজক পদার্থগুলি অবসাদ দূরীকরণে সাময়িকভাবে সাহায্য করে সত্য, কিন্তু এদের কুফল কতটা হয় এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে শর্করা (Sugar বা Glucose) অবসাদের পর খেলে, বা ইনজেকসন্ করলে অল্পক্ষণের মধ্যে পেশীর কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে দেহের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিলে (যেমন Insulin দিয়ে) অবসাদ বৃদ্ধি পায়।

৯। মেয়েদের সহের মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী। যে অবস্থায় ছেলেরা অধৈর্য হয়ে ওঠে, মেয়েরা সেখানে অনেকটা শান্ত থাকে। অবশ্য, এটা কতকটা সামাজিক শাসনেরও ফল। ছেলেদের শক্তিক্ষয়ের মাত্রা দ্রুততর, মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের সময় দীর্ঘতর। তাই সমান

সময় কাজ করে তারা অবসাদগ্রস্ত হয়। ছেলেদের প্রকৃতি হচ্ছে ক্যাটাবোলিক্। বেপরোয়া শক্তিক্ষয়, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে ছেলেদের আনন্দ। মেয়েদের প্রকৃতি হচ্ছে মেটাবোলিক্। তারা শক্তিসংগ্রহ ও শক্তিসঞ্চয়ে অধিক যত্নবতী। তারা সঞ্চয়ী, হিসাবী। এর কারণ সম্ভবতঃ প্রাণধর্মমূলক (biological)। প্রকৃতি মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারে সঞ্চয়ী করেছে, কারণ তাকে মাতৃত্বের বৃহৎ ক্ষয়ের দাবি ভবিষ্যতে মেটাতে হবে। পুরুষ জুয়াড়ীর মতো শক্তিক্ষয় করে, প্রকৃতির বাধা ভেঙে সে ছুটে চলে, বৃহত্তর লাভের আশায়—man tends to gamble and gain by the hope of greater return. তাই সে স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল। মেয়েকে ঘর বাঁধতে হয়, ঘর সামলাতে হয়, তাই সে সাবধানী, তাই সে শক্তিসঞ্চয়ে প্রয়াসী।

বিংশ অধ্যায়

খেলা—Play

'জগৎ পারাবারের তীরে, শিশুরা করে খেলা'—জগৎ জুড়েই এই লীলা। শিশুরা খেলা করে,—তাতে আনন্দ পায়, তাতে মেতে ওঠে। সব দেশে, সব কালে মানব-শিশু খেলা করে আসছে। গায়ে ধুলো লাগছে, তাতে ভোলানাথের লজ্জা নেই, রঙীন পোশাক ছিঁড়েখুড়ে যাচ্ছে, তাতে দুঃখ নেই। দামী স্প্রিং এর বিলিতী খেলনা, আর সস্তা মেলায়-কেনা মাটির পুতুল, দুই-ই তার কাছে সমান, দুয়েই তার সমান আনন্দ! হয় তো বরং দেখা যাবে ওই চক্‌চকে দামী মোটরের চেয়ে তার আকর্ষণ বেশী, ওই ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা ন্যাকড়ার পুতুলটার ওপরই। মানুষের জীবনে অবিমিশ্র সুখ যদি কখনো থেকে থাকে, তা শিশুর নিশ্চিত-নির্ভর স্বতঃ-উৎসারিত খেলার আনন্দের মধ্যে। শিশু যখন খেলায় মত্ত, তখনই বুঝি সে "স্বভাবে" আছে। "খেলাই হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়া। খেলাতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের বালাই নেই, খেলাতেই খেলার আনন্দ। এখানে শক্তি স্বেচ্ছায় ব্যয়িত হচ্ছে, কিন্তু শিশুর মনে অন্ততঃ, তার লাভক্ষতি খতিয়ে দেখবার দুশ্চিন্তা নেই। "হাসির মতো খেলা তো শক্তিব্যয়ের একটা পথ। তা অবশ্যই উদ্দেশ্য-হীন নয়—যদিও জীবনের প্রয়োজনে যে উদ্দেশ্যগুলিকে আমরা আবশ্যক মনে করি তাদের কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে এ দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবশ্যক উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে খাদ্য ও বাসস্থান আহরণ, শত্রুর কবল থেকে পলায়ন, অথবা অন্য কোন বহিরঙ্গ প্রয়োজন। খেলাতে ক্রিয়াটি যেন নিজেই নিজের উদ্দেশ্য।"[১]

বড়রাও খেলা করে। কিন্তু তাতে যেন তার লজ্জা আছে, সে সম্পূর্ণ প্রাণ তাতে ঢেলে দিতে পারে না, যেমন পারে শিশুরা। কারণ, তার মনের মধ্যে একটা সংস্কার গভীরভাবে শেকড় গেড়েছে, খেলা হচ্ছে কাজের উলটো; তাই কাজের মানুষের পক্ষে খেলাটা হচ্ছে সময়ের অপব্যয়,—এটা ছেলেমানুষী। তাই খেলার স্বপক্ষে তাকে যুক্তি খাড়া করতে হয়, তার জন্যে ওকালতী করে-

১ Thouless—General and Social Psychology, P. 211.

পরকে আর নিজেকেও বোঝাতে হয়। বলতে হয়, খেলাটা দরকার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে, শরীর তৈরি করার জন্যে, কাজের সর্বনাশা চাপ থেকে মাঝে মাঝে মনটাকে হাঁফ ছাড়বার অবসর দেবার জন্যে! যুক্তিগুলি মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তি যে ঘটা করে দিতে হয়, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মনের মধ্যে খেলা সম্বন্ধে বড়দের একটা খচ্‌খচি থেকে যাচ্ছে।

এতো গেল তথ্য। মনোবিজ্ঞানীরা সবাই এ সব কথা জানেন। কিন্তু তাঁদের মন এতেই সন্তুষ্ট নয়। তত্ত্বসন্ধানী, বিজ্ঞানী মন প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করে, কেন এমনটি হয়? কেন শিশু খেলা করে? কেন খেলাতে সে এত আনন্দ পায়? কেন খেলা এত স্বতঃস্ফূর্ত? কেন এতে কোন শিক্ষার দরকার নেই? খেলা কি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন, না প্রকৃতির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য এই আপাত- উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধিত হচ্ছে? এ নিয়ে পুরোনো ও নতুন কয়েকটি মত আছে।

সব চেয়ে পুরোনো মত হচ্ছে জার্মান কবি শিলারের (Schiller), যেটা পরবর্তীকালে হারবার্ট স্পেন্‌সারও (Herbert Spencer) প্রচার করেছিলেন। এ মতটা হচ্ছে যে খেলা শিশুর বাড়তি শক্তির প্রকাশ। শিশুকে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে, বা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে শক্তি ব্যয় করতে হয় না। খাদ্য, গৃহের আশ্রয়, সেবা ও পুষ্টি সে অনায়াসে পাচ্ছে, পিতামাতা-পরিবারের কাছ থেকে। তা থেকে তার শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে,—অথচ সে শক্তি ব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শক্তি বাড়তি থাকছে,—তার তো প্রকাশ চাই। সেই প্রকাশ হচ্ছে খেলা।[২]

এ মতের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু এটা দিয়ে খেলা সম্বন্ধে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। বাড়তি শক্তির ব্যয়ই যদি খেলার উদ্দেশ্য হয় তবে তো যে কোন ভাবে এলোমেলো কতগুলি পেশী ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা হতে পারে। কিন্তু খেলা তো একেবারেই এলোমেলো ক্রিয়া নয়। খেলার যে কতকগুলি সাধারণ রূপ আছে তা কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। আবার দেখি

২ According to this view, play is always be expression of a surplus nervous energy. The young creature, being tended and fed by its parents, does not expend its energy upon the quest of food, in earning its daily bread and therefore, has a surplus store of energy which overflows along the most open nervous channels producing purposeless movements of the kind that are most frequent in real life. McDougall—Social Psychology. p. 92.

খেলাতে শিশুর ক্লান্তি নেই। শরীর যখন ঘেমে গেছে,—দেহযন্ত্র যখন সম্পূর্ণ ক্লান্ত, তখনও খেলায় তার মন থাকে। অবশ্যি এ কথাটা সত্য, যখন দেহ সজীব ও সতেজ, তখন খেলাটা জমে ভাল। নান্ আর একটা যুক্তি দিয়েছেন এ মতের বিরুদ্ধে। একটা এঞ্জিন যন্ত্রের বাড়তি বাষ্পটা নানা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এঞ্জিন তার বাড়তি বাষ্পের শক্তিটা ব্যয় করছে নিজেকে আরও শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরি করতে, এ রকমটা আমরা কখনও ভাবতে পারি না। কিন্তু খেলাতে তো এই হচ্ছে।[৩] খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে দেহেমনে বলশালী করে তোলে।

আর একটা মত, যেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে,—সে হচ্ছে কার্ল গ্রূস (Karl Groos)-এর। এই মত প্রথম মলব্রানস্ (Malebranche) ইঙ্গিত করেছিলেন। বর্তমান কালে গ্রূস 'দ্য প্লে অব্ অ্যানিমাল্‌স' এবং 'দ্য প্লে অব্ ম্যান্' এই দুই গ্রন্থে, এ মত খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন। গ্রূস্-এর মতে শিশুর খেলাটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি। ভবিষ্যৎ জীবনে সংগ্রামের জন্যে যে ক্রিয়াগুলি দরকার হবে, তার রিহার্সেল দিয়ে নেয় শিশু খেলার মধ্য দিয়ে। তাই শিশুরা রান্নাবাড়া খেলে, ঘর বানানো খেলে, পুতুলের বিয়ে দেয়, কানাই মাষ্টার সেজে বেড়াল-ছানা পড়ুয়াদের তাড়না করে। পশুর মধ্যেও তাই। বেড়াল-ছানা উলের বলকে তাড়া করে, থাবা দিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করে, কুকুর-ছানা একটি আর একটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আদর করে গলা কামড়ে ধরে, কিন্তু এ সবই করে খেলার ছলে; বেড়াল-ছানা ঠিক আঁচড়ে দেয় না, কুকুর-ছানাও ঠিক কামড়ায় না। যে প্রবৃত্তিগুলি ও ক্রিয়াগুলি পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হবে, খেলার মধ্য দিয়ে তাদের শান দিয়ে রাখা হচ্ছে। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে খেলার রূপগুলি ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর ক্রিয়ার পূর্বাভাস, যেমন, বিড়াল ছানা যে কোন নড়ন্ত দ্রব্যকে খেলার মধ্যে তাড়া করে যায়; এতে করে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁদুর শিকারের নিপুণতা লাভ করে। তেমনি কুকুর-ছানা খেলায় খেলায় লড়াই করে; ভবিষ্যতে এটা তার খুব কাজে লাগবে। খেলার মূল কথাই হোল জৈব প্রয়োজনসাধন।[৪] গ্রূস্ বলেন, নিম্ন ইতর প্রাণীরা জন্মের থেকেই সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন, পরিপূর্ণ বিকশিত ইন্দ্রিয়াদি

---

৩ Nunn—Education ; Its data and first principles, p. 70.

৪ Ross—Educational Psychology.

নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতি তাদের চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে। তাদের কোন প্রস্তুতির দরকার নেই। অন্ধ ও অব্যর্থ সংস্কার তাদের জীবনের পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী উচ্চ স্তরের জীবের বাচ্চারা, বিশেষ করে মানব শিশু, জন্মকালে অসহায়। তাদের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অপরিণত। তাদের যত্নের সঙ্গে লালন করতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়, ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে হয়। সে প্রস্তুতি হয় অচেতনভাবে এবং অনায়াসে, খেলার মধ্য দিয়ে। তাই খেলায় রুচি দেখা যায় মানব শিশুর মধ্যে ও অন্যান্য উচ্চতর জীবদের মধ্যেই। কাজেই স্পেন্সারের মত যে, বাড়তি শক্তির প্রকাশ হয় খেলার মধ্য দিয়ে। এ কথাটি উলটে গ্রূস্ বললেন, শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই ছোটরা খেলায় মেতে ওঠে। গ্রূস্ কাজেই শিলার্, ও স্পেন্সারের মত উলটে দিয়ে বললেন, একথা ঠিক নয় যে জন্তুশাবকেরা খেলা করে, যেহেতু তাদের বাড়তি স্নায়বিক শক্তি আছে ; বরং আমরা একথাই বিশ্বাস করব যে উচ্চতর প্রাণীদের শৈশবের অপরিণতির জন্যই তারা খেলা করে।"[৫]

অনেকদিক দিয়ে গ্রূস্-এর মত সত্য বলে মনে হয়। ছেলে-মেয়েদের অনেক খেলাই যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাষ (anticipation) তাতে সন্দেহ নেই। আর মানব শিশুর জন্মকালে অসহায়তা তার মৌলিক প্রবৃত্তি-গুলির নমনীয়তার লক্ষণ, এ কথাও সত্য বলে মনে হয়। এই নমনীয় বৃত্তিগুলি বুদ্ধিদ্বারা যাতে উপযুক্ত ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সে জন্যে তার দীর্ঘ বাল্যকাল আর ক্রীড়াপরায়ণতা সহায়ক, এ সিদ্ধান্ত খুব অন্যায় মনে হয় না। কিন্তু শিশুদের সব খেলা গ্রূস্-এর এ মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্ট্যান্‌লি হল্ তাই এই মতকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, এ মত অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, অগভীর ও বিকৃত।[৬] ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এ মতকে আর এক দিক দিয়ে সমালোচনা করেছেন। গ্রূস্-এর মতে খেলাটা শিশুর একটা জন্মগত সংস্কার (instinct) কিন্তু প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে একটি বিশেষ অনুভূতি জড়িত থাকে। খেলার সাথে এমন কোন নির্দিষ্ট অনুভূতি জড়িত থাকে না। ছেলেরা বা কুকুরের বাচ্চারা যখন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে তখন উৎসাহ বা শারীরিক বল কিছুরই অভাব থাকে না—শুধু ঝগড়ার (pugnacity) সঙ্গে স্বাভাবিক যে অনুভূতি রাগ

৫ McDougall—Social Psychology. p. 93.

৬ Stanley Hall—Adolescence, p. 202.

(anger) তার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্যে এ প্রস্তুতি, এ মত নিতান্ত 'জোলো' বা অবাস্তব। ব্রাড্‌লে একটি প্রবন্ধে এই অসঙ্গতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে (এবং ম্যাক্‌ডুগ্যালের কাছেও) নিতান্ত অলীক ও টেনেবুনে (far-fetched) ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। ব্রাড্‌লে বলেন, "খেলার মধ্যে শিশুদের একটা সংযম-বোধ থাকে। এ সংযমই পরবর্তী কালে খেলার নিয়মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে।"[৭] অপরিণত কুকুর শাবক ও মানব শিশুর খেলার মধ্যে এতটা দার্শনিকতা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। বরং উল্টোটাই সত্যি। খেলার মস্ত আনন্দ যে তাতে পদে পদে বাধা নেই, নিষেধ নেই। শিশুরা জানে যেখানে পদে পদে বাধা, পদে পদে শাসন, তাকে বড়রা বলে 'কাজ'। বড়দের খেলাও কি অনেক সময়ে কাজ-পালানো (escapism) মনোবৃত্তি থেকে উদ্বুদ্ধ নয়? ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ খেলাকে একটা জন্মগত সংস্কার বা Instinct না বললেও, এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি সংস্কার—যেমন, দল বাঁধার প্রবৃত্তি (gregarious instinct), প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা, গঠন প্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, এটা স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খেলার উপযোগিতার কথাও অস্বীকার করেন না। "খেলার যে নানা রূপ আছে তা কোন একটিমাত্র সংস্কারসম্ভূত, একথা বলা যায় না। তথাপি খেলা অতি উচ্চ সামাজিক-মূল্য-সম্পন্ন জন্মগত কতগুলি প্রবণতা, একথা মানতেই হবে।"[৮]

এবার আর একটা মত আলোচনা করা যাক। এ মত প্রবর্তন করেছেন স্ট্যান্‌লি হল্‌ (Stanley Hall)। তাঁর মতে খেলার মূল কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে নয়; মনুষ্যের ক্রমবিকাশের অতীত পর্যায়ে তার মূল খুঁজে পেতে হবে। মানব দেহ যেমন তার উদ্ভিদ, কীট, এবং ইতর প্রাণী—জীবনের দীর্ঘ অতীত ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে, তেমনি তার মানসপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মধ্যেও রয়েছে তার অতীত মনুষ্যেতর জীবনের ছাপ। খেলার মধ্যে সেই অতীত চিন্তা-ভাবনা-রহিত সুখ স্বর্গের আনন্দকেই সে আবার স্বল্পকালের জন্য ভোগ করে।

'যৌবনের আনন্দিত হৃদয় যেমন করে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিত করে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়, যেন মানুষ এতে তার হারানো স্বর্গ ফিরে

---

৭ F. H. Bradley—Mind, N. S. Vol. XV, p. 468.

৮ McDougall—Social Psychology, p. 91.

পায়।"[৯] শিশু খেলার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্রম যেন পুনরতিক্রম করে। জন্মগত সংস্কারগুলির ক্রমপরিণতির ফলে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নানা ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে। খেলা হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়ার অভ্যাস যা জাতির অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এবং বর্তমানেও অপরিণত ইন্দ্রিয়ের মতো চলে আসে।[১০] ম্যাক্‌ডুগ্যাল এ মতের পক্ষে যুক্তি সামান্যই দেখতে পেয়েছেন এবং একে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। রস্ কিন্তু এ মতকে এত অশ্রদ্ধার সঙ্গে নস্যাৎ করে দেন নি। প্রাচীন গুহামানবের অনেক অভ্যাস ও ক্রিয়া আমাদের বহু ব্যবহারের মধ্যে এখনও তার চিহ্ন রেখে গেছে। এটা খুব কষ্ট-কল্পনা নয়। তবে এই মত দিয়ে সমস্ত খেলাকে ব্যাখ্যা করা শক্ত।

খেলা সম্বন্ধে আর একটি মত হচ্ছে যে, খেলা একটা রেচক বা জোলাপের কাজ (catharsis) করে। ভেতরের কতগুলি নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা আবেগ, যে-গুলির স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ নেই, সেগুলি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে ভেতরের বাষ্পের চাপকে কমিয়ে দেয়। ফ্রএড্‌পন্থীরা বলবেন, এ হচ্ছে libido-র ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment)-এর একটা 'নির্দোষ' পথ, যেটা সদাজাগ্রত সেন্সরের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ খুঁজে নেয়। অনেক খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার চেতন বা অচেতন ইচ্ছা পূরণ করে, সে খেলাগুলিকে আমরা বলি 'মনে-করো-মনে-করো (as if) কাজ। যেমন, যে শিশু তার বাস্তব জীবনে তার ইচ্ছানুযায়ী যথেষ্ট কেক্ পেলো না সে তার খেলার মধ্য দিয়ে অজস্র 'মনগড়া' কেক্ বিতরণ করতে ইচ্ছা করে।[১১] সেই জন্যই যখন অভিনয়ে বা ছবিতে আমরা দেখি যে একজন হাসিয়ে অভিনেতা (comedian) কাঁচের বাসন ভেঙে তছ্‌নচ্ করছে, পুলিসকে ঘুষি মেরে উলটে দিচ্ছে, মদ খেয়ে সুবেশা ও উন্নাসিকা মহিলার গায়ে ঢলে পড়ে তার পোশাক কর্দমাক্ত করে দিচ্ছে, আমাদের মাঝে যে আদিম বর্বর লুকিয়ে আছে, সে খুশী হয়। খেলার ছলে সেই গুহামানব প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির একটা বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছে। এ মতটা তাই স্ট্যানলি হল্-এর মতের পরিপোষক। মদ-খাওয়ার সম্পর্কে অনুরূপ একটা মত প্রকাশ করেছেন ফ্রএড্, "মদের প্রভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরা আবার বালকের মত যুক্তির চাপমুক্ত মানসিক উত্তেজনার সম্পূর্ণ অবাধ প্রকাশে আনন্দলাভ করে থাকেন।"

৯ Stanley Hall—Adolescence, p. 203.
১০ Mc Dougall—Social Psychology, p. 92
১১ Gates and Jersild—Educational Psychology, p. 206
১২ Quoted by W. Fielding-Mastery through Psycho analysis.

খেলার মধ্য দিয়ে শিশু-মনের অনেক বিরোধ (tension) হালকা হয়ে যায়,—বহু শিশুর মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এ কথাটি জানা গেছে। শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক রোগের চিকিৎসায় খেলা আজ তাই এক প্রধান স্থান অধিকার করেছে। খেলার সাহায্যে মানসিক দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত কারণ যেমন বোঝা সম্ভব হয়, তেমনি বিরোধের অবসানও ঘটে।

এ মতের মধ্যেও কিছুটা সত্য আছে তা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু ফ্রয়েড্-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত নই যে, শিশুর সমস্ত খেলার মধ্যেই রয়েছে কামের অবদমনজনিত মানসিক অশান্তির মুক্তি। হয়তো কোন কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের খেলায় এ কথাটা সত্য হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শিশুর খেলা তাদের মানসিক যন্ত্রণা বা উদ্বেগ থেকে মুক্তির পথ, এ কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত। মেলানী ক্লীন্ (Melanie Kleen) বরং উলটো কথা বলেন, যে সব ছেলেমেয়েরা মানসিক অসুস্থ (neurotic), তাদের একটা লক্ষণ যে তারা খেলা করতে পারে না বা ভালবাসে না।[১৩] খেলাটা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই আমরা মনে করি।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর কল্পনা নানাদিকে বিস্তারের পথ পায়, এবং তার অহংবুদ্ধির পরিতৃপ্তি ঘটে; তার দেহ মন সুস্থ ও সবল হয়। যেমন কাজ, তেমনি খেলাও সম্ভবতঃ একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং তাই একটা সহজ সূত্র দিয়ে সব খেলার একটা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। খেলার মূলে থাকে নানা প্রবৃত্তি ও আগ্রহ, যেমন থাকে কাজের বেলায়, তাই কাজ ও খেলার মধ্যে বিভেদটা খুব পাকা নয়।[১৪]

খেলা ও কাজ—তবুও খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে হলে একথা বলা চলে যে, খেলা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত, আপন আনন্দে উৎসারিত; এর প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা বা বাইরের তাগিদের অনুপস্থিতি। আর কাজ বলতেই বুঝি বাইরের চাপ, কর্তব্যের তাগিদ। কিন্তু এই প্রভেদটা আপেক্ষিক। অনেক খেলাতেই যথেষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়, যদিও সে নিয়ম আপন ইচ্ছাতেই গৃহীত। আবার কাজের মধ্যে মানুষ যখন আনন্দ খুঁজে পায়, কর্তব্য যখন নিজের অন্তর থেকে গৃহীত হয়, তখন কাজের স্বরূপ পরিবর্তিত

১৩ Melanie Klein—The Psychology of Children.

১৪ McDougall—Social Psychology, p. 96.

হয়ে যায়। আনন্দ যখন কর্মের আকারে আপনাকে প্রকাশ করে, তখন সেই কর্ম ও খেলার মধ্যে কোন প্রকারের বিভেদ থাকে না। প্যাট্রিক তাই খেলা ও কাজের বিভেদ রেখাকে দিয়ে খেলা ও কাজের একটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এমন অনেক খেলা আছে যার উদ্দেশ্য নিছক সময় কাটানো, আবার অনেক খেলা আছে যা শিক্ষামূলক, যার সাহায্যে স্বাস্থ্য ও চরিত্রের নানা দিকে বিকাশ ঘটে। এমন বহু খেলা আছে যার জন্য চাই নিষ্ঠা, ধৈর্য, একাগ্রতা ও দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন। যেমন শুধু দাঁড়ার জাগিয়ে দাঁড়া ও লক্ষ্যবিহীন কর্মের দাসত্ব থেকে মুক্তি আছে কোন কোন খেলায়, তেমনি আছে কাব্য, শিল্প ও তত্ত্বাবিষ্কারের আনন্দে কর্মের মুক্তি। এখানে কাজ ও খেলা একাকার।

এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থের মতটাও উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—খেলার সাধারণ বলে আলাদা কোন সংস্কার এ আগ্রহের ভিত্তি নয়। খেলায় আনন্দলাভের অনেকগুলি উৎসই ক্রিয়া করে। কোন কোন খেলাতে যুদ্ধের অনুকরণ আছে, তাতে যুদ্ধের কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে প্রকৃত বিপদ থাকে না। আবার যে সব খেলায় শিকার ও পলায়নের অনুকরণ আছে, তাতে প্রকৃত শিকার ও প্রকৃত বিপন্মুক্তির আনন্দের কিছু স্বাদ ও পাওয়া যায়। ছোট মেয়েদের পক্ষে নাচাটা একটা আনন্দময় খেলা। আগে 'চুনু-খাওয়া চুনু-খাওয়া খেলা'র খুব প্রচলন ছিল, সেই খেলাতে ও নাচের মধ্যে দিয়ে যৌন প্রবৃত্তির কিছু পরিতৃপ্তি ঘটে। তা ছাড়া নাচের মধ্য দিয়ে পেশী সঞ্চালনের আনন্দের তৃপ্তি হয়, যেটা খুব পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলায় আরো বেশী করেই হয়। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণভাবে খেলার যে আনন্দ, তার অনেকটাই যুক্ত পেশী সঞ্চালনের আনন্দ থেকে উদ্ভূত। আর একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে সামাজিক সংযোগ, যেটা নাচ এবং অন্য প্রায় সমস্ত খেলাধুলার মধ্যেই আমরা দেখি।

কিন্তু জন্মগত সমস্ত আগ্রহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী সব খেলার মধ্যে ক্রিয়া করে, সে হচ্ছে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। অধিকাংশ খেলাধুলার মধ্যে প্রতিযোগিতার আগ্রহকে কাজে লাগানো হয়। এ কথা কে অস্বীকার করবে যে জয়ের আনন্দই খেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ?[১৫]

১৫ Woodworth—Psychology, p. 555-56.

খেলার ক্রমবিকাশ—একেবারে শৈশবের খেলা, অনেকটা এলোমেলো এবং শিশু তখন আপন মনে আপন খুশীতেই লাফায়, ঝাঁপায়, দৌড়োয়, চীৎকার করে। তখন শিশু দল বেঁধে খেলে না,—তখন সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর একটু বড় হলে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার নানা কল্পনা, (কতক তার উদ্ভট, আদিম অতীতের স্মারক, কতক তার পরিবার-প্রতিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত) রূপ পায়। অনেক সময় তার অপূর্ণ ইচ্ছা খেলার ছলে সে পূর্ণ করে। এ সবের মধ্যে তার দেহ ও মনের শক্তির গঠনাত্মক দিক প্রকাশ পাচ্ছে, আবার এর মধ্য দিয়েই নিজের অজ্ঞাতেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের সংগ্রামের জন্যে তৈরি হচ্ছে। হয়তো, কখনো তার মনের জটিল সংঘাত, এর মধ্য দিয়েই হালকা হয়ে যাচ্ছে। শিশু যত বড়ো হয়, তত দল বেঁধে খেলায় আনন্দ তার বাড়ে। কারণ, তার বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ অপরের সংস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। আর সচেতন বা অচেতনভাবে, তখন থেকে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, হারিয়ে দেবার ইচ্ছা, বড় হবার ইচ্ছা তাকে তাগিদ দিতে থাকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বিপজ্জনক ক্রিয়ার দিকে। কাজেই তার খেলার রূপও ক্রমেই বদলাতে থাকে। তা ছাড়া, একেবারে শৈশবের খেলা ছাড়া, বড় শিশুদের, কিশোর ও বয়স্কদের খেলা—বড়দের দ্বারা সচেতন উদ্দেশ্যে চালিত এবং বিধিনিষেধনিয়মের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কাজেই খেলা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আমরা আলোচনা করেছি তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নয়। আপাত-দৃষ্টিতে এ মতগুলি পরস্পর-বিরোধী হলেও, হয়তো তারা বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর পরিপূরক। রস্ বলছেন, এই বিভিন্ন মতগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়, সম্পূরক। "আমরা দেখিয়েছি কি উপায়ে 'খেলা অতিরিক্ত শক্তির বহির্নির্গমন' এ মতের সঙ্গে, 'খেলা বিকৃত মানসিক কামনা'র রেচক, এই মতের সামঞ্জস্য করা যায়। আবার এই পরবর্তী মতকে 'খেলা পূর্বজীবনের স্মৃতির রোমন্থন এই মতের সম্প্রসারণ' এও বলা যায়। কারণ যে অসুস্থ আকাঙ্ক্ষাগুলি খেলার মধ্যে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে, প্রাণীকে নিরাময় করে, সেগুলি হচ্ছে অচ্ছেদ্যভাবে মৌলিক সংস্কারগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। এই মৌলিকপ্রবণতাগুলি পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। পূর্বস্মৃতির রোমন্থনমূলক খেলাগুলি এ গভীর সংস্কারের শক্তিকে নিরাপদভাবে শুধু নয়, লাভজনক ভাবে ব্যবহার করে। কারণ যে আবেগগুলি নিরুদ্ধ হয়ে

অসুস্থ মন সৃষ্টি করতে পারত, সেগুলির বহিঃপ্রকাশ জৈবপ্রয়োজন সাধনের সহায় এবং বয়স্কজীবনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত করে এবং যখন আমরা বয়স্ক হই তখন আমাদের সুস্থ ও সভ্য রাখে।"[১৬]

শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা—খেলা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, খুব বেশীদিন হল হয় নি। খেলা সম্বন্ধে প্রাচীন মনোভাব হল খেলাটা সময় ও শক্তির অপব্যবহার,—এটা শিশুদের অবুঝ খামখেয়ালী। খেলা আর পড়া এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া, এ দুটোর একটার সঙ্গে আরেকটার অহি-নকুল সম্বন্ধ। যে ছেলের খেলায় মন, তার আর পড়াশুনা হল না,—সে গোল্লায় গেল। কিন্তু ভাল কথা বোকা শিশুরা তো শুনবে না,—ওরা খেলবেই। তাই শিক্ষক আর পিতামাতা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন এটা মেনে নেন্ যে, শিশু খেলবেই। তবে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত যাতে খেলার সময়টা বেশী দীর্ঘ না হয়, আর পড়ার মধ্যে যাতে খেলার স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ না অনধিকার প্রবেশ করে। ফলে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের বেত্রাঘাত, গর্জন, শাসন আর শিশুর অশ্রুজল অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শুধু পড়া আর পড়ায়, ছেলে ভোঁতা হয়ে যায়, —"All work and no play makes Jack a dull boy"—কাজেই পরবর্তীকালে লেখাপড়ার শ্রান্তি অপনোদক হিসাবে খেলার স্থান থাকল। ইস্কুলের সাতঘণ্টা পড়ার রুটিনের মাঝে, আধ ঘণ্টার লিজার্ পিরিয়ড্-এর নিতান্ত সংকুচিত স্থান হোল। আর শিলার্-স্পেন্সর-এর মত প্রাচীন শিক্ষক ও পিতামাতারা মেনে নিলেন যে, শিশুদের বাড়তি শক্তির বাষ্প (steam) ফুঁকে দেবার জন্যে একটা দরজা খোলা রাখা মাঝে মাঝে দরকার।

ক্রমে আরও পরিবর্তন হল দৃষ্টিভঙ্গীর। শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা দেখলেন শিশুর কাছে খেলা শুধু খেলা নয়—এটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় 'কাজ'। তাই ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) প্রথম অসমসাহসিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন, খেলার মধ্য দিয়েই, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলের মধ্যেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। বদ্ধ ঘরে, কড়া আইন করে আটকে রেখে, বই-পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে, কঠিন শাসন দিয়ে শিক্ষা বহুলাংশে নিষ্ফল। সেদিন তাঁর কথায় শিক্ষকেরা চমকে উঠেছিলেন, অভিভাবকেরা আঁৎকে উঠেছিলেন! ভাগ্যিস্ গরীব

১৬ Ross—Educational Psychology, p. 105.

মানুষের ছেলেদের দিয়ে পরীক্ষাটা তিনি করেছিলেন! যাক্, তাঁর পরীক্ষার ফলটা কিন্তু হল বিস্ময়কর। 'ভালো' ডিসিপ্লিন্-ওয়ালা স্কুলগুলির ছাত্রদের চেয়ে তাঁর ছেলেরা দেখা গেল, শুধু খেলা-ধুলায়ই ভাল নয়; স্বাস্থ্যে, কাজে, কুশলতায় এমন কি বুদ্ধিতেও তারা শ্রেষ্ঠ! তাঁর পরীক্ষার ফল আজ আর বৈপ্লবিক মনে হয় না, তবু সহজে তাঁর মত গৃহীত হয় নি—আজও না। **কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে লাগলেন, যে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এবং তাতে শিক্ষাটা অনেক সহজে হয়।** বর্তমান কালে রুশোর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফ্রোএবল্-এর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং আরো স্পষ্টভাবে মন্তেসরী পদ্ধতি, শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক "ভাল-লাগা'কে কেন্দ্র করে গঠিত। মন্তেসরী বললেন, খেলাটাই শিক্ষার সব চেয়ে সহজ—সব চেয়ে কার্যকরী পথ।

শিক্ষায় স্বাধীনতার স্থান—খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতির প্রবর্তকগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর যে স্বাধীনতার কথা বলেন তার মানে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে ধরনের খেলার কথা তাঁরা বলেছেন, তার মধ্যে প্রচুর নিয়ম, শৃঙ্খলা অথচ আনন্দ বর্তমান। যেমন, মন্তেসরী প্রথায় খেলার উপাদান-গুলির মধ্যে যথেষ্টই নিয়ম ও উদ্দেশ্যের স্থান রয়েছে। **"খেলার মাধ্যমে শিক্ষা" (playway in education)** এই ধারনার প্রথম প্রবর্তক কল্ডওয়েল্ কুক্ (Caldwell Cook) কেম্ব্রিজে তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতেন বিষয়-নির্বাচনে ও শ্রেণীর কার্যচালনায়। বিষয় নির্বাচনের পর যথারীতি আলোচনা ও পাঠের গুরুত্ব যে কোনও সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা কম ছিল না, অথচ সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যে ছিল আনন্দ ও স্ফূর্তি। এতে ফল ভালই হত।

স্বাধীনতা ও নিয়মশৃঙ্খলা—খেলা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের উপায়গুলি মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে **ডাল্টন্ পরিকল্পনা**। এর স্রষ্টা মিস্ পার্কহার্স্ট বিশেষ ভাবে মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন। এই পরিকল্পনায় ছাত্রদের পড়াশুনার কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (এক মাস কি এক সপ্তাহ) বিদ্যালয়ের সময়ে তাদের ঐ কাজ (assignment) শেষ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকবে; ছাত্রেরা প্রয়োজনমত ঐ শ্রেণীতে গিয়ে কাজ করবে। এখানে ব্যক্তিগত শিক্ষা, স্বাধীনতা ও রুচির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি

একটি বিখ্যাত গবেষণা, এবং এর মূল্য সম্পূর্ণ ভাবে যাচাই এখনও হয় নি। তবে এখানেও দেখতে পাই, স্বাধীনতা মানে স্ব-ইচ্ছায় কর্মের স্বাধীনতা, কিন্তু নিয়মের সম্পূর্ণ অভাব নয়।

আজ এই ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি ক্রমশঃই শিক্ষাজগতে অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সুষম এবং সবল অঙ্গসঞ্চালনে দেহ সুগঠিত হয়, এটা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে আর দেহ-বলে বিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য জগৎ তাই খেলাটাকে দেহ গঠনের উপায় হিসাবে সহজেই মেনে নিয়েছে। অনুভূতি, রুচি, বুদ্ধি, সমাজবোধ এ সব শিক্ষার জন্যেও খেলা বিশেষভাবে উপযোগী, এ স্বীকৃতিও ক্রমেই এসেছে। মানসিক রোগের চিকিৎসায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক ক্লেশ উপশমের একটি উপায় হচ্ছে খেলা। তাই নিত্যি নূতন খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে, পুরানো খেলার পরিবর্তন হচ্ছে,— এবং খেলাগুলিকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন করবার চেষ্টা চলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা আজ একটা অবসর-বিনোদনের গৌণ উপায় মাত্র নয়। আজ ক্রমশঃই চেষ্টা চলেছে খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করে,—শিশুর স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ ও গতি-চঞ্চলতাকে তার সমগ্র বিকাশের কাজে লাগাবার।

খেলা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ (Bertrand Russell) এর মত— খেলা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা ও কল্পনার স্থান নিয়ে রাসেল্ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে তৈরি হচ্ছে গ্রুস-এর মত, তিনি মোটামুটি সমর্থন করেন। তবে খেলার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে এ মত যথেষ্ট নয়। খেলা সম্বন্ধে ফ্রএড্-পন্থীরা একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং খেলা, স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে যথারীতি যৌন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির ইঙ্গিতই তাঁরা দেখেছেন। ফ্রএড্-পন্থীদের এ মতকে রাসেল্ একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে খেলার মনস্তাত্ত্বিক মূল কাম (sex) নয়—ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। কোন কোন মনঃসমীক্ষণবাদীরা শিশুদের খেলায় যৌন প্রতীকের সন্ধান পেয়েছেন। "আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ মত সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক। বাল্যকালে খেলার পেছনের প্রধান আগ্রহ কাম নয়, বয়স্ক হবার আকাঙ্ক্ষা অথবা আরো ঠিক করে বললে, ক্ষমতা আহরণের আকাঙ্ক্ষা।"[১৭] ছোট শিশু সর্বদা চায় বড় হ'তে। সে স্বপ্ন দেখে "বাবার মত বড়" হবার।

---

১৭ Bertrand Russell—On Education, P. 98.

বড়দের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছে তাই করবার। তাই সে বড়দের অনুকরণ করে। আর যেখানে তা সে পারে না, সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, প্রকাণ্ড বড় হবার—রাক্ষস হবার, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন হবার, বাঘ, সিংহ এ রকম দুর্দান্ত বলশালী প্রাণী হবার। রাসেল্-এর দৃঢ় মত যে কল্পনা যেখানে শিশুর আত্ম-প্রকাশের সহায়ক, তার আত্মবিশ্বাসের পোষক সেখানে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানকে মন্তেসরী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছেন ; রাসেলের মতে, এটা জবরদস্তি ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে হানিকর। কল্পনাকে সচেতনভাবে গণ্ডী বেঁধে দিয়ে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে, কাজেই খেলাও সর্বদা সচেষ্ট উদ্দেশ্যমুখী হবে, এটা রাসেল্-এর মত নয়। খেলার মধ্যে যে কল্পনার মুক্তি আছে, ভান (pretence) আছে, তাতেই খেলার অনেকখানি আনন্দ ও উত্তেজনা। শিশু যখনই বুঝবে খেলাটা বাস্তবিক পক্ষে তাকে শিক্ষা দেবার একটা কৌশল, তখনই খেলার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তা অন্তর্হিত হবে এবং তখন তার শক্তিও হারাবে।

স্বপ্ন ও কল্পনামাত্রেই অলস সময়সাপেক্ষ, এ মত ঠিক নয়। শুধু তথ্য আহরণই শিক্ষা, শুধু মাত্র বাস্তব ঘটনাই (facts) সত্যের মর্যাদালাভের অধিকারী, শিশুর মনকে তাই সযত্নে কল্পনাবিমুখ করে তুলতে হবে, কোন কোন আধুনিক বাস্তবপন্থীদের এ উগ্র মত রাসেল্ অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা আর সত্য এক জিনিস, একথা মনে করা বিপজ্জনক ভ্রম। আমাদের জীবন শাসিত হয় শুধু বাস্তব ঘটনা দ্বারা নয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। যে সত্যনিষ্ঠা বাস্তব ঘটনা ভিন্ন অন্য কোথাও সত্যকে দেখে না সে তো মানবাত্মার পক্ষে কারাবাস। স্বপ্ন তখনই দূষণীয় যখন তা বাস্তবকে পরিবর্তনের চেষ্টার বিকল্প মাত্র হয় ; কিন্তু যখন স্বপ্ন বাস্তবকে পরিবর্তন করবার আগ্রহের সহায়ক তখন তা মানুষের আদর্শকে রূপায়ণের অত্যন্ত জীবন্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। শিশুকালে কল্পনাকে হত্যা করা মানে শিশুকে বাস্তবের ক্রীতদাস করা, স্বর্গ সৃষ্টির শক্তি-বিহীন, পৃথিবীর মাটিতে আবদ্ধ হীন প্রাণীতে পরিণত করা।[১৮]

---

১৮ Bertrand Russell—On Education, p. 101-102.

একবিংশ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র—Personality & Character

ইংরেজী ভাষায়, পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব একটি লোকরোচন, স্বাদু শব্দ। প্রাত্যহিক ব্যবহারে এর প্রয়োগ বহুল,—যেমন, "ভদ্রলোকের চমৎকার পার্সোনালিটি আছে।" আমেরিকার কলেজে "ব্যক্তিত্বে"র কোর্স আছে। সেখানে চলন, বলন ও অপরকে প্রভাবিত করার বিদ্যা শেখানো হয়। অর্থাৎ, জনপ্রিয়ভাবে যে শব্দটি আমরা ব্যবহার করি, সে গুণটি যেন আয়াসলব্ধ, যেন সকলের প্রকৃতিগত নয়।

অথচ মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের করায়ত্ত। ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে, তা সবল, দুর্বল, কঠিন, মধুর,—যেমনই ব্যক্তি হোক না কেন। তবে ব্যক্তিত্ব কেমনভাবে বিচার করা যায়, অথবা অভিপ্রেত গুণ ব্যক্তিত্বে কি করে বিকশিত করা যায়, তা জানতে শুধু মনোবিজ্ঞানী নয়, চাকুরিদাতারা (যাতে নিজেদের কাজে যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হয়), এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা (যাতে ক্ষমতার অপচয় নিরোধ করা যায়), এবং সাধারণ মানুষও উৎসুক। মনোবিজ্ঞানের নবতর শাখায় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনারও তাই অন্ত নেই।

সংজ্ঞা—Definition—ব্যক্তিত্ব কি? সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এ প্রশ্নের উত্তর বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে দিয়েছেন। কিভাবে কেউ অপরকে প্রভাবিত করেছে, সে ভাবে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা চলে,—"বড় নরম স্বভাবের মেয়ে।" অর্থাৎ, ব্যাখ্যাকারীর কাছে মেয়েটিকে নম্র মনে হয়েছে। কখনো বা যে বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রকট, তাই দিয়ে ব্যক্তিত্বকে অনুবাদ করা হয়,—যেমন, "বড় কুনো লোক" 'খুব মিশুক, আমুদে ছেলে।"

কেউ কেউ কোন মানুষের দোষ, গুণ, চেহারা, স্বাস্থ্য নৈতিকবোধ, বুদ্ধির, যোগসমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলেছেন।

বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ব্যক্তি অন্যকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে, তাই ব্যক্তিত্বের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। ব্যক্তিত্বে নিজস্ব ঐক্যবদ্ধ (organic) কতকগুলি গুণ আছে, যা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা উচিত। তাই অলপোর্টের (Allport) মতে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে, একটা মানুষ যা, তাই।"[১]

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাষায় "কেমন ঘি ? না, যেমন ঘি, তেমন।"[২]

এটি অবশ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞা। তাই একে আরেকটু বিস্তারিত করে, সংজ্ঞা দিয়েছেন অলপোর্ট—"ব্যক্তিত্ব একটি ব্যক্তির সক্রিয় জীবন্ত মানসিক "ঐক্য," যার দ্বারা, সে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজস্ব "বিশেষ" ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।"[৩]

এই সংজ্ঞায় "বিশেষ" ও "ঐক্য" এই দুইটি কথা অনুধাবনযোগ্য। প্রতি ব্যক্তির মধ্যে এই "বিশেষত্বটুকু" থাকাতেই, সে অপর থেকে পৃথক্, এবং মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, আবেগ, মূল্যবোধ সব বিচ্ছিন্ন গুণাবলীর মধ্যে, এই "ঐক্যে"র বাঁধন আছে বলেই তার ব্যক্তিত্ব সংহত।

যেমন ধরা যাক, রত্না ও মঞ্জু দুজনেই স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে, লেখাপড়ায় ভাল ছাত্রী ও আধুনিকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পর্বত-প্রমাণ দুস্তর ব্যবধান। কারণ, দুজনে দুটি "বিশেষ" ব্যক্তি, এবং তাদের মানসিক ঐক্যের মূল মন্ত্রটিও বিভিন্ন। ব্যক্তিত্বের একটি গ্রহণ-যোগ্য সংজ্ঞা এই যে, একটা মানুষের চেহারা স্বাস্থ্য, কথা বলবার ধরণ, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ, গুণ সবটা মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব,—তার বিশেষত্ব। ঠিক এই এই দেহ, মন, বুদ্ধি, অভ্যাস, অনুভূতির সংমিশ্রণটি আর কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিত্ব শুধু দোষ, গুণ, শক্তি, সম্ভাবনার সমষ্টিমাত্র নয়। তার মধ্যে একটা অখণ্ডতা আছে। আছে একটি জীবন্ত ঐক্য।[৪]

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব—Character & Personality—একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক কি না ? কোন কোন মনোবিজ্ঞানী,

১। "Personality is what a man really is". Allport. Personality.

২। কবি রামকৃষ্ণ—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

৩। Personality is the dynamic organisation within the individual, of those psychophysical systems, that determine his unique adjustment to his environment" Allport. Personality—a psychylogical interpretation, p. 48.

৪। N. L. Munn. Psychology. P. 455.

বিশেষতঃ যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনপ্রভাবান্বিত, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে অভিন্ন বলেই মনে করেন। তাঁদের মতে, মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়া, শক্তি বা প্রবণতারই নৈতিক মূল্য আছে। সমগ্র মানুষটির শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রকাশ হয় তার চরিত্রে। তাই মহৎ ব্যক্তিত্ব না থাকলে, মহৎ চরিত্র গঠনও সম্ভব নয়। Hartman বলেন, "a superior personality is also a superior character and the term personality contains all that character connotes."

বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু, এদের অভিন্নতা স্বীকার করেন না। ব্যক্তিত্বের বহু উপাদান নৈতিক মূল্যমানের সঙ্গে যুক্ত নয়—যেমন তার আকৃতি। চরিত্র কিন্তু সেই উপাদানে গঠিত, যার নৈতিক মূল্যায়ন চলে—যেমন সততা। এটা একটি চারিত্রিক গুণ। সামাজিক মান হিসাবে চরিত্র হয়, সু নয় কু। কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যে "ভাল", "খারাপের" ভেদাভেদ নাই। অলপোর্ট বলেন "পার্সোনালিটির যখন নৈতিক মূল্য নির্ণয় করা হয়, তখন তা হয় চরিত্র, আর চরিত্র থেকে সেই মূল্যায়ন অংশটুকু বাদ দিলে, আমরা পাই ব্যক্তিত্ব।"[৫]

ব্যক্তিত্বের গুণ বা traits—ব্যক্তিত্ব বিচারের জন্য বা ব্যাখ্যার জন্য, আমরা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক (dimensions) বা গুণ (traits) উল্লেখ করি। কতগুলো বিশেষণের মালা গেঁথে ব্যক্তিকে পরিচিত করা যায়। যেমন, মা সারদামণির একটি ভক্তি-আবেগ-রঞ্জিত চিত্র—"তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই শুদ্ধ বোধ-স্বরূপা। তুমিই হ্রী—তুমিই লজ্জা। পুষ্টি-তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তিও তুমিই। কেউ সৌভাগ্যে আরূঢ় হয়েছে, দেখি শ্রীরূপিণী তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মান হয়েছে, দেখি ঈশ্বরীরূপিণী তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দুষ্কার্য্য করে, নিন্দার ভয়ে, আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্রী-রূপিণী তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। তোমার কোলে ছাড়া আর স্থান নেই।"[৬]

তবে এই বিশেষণগুলি সাধারণ। কিন্তু কতগুলো গুণ আছে, যা ব্যক্তির নিজস্ব (individual traits) সেইগুলিই তাকে অপরদের থেকে পৃথক করে, এবং তাকে "টাইপ"-এ পরিণত করে না। গুণগুলির মধ্যে কোনটা হয়তো

৫। Allport—Personality, p. 48

৬। অচিন্ত্যকুমার সেন—পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি—পৃঃ ২৮

ব্যক্তির জীবনের মূলসূত্র (central trait) যেমন, ক্ষমতালিপ্সুতা। যেটী সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব-প্রকাশনী (cardinal trait), যেটির দ্বারাই হয় তো তাকে বোঝা যায়। যেমন, পুরুষ-সিংহ আশুতোষের নির্ভীকতা। কোনটী আবার অপ্রধান গুণ (secondary trait) যেমন, জামা কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা। এই গুণগুলি ব্যক্তিতে কি রকম ভাবে সন্নিবিষ্ট হবে, তা অনেকটা অনির্দিষ্ট। কিন্তু প্রায়ই গুণগুলি একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করে, কখনো কখনো বিপরীত-ধর্মী গুণ এক সঙ্গে সহবাস করে। তাই যাকে চিরদিন অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক বলে জানতাম, তাহার অকস্মাৎ আত্মত্যাগে বিস্মিত হই, পরম সাহসী বলে খ্যাত জননায়ক বিপদে চরম কাপুরুষতার নিদর্শন রাখে।

Types—তবুও কতগুলি গুণের সম্মেলন বা সন্নিবেশ প্রত্যাশিত। সে অনুযায়ী আমরা ব্যক্তিকে একটা বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে অভিহিত করতে পারি। যেমন, ডেভিড-কপারফিল্ডের আশাবাদী উড়নচণ্ডী মিঃ মিকোবার, অথবা রামায়ণে দুষ্টার ভুমিকায় কৈকেয়ী। কতগুলি মৌলিক গুণের (primary traits) সন্নিবেশে, এই চরিত্রগুলি গঠিত। বহু বিচার ও বর্জনের পর, কয়েকটী মৌলিকগুণ উড-ওয়ার্থ ও মারকিস্ তালিকাবদ্ধ করেছেন—

মৌলিক গুণ	বিপরীত
১। আয়াসী, আমুদে, দরদী	অনমনীয়, হৃদয়হীন, ভীরু, বিদ্বিষ্ট লাজুক।
২। বুদ্ধিমান, স্বাধীন-চেতা, নির্ভরযোগ্য	বুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী, চঞ্চল-মতি।
৩। ধীর-স্থির, বস্তুনিষ্ঠ, একাগ্র	স্নায়বিক রুগ্ন, এড়ানো স্বভাব, অস্থির-চিত্ত।
৪। দাবাখাবা গোছের, নেতৃত্বাভিমানী	বিনীত, বাধ্য, আত্মবিলুপ্তিতে অভ্যস্ত।
৫। শান্ত, আনন্দময়, মিশুক, গপ্পে	বিষণ্ণ, ভগ্নোদ্যম, একাচোরা, উদ্বিগ্ন।
৬। সংবেদনশীল, কোমল-হৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন।	কঠিন-হৃদয়, উদাসীন, স্পষ্টভাষী, দয়ামায়াশূন্য।
৭। মার্জিত, বিদগ্ধ, রুচিসম্পন্ন	স্থূলরুচি, অমার্জিত।

৮। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ, পরিশ্রমী	পরনির্ভর, আবেগচালিত, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য
৯। দুঃসাহসী, নির্ভীক, সদয়	পরাঙ্মুখ, সাবধানী, হিসাবী, অসরল।
১০। উদ্যোগী, ক্রীয়াশীল, নাছোড়বান্দা, তৎপর	যাই-যাচ্ছি ভাবের, অলস।
১১। অতি-অভিমানী, অল্পে-উত্তেজিত	নিস্তেজ, যা আছে বেশ আছে বলে, যারা নিরুদ্যম।
১২। বন্ধুভাবাপন্ন, বিশ্বাসপরায়ণ	সন্দিগ্ধচিত্ত, পরছিদ্রান্বেষী।[৭]

কতগুলি মৌলিকগুণের আধিক্য অনুসারে টাইপ্ ভাগ করার কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি। গুণ বা traits যেমন ব্যক্তির বিশিষ্ট লক্ষণে, টাইপ্ তেমনি সাধারণ, অর্থাৎ এমন একটা চরিত্র যা সত্যি সত্যি সর্বদা চোখে পড়ে না, কিন্তু যে ছাঁচে আমরা অনেক সময় মানুষকে ফেলে বিচার করতে চেষ্টা করি। য়্যুঙ্গের এক্স্ট্রোভার্ট বা বহির্মুখী, ও ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী, ব্যক্তিত্বের টাইপ বিভাগের একটী উদাহরণ। তিনি মনে করেন, যে সব ব্যক্তি কাজে উৎসাহী, মিশুক স্বভাবের, দলের সর্বাগ্রে থাকে, চিন্তা ভাবনার পরোয়া করে না, তারা এক্সট্রোভার্ট। আর যারা নিজের মনের মাধুরীতে মগ্ন থাকতে ভালবাসে, যারা দিবা-স্বপ্ন বেশী দেখে, কাজের চেয়ে কাজের প্ল্যান বেশী করে, তারা ইন্ট্রোভার্ট। অবশ্য সকলকে এই দুই দলে পরিচ্ছন্ন ভাবে ফেলা যায় না। কেন না, এই দুই বিপরীতের মধ্যে মাঝামাঝির সংখ্যা আছে যথেষ্ট। এই মাঝামাঝির দল, না সম্পূর্ণ এক্সট্রোভার্ট, না সম্পূর্ণ ইন্ট্রোভার্ট। এই মিশ্রদলের নামকরণ য়্যুঙ্গ করেছেন অ্যাম্বিভার্ট।

কে কোন দলে, তা বিচার করবার একটী প্রশ্নমালা থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়া যায়, যে চরম এক্সট্রোভার্ট ও চরম ইন্ট্রোভার্টের মধ্যে আরও দল আছে।

প্রশ্ন—আপনার অবসর মুহূর্ত আপনি কি ভাবে যাপন করেন ?

১। **সর্বদা** পড়াশোনা করে, এবং কি করবেন, সেই পরিকল্পনা করে ?

২। **মাঝে মাঝে** পড়াশোনা করে ও কি করবেন, সেই পরিকল্পনা করে ?

৭। Woodworth & Marquis—Psychology, p. 90

৩। **অর্ধেক** সময় পড়ে, ও অর্ধেক সময় কোন কায়িক শ্রম করে ?

৪। প্রায় **সমস্ত সময়** খেলধূলায় বা কায়িক শ্রমের কাজে ?[৮]

এর প্রথম প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর, খুব বেশী ইণ্ট্রোভার্ট ব্যক্তিত্ব সূচিত করে, এবং সর্বশেষটীর ইতিবাচক উত্তর, খুব বেশী এক্সট্রোভার্ট ব্যক্তিত্বের দ্যোতক।

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য টাইপ ভাগের মধ্যে সেল্‌ডনের দৈহিক ও স্নায়বিক গঠনের সঙ্গে মানসিক প্রবণতার সম্বন্ধ মিলিয়ে ভিসেরোটনিক (viscerotonic) সোমাটোটনিক (somatotonic) এবং সেরিব্রোটনিক (cerebrotonic)[৯] বিভাগ, ক্রেটস্‌মারের এস্‌থেনিক্ (asthenic) পিক্‌নিক্ (pyknic) অ্যাথ্‌লেটিক্ (athletic) ও ডিস্‌প্ল্যাশ্‌টিক (dysplastic) বিভাগ, মনস্তাত্ত্বিক জগতে প্রচলিত। রোজানফ্‌ মানসিক বিকারের প্রবণতার দিক থেকে ভাগ করেছেন মানুষদের,—নর্মাল (normal), হিষ্টেরয়েড্‌ (hysteroid), সাইক্লয়েড্‌ (cycloid), সিজয়েড্‌ (schizoid) আর এপিলেপ্‌টয়েড্‌ (epileptoid) দলে।[১০]

ব্যক্তিত্ব নিরূপণ :—কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ হয়, এটী জানা দরকার। চেহারা দেখে, ব্যক্তিত্ব বিচারের চেষ্টা থেকে, বিভিন্ন অবস্থায় ফেলে, ব্যক্তিত্বের পরিচয় আবিষ্কার করা পর্য্যন্ত, নানাবিধ পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব নিরূপিত হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় এর মধ্যে প্রধান। **(১) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ (case-history বা longitudinal studies) (২) গুণের পরিমাণ বা মিশ্রণ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের স্তর বিভেদ (rating) (৩) কাগজ-পেন্সিল সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর (paper & pencil tests) (৪) ব্যবহার পরীক্ষা (performance tests) (৫) সাক্ষাৎকার ও আলোচনা (interview) (৬) মনঃসমীক্ষণ ও স্বপ্নবিচার (free association and dream analysis.) (৭) ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে (projective procedures).**

(১) জীবন ইতিহাস পরিক্রমা—এই পদ্ধতির সুন্দর উদাহরণ,

৮। N. L. Munn.—Psychology, p. 452. (George G. Harrap & Co.)

৯। Sheldon—Varieties of Temperament

১০। Rosanoff—Manual of Psychiatry

খ্যাতনাম্নী নৃতাত্ত্বিক মার্গারেট মীডের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা।

বেশ কিছু দিন ধরে এই পরীক্ষাটি করা হয়। আমেরিকায় আগন্তুক একটী ছেলে ; এর পরিবারিক ইতিহাস, বাবা মায়ের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ইত্যাদি বিচার করে, তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে ছেলেটি একটী আপাত শান্তশিষ্ট, অথচ মাঝে মাঝে ভয়ানক মেজাজ মর্জীবাজ, এবং নিগ্রোদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

(২) রেটিং—অথবা গুণের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিচার, সাধারণত ব্যক্তিত্বের দুটী বিপরীত গুণকে একটী রেখার দুই প্রান্তে রেখে, মাঝখানে আরো কয়েকটী ভাগ করা হয়। যেমন,

৪ ৩ ২ ১ ০

খুব মিশুকে, ভাল মিশুকে, মাঝামাঝি মিশুকে, কম মিশুকে অত্যন্ত অমিশুকে

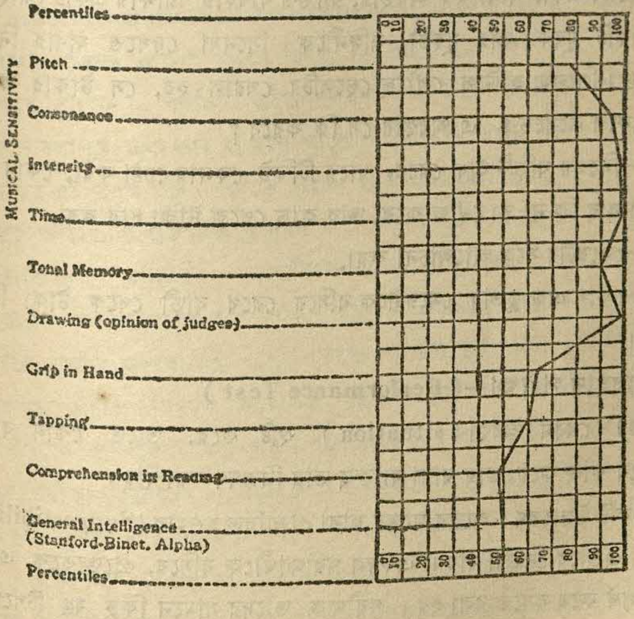

Fig. 43. Psychograph of an Average Child.

L. S. Holingworth—Special Talents and Abilities.

তেমনি (পাত্রীর গাত্রবর্ণ বিবেচনার সময়, যেমন ভাগ করা হয়, প্রকৃত গৌরবর্ণ, গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, শ্যামবর্ণ।)

এই রেখাটির দুইপ্রান্তে দুটি চূড়ান্ত নম্বর দেওয়া হয়, যেমন অত্যন্ত মিশুক পাবে ৪ এবং অত্যন্ত অমিশুকে পাবে-০। মাঝামাঝিদের রেটিং ৩, ২, ১।

নানা রকম গুণের (সততা, সময়নিষ্ঠা, ধৈর্য) রেটিং স্কেল্ (যে রেখাটিতে নানারকম স্তর-ভেদ করা হল) দ্বারা বিচার করে ব্যক্তিত্বের একটি চিত্র (personality profile বা Psychograph) পাওয়া যায়।

এ পরীক্ষায় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীর নম্বর কম বেশী দেওয়া হতে পারে, সুতরাং ভুলের সম্ভাবনা কিছু থাকে। সেই জন্যে একাধিক পরীক্ষক দ্বারা এই পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

(৩) **প্রশ্নমালা** কতগুলি প্রশ্নমালা এমনভাবে প্রস্তুত, যাহাতে উত্তরদাতার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থায়, ব্যক্তির ব্যবহার পরীক্ষার একটি উদাহরণ:

একটি যুবক তার যুবতী সঙ্গিনীকে সিনেমা দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে। সিনেমা হাউসে পৌঁছে ছেলেটির খেয়াল হয়, সে টাকার থলিটি ঘরে ফেলে এসেছে। এ অবস্থায় সে কি করবে?

—নিজের ঘড়িটি বাঁধা রেখে, ধারে টিকিট কেনার চেষ্টা করা, কোন বন্ধু পাওয়া যায় কি না তা খোঁজ করে, তার কাছ থেকে টাকা ধার করা,

—মেয়েটীর সঙ্গে আলোচনা করা,

—কোন এক ছুতায় মেয়েটীকে বসিয়ে রেখে বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসা।[১১]

ব্যবহার পরীক্ষা—(Performance Test)

(৪) কোন অবস্থা (situation) সৃষ্টি করে, তাতে কোন ব্যক্তি কিভাবে কাজ করে, তার দ্বারা ব্যক্তিত্ব তার নিরূপণ করা যায়।

একটি উদাহরণ: অন্যের মতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার (Suggestibility) পরীক্ষা এভাবে নেওয়া যায়। একদল পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে, প্রত্যেককে একটি তার স্পর্শ করে বসতে বলা হয়। পরীক্ষক তাদের সামনে কিছু যন্ত্র টিপছেন, যাতে কখনো কখনো তারটী গরম হয়। কিন্তু তারটী পরীক্ষকের বোতাম টেপার

১১। গুহ ও দত্ত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা—পৃঃ ৪৮৬

কখনো গরম হয়, কখনো বা হয় না। যে যে পরীক্ষার্থী, বেশীবার (অর্থাৎ ভুল সংবেদন), তারটী গরম বলে বোধ করছেন বলেন, তাঁরা সহজে অল্প দ্বারা প্রভাবিত হন এমন সিদ্ধান্ত সঙ্গত।[১২]

৫। **সাক্ষাৎকার ও আলোচনা দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিচার (Interview):** অনেক ক্ষেত্রেই, দিনের পর দিন ধরে, একটি ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। অভিজ্ঞ পরীক্ষক তখন সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে, তার ব্যক্তিত্বের একটি ধারণা পেতে চান। চাকুরী নিয়োগের সময় সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিচার একটি প্রচলিত ব্যবস্থা। অনেক সময়, সাক্ষাৎকারের সময়ের প্রশ্নগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকে। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় ও আলাপ হয়, এবং মানসিক উদ্বেগ নিয়ে প্রার্থীরা আসে, একথা স্মরণ রাখলে সহজেই বোঝা যায়, এতে অনেক সময় সুবিচার হয় না। ইন্টারভিউ নেওয়া, আর তার মধ্য দিয়ে লোক চেনা সহজ কাজ নয়। এটি সবাই পারে না।

৬। **মনঃসমীক্ষণ ও স্বপ্ন আলোচনা দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিচার (Free association method & Dream analysis)**—একটি ব্যক্তিকে তার চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করতে দিয়ে, অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষক তার ব্যক্তিত্ব বিচার করে থাকেন। পদ্ধতিটি এইরূপ—একটি ব্যক্তিকে সোফাতে আরাম করে শুতে বলা হয়, এবং তার যা মনে আসে তাই বলতে দেওয়া হয়। কোন এক ব্যক্তির এই রকম মুক্ত চিন্তাতে (free association) দেখা গেল, সে তার-প্রিয় আহার ও খাদ্য সংক্রান্ত সমস্ত কথা অত্যন্ত পছন্দ করে, সে স্বভাবতঃ স্নেহপ্রত্যাশী এবং পরনির্ভর। মনঃসমীক্ষক এই ব্যক্তিকে Oral personality বা মুখ-প্রধান ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করলেন এবং এ সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিশুকালে স্নেহের অভাব, এই বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির জন্যে দায়ী। এই পদ্ধতির মুখ্য প্রচারক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অনুগামীদের মধ্যে লিউইন, রর্স্, মারে ইত্যাদি পণ্ডিতেরা কিছু নতুন পথে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের নানা অভিনব পরীক্ষা করেছেন। রর্স্যাক্ (Ror:ach) ও মারের (Murray) পদ্ধতি-ছবি দেখে তার প্রক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্ব বিচারের কথা আলোচিত হবে। লিউইনের (Lewin) পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন ধরণের, কারণ তিনি মানুষের মানসিক অবচেতনের সঙ্গে সামাজিক প্রভাবগুলিও ব্যক্তিত্বের নির্ধারক

১২। J. P. Guilford—Personality, P. 258

বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিচার করতে হলে, তাহার জীবন-পট (life-space) টীকে অবলোকন করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তির সেই মুহূর্তের প্রয়োজন (needs), উদ্বেগ (tension), বাধা (barrier), কোন বিশেষ দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ (valence) ইত্যাদির দ্বারা তাকে বিচার করতে হবে। তাঁর অনুগামীরা ক্রীড়ারত শিশু, কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, এবং রান্না-ঘরে রন্ধনরতা গৃহিণীদের ব্যবহার পর্যালোচনা করে ব্যক্তিত্ব বিচার করতে চেষ্টা করছেন।[১০] এটা সাধারণ মানুষের মনের মত ব্যক্তিত্বে নির্ধারক মতবাদ সন্দেহ নাই।

৭। **ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্ব বিচার—(Projection procedure)**—ব্যক্তিত্ব নিরূপণে রর্সাকের অভিনব অবদান ইংক্ব্লট টেষ্ট্ বা কালির ছাপ দেখিয়ে, তার প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্বের বিচার। কালির ছাপ একটী ব্লটিং পেপারে চেপে দিয়ে যে ছবি হয়, তা দেখে যার যা মনে হয়, তা তাদের বলতে বলা হয়। কেউ হয়তো বলে, দুই ডাইনী কম্বল মুড়ি দিয়ে নাকে নাক লাগিয়ে বসে আছে;

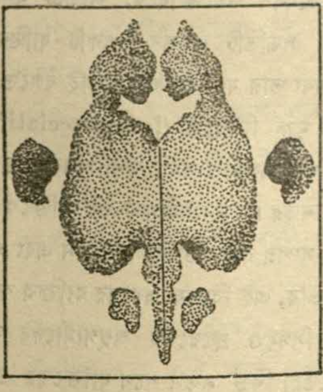

Fig. 44. Rorsach's Inkblcck test after Munn. Psychology, p. 175

পিষে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে। কারও মনে কোন ছবিই জাগে না। কেউ মনে করে এটী একটি পাখীর মাথার কঙ্কালের ছবি, মাথাটি যেন কেউ

১০। C. S. Hall & G. Lindzey.—Theories of Personality. John Wiley & sons. Inc. London, P. 254

কালো নানারকম কালির ছাপ পরে। রর্‌সা ব্যবহার করেছেন কে কোন্‌ রঙে সাড়া দেয়, কেউ কোন বিশেষ আকৃতিতে আকৃষ্ট হয় কিনা, কারো কল্পনায় কোন জন্তুর ছবি বারে বারে দেখা দেয় কিনা, এই সমস্ত আলোচনায় যারা লোকটি সহজে আবেগে অভিভূত হয় কিনা, বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা বেশী করে কিনা, ইত্যাদি বোঝা যায়। রর্‌সার মতে এ উত্তরগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ করলে, ব্যক্তি-মানসের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়।[১৪]

যারে, ছবি দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া সাহায্যে বিচারে সকল চেষ্টা করছেন, তাঁর এ চেষ্টা টি. এ. টি (থিমাটিক্‌ অ্যাপারসেপসন টেষ্ট) নামে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ছবিগুলি দেখিয়ে, কার মনে কি গল্প উদয় হয়, তা বলতে বলা হয়। "একটি ছবিতে দেখা যায়, একটা বন্ধ দরজার সামনে মাথা নীচু করে

Fig. 45. Themamtic Appirception test.

দাঁড়িয়ে একটী মেয়ে। এক হাত তার দরজার উপর, আর এক হাতে মুখ ঢাকা। চুলগুলি অবিন্যস্ত। এ ছবি দেখে কি মনে হয়? একজন উত্তর

১৪। N. L. Munn.—Psychology, p. 466

দিচ্ছে, "মেয়েটা বমি করবে, সে কিছু খারাপ জিনিষ খেয়ে অসুস্থ হয়েছে।" আর একজন বললে, "মেয়েটা দুঃখে ও লজ্জায় ভেঙ্গে পড়েছে। ভয়ানক খারাপ কাজ সে করে ফেলেছে, সে কথা বলতে হ'বে তার মাকে, যিনি তাকে এতদিন অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেছেন।" তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর, "মেয়েটি নিজের চেষ্টায় দরিদ্র অবস্থার থেকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে, কিন্তু উঁচু সমাজে মিশতে গিয়ে সে খুব ঘা খেয়েছে, ও তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।" চতুর্থ উত্তর "মেয়েটি ভীষণ রাগের মাথায় স্বামীকে হত্যা করেছে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে, কি ভয়ানক পাপ সে করেছে,—সে অনুতপ্ত ও শোকক্লিষ্ট, এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছে।" এ উত্তরগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের মনের প্রতিফলন।[১৫] এই সমস্ত পদ্ধতির কোনটিতেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে, কেননা পরীক্ষকরাও ব্যক্তি-কাজেই তাঁহাদের মতবাদ, সংস্কার, বিশেষ পক্ষপাতিত্ব, এই বিচারের পথে বাধা হয়। তা ছাড়া, ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট ও স্থায়ী পদার্থ নয়। তা ক্রমবর্দ্ধমান ও পরিবর্তনশীল, কাজেই ব্যক্তিত্ব বিচারের সম্পূর্ণ নির্ভুল পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ—ব্যক্তিত্ব স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নয়, ক্রমবিকাশমান। মানুষের জন্মগত কতগুলি সম্ভাবনা দিনে দিনে পরিণতি লাভ করে, পারিবেশিক প্রভাবেও তা পরিবর্তিত হয়। কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তির স্বয়ংক্রিয়তা (functional autonomy)-র ওপর খুব জোর দেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ, তাহার জন্মসময়েই নির্দিষ্ট Id (আদিম কাম), Ego (অহং) ও Super-ego (সামাজিক বুদ্ধি) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত, ফ্রয়েডের এই মত নির্ভুল সত্য নয়। অথবা, তার সমস্ত কার্যাবলী উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য বিধিলিপিদ্বারা নির্দিষ্ট নয়,—যেমন ব্যবহারবাদীরা বিশ্বাস করেন। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তার ইচ্ছা, আগ্রহের মোড় ফেরাতে পারে। এটাই তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। যেমন, একজন শিকারী শিকার করে শুধু আহারের তাগিদে, অথবা খাদ্যসংগ্রহের প্রেরণাতেই নয়। এর কারণ, সে শিকার করতে ভালবাসে। একে অলপোর্ট বলেন, স্বয়ংক্রিয়তা বা Functional autonomy। যে ব্যক্তিতে এর প্রকাশ যত বেশী, সেই ব্যক্তির তত

১৫। Murray. H.—Explorations in Personality.

পরিণত। খুব ছোট্ট শিশুদের কোন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রক্ত-মাংসের অনুভূতির হাতো বন্দী, অথবা কতগুলো জৈবিকতার টানাপোড়েন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার প্রথম বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সে তার সম্ভাব্য ব্যক্তিত্বের কিছু প্রমাণ দিতে আরম্ভ করে। অল্পকালের এই শারীরিক বাধা-বেদনা-আনন্দের প্রাণকেন্দ্রটিতে ক্রমে ক্রমে অহং বুদ্ধি (ইগো) জন্মায়, চরিত্রের গুণাবলী বিকশিত হয়, ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাড়তে, সে এক ব্যক্তি পরিণত হয়।[১৬]

লিউইনও এই ক্রমবিকাশ স্বীকার করেছেন। জীবনের প্রথম উষার অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব কেমন করে বিভিন্ন পারিবেশিক বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, লিউইনের মতে তাহার চরিত্রগত প্রতিকৃতি এইরূপ:

শৈশব বাল্যকাল পরিণত বয়স

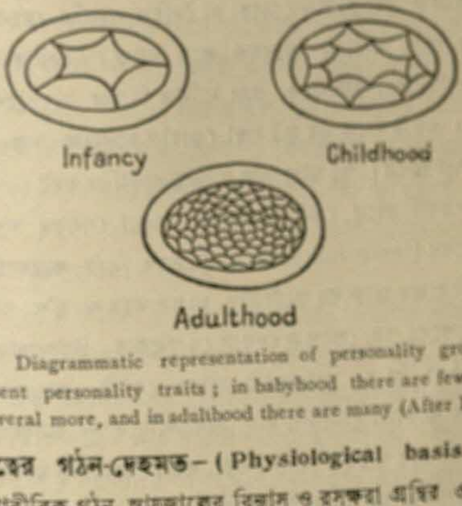

Fig. 46. Diagrammatic representation of personality growth; Various areas represent personality traits; in babyhood there are few, in childhood there are several more, and in adulthood there are many (After Lewin).

ব্যক্তিত্বের গঠন-দেহগত – (Physiological basis of personality—শারীরিক গঠন, স্নায়ুজালের বিন্যাস ও রসক্ষরা গ্রন্থির প্রভাব ব্যক্তিত্ব গঠনে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে। যে তিনটি মূল শারীরিক সত্তা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ তারা হচ্ছে—(১) রসক্ষরা গ্রন্থি (glands) (২) দৈহিক আকৃতি (physique) ও (৩) স্নায়বিক গঠন (neural pattern)।

১। রসক্ষরা গ্রন্থি—আমাদের শরীরের মধ্যে কতগুলি প্রধান রসক্ষরা

১৬। Munn—Psychology, P. 468

গ্রন্থি আছে,—তাহাদের কাজ শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতগুলি রসের ক্ষরণ করা। প্রধান গ্রন্থিগুলি হচ্ছে পিটুইটারী (pituitary), থাইরয়েড (thyroid), প্যারাথাইরয়েড (para-thyroid) এ্যাড্রেন্যাল (adrenal) ওভারিস্ (ovaries) বা টেষ্টিস্ (testis)। এদের বিশিষ্টতা এই যে, এগুলি ক্ষরিত রসের প্রকৃতি ও পরিমাণ ব্যক্তির বুদ্ধি, অনুভূতি, ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ স্বল্প হলে ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়, ও লোকটী "ধীরজ" ও "ঢুলো" প্রকৃতির হয়। পিটুইটারীর অতিরিক্ত ক্ষরণের ফলে কোন ছেলে অত্যন্ত দীর্ঘকায় ও অতিরিক্ত স্থূলকায় হতে পারে; তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশও স্বভাবতই ব্যাহত হবে। মানস জীবনের দৈহিক আধার অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

২। **দৈহিক আকৃতি**—চেহারা বা দৈহিক আকৃতি দেখে তার ব্যক্তিত্ব বিচার করার চেষ্টা সাধারণ মানুষেও করে থাকে। দৈহিক গঠন অপরের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং ব্যক্তির নিজের ব্যবহারও ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি সাড়ে ছয় ফুট লম্বা জোয়ান মানুষকে অন্য মানুষে সমীহ করে,—সেও তা জানে। তা দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়ই। প্রাচীনকালে প্ল্যাটো পরবর্তীকালে ক্রেট্‌সমার এবং অধুনা সেলডন্ আকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বভাবের (temperament) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। চার হাজার কলেজের ছাত্রদের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে ও দু'শ ব্যক্তির জীবন ইতিহাস পর্যবেক্ষণের পর, সেলড্‌ন দেখান যে স্থূলকায়, উদরপ্রধান শারীরিগণ (endromorphs) প্রায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে লোভী, খাদ্যসংক্রান্ত বিষয়ে উৎসুক, যেহের কাঙাল, হাসিখুশী, সাদাসিধে, আমুদে ও অনবৎসল স্বভাবের (viscerotonic) হয়ে থাকে। হাড়-চওড়া, শক্ত, খেলোয়াড় ধরণের শারীরিগণ (mesomorphs) প্রায়ই উগ্র স্বভাবের (aggressive), উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট, অপরের মনোভাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী (somatotomic) এবং রোগা, বুক পিঠ পাতলা (ectomorphic) লোকেরা ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক অন্তর্মুখী, মৃদুভাষী ও দুর্বল স্বভাবের (cerebrotonic) হয়।[১৭]

৩। **স্নায়বিক গঠন**—আমরা কে কি রকম ভাবে নিজেকে পরিবেশে

১৭। Seldon—Varieties of temperament

সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি, ও কি ভাবে আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, তা নির্ভর করে, আমাদের স্নায়ু তন্তুগুলির নমনীয়তার উপর। এর তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কের কোন স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তিত্বের ভয়ানক পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

পরিবেশের প্রভাব—কিন্তু দেহগত গঠনের দ্বারাই ব্যক্তিত্বের সবটা ব্যাখ্যা মেলে না। ব্যক্তি যে পরিবেশে বাড়িয়া ওঠে, তা তার ব্যক্তিত্বকে অনুকূল ভাবে বিকশিত গঠিত করে বা ব্যাহত করে।

গৃহ পরিবেশ—সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান যে পরিবেশ, ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, তাহচ্ছে গৃহ। পরিবারের মধ্যে শিশুকে কেমন ভাবে গ্রহণ করা হয়, তা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। মীড্ দেখিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিশুর সঙ্গে ব্যবহারের রীতিতে প্রভেদ আছে। "কোন কোন সমাজে শিশু যখন হাটিতে পারে না, তখন থেকেই তাকে হাটাইবার চেষ্টা বা খুব শিশুকাল থেকেই তাকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা, যেমন, নিজের হাতে খাওয়া, নির্দিষ্ট জায়গায় পায়খানা প্রস্রাব করা ইত্যাদি অভ্যাস গঠনের চেষ্টা হয়, যাতে শিশু শক্ত হয়ে গড়ে উঠতে শেখে। অপরপক্ষে, কোন কোন সমাজে শিশুকে তিন চার বৎসর পর্যন্ত কোলে বহন করা, বা অধিকাংশ কাজ শিশুর সাধ্যায়ত্ত হলেও করে দেওয়া (যেমন জুতা মোজা পরিয়ে দেওয়া) হয়, ফলে শিশু বাধ্যতাও পরনির্ভরতা শেখে।[১৮]

গৃহে পিতামাতার আচরণ শিশুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের স্নেহমমতা, ভাইবোনদের সঙ্গে, তাহাদের ঝগড়া, ভালবাসা, পিতার আর্থিক সঙ্গতি, গৃহের স্বাস্থ্য-সকলের উপর পিতামাতার চরিত্র, শিশুর জীবনে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। গৃহ পরিবেশ যেখানে স্নেহপূর্ণ, নিরাপদ, নির্মল, স্বাস্থ্যকর ও উৎসাহপূর্ণ, সেখানে ভাল ছেলে মেয়ে তৈরী হয়। এরকম পরিবারে সু-অভ্যাস সুরুচি গঠিত হয়, উৎকৃষ্ট সামাজিক গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে পিতামাতা কলহ-পরায়ণ, নির্মম, উৎপীড়ক, খামখেয়ালী সেখানে শিশু ভীরু অসামাজিক, ক্রূর, সন্দিগ্ধ, বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে।

১৮। Mead.—The cross cultural approach to the study of personality. pp. 226.—527. From psychology of Personality Ed. T. L. Mc Cary Logos Press. N. Y, 1956.

গৃহ পরিবেশ ও তার প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন ফেল্‌স, পেরেণ্ট বিহেভিয়ার রেটিং স্কেল্‌স্ এ।[১৯] এতে পিতামাতার ৩০টি প্রধান দোষগুণ বেছে নিয়ে, শিশুর উপর তাহার প্রভাব কি ভাবে হয়, তা দেখা হয়েছে। বলডুইন (Baldwin), ক্যালহর্ণ (Kalhorn) এবং ব্রীস্ (Breese) এই স্কেল্ ১২৫টি পরিবারে ব্যবহার করে তিনটি প্রধান ধরণ (major syndromes) লক্ষ্য করেছেন।

১। যেখানে প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতি বর্তমান (democracy in the home) অথবা তাহার বিপরীত (parent dominance)।

২। যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহে আশ্বস্ত, অথবা যেখানে সে স্নেহ-বঞ্চিত (acceptance or rejection)।

৩। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায় (indulgence)।

এ পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, যেখানে শিশু স্নেহবঞ্চিত, সেখানে সে বিদ্রোহী, কলহপরায়ণ, নিষ্ঠুর ইত্যাদি। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায়, সেখানে সে পরনির্ভর, স্বার্থপর, মতলববাজ হয়। যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, অথচ যেখানে অতিরিক্ত আদর নাই, যেখানে শিশুর অধিকার ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি পিতামাতার শ্রদ্ধা আছে, সেখানে শিশুর সুষম ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে।[২০]

বিদ্যালয় ও দলের প্রভাব—বিদ্যালয় ও দলের প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে একটি ছেলে মিশতে পারে, তা থেকে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সহযোগিতাপূর্ণ হবে কিনা, অথবা জেদী, স্বার্থপর, কুণো ও ভীরু স্বভাবের হবে কিনা, তা জানা যায়। অন্য ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে যেভাবে মেশে, তাহা দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তার উদাহরণ নিম্নলিখিত পরীক্ষা "কয়েকটি কলেজের ছাত্র মিলে স্থির করল যে, একটি লাজুক, মুখচোরা কলেজের ছাত্রীকে তাহারা খুব খাতির করবে এবং এমনভাব দেখাবে যে, সকলেই তাকে নিয়ে পার্কে বা পার্টিতে যেতে উৎসুক। কিছুদিন এরকমভাবে

১৯। Chapman J.—Child development. Pp. 131-166.

২০। Baldwin, Kalhorn & Breese.—The appraisal of parent behaviour, Psychology, monogram-1944.

আদৃত হবার পর, মেয়েটি একটি স্বচ্ছন্দ ও আত্মপ্রত্যয়ে স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করে, ফলে সে প্রকৃতই কলেজের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রী হয়ে দাঁড়ায়।[২১]

শিক্ষকেরা তাকে কেমন চোখে দেখেন, তাও ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। শিক্ষকের সস্নেহ উৎসাহপূর্ণ ব্যবহারে ছাত্ররা স্কুলকে ভালবাসতে শেখে, লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়; তেমনি আবার অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা বা অপ্রশংসার ফলে, ছেলেরা বিদ্রোহী, বিরূপ হয়ে দাঁড়ায় ও পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। প্রত্যেক শিশুই শিক্ষক ও পিতামাতার প্রশংসাকাঙ্ক্ষী। এর মূল্য শিশুর জীবনে অসামান্য। যেখানে ঠেকে গেল, সেখানে শিক্ষকের সামান্য একটু মনোযোগ, সামান্য একটু সাহায্য, শিশুকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়।"[২২]

ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব—গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়, ব্যক্তিত্বের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে, এই কথা সত্য। কিন্তু সকলে সব প্রভাব সমানভাবে গ্রহণ করে না, করতে পারে না। ব্যক্তির নিজের মধ্যে কোন কোন প্রভাব গ্রহণ করবার যোগ্যতা আছে, প্রবণতা আছে। কাজেই এক হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলি, একথা মূলতঃ সত্য। ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন অপরিবর্তনীয়তা আছে, তেমনি পরিবর্তন-প্রবণতাও আছে। সচেতন চেষ্টায় আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পরিবর্তন করতে পারি, এমন ঘটনা বিরল নয়। হঠাৎ এক শুভমুহূর্তে ডাক আসে, "বেলা যে যায়", তখন ঘোর সংসারী লালাবাবুর শান্তিহীন প্রাণ চঞ্চল হয়, —অসম্ভব সম্ভব হয়, বিষয় বাসনা ত্যাগ করে নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। ভারতীয় সাধকেরা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে 'ব্রহ্মসত্তা', ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত আবরণের জঞ্জাল সরিয়ে সে আগুন স্বীয় ভাস্বরতায় আত্মপ্রকাশ করে। তবে তা আরামের পথে, সুখের পথে আসে না। তার জন্য চাই আন্তরিক প্রয়াস, কঠোর সাধনা।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কি?—কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? যার বিভিন্ন বৃত্তি, শক্তি অনুভূতি ও ক্রিয়া সুসমঞ্জস, যিনি নানা সাময়িক ও বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার দাস নন, যিনি তাঁর জীবনকে একটী স্থির কেন্দ্রে সংহত করেছেন,

---

২১। E.R. Guthrtie—The Psychology of Human Conflict. p. 128. Harper N.Y.

২২। Millard—Child growth & development. P. 398.

তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহাকেই ভারতীয় দর্শন বলে, যোগী, স্থিতধী। খুব কম মানুষই এই আদর্শে পৌঁছতে পারে। তবুও সব মানুষের মধ্যেই কিছুটা কেন্দ্রীভূত ও সুমঞ্জস (centeredness ও consistency) হওয়ার চেষ্টা আছে। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও তাই আমাদের একটা অখণ্ডতা আছে।

ব্যক্তিত্বের বিকার—কিন্তু কখনো কখনো শারীরিক বা মানসিক বিকারের ফলে, ব্যক্তিত্বের এই অখণ্ডতা বিপন্ন হয়। যেমন দ্বিত্ব-ব্যক্তিত্ব (dual personality) বা বহুধা বিভক্ত ব্যক্তিত্বে (multiple personality)।

দ্বিত্ব ব্যক্তিত্ব—(Double porsonality) একদা একটি শান্ত ভদ্র, নম্র মেয়ে-দেখা গেল, মাঝে ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির, কটুভাষিনী ও অপরের অনিষ্টকারিনী হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম চরিত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির কোন মিল তো নেই-ই, এমন কি, অধিকাংশ সময় প্রথম ব্যক্তিত্বটি দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অবহিত নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রথমটির সম্বন্ধে জানে এবং তাহাকে উপহাস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়। "থ্রী ফেসেস্ অব ঈভ্" ছবিটি ত্রিধা-বিভক্ত গ্রাম্য বধূর জীবন ইতিহাস নিয়ে তোলা হয়েছে।

সাধারণতঃ কোন গুরুতর মানসিক কি দৈহিক আঘাতের ফলে ব্যক্তিত্বের সংহতি নষ্ট হয়ে, এক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমাবেশ হয়।

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ (Manic-depressive) ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বিকার, তার কারণ, ও চিকিৎসার উপায় অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ব্যক্তিত্বের পরিচয়

(ক) মেজাজে—(Temperament)

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেহের গঠনের দিক দিয়ে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি প্রভেদ আছে, মেজাজ বুদ্ধি ও অনুভূতিতে। কোন কোন মানুষ আছে রগ্‌চটা, সহজেই চটে যায়; আবার কেউ বা বেশ গদাই-লস্করী চালে চলে, বুদ্ধিতে হয়তো কিছু ভোঁতা, সহজে কিছু গায়ে মাখে না। কেউ খুব রাসভারী, গম্ভীর, মানুষের সঙ্গে মিশতে কিছুটা যেন অনিচ্ছুক, অহংকারী, কিছুটা মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব ইত্যাদি। মেজাজ বা ধাত বলতে বুঝি, অনুভূতির প্রতিক্রিয়া ও আচরণের দিক থেকে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক গঠন—tendency toward a specific kind of emotional responsiveness.

দেহের গড়ন ও মেজাজ—মানুষ বহুদিন থেকেই বিশ্বাস করে এসেছে যে, দেহের গড়ন দিয়ে মানুষের স্থায়ী ধাত বা মেজাজ নির্ধারিত হয়। রোগা, তীক্ষ্ণ, মাথা-বড় মানুষেরা বুদ্ধিজীবি, সংশয়ী, অভিমানী ও পরশ্রী-কাতর। ক্যাসিয়াস্ হচ্ছে এই মেজাজের মানুষ। অন্যদিকে গোলগাল, নাদুস নুদুস মানুষগুলি বেশ আমুদে স্বল্প সন্তুষ্ট, মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করে না, পেট ভরে চারটি খেতে পেলেই তারা খুসী। ফল্‌ষ্টাফ্ হচ্ছে এই ধাতের প্রতিনিধি (type)। ইয়োরোপে প্রাচীন দেহবিদ্ ও চিকিৎসকদের মতে দেহের চার রকমের রস (humour) আছে। এই রসের আধিক্য অনুযায়ী চার ধাতের ব্যক্তি আছে; যাদের দেহে রক্তের আধিক্য, তারা হ'ল স্যাঙ্গুইন্ (sanguine); এরা আশাবাদী ও উদ্যোগী, (ardent, confident and inclined to hopefulness)। যাদের পিত্তাধিক্য, তারা হ'ল কোলেরিক্ (choleric), এরা খিট্‌খিটে কোপনস্বভাব, (angry, passionate); যাদের আবার শ্লেষ্মার আধিক্য তারা হ'ল ফ্লেগ্‌মাটিক (phlegmatic),—এরা অলসপ্রকৃতির, কিছুটা বা বুদ্ধিহীন (sluggish indifference); আর চতুর্থ হ'ল প্লীহা-রসের যাদের আধিক্য,—এরা হ'ল মেলান্‌কোলিক্ (melancholic)—এসব মানুষ

হ'ল বিষন্নপ্রকৃতির (affected with melancholy, dejected)। কখনও কখনও এই চারটি রসের উপর, আর একটি রসও স্বীকার করা হ'ত, তা হোল স্নায়বিক রস (nerve fluid); যাদের মধ্যে এই রসের আধিক্য তারা হোল ব্যস্তবাগীশ, অল্পেতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোক,—এদের বলা হয় নার্ভাস

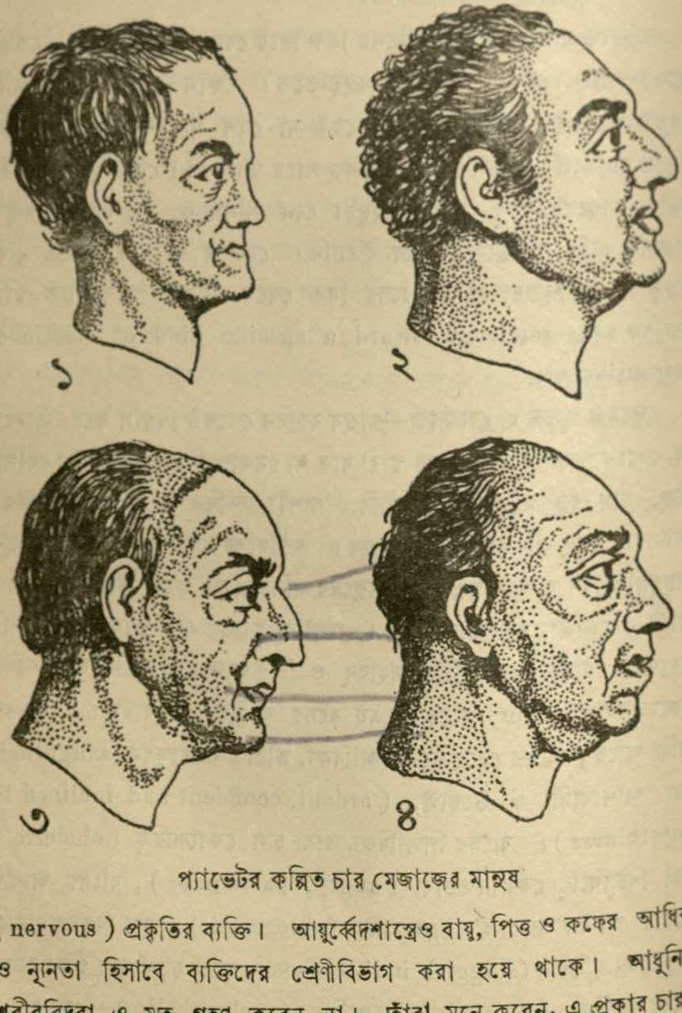

প্যাভেটর কল্পিত চার মেজাজের মানুষ

(nervous) প্রকৃতির ব্যক্তি। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য ও ন্যূনতা হিসাবে ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। আধুনিক শরীরবিদ্‌রা এ মত গ্রহণ করেন না। তাঁরা মনে করেন, এ প্রকার চারটি

রসের ধারণা অতিমাত্রায় স্থূল। কিন্তু দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তির ও মেজাজের নিকট সম্পর্ক আছে, এ কথাটা সব বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। কিন্তু এ সম্পর্কটি ঠিক কি রকম, একথা এখনও একেবারে নির্ভুলভাবে জানা না গেলেও, দেহ যে মনকে প্রভাবিত করে এবং মনও যে দেহকে প্রভাবিত করে, এ কথা সন্দেহাতীত। বর্তমানে দেহবিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, রক্তস্রোতে দেহাভ্যন্তরস্থ বহু যন্ত্র, ইন্দ্রিয় ও গ্রন্থির ক্ষরণ ঘটে এবং রক্তস্রোতে মিশ্রিত নানা রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহণ করে, এবং এই জটিল প্রক্রিয়া ব্যক্তির অনুভূতি, প্রক্ষোভ, মেজাজকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে, অনালী রসক্ষরা গ্রন্থির (ductless glands) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে ক্যানন্, বার্ড ও পল ডি ক্রুইফ্-এর গবেষণা ও পরীক্ষা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান, বিশেষ করে খাদ্যপ্রাণ (vitamins) এবং ধাতব লবণগুলিও (mineral salts) প্রভাব রয়েছে ব্যক্তির 'মেজাজ' বা ধাত গঠনে। রক্তস্রোতে গ্রন্থিক্ষরিত রাসায়নিক দ্রব্য, হর্মোনগুলিই (hormones) শুধু ব্যক্তির অনুভূতি ও মেজাজের নিয়ন্তা নয়—মধ্যমস্তিষ্কের এবং সমগ্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রেরও ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দেহ ও স্নায়বিক গঠনের পার্থক্যের ভিত্তিতে আধুনিককালে সেলডন, ক্রেট্সমার ও রোজানফ্ বিভিন্ন ধাতবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

দৈহিক-স্নায়বিক গঠন, অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ, মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত প্রক্ষোভ কেন্দ্র, প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত অন্ত্রের অ-ডোরাকাটা পেশীগুলির (unstriated muscles of the viscera) বিন্যাস ইত্যাদি ব্যক্তির স্থায়ী প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা, যাকে আমরা বলেছি 'মেজাজ' বহুলাংশে নির্ধারিত করে। এবং এই স্থায়ী 'মেজাজ' যে জন্মগত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, তা পরীক্ষার মধ্য দিয়েও জানা যায়। যে ছেলে ছ'মাস বয়স থেকেই অল্পেতে মৃদুহাস্য ক'রে, খুশী খুশী ভাব দেখায়, এক বছর পুরে গেলেও সে শিশু মোটামুটি খুশী মেজাজেরই থাকে। আর যে ছেলে ছমাস বয়সে কাঁদুনে, সে বড় হলেও, খুব হাসি-খুশী মেজাজের হয় না। আবার যে ছেলে ভাবপ্রকাশ বিষয়ে অনেকটা নির্বিকার, সে বরাবরই কতকটা গম্ভীর প্রকৃতিরই থেকে যায়। কিন্তু 'ধাত' বা মেজাজটা নিতান্তই দৈহিক-স্নায়বিক কারণ দ্বারাই নির্ধারিত

নয়। এটাও অনেকটা সামাজিক পরিবেশ নির্ভর। যে সমাজ ও জাতির মধ্যে আমরা গড়ে উঠি, সেই গোষ্ঠীর অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মেজাজ বা ধাতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এ কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাই আমরা দেখি, বাঙালীরা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গপরায়ণ, পাঞ্জাবীরা দিল্‌দরিয়া, মাদ্রাজীরা প্রাচীনপন্থী, সন্দিগ্ধ পরায়ণ, ইংরেজরা রাশ ভারী গম্ভীর, আমেরিকানরা আমুদে, আত্মসন্তুষ্ট ফরাসীরা মিশুক, তর্কপ্রিয়, ইটালিয়ানরা রোমাণ্টিক প্রকৃতির, ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীরের গঠন ও স্নায়বিক গঠনের দিক থেকে বাঙালী ও মাদ্রাজীর খুব কোন প্রভেদ নেই ; তেমনি ইংরেজ ও আমেরিকানের মধ্যেও দৈহিক স্নায়বিক পার্থক্য নগণ্য। কিন্তু তাদের মেজাজের পার্থক্য লক্ষণীয়। কাজেই এটাই মনে করা সঙ্গত যে, মেজাজ বা ধাতের কিছুটা উপাদান জন্মগত ও দৈহিক হলেও, তার কিছু উপাদান সামাজিক এবং পরিবেশগতও বটে।

ব্যক্তিত্বের পরিচয়ঃ (খ) দৃষ্টিভঙ্গীতে (Attitudes)—দেহ ও মনের গঠনে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেও তেমনি প্রভেদ আছে। কাউকে আমরা বলি গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী ; আবার কাউকে বলি উদারদৃষ্টিভাবাপন্ন ও সংস্কারে বিশ্বাসী ; কাউকে বলি 'নরম', আর কাউকে বলি 'গরম'—কেউ 'লেফ্‌টিষ্ট', কেউ 'সেণ্টার-অব-দ্যরোড্', আর কেউ 'রাইটিষ্ট' ; কেউ বা ব্যক্তিস্বাধীনতায় অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাসী, আবার কেউ বা সমর্থন জানান, নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রবাদে। উইলিয়ম্ জেমস্ দর্শনে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন—টাফ্‌মাইণ্ডেড্ (Toughminded) এবং 'সফ্‌ট্ মাইণ্ডেড্' (Soft-minded) এই দুই দলে ভাগ করে। ৺সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল তাবোল'-এ বলেছিলেন যে, গোঁফ দিয়েই মানুষের পরিচয় মানুষকে 'গোঁফ দিয়ে যায় চেনা'! আর আধুনিক জটিল মানুষকে চেনবার উপায় হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। নীতি, ধর্ম, সমাজ সমস্যা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট কতগুলি প্রশ্নমালার উত্তরের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বুঝবার চেষ্টা করা হয়। প্রশ্নের কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে—

(ক) সর্বদেশের সর্বজাতির জন্যে একটি পৃথিবীব্যাপী গভর্ণমেণ্ট গঠনের ধারণা কি একটি অসম্ভব স্বপ্ন ?

(খ) মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—এ কথা সত্য কি ?

(গ) ধর্মই জগতের নানা বৈষম্য ও অশান্তির মূল এ কথা স্বীকার্য কি ?

(ঘ) হিন্দীই ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত—এ কথা ঠিক কি ?

(ঙ) জীবিকা এবং পারিবারিক জীবনের বাইরে, অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীদের সমান অধিকার দান সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ?

ইচ্ছে করেই কোন কোন প্রশ্ন অন্য প্রশ্নের চেয়ে বেশী জোরালো করা হয়েছে। কখনো কখনো প্রশ্নগুলি এমন ভাবে করা হয়, যাতে উত্তরগুলি "নিশ্চয়ই হাঁ", "একেবারেই না", ছাড়াও মাঝামাঝি অন্য উত্তরও দেওয়া চলে, এবং ব্যক্তিকে তাঁর নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতেই উৎসাহ দেওয়া হয়। ব্যক্তি তার মতামত নির্বাধে এবং নির্ভয়ে প্রকাশ করলে, তা থেকে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু যদি উত্তরদানকারী মনে করেন যে, কোন বিশেষ উত্তরই প্রশ্নকর্তার কাম্য এবং তা বাঞ্ছনীয় বা লাভজনক, তা হ'লে এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গার অবশ্যই সত্য পরিচয় মিলবে না। কাজেই এই প্রশ্নমালা নিতান্তই বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হ'তে হবে। তা না হলে, এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য নির্ধারণ করা। কখনও কখনও কোন বিশেষ প্রকার প্রচারের ফল ব্যক্তির উপর কেমন হয়, তা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী তার বাস্তব প্রয়োজন ও শিক্ষা দ্বারা নির্ধারিত। ফ্রয়েডপন্থীদের মতে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাতে আছে আদিম জৈব কামের (Id) তাড়না এবং বাহ্য জগৎ এবং সমাজ চেতনার সঙ্গে সংঘর্ষের দ্বারা (conflict with ego & super-ego) আদিম কামের রূপ পরিবর্তন। ব্যক্তি নিজেও কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশেষ কোন মত কেন সে গ্রহণ করে, অনেক সময় তার কারণ জানে না।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নানা কারণের উপরেই নির্ভর করে—তার কিছুটা জন্মগত শারীরিক-মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু সমাজ পরিবেশের প্রভাবই অধিকতর। ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্য, পরিচ্ছদ, আলো, বাতাস যেমন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে রঞ্জিত করে, তেমনি বয়স, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, সাফল্য

ইত্যাদিও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। সকলের থেকে বড় প্রভাব, পরিবার, বিদ্যালয় ইত্যাদি সামাজিক সংস্থা এবং শক্তিগুলির। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অনড়, অচল নয়—অবস্থার পরিবর্তনে দৃষ্টি-ভঙ্গীরও প্রভেদ ঘটে। দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন,—

"ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেলো মতটা।

—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়!"

কথাটা কিন্তু নেহাতই ঠাট্টা নয়। তথাপি এট বলা যায় যে দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা স্থিরত্ব আছে। সেইজন্যই মেজাজ বা ধাতের (temperament) মত দৃষ্টিভঙ্গীও (attitude) ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। মেজাজে অনুভূতির উপাদান প্রধান; দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপাদান প্রধান। 'মেজাজ' অনেকটাই জন্মগত, দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ পরিবেশ-নির্ভর।

কিন্তু তাই ব'লে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীও অনুরাগ বিরাগের রং বর্জিত। এবং একথাই সত্য যে, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়, সে কোন এক বিশেষ দলের পক্ষে, বা অন্য কোন দলের বিপক্ষে। বর্তমানের ভাষা-বিরোধের প্রশ্নটি এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এখানে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য একটা গুরুতর ও মারাত্মক আকার নিয়েছে, কারণ এই প্রশ্নটি নিরপেক্ষ, বস্তুগত (objective) নিছক বুদ্ধি বিচার দিয়ে কেউই প্রায় দেখছেন না। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীই গভীর আবেগ দ্বারা রঞ্জিত—highly charged with emotion.

এই কারণেই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সমাজ উদাসীন থাকতে পারে না—থাকে না। যাঁদের হাতে রাজনৈতিক বা সামাজিক শাসন ক্ষমতা থাকে, তাঁরা চান কিশোর তরুণ সম্প্রদায়, বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চার করে দিতে। এরই নাম indoctrination বা regimentation. যে ব্যক্তি সমাজপতিদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, সে নিন্দিত হবে, কখনো কখনো তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

সমাজ স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু তা সত্ত্বেও, নূতন ভাব, নূতন বিচার, নূতন আবিষ্কার, নূতন প্রয়োজনের ফলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, নারীর শিক্ষা, ও তার অধিকার, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, বিবাহে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ ইত্যাদি বহু বিষয়ে এই বাংলা-

দেশে এবং অন্য সব দেশেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। আজ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়ে অবিবাহিতা থাকছে, নিঃসম্পর্কিত পুরুষের সঙ্গে মিশছে, হয়তো একাধিক যুবকের সঙ্গে প্রেম কচ্ছে, এটা খুব একটা নিন্দার বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রাচীন মানুষেরা খুশী না হলেও এটা মেনে নিয়েছেন —যুবক যুবতীরা তো এটা নিন্দনীয়ই মনে করে না। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন লক্ষণীয়। চুরি করা বা মিথ্যা কথা সম্বন্ধে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গী আজ আর নেই। পুরানো মানুষেরা বলতেন, মিথ্যাকথা বলা মহাপাপ; বাক্য রক্ষা না করা মহা অধর্ম। কিন্তু আজকের মানুষেরা বলে অসাম্য ও অবিচারই মস্ত পাপ। অসাম্য দূর করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলাও কিছু দোষের নয়।

রাষ্ট্রনেতা, ব্যবসায়ী, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ্ আজ বাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠন এবং অবাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। সকলেই বিশ্বাস কচ্ছেন, শিক্ষা, প্রচার ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শিশু বয়স থেকেই দৃষ্টিভঙ্গী গঠন বা পরিবর্তন সম্ভব। রাজনৈতিক কারণে 'মগজ ধোলাই' (brainwashing)-একটা নিদারুণ বাস্তব সত্য। উপযুক্ত সময়ে, মনোহর ভাবে, বারে বারে, একই কথা নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ক্রেতার কাছে ধরে দেওয়াই হ'ল, আধুনিক বিজ্ঞাপনের মূল কথা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পণ্যবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচারের (publicity) জন্য শিল্পপতিরা তাই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। এতে বাস্তবিক ফল হয়। তা না হ'লে, ব্যবসায়ীরা, রাষ্ট্রনেতারা এ বিষয়ে এত মনোযোগী হতেন না। আমেরিকায় প্রচার বা বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। কি ভাবে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের দ্বারা সব চেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, কিন্তু প্রচারের দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন বা পরিবর্তন সে হয়, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষকের কাছে, এ জন্যেই ছাত্রের বাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুতর। কি করে শিক্ষা, উপদেশ ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের বাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা যায়, ও অবাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা যায়, তা শিক্ষাবিদ্‌কে চিন্তা করতে হয়—কারণ শিক্ষকের কাজ হচ্ছে সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর মানুষ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ সু-নাগরিক তৈরী করা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য

একটা তত্ত্বের রীতি। একই সময় দুটো বিপরীত গুণ একই সঙ্গে সত্য হতে পারে কিনা? সাধারণ বুদ্ধি ও তর্কবিদ্যা বলবে এটা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

মানুষে মানুষে গভীর মিল আছে

আর

মানুষে মানুষে গুরুতর অমিল আছে

এই দুটো কথাই সমান সত্য। সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী মানুষের ব্যবহারের নিয়ম শৃঙ্খলা (uniformities of behaviour) আবিষ্কারে ব্যস্ত। আবার তাঁরাই এ কথা মানেন যে মানুষ কলে ঢালাই করা পুতুল নয়। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের থেকে নানা বিষয়ে পৃথক। আধুনিক শিক্ষাবিদ মানুষে মানুষে এই প্রভেদটাকে উপেক্ষা করেন না। তিনি বলেন যে শিক্ষার কতকগুলি বিষয় আছে যা সকলের জন্যে, কিন্তু এটাও তিনি জানেন যে প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও রুচির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং শিক্ষায় সুফল পেতে হলে এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষার রীতি ভিন্ন ভিন্ন করতে হবে। রবীন অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ড্রয়িংয়ে পটু; শেফালী আবার ছবি আঁকতে দিলে কাঁদতে বসে, কিন্তু অঙ্ক কষতে ওর উৎসাহ অপরিসীম। সমীর লেখাপড়ায় ভালো কিন্তু খেলাধুলায় মন নেই। তপন আবার হাতের কাজে ওস্তাদ কিন্তু লেখাপড়ায় ঢৈব ঢৈব ঢ।

এরকম যে কোন গুণ সম্বন্ধেই আছে ভাল, মন্দ, মাঝারি। আবার দেখি বয়সে বয়সে রুচি ও প্রবৃত্তিতে তফাৎ—

জোয়ানে জোয়ানে কথা
কথায় কথায় হাস।
আর বুড়ায় বুড়ায় কথা
কথায় কথায় কাশ।

অল্প বয়সে বয়সে প্রভেদ বড়—ঈশপের বেলা; দেশে দেশে বেলা; সামাজিক ধারা ধরে বেলা। একখানে যেটা বাহার, অন্তর সেটা নিতান্ত বে-মানান।

মেহগনিকা কাঁহা কোম্পা চাম্বা
পাইতিকা কাঁহা ফুল।
কেতকা কাঁহা বর্ষা বাদল
জাড়কা কাঁহা ফুল।"

হয়ত 'রোমান্টিক' বাঙালীর প্রেম-কোম্পানের, কিন্তু পৌঁ-চিনের পক্ষে পোশাক হচ্ছে ঘোমটা; মেয়েদের পক্ষে ঘরের কাজই ভাল, কিন্তু চাষাদের পক্ষে দরকার, প্রখর রৌদ্র। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে মানুষের মনোবৃত্তি মেল-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের মূলে আছে, হিন্দু আর মুসলমানের বিভিন্নতা সম্বন্ধে অতি-সচেতনতা। আর বর্তমানে পৃথিবীর সাম্যবাদীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে, জাতীয়তাবাদ। তাদেরই মাঝখানে ও মনোবৃত্তির ভেদে মানুষে মানুষে প্রভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে আবার ধসেও পড়িছে।

কিন্তু তাদের তাদের ভাবে মানুষের প্রভেদের কথাটা আমরা এখন ধরে নাই। মানুষের এই প্রভেদের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা দরকার।

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে, তা প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্লেটো, আরিস্টটল, হেগেল—এ প্রভেদ স্বীকার করেছেন। প্লেটো মানুষকে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী কয়েকটি ধরনে (type) ভাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে, গ্যাল্টন্‌। পূর্বেই বলা হয়েছে গ্যাল্টন্‌ বংশানুক্রমের প্রভাবে গভীর ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বংশানুক্রম অনুযায়ী মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে, এবং জাতিতে জাতিতে যে প্রভেদ, তা নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে আর একজন প্রধান বিজ্ঞানী হচ্ছেন ক্যাটেল্‌। তিনি বুদ্ধিশক্তি, ইন্দ্রিয়ের বোধের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের প্রভেদ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আমাদের, বিনের বুদ্ধির মাপের কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানেও দেখি বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষে মানুষে কতটা প্রভেদ তা নিয়েই অনুসন্ধান।

প্রাচীনেরা মানুষের মধ্যে পার্থক্য তিনটি ভাগে সাধারণতঃ ভাগ করেছেন,—(ক) দৈহিক (খ) মানসিক ও (গ) নৈতিক। গেটস্ আরো বিস্তৃততর ভাবে বিভেদগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

(১) **দৈহিক গঠন** (Physical traits)—যেমন উচ্চতা, ওজন, বাঁধুনী, চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(২) **মানসিক গঠন** (Mental traits) যথা—বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা, কল্পনার ক্ষমতা ইত্যাদি।

(৩) **বিশেষ বিষয়ে সামর্থ্য** (Special abilities) যথা,—সঙ্গীত, সাহিত্য, কলকব্জা চালানো ইত্যাদি।

(৪) **অনুশীলন দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কুশলতা** (Acquired Interest, knowledge and technical skill).

(৫) **ভাবাবেগ বিষয়ে পার্থক্য** (Temperament) যথা—"কেউ বা শান্ত, কেউ বা চপল।"

(৬) **ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য** (Volition) যথা—ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।

(৭) **নৈতিক চরিত্র** (Character) যথা—দয়া, ঔদার্য, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।[১]

টাইপ অনুযায়ী-মানুষের ভাগ (The notion of types)—সাধারণ মানুষের ধারণা,—কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ অনুযায়ী মানুষকে কতকগুলি বিভিন্ন টাইপ্-এ ভাগ করা যায়,—যেমন আমরা বলি, রাগী মানুষ, শান্ত মানুষ। টাইপ্ হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন একটা, বা কতগুলি নির্দিষ্ট গুণ অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যে এমন টাইপ্ চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত,—যেমন ডন্ কুইক্সোট্, মিসেস্ গ্রাণ্ডি, সার্ক্ হোমস্, রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা,' ইত্যাদি। অনেক বিজ্ঞানীও মানুষকে এ রকম বিপরীত টাইপ্এ ভাগ করেছেন,—যেমন সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। য়ুঙ্গ মানুষকে ভাগ করেছেন, ইন্ট্রোভার্ট (Introvert) আর একস্ট্রোভার্ট (Extrovert) এই দুই দলে। ইনট্রোভার্ট-রা হচ্ছেন অন্তর্মুখী, চিন্তা ও অনুভূতিপ্রবণ, অভিমানী আত্মকেন্দ্রিক, স্বপ্নালু, কর্মবিমুখ; আর একস্ট্রোভার্ট-রা হচ্ছেন বহির্মুখী, কর্মিষ্ঠ, মিশুক, কাজের লোক। নীট্সে (Nietzsche) মানুষদের ভাগ করছেন, প্রভুজাতীয়, আর

১ Gates—Psychology for Students of Education.

বাস্তবাতীয়, এ দুই শ্রেণীতে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কেউ মানুষকে ভাগ করেছেন সাব্জেক্টিভ্ আর অব্জেক্টিভ্ টাইপে, থিয়োরেটিক্যাল, আর প্র্যাক্টিক্যাল টাইপে; আর কেউ পিকনিক্স, এস্থেনিক্স, এ্যাথলেটিক্ ও ডিস্প্লাসটিক্ টাইপে। এভাবে মানুষকে ভাগ করলে মনে হয়, এই টাইপ-গুলোকে কেন্দ্র করে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে,—আর দুই টাইপ্-এর মাঝে মাঝে থেকে যাচ্ছে ফাঁক। তাহ'লে একটা ছড়িয়ে থাকার ছক্ (distribution curve) আঁকলে দেখা যাবে, যে বক্র রেখার দুটো শীর্ষ (modes) রয়েছে দুই টাইপের জায়গায়, আর মাঝখানটায় বক্ররেখাটা নীচু হ'য়ে যাচ্ছে। তা হ'লে হোল দ্বিশীর্ষ বক্ররেখা (bimodal curve), আর যদি দুই-এর বেশী টাইপ স্বীকার করা হয়, তবে শীর্ষও হবে দুই-এর বেশী। তাহ'লে পাব বহুশীর্ষ বক্ররেখা (multimodal curve)। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায়, এভাবে মানুষেরা কোন গুণ (বা দোষ) সম্বন্ধেই ছড়িয়ে নেই। যে কোন গুণ ধরলেই দেখা যায় সেইগুণের বেশী কম অনুসারে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে, সর্বত্র। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আছে, যারা মাঝারী; আর ক্রমে ক্রমে কমে, ভালর দলও যেমন কম, তেমনি ক্রমে ক্রমে কমে, মন্দের দলও কম। মাঝে কোথাও কোন ফাঁক নেই, অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকার বক্র-রেখাটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে মাঝারীর (Average) কাছে, আবার ধীরে ধীরে একটানা ভাবেই প্রায় নেমে গেছে। কাজেই যদি টাইপ স্বীকার করতে হয় তবে একটি মাত্রই টাইপ আছে, সে হচ্ছে মাঝারী, বা Average।[২] অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তি থাকতে পারে, যাদের মধ্যে কোন একটা গুণ অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে দুই বা দুই এর অধিক বিপরীত গুণের মিশ্রণ, একথাটা বুদ্ধির বেলায় আমরা দেখেছি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ কি (Causes of Individual differences)—এ নিয়ে অনুসন্ধান চলেছে। থর্নডাইক কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করেছেন—

(১) সুদূর বংশগত (অথবা জাতিগত) পার্থক্য—Racial differences.
(২) নিকট বংশগত (অথবা পরিবারগত) পার্থক্য—Family differences
(৩) লিঙ্গগত প্রভেদ—Sex differences.

২ Freeman—Individual Differences.

(৪) পরিবেশগত প্রভেদ ও ব্যক্তির পরিণতি বা maturity বিষয়ে প্রভেদ—Environmental difference.

জাতিগত প্রভেদ—জাতি বা race—এর সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতভেদ আছে,—তথাপি নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মানুষদের মাথায় খুলির গড়ন, কঙ্কালের গড়ন, চোখের রং, গায়ের রং, চুলের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইয়োরোপীয়ান্, নর্ডিক, আলপাইন্, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী জাতি, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ানস (European, Nordic, Alpine, Mediterrnean groups, Negro, Mongolians)-এ রকম সব নানা দলে ভাগ করেছেন। ফ্রীম্যান্ গায়ের রং দিয়ে সোজা ভাগ করেছেন—সাদা, হলদে, কালো, বাদামী ও লাল এই কয় দলে। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যেক দলের অন্তর্গত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এখন এই জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনুসারে বুদ্ধি বা অন্য কোনো মূল্যবান গুণেও কি পার্থক্য দেখা যায়? এ নিয়ে আমেরিকাতে কিছু কিছু অনুসন্ধান চলেছে—কারণ সেখানে বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর কালো নিগ্রো আর লাল নর্থ আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ ওদের জাতীয় জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত পরীক্ষার ফলে মোটামুটি একথা বলা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধি বা অন্য কোন গুণে পার্থক্য খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত যে অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রখরতর কারণ বন-জঙ্গলে সর্বদা বিপদ-পরিবৃত তাদের জীবন, তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, তীক্ষ্ণতর হতে বাধ্য,—আত্মরক্ষার তাগিদে। কিপলিং-এর 'জাঙ্গলবুক,' 'কিম্' জাতীয় গ্রন্থে এ ধারণার পোষকতা ও প্রচার আছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উডওয়ার্থ ৩০০ উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্ নিগ্রো ও মালয় দেশীয় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান, যে তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি অন্যান্য জাতের তুলনায় তীক্ষ্ণতর, এমন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। সভ্য মানুষদের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতখানি প্রভেদ, এ বিষয়ে দেখা যায়,—সভ্য মানুষ আর অসভ্য মানুষে ভেদ তার চেয়ে বেশী নয়।৩

বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য নিয়েও কিছু পরীক্ষা হয়েছে। এ পরীক্ষাও আমেরিকাতে হয়েছে। দেখা গেছে প্রচলিত সবগুলি মৌখিক পরীক্ষায়ই (verbal test) নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ান্ ছেলেমেয়েরা সাদা সাহেবদের

৩ Quoted by—Thorndike—Educational Psychology (Briefer course).

ছেলে-মেয়েদের তুলনায় কিছুটা হীন। তাদের গড় বুদ্ধির হার (Average I.Q.) কিছু কম। কিন্তু এখানে সন্দেহ করা যেতে পারে যে পরীক্ষাগুলি সাহেবদের মাতৃভাষায় হয়েছিল,—কাজেই তা তাদের অনুকূলই হয়েছিল। কারণ, দেখা যায় মৌখিক পরীক্ষায় কালো ও সাদের দল হেরে গেলেও, কাজের পরীক্ষায় (Performance tests) সাদাদের তুলনায় তারা নিকৃষ্ট নয়। মেয়ো (Meyo) ১৯০২ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক হাইস্কুলগুলিতে ভর্তি হয়েছে এমন ৫০ জন নিগ্রোর পরবর্তী কালে লেখাপড়ায় উন্নতির সংবাদ (academic records) সংগ্রহ করেন। সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং অনুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, ১৫০ জন সাদা সাহেবের ছেলের সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেন। তাদের তুলনা করে দেখা গেল দু দলেরই উন্নতি (achievements) প্রায় সমান, যদিও কোন প্রভেদ সাদায় কালায় থাকে তা জন্মগত, এমন না হতেও পারে। তাদের শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হ'লে তাদের বুদ্ধির মানেরও উন্নতি ঘটে, এটা দেখা গেছে। তাই ফ্রীম্যানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও কর্মশীলতায় পরিমাণগত প্রভেদ আছে সত্য, তবে সে প্রভেদ জাতিতে জাতিতে যতটা প্রভেদও প্রায় ততটাই।

এসব পরীক্ষার ফলে দেখা যায় জাতি বা উপজাতিদের ভিত্তিতে বেশী তফাৎ করা যায় না; কারণ উপজাতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। এবং একই দল ও উপজাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতটা প্রভেদ আছে বর্তমানে উপদল বা জাতিগুলির মধ্যে তফাৎ তার চেয়ে বেশী নয়। প্রত্যেক দলের মধ্যেই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও। আরো এটা দেখা গেছে, শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির মানের উন্নতি করা যায়—তার জন্মগত বুদ্ধির পরিমাণ যাই হোক, আর সে যে জাতিরই হোক্ না কেন। ৪

নারী ও পুরুষের প্রভেদ (Differences due to sex)—পুরুষ বহুকাল থেকেই নারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে এসেছে। নারীরাও নিজেদের মধ্যে একত্র হয়ে, যখন আলোচনা করেন, তখন এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ একমত যে, পুরুষের মত বোকা জাত আর নেই। এ নিয়ে দু'পক্ষেই কত সরস আর কঠোর আলোচনা হয়, সেটা সবাই আমরা জানি। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে নারী ক্রমেই পুরুষের সমান অধিকার পেতে সুরু করেছে, আর এ বাধা

৪ Freeman—Individual Differences, p. 150.

ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠেছে যে বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, এর কোনটাতেই নারী পুরুষের থেকে হীন নয়,—সুযোগ সুবিধে পেলে, তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে, প্রতিযোগিতা করতে পারে।

পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন, সামাজিক পরিবেশ, জীবনযাত্রার প্রণালীতে বিস্তর প্রভেদ। তাই তারা বুদ্ধি বা অন্য গুণে মানুষের সমকক্ষ কিনা সে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান, একেবারেই সোজা নয়। গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের কাজে পুরুষ নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কারণ, তার পেশীর গঠন দৃঢ়তর—কিন্তু ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, সম্ভবতঃ নারীদের বেশী। কতগুলি বিশেষ গুণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায়:—

(১) ভাষাগত যে সব পরীক্ষা (linguistic ability) তাতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় যোগ্যতর (—তরা?)

(২) কিন্তু সংখ্যা ও গণনা বা হিসাবের ব্যাপারে পুরুষেরা, নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

(৩) স্মৃতিশক্তি মেয়েদের প্রখরতর।

(৪) কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষেরা অগ্রগামী।

(৫) ইন্দ্রিয়বোধের সূক্ষ্মতা, (sensory discrimination) সম্ভবতঃ পুরুষের বেশী।

(৬) খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি, সম্ভবতঃ মেয়েদের বেশী।

বুদ্ধি নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে। সে পরীক্ষা সাধারণ বুদ্ধি (general intelligence) আর বিশেষ বিশেষ দিকে যোগ্যতা (special abilities) এ দুদিক থেকেই করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের ও মেয়েদের গড় বুদ্ধির হার তুলনা করে দেখা গেছে মেয়েরাই বরং সামান্য কিছু বেশী নম্বর পাচ্ছে। নীচে পরীক্ষার ফলটা দেওয়া হোল।

বয়স	গড় বুদ্ধির হার	
	ছেলে	মেয়ে
৫	১০০	১০৪
৬	৯৯	১০৫
৭	১০১	১০৩
৮	১০০	১০২

বয়স	গড় বুদ্ধির হার	
	ছেলে	মেয়ে
৯	৯৮	১০২
১০	১০৩	১০৩
১১	৯৬	১০১
১২	৯৭	৯৯
১৩	৯৬	৯৭
১৪	১০০	৯৬

মনে হয়, মেয়েদের বুদ্ধি দ্রুততর পরিণতি লাভ করে, কিন্তু ছেলেদের স্থির পরিণতি হয় বেশী দিন ধরে। নীচের ক্লাশে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেয় কিন্তু কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, মোটের উপর, ছেলেরা বেশী ভাল করে। পুরুষদের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিও বেশী, পরন্তু, দুর্বলমনাও বেশী অর্থাৎ মাঝামাঝি থেকে খুব বেশী তফাৎ (variation) পুরুষদের মধ্যে যতটা, মেয়েদের মধ্যে ততটা নয়।

এসব পার্থক্য, কতটা জন্মগত, কতটা পরিবেশগত, তা নিশ্চিত করে বলার মত তথ্য, এখনও আমাদের হাতে নেই। আরো বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল সংগ্রহ করে, শেষ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। মোটের উপর বলা যায়,—নারী ও পুরুষের ভেদ বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ফ্রীম্যান সিদ্ধান্ত করেছেন সাধারণভাবে মাঝামাঝিদের বিবেচনা করে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতার অঙ্কে তাদের শক্তি বুদ্ধি ইত্যাদিতে খুব উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কোন গুণ অনুযায়ী ছড়িয়ে থাকার হার প্রায় একই, আর পুরুষে পুরুষে ও মেয়েতে মেয়েতে তফাৎও যথেষ্ট।[৫]

পরিবার বা বংশের প্রভাবজনিত পার্থক্য (The influence of family or inheritance)—এ নিয়ে কিছু আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি, 'বংশানুক্রম ও পরিবেশ' অধ্যায়ে। বংশানুক্রমের ক্ষেত্রে, দেহের মূল উপাদান, জীন্‌স্ নির্ধারণ করে, কেন একই পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে মিল থাকে, আর কেনই বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্যটা শুধুই জন্মগত নয়, আবার শুধুই পরিবেশগত নয়, তা আমরা দেখেছি।

৫ Freeman—Individual Differences.

শারীরিক পরিণতির বা বয়সের সঙ্গে মানসিক বিকাশের পার্থক্য (The influence of maturity or age on mental growth)—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, দেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পরিণতি ঘটে,—মস্তিষ্কেরও তেমনি পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে, বুদ্ধি বাড়ারও সম্ভব আছে, এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু দৈহিক পরিণতির হার সকলের সমান নয়, মানসিক পরিণতির হারও বিভিন্ন। পরিণতির ফলে, প্রভেদটা শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও বটে। পরিণতির একটা ফল, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকতর সুসংবদ্ধ হয়, মানসিক শক্তিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সুসমঞ্জস হয়। তাই বয়সের তারতম্য যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের একটা প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিণতির পার্থক্য কতটা যে জন্মগত আর কতটা যে শিক্ষার ফল তা নির্ধারণ করা অত্যন্তই কঠিন, হয়তো বা আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়, অসম্ভব। ব্যক্তির স্বভাব (nature), পরিবেশ ও শিক্ষার আগ্রহ—এ তিন বিভিন্ন প্রভাবই নির্ধারণ করে পরিণতির দ্রুততা বা মন্থরতা। বহু বৎসরব্যাপী কিছু কিছু ব্যক্তির ক্রমপরিণতির ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে আমেরিকায়। এসব পরীক্ষা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়:

(১) নিতান্ত শিশুকাল থেকেই দেখা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ,—তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি একজাতের নয়,—এক হারেও হয় না।

(২) প্রথম পাঁচ বছরে দৈহিক ও মানসিক পরিণতি অত্যন্ত দ্রুত। তারপরে ১০—২৫ বৎসর পর্যন্ত পরিণতি চলতে থাকে, কিন্তু তার হারটা অত দ্রুত নয়। তারপর ৩৫—৪৫ বৎসর পর্যন্ত প্রায় একটা স্থিতাবস্থা চলে থাকে। ৪৫ এর পর থেকে ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে। দৈহিক দিক থেকে এ অবনতি বেশী চোখে পড়ে।

(৩) শিশুর মানসিক পরিণতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর শৃংখলা (orderliness) এবং নিয়মিত (regularity) লক্ষ্য করা যায়। তার থেকে, কোন কোন উৎসাহী বিজ্ঞানী আশা করেছিলেন যে শিশুর মানসিক পরিণতির প্রকৃতি ও গতি (nature and rate of maturity) জানা গেলে, তার উপর নির্ভর করে, তার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলবে। সে আশা

কিন্তু এখনও ফলবতী হয় নি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ব্যক্তির I. Q. প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে—কিন্তু তাই বলে যে ছেলে বুদ্ধিমান্ বলে শিশুকালে বাহবা পেয়ে এসেছে, পরবর্তী জীবনে সে অনেক সময় বুদ্ধিমান মানুষ ব'লে খ্যাতিলাভ

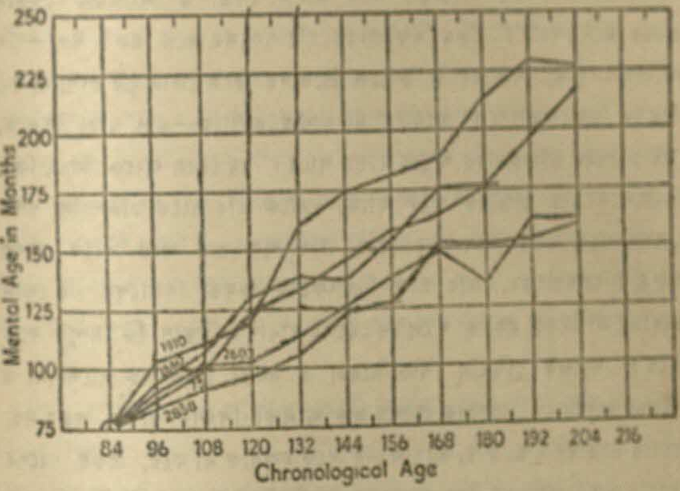

Variability in mental growth of five boys whose mental test scores and intelligence quotients were equivalent at age seven (from Dearborn and Rothney)

করে নি। বিশেষ করে দেখা যায় যাদের I. Q বেশী—তাদের ভবিষ্যতে পরিণতিতে পার্থক্য বরং বেশী—গতিপতির প্রকৃতি ও নিয়মিততা সম্বন্ধে মোটা-মুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হলেও, কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যতিক্রমটা এবং তার তাৎপর্য স্মরণ রাখতে হবে। একটা মাঝারী দলের মধ্যে সাধারণ কয়েকজনের মধ্যে হঠাৎ বেশ তফাৎ চোখে পড়ে, আর যাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেকটা বেশী তাদের মধ্যে দলের চেয়ে অনেকটা তফাৎ বরং আরো বেশী।* পাঁচটি শিশুর মানসিক পরিণতির হার ও পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে, যদিও তারা সমান মানসিক গুণ (Mental Age) নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভেদের তাৎপর্য—Educational significance of Individual difference—শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের তাৎপর্য কি? শিক্ষা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। জীবন্ত মানুষ

* Freemen—Individual Differences, P. 251.

নিয়ে তার কারবার। তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ, যে কোন সহৃদয় এবং বুদ্ধিমান্ শিক্ষা ব্যবস্থার সে সম্বন্ধে বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন একটা গুণ নিয়েই, শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আর বহু গুণের সমষ্টি দিয়ে তৈরী, একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব। তাই একটি শিশু ও আরেকটি শিশুতে প্রভেদ অনেকখানি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সকলের জন্যে একই হয়,—যদি ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যোগ্যতা ও রুচিতে প্রভেদের দিকে কোন দৃষ্টি রাখা না হয়, তাহ'লে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেকখানিই ব্যর্থ হতে পারে—এবং যারা শিখছে, সেই ছাত্রদের শক্তিরও বহু অপচয় ঘটতে পারে। যে ছেলে অংকে কাঁচা, কিন্তু চিত্রাংকনে যার বাস্তবিক রুচি আছে,—তাকে যদি অংকে-রুচিওয়ালা দশটি ছেলের সাথে, একই সমান কাজ দিয়ে, তার অক্ষমতার জন্যে তাকে কেবল লাঞ্ছনাই দেওয়া হয়, আর তার চিত্রাংকনের ক্ষমতা বিকাশের যদি কোন সুযোগই না দেওয়া হয়, তা হ'লে সে ছেলের মানসিক বিকাশ কি সম্পূর্ণ হতে পারে? কাজেই বুদ্ধিমান্ শিক্ষাবিদেরা এ সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা ও পরীক্ষা করেছেন। প্রত্যেক ছেলের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়, আবার ছাত্রদের বুদ্ধি, রুচি, প্রয়োজনের দিকে দৃক্পাত না করে, একই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা হানিকর এবং অপচয়কর। তাই এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ের একটা সামঞ্জস্যকরণ প্রয়োজন। সে চেষ্টাই নানা ভাবে চলছে সে কথা এবার বলছি।

(১) ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ নির্ধারণ —Adaptation of aims of education to the individual—ছাত্রের শক্তি, প্রয়োজন, রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ প্রয়োজন। যে যে কাজের উপযোগী, তাকে সে রকম শিক্ষা দিলে, ব্যক্তিও লাভবান হয়, সমাজও লাভবান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হচ্ছে, গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, এবং তাকে তার নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

(২) লেখাপড়া ছাড়া অন্যগুণকেও মর্যাদা দান—Need to recognise value in the less abstract studies and capacities—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে পুঁথিগত বিদ্যাকেই মর্যাদা দেওয়া হ'ত। বস্তুবিবর্জিত (abstract) চিন্তার বিকাশকেই প্রাচীনপন্থীরা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন।

কাজেই অংক, ইতিহাস, সাহিত্য এই সব ভাষাগত কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শিতা দিয়েই, ছাত্রদের মূল্য বিচার হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে অনেক ছেলে আছে, যারা এই বস্তু-বিবর্জিত চিন্তা ও ভাষাগত বিষয়ে হয়তো খুব যোগ্যতার পরিচয় দেয় না, কিন্তু তাই বলে, তারা ছাত্রহিসাবে মূল্যহীন হয়ে গেল না। হয়তো দেখা যাবে তারা কোন হাতের কাজে বেশ ওস্তাদ—না হয়তো ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে। কাজেই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সব অ-বিদ্যা (?) কেও মর্য্যাদা দান করা হচ্ছে। আর যারা এ সব বিশেষ দিকে পারদর্শিতা বা আগ্রহের পরিচয় দেয়, তাদের অন্ত দশজন পড়ুয়া ছেলের সঙ্গে, ইতিহাস, সাহিত্য অংকের বোঝা (এদের কাছে এগুলি বোঝাই বটে) সমানভাবে চাপিয়ে না দিয়ে, তাদের যেদিকে রুচি ও পারদর্শিতা সে রকম কাজই বেশী দেওয়া হয়। এবং তাদের মনে এই বোধই জন্মে দেওয়া হয় যে তাদের গুণগুলিও অন্তান্ত পাঠ্য বিষয়ের মত সমান মূল্যবান।

(৩) যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার হারের বিভেদ Need for provision for different rates for progress—একই বিষয়ে যাদের রুচি আছে, তাদেরও সবার বুদ্ধি বা যোগ্যতা সমান নয়। তাই ছাত্রের শক্তি অনুযায়ী তাকে অগ্রসর হবার সুযোগ দিতে হবে। যারা বেশী বুদ্ধিমান, তাদের উন্নতির হার যতটা দ্রুত হবে,—সাধারণ ছেলেদের অথবা কিছুটা বোকা ছেলেদের, উন্নতির হার ততটা দ্রুত হবে না, সেটা জানা কথা। তাই মাঝামাঝি ও মন্দদের, অতিরিক্ত তাড়া দিয়ে, বুদ্ধিমানদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাবার জন্তে চেষ্টা করলে লাভ হবে না। আবার যারা বেশী বুদ্ধিমান তাদের যদি অকাট মূর্খদের সঙ্গে একই মন্থর তালে চলতে হয়, তবে তারা অলস হবে, আর তাদের বুদ্ধির ধার যাবে মরে। তাই থর্নডাইক্ ও গেট্স্ লিখছেন, বিভিন্ন শক্তি অনুযায়ী ছাত্রদের সম্যক্ বিকাশ কর্ত্তে হলে তাদের শিক্ষণীয় বিষয় যেমন বিভিন্ন করতে হবে, তাদের অগ্রগতির হারও তেমনি বিভিন্ন করতে হবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে পরিণত জীবনে নানারকম জীবিকা, নানা খেলা ধূলা, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিভিন্ন কর্ত্তব্যে যাতে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে জন্তও এটা প্রয়োজন।[১]

[১] Thorndike & Gates—Elementary principles of Education. p. 225.

(৪) আগ্রহ ও চেষ্টা বিবেচনা করে পুরস্কার দানের পদ্ধতি —Equalizing rewards by means of the Accomplishment Quotient Technique.—লেখাপড়ায় উৎসাহ জন্মাবার জন্যে, পুরস্কার দেবার বিধি সর্বত্র আছে। যারা ক্লাসের মধ্যে সব বিষয়ে মিলিয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়, অথবা কোন একটা বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল নম্বর পায়, তারা পুরস্কার পেয়ে থাকে। এতে করে, উৎকৃষ্টরা তাদের উৎকর্ষ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, এটা ভালোই। কিন্তু অত্যন্ত সম্প্রতি শিক্ষা-মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা একটা নতুন ধরণের পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে, পুরস্কার দেওয়া হবে তাদের, যারা তাদের ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে বেশী ফল দেখাতে পারে। সে ক্লাসের সব চেয়ে বেশী নম্বর নাও পেতে পারে, কিন্তু তার শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য সে করেছে, তাই পুরস্কার তার প্রাপ্য। অর্থাৎ ধরা যাক্, এক মাঝারী ছেলের সামর্থ্য হচ্ছে ১০০, কিন্তু সে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে নিজের উন্নতি করলে, আর তার ফল সে ১০৫ সামর্থ্যযুক্ত ছেলের মত দেখাতে পারলে। আর একজন খুব ভাল ছেলে, তার সামর্থ্য হচ্ছে ১১০, কিন্তু সে খুব খাটলো না, তবু সে ১০৫ সামর্থ্যযুক্ত ছেলের সমান ফল দেখাতে পারলো। যদিও দ্বিতীয় ছেলেটি, এখানে প্রথম ছেলেটির তুলনায় বেশী নম্বর পেয়েছে কিন্তু তথাপি, প্রথম ছেলেটি তার শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করেছে, তাই দ্বিতীয়ের তুলনায় সে কম পেলেও পুরস্কার তারই প্রাপ্য। এ পদ্ধতির গুণ হচ্ছে এই যে, এতে প্রত্যেকটি ছেলেরই পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা থাকে, আর সব চেয়ে বড় কথা যেটা,—প্রত্যেককেই নিজ শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৫) যারা অ-সাধারণ তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা—Need for better instruction of the most gifted—যারা সব চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বা কোন বিশেষ গুণান্বিত, তাদের জন্যে, বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সব চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধির বেলায় দেখেছি, খুব বুদ্ধিমান যারা, তাদের মাঝারী ও মন্দদের সঙ্গে একই সমান পড়া বা কাজের ব্যবস্থা করলে বুদ্ধিমানদেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

(৬) আবেগ প্রবণতা ও অন্যগুণের প্রতি দৃষ্টিদান—Need of attention to differences in emotionality and other traits—মানুষে

মানুষে তফাৎ, শুধু শিক্ষার ক্ষমতায় নয়,—মৌলিক প্রয়োজন ও রুচিতেও বটে। অনুভূতির ক্ষেত্রে, সহজাত সংস্কারের তীক্ষ্ণতা বিষয়ে ও মানসিক গঠনেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ প্রচুর। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু বুদ্ধির তফাৎটার কথাই ভাবলে চলবে না, জীবনের অন্যান্য মৌলিক প্রভেদের কথাও শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে, আর সে অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সকলের বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। যারা অতিরিক্ত অভিমানী, অথবা যারা একেবারে উদাসীন ও নির্মম, তাদের মনের গড়ন, রুচি ও প্রয়োজন অনেকখানি ভিন্ন হবেই এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ভিন্নতার স্বীকৃতি না থাকলে বহু মনোদুঃখ ও অপচয় অবশ্যম্ভাবী। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুভূতির জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নূতন শিক্ষাবিদেরা সচেতন।

(৭) **সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েও সামর্থ্য অনুযায়ী-শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতির ভিন্নতা**—Need of adapting materials and methods of instruction in common subjects to individual differences—প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে তার শক্তি, প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এটাই আদর্শ। রুশো 'এমিল' গ্রন্থে এ ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট বলেছেন। কিন্তু যেখানে শিক্ষায় সর্বসাধারণের অধিকার, সেখানে এটা কখনোই সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। ছাত্রদের পার্থক্য যেমন আছে, মিলটাও উপেক্ষণীয় নয়। সমষ্টির থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত প্রাণরস পেতে পারে না। শিক্ষা একটা সামাজিক ক্রিয়া। এখানে দশের একত্র হওয়া চাই,—এখানে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুই-ই প্রয়োজন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও "দশে মিলি করি কাজ"। কাজেই শিক্ষায় কতকগুলি সাধারণ বিষয় থাকবেই, আর একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। কিন্তু এর মধ্যেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ অনুযায়ী, বিষয়-বস্তুর তারতম্য করতে পারা যায়, শিক্ষার পদ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন সম্ভব। সব চেয়ে ভাল ফল পেতে গেলে, তা করতেও হবে, এবং অগ্রসর সমস্ত বিদ্যালয়ে সে চেষ্টা হয়েও থাকে। যেহেতু ছাত্রদের শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন, কাজেই কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তু বা পাঠক্রম থাকবে না, এটাও আবার একটা ভুল ধারণা। এ নিয়ে ডিউই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।[৮]

---

৮ তিনি লিখিছেন, Progressive schools set store by individuality, and sometimes it seems to be thought, that orderly organisation of subject-

দলের এ্যাভারেজ স্কোর, বা মীন্ বা মেডিয়ান্ বার করে, মাঝারী থেকে পরিবর্তন কতটা (variability range) বার করে তুলনামূলক বিচার করা যায়। মাঝারী, পরিবর্তনের নির্দিষ্ট মান ও পরিবর্তনের পরিমাণ (Average, Standard deviation, Range) এগুলো কিভাবে বার করতে হয়, তা অবশ্য পরিসংখ্যাণতত্ত্বেরই বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

তারপর এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নিরূপণ ও নানাবিধ পরীক্ষা এর সাহায্যে হতে পারে। বুদ্ধির পার্থক্যের বিচারই এ পর্যন্ত অন্যান্য সকল গুণের পার্থক্য অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হয়েছে। বিনে-সিমোন্, ট্যারম্যান-মেরিল্ (Binet-Simon, Terman-Merrill) ইত্যাদি বহু প্রকার পরীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির বিচার কি করে করা হয়, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বিশেষ যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা (Special Ability tests) অনেক উদ্ভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা বা বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা পরিমাপেরও নানা পরীক্ষা আছে। কোন বিষয়ে যোগ্যতা ও রুচি (Capacity or Aptitude) কার কেমন আছে তা নির্ণয়েরও নানা পরীক্ষা আছে, যার দ্বারা কোন মানুষের ভবিষ্যতে কোন যোগ্যতার বিকাশ হতে পারে, বর্তমানে তার ইঙ্গিত পাওয়া চলে।

মানুষের ভাবাবেগ মাপবার উপায়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত বলা যায় না। তবুও নানাপ্রকার সামাজিক গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষার (Sociometric scale & Attitude test) সাহায্যে মানুষের বিশিষ্ট বস্তু বা আদর্শের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাপা যাচ্ছে। আমেরিকায় এ চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে।

এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিরূপক যত প্রকার উপায় আছে, সকল উপায়ের সাহায্যেই এক ব্যক্তি হতে অপর ব্যক্তির পার্থক্য ধরা পড়ে।

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাকে। সে সমাবেশের প্রকৃতি আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হয়। এই সমাবেশকে পরিসংখ্যানতত্ত্বের ভাষায় চিত্রিত করতে হলে প্রয়োজন হয় Co-efficient of correlation-এর-অর্থাৎ এক গুণের সঙ্গে অপর গুণের সম্বন্ধ বোঝায়। পার্সোনালিটি প্রোফাইল্ বা সাইকোগ্রাফের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণ-দোষের সমাবেশের পার্থক্যটা সহজে বুঝতে পারি।[১০]

---

১০ Woodworth—Psychology (18th edn.) p. 158

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। কি কি বিষয়ে এ প্রভেদ এবং তার কারণ কি এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করতে গেলে এ প্রভেদটা মাপবার ও প্রকাশ করবার নির্দিষ্ট উপায় থাকা চাই। এটা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অন্তর্গত। পরবর্তী প্রবন্ধে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা ও পরিসংখ্যান

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পরিসংখ্যানের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের অবদান প্রচুর। শিশু কতটা শিখতে পারল ও অপর একটি শিশু থেকে তার কৃতিত্বের পার্থক্য কতটা, তা পরিমাপ করার নানা পদ্ধতি আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে। বর্তমান যুগে বুদ্ধি সমীক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিমাপগুলি বহুল পরিমাণে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। বিভিন্ন অভীক্ষায় কি mental কি scholastic, প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী জানতে গেলে পরিসংখ্যানের সাহায্য অত্যাবশ্যক।

কোনও একটি পরীক্ষায় দুই দল ছাত্রের ফল তুলনা করতে হলে তাদের average score, range ও extent of variability জানতে হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন বিভিন্ন দেশের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জাতি, বর্ণ ও লিঙ্গগত কারণে বুদ্ধি বা পারদর্শিতার পার্থক্য হয় কিনা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে পার্থক্য দেখা যায়, উহার মূল্য বা 'Significance' জানতে হলে একমাত্র পরিসংখ্যান দ্বারাই আমরা তা জানতে পারি।

ধরা যাক্ অঙ্কের achievement test এ একটি ছেলের স্কোর হল 68 এবং ইংরাজী ভাষায় স্কোর হল 143, তার পারদর্শিতা কোন বিষয়ে কি রকম, কি করে বুঝব? এখানে Percentile Rank আমাদের সাহায্য করবে। অঙ্কে 68 মানে যদি PR 52, এবং ইংরাজীতে 143 মানে PR 68 হয়, তবে বুঝতে হবে ছাত্রটি অঙ্কে মাঝামাঝি (কারণ তার নীচে 52% ছাত্র আছে) এবং ইংরাজীতে ভাল (কারণ তার নীচে 68% ছাত্র আছে)।

তবে পরিসংখ্যান পরীক্ষা বা পরিমাপের শেষ কথা নয়, এটা পরিমাপের সহায়ক মাত্র। যে পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির মাপ করব, সেই পরীক্ষাটিই যদি নিকৃষ্ট স্তরের হয়, তবে তার সাহায্যে পরবর্তী সাফল্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও অনুরূপ ভাবে ভুল হবে। পরিসংখ্যান কতকগুলি tools বা উপায়ের সন্ধান দেয় মাত্র, যার সাহায্যে সংখ্যা বা নম্বরগুলি নানাভাবে ছকে ফেলে

ব্যাখ্যা করা চলে। এর সাহায্যে কোন একটি দল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাই, কিন্তু কোন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র ঐ দলের পরিপ্রেক্ষিতে বা Average এর মাধ্যমে ঠিক পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় আলাদা Psychograph বা Profile-এর।

পরিসংখ্যানের কয়েকটি সাধারণ সূত্র, যা শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণ মাপ—Measurements in general—আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ও কালের মাপ গ্রহণ করে থাকি, যেমন ঘরের দৈর্ঘ্য, কাপড়ের দৈর্ঘ্য, শিশুদের দৈর্ঘ্য, ওজন ইত্যাদি। এর জন্য প্রয়োজন হয় ইঞ্চি, ফুট, গজ, মিটার প্রভৃতি নানা এককের জ্ঞান ও স্কেল্। এছাড়া মানুষের বুদ্ধি, ক্ষমতা, চারিত্রিক গুণাবলীও আমাদের বিষয়বস্তু হয়।

সারি বিন্যাস—Rank order—নানা ভাবেই এই সব বিষয়ে মাপ গ্রহণ করা যায়। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, যে কোন একটি গুণ অনুসারে ব্যক্তিদের পর পর সারিতে সাজিয়ে ফেলা, যেমন উচ্চতা, দৈর্ঘ্য বা পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ছাত্রদের পর পর সাজিয়ে বলতে পারি, অমুকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এতে কোন একটি বিশেষ দলের মধ্যে কোন একটি গুণ অনুসারে এক বিশেষ ব্যক্তির সারিতে স্থানটি (Rank order) কোথায় তাই শুধু বোঝা যায়, অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণ তুলনা-সাপেক্ষ বা relative, 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' বা 'তৃতীয়' এই স্থান দিয়ে ব্যক্তির absolute বা একক উচ্চতা, দৈর্ঘ্য বা পরীক্ষার ফল বোঝা যায় না।

Score—অনেক সময় scores, সংখ্যা বা নম্বরের সাহায্যে আমরা গুণ, যোগ্যতা ইত্যাদির পরিমাপ প্রকাশ করে থাকি, যেমন বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বর, কর্মচারীদের বেতন, ক্রিকেট খেলার রাণ, কোন অভীক্ষার নম্বর ইত্যাদি।

Scale—স্কোর বা নম্বরগুলির কোন unit, একক বা ধাপ ঠিক করে পর পর ধাপে ধাপে সাজালে একটি Scale বা মাপকাঠি তৈরী করা যায়, এবং তার সাহায্যে কোন বস্তুর কোন একটি বিশেষ গুণ মাপ করা যায়। যেমন স্থানের দূরত্ব মাপ করার জন্য এক ইঞ্চিকে একক করে একটি scale তৈরী করা যায়, যথা 0—1″, 1″—2″, 2″—3″, ইত্যাদি, এবং তার সাহায্যে দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা মাপ করা যায়।

তবে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বে যেসব স্কেল ব্যবহার করা হয়, তাতে units সমান হলেও স্কেলটি সম্পূর্ণ শূন্য থেকে সুরু হয় না, ফলে প্রত্যেকটি একক ঠিক absolute বা আলাদা নিজস্ব মূল্যের অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে পদার্থবিজ্ঞানে মিটার, গ্রাম, সেকেণ্ড ইত্যাদি এককের সাহায্যে যে সব স্কেল তৈরী হয়, তারা প্রত্যেকেই 'zero point' থেকে সুরু হয়, এবং প্রত্যেকটি ধাপের বা এককের নিজস্ব একটি মূল্য আছে, তা অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। Physical Scale এর স্কোরকে বলা হয় 'measures" তাদের যোগবিয়োগ গুণ ভাগ করা চলে, যেমন 20″ স্কোরটিকে 'দশ ইঞ্চি' স্কোরের দ্বিগুণ বলা চলে। কিন্তু কোন ability test এর ফল যদি চল্লিশ হয়, তাকে ঐ টেষ্টের উপর অপর একটি স্কোর, যথা কুড়ির দ্বিগুণ বলা যাবে না। কারণ কোন ability ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এমন শূন্য অবস্থা কখনও কল্পনা করা যায় না। ফলে স্কেলটা কখনও 'Zeropoint' থেকে সুরু হতে পারে না।

Variables – continuous and discrete series—অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্নসারি—স্কোর বা measures এর সাহায্যে যে সব বস্তু, গুণ বা ক্ষমতা আমরা মেপে থাকি, তাদের বলা হয় variables ; এই variables কে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, continuous বা অবিচ্ছিন্ন এবং discrete বা বিচ্ছিন্ন সারি। আমরা যখন টাকাপয়সার হিসাব করি, দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা, অথবা বুদ্ধি কি কোন যোগ্যতার মাপ করি, তখন তাদের সারি করে ধাপে ধাপে সাজান যায় এবং ঐ সারির ধাপগুলির মধ্যে কোন বিচ্ছেদ বা বিরতি (real gap) থাকে না অর্থাৎ চিন্তনীয় বিরতিগুলি অসংখ্য ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, যদিও দৈনন্দিন জীবনে হিসাবের সুবিধার জন্য ভগ্নাংশগুলি আমরা সাধারণতঃ ছেড়ে দিয়ে থাকি। যেমন বাসের ভাড়া নয়া পয়সার হিসাবে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দু'আনার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—তের নয়া পয়সা, কারণ দু'আনার মূল্য—বার নয়া পয়সার চেয়ে সামান্য বেশী, অথচ তের নয়া পয়সা থেকে কম। বার নয়া পয়সা নিলে ঐ বাড়তি অংশটুকু ছেড়ে দিতে হয়, তাতে কোম্পানীর অনেক ক্ষতি হয়, সেজন্য বেশী মূল্যটাই ধার্য্য করা হয়েছে।'

কিন্তু আরো অনেক বিষয় আছে যাদের অবিচ্ছিন্ন সারিতে সাজান যায় না। যেমন মানুষ, বই, ফল ইত্যাদি। একটি পাড়ায় প্রত্যেক পরিবারের ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যার একটি হিসাব নেওয়া হ'ল। এবং অঙ্ক কষে গড়-

পড়তায় প্রত্যেক বাড়ীতে 2·57 ছেলেমেয়ে আছে দেখা গেল। এখন সত্যিকার 2·57 ছেলেমেয়ে হতে পারে না। আমাদের বলতে হবে, হয় দুটি, নয় তিনটি—ছেলেমেয়ে আছে গড়-পড়তায়। কিন্তু দুটি বা তিনটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্যিকারের, তাকে কোন ভগ্নাংশ দিয়ে টুকরো করে প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং মানুষ বিচ্ছিন্ন সারিতে পড়ে। কিন্তু বুদ্ধি, বয়স, সময় অবিচ্ছিন্ন সারিতে পড়ে। সাধারণতঃ মানসিক ক্রিয়া, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি অবিচ্ছিন্ন ধারায় সাজান যায়। সেজন্য বর্তমানে আমরা অবিচ্ছিন্ন সারি সংক্রান্ত স্কোর নিয়েই শুধু আলোচনা করব।[1]

Score in a continuous series.—অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের তাৎপর্য্য বুঝতে হলে অবিচ্ছিন্ন সারিকে, প্রথমতঃ একটি সরলরেখা হিসাবে কল্পনা করতে হবে। সেই সরল রেখায় (linear continuum) স্কোর মানে এক একক থেকে অপর এককের দূরত্ব। একটি ফুটরুলে এক ইঞ্চি মানে দুটি বিশেষ ধাপের মধ্যে দূরত্ব, যেমন 0—1″ বা 1″—2″; 150 স্কোর মানে 149·5 থেকে 150·5 এর মধ্যবর্তী দূরত্ব। অর্থাৎ 150 মানে 149·5 ও 150·5 এর ঠিক মধ্যবিন্দু বা midpoint.

SCORE 150

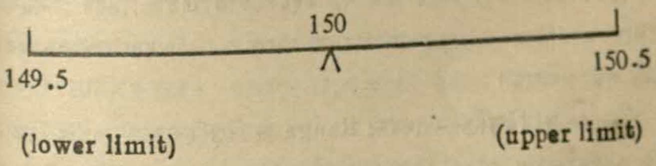

তার মানে 149·6, 149·7, 149·8···150·4 পর্য্যন্ত সমস্ত value কেই 150 এই স্কোর হিসাবে নেওয়া যাবে। এখানে 150 এর নিম্নতম সীমা হচ্ছে 149·5 এবং উচ্চতম সীমা 150·5।

অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অপর একটি তাৎপর্য্য করা যায়। 150 score মানে 150 থেকে 151 পর্য্যন্ত যে কোন মূল্য—যেমন 150·2, 150·3, 150·8

---

[1] "A continuous series is one which is capable of any degree of sub. division, although in practice divisions smaller than some convenient unit are rarely employed".—Garrett.

কে 150 এই স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। 150 মানে এই হিসাবে 150 থেকে 151 পর্য্যন্ত দূরত্বের মধ্যবিন্দু বা midpoint.

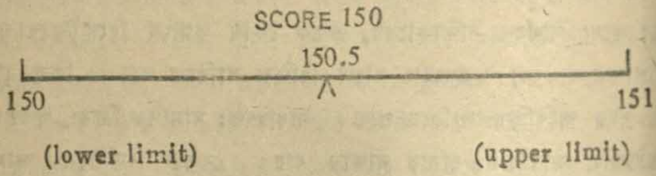

এই হিসাবে একটি স্কোর বা নম্বর মানে সংখ্যাটির ·5 কম থেকে ·5 বেশী পর্য্যন্ত মূল্য ধরা হল, এটাই সাধারণ গণিতের নিয়ম। আমরা এখানে স্কোর বলতে প্রথম অর্থটিকেই মেনে চলব, অর্থাৎ স্কোর 150, 64 এবং 9-এর মানে 149·5 – 150·5, 63·5 – 64·5, এবং 8·5—9·5।

Frequency Distribution

ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন বলতে একটি স্কোর কতজনে পেয়েছে, বা কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী বা ব্যবধানের মধ্যে একটি স্কোর কতবার এসেছে, তারই হিসাবকে বোঝায়। এই হিসাব তৈরী করতে হলে প্রথম প্রয়োজন স্কোরগুলি সাজিয়ে নেওয়া। পরীক্ষার ফল বা নম্বর কোন একটি নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে না নিলে তাদের কোন তাৎপর্য্য থাকে না। এদের শ্রেণীবদ্ধ করার তিনটি পদ্ধতি আছে।

Range বা বিস্তৃতি—প্রথমতঃ Range বা বিস্তৃতির মাপ, অর্থাৎ স্কোরগুলি কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, তার মাপ গ্রহণ করা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাকেই বলে Range.

Class-intervals বা শ্রেণীব্যবধান—দ্বিতীয়তঃ স্কোরগুলিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে সাজান চলে। শ্রেণীগুলিকে কি ভাবে ও কি প্রকার দূরত্ব বজায় রেখে সাজান যায় তার কতকগুলি বিশেষ আংকিক পদ্ধতি আছে। নীচে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

Graphical representation বা লেখচিত্র—গ্রাফ বা লেখচিত্রের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ স্কোর অথবা ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনকে প্রকাশ করা চলে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চার প্রকার গ্রাফের সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউ-

জনকে প্রকাশ করা যায়, যথা, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন (Polygon), হিষ্টোগ্রাম (Histogram) কিউম্যুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ (cumulative frequency graph) এবং কিউম্যুলেটিভ পার্সেন্টেজ কার্ভ বা ওজাইভ্ (Ogive)।

একটি উদাহরণ সহযোগে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক্।

একটি পরীক্ষায় 50 জন ছাত্রের স্কোর

অবিন্যস্ত ভাবে (ungrouped)

উদাহরণ—১

185	166	176	145	166	191	177	164	171	174
147	178	176	142	170	168	171	167	180	178
173	148	168	187	181	172	165	169	173	184
175	156	158	187	156	172	162	193	173	183
197	181	151	161	153	172	162	179	188	179

তালিকা সংখ্যা ১

Range—এখানে সবচেয়ে বড় স্কোর হচ্ছে 197, এবং সব চেয়ে ছোট স্কোর হচ্ছে 142। তাহলে Range হ'ল 197-142 = 55।

Class intervals. Range বার করার পর স্কোর গুলিকে শ্রেণীতে ভাগ করে সাজাতে হবে। সাজাতে হলে প্রথমে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঠিক করতে হবে। ঐ দূরত্ব বা interval এর মাপ আমাদের ইচ্ছা ও সুবিধার উপর নির্ভর করে। তবে এর একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, হিসাব করে **এমন interval নেওয়া যাতে দল বা শ্রেণীর সংখ্যা কুড়ির বেশী বা দশের কম না হয়।** তবে স্কোরের সংখ্যা যেখানে অত্যন্ত বেশী বা অত্যন্ত কম, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

Interval বার করার আংকিক পদ্ধতি—Range বার করে নিয়ে তাকে মনগড়া কোন একটি interval দিয়ে ভাগ কর। ১নং তালিকায় Range হচ্ছে 55। ধরা যাক Class-interval বা শ্রেণীর মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে 5, তাহলে Range ÷ Class interval এই সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই 55 ÷ 5 = 11 Classes ; গ্রাফ্ কাগজে প্লট্ করতে একটি শ্রেণী বেশী নেওয়া

রীতি। তাহলে শ্রেণীর সংখ্যা হল 11 + 1 = 12। এভাবে Class interval বা শ্রেণীর সংখ্যা বার করার সূত্র হচ্ছে $\frac{\text{Range}}{\text{Class interval}}+1$ উপরের উদাহরণে Class interval-এর Size যদি 5 এর বদলে 3 হয়, তাহলে শ্রেণীর সংখ্যা হয় 19 ; আবার 10 হলে আমরা পাই ছয়টি শ্রেণী।

শ্রেণী বা দলে ভাগ করে সাজাবার পদ্ধতি —

5 Unit-কে Class interval ধরে উপরোক্ত উদাহরণের (১নং তালিকা) স্কোরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাক্। শ্রেণীতে সাজাবার তিনটি রীতি আছে।

A পদ্ধতি	B পদ্ধতি	C পদ্ধতি
195—200	194·5—199·5	195—189
190—195	189·5—194·5	190—194
185—190	184·5—189·5	185—189
180—185	179·5—184·5	180—184
175—180	174·5—179·5	175—179
170—175	169 5—174·5	170—174
165—170	164·5—169·5	165—169
160—155	159·5—164·5	160—164
155—160	154·5—159·5	155—159
150—155	149·5—154·5	150—154
145—150	144·5—149·5	145—149
140—145	139·5—144·5	140—144

তালিকা সংখ্যা ২

*আসল স্কোরগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি হল 142. প্রথম শ্রেণীটি "142—147" করে সাজান চলত, কিন্তু অঙ্ক কষার সুবিধার জন্য 140 থেকে সুরু করা হয়েছে।

'A' পদ্ধতিতে '140-145' দলের মানে এই যে 139·5 থেকে সুরু করে 144·5 পর্য্যন্ত সমস্ত Score-ই ঐ দলের মধ্যে পড়বে। B পদ্ধতিতে ঐ একই দলের উচ্চপ্রান্ত ও নিম্নপ্রান্ত সীমা দেখিয়ে লেখা হয়েছে। C পদ্ধতিতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, তবে এটি A পদ্ধতি থেকে সহজ, যদি ও B পদ্ধতির মত অত নিখুঁত নয়।

Score গুলি সাজাতে আমরা সাধারণত 'C' পদ্ধতি মেনে চলব, যদিও অঙ্কের দিক থেকে তিনটি পদ্ধতিই সমান মূল্যবান। 'A' পদ্ধতির অসুবিধা এই যে 145 স্কোরটি হঠাৎ ভুল করে '140-145' এই শ্রেণীতে ফেলে দিতে পারি। 'B' পদ্ধতির অসুবিধা এই যে 0·5 করে বারে বারে লিখতে অনেক সময় লাগে। 'C' পদ্ধতিতে শ্রেণী ভাগ করে সাজান সহজ, যদিও সর্বদাই মনে রাখতে হবে '140-144' মানে হচ্ছে '139·5 থেকে 144·5" পর্যন্ত।

তাহলে ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন হিসাব করার **প্রথম ধাপ** হল, স্কোরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দলে দলে সাজিয়ে নেওয়া।

দ্বিতীয় ধাপ—প্রত্যেক class-interval এর মধ্যবিন্দু বা midpoint বার করা। যথা 175-179 এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হচ্ছে 177. এই শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু কেমন করে 177 হল, তা লেখচিত্রের মাধ্যমে নীচে দেখান হল।

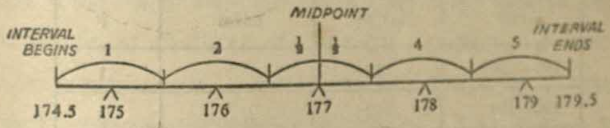

চিত্র সংখ্যা ১

মধ্যবিন্দু বার করার সহজ সূত্র হচ্ছেঃ মধ্যবিন্দু = শ্রেণীর নিম্নপ্রান্ত সীমা (lower limit of interval)

$$+\frac{\text{উচ্চ প্রান্তসীমা} - \text{নিম্নপ্রান্তসীমা অথবা class interval}}{2}$$

এই সূত্র অনুযায়ী "175-179" এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হল

$$174{\cdot}5+\frac{179{\cdot}5-174{\cdot}5}{2}=177$$

কোনও একটি শ্রেণীব্যবধানে যে স্কোরগুলি থাকে, মধ্যবিন্দু তাদের যথার্থ প্রতীক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কিনা, এবিষয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। ১নং তালিকায় দেখতে পাই যে "170-175" এই শ্রেণীতে (মধ্যবিন্দু 172) তিনটি স্কোর (170, 171, 171) মধ্যবিন্দুর নীচে পড়েছে, তিনটি স্কোর (172, 172, 172) ঠিক মধ্যবিন্দুতে আছে, এবং চারটি স্কোর (173, 173, 173, 174) মধ্যবিন্দুর ওপরে পড়েছে। "180 – 185" শ্রেণীতে পাঁচটি স্কোর

আছে। তার মধ্যে তিনটি স্কোর (180, 181, 181) মধ্যবিন্দুর (182) নীচে এবং দুটি স্কোর (183, 184) ওপরে। "195–200" এই শ্রেণীতে একটিই স্কোর 147, এবং সেটি ঠিক মধ্যবিন্দুর ওপরে পড়েছে। সুতরাং বর্তমান উদাহরণে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানে যে স্কোরগুলি আছে মধ্যবিন্দুগুলি তাদের যথার্থই প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে সর্বদা মধ্যবিন্দু এত সুন্দরভাবে সব স্কোরের প্রতীক হয় না। যখন স্কোরের সংখ্যা কম থাকে, বা ডিষ্ট্রিবিউশনটি নর্ম্যাল কার্ভের রূপ না নিয়ে Skewed বা একপেশে হয়, তখন মধ্যবিন্দুর ওপরে বা নীচে স্কোরের আধিক্য হয়ে যেতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে মধ্যবিন্দু যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে না।

উদাহরণ সংখ্যা—২

শ্রেণী	মধ্যবিন্দু	tallies	F
195—199	197	/	1
190—194	192	//	2
185—189	187	////	4
180—184	182	~~////~~	5
175—179	177	~~////~~ ///	8
170—174	172	~~////~~ ~~////~~	10
165—169	167	~~////~~ /	6
160—164	162	////	4
155—159	157	////	4
150—154	152	//	2
145—149	147	///	3
140—144	142	/	1
			N=50

তালিকা সংখ্যা ৩

শ্রেণীব্যবধানের স্কোরসমূহের প্রতিনিধি হচ্ছে মধ্যবিন্দু, এই ধারণা সত্য হতে হলে প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সংখ্যক স্কোরের, এবং শ্রেণী ব্যবধান গুলির

দূরত্ব যেন খুব বেশী না হয়। তবে এসব নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে না মানলেও মধ্যবিন্দুকে মোটামুটি ভাবে শ্রেণী ব্যবধানের প্রতিনিধি বলা চলে।

তৃতীয় ধাপ—প্রত্যেকটি স্কোর কোন্ শ্রেণীতে পড়েছে, সেটা একটা করে দাগ দিয়ে যাওয়া (tallies)। তারপর দাগগুলি গুণে সংখ্যায় সেই frequency (f) প্রকাশ করা, যাতে সেই frequency এর সারি দেখলেই কোন্ শ্রেণীতে কতগুলি করে স্কোর আছে তা বোঝা যায়। উদাহরণ (১ম তালিকা থেকে)

চতুর্থ ধাপ—গ্রাফ্ কাগজে ঐ Frequency distribution প্লট্ করা। নিম্নলিখিত চার প্রকার গ্রাফ কি ভাবে আঁকা যায়, উপরের উদাহরণ যোগে তা' আলোচনা করছি।

Frequency Polygon.

গ্রাফ আঁকা সম্বন্ধে প্রথমে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম আলোচনা করছি। যে কোন গ্রাফ বা লেখচিত্রের দুটি অক্ষ থাকে, x এবং y ; x অক্ষরেখাটি নীচে আড়াআড়ি ভাবে (Horizontally) টানতে হয়, ; এবং y. অক্ষরেখাটি তার এক প্রান্তে লম্বভাবে বা উর্দ্ধমুখে (Vertically) টানতে হয়। উভয় রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাকে বলে origin। তার নামকরণ করা হোক 'o'। তাহলে y-অক্ষরেখার নাম হল oy এবং x-অক্ষরেখার নাম হল ox। x-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধান এবং y-অক্ষরেখার ফ্রিকোয়েন্সীগুলি সাধারণতঃ প্লট করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করি, যে লেখচিত্র আঁকতে একইঞ্চি তফাতে স্পষ্ট দাগসহ এবং প্রতি ইঞ্চি দশভাগে বিভক্ত এমন গ্রাফ্ কাগজ ব্যবহার করাই প্রকৃষ্ট।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁকার পদ্ধতি :—x-অক্ষরেখার দুই প্রান্তে প্রকৃত শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা থেকে আরো দুটি পূর্ণ বা অর্দ্ধেক শ্রেণীব্যবধান বেশী ধরে বসাতে হবে, যদিও ঐ দুই শ্রেণীতে কোন স্কোর নেই। ১নং তালিকার উপর নির্ভর করে ৬১১ পৃষ্ঠায় যে শ্রেণী ব্যবধান দেখিয়ে frequency distributionটি তৈরী করা হয়েছে, তাতে প্রকৃত শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা 12, এর উভয় প্রান্তে ($\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$) হিসাবে শ্রেণীব্যবধান বাড়িয়ে সর্বসমেত 13 শ্রেণীব্যবধান লওয়া গেল x-অক্ষরেখায়। এক দশমাংশ ইঞ্চিকে unit ধরে x-অক্ষরেখায় তেরটি শ্রেণীব্যবধান বা ক্লাসইন্টারভ্যাল বসালে লেখচিত্রটি $6\frac{1}{2}$ ইঞ্চি

লম্বা হবে। x-অক্ষরেখার শ্রেণীব্যবধানগুলি বসাতে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত প্রান্তসীমা দেখাতে হবে। অর্থাৎ 195 – 199 শ্রেণীকে উচ্চপ্রান্ত ও নিম্ন প্রান্ত দেখিয়ে 194·5 – 199·5 হিসাবে বসাতে হবে। তাহলে বর্তমান লেখচিত্রটির শ্রেণীব্যবধান সুরু হবে 134·5 – 139·5 শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে, এবং শেষ হবে 199·5 – 204·5 শ্রেণীর মধ্যবিন্দুতে।

এবার y-অক্ষরেখায় frequencyগুলি প্লট করতে হবে। প্রতি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর ওপরে লম্বভাবে ঐ শ্রেণীর frequency গুণে একটি বিন্দু বসাতে হবে। যেমন 140 – 144 (139·5 – 144·5) শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী হচ্ছে এক। ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 142 এর ওপরে লম্ব ভাবে y-অক্ষরেখার এক unit গুণে একটি বিন্দু বসাতে হবে।

y-অক্ষরেখায় উচ্চতা ও শ্রেণীর একক কি হবে, সে সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম আছে। সাধারণতঃ x-অক্ষরেখার প্রসারের 75% বা তিনচতুর্থাংশ হবে y-অক্ষরেখার উচ্চতা। না হলে লেখচিত্রটি একটি সুষম আকার ধারণ করবে না। x-অক্ষরেখার শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব থেকে y-অক্ষরেখার শ্রেণীগুলির দূরত্ব বেশী হলে পলিগনটি অতিরিক্ত উঁচু হবে, আবার দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হলে, পলিগনটি অত্যধিক নীচু ও চ্যাপ্টা হবে।

এখানে x-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা তের, সুতরাং 75% of 13 হচ্ছে 9·75 বা প্রায় দশ; অতএব y-axis এ—দশটি ইন্টারভ্যাল নিতে হবে এবং উচ্চতা হবে (75% of 6·5 inches = 4·875″) বা পাঁচ ইঞ্চি। y-অক্ষরেখায় প্রতি ইন্টারভ্যাল, unit বা $\frac{1}{10}$th ইঞ্চিতে কত frequency ধরা হবে, তা' নির্ভর করে—frequency এর সর্বোচ্চ সংখ্যার উপর। সাধারণতঃ সর্বোচ্চ frequencyকে (এখানে 10) y-অক্ষরেখার শ্রেণীর সংখ্যা (এখানে 10) দিয়ে ভাগ করে প্রতি unit এ কত স্কোর বা frequency বোঝাবে, তা' হিসাব করে দিতে হয়। এখানে প্রত্যেক y-unit (10 ÷ 10 = 1) একটি স্কোর বা frequencyএর সমান।

সব বিন্দুগুলি প্লট করা হয়ে গেলে, আরম্ভে যে শ্রেণীতে কোন frequency নেই, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে সুরু করে প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে সরলরেখা টেনে যোগ করে শেষ যে শ্রেণীতে কোন frequency নেই, তার মধ্যবিন্দুতে গিয়ে চিত্রটি শেষ করতে হবে এবং সেটি হবে একটি frequency polygon.

এখানে ১নং তালিকার উদাহরণ যোগে একটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এঁকে দেখান হ'ল।

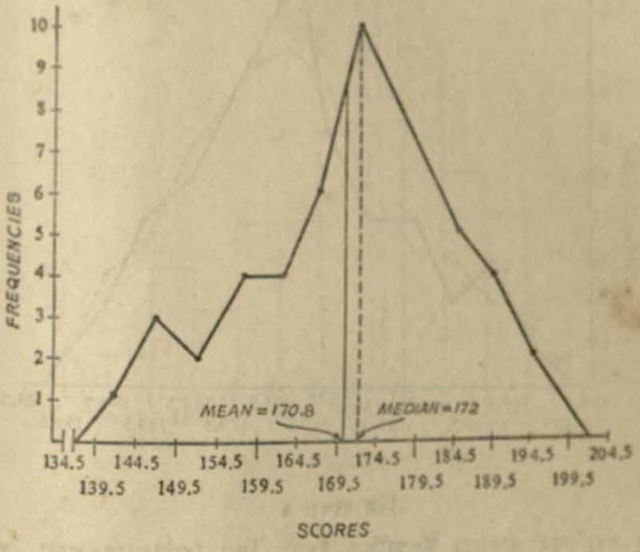

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন অনেক সময় বড় বেশী উচুনীচু হয়। তাকে মসৃন করার (smoothing) একটি সূত্র আছে। প্রতি শ্রেণীতে যে frequency আছে, তার সঙ্গে তার ঠিক ওপরের ও নীচের শ্রেণীর frequency যোগ দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন "174·5—179·5" এই class interval এর smoothed frequency হবে $\frac{5+8+10}{3}$ অথবা 7·67। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর smoothed frequency বের করে আবার বিন্দুগুলি প্লট্ করে গ্রাফ টানলেই আমরা একটি সুন্দর একটানা মসৃণ frequency polygon পাব। এই সূত্র অনুযায়ী উপরোক্ত ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনকে মসৃণ করে একটি smoothed frequency polygon এখানে দেখান হল।

Histogram বা column diagram বা স্তম্ভচিত্র

একই ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যন পলিগনের সাহায্যে না করে হিষ্টোগ্রামের সাহায্যে এঁকে দেখান যায়। পলিগনে আমরা প্রতি শ্রেণীব্যবধানের

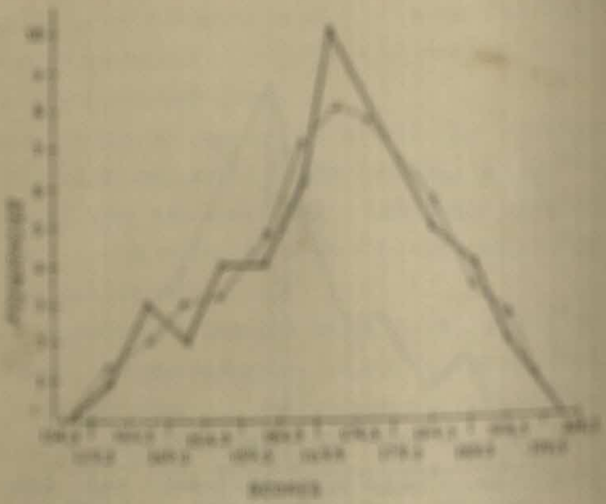

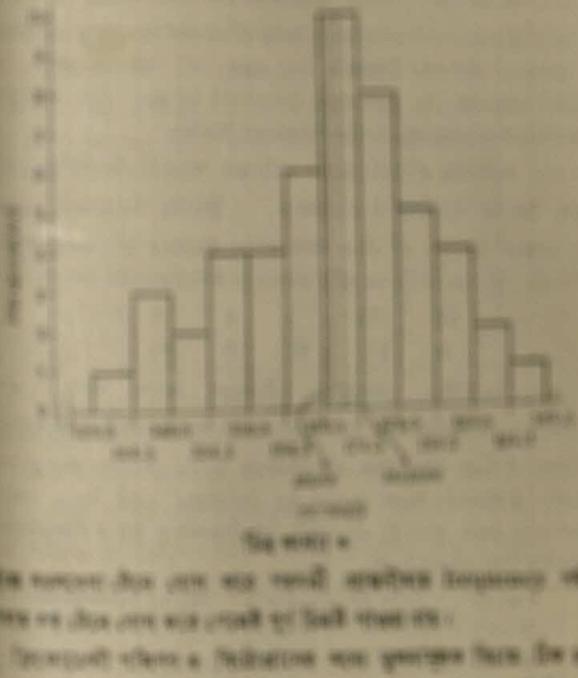

গোলের হিসাব, (f) গাড়ীতে চলা রাস্তার দৈর্ঘ্য, (g) ওজন, (h) ১০০ খানা বই-এর পৃষ্ঠা। [State which of the following variables fall in continuous and which into discrete series ; (a) time (b) sizes of School Classes (c) age (d) census data (e) football scores (f) distance travelled by car (g) weight (h) number of pages in one hundred books.

(২) অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের দুইটি অর্থ অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্কোর সমূহের উচ্চ ও নিম্নপ্রান্ত সীমা দেখাও। [Write the exact upper and lower limits of the following scores in accordance with the two definitions of a score in continuous series :—

62	174	1	4	5
8	311	85	0	39

(৩) নিম্নলিখিত স্কোরগুলির Range দেওয়া আছে। একটি frequency distribution তৈরী করতে হলে তাদের একটি শ্রেণীব্যবধানে সাজাবে ? [Let the Set of Scores have the ranges given below. Indicate how large an interval and how many intervals you would suggest in drawing up a frequency distribution of each set.]

Range	Size of interval	No. of intervals
16 – 87		
0 – 46		
110 – 212		
63 – 151		
4 – 12		

(৪) নিম্নলিখিত শ্রেণীব্যবধানগুলির নিম্নপ্রান্ত সীমা ও উচ্চপ্রান্ত সীমা দেখাও (অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী)। শ্রেণীব্যবধানগুলির মধ্যবিন্দু নির্দিষ্ট কর। [In each of the following write (a) the exact lower and upper limits (b) in accordance with the first definition of a score in a continuous series and (c) the midpoint of each interval.)

45 – 17	162·5 – 167·5	63 – 67	0 – 9
1 – 4	80 – 90	16 – 17	25 – 28

(৫) নিম্নলিখিত 25টি স্কোরের দুটি frequency distribution দেখাও, প্রথমটিতে শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব হবে তিন, এবং দ্বিতীয়টিতে শ্রেণী-ব্যবধানের দূরত্ব (Size of class interval) হবে পাঁচ। প্রথম শ্রেণীটি শুরু হবে 60 থেকে। [Tabulate the following 25 scores into 2 frequency distributions using (1) an interval of 3, and (2) an interval of 5 units Let the first interval start with the score 60.]

72	75	77	67	72
81	78	65	86	73
67	82	76	76	70
83	71	63	72	72
61	67	84	69	64.

(৬) Take 100 leaves of one particular tree. Measure their length in centimetre and represent the result in a frequency polygon.

(৭) একটি অভীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া গেল। Classinterval এর দূরত্বকে 5 ধরে একটি frequency distribution তৈরী কর। প্রথম বার, প্রথম, ও নিম্নতম শ্রেণীটি শুরু কর 35 স্কোরটি নিয়ে। প্রত্যেক শ্রেণী-ব্যবধানের ঠিক ঠিক প্রান্তসীমাগুলি ও মধ্যবিন্দু দেখাও। দ্বিতীয় distribution টি তৈরী কর 33 স্কোরকে নিয়ে শ্রেণীব্যবধান শুরু করে। উভয় distribution তুলনা কর, এবং প্রত্যেকটির গুণাবলী বিচার কর।

59	48	53	47	57	64	62	62	65	57	57	81	83
48	65	76	53	61	60	37	51	51	63	81	60	77
71	57	82	66	54	47	61	76	50	57	58	52	57
40	53	66	71	61	61	55	73	50	70	59	50	59
69	67	66	47	56	60	43	54	47	81	76	69	

(৮) Given the following list of scores, set up a frequency distribution making the wisest choice of class interval and class limits.

43	62	52	48	46	65	43	48	52	51	57	48	48
38	42	44	46	43	35	42	45	45	44	46	40	40
47	52	38	51	45	38	51	40	46	45	54	55	41
50	59	42	39	56	44	43	47	51	43	50	34	40
53	42	31	44	51	43	48	41	43	48	41	35	

(৯) Plot a frequency polygon and histogram for data given below. Distributions of an aptitude test scores for two courses :

Scores	f for group 1	f for group 2
90–94	4	2
85–89	10	0
80–84	14	0
75–79	19	0
70–74	32	2
65–69	31	4
60–64	40	5
55–59	28	12
50–54	29	13
45–49	21	21
40–44	18	21
35–39	10	19
30–34	6	20
25–29	1	14
20–24	3	1
	266	134

(১০) Tabulate the following 100 Scores on an Intelligence test into three frequency distributions, using class intervals of 3, 5 and 10 units. Let the first interval begin with the score 45.

63	78	76	58	95
78	86	80	96	94
46	78	92	86	88
82	101	102	70	50
74	65	73	72	91
103	90	87	74	83
78	75	70	84	98
86	73	85	99	93
103	90	79	81	83
87	86	93	89	76
73	86	82	71	94

95	84	90	73	75
82	86	88	63	56
89	76	81	105	73
78	75	85	74	95
92	83	72	98	110
85	103	81	78	98
80	86	96	78	71
81	84	81	83	62
90	85	85	96	72

(১১) পাঁচ নম্বর প্রশ্নে 25 স্কোরে দেওয়া আছে, তার সাহায্যে 5 এবং 3 কে class interval-এর দূরত্ব ধরে দুটি frequency polygon আঁক। উভয় ডিষ্ট্রিবিউশনকে Smooth কর—এবং একই অক্ষরেখার উপর Smoothed frequencies এবং Original স্কোর এর ডিষ্ট্রিবিউশন দেখাও।

(১২) দশ নং প্রশ্নে দেওয়া 100 স্কোরের একটি frequency polygon আঁক, 10 স্কোর এককের ইণ্টারভ্যাল ব্যবহার করে। একটি হিষ্টোগ্রাম এঁকে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের উপর উপস্থাপিত কর।

(১৩) অনেক সংখ্যায় এক বয়সী ছেলে ও মেয়ের উচ্চতা এবং ওজনের মাপ নিয়ে আলাদা আলাদা frequency distribution তৈরী কর ও frequency polygon আঁক, ও মসৃণ কর।

Measures of Central tendency

মাঝারী ঝোকের মাপ

মাঝারী ঝোঁকের মাপ থেকে আমরা গোটা দলটির প্রকৃতি বুঝতে পারি। তারা মোটামুটি ভাল কি মন্দ। এখানে অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমকে বাদ দিয়ে ঐ গড় বা কেন্দ্রীয় প্রবণতাই সমস্ত দলটির প্রতিনিধিত্ব করে। এ ভাবে দুই বা ততোধিক দলের একটা তুলনামূলক বিচার ঐ মাঝারী বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে করা চলে। সাধারণতঃ এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপ তিন ভাবে নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে—(১) Arithmetic mean বা গড় (২) Median এবং (৩) Mode বা সর্ব্বোচ্চ শীর্ষ।

(১) **Arithmetic Mean**—অবিন্যস্ত অবস্থার কতগুলি সংখ্যা বা স্কোরের মীন বার করার পদ্ধতি হল, ঐ স্কোরগুলি সব যোগ করে যতগুলি

স্কোর ছিল তার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। যেমন একটি টিউটোরিয়াল ক্লাশে দশজন ছাত্রের পরীক্ষার ফল হল 13, 17, 15, 11, 13, 11, 17, 13, 11, এবং 11, নম্বরগুলির যোগফল হল 132, ছাত্র সংখ্যা 10, সুতরাং মীন বা গড়= 132÷10=13·2।

এভাবে arithmetic mean এর ফরমূলা বা সূত্র হল

$$M=\frac{\Sigma x}{N}$$

এখানে N মানে নম্বর বা স্কোরের মোট সংখ্যা, x মানে নম্বর বা স্কোর, Σ চিহ্ন মানে যোগফল, অর্থাৎ মীন বার করতে হলে সমস্ত নম্বরগুলি যোগ করে (Σx) সেই যোগফলকে নম্বরের মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই সূত্রটি খাটবে যখন স্কোরগুলি এলোমেলো বা অবিন্যস্ত থাকে।

২। একটি ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনে স্কোরগুলি যখন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সাজান থাকে, সেই বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের Arithmetic mean বার করার ফরমূলা হবে নিম্নরূপ।

$$M=\frac{\Sigma fx}{N},$$

এখানে Σ মানে যোগফল, f মানে ফ্রিকোয়েন্সী, x মানে প্রত্যেক শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্যবিন্দু, Σfx মানে প্রতি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে তার frequency দিয়ে গুণ করে মোট যোগফল, N মানে স্কোরের মোট সংখ্যা।

৬৭৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনটির তালিকা সংখ্যা ৩ সাহায্যে আমরা এখানে Mean এবং Median, Mode—এই তিনপ্রকার কেন্দ্রীয় প্রবণতাই বার করার পদ্ধতি দেখাচ্ছি।

৩ নং উদাহরণ

শ্রেণীব্যবধান (class interval)	মধ্যবিন্দু (midpoint)	f		fx
195—199	197	1		197
190—195	192	2		384
185—189	187	4		748
180—184	182	5	↓	910
175—179	177	8	20	1416
170—174	172	10		1720

165–169	167	6 ২০	1002
160–164	162	4	648
155–159	157	4	628
150–154	152	2	304
145–149	147	3	441
149–144	142	1	142
		N = 50	8542
		$\frac{N}{2} = 25$	

তালিকা সংখ্যা—৪

মীন :—প্রথমত :—স্কোরগুলি শ্রেণীব্যবধানে সাজিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশ্যন ঠিক করে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত : প্রতি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে তার ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে fx সারিটি বার করে নিতে হবে ; ও যোগ করতে হবে। এখানে Σfx হল 8542 ; তৃতীয় ধাপ Σfx কে ফ্রিকোয়েন্সীর মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে Mean পাওয়া গেল।

$$\text{এখানে} \quad \text{Mean} = \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{8542}{50} = 170{\cdot}80$$

মিডিয়ান :—প্রথমে অবিন্যস্ত (ungrouped) স্কোরসমূহের মিডিয়ান বার করা যাক্। স্কোরগুলি ছোট থেকে বড় এই হিসাবে সাজিয়ে নিলে এই সারির ঠিক মাঝখানটা হল মিডিয়ান। যেমন সাতটি নম্বর যদি এভাবে সাজাই, 1 6 6 (8) 9 11 12, তাহলে মিডিয়ান হবে 8 ; আবার যদি আটটি নম্বর সাজাই, যেমন—4 6 6 8 (8·5) 9 11 12 14, তাহলে মিডিয়ান হবে 8·5।

ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউস্যনে বিন্যস্ত স্কোরসমূহ থেকে মিডিয়ান বার করার ফরমূলা নিম্নরূপ :—

$$\text{Mdn} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \right) i, \text{ যেখানে}$$

l = যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ান আছে তার নিম্নপ্রান্তসীমা, (৬৭৪ পৃষ্ঠার উদাহরণে 169·5)

$\frac{N}{2}$ = মোট স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সীর অর্দ্ধেক (এখানে 25)

F = 1 এর নীচে যত শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের স্কোরের মোট সংখ্যা (এখানে 20)

fm = যে শ্রেণীব্যবধানে Mdn আছে, সেই শ্রেণীর স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সীর সংখ্যা (এখানে 10)

i = শ্রেণীগুলির মধ্যবর্তী দূরত্ব (size of class interval এখানে 5)

এই ফরমুলা অনুযায়ী ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত frequency distribution থেকে মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি—

প্রথম ধাপ :—মোট ফ্রিকোয়েন্সীর 50% বা অর্দ্ধেক

$\left(\frac{N}{2}\right)$ বার কর, এখানে $\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$;

মিডিয়ান হচ্ছে, তাহলে, সেই মধ্যবিন্দুটি যার উভয় প্রান্তে frequency এর সংখ্যা হবে 25 ; নীচ থেকে frequency গুলি ক্রমান্বয়ে যোগ করে দেখি 144—149 ব্যাবধান থেকে 165—169 পর্যন্ত শ্রেণীব্যবধানে ঠিক 20 frequency আছে। পরবর্ত্তী শ্রেণীতে অর্থাৎ 170—174 শ্রেণীতে মোট frequency হচ্ছে 10 ; এই দশ থেকে পাঁচটি ফ্রিকোয়েন্সী কুড়ির সঙ্গে যোগ দিলেই প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সী, যথা 25 পাই।

দ্বিতীয় ধাপ :—পঁচিশটি frequency পেতে হলে $\frac{5}{10} \times 5$ (শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব) = 2·5 কে 170—174 এই শ্রেণীর নিম্নপ্রান্তসীমা 169·5 এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। তাহলে Mdn আছে $169{\cdot}5 + 2{\cdot}5 = 172{\cdot}00$ এই বিন্দুতে।

(এখানে মনে রাখা দরকার মীন বা মিডিয়ান কোন স্কোর নহে, এই মাঝামাঝিপ্রবণতা নির্ণয়ক একটি বিন্দু মাত্র।)

উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী :—

$$Mdn = l + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm}\right) i = 169{\cdot}5 + \frac{\frac{50}{2} - 20}{10} \times 5 =$$

$$169{\cdot}5 + \frac{5}{10} \times 5 = 172{\cdot}00$$

মোড (Mode) :—অবিন্যস্ত সারিতে "crude" বা "empirical" মোড হচ্ছে সেই স্কোরটি যেটি বারে বারে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। যেমন, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, এই সারিতে 13 স্কোরটি বারে বারে এসেছে, সুতরাং 13 হচ্ছে এখানে "crude" Mode। স্কোরগুলি যখন শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে, তখন যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী সর্বাধিক, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে 'crude' মোড বলে ধরা হয়। ৩ নং উদাহরণ তালিকা সংখ্যা ৪ এ crude mode আছে 170—174 এই শ্রেণীব্যবধানে, এবং মোড হচ্ছে এর মধ্যবিন্দু 172·00। True মোড এবং Crude মোডের পার্থক্য এই যে true মোড বলতে যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনের সর্বোচ্চ শিখরটিকে বোঝায়। এই হিসাবে crude মোড প্রায়ই true মোডের কাছাকাছি আসে। যখন ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশানটি normal curve এর রূপ ধারণ করে তখন true মোড বার করার সূত্র হচ্ছে mode = 3 mdn − 2 Mean তিন নং উদাহরণ এই সূত্র অনুযায়ী mode = 174·40।

মীন বার করার একটি সহজ উপায় :—

উপরের সূত্র অনুযায়ী মীন বার করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, সেজন্য একটি সহজ উপায় বা short method আছে। এতে পরিশ্রম অনেক কম। এই পদ্ধতিতে মাঝামাঝি স্থানে আন্দাজে একটি গড় ধরে নেওয়া হয়, এবং পরে অংক করে এই ধারণার ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়া হয়।

যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে Assumed mean (আন্দাজী গড়) ধরে নেওয়া যাক, যদিও এই আন্দাজের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। ৬৭৪ পৃষ্ঠায় ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনের উদাহরণ অবলম্বনে সহজ উপায়ে মীন বার করা গেল।

৪ নং উদাহরণ

শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x′	fx′
195—199	197	1	5	5
190—194	192	2	4	8
185—189	187	4	3	12
180—184	182	5	2	10
175—179	177	8	1	8
				+43

170—174	172	10	0	
165—169	167	6	—1	—6
160—164	162	4	—2	—8
155—159	157	4	—3	—12
150—154	152	2	—4	—8
145—149	147	3	—5	—15
140—144	142	1	—6	—6
				—55

তালিকা সংখ্যা—৫

এখানে 172 হচ্ছে Assumed Mean, কারণ 170—174 এই শ্রেণীর frequency সবচেয়ে বেশী, এবং এই শ্রেণীব্যবধানটি সমগ্র distribution এর কেন্দ্রস্থলেও বটে। সুতরাং Mean = Assumed Mean + i.

এই সূত্র অনুযায়ী :—

AM = 172·00 ;

c (correction বা শুদ্ধি) $= \frac{+43-55}{50} = -\frac{12}{15} = -\cdot240$;

i (শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব) = 5 ,

ci = $-\cdot240 \times 5 = -1\cdot20$;

Mean = AM + ci = 172·00 + (− 1·20) = 170·80

x′ সারি বার করার পদ্ধতি :—Assumed Mean যে শ্রেণীব্যবধানে পড়েছে সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে অপর শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর দূরত্বগুলি (diviations) এক unit বা এককের মানদণ্ডে লিখে যাওয়া। এখানে Assumed Mean হ'ল 172, এটি আবার 170—174 এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু, সুতরাং 172 − 172 = 0, অর্থাৎ A. M. থেকে এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে শূন্য। ওপরের দিকে প্রতি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর দূরত্ব এক করে বেড়ে চলেছে, ও নীচের দিকে দূরত্ব এক করে কমেছে, এই উর্দ্ধগতির দূরত্বকে positive এবং নিম্নগতির দূরত্বকে negative চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

fx′ সারি :—এই সারিতে প্রতি ফ্রিকোয়েন্সীকে প্রতি x′ দিয়ে গুণ করে লিখতে হবে। তাদের যোগফল হচ্ছে —12। তাহলে correction হচ্ছে

$$\frac{fx'}{N} = -\cdot240 ।$$

এই Short method অনুযায়ী মীন বার করা অল্প আয়াসসাধ্য।

২ নং অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যনগুলির mean, median এবং mode হিসাব কর।

(a)

Scores	f
52—53	1
50—5u	0
48—49	5
46—47	10
44—45	9
42—43	14
40—41	7
38—39	8
36—37	6
34—35	5
32—33	3
	68

(b)

Scores	f
95—99	6
90—94	11
85—89	16
80—84	7
75—79	9
70—74	8
65—69	2
60—64	3
55—59	2
50—54	1
	65

(c)

Scores	f
84—86	2
81—83	3
78=80	1
75—77	4
72—74	5
69—71	3
66—68	3
63—65	3
60—62	1
	25

(d)

Scores	f
85—89	1
80—84	4
75—79	5
70—74	7
65—69	5
60—64	3
	25

গড়বিচ্যুতি

(Measures of deviations from the central tendency)

পূর্বে আমরা একটি দলের গড় (Average) বার করতে শিখেছি। এখন গড় থেকে সেই দলের ব্যক্তিবিশেষের নম্বরের তারতম্য হতে পারে। যেমন

কোন এক ক্লাশে ত্রিশজন ছাত্রী আছে, তাদের গড় বয়স তের, কিন্তু এদের মধ্যে কারো বয়স এগারো, কারো দশ, কারো বা চৌদ্দ। এভাবে গড় বয়স থেকে প্রায় প্রত্যেকটি মেয়ের বয়সই হয়ত বা কিছু কম বেশী হতে পারে। গড় থেকে এই যে ব্যতিক্রম, একে মাপ করার বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে Range, Average deviation, Standard deviation ও Quartile deviation প্রধান।

(ক) **Range**:—Range সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। Range বা বিস্তৃতি হচ্ছে স্কোরগুলি কতদূর ছড়িয়ে আছে, তার মাপ। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, Range হল সবচেয়ে বড় স্কোর ও সবচেয়ে ছোট স্কোরটির মধ্যবর্তী পার্থক্য। এই Range এর সাহায্যে দুটো দল কি ভাবে ছড়িয়ে আছে, তার একটা মোটামুটি তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি দলের সংখ্যা (N) এবং মীন (Mean) সম্পূর্ণ এক হলেও অনেক সময় বিস্তৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যেতে পারে। নীচে একটি লেখ-চিত্র দেওয়া গেল।

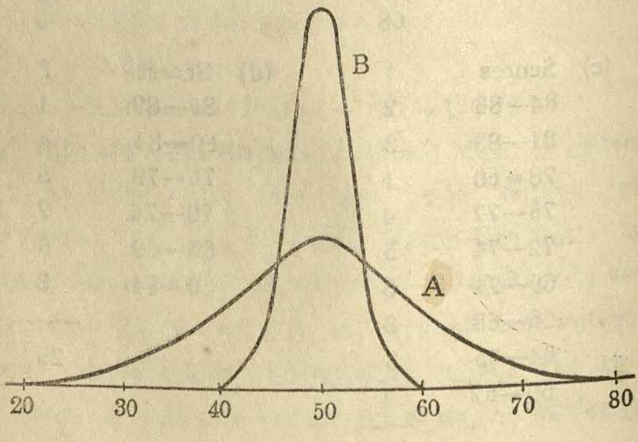

চিত্র সংখ্যা ৩ (ক)

এখানে গ্রুপ 'A' এর Range হচ্ছে 20—80, এবং গ্রুপ 'B' এর Range হচ্ছে 40—60, মোট সংখ্যা (N) এবং মীন (50) সমান। গ্রুপ 'A' অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে, অর্থাৎ তুলনায় এই দলের Variability অন্য দল (গ্রুপ B) থেকে অনেক বেশী।

তবে N যখন খুব অল্প হয়, অথবা শ্রেণীব্যবধানগুলিতে কোন Score থাকে না, অর্থাৎ distribution এর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, তখন Range কে Variability এর প্রকৃষ্ট মাপ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

(খ) **Average বা Mean Deviation from ungrouped data :—**

স্কোরগুলি যখন সাজান থাকে না, তখন তাদের গড়বিচ্যুতি বার করবার সাধারণ পদ্ধতি :—

১ম ধাপ :—মীন থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের ব্যতিক্রম বার করা। এই ব্যতিক্রম বার করবার সময় মনে রাখতে হবে যে স্কোর থেকেই গড়কে বিয়োগ দিতে হবে, অর্থাৎ x (deviation) = X (Score or midpoint) − M (mean)।

২য় ধাপ :—এই বিয়োগফলগুলির plus ও minus চিহ্ন অগ্রাহ্য করে মোট যোগফল বার করতে হবে।

৩য় ধাপ :—এই যোগফলকে N বা মোট স্কোরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই Average বা Mean Deviation বার হবে।

৩ নং উদাহরণ :—5 টি স্কোর দেওয়া আছে ; 6, 8, 10, 12 এবং 14 ; এদের মীন হচ্ছে 10 ; মীন থেকে প্রতি সংখ্যার ব্যতিক্রম :

$6-10=-4$; $8-10=-2$; $10-10=0$; $12-10=2$ এবং $14-10=4$, সুতরাং ব্যতিক্রমগুলি হল : −4, −2, 0, 2 এবং 4 ; plus এবং minus চিহ্ন অগ্রাহ্য পূর্বক এদের যোগফল হল 12। Mean Deviation $=12\div N$ বা $5=2{\cdot}4$।

তাহলে ungrouped স্কোরের Mean deviation এর সূত্র এভাবে লেখা যায় :—

$$MD=\frac{|\Sigma x|}{N},$$

যেখানে $|\Sigma x|$ হ'ল গড় থেকে ব্যতিক্রমগুলির যোগফল ; Σx এর বাইরের || চিহ্ন দুটির অর্থ এই যে plus এবং minus চিহ্নকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। উপরের উদাহরণে

$$MD=\frac{|\Sigma x|}{N}=\frac{12}{5}=2{\cdot}4 \text{।}$$

(খ) Calculation of MD from data grouped in class-intervals.

৬১৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া পঞ্চাশ জন ছাত্রের স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশন থেকে মীন বিচ্যুতি বার করা যাক। স্কোরগুলি যখন শ্রেণীতে দলে দলে সাজান থাকে, তখন মীন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি বার করা সম্ভব নয়, অতএব এখানে প্রথম ধাপ হ'ল—প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে গড়ের দূরত্ব বা ব্যতিক্রম বার করা।

উদাহরণে x সারি দেখ। এখানে মীন হল 170·80 (পৃষ্ঠা ১৬, উদাহরণ ১, তালিকা সংখ্যা—৪) সুতরাং midpoint—mean এই হিসাবে x সারি বার করা হয়েছে, যেমন (197 – 170·80 = 26·20)

২য় ধাপ :—অতঃপর ব্যতিক্রমগুলিকে প্রতি শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ (weighted) করতে হবে। উদাহরণে fx সারি দেখ।

৩য় ধাপ :—এই fx সারির যোগফল বার করতে হবে। যোগ বিয়োগ চিহ্ন অগ্রাহ্য করে। যোগফল হ'ল 502·00।

৪র্থ ধাপ :—ঐ যোগফলকে N বা 50 দিয়ে ভাগ কর, এবং ঐ ভাগফলই হল Mean Deviation ; এখানে M. D. হচ্ছে 10·04।

৫ নং উদাহরণ

১	২	৩	৪	৫
শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x	fx
195—199	197	1	26·20	26·20
190—194	192	2	21·20	42·40
185—189	187	4	16·20	64·80
180—184	182	5	11·20	56·00
175—179	177	8	6·20	49·60
170—174	172	10	1·20	12·00
165—169	167	6	—3·80	—22·80
160—164	162	4	—8·80	—35·80
155—159	157	4	—13·80	—55·20
150—154	152	2	—18·80	—37·60
145—149	147	8	—23·80	—71·40
140—144	142	1	—28·80	—28·80
যোগফল		N = 50		502·00 1∑fx1

তালিকা সংখ্যা—৬

• মীনবিচ্যুতি বার করার সূত্র, যখন স্কোরগুলি শ্রেণীতে সাজান থাকে :

$$MD = \frac{|\sum fx|}{N}$$

বর্তমান উদাহরণে,

$$MD = \frac{520 \cdot 00}{50} = 10 \cdot 04$$

Standard Deviation :

পরিসংখ্যান তত্ত্বে সাধারণতঃ Mean Deviation অপেক্ষা Standard Deviation এর ব্যবহারই বহুল প্রচলিত। এটিও M. D. এর মত একটি দলের গড় থেকে ব্যতিক্রমেরই এক প্রকার গড়। Standard Deviation নামটি অধিকাংশ সময়ে σ (সিগমা) নামক একটি গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়।

(ক) **S. D. from ungrouped data :—**

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে, তখন Standard deviation বার করার সূত্র হল :

$$SD \text{ বা } \sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}},$$

যেখানে x — দলের গড় (arithmetic mean) থেকে ব্যতিক্রম,

N — স্কোরের মোট সংখ্যা।

পদ্ধতি—প্রথম ধাপ :—প্রত্যেকটি স্কোর থেকে মীনের ব্যতিক্রম বার কর (x)।

২য় ধাপ :—প্রত্যেকটি ব্যতিক্রমের বর্গ বার কর (x^2)।

৩য় ধাপ :—ঐ বর্গগুলির যোগফল বার কর ($\sum x^2$)।

৪র্থ ধাপ :—ঐ যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ কর

$$\left(\frac{\sum x^2}{N}\right)।$$

৫ম ধাপ :—ঐ ভাগফলের বর্গমূল বার কর, এবং সেটাই হবে Standard deviation বা σ।

৬ নং উদাহরণ

(১) স্কোর X	(২) ব্যতিক্রম x	(৩) ব্যতিক্রমের বর্গ x^2
6	−4	16
8	−2	4
10	0	0
12	+2	4
14	+4	16
মীন $= \frac{50}{5}$ $= 10{\cdot}0$		$\sum x^2 = 40$ $S.\ D = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}}$ $= \sqrt{\frac{40}{5}}$ or $\sigma = \sqrt{8} = 2{\cdot}83$

তালিকা সংখ্যা—৭

পুনরায় বলা যায়, স্কোরগুলি যখন ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউস্যনে সাজান থাকে না, তখন Standard deviation বার করার সূত্র হচ্ছে

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}}$$

অথবা

$$\sqrt{\frac{\text{যোগফল (স্কোর—মীন) 2}}{N}}$$

(খ) **Standard Deviation from grouped data :—**

অল্পসংখ্যক স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউস্যনে সাজিয়ে নিয়ে কিভাবে SD বার করতে হয়, তার পদ্ধতি উদাহরণ সহযোগে দেখান হ'ল। দশটি স্কোর দেওয়া আছে, যথা 13, 17, 15, 11, 13, 17, 13, 11, 11।

প্রথম ধাপ :—স্কোরগুলি সাজিয়ে নিয়ে frequency বার করে তাদের গড় বা মীন বার কর। (X এবং f সারি দেখ)।

দ্বিতীয় ধাপ :—সাজান স্কোর থেকে গড়ের ব্যতিক্রমগুলি বার কর (x সারি দেখ)।

তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপ :—fx এবং fx^2 সারি বার কর। ($fx \times x = fx^2$)।

পঞ্চম ধাপ :—ঐ গুণের যোগফলকে (Σfx^2) স্কোরের মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ কর।

ষষ্ঠ ধাপ :—ঐ ভাগফলের বর্গমূলই হচ্ছে SD বা σ (সিগমা); এই হিসাবে

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}$$

৭ নং উদাহরণ

X (scores)	x (deviations)	t	fx	fx^2
17	+3·8	2	7·6	28·88
15	+1·8	1	1·8	3·24
13	−0·2	3	−3·6	·12
11	−2·2	4	−8·8	19·36
		N=10		51·60
মীন=13·2 $\sigma = \sqrt{\frac{51\ 60}{10}} = \sqrt{5 \cdot 160}$ $= 2 \cdot 27$				Σfx^2

তালিকা সংখ্যা—৮

(গ) যখন স্কোরের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে, তখন তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন থেকে σ বার করার পদ্ধতি নীচে দেখান হল। ৬৭৪ পৃষ্ঠার ৩ নং তালিকার ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনটি এখানে ব্যবহার করা হ'ল। উপরের উদাহরণ থেকে এই পদ্ধতির তফাৎ এই যে এখানে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু থেকে মীনের বিচ্যুতি বার করে নিতে হবে।

৮ নং উদাহরণ

শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু X	ফ্রিকোয়েন্সী f	বিচ্যুতি x	fx	fx²
195—199	197	1	26·20	26·20	686·44
190—194	192	2	21·20	42·40	898·88
185—189	187	4	16·20	64·80	1049·76
180—184	182	5	11·20	56·00	627·20
175—179	177	8	6·20	49·60	307·52
170—174	172	10	1·20	12·00	14·40
165—169	167	6	−3·80	−22·80	86·64
160—164	162	4	−8·80	−35·20	309·76
155—159	157	4	−13·80	−55·20	761·76
150—154	152	2	−18·80	−37·60	706·88
145—149	147	3	−23·80	−71·40	1699·32
140—144	142	1	−28·80	−28·40	829·44
		N=50		502·00	7978·00

Mean = 170·80

$$\text{Standard Deviation} = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}} = \sqrt{\frac{7978\cdot00}{50}} = 12\cdot63$$

তালিকা সংখ্যা—৯

উপরোক্ত উপায়ে S. D. বার করা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। সহজ উপায়ে মীন বার করার মত S. D. বার করারও একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আছে।

৯ নং উদাহরণ

শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x′	fx′	fx′²
195—199	197	1	5	5	25
190—194	192	2	4	8	32
185—180	187	4	3	12	36
180—184	182	5	2	10	20
175—179	177	8	1	8	8
				+43	
170—174	172	10	0		
165—169	157	6	−1	−6	6
160—164	162	4	−2	−8	16
155—159	157	4	−3	−12	36
150—154	152	2	−4	−8	32
145—149	147	3	−5	−15	75
140—144	142	1	−6	−6	36
			N=50	−55	

এখানে Assumed mean $= 172 \cdot 00$

$$c = \frac{-12}{50} = -\cdot 240,\ ci = -\cdot 240 = -1\cdot 20$$

$\therefore$ Arithmetic mean $= 170 \cdot 80$

[সূত্র—mean = Assumed Mean + correction × class interval]

অতএব Standard Deviation বা

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f x'^2}{N} - c^2} \times i \text{ (interval)}$$

$$= \sqrt{\frac{322}{50} - (-\cdot 240)^2} \times 5$$

$$= \sqrt{\frac{322}{50} - \cdot 0576} \times 5$$

$$= \sqrt{6 \cdot 3826} \times 5 = 2 \cdot 525 \times 5 = 12 \cdot 63^{*}$$

পদ্ধতি :—

প্রথম ধাপ :—Assumed mean থেকে শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী ব্যতিক্রম (x') বার করতে হয়। (চতুর্থ সারি)

দ্বিতীয় ধাপ :—ঐ ব্যতিক্রম বা দূরত্বকে (x') তার frequency দিয়ে গুণ (weighted) করতে হবে। (fx' সারি, যোগফল $= -12$)

তৃতীয় ধাপ :—c বা শুদ্ধি বার করতে হবে, fx' কে N দিয়ে ভাগ করে c পাই $(-\frac{12}{50}) = -\cdot 240$; তারপর c^2 বার করতে হবে।

চতুর্থ ধাপ :—চতুর্থ সারির প্রতি x' কে পঞ্চম সারির প্রতি fx' দিয়ে গুণ করে fx'^2 সারি বার করতে হবে। $\Sigma fx'^2 = 322$

এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সঙ্গে দীর্ঘ পদ্ধতির তফাৎ এই যে এখানে x' সারি বা deviations এর শ্রেণীব্যবধানকে একক গ্রহণ করে বার করা হয়েছে।

---

* "The formula for computing σ from a frequency distribution when deviations are taken from an assumed mean is

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f x'^2}{N} - c^2} \times i \text{ in which } \Sigma fx'^2$$

the sum of the squared deviations in units of class-interval, taken from the assumed mean, and c^2 is the squared correction in units of class interval." সিগমা বার করতে বর্গ ও বর্গমূল হিসাব করতে হবে। এই পরিশ্রম বেঁচে যাবে যদি ছাত্র ছাত্রীরা log table ব্যবহার করে।

The Quartile deviation বা Q :—

যে কোন একটি frequency distribution এ স্কোর সমূহকে চার ভাগে ভাগ করলে আমরা একটি চতুর্থাংশ পাই। এভাবে প্রথম চতুর্থাংশকে বলা হয় 25th শতাংশ (percentile) বা Q_1, এই বিন্দুর নীচে স্কোর সমূহের 25% আছে; দ্বিতীয় চতুর্থাংশ বা Q_2 হল median ; তিন চতুর্থাংশ বা 75th শতাংশ হল Q_3 যার নীচে শতকরা 75 টি স্কোর আছে ; প্রথম চতুর্থাংশ বা Q_1 এবং তিন চতুর্থাংশ বা Q_3 এর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু হল Q বা Quartile deviation।

Q নির্দ্ধারণের পদ্ধতি :—

প্রথম ধাপ :—২ নং তালিকার ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশানকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যাক্। প্রথমেই Q_1 বার করতে হবে। N কে 4 দিয়ে ভাগ কর। কম স্কোরের দিক থেকে সুরু করে $\frac{1}{4}$ of N হল $\frac{50}{4}=12.5$; প্রথম চারটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী যোগ করে পাই 10 স্কোর ; পরবর্ত্তী শ্রেণী, 160—164 এ আছে চারটি স্কোর। দশের সঙ্গে আর 2·5 যোগ করলেই 12·5 হয়, সুতরাং এখানে প্রয়োজন আর 2·5 স্কোরের। সুতরাং যে শ্রেণীতে Q_1 আছে, তার সুরুতে 159·52 এর সঙ্গে 2 5/4 × 5 (শ্রেণী-ব্যবধানের দূরত্ব) যোগ করলে Q_1 কে পাই 162·63 বিন্দুতে।

দ্বিতীয় ধাপ :—Q_3 হিসাব করা। N এর $\frac{3}{4}$ হল 37·5 ; 140—144 থেকে 170—174 শ্রেণী ব্যবধানে frequency আছে 30। পরবর্ত্তী শ্রেণী-ব্যবধানে, 175—179, আছে 8টি স্কোর ; 37·5 পেতে হলে 174·50 এর সঙ্গে 7·5|8 × 5 যোগ করতে হবে। তাহলে Q_3 আছে 179·19 এ।

তৃতীয় ধাপ :—Q_1 এবং Q_3 বার করে Q বা Quartile deviation বার করতে হবে। সূত্রটী হচ্ছে $Q=\frac{Q_3-Q_1}{2}$; বর্ত্তমান উদাহরণে

$$Q=\frac{179{\cdot}19-162{\cdot}63}{2}=8{\cdot}28$$

বিভিন্ন বিচ্যুতির মাপ ব্যবহার করা সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম :—।

১। Range ব্যবহার করা হয় যখন স্কোরের সংখ্যা খুবই কম থাকে, এবং স্কোরগুলি কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, শুধু তাই জানবার প্রয়োজন হয়, এবং অন্য কোন উন্নত ধরণের মাপ জানবার প্রয়োজন থাকে না।

২। Q ব্যবহার করা ভাল যখন খুব তাড়াতাড়ি বিচ্যুতির মাপ লক্ষ্য করার প্রয়োজন পড়ে, যখন স্কোরগুলি অত্যন্ত ছড়ান অবস্থায় থাকে (when there are scattered or extreme measures) এবং যখন মিডিয়ানের কাছাকাছি স্কোরের অবস্থান জানবার প্রয়োজন পড়ে।

৩। MD ব্যবহার করা ভাল, যখন প্রত্যেকটি বিচ্যুতির মাপ জানার দরকার পড়ে, যখন বিচ্যুতির মাত্রা অত্যন্ত বেশী বা কম এই উভয় প্রকার Score-ই থাকে, এবং বিচ্যুতির গড়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে (when extreme deviations should influence the measure of variability, but not influence it unduly)

৪। SD ব্যবহার করা হয় যখন বিচ্যুতির মাপ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে, যেমন যখন co-efficient of correlation (সহপরিবর্তন) এবং নির্ভরশীলতার (Reliability) মাপের প্রয়োজন পড়ে।

৩ নং অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত স্কোরগুলির Average বা Mean deviation বার কর :—

22, 24, 20, 23, 21, 19, 23, 22, 20, 22, 20, 22, 23, 25, 21, 21, 22, 24, 23, 22, 23, 21, 22, 21, 23, (Mean = 21·96)

২। ২৫ জন ছাত্রের ইংরাজী, ইতিহাস ও বাংলা পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হল। এদের Mean Deviation ও Standard Deviation বার কর।

ছাত্র	ইংরাজী	ইতিহাস	বাংলা
1	41	31	29
2	49	13	35
3	41	20	25
4	35	31	40
5	35	30	28
6	55	45	49
7	50	38	40

ছাত্র	ইংরাজী	ইতিহাস	বাংলা
8	38	42	26
9	49	30	39
10	46	30	58
11	28	30	38
12	64	46	18
13	48	36	41
14	31	2	35
15	45	41	38
16	49	44	33
17	66	18	36
18	46	26	21
19	21	44	27
20	27	30	50
21	50	19	39
22	49	5	27
23	26	44	40
24	39	15	45
25	52	9	25

৩। 52, 50, 56, 68, 65, 62, 57, 70—এই স্কোরগুলির Mean deviation ও Standard deviation সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বার কর।

The Normal Probability or Gaussian Curve

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

নানা পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী (traits) আছে, তা' প্রায় কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। তাই বহুসংখ্যক ব্যক্তির (large sample) উপর কোন অভীক্ষা গ্রহণ করলে, এবং তাদের বয়স, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ একই ধরণের হলে, ফলাফল একটি normal distribution এর আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই মাঝারী দলে পড়বে। অল্পসংখ্যক বেশী বুদ্ধিমানের দলে, (যদি বুদ্ধি অভীক্ষার ফল হয়) এবং বাকী অল্পসংখ্যক কমবুদ্ধির দলে পড়বে। এই ধরণের ডিষ্ট্রিবিউশনের রেখাচিত্র আঁকলে সেটি ঘণ্টার আকার ধারণ করবে।

মাঝখানটা উঁচু, ও দু'পাশ ক্রমে নীচু হয়ে অক্ষরেখার নিকটবর্তী হবে। সাধারণভাবে, মনোবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ও শিক্ষাতত্ত্বে যে সব ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই ঘণ্টাকৃতি (bell shaped) বা স্বাভাবিক (normal) কার্ভের আকার ধারণ করে বলেই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সবিশেষ জানা প্রয়োজন। Normal probability curve এর একটি লেখচিত্র নীচে দেওয়া গেল।

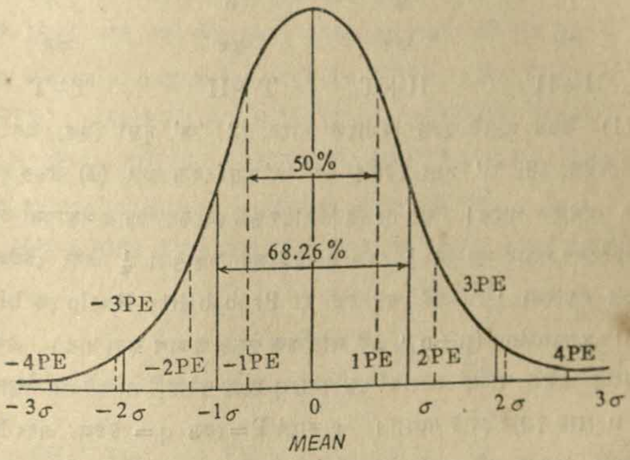

চিত্রসংখ্যা—৪

এই কার্ভের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে হলে probability (সম্ভাবনা) বা laws of chance এর প্রাথমিক নীতিগুলি বোঝা দরকার।

Normal curve বা Gaussian curveকে normal probability curve বলা হয়, কারণ নর্ম্যাল ডিষ্ট্রিবিউশনের সঙ্গে probability বা laws of chance এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিদ্যমান, এবং এই সম্বন্ধকে অংকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। একটি মুদ্রা যদি টস্‌ করা যায়, তবে হয় তার হেড নয় টেইল্‌ উপরের দিকে পড়বে, এবং পড়ার সম্ভাবনা উভয়েরই সমান। এখানে মনে রাখবে হবে যে হেড বলতে মুদ্রার ছবির দিকটি মনে করা হয়, তা সে রাজার মাথাই হোক কি অশোকচক্রই হোক, আর টেইল বলতে সংখ্যার দিকটা বোঝায়। এই 'পড়ার' বা ঘটনার সম্ভাবনাকে বলে Probability

ratio ; এই ratio দুটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ, ·00 বা একবারও না ঘটবার সম্ভাবনা, এবং 1·00 বা প্রত্যেকবারই ঘটবার সম্ভাবনা। এভাবে মুদ্রাটি একশবার টস্ করলে একশবারই সেটি মাটিতে পড়বে, এবং হয় হেড নয় টেইল উপরে পড়বে, এবং উভয় সম্ভাবনাই সমান। Ratio বা অনুপাতের হিসাবে হেডের পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ এবং টেইল পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$, এবং উভয়ে মিলে পূর্ণ ঘটনা হল, $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1{\cdot}00$। একই সঙ্গে দুটি মুদ্রা 'ক' এবং 'খ' টস্ করলে চার-ভাবে মুদ্রাগুলি মাটিতে পড়তে পারে। সম্ভাবনাগুলি এই প্রকার :—

1	2	3	4
কখ	কখ	কখ	কখ
H+H	H+T	T+H	T+T

(1) উভয় মুদ্রাই হেড দেখাতে পারে, (2) 'ক' মুদ্রা হেড, এবং 'খ' মুদ্রা টেইল, (3) 'ক' মুদ্রা টেইল এবং 'খ' মুদ্রা হেড এবং (4) উভয় মুদ্রাই টেইল দেখাতে পারে। অনুপাতের হিসাবে দুটি হেডের পড়ার সম্ভাবনা হল $\frac{1}{4}$ দুটি টেইলের পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$, হেড ও টেইলের সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$ এবং টেইল ও হেডের সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$। এই অনুপাত বা Probability Ratio কে binomial expansion $(p+q)^n$ এই আংকিক সূত্রে প্রকাশ করা যায়। এখানে p হচ্ছে একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা, q হচ্ছে ঘটনাটি না ঘটবার সম্ভাবনা, এবং n হচ্ছে মুদ্রার মোট সংখ্যা। এ ভাবে P = হেড q = টেইল, এবং N = ২ মুদ্রা ; তাহলে দুটি মুদ্রার binomial expansion * হবে $(H+T)^2 = H^2+2HT+T^2$ এই expansion কে নিম্নলিখিত ভাবেও প্রকাশ করা যায় :—

---

* The generalised binomial expansion is :—

$$(p+q)^n = p^n + \frac{n}{1}\, p^{(n-1)}q + \frac{n(n-1)}{1\times 2}\, p^{(n-2)}q^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1\times 2\times 3}\, p^{(n-3)}q^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1\times 2\times 3\times 4} \times p^{(n-4)}q^4 + q^n,$$

in which p and q can have any positive values so long as $p+q=1$.

$1H^2$ = 4 বারের মধ্যে একবার হেড পড়ার সম্ভাবনা এক বা probability ratio = $\frac{1}{4}$

$2HT$ = 4 বারের মধ্যে একবার হেড ও একবার টেইল পড়ার সম্ভাবনা দুই বা probability ratio $\frac{1}{2}$

$1T^2$ = 4 বারের মধ্যে একবার টেইল পড়ার সম্ভাবনা এক বা probability ratio = $\frac{1}{4}$

মোট 4

অনুরূপভাবে আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক্। ধরা যাক্ দশটি মুদ্রা একই সঙ্গে 1024 বার টস্ করা হল। তাহলে $(p+q)^n$ এই সূত্র অনুযায়ী দশটি মুদ্রার binomial expansion হবে $(H+T)^{10}$; $(H+T)^{10} = H^{10} + 10H^9T + 45H^8T^2 + 120H^7T^3 + 210H^6T^4 + 252H^5T^5 + 210H^4T^6 + 120H^3T^7 + 45H^2T^8 + 10HT^9 + T^{10}$ এই expansion এর probability ratio নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়:

H^{10} = 1024 বারের মধ্যে 10H এর পড়ার সম্ভাবনা 1 ব probability ratio $\frac{1}{1024}$

$10H^9T^1$ =	...	9H এবং 1T এর ...	10	$\frac{10}{1024}$
$45H^8T^2$ =	...	8H এবং 2T	45	$\frac{65}{1024}$
$120H^7T^3$ =	...	7H এবং 3T	120	$\frac{120}{1024}$
$210H^6T^4$ =	...	6H এবং 4T	210	$\frac{210}{1024}$
$252H^5T^5$ =	...	5H এবং 5T	252 ...	$\frac{252}{1024}$
$210H^4T^6$ =	...	4H এবং 6T	210	$\frac{210}{1024}$
$120H^3T^7$ =	...	3H এবং 7T	120	$\frac{120}{1024}$
$45H^2T^8$ =	...	2H এবং 8T	45	$\frac{45}{1024}$

$10HT^9$ = … 1H এবং 9T … … 10 …. $\frac{10}{1024}$

T^{10} = … 10T …. … 1 …. $\frac{1}{1024}$

এই probability ratio গুলি হিষ্টোগ্রাম ও frequency polygon এর সাহায্যে প্রকাশ করে নিম্নলিখিত কার্ভটি পাওয়া যায়।

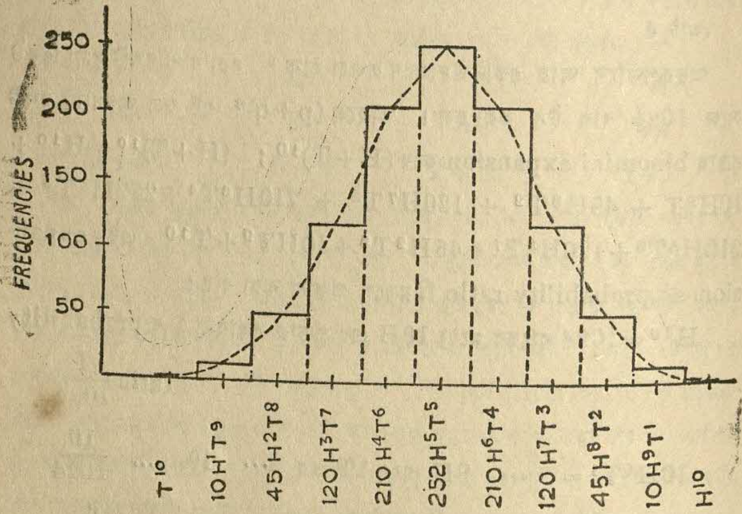

চিত্র সংখ্যা ৫

এখানে মুদ্রার সংখ্যা দশ, সুতরাং 10+1=11টি বাহু যুক্ত হিষ্টোগ্রাম ও পলিগন আঁকা হল, x-অক্ষরেখায় উক্ত এগারটি বাহু, এবং y-অক্ষরেখায় হেড ও টেইলের সম্ভাবনার ফ্রিকোয়েন্সী দেখান হল। কার্ভটি একটি সুসমঞ্জস (Symmetrical) ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের রূপ নিয়েছে। যার মাঝখানে বেশী ভিড়, এবং দুপাশে সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এই হচ্ছে প্রকৃত নর্ম্যাল কার্ভের স্বরূপ, এবং এটি সম্ভব হয় যখনই $(p+q)^2$ এই expansion এ p=q হয়, তা না হলে কার্ভটি একপেশে বা Skewed হবে। এখানে একথা মনে রাখা উচিত হবে যে উপরোক্ত কার্ভটি সম্পূর্ণ theoretical এবং আংকিক সম্ভাবনার উপর রচিত। এ বিষয়ে অনেক প্র্যাক্টিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়েছে। একটি বিখ্যাত পরীক্ষায় একবার বারটী ডাইস্ 4096 বার সত্যি সত্যিই ছুঁড়ে ফেলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, আংকিক সম্ভাবনার সঙ্গে সত্যিকারের

পরিস্থিতিকে তুলনা করা ও যাচাই করা। ডাইসের 4, 5, 6 চিহ্নযুক্ত দিকগুলিকে সাফল্য এবং 1, 2, 3 চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে অসাফল্য হিসাবে ধরা হল। এ হিসাবে ডাইসগুলি যখন 3, 1, 2, 6, 4, 6, 3, 4, 1, 5. 2 এবং 3 এই সংখ্যাগুলি দেখাবে, তখন সাফল্য হবে পাঁচ এবং অসাফল্য হবে সাত। সত্যিকারের ফ্রিকোয়েন্সী ও আংকিক সূত্র $(p+q)^{12}$ অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সী কষে একই অক্ষরেখায় প্লট করে কার্ভগুলি দেখান হল।

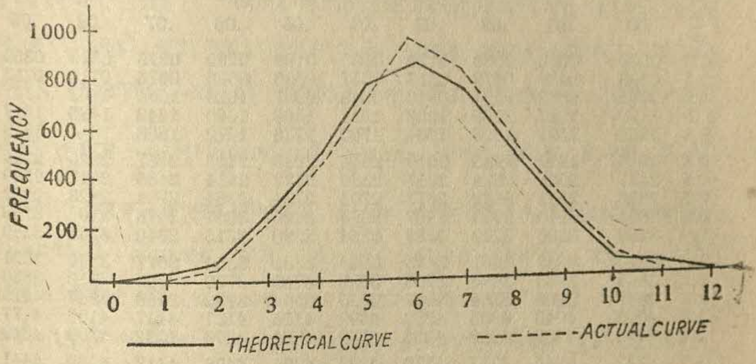

চিত্র সংখ্যা ৬

উভয় রেখার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

নর্ম্যাল কার্ভের ইকোয়েসনের সূত্রটি এইরূপ।

$$y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, c\, \frac{-x^2}{2\sigma^2}$$

যেখানে y = ফ্রিকোয়েন্সী, y-অক্ষরেখায়

x = x-অক্ষরেখায় স্কোর, অর্থাৎ-Mean থেকে বিচ্যুতি অন্য সংখ্যাগুলি সর্বদাই একরূপ বা constant থাকে, যেমন N = ঘটনার সংখ্যা।

σ = সিগমা, অথবা Standard deviation,

π=3·1416 (একটি বৃত্তের পরিধির সঙ্গে তার diameter এর সম্বন্ধ)।

c = 2·718 (base of the Napierian system of logarithms)

π এবং c এর মূল্য বসালে ইকোয়েসনটি এইরূপ দাঁড়ায়,

$$y=\frac{N}{2{\cdot}5066\sigma}\, 2{\cdot}718\ \frac{-x^2}{2\sigma^2};$$

TABLE 17

FRACTIONAL PARTS OF THE TOTAL AREA (TAKEN AS 10,000) UNDER THE NORMAL PROBABILITY CURVE, CORRESPONDING TO DISTANCES ON THE BASELINE BETWEEN THE MEAN AND SUCCESSIVE POINTS LAID OFF FROM THE MEAN IN UNITS OF STANDARD DEVIATION

Example: between the mean and a point 1.38σ $\left(\frac{x}{\sigma} = 1.38\right)$ are found 41.62% of the entire area under the curve.

$\frac{x}{\sigma}$	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0000	0040	0080	0120	0160	0199	0239	0279	0319	0359
0.1	0398	0438	0478	0517	0557	0596	0636	0675	0714	0753
0.2	0793	0832	0871	0910	0948	0987	1026	1064	1103	1141
0.3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
0.4	1554	1591	1628	1664	1700	1736	1772	1808	1844	1879
0.5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	2157	2190	2224
0.6	2257	2291	2324	2357	2389	2422	2454	2486	2517	2549
0.7	2580	2611	2642	2673	2704	2734	2764	2794	2823	2852
0.8	2881	2910	2939	2967	2995	3023	3051	3078	3106	3133
0.9	3159	3186	3212	3238	3264	3290	3315	3340	3365	3389
1.0	3413	3438	3461	3485	3508	3531	3554	3577	3599	3621
1.1	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	3790	3810	3830
1.2	3849	3869	3888	3907	3925	3944	3962	3980	3997	4015
1.3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	4131	4147	4102	4177
1.4	4192	4207	4222	4236	4251	4265	4279	4292	4306	4319
1.5	4332	4345	4357	4370	4383	4394	4406	4418	4429	4441
1.6	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
1.7	4554	4564	4573	4582	4591	4599	4608	4616	4625	4633
1.8	4641	4649	4656	4664	4671	4678	4686	4693	4699	4706
1.9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2.0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	4812	4817
2.1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
2.2	4861	4864	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
2.3	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
2.4	4918	4920	4922	4925	4927	4929	4931	4932	4934	4936
2.5	4938	4940	4941	4943	4945	4946	4948	4949	4951	4952
2.6	4953	4955	4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
2.7	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974
2.8	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
2.9	4981	4982	4982	4983	4984	4984	4985	4985	4986	4986
3.0	4986.5	4986.9	4987.4	4987.8	4988.2	4988.6	4988.9	4989.3	4989.7	4990.0
3.1	4990.3	4990.6	4991.0	4991.3	4991.6	4991.8	4992.1	4992.4	4992.6	4992.9
3.2	4993.129									
3.3	4995.166									
3.4	4996.631									
3.5	4997.674									
3.6	4998.409									
3.7	4998.922									
3.8	4999.277									
3.9	4999.519									
4.0	4999.683									
4.5	4999.966									
5.0	4999 997133									

N এবং σ জানা থাকলে ঐ ইকোয়েসনের সাহায্যে x এর ফ্রিকোয়েন্সী বা y জানা যায়, অর্থাৎ একটি স্কোর কতজন লোকে পেয়েছে, এবং দুটী স্কোরের মধ্যে কত শতাংশ লোক আছে, তাও জানা যায়। এই কার্ভের ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

Area under normal curve.

১০১ পৃষ্ঠায় ৪নং চিত্রে নর্ম্যাল কার্ভের ব্যাপ্তি ও মীন থেকে অন্যান্য বিন্দুর দূরত্ব দেখান হয়েছে। সিগমার হিসাবে এই দূরত্বগুলি মাপ করবার জন্য একটী তালিকা তৈরী করা আছে। তা ১০৬ পাতায় দেওয়া হয়েছে। স্কোরের সংখ্যা দশহাজার নিয়ে এই তালিকাটী তৈরী করা হয়েছে।* এই তালিকার প্রথম লাইনে $\frac{x}{\sigma}$ বা Standard Scores দেখান আছে, x হল X-M বা মীন থেকে স্কোরের বিচ্যুতি, x কে সিগমা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা Standard Scores পাই। ষ্টাণ্ডার্ড স্কোরের হিসাবে সমগ্র ক্ষেত্রটী হিসাব করলে মীন থেকে এক সিগমা করে দূরত্ব মানে সমগ্র স্কোরের এক তৃতীয়াংশ। তালিকাটী অনুযায়ী দশমিকের হিসাবে ইহার মূল্য 0·3413, অর্থাৎ দশ হাজার স্কোর হলে 3413 টি স্কোর ঐ ক্ষেত্রে পড়বে, শতকরা হিসাবে 34·13%, স্কোর পড়বে। তাহলে $+1\sigma$ থেকে -1σ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে ·6826 বা 68·26% স্কোর বা সমগ্র স্কোরের দুই-তৃতীয়াংশ পড়বে। মীন থেকে দুই সিগমা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ -2σ থেকে $+2\sigma$ ক্ষেত্রে ·9544 বা 95·44% স্কোর থাকবে। ঠিক এই ভাবে 1σ এবং 2σ এর মধ্যে আছে ·1359 বা 13·59%, এবং -1σ এবং -2σ এর মধ্যে আছে ·1359 বা 13·59%। সর্বসমেত -2σ থেকে $+2\sigma$ পর্য্যন্ত থাকবে ·9544 বা 95·44% স্কোর। এইভাবে মীন থেকে 3σ পর্য্যন্ত উভয়পার্শ্বে ক্ষেত্রের বিস্তৃতি মানে সমগ্র ক্ষেত্রের (2 × ·4987=).9974 অংশ বা 99·74% স্কোর। এর মানে দশ হাজার স্কোর হলে (10,000—9974=26) মাত্র ছাব্বিশটি স্কোর

---

*Garrett, H. E.—Statistics in Psychology and Education. 3rd Edn Pp. 115. বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই প্রবন্ধের অধিকাংশ চিত্র ও তালিকা গ্যারেটের উক্ত পুস্তকের সাহায্যে করা হইয়াছে, লংম্যান্স ও গ্রীন কোম্পানীর সৌজন্যে।

-3σ থেকে $+3\sigma$ এর সীমার বাইরে পড়বে। এই ভাবে দেখা যায় প্রায় সমস্ত স্কোরই -3σ থেকে $+3\sigma$ এর সীমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এর বাইরে যারা পড়ে তাদের সংখ্যা নগন্য।

স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি:—নর্ম্যাল কার্ভের মীন, মিডিয়ান এবং মোড একই বিন্দুতে পড়ে এবং কার্ভটি সুসমঞ্জস হয়। কিন্তু যদি অধিকাংশ স্কোর কার্ভের কোন একদিকে বেশী ভীড় করে, তাহলে মীন মিডিয়ান ও মোড বিভিন্ন স্থানে পড়বে, এবং কার্ভটি একপেশে বা Skewed হবে। Skewness মাপবার সূত্র হল $SK = \frac{(3\ \text{mean} - \text{median})}{\sigma}$ নর্ম্যাল ডিষ্ট্রিবিউশনে Skewness হবে শূন্য। এই Skewness দু'প্রকার হতে পারে, ধনাত্মক (positive) বা ঋণাত্মক (negative)।

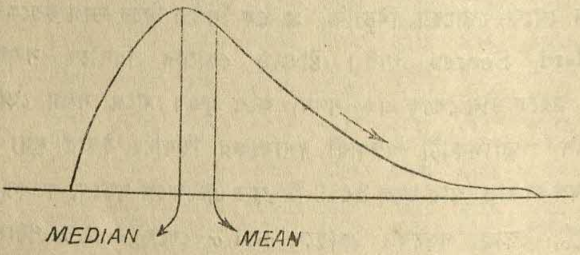

ধনাত্মক বা positively skewed

চিত্র সংখ্যা ৭

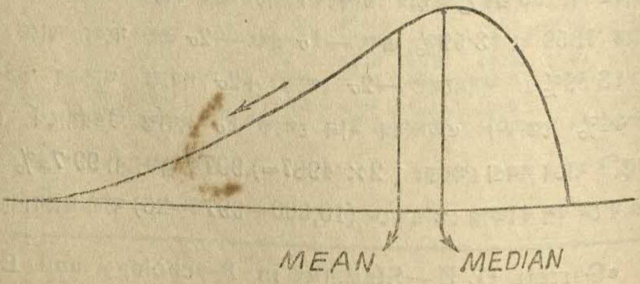

ঋণাত্মক বা negatively skewed

চিত্র সংখ্যা ৮

ঋণাত্মক Skewed কার্ভে অধিকাংশ স্কোর স্কেলের ডানদিকে জড় হয়,

ফলে কার্ভের বাঁ দিক নীচু হয়, এবং ধনাত্মক Skewed curve এ স্কেলের বাঁদিকে স্কোরগুলি সমবেত হয়, এবং কার্ভের ডানদিক নীচু হয়।

Kurtosis.

Kurtosis মানে হল একটি স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যানের সঙ্গে তুলনায় একটি ডিষ্ট্রিবিউস্যান কতটা চ্যাপ্টা (flat) বা উঁচু (peaked) তার একটি মাপ। যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী উঁচু (peaked) হয়, তবে ঐ ডিষ্ট্রিবিউস্যানকে বলা হয় leptokurtic ; এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী নীচু বা চ্যাপ্টা হয়, তাকে বলা হয় platykurtic। নীচে চিত্রটিতে একটি leptokurtic ও একটি platykurtic ডিষ্ট্রিবিউস্যানকে একটি স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যনের সঙ্গে তুলনা করে দেখান হল, এদের mean একই। পার্সেন্টাইলের হিসাবে kurtosis বার করার সূত্র হল

$$k.u = \frac{Q}{(P_{90} - P_{10})}$$

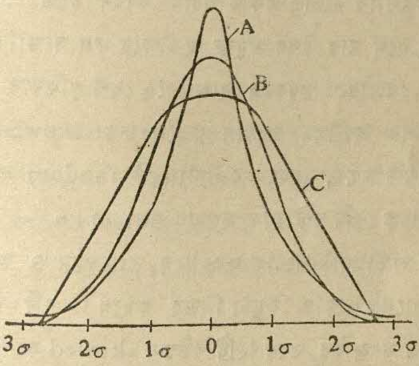

চিত্র সংখ্যা ৯ (ক)

এই সূত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক ডিষ্ট্রিবিউশ্যনে ku হল '263। ku যদি '263 এর বেশী হয়, তবে ডিষ্ট্রিবিউশ্যন হবে platykurtic, এবং কম হলে leptokurtic হবে। ৩নং তালিকার 50 স্কোরের ku হল '237, অর্থাৎ distributionটি একটু leptokurtic এর দিকে।

Significance of skewness :—

যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী কার্ভকে তার উপযুক্ত স্বাভাবিক (best fitting normal curve) লেখ চিত্রের উপর ফেলে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে,

এখন যদি কতিপয় স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনটি নর্মাল কার্ভ থেকে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকে, এ ধরনের skewness দেখা যেতে পারে। এই skewness পরিসংখ্যানগতভাবে কিছু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বা significant কিনা তা' জানবার জন্য একটি সূত্র আছে, এই সহগটিকে প্রয়োগ করে এই স্কোর আলোচনা করা সম্ভব হয়।

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনে যদি কোন ব্যতিক্রমের অভাব বা asymmetry দেখা দেয়, তার কারণগুলি জানা দরকার। মনোবিজ্ঞানে সাধারণতঃ যে সব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতাদির পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়, তবে দেখা যায় যে তারা নর্মাল কার্ভের কাছাকাছি আছে, কিন্তু অনেক সময় ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনটি একপেশে, skewed বা অসমান হতে পারে। এর কারণ নির্দেশ করা হল।

প্রথমতঃ নমুনাচয়নের ত্রুটি একটি প্রধান কারণ হতে পারে। নমুনাগুলি (sample) যত ছোট হবে তার উপর প্রযুক্ত অভীক্ষার ফল স্বাভাবিক ডিস্ট্রিবিউশন না দেখাতে পারে, অভীক্ষার্থীরা অনুপাতে বেশী বুদ্ধিমান বা কম বুদ্ধি, তাদের উপর অভীক্ষা প্রয়োগ করলে ফল skewed হতে পারে। নমুনাগুলি যত বেশী হবে, এবং samplingটি random বা যথাযথ হবে, ফ্রিকোয়েন্সী তত বেশী নর্মালের হবার সম্ভাবনা।*

দ্বিতীয়তঃ যে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হবে, তার গঠন ও আকৃতি তার ফলের উপরও ডিস্ট্রিবিউশনের প্রকৃতি কিছুটা নির্ভর করবে। যদি অভীক্ষাটি অত্যন্ত কঠিন বা অত্যধিক সহজ হয়, তবে ডিস্ট্রিবিউশন skewed হবে।

তৃতীয়তঃ যে বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার পরিমাপ করা হবে, তারই মধ্যে যদি normality-এর অভাব থাকে তবে ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল হবে না। যে

---

* Garrett—"Selection will produce skewness and Kurtosis in the distribution even when the test has been adequately constructed and carefully administered. For example, a group of elementary school pupils which contains (a) a large proportion of bilinguals, (b) many children of very low or high socio-economic status, (c) a large number of pupils overage for grade or accelerated, will almost surely return skewed distributions of test scores even upon standard intelligence and educational achievement examinations".

মুদ্রাটি টস্ করা হবে, তার মধ্যে যদি একদিকে বেশী হয়, তবে হেড বা টেইল পড়ার স্বাভাবিক সম্ভাবনা ব্যাহত হবে। $(P+q)^n$ এই Binomial expansion-টি প্লট করলে স্বাভাবিক কার্ভ তখনই পাওয়া যায় যখন $P=q$ হবে

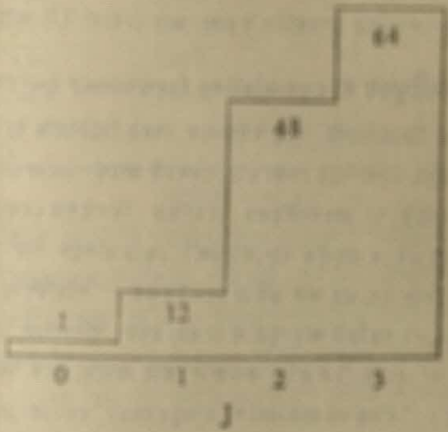

চিত্র সংখ্যা ৯

দেখা যায়। যদি মুদ্রাতে 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা বেশী হয় তবে 'J' টাইপের কার্ভ হবে। বেকিয়ারের বিবাহের পরিসংখ্যানে 'J' টাইপ কার্ভ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন পার্লামেন্টারি ক্যাবিনেট মিটিং-এ যাঁরা আসেন তাঁরা 'J' টাইপ হবে, কারণ বৈঠকে ঐ সময়ের বেশির ভাগ আসেন নিয়ম।

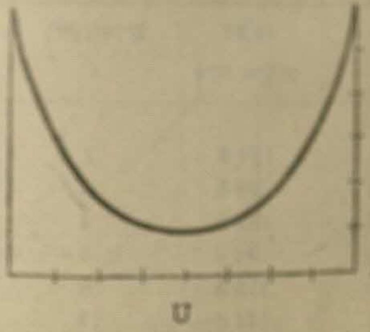

চিত্র সংখ্যা ১০

আর একটি অ-স্বাভাবিক ডিস্ট্রিবিউশন হল "U" ধরনের কার্ভ। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাছাই করে দুটি দলে পড়াবার ব্যবস্থা যদি করা হয়, এক দলে 75 I. Q. এর নীচের বুদ্ধাঙ্ক বিশিষ্ট ছাত্রদল, ও অপর দলে 120 এর ওপরে বুদ্ধাঙ্ক বিশিষ্ট ছাত্রদল থাকবে, এদের পরীক্ষার ফলের ডিস্ট্রিবিউশনকে লেখচিত্রে রূপান্তরিত করলে তার চেহারা 'U' আকৃতি হবে।

ক্রমসমষ্টিমূলক বা cumulative frequency curve.

যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনকে যেমন হিস্টোগ্রাম বা ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের সাহায্যে রেখাচিত্রে ফেলা যায়, তেমনই তাকে cumulative frequency graph বা ক্রমসমষ্টিমূলক রেখাচিত্র হিসাবেও লেখা যায়। এই গ্রাফের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সী স্কোরগুলিকে পর পর ক্রমান্বয়ে যোগ করে দেখান হয়, এর জন্য এটি ক্রমসমষ্টিমূলক। সাধারণতঃ ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশনের এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়, যখন পরিমাপক স্কেলের কোন একটি বিন্দু বা মূল্যের ঠিক নীচে কতগুলি স্কোর আছে, তার সমষ্টিকে জানার প্রয়োজন হয়। "The cumulative frequency corresponding to any class interval is the number of cases within that interval **plus all those in intervals lower on the scale.**"

৬৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উদাহরণযোগে cumulative frequency বার করে চিত্রটি আঁকা যায়।

১০ নং উদাহরণ

শ্রেণীব্যবধান	শ্রেণীর সর্বোচ্চ প্রান্ত	ফ্রিকোয়েন্সী f	কিউম্যুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী c. f.
195—199	199·5	1	50
190—194	194·5	2	49
185—189	189.5	4	47
180—184	184·5	5	43
175—179	179·5	8	38
170—174	174·5	10	30
165—169	169·5	6	20
160—164	164·5	4	14

শ্রেণীব্যবধান	শ্রেণীর সর্বোচ্চ প্রান্ত	ফ্রিকোয়েন্সী f	কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী c. f.
155—159	159·5	4	10
150—154	154·5	2	6
145 – 149	149·5	3	4
140—144	144.5	1	1
		N = 50	

তালিকা সংখ্যা ১০

প্রথম স্তম্ভে যথারীতি শ্রেণীব্যবধানে স্কোরগুলি সাজান আছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর পরিবর্তে সর্বোচ্চ প্রান্তসীমাগুলি দেখান হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভে প্রতি শ্রেণীব্যবধানের সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সী, এবং চতুর্থ স্তম্ভে সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী আছে। সর্বনিম্ন শ্রেণীর উচ্চপ্রান্ত 144·5 এর নীচে ফ্রিকোয়েন্সী হল 1, তার সঙ্গে পরবর্তী শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী যোগ করে

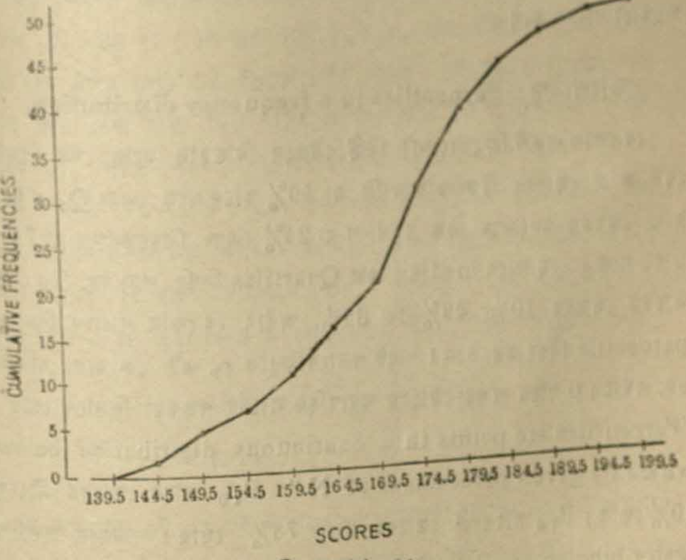

চিত্র সংখ্যা—১১

হল 1+3 = 4 ; এভাবে পর পর যোগ করে যেতে হবে, যেমন চতুর্থ ব্যবধানে

ফ্রিকোয়েন্সী হল 4, সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (c. f.) হবে 4 এবং এর নীচের শ্রেণীসমূহের সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী বা 6, (4+6)=10, এভাবে প্রতি শ্রেণীর সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী তৈরী হবে ঐ শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সীর সঙ্গে পরবর্তী সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী যোগ করে। শেষ সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হবে স্কোরের সংখ্যা বা N এর সমান। এই উদাহরণে শেষ c. f. হবে 50। উপরের উদাহরণযোগে একটি গ্রাফ অঙ্কিত হল।

এখানে পলিগন আঁকবার প্রায় সকল নীতিই অনুসৃত হয়েছে, শুধু মধ্যবিন্দুর পরিবর্তে প্রত্যেক শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তসীমার সমষ্টি-মূলক ফ্রিকোয়েন্সী গুলি প্লট করা হয়েছে, এবং এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা দিয়ে যোগ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা হিষ্টোগ্রামের রূপ নেবে না। এটি একটি S এর মত রেখার রূপ নেবে। রেখাটি x-অক্ষরেখা স্পর্শ করার জন্য প্রথম শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন প্রান্তসীমার 0 স্কোর ধরে সুরু করতে হবে, এবং শেষ হবে সর্বশেষ শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তসীমায়। এখানেও গ্রাফের উচ্চতা "x-অক্ষরেখার 75%" নিয়ম অনুযায়ী রক্ষিত হবে।

শতাংশবিন্দু—Percentiles in a frequency distribution.

যে কোন একটি ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনে মিডিয়ান হচ্ছে সেই বিন্দুটি যেটি সমগ্র স্কোরের ঠিক মাঝামাঝি বা 50% স্থানে পড়ে, এবং Q_1 ও Q_3 হচ্ছে স্কোরের যথাক্রমে এক চতুর্থাংশ বা 25% এবং তিনচতুর্থাংশ বা 75% স্থানে পড়ে। যে ভাবে median এবং Quartiles নির্ণয় করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই স্কোরের 10%, 43% কি 85%, অর্থাৎ যে কোন শতাংশ বিন্দু বা percentile নির্ণয় করা চলে। এই শতাংশবিন্দুকে p_p এই চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়, এখানে p মানে দেওয়া স্কোরের অব্যবহিত নীচের শতকরা হিসাবে স্কোর। "Percentiles are points in a continuous distribution below which lie given percentages of N." P_{10} মানে স্কোরের নীচের 10% স্কোর ; P_{76} মানে ঐ স্কোরের নীচে 76% স্কোর। তাহলে শতাংশ হিসাবে median হবে P_{50}, Q_1 হবে P_{25} এবং Q_3 হবে P_{75}। এখানে P_0 হল প্রথম শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন প্রান্তসীমা, এবং P_{100} হল শেষ শ্রেণী

ব্যবধানের সর্বোচ্চ সীমা। মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি অনুযায়ী শতাংশবিন্দু বার করা চলে। সূত্রটি এইরূপ :—

$$P_p = l + \left(\frac{{}_pN - F}{f_p}\right) \times i \text{ (interval)}$$

এখানে p = ডিস্ট্রিবিউশনের যে শতাংশ জানতে চাওয়া হয়, যেমন 5%, 8%, 30% ইত্যাদি।

l = যে শ্রেণীব্যবধানে P_p আছে তার নিম্ন প্রান্তসীমা

N = P_p হিসাব করতে হলে N এর যে অংশ পর্যন্ত গুনতে হবে।

F = l এর নিম্নবর্তী সকল শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোর।

f_p = যে শ্রেণীব্যবধানে p_p পড়ে, সেই শ্রেণীর স্কোর।

i = শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব।

এই সূত্র অনুযায়ী ৯ নং উদাহরণের ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশন থেকে P_{70} বার করা যাক। এখানে N = 50, অতএব 70%, মানে 50 এর 70%, সুতরাং ${}_pN = 35$ বা (50 এর 70%); p_{70} হল ডিস্ট্রিবিউশনের সেই বিন্দুটি যার নীচে মোট 35 ফ্রিকোয়েন্সী আছে। সমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হিসাব করে দেখা যায়, 170 − 174 শ্রেণীব্যবধানে 30 ফ্রিকোয়েন্সী পড়ে, অতএব p_{70} আছে পরবর্তী শ্রেণীব্যবধানে, 175 − 179 এ। সুতরাং এখানে l হল 175 − 179 ; এই শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন প্রান্তসীমা হল 174·5, তাহলে F হল 30, অর্থাৎ l এর নীচে সকল শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোর; $f_p = 8$ অর্থাৎ যে শ্রেণী ব্যবধানে p_{70} পড়েছে, তার ফ্রিকোয়েন্সী, এখানে 175 − 179, এবং i = 5, বা শ্রেণীদূরত্ব। সূত্রটি প্রয়োগ করে পাই—

$$P_{70} = 174{\cdot}5 + \left(\frac{35 - 30}{8}\right) \times 5$$

$$= 177{\cdot}6$$

এর তাৎপর্য্য এই যে 50 ছাত্রের মধ্যে শতকরা 70 জন 177·6 স্কোরের নীচে আছে। এই ভাবে অন্যান্য শতাংশবিন্দুও বার করা যায়। ৯ নং উদাহরণ অনুযায়ী কয়েকটি শতাংশবিন্দুর তালিকা দেওয়া গেল।

১১নং উদাহরণ

Score	f	cum. f.	Percentiles
195—199	1	50	$p_{100} = 199·5$
190—195	2	49	$p_{90} = 187·0$
185—189	4	47	$p_{80} - 181·5$
180—184	5	43	$p_{70} = 177·6$
175—179	8	38	$p_{60} - 174·5$
170 - 174	10	30	$p_{50} = 172·0$
165—169	6	20	$p_{40} = 169·5$
160—164	4	14	$p_{30} = 165·3$
155—159	4	10	$p_{20} = 159·5$
150—154	2	6	$p_{10} - 152·0$
145—149	3	4	$p_{8} - 139·5$
149—144	1	1	

তালিকা সংখ্যা ১১

শতাংশ সারি নির্ণয়—Percentile Ranks in a frequency distribution.

উপরে দেখেছি, শতাংশ বিন্দু বা percentiles মানে হল যে কোনও ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশনে কোন একটি বিন্দু বিশেষ যার নীচে N এর কোন বিশেষ শতাংশ পড়ে। এখন শতাংশ হিসাবে সারিতে ব্যক্তিবিশেষেরও একটি স্থান আছে। এই শতাংশ সারি নির্ণয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। শতাংশ বিন্দু (percentiles) এবং শতাংশ সারির (Percentile Rank) এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। শতাংশবিন্দু হিসাব করতে হলে N এর কোনও শতাংশ, যেমন 62%, নিয়ে হিসাব সুরু করা হল। তার নীচ থেকে সমষ্টিমূলক f হিসাব করে যে বিন্দুতে ঐ শতাংশ পাওয়া যায়, সেখানেই ঐ শতাংশবিন্দু বা P_{62} পাওয়া যাবে।

শতাংশ সারি বার করার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। এখানে কোন ব্যক্তি-বিশেষের একটি স্কোর নিয়ে সুরু করে তার নীচে যে শতাংশ আছে, তা বার করা হয়। দশ নং উদাহরণযোগে একটি ব্যক্তিগত স্কোর, যথা 163 এর PR বা পার্সেন্টাইল র‍্যাঙ্ক (শতাংশ সারি) বার করা যাক্। এই স্কোরটি 160—164 শ্রেণীব্যবধানে পড়েছে। এর নিম্নপ্রান্তসীমা 159.5 পর্য্যন্ত দশটি স্কোর

আছে, এবং এই শ্রেণীতে চারটি স্কোর আছে। এই চারকে শ্রেণীদূরত্ব অর্থাৎ 5 দিয়ে ভাগ করলে (4 ÷ 5 = ·8) ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক এককের স্কোর হয় ·8; যে শ্রেণীব্যবধানে 163 স্কোরটি অবস্থিত, তার নিম্নপ্রান্তসীমা 159·5 থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে 3·5 score units অর্থাৎ (163 – 159·5 = 3·5)। তাহলে 159·5 থেকে 163 এর Score distance হচ্ছে 3·5 × ·8 বা 2·8। 159·5 এর নীচে মোট স্কোর 10 এর সঙ্গে 2·8 যোগ করলে পাই 12·8, ইহাই হল 163 স্কোরের নীচে N এর অংশ, শতকরা হিসাবে মোট score এর ইহা হল 25·6%, অর্থাৎ (12·8 ÷ 50) = 25·6% ব্যক্তি 163 স্কোরের নীচে আছে, সুতরাং 163 এই স্কোরের **শতাংশ সারি** বা PR হল 26। এই ভাবে যে কোন স্কোরের PR বা শতাংশ সারি বার করা চলে। যেমন এই ডিষ্ট্রিবিউশনে 181 স্কোরের PR হচ্ছে 79।

দশ নং উদাহরণে ক্রমসমষ্টিমূলক ডিষ্ট্রিবিউশন ও শতাংশবিন্দুর তালিকা থেকে আমরা একবারেই শতাংশ সারি বা PR হিসাব করতে পারি, হিসাবগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও কাছাকাছি নির্ভুল হবে। যেমন 152 স্কোরের শতাংশ সারি (PR) হবে 10, 172 এর PR হবে 50, এবং 187 এর PR হবে 90। ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন থেকে সরাসরি PR বলা সম্ভব হয় কারণ শতাংশ বিন্দুগুলি (Percentiles) শ্রেণীব্যবধানগুলির প্রতিনিধিত্ব করে বলেই মেনে নেওয়া হয়। এই ভাবে 160 এর PR বা শতাংশ সারি হবে মোটামুটি ভাবে 20, 165 এর শতাংশ সারি হবে 30, 170 এর শতাংশ সারি 40, 175 এর শতাংশ সারি 60, 178 এর 70, 182 এর 80। এই P.R গুলি সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও মোটামুটি ভাবে সত্য।

শতাংশ সারির হিসাব যখন ব্যক্তিরা কোন গুণ হিসাবে পর পর সাজান থাকে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে শতাংশ সারির ব্যবহারের প্রচলন খুবই বেশী দেখা যায়, বিশেষতঃ যখন কোন একটা গুণ, যেমন সামাজিকতা, উদ্ভাবনীশক্তি বা সকল কাজে আগ্রহ, অনুযায়ী ব্যক্তিদের পর পর সাজান হয়। এই সারিতে স্থানগুলি (Rank order) শতাংশসারিতে পরিণত করে তাকে স্কোর হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক্। পঁচিশ জন অফিসারকে লীডারসিপ অনুযায়ী পর পর সারিতে সাজান হয়েছে। এখানে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন—

তার PR হবে 98, এবং যিনি সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছেন, তার PR হবে 2, সূত্রটি হচ্ছে—

$$PR = 100 - \frac{(100R - 50)}{N}$$

এখানে R হল সারিতে ব্যক্তির স্থান। সারির সর্বোচ্চ স্থান হল '1'। এই ভাবে পঁচিশ জনের মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তার সারি হল 1, এবং পঁচিশের মধ্যে শতাংশ সারি হল $100 - \frac{(100 \times 1 - 50)}{N} = 98$।

এখানে মনে রাখা উচিত, যে যেহেতু শতাংশ সারি কোন স্কেলের এককের মধ্য-বিন্দুতে পড়ে, সেজন্য শতাংশ সারি কখনও 0 বা 100 হয় না।

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র

Ogive or Cumulative Percentage curve.

ক্রমসমষ্টিমূলক রেখাচিত্রের সঙ্গে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্রের তফাৎ এই যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ক্রমান্বয়ে পর পর যোগ করা ছাড়াও প্রত্যেক ফ্রিকোয়েন্সীকে N এর শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়, এবং y-অক্ষরেখায় N এর শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলিই প্লট করা হয়।

তালিকা সংখ্যা ৯ এর সঙ্গে শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী যোগ করে একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

১২ নং উদাহরণ

score	f	cum f	cum. percent f
195—199	1	50	100
190—194	2	49	98
185—189	4	47	94
180—184	5	43	86
175—179	8	38	76
170—174	10	30	60
165—169	6	20	40
160—164	4	14	28
155—159	4	10	20

score	f	cumf	cum. percent f
150—154	2	6	12
145—149	3	4	8
140—144	1	1	2

তালিকা সংখ্যা ২

এখানে চতুর্থ স্তম্ভে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলি N এর শতকরা হিসাবে দেখান হয়েছে। প্রত্যেক ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে N দিয়ে ভাগ করে শতকরাতে পরিণত করলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যায়। যেমন $1 \div 50 = \cdot 02$ বা $2 \cdot 0\%$, $4 \div 50 = \cdot 008$ বা $8 \cdot 0\%$। সহজতর উপায় হচ্ছে Reciprocal, Rate বা হার হিসাব করা। হার হল $\frac{1}{N}$, এবং প্রত্যেক cum. f কে ঐ হার দিয়ে (এই উদাহরণে ·02) গুণ করলেই শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যায়।

একশ পঁচিশটি ছাত্রের একটি reading test এর ফলের একটি ogive বা ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র নীচে আঁকা হ'ল। ডিষ্টিবিউশনটি প্রথমে দেখান হল।

১৩ নং উদাহরণ

Score	f	cumf	cum. percent f
74·5—79·5	1	125	100·0
69·5—74·5	3	124	99·2
64·5—69·5	6	121	96·8
59·5—64·5	12	115	92 0
54·5—59·5	20	103	82·4
49·5—54·5	36	83	66·4
44·5—49·5	20	47	37·6
39·5—44·5	15	27	21·6
34·5—35·9	6	12	9·6
29·5—34·5	4	6	4·8
24·5—29·5	2	2	1·6

N = 125

$$\text{Rate} = \frac{1}{N} = \frac{1}{125} = \cdot 008$$

তালিকা সংখ্যা—১৩

এখানেও পূর্বোক্ত পন্থায় প্রত্যেক ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে N দিয়ে ভাগ করে শতকরাতে পরিণত করা হয়েছে, এবং ঐ ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে Rate দিয়ে গুণ করলেই শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যায়। যথা 2×·008=·016 অথবা 1·6%; 6×·008=·048 বা 4·8%, 12×·008=·096 বা 9·6% ইত্যাদি।

উপরোক্ত (১৩ নং) তালিকা থেকে একটি ওজাইভ অঙ্কিত হল।

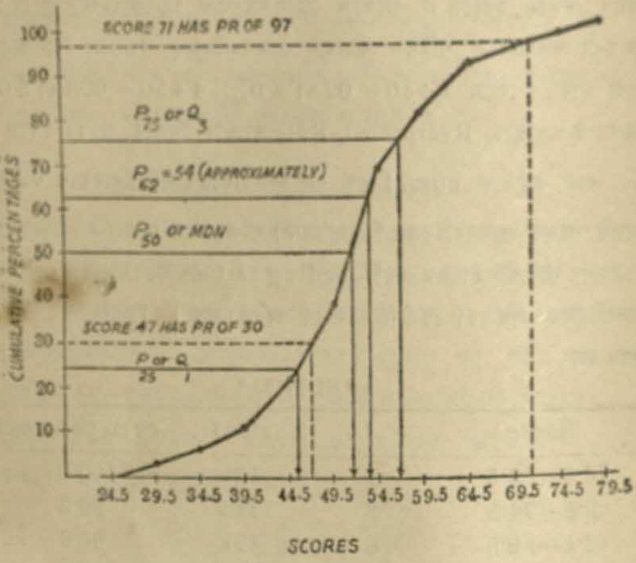

চিত্র সংখ্যা—১২

x অক্ষরেখায় এগারটি শ্রেণীব্যবধান প্লট করা হয়েছে, এবং y-অক্ষরেখায় দশটি সমান এককের একটি স্কেল প্লট করা হয়েছে, প্রত্যেক একক ডিষ্ট্রিবিউশনের শতকরা দশের সমান। ওজাইভটিতে প্রথম বিন্দু পড়েছে x-অক্ষরেখায় 29·5 এর উপরে এবং 1·6 y-এককে; দ্বিতীয় বিন্দুটি 34·5 এর উপরে এবং 4·8 y-এককে। সর্বশেষ বিন্দুটি মিলেছে x-অক্ষরেখায় 79·5 (সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তসীমা) এবং y-অক্ষরেখায় 100 y-এককে।

শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন ও ওজাইভ থেকে সরাসরি শতাংশ বিন্দু (Percentiles) এবং শতাংশ সারি (Percentile Ranks) হিসাব করা যায়। প্রথমে শতাংশ বিন্দু বার করা যাক, ১৩নং

তালিকা যোগে। ধরা যাক্ P_{71} বার করা হচ্ছে। চতুর্থ স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে P_{71} আছে 66·4% এবং 82·4% এর মধ্যে। 66·4% যে শ্রেণীব্যবধানে আছে তার উচ্চ প্রান্তসীমা হল 54·5, এবং 82·4% যে শ্রেণী ব্যবধানে আছে তার উচ্চ প্রান্ত সীমা হল 59·5 ; তাহলে 82·4%−66·4%=16·0% এর জন্য আছে 59·5−54·5=5·0 স্কোর ; P_{71} আছে 66·4% থেকে 4·6% দূরে ; সুতরাং 16·0% এর জন্য যদি 5·0 বিন্দু থাকে, 4·6% এর জন্য থাকে $\frac{5}{16 \cdot 0} \times 4 \cdot 6 = 1 \cdot 4$, সুতরাং P_{71} হল 54·5+1·4=55·9।

অনেক সময় এত অংক না করে সরাসরি চতুর্থ স্তম্ভ থেকে শতাংশ বিন্দু বার করা যায়। যেমন পঞ্চম শতাংশ বিন্দুটি মোটামুটিভাবে হচ্ছে 34·5 ; P_{21} হল মোটামুটিভাবে 44·5, P_{38} হল 49·5, P_{92} হল 64·5 ইত্যাদি।

শতাংশ সারিও এইভাবে চতুর্থ স্তম্ভ থেকে সোজাসুজি বার করা যায়। স্কোর 43 এর শতাংশ সারি বার করা যাক্। চতুর্থস্তম্ভে পাই যে স্কোরের 9·6% আছে 39·5 এর নীচে; স্কোর 43 তাহলে 39·5 থেকে 3·5 দূরে আছে। 39·5 থেকে 44·5 পর্যন্ত ব্যবধানের দূরত্ব পাঁচ এককের। এবং এই দূরত্ব ডিষ্ট্রিবিউশনের 21·6%−9·6%=12·0% বোঝায়। সুতরাং 39·5 থেকে 43 স্কোরের দূরত্বের শতাংশ হল 3·5/5×12·0=8·4% ; অতএব স্কোর 43 এর নীচে শতকরা ব্যক্তি সংখ্যা হল 9·6% (39·5 পর্যন্ত) +8·4% (39·5 থেকে 43·0 পর্যন্ত)=18% ; সুতরাং 43 স্কোরের PR হল 18।

শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি ওজাইভ থেকেও সরাসরি সহজেই বার করা যায়। ওজাইভ থেকে P_{50} বা মিডিয়ান বার করতে হলে y-অক্ষরেখার 50 ফ্রিকোয়েন্সী থেকে x-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে একটি রেখা টেনে ওজাইভকে যেখানে ছেদ করে, সেই বিন্দু থেকে x-অক্ষরেখার উপরে একটি লম্ব টেনে আসতে হবে। যে বিন্দুতে লম্বটি x-অক্ষরেখার সঙ্গে মিলিত হবে, সেখানেই মিডিয়ান পাওয়া যাবে। ১২নং উদাহরণে এই হিসাবে মিডিয়ান হবে 51·5 (অংক কষে পাওয়া মিডিয়ান হল 51·65)। P_{25} বা Q_1 এই ভাবেই হল 45·0, এবং P_{75} বা Q_3 হল 57·0, (অংক কষে পাওয়া P_{25} এবং P_{75} যথাক্রমে হল 45·66 এবং 57·19)। অপরদিকে যে কোন স্কোরের

শতাংশ সারি বার করতে হলে অনুরূপ ভাবে x-অক্ষরেখা থেকে উল্টো ভাবে সুরু করে y-অক্ষরেখা পর্য্যন্ত পৌঁছালেই বার করা যাবে। এভাবে দেখা যায় ওজাইভ থেকে সরাসরি যে শতাংশবিন্দু পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।

শতাংশ বিন্দু ও সারি বার করা ছাড়াও ওজাইভের আরো নানাপ্রকার ব্যবহার আছে। যেমন দুই বিভিন্ন দলের উপর একই পরীক্ষার ফলাফল তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে হলে একই অক্ষরেখার উপর দুটি ওজাইভ এঁকে দেখান যায়। নীচে একটি উদাহরণে দু'শ বালক ও দু'শ বালিকার একই অংক পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে দুটি ওজাইভ আঁকা হয়েছে।

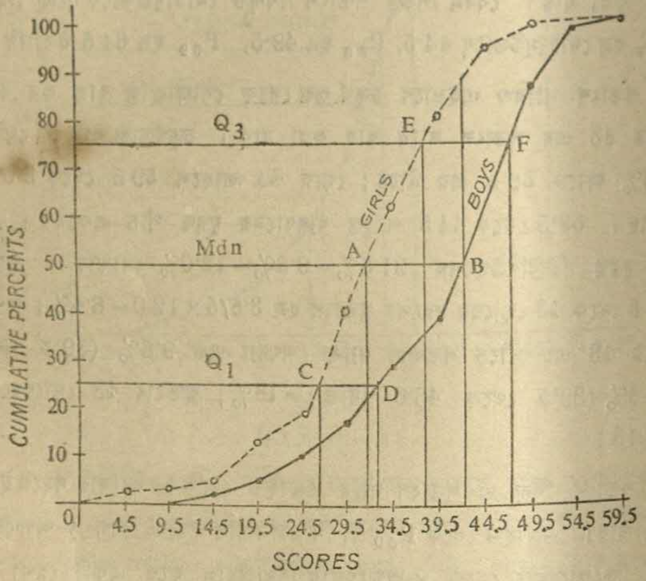

চিত্র সংখ্যা ১৩

ওজাইভ দুটি থেকে দেখা যায় যে বালিকাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৪৪ জন বালকদের মিডিয়ানের নীচে আছে, এদিকে বালকদের মধ্যে শতকরা 76 জনই বালিকাদের মিডিয়ানের উপরে আছে। কিন্তু স্কেলের উপরের দিকে বা নীচের দিকে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম।

দ্বিতীয়তঃ পার্সেন্টাইল নর্ম ওজাইভ থেকে বার করা চলে। নর্ম বলতে

কোন একটি দলবিশেষের কাজের প্রতীক নমুনা বা typical performance বোঝায়। সাধারণতঃ মিডিয়ানের সাহায্যে একটি দলের গড় কাজকে আমরা বুঝে থাকি, এবং ঐ মিডিয়ানটি দলের নর্মের প্রতীক। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য শতাংশ বিন্দুর নর্ম ও হিসাব করা চলে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বিভিন্ন achievement test-এর ফলাফল তুলনা করার সময় পার্সেন্টাইল নর্মের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। যেমন একটি ছেলে অংক অভীক্ষায় পেল 63, এবং ইংরেজী অভীক্ষায় পেল 143। শুধু স্কোর দেখে কোন অভীক্ষায় বেশী ভাল করেছে, তা বোঝার উপায় নাই। কিন্তু যখন জানি যে 63 স্কোরের PR হচ্ছে 52 এবং 142 স্কোরের PR হচ্ছে 68, আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে অংকে তার কৃতিত্ব মাঝারী (কারণ তার নীচে রয়েছে শতকরা 52 ছেলে), এবং ইংরাজীতে তার কৃতিত্ব ভাল, কারণ তার নীচে আছে শতকরা 68 ছেলে।

অন্যান্য রেখাচিত্র—Other graphical methods.

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি মনোবিজ্ঞানে কিভাবে হিষ্টোগ্রাম, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগণ, ক্রমসমষ্টিমূলক ডিষ্ট্রিবিউশন, ওজাইভ ইত্যাদি লেখচিত্র ব্যবহার করা চলে, এবং আংকিক তালিকাগুলি চিত্রের মাধ্যমে অধিকতর পরিস্ফুট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এই চিত্রগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি চিত্রের ব্যবহার মনোবিজ্ঞানে প্রচলিত আছে, এবং এই পুস্তকের অন্যান্য প্রবন্ধে তার নানা উদাহরণ রয়েছে। সংক্ষেপে এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

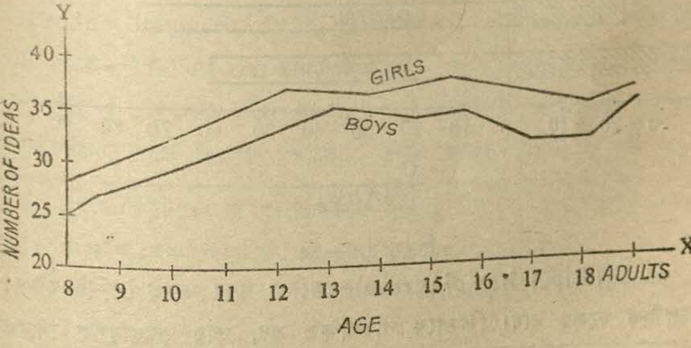

চিত্র সংখ্যা—১৪

Line graph :—

৭২০ পৃষ্ঠার চিত্রটিতে আট বৎসর বয়স থেকে আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকার যুক্তিগত স্মৃতির (logical memory) বিকাশের দুইটি রেখাচিত্র পাশাপাশি একই অক্ষরেখায় স্থাপিত হ'ল।

x-অক্ষরেখায় বয়স এবং y-অক্ষরেখায় স্মৃতির বিষয় দেখান হয়েছে। প্রায় সমান্তরাল লাইন গ্রাফের সাহায্যে এখানে বিভিন্ন বয়সের বালক ও বালিকার স্মরণশক্তির বিকাশ দেখান হয়েছে। দেখা যায় পনের বৎসর বয়সে উভয় দলেরই স্মৃতিশক্তি সর্বোৎকৃষ্ট, তার পরে কিছু কম, আবার প্রাপ্তবয়স্কদের একটু ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্মৃতিরেখাটি বরাবরই ছেলেদের চেয়ে ভাল হয়েছে।•

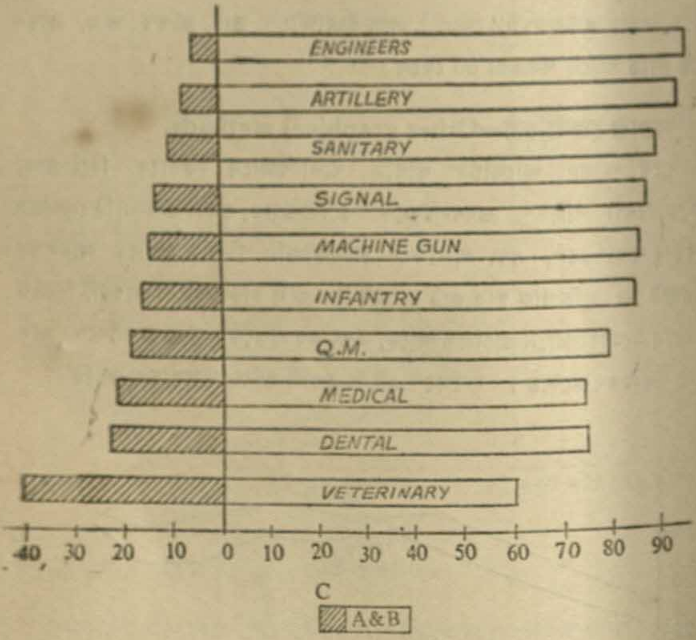

চিত্রসংখ্যা—১৫

২। বার চিত্র (**bar diagram**)—অনেক সময় একই বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে কিভাবে পরিলক্ষিত হয়, তার তুলনামূলক বিচার

• এই প্রকার লাইন গ্রাফের উদাহরণ এই বইতে 'মনে রাখা ও ভুলে

করতে হলে মনোবিজ্ঞানের বার চিত্র ব্যবহার করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিন্ন মিলিটারী দলের অফিসারদের উপর আর্মি আলফা অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, এবং অভীক্ষার ফলাফল A, B, C, দ্বারা গ্রেড করে প্রকাশিত হয়। নীচের চিত্রে A এবং B যাঁরা বেশী সংখ্যায় পেয়েছেন, তাদের শীর্ষস্থান দিয়ে পর পর সারি করে সাজান হয়েছে।

এখানে দেখা যাবে ইঞ্জিনিয়ারের দল প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তাদের শতকরা 95 জন A এবং B গ্রেড পেয়েছেন, এবং শতকরা প্রায় পাঁচজন C পেয়েছেন। সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছেন পশুচিকিৎসক দল, তাদের শতকরা 60 জন A এবং B পেয়েছেন, এবং শতকরা 40 জন C পেয়েছেন। *

Correlation—সহপরিবর্তন :—

এ পর্যায় আমরা কোন একটি বিশেষ গুণ, দক্ষতা বা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার মাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু অনেক সময় দুইটি গুণের মধ্যে সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, এবং সেই সম্বন্ধটি জানতে পারলে এক বিষয়ে পারদর্শিতা থেকে অপর বিষয়ে কতটা দক্ষতা আশা করা যাবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়। একটি শিশুর সাধারণ বুদ্ধির মাপ থেকে তার ক্লাসে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ে পারদর্শিতা সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব কিনা, সহপরিবর্তনের মাপের সাহায্যে তা' বলা সম্ভব হতে পারে।

যখন দুই দল স্কোরের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, এবং সেই সম্বন্ধকে একটি সরল (linear) রেখার সাহায্যে চিত্রায়িত করা যায়, সেই সম্বন্ধকে বলা হয় **Product moment co-efficient of correlation.** এই সম্বন্ধকে 'r' এই অক্ষরটির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

Product moment co efficient of correlation বা 'r' সর্বদাই 1·00 থেকে—1·00 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। 'r' যখন 1·00 হয়, তা'র মানে হচ্ছে দুটি স্কোরদলের মধ্যে পূর্ণ সহপরিবর্তনের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। একটি বৃত্তের পরিধি সর্বদাই তার

যাওয়া' প্রবন্ধে গেইট্সের আঁকা চিত্রটিতে (Fig 27A) দেখা যাবে এবং 'পড়া শেখা কাজ শেখা' অধ্যায়ে Practice curve এ দেখা যাবে।

* এই পুস্তকের "বংশানুক্রম ও পরিবেশ" প্রবন্ধে বার চিত্রের একটি সুন্দর উদাহরণ (Fig no. 23) আছে।

ব্যাসের 3·1416 অংশ (C=3·141D), বৃত্তের আকারের পরিবর্তনের ফলে এই সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটে না, এটি অপরিবর্তনীয়। অনুরূপ ভাবে একদল ছেলে যদি দুটি পরীক্ষায় বরাবর একই ফল করে, অর্থাৎ যে প্রথম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, সে দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান পায়, যে প্রথমটিতে সর্বনিম্ন স্থান পায়, সে অপরটিতেও একই স্থান পায়। এইভাবে দুই দলের প্রত্যেকের স্থান যখন সম্পূর্ণ একই ধরণের হয়, এই ফল দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ বা 'r' হচ্ছে পূর্ণ, অথবা 1·00.

অপর পক্ষে দুই দলের পরীক্ষার ফলের মধ্যে যদি কোন প্রকার সম্বন্ধই না থাকে, অর্থাৎ একটি দলের স্কোরের পরিবর্তন যদি অপর দলের স্কোরের মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত না করে, তবে উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই বুঝতে হবে, এবং এখানে 'r' হবে শূন্য বা ·00। যেমন তিনজন ছাত্রকে একটি tapping test এবং Army Alpha test দেওয়া গেল। Tapping testএ তিনজনেরই মীন সমান, অথচ আর্মি আলফা অভীক্ষায় তাদের Mean ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এ থেকে বোঝা যায় যে tapping testএর ফল থেকে বুদ্ধি পরীক্ষায় তারা কিরকম ফল করবে, সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণীই এখানে করা চলবে না। এখানে কোন প্রকার সম্বন্ধই অনুপস্থিত।

তাহলে, ধনাত্মক পূর্ণ সহপরিবর্তন 1·00 এই co-efficient দ্বারা সূচিত হয়, এবং সহ পরিবর্তন সম্বন্ধের সম্পূর্ণ অভাব ·00 এই co-efficient দ্বারা বুঝায়। এই দুই সীমার মধ্যে যে co-efficient of correlation হতে পারে, যেমন ·24, ·05 বা ·94, তারা সর্বদাই কিছু না কিছু ধনাত্মক সম্বন্ধের দ্যোতক।

এই co-efficient of correlation আবার ঋণাত্মকও হতে পারে। যেমন কোন একটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা যখন অপর বিষয়ে পারদর্শিতার অভাব সূচিত করে, তখন এই সম্বন্ধটি ঋণাত্মক। একদল ছেলে ভাষা পরীক্ষা ও দোকান পরিচালনা উভয় বিষয়ে পরীক্ষা দিল। যে ভাষা পরীক্ষায় সর্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করে, দেখা গেল সে সর্বদাই দোকান পরিচালনায় সর্বশেষ স্থানটি পায়। অতএব উভয় গুণের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধটি বিপরীত মুখী (inverse), এবং এখানে 'r' হচ্ছে পূর্ণ ঋণাত্মক বা −1·00।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা দেখি co-efficients of correlation বা 'r' "—1·00 থেকে ·00 হয়ে 1·00" পর্যন্ত বিস্তৃত একটি scale-এর মধ্যে ওঠা নামা করে। "Co-efficients of correlation range over a scale which extends from—1·00 through ·00 to 1·00. A positive correlation indicates that large amounts of the one variable tend to accompany large amounts of the other; a negative correlation indicates that small amounts of the one variable tend to accompany large amounts of the other. A zero correlation indicates no consistent relationship"—Garett.

সূত্র—The product moment co-efficient of correlation :—

পূর্বের আলোচনাতে দেখেছি, প্রোডাক্ট মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট অব কোরিলেশন বলতে আমরা দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝি যে একটির পরিবর্তন অপরটির সহপরিবর্তন ঘটায়, এবং এই সহ-পরিবর্তনকে একটি সরল রেখাঙ্কিত গ্রাফের মাধ্যমে মাপা যায়, যার সীমা হচ্ছে—1·00 থেকে শুরু করে ·00 হয়ে 1·00 পর্যন্ত। একটি সহজ সরল মনগড়া উদাহরণের সাহায্যে প্রোডাক্ট মোমেন্ট অনুপাতের আংকিক সূত্রকে, $r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma_x\sigma_y}$, বোঝার চেষ্টা করা যাক।

পাঁচজন ছাত্রের উচ্চতা ও ওজনের মাপ নীচে দেওয়া হল।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ছাত্র	X উচ্চতা ইঞ্চিতে	Y ওজন পাউণ্ডে	x	y	xy	$\frac{x}{\sigma_x}$	$\frac{y}{\sigma_y}$	$\left(\frac{x}{\sigma_x}\frac{y}{\sigma_y}\right)$
ক	72	170	3	0	0	1·34	·80	·00
খ	69	165	0	−5	0	·00	−·37	·00
গ	66	150	−3	−20	60	−1·34	−1·46	1·96
ঘ	70	180	1	10	10	·44	·73	·32
ঙ	68	185	−1	15	−15	−·44	1·10	−·48
					55			1·80

14 নং উদাহরণ

$MX = 69$ in. $\sigma_x = 2{\cdot}24$

$MY = 170$ lbs. $\sigma_y = 13{\cdot}69$

$$\text{Correlation} = \frac{\sum \frac{x}{\sigma_x} \cdot \frac{y}{\sigma_y}}{N} = \frac{1{\cdot}80}{5} = {\cdot}36$$

উচ্চতা এবং ওজনের স্তম্ভ থেকে বোঝা যায় যে লম্বা ছেলেরা একটু বেশী ভারী। অর্থাৎ উচ্চতার সঙ্গে ওজনের কিছু ধনাত্মক সহ পরিবর্তনের সম্বন্ধ আছে। উচ্চতা বা x এর মীন হচ্ছে 69 ইঞ্চি, ওজন বা y স্তম্ভের মীন হচ্ছে 170 lbs, x এর standard deviation বা σ হচ্ছে 2·24 in, এবং y এর σ হচ্ছে 13·69 lb ; উভয় দলের মীন বিচ্যুতিকে গুণ করে মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করলেই সাধারণতঃ সহপরিবর্তনের একটি মাপ পাওয়া যায়। কিন্তু মীন বিচ্যুতিগুলির এককের পার্থক্য অনেক সময় সহপরিবর্তনের নির্ভুল হিসাবে বাধা ঘটায়। এজন্য standard deviation বার করে প্রত্যেক মীন বিচ্যুতিকে তার সিগমা দিয়ে ভাগ করে standard score বা Z-scores বার করে নিতে হবে। দুই দলের standard score এর পরস্পর গুণ ফলকে যোগ করে তাকে N দিয়ে ভাগ করলে যে Ratio পাওয়া যায়, তাই হল Product moment co-efficient of correlation.*

Standard score এ পরিণত না করে শুধু মীনবিচ্যুতির উপর নির্ভর করে সহপরিবর্তনের ratio বার করলে এককের ভিন্নতার দরুণ ঐ ratio ভিন্ন রকমের হতে পারে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক্। চৌদ্দ নং উদাহরণের পাঁচটি ছেলের উচ্চতা এবং ওজন এবার centimeter এবং kilogram এর মাপে প্রকাশ করে 'r' হিসাব করা যাক্।

---

*মীন বিচ্যুতির যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় 'moment' ; যখন x এবং y উভয় মীনবিচ্যুতিকে পরস্পর গুণ করে তার যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করা হয়, তখন 'product-moment' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ছাত্র	উচ্চতা	ওজন						
	cm	kg	x	y	xy	$\frac{x}{\sigma_x}$	$\frac{y}{\sigma_y}$	$\left(\frac{x}{\sigma_x}\cdot\frac{y}{\sigma_y}\right)$
	X	Y						
ক	183	77	8	0	0	1·43	·00	·00
খ	175	75	0	−2	0	·00	−·32	·00
গ	168	68	−7	−9	63	−1·25	−1·43	1·79
ঘ	178	82	3	5	15	·53	·80	·42
ঙ	173	84	−2	7	−14	−·36	1·11	−·40
					64			1·81

15 নং উদাহরণ

MX = 175 cms $\sigma_x = 5{\cdot}61$ cms

MY = 77 gs $\sigma_y = 6{\cdot}30$ kg

$$\text{correlation} = \frac{\Sigma\left(\frac{x}{\sigma_x}\cdot\frac{y}{\sigma_y}\right)}{N} = \frac{1{\cdot}81}{5} = {\cdot}36$$

এখানে xy স্তম্ভের যোগফল হচ্ছে 64, এবং পূর্বোক্ত উদাহরণে xy এর যোগফল ছিল 55, অর্থাৎ পার্থক্য হচ্ছে 9; কিন্তু মীনবিচ্যুতি যখন Standard score এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাদের পরস্পর গুণফলকে যোগ করে N দিয়ে ভাগ করে Ratio উভয় উদাহরণেই হচ্ছে ·36। অতএব দেখা যায় যে

$$\frac{\Sigma\left(\frac{x}{\sigma_x}\cdot\frac{y}{\sigma_y}\right)}{N}$$

সূত্রটি সহপরিবর্তনের যে অনুপাতকে প্রকাশ করে তা' স্কোরের এককের উপর নির্ভরশীল নহে। এই Ratio কে যখন নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা

হয়, $\frac{\sum xy}{N\sigma_x\sigma_y}$, ইহাকেই বলা হয় '$r$' অথবা **Product moment co-efficient of correlation**. *

The scatter diagram and the correlation table.

যখন N খুব বড় হয়, একটি diagram বা চার্ট করে সমস্ত data সাজিয়ে নিয়ে তারপর assumed mean থেকে বিচ্যুতি হিসাব করে নিলে 'r' বার করা সহজ হয়। একে বলা হয় 'Scatter diagram' বা 'Scatter gram'। নীচে একশ কুড়িজন কলেজের ছাত্রের একটি scatter diagram দেওয়া গেল।

Weight in Pounds (X-Variable)

Height in Inches (Y-Variable)	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	f_y	M_{wt}
72-73								1	1	174.5
70-71			1	3	3	4	2	3	16	152.0
68-69			4	11	6	3	2	2	28	142.4
66-67		2	9	11	8	2	1		33	135.1
64-65	1	5	7	10	3				26	128.0
62-63	1	2	7	1	2				13	125.3
60-61	1	1		1					3	117.8
f_x	3	10	28	37	22	9	5	6	120	
M_{ht}	62.5	64.1	65.4	66.6	67.0	68.9	68.9	70.2		

চিত্রসংখ্যা 16

* Co-efficient of correlation বা 'r' কে অনেক সময় "Pearson r" বলা হয় অধ্যাপক কার্ল পীয়ার্সনের নামানুসারে, কারণ তিনি Product moment mothod টির আংকিক ভিত্তি উন্নততর করে তোলেন।

Scatter diagram তৈরী করার পদ্ধতি :—

(১) এ চার্টের বাঁ দিকে নীচ থেকে উপরে উচ্চতার ডিষ্ট্রিবিউশন ও শ্রেণী-ব্যবধান দেখান হয়েছে, এবং চার্টের উপরে বাঁ দিক থেকে ডাইনে ওজনের ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশন ও শ্রেণীব্যবধান দেখান হয়েছে। উচ্চতা ইঞ্চির মাপে এবং ওজন পাউণ্ডের মাপে দেখান হয়েছে।

(২) **Tallies :**—প্রত্যেকটি ছাত্রকে ঐ চার্টে দেখান হয়েছে, তার ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী। একজন ছাত্রের ওজন যদি 150 lb এবং উচ্চতা 69″ হয়, তাহলে ওজন অনুযায়ী বাঁ দিক থেকে ষষ্ঠ ঘরে তার স্থান, এবং উচ্চতা অনুযায়ী উপর হতে তৃতীয় ঘরে তার স্থান। সুতরাং ষষ্ঠ স্তম্ভের তৃতীয় খোপে একটি 'tally' বা দাগ পড়বে। সর্বসমেত এই খোপে তিনটী ট্যালি আছে, তার মানে, তিনজন লোকের উচ্চতা 68-69 ইঞ্চির মধ্যে, ও ওজন 150-159 পাউণ্ডের মধ্যে। এইভাবে প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী একটী করে tally দিয়ে scattergramটি তৈরী করা হয়েছে।

ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী প্রত্যেক স্তম্ভের total বার করতে হবে, এবং তাদের Grand total হবে N এর সমান। এখানে f_x হচ্ছে ওজন অনুযায়ী প্রত্যেক স্তম্ভের যোগফল, এবং f_y হচ্ছে উচ্চতা অনুযায়ী প্রত্যেক স্তম্ভের যোগফল, এবং f_x ও f_y এর Grand total হচ্ছে 120.

Scattergram থেকে 'r' বার করার পদ্ধতি :—

(১) এখন এই scattergramটি থেকে একটি correlation table তৈরী করা যাক্। পরবর্তী পৃষ্ঠায় টেবলটি দেওয়া গেল (১৬নং উদাহরণ)।

(২) f_y স্তম্ভে উচ্চতার বন্টন দেওয়া আছে। উচ্চতার assumed mean বার করে যে শ্রেণীতে assumed mean পড়ে, সেই শ্রেণীতে দু'বার রেখা টেনে লাইনগুলি স্পষ্টতর করে তুলতে হবে। এখানে মীন হল 66·5 in. এবং শ্রেণীব্যবধান 66 67এ পড়েছে।

অনুরূপ ভাবে f_x সারিতে ওজনের বন্টন দেখান হয়েছে এবং assumed mean যে শ্রেণী ব্যবধানে পড়েছে, সেই শ্রেণীতে দু'বার রেখা টেনে দিয়ে আলাদা করতে হবে। এখানে AM হচ্ছে 134·5lb, 130 – 139 শ্রেণীর মধ্যবিন্দু।

Weight in Pounds (X-Variable)

Height in Inches (Y-Variable)

	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	fy	y'	fy'	fy'^2	$\Sigma x'y'$ +	$\Sigma x'y'$ −	$\Sigma x'$	$\Sigma x'y'$
72-73								$_{12}1^{(12)}$	1	3	3	9	12		4	12
70-71			$_{-2}1^{(-2)}$	$_{0}3^{0}$	$_{6}3^{(2)}$	$_{16}4^{(4)}$	$_{12}2^{(6)}$	$_{24}3^{(8)}$	16	2	32	64	58	2	28	56
68-69			$_{-4}4^{(-1)}$	$_{0}11^{0}$	$_{6}6^{(1)}$	$_{6}3^{(2)}$	$_{6}2^{(3)}$	$_{8}2^{(4)}$	28	1	28 (63)	28	26	4	22	22
66-67		$_{0}2^{0}$	$_{0}9^{0}$	$_{0}11^{0}$	$_{0}8^{0}$	$_{0}2^{0}$	$_{0}1^{0}$		33	0					2	0
64-65	$_{6}1^{(3)}$	$_{10}5^{(2)}$	$_{7}7^{(1)}$	$_{0}10^{0}$	$_{-3}3^{(-1)}$				26	-1	-26	26	20	3	-17	17
62-63	$_{6}1^{(6)}$	$_{8}2^{(4)}$	$_{14}7^{(2)}$	$_{0}1^{0}$	$_{-4}2^{(-2)}$				13	-2	-26	52	28	4	-12	24
60-61	$_{9}1^{(9)}$	$_{6}1^{(6)}$		$_{0}1^{0}$					3	-3	-9 (-61)	27	15		-5	15
fx	3	10	28	37	22	9	5	6	120		2	206	159	-13 (146)	22	146
x'	-3	-2	-1	0	1	2	3	4								
fx'	-9	-20	-28 (-57)		22	18	15	24 (79)	=22							
fx'^2	27	40	28		22	36	45	96	=294							
$\Sigma y'$	-6	-12	-15	2	5	11	6	11	=2							
$\Sigma x'y'$	18	24	15	0	5	22	18	44	=146							

check check check

$c_y = \frac{2}{120} = .02$ $\qquad c_x = \frac{22}{120} = .18$

$c_y^2 = .0004$ $\qquad c_x^2 = .0324$

$\sigma_y = \sqrt{\frac{206}{120} - .0004} \times 2 = 1.31 \times 2 = 2.62$

$\sigma_y = \sqrt{\frac{294}{120} - .0324} \times 10 = 1.554 \times 10 = 15.54$

$r = \dfrac{\frac{146}{120} - .02 \times .18}{1.31 \times 1.55}$

$r = .60$

$PE_r = \dfrac{.6745\,(1 - .60^2)}{\sqrt{120}} = .04$

(৩) AM থেকে মীনবিচ্যুতি হিসাব করে x' এবং y' সারি বার করতে হবে। তারপর $f_{y'}$ এবং $f_{y'^2}$ সারি, $f_{x'}$ এবং $f_{x'^2}$ সারি বার করতে হবে। ($f_y \times y' = f_{y'}$, $f_{y'} \times y' = f_{y'^2}$; $f_x \times x' = fx'$; $f_{x'} \times x' = f_{x'^2}$)। প্রত্যেক সারির যোগফল বার করতে হবে।

(৪) এরপর AM এর শুদ্ধি বার করতে হবে। f_x' থেকে C_x এবং f_y' থেকে C_y (correction in units of interval) বার করতে হবে।

(৫) $f_x'^2$ এবং $f_y'^2$ থেকে standard deviation বা σ_x এবং σ_y বার করতে হবে। এখানে $\sigma_x = 15.54$lb, এবং $\sigma_x = 2.62''$ inch,

(৬) এখন চার্টের ডানদিকে $\sum x'y'$ সারিটি বার করতে হবে। যেহেতু x' এবং y' এর গুণফল + বা − হতে পারে; এজন্য দুই সারিতে গুণফল দিয়ে পরে যোগ করা হল। যোগফল হয়েছে 159 − 13 = 146*

(৭) Checks—$\sum x'y'$ এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে হলে বিচ্যুতির গুণফল এবং সারির বদলে স্তম্ভ অনুযায়ী যোগ করে দেখতে হয়। চার্টটির নীচে $\sum y'$ এবং $\sum x'y'$ সারিতে এই পদ্ধতি দেখান হয়েছে। অপর দুটি check হল f_y' হবে $\sum y'$ এর সমান, এবং f_x' হবে $\sum x'$ এর সমান।

(৮) $\sum x'y'$ স্তম্ভের হিসাব হলে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে 'r' বার করা যাবে।

$$r = \frac{\frac{\sum x'y'}{N} - c_x c_y}{\sigma_x \sigma_y}$$

এখানে $x'y' = 146$; $c_y = 02$; $c_x = \cdot 18$; $\sigma_y = 1\cdot 31$; $\sigma_x = 1\cdot 55$; এবং N = 120 ; তাহলে উপরের সূত্র অনুযায়ী r হল ·60।

---

* The reader should bear in mind in calculating x'y''s that the product deviations of all entries in the cells in the first and third quadrants of the table are positive, while the product deviations of all entries in the second and fourth quadrants are negative. It should be remembered too, that all entries either in the column headed by the AM_x or the row headed by the AM_y have zero product deviations, since in the one case the x' and in the other y' equals zero."—Garrett.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ব্যক্তির বিকাশ

দু বছরের শিশু যখন দশ বছরের হবে তখন সে একই ব্যক্তি থাকলেও, অনেকটাই বদলেছে। তার শরীরটা বেড়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, কুশলতা বেড়েছে ; নানা অভ্যাস সে আয়ত্ত করেছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা রুচি অনেকটা স্পষ্টতর রূপ পেয়েছে। এই যে দেহে মনে বাড়া, পরিবর্তিত হওয়া, একটা বিশেষ গড়ন বা মেজাজের প্রবণতার দিকে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন, একেই আমরা বলি ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিশুর দেহ, মন, বৃত্তি, রুচি ইচ্ছার ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধতার যে লক্ষণ দেখা যায়, তাই হল তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। সে একটি পৃথক বিশিষ্ট সত্তা হিসাবে বেড়ে উঠেছে। একই বয়সের দুটি ছেলে কিন্তু মোটামুটি একই অবস্থায় তাদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ায় প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়।[১] ব্যক্তির দৈহিক-মানসিক, গঠন তার ভয়, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ, তার চিন্তা, আগ্রহ, ক্রিয়ার নির্দিষ্ট অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। কোন এক ব্যক্তির শক্তি সম্ভাবনা, ভাল মন্দের সামগ্রিক যে রূপ তার নানা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাকে আমরা বলি তার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব যার জন্যে অন্য সকলের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও সে পৃথক।[২]

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর সব শিক্ষাবিদ্ একই ভাবে দেন না। কিন্তু সকলেই একমত যে, সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা শিক্ষকের একটি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এ কথা তা'হলে মেনে নেওয়া হয় যে

---

১ Indeed personality has been defined as the characteristics that lead people of similar intelligence and knowledge, when placed in similar circumstances to react in different ways-Wallon-LaVie Mentale.

২ It is the totality of his being. It includes his physical, mental, emotional and temperamental make-up and how it shows itself in behaviour. It is "the pattern developed by the integrated functioning all traits and characteristics of an individual."—Cruze

মানুষ নানা ক্ষমতা ও প্রবণতা নিয়ে জন্মায়, সেই শক্তি, বৃত্তি, প্রবণতা স্বভাবতঃই বয়সের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়—কিন্তু এদের শাসন ও সামঞ্জস্য বিধান শিক্ষাসাপেক্ষ। কি ভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন এবং কখনো কখনো বিপরীত শক্তি, বৃত্তি, প্রবণতাকে একটি সুসমঞ্জস, কল্যাণ-উদ্দেশ্য-অভিমুখী সবল ঐক্যে পরিণত করা যায় এর কৌশল যিনি জেনেছেন তিনিই সুশিক্ষক। সমস্ত শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য এই আদর্শ ঐক্যের দিকে ব্যক্তিকে অগ্রসর করে দেওয়া।

শিক্ষকের কাছে তাই এই সব প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: ব্যক্তিত্বের উপাদান কি? এর কতখানি অংশ বংশগত, কতটাই বা পরিবেশগত? ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি কি? কি করে ব্যক্তিত্বের অবাঞ্ছিত লক্ষণগুলি শাসন-দমন করা যায়? কি করে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলির সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? ব্যক্তিত্বের বিকার কি কি প্রকারের? কি করেই বা তাদের চিকিৎসা বা সংশোধন করা যেতে পারে? ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রশ্নগুলির সর্ববাদীসম্মত উত্তর পাওয়া যাবে না এবং এগুলির চূড়ান্ত উত্তর দেবার সময় এখনও আসে নি। তবে এ প্রশ্নগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলছে, তার থেকে নিজেদের যুক্তিবিচার দিয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর আমাদের বেছে নিতে হবে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ কিভাবে ঘটে? সমস্ত প্রাণী জন্মকালে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মূলধন নিয়েই আসে। সে প্রবৃত্তিগুলি কি তা আমরা আলোচনা করেছি। প্রথম অবস্থায় এ প্রবৃত্তিগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও অন্ধ। কিন্তু যতই ব্যক্তি বিকশিত হতে থাকে ততই প্রবৃত্তিগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সুসংহত হয়। যেমন জন্মের পরে কিছুদিন পর্যন্ত মাকে কেন্দ্র করে শিশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, রাগ, আনন্দ, ভাললাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি প্রবৃত্তি (instincts), প্রক্ষোভ (emotions) ইত্যাদি আবর্তিত হয়। মাতৃভক্তি রূপ রস বা ভাব (sentiments) শিশুর প্রবৃত্তি ও আবেগের বিশৃঙ্খলার বহুত্ব ও বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিধান করে। এরই নাম ব্যক্তিত্বের বিকাশ। পশুদের জীবনে এটা ঘটে না। যতই বয়স ও বুদ্ধি পরিণত হয় ততই মূর্তব্যক্তি বা বস্তু (মা, খাদ্য ইত্যাদি)-কে অতিক্রম করে প্রবৃত্তি, আবেগ, ইচ্ছা কর্ম, বিমূর্ত ভাব বা রস বা আদর্শ দ্বারা সংহত হয়, পরিচালিত হয়। মাতৃভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদি হচ্ছে এমন সব ভাবকেন্দ্র।

আবার দেশপ্রেম, জ্ঞানস্পৃহা ইত্যাদি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষণ-সূচক বিমূর্ত ভাব বা আদর্শ। যতই ব্যক্তির প্রবৃত্তিগুলি মূর্ত ও বিচ্ছিন্ন বিশেষ বস্তুকে অতিক্রম করে ভাব বা আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ততই আমরা বলি ব্যক্তিত্বের উচ্চতর বিকাশ ঘটেছে। প্রাণীর জৈবশক্তিগুলি সম্বন্ধে যেমন, মানসজীবন সম্পর্কেও তেমনি, ক্রমবিকাশের মৌলিক সূত্রটি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা থেকে সমগ্রতায় বা সংহতিতে, অবিভক্ত সরলতা থেকে জটিল বিভক্ততায়, মূর্ত ও বিশেষ থেকে বিমূর্ত ও সামান্যে উত্তরণ—The law of evolution in the physical as also the mental sphere follows the same pattern : a progress from separateness to unity and organisation ; from simple undifferentiated homogeneity to complex heterogeneity, from the particular and the concrete, to the abstract and the general.

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ সুসংহত নয়। এক একটি উত্তেজনা অন্ধ ও যান্ত্রিকভাবে ক্ষণিক প্রবৃত্তি তৃপ্তির পশ্চাতে ধাবিত হয়। এই ইচ্ছা, আবেগ প্রবৃত্তিগুলি প্রত্যেকেই যেন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধাক্কা দিয়ে ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। সাধারণ মানুষকে তাই আমরা বলি প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ক্রিয়াও পশুর ক্রিয়ার মতো সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। তার জীবনেও বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি ভাবকেন্দ্র তার ইচ্ছা-আবেগ-কর্মকে সংহত করে।* সে কখনও সন্তানের প্রতি বাৎসল্য, কখনও অর্থলালসা, কখনো বা যশোলিপ্সা থেকে তার আবেগ, ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যাঁরা মহৎ ব্যক্তি, যাঁরা বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ—তাঁদের জীবনে ভাবকেন্দ্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিগত সম্পর্কে যুক্ত—তাদের জীবন কতকগুলি উদার ভাবাদর্শদ্বারা সচেষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই যে সমস্ত চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা, কর্মকে উচ্চভাবাদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস, একেই বলা হয় চরিত্রগঠন। এমন মানুষদের ব্যক্তিত্বই সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্যক্তিত্বের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ আকস্মিক নয়। এর পেছনে থাকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গঠন। বহুদিনের বিচার, চেষ্টা ও অনুশীলনের ফলেই ব্যক্তি স্পষ্ট করে কতকগুলি আদর্শকে মূল্যবান্ বলে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়। ব্যক্তিত্বগঠন তাই

---

* Ryburn- Introduction to Educational Psychology. p. 86

শুধু বংশগতি ও যান্ত্রিক অনুকরণের ফল নয়—তা শিক্ষা, বিচার, চেষ্টা, ও দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফল।

এটা অবশ্যই সত্য, ব্যক্তিত্বগঠন ব্যক্তির নিজস্ব একক চেষ্টার ফল নয়। ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ, তার শিক্ষা, পিতা, মাতা, শিক্ষক ও বন্ধুজনের উপদেশ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত—তার দৃষ্টিভঙ্গী, তার রুচি ও জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করে, তা গঠন করতে সহায়ক হয়। ব্যক্তির জীবনে তার সমাজ পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাব ঠিক কতটা তা নিয়ে মতভেদ আছে; কেউ বলবেন, পরিবেশ ও শিক্ষাই ব্যক্তিকে গঠন করে—অনুকূল পরিবেশই সৎ, সুস্থ, বুদ্ধিমান্ কুশলী মানুষ সৃষ্টি করে। পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার না করেও একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে এ বিষয়ে বংশগতির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। দূষিত বা দুর্বল বংশগতি নিয়ে যে ছেলে জন্মেছে—অনুকূল পরিবেশে এবং সযত্ন শিক্ষা দিয়ে তার প্রভূত উন্নতি অবশ্যই ঘটানো যাবে, কিন্তু এমন ছেলে প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক, শক্তিধর ক্রীড়াবিদ্, কুশলী যন্ত্রকর্মী এবং নমস্য চরিত্রবান্ মহাপুরুষে পরিণত হবে না। যে সম্ভাবনা নিয়ে কোন শিশু জন্মেছে তারই শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে যিনি সমর্থ হবেন তিনিই সুশিক্ষক।

ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ বুদ্ধি-আবেগ-উদ্যমের সংহতি করণে—

শুধু মাত্র প্রবৃত্তির সংহতিই ব্যক্তির বিকাশের লক্ষণ নয়। মানুষের জীবন পশুর জীবন থেকে উন্নততর এবং জটিলতর। মানুষের মানসজীবনকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান উপাদানে ভাগ করা হয়—বুদ্ধি, আবেগ ও উদ্যম (thinking, feeling & willing)।

এই তিনটি উপাদান একদিকে যেমন পরস্পর-বিরোধী, তেমনি এরা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত এবং পরস্পরের সহযোগী। প্রত্যেক মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়ায় এই তিন উপাদানই বিভিন্ন অনুপাতে উপস্থিত থাকে।

ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির এই তিন উপাদানই সমান্তরাল রেখায় বিকাশ লাভ করে।

তা ছাড়া প্রবৃত্তিগুলির বেলায় যেমন, তেমন এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বেলায়ও আমরা দেখি, প্রথম অবস্থায় এই প্রক্রিয়াগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট, পরস্পরবিরোধী। ক্রমে ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে প্রক্রিয়াগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত ও সুসংহত হয়। প্রথম অবস্থায় সেগুলি থাকে সরল ও অস্পষ্ট, ক্রমে তারা হয়

জটিল, বহু বিভক্ত এবং সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যাভিমুখী। প্রথম অবস্থায় প্রক্রিয়াগুলির বস্তু থাকে বিশেষ ও মূর্ত (particular & concrete) কিন্তু মানসজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গতি হয় সামান্যের (universal) এবং বিমূর্তের (abstract) দিকে।

উদাহরণ দিয়ে বিকাশের এই ধারা বা মূলসূত্র বুঝতে সুবিধা হবে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা দেখি—শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ইন্দ্রিয়গুলির কাছে বিভিন্ন উদ্দীপক (stimuli যেমন, আলো, শব্দ, উত্তাপ ইত্যাদি) এসে পৌঁছায়। সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে শিশুর বোধের দ্বারে এসে নাড়া দেয়। এইগুলিকে বলা হয় সংবেদন (Sensations)। কিন্তু ক্রমেই এই বিচ্ছিন্ন বোধগুলি পরস্পরযুক্ত হয়ে শিশুর কাছে স্পষ্ট অর্থবোধক (significant) হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন অস্পষ্ট বোধের জটাজালের মধ্য থেকে সে এক একটি বিশেষ মুহূর্তে কয়েকটিকে মাত্র বেছে নিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগ আবদ্ধ করে—বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাধান করে,' তাদের সুসংবদ্ধ করে। এই উন্নততর বোধের অবস্থাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ (Perception)। শিশু পৃথক পৃথক ভাবে চোখ দিয়ে লাল রং দেখছে, নাসিকার সাহায্যে একটি সুগন্ধ পাচ্ছে, জিহ্বা দিয়ে আস্বাদন করে জানছে তা মিষ্ট, হাতে নিয়ে বুঝতে পাচ্ছে তার ভার (weight)। কিন্তু এই সমস্ত সংবেদনগুলিকে মিলিয়ে শিশু যখন জানলো এটি আপেল ফল—তখন তার বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলি একটি সংহত প্রত্যক্ষণে পরিণত হোল।

তেমনি আবেগের ক্ষেত্রেও প্রথম থাকে অস্পষ্ট ভাল-মন্দ লাগার অনুভূতি; ক্রমে তা বিশেষ ব্যক্তি দ্রব্য ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে—রাগ, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি প্রক্ষোভে পরিণত হয়। ক্রমে তা কতকগুলি বিমূর্ত ভাব বা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় (যেমন দেশপ্রেম, সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যানুরাগ) উন্নীত হয়। যা ছিল অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন তা হয় সংহত ও বিচ্ছিন্ন; যা ছিল অন্ধ, তা হয় সচেতন উদ্দেশ্যাভিমুখী ও যা ছিল বিশেষ ও মূর্ত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত, তার উন্নয়ন ঘটে বিমূর্ত, সার্বিক (universal) ভাব বা আদর্শে।

উদ্যমের ক্ষেত্রেও একই কথা। শিশুর প্রথম ক্রিয়াগুলি বিশৃংখল, অসংবদ্ধ, অন্ধ—কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী তারা নয় যেমন, একেবারে ছোট শিশু নিতান্ত এলোমেলো ভাবে হাত পা নাড়ে, হাসে কাঁদে। এগুলি হচ্ছে অন্ধ

বিশৃংখল ক্রিয়া (random actions)। আর একটু পরিণত হলে বিশেষ কোন উত্তেজক উপস্থিত হ'লে দেখা দেয়, শিশুর তৎক্ষণাৎ কতগুলি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া, যেমন পায়ের চেটোতে সুড়্‌সুড়ি দিলে সে পা সরিয়ে নেয়—কড়া আলো হঠাৎ চোখে পড়লে সে চোখ বুজে ফেলে ইত্যাদি। প্রবৃত্তিগুলিও তেমনি কিছুটা পরিণতি সাপেক্ষ—শিশুর লাল বল কেড়ে নিলে সে রাগ করবে। ক্রমে তার ক্রিয়া সচেতন ইচ্ছা দ্বারা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যাভিমুখে পরিচালিত হয়।

সুতরাং ব্যক্তির বিকাশের মূল সূত্রটি সর্বত্রই এক—সরল থেকে জটিলে, অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায়—বিচ্ছিন্নতা থেকে সংহতিতে—বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে অগ্রগমন।

শুধু তাই নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনই ঘটে, যখন বুদ্ধি-আবেগ-উদ্যম সমস্ত মানস ক্রিয়া সচেতন ইচ্ছা দ্বারা বিচারলব্ধ উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রসরণে অভ্যস্ত হয়।[৪]

---

৪ Self is known not merely as intelligence but also as Power. Personality thus involves self-conscious being, self-regulated intelligence and self-determined activity. Calderwood. Nature of the self. P. 241

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা

জন্মের মুহূর্তের পূর্বে থেকেই শিশুর শিক্ষা সুরু হয়। দার্শনিক লক্ বলেছিলেন, জন্মকালে শিশুর মন হচ্ছে অলেখা শ্লেটের মত—tabula rasa —তাতে কোন অভিজ্ঞতার দাগ পড়েনি। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানী বা মনোবিদ্ কিন্তু এ কথা সত্য বলে মনে করেন না। জন্ম মুহূর্তের বহু পূর্বে মাতৃগর্ভেই তার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ সুরু হয়ে গেছে। এ কথাও মনে করা ভুল যে, শিশুর মন হচ্ছে 'নরম কাদা' তাকে যেমন খুসী করে গড়ে তোলা যায়!

জন্ম মুহূর্তের পূর্বেই শিক্ষা শুরু—

মায়ের পেটে আসবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর অভিজ্ঞতা সুরু হয়ে যায়—তার বহু প্রমাণ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভ সঞ্চারের তিন সপ্তাহ পরেই ভ্রূণের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার বহু পূর্বেই, শিশু ভ্রূণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও খাদ্যপরিপাক করবার সঙ্গে সংযুক্ত শারীরক্রিয়াগুলি প্রস্তুত হয়ে থাকে।[১] মাতৃগর্ভে তিন মাসের পর থেকে ভবিষ্যৎ শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের সহগামী কিছু কিছু ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় (movements of the skeletal muscles)। যে সমস্ত পেশী দ্বারা এসব অঙ্গ সঞ্চালন হয়, সেগুলি নিম্ন মস্তিষ্ক অথবা মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ু কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত। ভ্রূণের অপরিণত মস্তিষ্কে এই কেন্দ্রগুলি কিছুটা বিকাশলাভ তখনই করেছে। অবশ্য গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) কেন্দ্রগুলির বিকাশ আরো সময় সাপেক্ষ। এমন কি, শিশুর জন্ম মাত্রই তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না—জন্মের বহুদিন পর পর্যন্তও এই শারীর ও স্নায়বিক মণ্ডলীর বিকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের পরিপক্কতা চলতে থাকে। এবং এটা লক্ষণীয় যে,

---

১ Carmichael-(ed) Manual of Child Psychology—Ch. The Onset and Early Development of Behaviour. Pp 43—166.

দেহের ও মস্তিকের সমস্ত অংশের সমান পরিণতি বা বিকাশ একসঙ্গে ঘটে না। প্রথম দিকে, এই পরিণতি অতি দ্রুত গতিতে চলতে থাকে—যৌবনাগমে এই পরিণতি ক্রমশঃ মন্থর হয়; মধ্য বয়সে এই বিকাশের একটা স্থিতাবস্থা আসে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পেশী ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ক্রমশঃ তাদের নমনীয়তা ও বিকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে।[২]

জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরেও ব্যবহারের বিকাশের কয়েকটি সাধারণ সূত্র লক্ষণীয়—

(১) প্রথম অবস্থায় ব্যবহার (behaviour) বা প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে অস্পষ্ট এবং সমগ্র দেহে ছড়ানো। যেমন শিশুর জন্মের পর অল্প কিছুদিন তার পায়ে চিমটি কাটলে, সমগ্র দেহেই বিশৃঙ্খল সাড়া জাগে; ক্রমেই এই প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতর হতে থাকে এবং প্রতিক্রিয়াটি বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পায়ে চিমটি কাটলে, শিশু তখন সেই পা-টিই সরিয়ে নেয়, তার সমগ্র দেহে অস্বস্তির চাঞ্চল্য দেখা দেয় না। শিশুর জন্মকালের অল্পদিনের মধ্যেই তার দেহের বিভিন্ন স্থানে পিনের খোঁচা দিয়ে এ তথ্যটি পরীক্ষার নির্ভুল ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানী স্থাপিত করছেন।[৩]

(২) যতই শিশুর বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই তার দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ বিশেষ বিশেষ এক একটি ক্রিয়ার সমর্থ হয়। শিশুর জন্মের প্রথম এক মাসের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর আলাদা আলাদা ক্রিয়া দেখা যায় না। ও দুটো আলাদা আলাদা তো নাড়তে পারেইনা, এমন কি, আঙ্গুল দুটো যখন একসঙ্গে নাড়ে, তখনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হাতটাই নাড়ে। ক্রমে যখন তার কয়েক মাস বয়স হয়, তখনই সে এই দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে ছোট কোন জিনিষ আলাদা করে তুলতে শেখে এবং দুটি আঙ্গুল পৃথক পৃথক নাড়তে শেখে।[৪] পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যেকটি হাতের আঙ্গুল আলাদা আলাদা নাড়তে শেখে কিন্তু এমন ব্যক্তিও দীর্ঘকাল শিক্ষা ব্যতিরেকে কনিষ্ঠা এবং অনামিকাকে আলাদা

২। Conel—The Cortex of the New born—Ch. The post-natal development of the Human Cerebral Cortex. pp. 23—45.

৩। Mc Graw—Child Development : Ch XII. yp 31-32.

৪। Coghill—Anatomy & the problem of behaviour. J. of Geneg Psy. 1936-48. pp. 3—19.

আলাদা নাড়াতে পারে না। এই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়া তাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—"individuation"।

দেহের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার গতি সম্বন্ধে দুটি সাধারণ ধারা লক্ষ্য করা যায়—(১) এই গতি মাথার দিক থেকে, মেরুদণ্ডের নীচের দিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের হাতের অস্ফুট কোরক অবস্থা, পায়ের অস্ফুট কোরকের পূর্বে দেখা দেয়। জন্মকালে শিশুর মাথাটী থাকে শরীরের তুলনায় অনেক বড়। শিশু প্রথমে হাতের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। পা দিয়ে হাঁটতে শেখে সে প্রায় এক বছর বয়স হলে।[৫]

দেহের গঠন ও ব্যবহারের বিকাশের আর একটী সাধারণ সূত্র হচ্ছে যে দেহের মূল কাণ্ডের বিকাশ এবং তার ক্রিয়া প্রথম দিকে দ্রুততর অগ্রসর হয়—কাণ্ড থেকে দূর প্রান্তে অবস্থিত অংশে ক্রমে ক্রমে, কিছু দেরীতে ক্রিয়া দেখা যায়। শিশু বাহুর উর্দ্ধাংশের পেশীগুলি অনেকটা শীঘ্র চালনা করতে শেখে, আঙুলগুলির সঙ্গে যুক্ত পেশীগুলির ব্যবহার অনেকটা পরে করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ বৃহৎ পেশীগুলির গঠন ও ক্রিয়া শিশুর জীবনে প্রথম দিকে যতটা দ্রুত অগ্রসর হয়, ক্ষুদ্র পেশীগুলির গঠন ও ক্রিয়া ততটা দ্রুত অগ্রসর হয় না। সেই জন্যই দেখা যায়, হাত পা নাড়া, দৌড় ইত্যাদি, শিশু যতটা শীঘ্র আয়ত্ত করে, ক্ষুদ্র পেশী সঞ্চালন দ্বারা সূক্ষ্ম যে সব কাজ (যেমন মার্বেল খেলা, সেলাই, অংকন) করা হয়, তা আয়ত্ত হয় কিছুটা দেরীতে।[৬]

শিক্ষকের পক্ষে বিকাশের ধারা ও গতির এই সাধারণ সূত্রগুলি জানা দরকার, কারণ দেহ ও স্নায়ুর বিকাশের ধারার যে ছন্দ, তার সঙ্গে শিক্ষার ছন্দ সমান তালে অগ্রসর হতে হবে। শিশুর দেহ, মস্তিষ্ক ও মন যখন প্রস্তুত হয়নি, তখন শিশুকে জটীল ও কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম।

নব জাতকের 'মানস জীবনের' স্বরূপ—

আমরা আগেই বলেছি, শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার মনটা একেবারে 'সাদা শ্লেট' নয়। জন্মের পরেই তার ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না।

৫। Scammon & Calkins, Development and Growth of the External Dimensions of the Human Body in the Fetal period. P. 267;

৬। Gates, Jersild etc—Educational Psychology. p. 22.

কিন্তু তার চারপাশের পরিবেশ এবং তার দেহাভ্যন্তর থেকেও নানা উত্তেজক তার ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারে যুগপৎ এসে ধাক্কা দিতে থাকে। সুতরাং জন্মের পরে তার অভিজ্ঞতাগুলি নিতান্তই বিশৃংখল, অস্পষ্ট এবং সবটা মিলিয়ে একটা বিষম গোলমেলে অবস্থা। তখন শিশুর প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আলাদা আলাদা করে, নিজ নিজ উত্তেজক বেছে নিতে পারে না এবং বয়স্করা যেমন করে কোন উত্তেজকের (stimuli) উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ায় (response) সমর্থ হয়, শিশুর অপরিণত অথচ সদা বিকাশমান ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তা করতে সমর্থ হয় না। প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ জেমস্ সদ্যোজাত শিশুর মনের এই প্রাথমিক অবস্থা ভারী সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭]

নবজাতকের শিক্ষার লক্ষণ—

জন্মকালে নবজাতকের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরিণত, তাই ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা তার সীমিত। দৃঢ় ও সুসম্বদ্ধ পেশী সঞ্চালন দ্বারা সকল সুশৃংখল ক্রিয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। তার চোখের কথাই ধরা যাক্। প্রথম কয়েক সপ্তাহে কোন দ্রব্যের স্পষ্ট পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব তার চোখে ফোটে না—দুই চোখের দৃষ্টি একই দ্রব্যে আবদ্ধ করতে পারে না—এবং চোখ দিয়ে চলন্ত দ্রব্য অনুসরণ করতেও সে অক্ষম তার পেশীগুলি এখনও নিতান্ত অপরিপুষ্ট, তাই কোন দ্রব্যকে দৃঢ়ভাবে ধরতে, নাড়াচাড়া করতে শিশু পারে না। বিশৃঙ্খল ভাবে সে হাত পা নাড়ে ; বিভিন্ন পেশীর মধ্যে কোন সুশৃঙ্খল সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি, তাই সে হাঁটতে চলতে পারে না, ঘুড়ি ওড়াতে পারে না—লাটিম ঘোরাতে পারে না, মার্বেল খেলতে পারে না। কিন্তু জন্মের পর থেকে তার 'শিক্ষা' দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে থাকে। দিনের পর দিন নবজাতকের ব্যবহার লক্ষ্য করলেই অবাক হয়ে যেতে হয় তার শিক্ষার দ্রুত গতি দেখে। গোড়ার দিকে, ক্ষিধে পেলেই শিশু কাঁদে, ঠাণ্ডা লাগলেও সে কাঁদে, গরম লাগলেও কাঁদে, পিঁপড়ে কামড়ালেও ট্যাঁ ট্যাঁ করে। সব কান্নাই তখন একরকমের। অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় তার একই অবিশেষ প্রতিক্রিয়া (same generalized response) দেখতে পাওয়া। কিন্তু যতই শিশু বড় হতে থাকবে, ততই তার প্রতিক্রিয়া,

---

৭। James opined that the baby assailed by eyes, ears, nose, skin and entrails all at once, feels it all as "one great blooming buzzing confusion". James—Principles of Psychology. Vol. I. p. 488.

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হবে। এমন কি, একটু বড় হলে, শিশুর ক্ষুধার কান্না, আর পেট ব্যথার কান্নার মধ্যেও প্রভেদ, মায়ের কানে ধরা পড়ে। ক্রমেই সে কতগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করে। ক্ষুধার কান্না, আগে মায়ের স্তন মুখে না পেলে থামতো না, এখন মার পায়ের শব্দ পেলেই তা থামে। গোড়াতে খাওয়া ও ঘুমের কোন নির্দিষ্ট সময় শিশুর থাকেনা, কিন্তু ছ'মাস বয়সেই এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট অভ্যাস মোটামুটি গঠিত হয়ে যায়, এটা লক্ষ্য করা যায়।

নবজাতকের ব্যক্তিত্ব গঠন বিষয়ে শিক্ষা—

প্রত্যেক শিশুই কতগুলি বিশিষ্টতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রসূতি সদনে একদিনে যে দশটি শিশু জন্মগ্রহণ করল, তারা একই ঘরে, পাশাপাশি, একই মাপের খাটে শুয়ে থাকলেও, তাদের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য তখন থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এ পার্থক্য শুধুই দৈহিক নয়, মেজাজ (temperament) বুদ্ধি ও চরিত্রেও। কোন শিশু বিষম কাঁদুনে, কোনটা অল্পে বিরক্ত, কোনটা আবার সর্বদাই হাসিখুসী। কিন্তু এটাও ঠিক যে, শিশু জন্মের পর থেকে যে ব্যবহার তার চারপাশের ব্যক্তি বা বস্তুর থেকে পায়, তা দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব শিশুকাল থেকেই প্রভাবিত হয়। যে পরিবারে শিশু সারাদিন কোলে কোলে 'তোলা-তোলা'ই থাকে, সে পরিবারে শিশুরা 'আদুরে দুলাল' হয়ে বেড়ে ওঠে, আর যেখানে গরীবের ঘরে অনাদরে অবহেলায় ছেলে বড় হয়, সেখানে শিশু ছোটকাল থেকেই শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। হয়তো কোন মা শিশুকাল থেকেই জাতককে ঘড়ি ধরে খাওয়ানো শোয়ানো অভ্যাস করাবেন এই রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্তান পালনে রত হলেন। এই কড়া মেজাজের মার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে শিশুর প্রবল কান্না ভিন্ন পথ নেই এবং সম্ভবতঃ এ শিশুর সময়ে অসময়ে হাঁ হাঁ করে কান্নার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাবে। যে মার মেজাজ খিটখিটে, যিনি বদ্‌রাগী, তার ছেলেটাও শিশুকাল থেকে মায়ের ব্যবহার ও চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং ছেলে খুব জেদী হবে। আর শান্ত ঠাণ্ডা ধৈর্যশীলা মার ছেলেটীও বেশ শান্ত ও হাসিখুসী হয়ে গড়ে উঠবে।[৮]

কোন বয়স থেকে শিক্ষার স্মৃতি থাকে ?

শিশু তো জন্ম মুহূর্ত থেকেই (এমন কি, মাতৃগর্ভেও) অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বড় হয়ে আমরা কেউই

৮। Gates & Jersild etc. Educational Psychology. p. 18.

প্রায় ৩ বৎসর বয়সের আগের কথা স্মরণ করতে পারি না।[১] তিন বছর বয়সের কোন কোন ঘটনা আমরা অনেকেই হয়তো অস্পষ্ট ভাবে মনে করতে পারি। তার আগের স্মৃতি আমাদের অবলুপ্ত। কিন্তু তিন বছরের শিশু কতগুলি জিনিষ চিনতে শিখেছে, কিছুটা ভাষা আয়ত্ত করেছে, কোন কোন জিনিষ সে ভালবাসতে, আবার কোন কোন জিনিষকে সে ভয় করতে শিখেছে। অনুকরণ ও শাসনের ফলে সে জেনেছে, কোন কোন কাজ করতে হয়, আবার কোন কোন কাজ করতে নেই। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, যে সময়ের স্মৃতি শিশুর মনে নেই, সে সময়েও শিশু শিখেছে, তার মন সঞ্চয় করেছে, অর্থগ্রহণ করতে সুরু করেছে, মূল্যবোধের পথে অগ্রসর হয়েছে। বড় হয়েও আমাদের অনেক অকারণ ভয়, হাস্যকর ভুল, অদ্ভুত কাজ, সচেতন মনের ব্যবহার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাই সচেতন মনের পিছনে যে মগ্ন-চৈতন্য, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন যে, এই অবচেতনার প্রভাব আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর সামান্য নয়।

বিকাশের দুইটি উপাদান—শিক্ষা ও স্বাভাবিক পরিণতি

শিশু ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনুকরণ ও উপদেশের (এক কথায় শিক্ষা) উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে তা শিশুর স্বাভাবিক পরিণতি (growth) এবং পরিপক্কতার (maturity) উপর। শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং স্নায়ুতন্ত্র বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই অধিকতর সক্রিয় হয়—অধিকতর সু-সামঞ্জস্য লাভ করে। এটা শিক্ষা-নিরপেক্ষ। অবশ্য প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই শিক্ষা এবং স্বাভাবিক পরিণতি একই সঙ্গে চলতে থাকে। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কতটা শিক্ষার উপর নির্ভরশীল আর কতটাই বা স্বাভাবিক পরিণতি-নির্ভর তা বিশ্লেষণ করে সঠিক নির্ধারণ করা অসম্ভব। তথাপি এই দুইটি দিকের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বোঝা কিছু কঠিন নয়। একটি শিশু এক বছর বয়সে যতটা বড় ছিল, পাঁচ বছর বয়সে তার চেয়ে অনেকটাই বড় হবে। এ বড় হতে সে শেখেনি, স্বাভাবিক ভাবেই সে বেড়েছে। অবশ্য খাদ্য এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে যে অভ্যাসগুলি সে আয়ত্ত করেছে, তা কিছু পরিমাণে তার

১। Dudycha & Dudycha—Adolescents' Memories of pre-school experience Journal of Genetic Psychology 1933, 42, pp. 468—'80.

দেহের বাড়'টা প্রভাবিত করে। কিন্তু এ শিক্ষা বা অশিক্ষা তার বেড়ে উঠা'র মূল কারণ নয়, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঠিক তেমনি, তিন বছরের ছেলের যে বুদ্ধি, দশ বছরের ছেলের বুদ্ধি তার চেয়ে বেশী হবেই—তাকে যদি বর্ণ-পরিচয়ও না করানো হয়, তথাপি তার বুদ্ধির বেড়ে যাওয়াটা আটকে রাখা যাবে না। কিন্তু এক ছেলে পাঁচ বছর বয়সে বাংলায় কথাবার্তা বলে, ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে গরম গরম ভাত হাত দিয়ে মুখে তুলে খেতে ভালবাসে আর এক ছেলে একই বয়সে ইংরেজীতে কথা বলে, আর কাঁটা চামচ্ দিয়ে "গোস্ত রোটি" খেতে ভালবাসে, এ প্রভেদ স্পষ্টতঃই শিক্ষা-সাপেক্ষ। এক শিশু বাংলা বলতে শিখেছে, ইলিশ মাছ ভাজা ভালবাসতে শিখেছে, আর এক ছেলে ইংরাজী বলতে শিখেছে—আর কাঁটা চামচের ব্যবহার শিখেছে। অবশ্য ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পেশীর স্বাভাবিক পরিণতি একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় না পৌছলে, কাঁটা বেছে ইলিশ মাছ খেতে, অথবা কাঁটা চামচ ব্যবহার করতে শিশু শিখতো না—কিন্তু এটাও খুবই স্পষ্ট **শিশুর এই ক্ষমতা আপনা থেকেই জন্মেনি—তাকে শেখাতে হয়েছে, তার শিখতে হয়েছে।**

শিক্ষাবিদের কাছে এ কথাগুলি মূল্যবান্। অনেক সময় দেখা যায় মাতা পিতা, শিক্ষক, শিশুকে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিগ্‌গজ্ করে তোলবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কোন কোন মা তিন মাস বয়স থেকেই শিশুকে বিছানার বাইরে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রস্রাব করার অভ্যাস গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই শেখবার চেষ্টা অনেকটাই পণ্ডশ্রম, কারণ ওই শিশু বয়সে মূত্রাশয় শাসনের (bladder control) ক্ষমতা জন্মে না। এর জন্যে কিছুদিন আরো অপেক্ষা করতেই হবে। লেখাপড়া শেখার বিষয়েও, সে রকম, অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দুবছর বয়সেই বই খাতা পেন্সিল নিয়ে পড়া শেখাতে বসলে কিছু লাভ হবে না। মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট স্তরে পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত শিশু শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারবে না।

কোন বিশেষ শিক্ষা বিশেষ একটা বয়স বা পরিণতির যেমন অপেক্ষা রাখে, তেমনি যখন শিশুর দেহ মন একটা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং উন্মুখ হয়ে আছে, তখন সে সুবর্ণ মুহূর্ত বইয়ে দিলেও পরে সে শিক্ষা ততটা সফল বা সুন্দর হয় না। তাই পিতা মাতা শিক্ষককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়—লক্ষ্য করতে হয় শিশু কখন কোন শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিণতি লাভ করেছে। শিক্ষার শুভ মুহূর্তে উপযুক্ত শিক্ষাটি দিলে, তবেই তা শিশুর

পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক এবং আনন্দদায়ক হয় এবং পিতামাতা শিক্ষকের উদ্যমেরও অপচয় ঘটে না। শিক্ষাগ্রহণের জন্তে আগ্রহ শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। তা'র মানসিক আগ্রহ তার জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। কাজেই জোর করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন-তাড়নার মধ্য দিয়েই শিশুকে শেখাতে হয় এ ধারণা শিশু, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রম থেকে উদ্ভূত। ইয়োরোপে আধুনিক যুগের গোড়াতে রুশোই প্রথম খুব জোর দিয়ে একথা বলেন। মানুষের প্রকৃতি যেমন ক্রমবিকাশধর্মী ও গতিশীল, শিক্ষাও তাই হ'তে হবে! তা না হ'লে শিক্ষা নিষ্ফল ও শক্তিক্ষয়কারক হবে। রুশো বলেছিলেন কখন কোন্ জাতীয় শিক্ষা শিশু সর্বোত্তমভাবে গ্রহণ করতে পারবে তার নির্দিষ্ট সময় আছে—আর সে সময়টি হচ্ছে, শিশুর নিজের মধ্যে সেই প্রয়োজনটি যখন দেখা দেবে। রুশোর পর থেকে পেসতালৎসী, ফ্রোয়েবেল, হার্বার্ট স্পেন্সার, মন্তেসরী এবং অধুনাতম শিশু মনোবিজ্ঞানীরাও এবিষয়টি লক্ষ্য করে বলেছেন যে শিশুকে শিক্ষা দিতে হ'লে প্রচুর ধৈর্য চাই, আর চাই শিশুর স্বাভাবিক পরিবর্তন সম্পর্কে সহৃদয় সতর্ক মনোযোগ। লক্ষ্য করতে হবে, শিশু যখন যে শিক্ষা গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়েছে, তখন যেন সে শিক্ষা পেতে পারে। শিক্ষা শিশুর মনোবৃত্তি অনুসরণ করিবে। এবং এও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত যেশিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন যা শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্রিক্ত হয়—তা যেন শিশুর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয়। প্রচলিত শিক্ষা অনেক সময় এই গোড়ার কথাগুলি উপেক্ষা করে বলেই নিষ্ফল হয় এবং বহু অপচয় ও মনস্তাপের কারণ হয়। বুদ্ধিতে রহস্যময় কোন শক্তি নয়—সমস্ত প্রাকৃত শক্তির মত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও নিয়মের অধীন এবং শিশুরবুদ্ধির উন্মেষ ক্রমবিকাশের নিয়ম জানলে তবেই শিক্ষাকে বুদ্ধিবিকাশের কাজে ব্যবহার করা যায়—পিতা মাতা ও শিক্ষক কেহই মনস্তত্ত্বের নিয়মগুলি জানেন না। ফলে শিশুকে তাহার বয়স ও বুদ্ধি বৃত্তিবিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় না। যা শেখবার জন্য শিশুর মন উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে নাই, তাই জোর করে শেখাবার চেষ্টা হয়। যা শিখবার জন্য তাদের মন উন্মুখ হয়ে আছে, তা তাদের শেখানো হয় না। যা শেখানো হয় তা ভুল পদ্ধতিতে শেখানো হয়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শক্তি ও সম্ভাবনার বিরাট অপচয় ঘটে।[১০]

---

১০ Spencer. Education. Intellectual, Moral & Physical. p. 27.

এ আলোচনা থেকে আমরা কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে পারি :

(১) একটা বিশেষ শারীরিক মানসিক বিকাশের স্তরে উপনীত হলে শিশু সহজেই কোন এক জাতীয় কাজ করতে শেখে। তখন তাকে সুষ্ঠুভাবে সে কাজটা করতে শেখানোটাই লাভজনক। একেই বলে ট্রেনিং। সেই বিকাশের স্তরে পৌছবার আগে ট্রেণিং-এ যে বিশেষ কোন লাভ হয় না তা নিম্নলিখিত একটি পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়। দু বৎসর বয়সের কয়েকটি ছেলেকে বোতাম লাগানো এবং কাঁচি দিয়ে কাটা শেখানো গেল। বার সপ্তাহ ট্রেণিং দেওয়ার পর দেখা গেল—আর একদল একই বয়সের শিশু যারা ট্রেণিং পায়নি, তাদের চেয়ে যারা ট্রেণিং পেয়েছে, তারা এই দুই ক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষ। ত্রয়োদশ মাসে এই নূতন দলকেও ট্রেণিং দেওয়া সুরু হল। দেখা গেল, অল্প দিনের মধ্যেই এরা এ দুটি কাজে পূর্বের ট্রেণিংপ্রাপ্ত দলের মতই সমান দক্ষতা অর্জ্জন করেছে। অর্থাৎ আগের দলের ট্রেণিং যথাসময়ের পূর্বে হয়েছে বলেই অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে।[১১]

(২) আবার শিশুর দেহ-মন যখন কোন এক বিশেষ শারীর ক্রিয়ার জন্য পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং প্রস্তুত হয়েছে তখন তাকে সেই শারীর ক্রিয়ার সুযোগ না দিলে পরবর্তীকালে সেই কাজ শিখলেও, শিশু সে কাজে ততটা কুশলতা লাভ করবে না। শিশুরা দুই বৎসরের মধ্যেই বেশ স্বচ্ছন্দে হাঁটতে শেখে—তখন থেকেই তাদের ট্রাইসাইকেলে চড়া সহজে শেখানো যায়। যে ছেলে দু'বছর বয়সে ট্রাইসাইকেল চালাতে শিখলো এবং সে অভ্যাসটি রাখলো সে বড় হয়ে সাইকেল চড়ায় কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে। কিন্তু যে মানুষ শিশুকালে ট্রাইসাইকেল চালাতে শিখলো না, অথবা পরিণত কৈশোরেও সাইকেলে চাপলো না সে যদি ত্রিশ বৎসর বয়সে সাইকেল শিখতে প্রথম সুরু করে তবে তার সময় বেশী লাগবে এবং শেখাটাও তার স্বচ্ছন্দ হবে না। ঠিক একই কথা গাছে চড়া, সাঁতার কাটা ইত্যাদির বেলায়ও খাটবে।[১২]

---

১১ Mc Graw. Growth: A study of Johnny & Jimmy also, Hilgard. Learning and maturation in pre-school children Journal of Genetic psychology, 1932, 41, p. 36.

১২ 3 Gates & Jersild etc. Educational Psychology. p—28

(৩) যখন শিশুর দেহ-মন প্রস্তুত হয়েছে তখনই শিশু সুষ্ঠুভাবে কাজটি স্বচ্ছন্দে করতে পারবে তা নয়। এ ক্রিয়াগুলিতে কুশলতা লাভ অভ্যাস ও সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিশু হাঁটতে শিখেই স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারে না। বেশ কয়েক মাস সে পড়ে পড়ে যাবে, হেলে দুলে হাঁটি হাঁটি পা পা করে টলতে টলতে চলবে (toddling)। ক্রমে সে সিধা হয়ে হাঁটতে শিখবে।

(৪) স্বাভাবিক পরিপক্কতা লাভের পর শিশু স্বেচ্ছায়ই কোন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু তখন উপযুক্ত পরিচালনা পেলে সে কাজটি নির্ভুল ভাবে সুন্দর ভাবে করা শিখবে। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে কোন কিশোর যদি সাঁতারের বা দৌড়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি প্রথম থেকেই আয়ত্ত করে নেয়, তবে ভবিষ্যতে ছেলেটি ভাল সাঁতারু হতে পারবে, অথবা কম আয়াসে অনেক দ্রুত দৌড়তে পারবে। কিন্তু গোড়াতেই যদি ভুল পদ্ধতিতে, নিজের চেষ্টায়, সাঁতার দিতে শেখাটা আরম্ভ করে, তবে ভবিষ্যতে ভুল শোধরানোটা কঠিন হয়। সে জন্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে, গোড়ার ট্রেনিংটা নির্ভুল হওয়া খুব দরকার।

(৫) স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা, শিশু নানা ক্রিয়া এবং মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত করে। এতে সে বিশেষ ক্রিয়াটিই যে শুধু শেখে তা নয়। ভবিষ্যতে এই শেখাটা, অন্য জটিলতর ক্রিয়া শেখার সহায়ক হয়। অনেক সময় বাল্যকালে যে ক্রিয়া কোন এক ভাবে শিশু করতে শেখে, ভবিষ্যতে তার দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের ফলে, সে কাজ একবার কায়দা পাল্টাতে হয়। দু' বছর বয়সে তার ছোট ছোট পা ফাঁক করে শিশুটি চমৎকার রোলারস্কেট্ চালাতে শিখেছিল। মাঝে কয়েক বছর সে আর রোলার স্কেট্ চালায় নি। ছ বছর বয়সে দেখা গেল তার আগের তুলনায় লম্বা লম্বা পা, আগের মত অতটা ফাঁক করে স্কেট চালাতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই কায়দাটার পরিবর্তন করতে হয়। তাই বলে তার আগের শেখাটা নিরর্থক হয়েছিল, তা নয়। আগে শিখেছিল বলে, তার পরে পরিবর্তন করতে শেখাটা বরং সহজ হয়। কিন্তু ভুল পদ্ধতিটা পাকাপোক্ত ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন পরিবর্তন কঠিন হয়।[১৩]

(৬) সাধারণ ভাবে বলা যায় পেশী সঞ্চালন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারে দক্ষতা

---

১৩ Mc Graw. Child Development: Later Development of children specially trained during infancy.

শিক্ষা বাল্যকালে অনেক সহজে শিশু গ্রহণ করতে পারে এবং সম্ভবতঃ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এই শিক্ষার সম্ভাবনা অনেকটা অবহেলিত। শিশুকে আরো নানা রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীর ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া চলে, এবং তা দিলে ভবিষ্যতে যন্ত্র চালনা এবং অন্যান্য অনেক কাজে সে নিপুণতা আরো সহজে আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু আমরা অনেক অল্প বয়সে শিশুদের বিমূর্ত বিষয়ের ধারণা, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান এবং অঙ্ক ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহার শেখাবার জন্যে ব্যস্ত হই। বাস্তবিক পক্ষে শিশুদের মস্তিষ্ক তখনও এ বিষয়গুলি গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করে না—কাজেই শিক্ষার অনেকটাই অপচয় হয়। বরং একটু বেশী বয়সে এ সব শিক্ষা দিলে, শিশু অনেক দ্রুত এ সব জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষকের পরিশ্রমও অনেক কম হয়।

(৭) সমস্ত শিশুর স্বাভাবিক পরিণতির হার সমান নয়—সকলের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও সমান নয়। কিন্তু তথাপি মোটামুটি তাদের দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ক্রম নির্দেশ করা চলে। কোন স্তরের পর কোন স্তর আসবে, তা সব শিশুতেই প্রায় নির্দিষ্ট। কিন্তু এক স্তর অতিক্রম ক'রে অন্য স্তরে পৌঁছতে সব শিশুর ঠিক সমান সময় লাগে না। এতে বোঝা যায়, সব শিশু সমান বুদ্ধি বা শিক্ষাগ্রহণের সমান শক্তি নিয়ে জন্মায় না। শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপরও শিক্ষা গ্রহণ কতটা দ্রুত হবে, তা নির্ভর করে।

(৮) পরিণতির উন্নতির উর্দ্ধগতি একটানা অব্যাহত থাকে তা নয়—অসুস্থতা বা মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি কারণে শিশু কখনও কখনও তার পূর্ব্ব আয়ত্তীকৃত সহজতর ক্রিয়ায় ফিরে যায়। হাঁটতে শিখেও মাঝে মাঝেই শিশু হামাগুড়ি দিয়ে চলে। তবে এই পশ্চাদপসরণ (Regression) সাময়িক। মোটামুটি ভাবে উন্নতির দিকেই বিকাশের গতি।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE.
CALCUTTA-27

ষড়বিংশ অধ্যায়

জীবন পরিক্রমা

স্বভাবের গতিতেই নবজাতক বেড়ে উঠবে। দৈহিক দিক থেকে সে যে বড় হয়ে উঠছে, তা চোখেই দেখা যায়। একমাসের শিশুর দেহের ওজন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের **দৈর্ঘ্য** ও **পুষ্টি**, ইন্দ্রিয়গুলির **ক্ষমতা** যা থাকে—এক বছরের শিশুর সেগুলি সব দিক দিয়েই বেশী—পরিমাণেও বেশী, গুণের দিক দিয়েও উন্নততর। যৌবনাগম পর্যন্ত এই বেড়ে উঠার হার যথেষ্ট দ্রুত—তারপরে হারটি মন্থর হয় —তারপরেই আসে একটা স্থিতাবস্থা। তারপর মধ্য বয়স অতিক্রান্ত হ'লে অবনতি শুরু হয়; দেহের কোষগুলি যত দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে, তত দ্রুত ক্ষয়পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, যদিও মস্তিষ্কের ক্ষমতা হ্রাস অনেক ধীর গতিতে হয়।

এই যে দৈহিক বিকাশ শৈশবে ও বাল্যে তা দ্রুত অব্যাহত গতিতে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকলেও—এই বিকাশের ধারায় কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়। অকস্মাৎ অপোগণ্ড শৈশব থেকে ব্যক্তি রাতারাতি কৈশোরত্ব প্রাপ্তি ঘটে না সত্য কিন্তু,—মাঝে মাঝেই যেন বিকাশের গতির মধ্যে এক একটা বিরতির স্তর আসে। তখন বিকাশের গতি মন্থরতর। আবার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিণতির বেগ সমান নয়—কখনও তা দ্রুত কখনও তা মন্থর।

সাধারণভাবে, বিকাশমান শিশুর জীবনকে (the developing child) কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, ইত্যাদি। এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে একথা মনে রাখা উচিত যে শিশুর জীবনকে ঠিক আলাদা আলাদা কতকগুলি প্রকোষ্ঠে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি না। শুধু মনোবিজ্ঞানী তার তথ্য আহরণের সুবিধার জন্য ও বৃদ্ধির মূল নীতিগুলিকে বুঝাবার সুবিধার জন্য মানুষের জীবন পরিক্রমাকে স্তর-বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগের মূলে কিছু সত্য নেই, তাও নয়। ছয়-সাত বছর বয়স হলে পর শিশুরা, নিশ্চয়ই বোধ করে, যে তারা মা'র কোলের খোকা বা খুকু নয়, তাদেরও একটা পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা আছে, এবং তারা তা দাবী করে। তার পেছনে ফেলে আসা শৈশব থেকে সে একটা আলাদা রকমের, তা' সে বোঝে। বিভিন্ন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তরের (phases) মধ্য দিয়ে শিশুকে যেতে হয়। সে হিসাবে এই শ্রেণীবিভাগগুলি বাস্তবিকই সত্য। তবে এই কথাটি আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার মাঝে কোন ফাঁক নেই, একদিনেই চট করে কেউ বড়ো হয়ে যায় না, আবার পরিবর্তনগুলিও বিশেষভাবে অগ্রকৃত হয় না। অত্যন্ত ধীরে, ক্রমশঃ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা আসে, শৈশবের পর বাল্য, তারপর কৈশোর।

শিশুর জীবনের বিভিন্ন স্তর ও প্রত্যেক স্তরের বয়ঃক্রমের সীমা—
Periods and approximate age limits :—

(১) **শৈশব** (Infancy)

(ক) অতি শৈশবাবস্থা —১—২ বৎসর বয়ঃকাল

(খ) শৈশবের দ্বিতীয় স্তর —২—৪ " "

(২) **বাল্য** (Childhood)

(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-school period or infant's school period) — — ৪—৭ " "

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা (Primary school period) — — ৭—১১ " "

(৩) **কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি** (Adolescence)

(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-pubertal stage) — — ১১—১৪ " "

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা (Puberty) — ১৪—১৮ " "

(গ) তৃতীয় অবস্থা (Later adolescence) — — ১৮—২১ " "

এই শ্রেণীবিভাগ ও বয়সের সীমা, এক এক লেখক, এক-এক রকম ভাবে, করে থাকেন।[১] এবং সব শিশুর জীবনে বিভিন্ন স্তরের সীমা ঠিক এক নয়, তবে এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগই মোটামুটিভাবে প্রচলিত।

শিশুর ক্রমবিকাশ ও তার প্রকৃতি আলোচনা করার আগে, একটি মতবাদ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুনরাবর্তন মতবাদ (Recapitulation Theory) অনুযায়ী ছোট শিশুর জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে মানব জাতির ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই মতবাদের বিশেষ সমর্থক ষ্টানলি হল্ (Stanley Hall)। বর্তমানে এই মতবাদ অচল। শিশুর ক্রমবিকাশ তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বহুলাংশে এবং অসভ্য আদিম মানবের সহজ সরল জীবন থেকে সুরু করে, বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল সভ্য মানবের জীবন পর্যন্ত, কতগুলি ছক্ কেটে নিয়ে, তার মধ্যে শিশুর জীবনকে ফেলে দেখা যায় না।

শৈশব (১-২) বৎসর—শিশু তার জীবন আরম্ভ করে নিতান্ত অসহায় একটি জীব হিসাবে। খাদ্য ও জীবনের জন্য সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী। প্রাণতত্ত্বের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। সাধারণতঃ, দেখা যায়, যে সব জীবজন্তুর শৈশবকাল বেশীদিন স্থায়ী হয়, তারা ভবিষ্যৎ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের তাল খাপ খাওয়াতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হবার অবকাশ ও প্রয়োজন বেশী থেকে, এবং তাদের বুদ্ধির বিকাশও তাই বেশী হয়। প্রথম শৈশবের এ স্তরে ইন্দ্রিয়বোধ স্পষ্টতা লাভ করতে সুরু করে, তবে বুদ্ধি বা বিচার তখনও দেখা দেয় না।

---

১ রাইবার্ণ শিশুর জীবনের স্তরগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করেছেন—

	Age in year		Nature of growth
Infancy	0	$2\frac{1}{2}$/3	period of physical growth
Early childhood	3	6/7	period of mental growth
Transition period	6/7	8	period of physical growth
Later childhood	8	12	period of mental growth
Adolescence			
Early adolescence	12	14	period of physical growth
Later adolesence	14	18	period of mental growth

এ বয়সে যে ভাবাবেগ সব চেয়ে বেশী লক্ষিত হয়, সে হচ্ছে স্নেহ, ভালবাসা ও ভয় ; কোন সুসংবদ্ধ যুক্তি বা বুদ্ধি দেখা যায় না, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি। শিশুর কাছে তার মা এলেই, হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, দু'হাত বাড়িয়ে দেয় মার

মার আদরের শিশুর প্রতিক্রিয়া

কোলে যাবার জন্য, এবং মার সামান্য হাসি, আদর ও অঙ্গ স্পর্শে তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মার ভালবাসায় শিশু-মনে আসে পরম নিরাপত্তার (security) ভাব। এই নিরাপত্তার ভাবের মূল্য শিশু জীবনে অসীম, এ বয়সে শিশু মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হ'লে তার ভবিষ্যৎ মানসিক জীবন সুস্থ হতে পারে না। ডাঃ সাটির (Dr. Suttie) মতে ব্যক্তি জীবনের পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মূল নিহিত থাকে, অতি শৈশবে শিশু ও তার মাতার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে।[২] আবেগ ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশের সঙ্গে, সামাজিক জীবনের ক্রম-বিকাশের অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ বর্তমান। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময়, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ হতে হলে, বিশেষ প্রয়োজন, শৈশবে প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসা পাওয়া। শিশু যে শুধু ভালবাসা পেতেই চায়, তা নয়, সে ভালবাসতেও চায়। ডাঃ সাটির মতে পরিণত জীবনে ঘৃণা, উদ্বেগ, বা ভয়ের কারণ হচ্ছে শৈশবের স্বাভাবিক স্নেহাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব।

---

২ Dr. I. Suttie. Origins of Hate and Love.

শৈশবে নিরাপত্তার ভাবের অভাব হলে, সেই অভাববোধ কৈশোরে আবার বিশেষ করে দেখা দেয়। যে শিশু মাতৃস্নেহের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় গড়ে উঠলো না, কৈশোর ও যৌবনেও সে নিজেকে অসহায় মনে করে। আমরা দেখি, মনঃসমীক্ষকগণ সর্বদাই মানসিক ব্যাধির কারণ খোঁজেন, শৈশবের ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতায় মানসিক ব্যাধির মূল কারণ হচ্ছে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, ভালবাসা পাওয়ার অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। এতে, আমাদের মানসিক বিকারের মূল হচ্ছে অবরুদ্ধ কাম, এই সূত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ভালবাসা সর্ব্বদাই কামান্ধ নয়, ভালবাসার মধ্যে কামও যেমন আছে তেমনি আছে রক্ষা করবার আগ্রহ এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসায় কাম চরিতার্থতার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, বুক দিয়ে ঢেকে রাখবে এমন ভালবাসা আর নিরাপত্তা বোধের।

শিশুর সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষণ ও নিরাপত্তা বোধ ; এটা শিশুর প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত, কারণ বাল্যে শিশু সম্পূর্ণ অসহায় আর তার বিশেষ প্রয়োজন, যিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন তাঁর আন্তরিক স্নেহ। এ হচ্ছে জৈব প্রয়োজন, কেন না বাস্তবিক পক্ষে শিশুকে অপরের উপরই নির্ভর করতে হয় তার খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্তে। কিন্তু এ প্রয়োজন মানসিকও বটে ; কারণ শিশুর প্রয়োজন শুধু রক্ষণের নয়। সে রক্ষিত হচ্ছে, এ বোধেরও।[৩]

দুটি মানসিক ব্যাধি, বদ্ধ ঘরের ভয়, ক্লস্ট্রোফোবিয়া এবং কোলাহলপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানের ভয়, এ্যাগেরাফোবিয়ার কারণ—নিহিত থাকে শৈশবে স্নেহ যত্নের অভাব ও তার ফলে নিরাপত্তার বোধের অভাবে।

প্রথম শৈশবে শিশুর উপর যে সব প্রভাব পড়ে তার মূল্য ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে গভীর গুরুত্বপূর্ণ। এ বয়সটায় শিশুর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবই নমনীয়—তাই এ বয়সের নরম কাদায় যে ছাপ পড়ে তা ভবিষ্যতে স্থায়ী হয়। পিতা-মাতার তাই বিশেষ যত্নের সঙ্গেই শিশুকে লালন পালন করতে হবে। এই বয়সে শিশুকে যে ভাবে গড়ে তোলবার সুযোগ থাকে, শিশু বড় হয়ে উঠলে সে সুযোগ আর তেমন পাওয়া যায় না। এ বয়সে অবহেলা, ভুল পথ্য, অবাঞ্ছিত অভ্যাস

---

৩ Hadfield Childhood and Adolecence p 73

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে।[8] যদিও প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত শিশুর বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটে, কিন্তু এই আপাত আলস্যের মধ্য দিয়েই তাহার দেহ ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক সবই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শক্তি সংগ্রহ কচ্ছে। তা ছাড়া যতক্ষণ জেগে আছে, ততক্ষণ শিশুর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় চঞ্চল, তারা কাজের মধ্য দিয়ে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠছে ; সে হাত পা ছুড়ছে, মুখ বুজছে, হাঁ করছে, চোখ খুলছে, বন্ধ করছে, হাতের পায়ের ছোট ছোট আঙ্গুলগুলো নাড়ছে, বন্ধ করছে, মেলছে অর্থাৎ দেহের পেশীগুলির ক্রিয়াতে অভ্যস্ত হচ্ছে। একেবারে শিশুর এই পেশী ও অঙ্গসঞ্চালন অনেকটা অসংবদ্ধ, কারণ উর্দ্ধ মস্তিষ্কের ক্রিয়া কেন্দ্রগুলি তখনও পুষ্টিলাভ করেনি। সুষুম্নাকান্ত এবং নিম্ন মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিই তখন পর্য্যন্ত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। এই সময় থেকে জীবনের মৌলক্রিয়াগুলি কিন্তু যথেষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত— এগুলি হচ্ছে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, মাতৃস্তন্যগ্রহণ, তরল খাদ্য গলাধঃকরণ, হাঁচি, কাশি, মল মূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি। ক্ষুধার্ত হলে সে কেঁদে নিজ প্রয়োজন ও দাবী সুস্পষ্টভাবেই জানায়।[5]

ছমাস বয়স হলেই শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের দিকে মনোযোগ দিতে শেখে। চোখের দৃষ্টি তখন অনেকটা স্পষ্ট ও স্থির হয়। সে মানুষ চিনতে শেখে বিশেষতঃ মাকে অন্যের থেকে অস্পষ্টভাবে প্রভেদ করতে শেখে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াগুলি ক্রমেই উদ্দেশ্য মূলক হ'তে থাকে সে তার মশারীতে ঝোলানো লাল ফিতেটাকে ধরতে চায়। এ বয়স থেকেই উর্দ্ধ মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে তাই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ক্রমশঃই

---

8 Nothing that happens to him in later years is comparable in importances as far as his development is concerned, with what has happened to him before he ever comes to school.

Collins Drever—Psycology and practical life p. 49

5 In short, he uses all his muscles. Some of the service acts, such as sneezing and swallowing are obviously well-co-ordinated performances, clever instinctive techniques, requiring good team work from the muscles that operate the different joints. The team work is controlled by the lower centres of the cord and brain stem.

Woodworth Marquis psycology p 285

সুসংহত হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ তার চোখ আর হাত তার এই বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আঙুল দিয়ে জিনিষকে শক্ত করে ধরা বিশেষ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর একসঙ্গে ব্যবহারে সাত মাস বয়সে সে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে ওঠে। এক বছর বয়স হলে শিশুর কয়েকটি দন্তোদ্গম হয়—সে কিছুটা শক্ত জিনিষ খেতে শেখে। এই সময়ে তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত হয়। শিশু হাঁটতে শেখে। অপোগণ্ড শিশু ছিল নিতান্তই মায়ের উপর নির্ভরশীল। এবার থেকে সে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে থাকে। তার জগতের পরিধি তার ছোট্ট বিছানা বা মায়ের কোল ছাড়িয়ে আরো কিছুটা বিস্তৃত হল। হাঁটার মধ্যে দুটি ক্রিয়া একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, এক হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে দেহের ভারসাম্য রক্ষা। এই হাঁটতে শেখার মধ্যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ এবং শিশুর নিজ চেষ্টা ও অভ্যাস দুই-ই আছে।

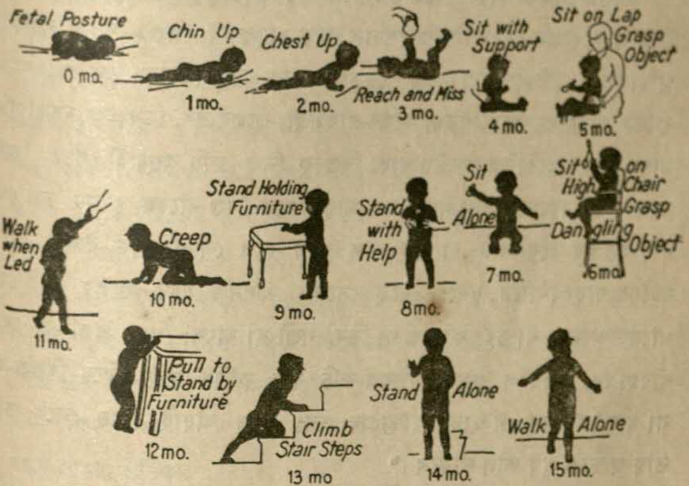

Stages in the development of locomotion, from Mary-Shirley. The first two years Vol, II Uni o! Minnesata Press 1933

হাঁটতে শেখাটা একদিনে হঠাৎ হয় না—ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথম শিশু অল্প কিছুক্ষণের জন্যে উপুড় হতে শেখে। তিন মাস বয়সে উপুড় হতে পারলেও মাথাটা সিধে করতে পারে না। পাঁচ মাসে ঘাড়টা অনেকটা শক্ত হয়েছে। কিন্তু তখনও শিশু এগোতে পারছে না। নয় মাস বয়সে একটু একটু এগুতে পারে।

একবছর বয়সে সে বেশ হামা দিয়ে চলতে পারে। নয় মাস বয়স থেকেই একটু একটু দাঁড়াতে শেখে। এ সময়ই মা তাকে হাতে ধরে হাঁটতে শিখতে উৎসাহ দিতে থাকেন। এক বছরে টলে টলে অল্প এগুতে পারে। পনেরো মাস বয়স হলে অনেকটা দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে সে হাঁটতে পারে। ৭৫৭ পৃষ্ঠার ছবি থেকে শিশুর হাঁটা শেখার ক্রমপরিণতি আমরা বেশ বুঝতে পারবো।

এ বিষয়ে অধিকাংশ শিশু-চিকিৎসকই একমত যে, মা সুস্থ থাকলে মাতৃস্তন্যই শিশুর পক্ষে সর্বোত্তম খাদ্য। যদিও আজকাল মায়েরা অনেক সময়ই শিশুর এই সেবাটুকুর ভার গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং গোড়া থেকেই তাদের বোতলে বেবীফুড খাওয়াতে সুরু করেন, তথাপি চিন্তাশীল বহু মনোবিজ্ঞানীর মতে এই স্তন্যদানের মধ্য দিয়েই শিশু ও মায়ের মধ্যে নিবিড়তম প্রীতির বন্ধনটি গড়ে ওঠে যা মা ও শিশু উভয়ের পক্ষেই পরম কল্যাণকর।

শিশুর উপযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে ডাঃ ক্লারা ডেভিস্ কিছু পরীক্ষা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আট কি দশমাস পর্যন্ত মাতৃস্তন্যই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। এর পরে শিশু আর একটু বড় হলে তখনও দেখা যায় কৃত্রিম খাদ্য অপেক্ষা গোদুগ্ধ, তাজা শাকসব্জী, ফলের রস, ডিম এবং মশলাবর্জিত মাংস ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য শিশুকে নিজ রুচি অনুযায়ী খেতে দিলেই তার স্বাস্থ্য সবচেয়ে ভাল থাকে। গোড়া থেকে শিশু মায়ের বুকের দুধ খেয়ে যদি বড় হয় তবে আট বা দশ মাস বয়স হলে সে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন ধরণের খাদ্য বিভিন্ন সময়ে বেছে নেবে। কখনও হয়ত ফলের রসই বেশী খাবে কখনও বা দুধ, কখনও বা ডিম, সব্জী বা মাংস কিন্তু প্রকৃতির এমনই ব্যবস্থা যে, জন্মকাল থেকেই শিশুর রুচি যদি কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে বিকৃত করা না যায়, তা হলে সে স্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সুষম খাদ্যই বেছে নেবে, তাতে তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকবে।[৬]

শৈশব (২-৪ বৎসর)—এ সময়টা শিশুর জীবনে বিশেষ গুরুত্ব ও সঙ্কট-পূর্ণ অধ্যায়। শিশু হাঁটতে শেখে। এ সময়টাকে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' বয়স (period of toddlerhood) বলা হয়। শিশু মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে; জগৎটা হঠাৎ বড় হয়ে দেখা দেয়,

৬ Dr Benjamin Spock—Baby & Child Care
Cardinal Ed. (38th printing) pp. 207-9

শিশুর কাছে। ঔৎসুক্য (curiosity) হচ্ছে তার জীবনে প্রধান আবেগ। ডাঃ হাডফিল্ড বলেন, দু'বছরের শিশু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, তার চার পাশের প্রকৃতিকে বুঝতে চায়। চার বছরের শিশুর ইন্দ্রিয়বোধ যথেষ্ট প্রখর হয়ে উঠে, ও বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হয়।[৭] স্বাধীনতার ইচ্ছার সূচনা দেখা দেয় ও নিজের অহংকে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ বয়সে তাই তার কান্নাকাটি মর্জি (temper-tantrum) প্রবল ভাবে দেখা যায়। এবং শিশু সবার কাছে নিজেকে জাহির করতে চায়, সবাই তাকে স্বীকার করুক, এটা সে চায়। এ জন্য দু-তিন বছরের ছেলে-মেয়েরা অনেক সময়ই বেশী হেসে কথা বলে, গোলমাল করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এ স্বীকৃতি না পেলে, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়, এবং তার শৈশবের অতি-পরনির্ভরশীল অবস্থায় ফিরে যাবার (regression) ভয় থাকে।

এ সময়টা শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হবার আর একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, শিশুর অহং ভাবের (ego-consciousness) সৃষ্টি, এবং নৈতিক জীবনের আদর্শ (ego-ideal) অস্পষ্ট ভাবে, এ সময় থেকে তার মনে মূল বিস্তার করতে সুরু করে। শিশুর কান্নাকাটির মর্জির একটি প্রধান কারণ, তার এই অহং-ভাব। অনেক সময় পিতামাতা শিশুর জেদকে অন্যায় মনে করে, তাকে অগ্রাহ্য করতেই পছন্দ করেন বেশী, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তার ফলে, শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে উঠতে পারে না। পরবর্তী জীবনে এসব শিশুর প্রবল ইচ্ছা শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এমন শিশু ভবিষ্যতে অত্যন্ত নার্ভাস ও দুর্বল প্রকৃতির লোক হয়, না হয় উৎপীড়ক হয়। শিশু হচ্ছে দার্শনিক, সব কিছুর কারণ সে জানতে চায়। তাদের অফুরন্ত "কি" এবং "কেন"র জবাব দিতে অনেক সময় ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত বোধ করলেও, যতদূর সম্ভব দেওয়া উচিত।

শিশুর অহং-আদর্শের গোড়াপত্তন হতে থাকে, মোটামুটিভাবে আড়াই থেকে চার বছর বয়সের মধ্যে। এর মধ্যে তিনটি ক্রিয়া কাজ করে (১) ইঙ্গিতময়তা বা অভিভাবন (suggestibility)—এটি শিশু মনকে অচেতনভাবেই প্রভাবান্বিত করে। (২) তদাত্মীকরণ (Indentifiability), এ স্তরে শিশু অচেতন এবং

---

[৭] Hadfield, J. A,—"Mental Health and Psychoneurosis," p, 31-33

কিছুটা সচেতনভাবে তার পরিবেশকে অনুকরণ করে। (৩) অহং ভাবাদর্শ—(Ego-ideal), এটা সচেতন চিন্তার ফল।

প্রথমতঃ শিশু যে পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়, সেই পরিবেশের ব্যবহার ও আদর্শ, নিজের অজ্ঞাতেই গ্রহণ করে। পিতামাতার অভিভাবন (suggestion) মারফৎ এই পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে। বাবার মতো বড় হওয়া, বা যে কাজটা করলে মার ভাল লাগবে সেই কাজ করা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে না জেনেও শিশু পরিবারের আচরণের আদর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। তাই পিতামাতার মধ্যে কলহ বা তাদের নৈতিক শিথিল জীবন শিশুর অবচেতন মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। শিশুর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে পিতামাতার জীবনও সুন্দর, আনন্দময় ও নির্মল হওয়া চাই। পরে কিছুটা সচেতনভাবেই, শিশু অপরের আদর্শ অনুসরণ করে। নিজেকে অপরের স্থানে বসিয়ে নানাপ্রকার make-believe- 'যেন-যেন'-খেলা করতে ভালবাসে। ছোট মেয়ে, তার মার অংশ অভিনয় করতে ভালবাসে। পুতুল নিয়ে তাকে খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম পাড়ায়। আবার পিয়ন, ড্রাইভার ইত্যাদি যত লোককে সে জানে, প্রত্যেকের চরিত্র নিখুঁতভাবে অভিনয় সে করতে চায় ও ভালবাসে। গল্পে-শোনা নানা বীরত্বের কাহিনী যখন তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, খেলাচ্ছলে নিজেকে সেই সব বীর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় (identification), ও সেই বীর-আদর্শ অনুকরণ করে (imitation)। এ ভাবে গড়ে ওঠে, শিশুর নৈতিক চরিত্রের বুনিয়াদ। এ সময়টায় যদি আবার পিতামাতা বেশী চাপ দেন, অতিরিক্ত ভাল হয়ে ওঠার জন্য, ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। জোর করে চাপানো অহং-ভাবাদর্শের সঙ্গে, নিজের সত্যিকারের অহং-এর একটা বিভেদ ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এটা অবাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে, এ সময় পরিবেশের নৈতিক আবহাওয়া শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে। তাই তার চতুষ্পার্শের পরিবেশটি নির্মল, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাল্যকাল (৪-৭ বৎসর)—স্বাধীন হবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবলতর হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে, শিশু তখনও চায় না। সে নির্ভর করতেও চায়। দুই পরস্পর-বিরোধী-শক্তি একই সময়ে কাজ করে। বড়দের কাছে হুকুম

পেতে ভালবাসে—তা এনে দেয় নিরাপত্তার ভাব। আবার নিজের ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করতেও তার ভাল লাগে—তাতে হয় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

এ সময় বহিঃ-প্রকৃতির দিকে শিশুর দৃষ্টি পড়ে। গাছ-পালা, পশু-পাখী তার ভাল লাগে, জন্তু বা পাখী পুষতে সে পছন্দ করে।

তার দেহ, বিশেষ করে পেশীগুলি অনেকটা পুষ্টিলাভ করে, ও অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক নৈপুণ্য সে আয়ত্ত করে, যেমন দৌড়ান, লাফান,—(hopping, skipping, etc) এ সব দৈহিক নৈপুণ্য লাভের ফলে, শুধু যে পেশীসঞ্চালনের উপর কর্তৃত্বই বাড়ে তা নয়, শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার ভাব আসে। এর ফলে তার অনুভূতির জীবনেরও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। পেশীগুলির সক্রিয়তা বাড়ে—তাদের পরস্পরের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্যবিধানও ঘটে। তা ছাড়া, শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বাড়ে এবং তার ভাষার উপর দখলও আগের চেয়ে বেশী হয়।

এখন থেকে শিশুর চিন্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতার খানিকটা বিকাশ হয়। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। পিয়াজে'র (Piaget) মতে ৮ বছরের নীচে শিশুরা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা (logical thinking) করতে পারে না। এ বয়সের শিশুরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক থাকে, অর্থাৎ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে জগৎটাকে তারা বুঝবার চেষ্টা করে, অপরের দৃষ্টিভঙ্গী তারা বোঝে না। পিয়াজে'র মত, সুজান আইজ্যাক্‌স্ (Susan Isaacs) এভাবে প্রকাশ করেছেন—শৈশবের চিন্তা ও বয়স্কদের চিন্তার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ হচ্ছে যে, শিশু সব জিনিষকে জীবন্ত (animistic) মনে করে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় বিশ্বাস করে (magic) আর অসম্ভব স্বতঃ-বিরোধী ভাব একসঙ্গে মনের মধ্যে পোষণ করে (Syncretistic)।[৮] কিন্তু সুজান্ আইজ্যাক্‌স্, হাজ্‌লিট প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে এ বয়সে শিশুদের অভিজ্ঞতা সামান্য হলেও, তার উপর নির্ভর করে তাদের নিজ সমস্যাগুলির সমাধান করতে তারা অনেকটা সক্ষম হয়, এবং সাধারণভাবে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতেও তখন পারে। সুজ্যান্ আইজ্যাক্‌সের ভাষায়, শৈশবের মধ্য বয়স পর্যন্ত চিন্তার ধারা থাকে হাত পা দিয়ে নাড়াচাড়া

৮ Susan Isaacs—The Psychological aspects of Child Development. Sec. II p.22, Year Book of Education, 1935.

কাজ করা ইত্যাদির সহায়ক।[১] তারা কল্পনা করতে ভালবাসে, কিন্তু কাল্পনিক বস্তু যে কাল্পনিক, সত্য নয়, সে বোধ, তাদের কিছুটা থাকে।

তাদের সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ সম্বন্ধে বলা যায় যে তারা এখনও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে না। অন্য শিশুদের প্রতি এ বয়সে বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় না, বরং ঔদাসীন্যই বেশী। কখনো কখনো অন্যদের প্রতি হিংসা ও বিরক্তি যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু, ধীরে সে বন্ধুত্ব করতে শেখে এবং মিলে মিশে খেলা করতে পছন্দ করে। দু'তিন বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, মেজাজ-মর্জি, রাগ ও দুঃখের আতিশয্য (intensity) দেখা যায়। নার্সারী স্কুলে এলে পর, এটা অনেক কমে যায়, কিন্তু ঈর্ষা বেশ যথেষ্টই থাকে। এর পেছনে সাধারণতঃ মা'র ভালবাসা কমে যাবার ভয়ই বেশী, এবং ছোট ভাই-বোনের প্রতি হিংসার ভাব থাকে। সেজন্য মনঃস্তাত্ত্বিকগণ শিশুকে নিজমনে যথেষ্ট খেলা করতে দেবার পক্ষপাতী, কারণ এর ভেতর দিয়ে শিশু নিজের মনের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে, সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশও সহজ হয়।

কৈশোর—(৭-১১ বৎসর)—এ বয়সে, বস্তুবিরহিত শুদ্ধচিন্তার (abstract thinking) ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ে। তাদের স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ সময় কিছু করবার, কিছু গড়বার ইচ্ছাটা বেশ প্রবল হয়, তাই এই কালকে অনেক সময় বলা হয়, প্রভুত্ব ও গঠনের বয়স (the age of mastery and achievements.)

এ বয়সে শিশুদের সমাজ-জীবন ও বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পিয়াজেঁর মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনেই ঘটে বুদ্ধির বিকাশ। তাঁর মতে, ৭।৮ বছর বয়স থেকে শিশু অন্যের মতামত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে (socialised), ও আত্মকেন্দ্রিকতা তার কমে যায়। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে সে বুঝতে শেখে। এর ফলে, সে বস্তুবির্বজিত সার্বিক (abstract and universal) চিন্তা করতে সক্ষম হয়, তার চিন্তার মধ্যে যৌক্তিকতা দেখা দেয়।

অপর পক্ষে, এ কথাও সত্য যে অনেক সময় বুদ্ধির বিকাশের দ্বারাই শিশুর সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তার বুদ্ধিই তার সমাজ-জীবন অনুযায়ী অনুভূতির

---

১ Isaacs, S.—The Psychological aspects of Child Development. Sec II p. 23, Year Book of Education, 1935.

প্রকৃতি ও বিস্তার নির্ধারণ করে। মানসিক ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের (Mentally deficient) বুদ্ধি কখনই যুক্তিপূর্ণ চিন্তার রাজ্যে পৌঁছাতে পারে না এবং তাদের জীবন নিজ নিজ সুখ ও দুঃখের সাধারণ অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হয়।

দুই মতবাদই একপেশে ও কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সমাজ-জীবন ও বুদ্ধি উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সুজান্ আইজ্যাক্স্ বলেন, বুদ্ধি ও সামাজিক বোধ এই দুই-এর একটিকে কারণ আর একটিকে কার্য, এ রকম না বলাই ভালো। শিশুর পরিণতি তার সমস্ত দিক মিলিয়ে, সমস্ত বয়সেই এক ও অবিভাজ্য, এ রকম মনে করাই উচিত। কোন একদিকে পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য পরিবর্তনও যুক্ত এবং তারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। এ স্তরে শিশুর জগতের পরিসর বেড়ে যায়, পিতামাতার ভালবাসা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও ছোট ভাই-বোনদের প্রতি ঈর্ষা থেকে সে অনেকটাই দূরে সরে আসে। সে অনেক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে, ও ক্রমে সামাজিক হয়ে ওঠে। আগে সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, অন্য শিশুরা ছিল, বড়োদের ভালবাসা বা নিজের খেলার জিনিষ কেড়ে নেওয়ার প্রতীক, সুতরাং হিংসা বা ঈর্ষার পাত্র। ছোটদের সঙ্গে মিলে খেলা করলেও, আপন আনন্দই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য, এবং বড়োদের কাছে প্রশংসা অর্জনের জন্য যে কোন মুহূর্তে খেলার সঙ্গীকে ত্যাগ করতে, বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তার বাধতো না। কল্পনার জগতটাই তার বেশী প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন দলগত বোধ তার প্রবল হয়, এবং শিশু ব্যবহার অনেকটাই সামাজিক হয়ে ওঠে ও সে নিজের দৃষ্টি ভঙ্গীকেই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে না। সহযোগিতার ভাব ক্রমে তার মনে জাগে, ও অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে খেলতে সে ভালবাসে। সে দল (team) বানায়, ও নিজেকে সেই ক্ষুদ্র সমাজের অঙ্গ হিসাবে দেখে। পিতামাতা ও শিক্ষকের মতামতের চেয়ে, বন্ধুদের মতামতের মূল্য তখন বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

এ বয়সকে অনেক সময় বলা হয় দল গড়বার বয়স (gang age) এবং এ বয়সের সীমা (the peak of gang age) হচ্ছে, এগার বছর বয়স। ঠিকভাবে পরিচালিত না হলে, দুষ্ট দলের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এবং অপরাধ-প্রবণতা (delinquency), এ সময়েই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

দলের প্রতি আনুগত্য ভাব প্রবল থাকে তাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন মেনে

তারা চলে। বয়স্কাউট, ব্রতচারী, গার্ল গাইড, ইয়ুথ ক্লাব এর মূল্য এই বয়সে যথেষ্ট।[১০]

গড্‌ফ্রে টমসন্ বলেছেন, যে মনোবিদরা একথাটা স্বীকার করেন এ বয়সের কোন না কোন কালে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেয়। আর এ সময়েই আসে নানা রকম দলে থাকবার ও নানা রকম কাজে মিশবার আগ্রহ। এ বয়সে বয়স্কাউট বা অন্য কোন সংস্থা তা সে যে নামেই হোক্ না কেন, শিশুর পক্ষে ভাল।

কিন্তু দলগত মনোভাব সুরু হলেও তাকেই সে সবচেয়ে বড় মূল্য দেয় না। সে দলের অংশ হিসাবে কাজ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর নয়। সে তার নিজের যশের জন্য বেশী ব্যগ্র থাকে। কোন নৈর্বক্তিক আদর্শের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ তখনও সে করতে পারে না, যদি না সেই আদর্শ তার বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখে। তবে, অন্যদের সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে, সামাজিক আদান প্রদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ভবিষ্যতে আদর্শের জন্য, ও সমাজের জন্য নিস্বার্থপর আত্মাহুতির ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে।

এ সময়ে শিশুরা নাচ, গান, বাজনা, অভিনয়, ছবি আঁকা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে অভিনয়, নানাপ্রকার কারু ও চারুশিল্প-কর্মের সাহায্যে তাদের সামাজিক বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা করা উচিত। দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান এ বয়সে কতকটা হয়, সেজন্য এ বয়সের শিশুকে কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে, তার আত্মবিকাশের সাহায্য করা উচিত।

শিশু নানা জিনিষ সঞ্চয় করতে ভালবাসে। শিশুর পকেটে ভাঙ্গা ছুরি, কলম, রবার, ডাকটিকিট কী না থাকে এবং যার একটি পকেট থাকে না জামায়, তার বোধ হয় দুঃখের আর অন্ত থাকে না। তাদের জামায় পকেট দেওয়া হ'ত না, এ অগৌরব শিশু রবীন্দ্রনাথকে বড় পীড়া দিত, তাই তাদের সকাতর-আবেদন ছিল খলিফা নেয়ামত আলির কাছে যাতে এ ত্রুটি সংশোধন করা হয়।[১১]

শিশুর এই প্রভুত্ব বা মালিকানা-বোধ (sense of property), ভবিষ্যৎ জীবনের বহু সুখ ও দুঃখের মূল। এ একটি প্রবল মানসিক ও সামাজিক

---

১০ Bowley The natural development of the child p 89

১১ রবীন্দ্রনাথ—ছেলেবেলা।

সংস্কার, কাজেই এর সুস্থ বিকাশ খুবই প্রয়োজন। এ সংস্কার উপযুক্ত পরিতৃপ্তির সুযোগ না পেলে বা অযথা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে অবচেতন মনে তার "জটিল মূল সুদূরে প্রসারে, নিত্য বিরক্তি করি রাখে চিত্ততল।" ফলে শিশু ঈর্ষা চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি গোপন অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, সে সংস্কারের তৃপ্তি খোঁজে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংস্কারকে শিশুর সুস্থ মর্যাদা-বোধের সহায়ক হিসাবে কাজে লাগানো বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্তব্য। মালিকানাবোধ এ বয়সে যেমন প্রবল হয়, তেমন আর কখনো হয় না। এ প্রবৃত্তি অনাদৃত হলে, অথবা সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থাকলে অবচেতন মনে এ ক্ষোভ আত্মগোপন করে এবং ঈর্ষা, চৌর্য-বৃত্তি ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টি অনুসারে ব্যবহার করলে এটা আত্মমর্যাদা ও অপরের সম্পর্কে বিবেচনা-রূপ সদ্‌গুণে পরিণত হয়। শিশু তার নিজ ডেস্ক, বই-পত্র ইত্যাদির জন্য বিশেষ গর্ব বোধ করে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ অত্যন্ত প্রবল অস্ত্র।[১২]

শিশু নিজ লিঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু যৌন-আকর্ষণ (দুষ্ট প্রভাবে না পড়লে) সাধারণতঃ এ বয়সে দেখা যায় না।

উত্তর-কৈশোর বা **যৌবনাগম** (**Adolescence**)—বলতে আমরা সেই বয়ঃ-সন্ধিকালকেই বুঝি যখন শিশু তার কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে। এই বয়সেই শিশুর দেহ ও মন অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এ হচ্ছে একটা পরিবর্তনের কাল, যখন শিশু বাল্যের অবস্থা থেকে বয়স্কের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। এ বয়সে শিশু পরিপূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

কোন বয়সে শিশু কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে, তার সঠিক সীমারেখা টানা ঠিক সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জগতে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্যান্‌লী হল্‌-এর Adolescence নামে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, এ নিয়ে বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চলেছে এবং এ সম্বন্ধে বিস্তর লেখা হয়েছে। ষ্ট্যান্‌লি হল্‌-এর মতে, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের ইতিহাস

১২ Susan Isaacs—The Psychological aspects of Child development.

ক্র্যাম্প্‌টন্ (Crampton) প্রমুখ বিশিষ্ট মনঃস্তাত্ত্বিকদের মতে বয়ঃসন্ধিকাল সুরু হয় মেয়েদের বেলায়, প্রথম রজঃ নিঃসরণের বা মাসিক ঋতুর সঙ্গে, এবং ছেলেদের বেলায় শরীরের কয়েকটি স্থান বিশেষে রোম দেখা দিলে। গড়পড়তা কোন্ বয়সে কোন্ জলবায়ুতে, কোন্ সামাজিক শ্রেণীর কোন্ জাতির মেয়েদের প্রথম ঋতু দেখা দেয়, এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায় এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

হারভার্ড গ্রোথ্ ষ্টাডিস্ (Harvard Growth Studies)-এর সমীক্ষার উপর নির্ভর ক'রে ডিয়ারবর্ণ ও রথ্‌নী এই মতে উপনীত হয়েছেন যে, দেহ ও মনের সর্বাধিক পরিণতির বয়সটা (Maximum growth) হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের মাপকাঠি অর্থাৎ যখন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সর্ব্বোচ্চ হয়, তখনই যৌবনাগম হয়েছে বুঝতে হয়। এঁদের মতে কৈশোরে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। প্রত্যেক কিশোরকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে তাদের পরিণতির হারের লেখ তৈরী করলে দেখা যায় যে, তথাকথিত বয়ঃসন্ধিকালের অব্যবহিত পূর্বেই একটা খুব জোর বাড়বার তাগিদ (ntense growth spurt) আসে। সাধারণের গতির হারের লেখের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তির এই হঠাৎ বাড়তির রেখাটা ধরা পড়ে না। "সাধারণের পরিণতির হারের লেখের মধ্যে ব্যক্তির পরিণতির লেখের অনিয়মিততা চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে সব চেয়ে বেশী বাড়বার কাল আর মেয়েদের প্রথম ঋতুকাল ও ছেলেদের লিঙ্গরোমোদ্গমের কাল একই। এ চিহ্নগুলি যৌবনাগমের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য লক্ষণ।[১৭] ডিয়ারবর্ণ ও রথ্‌নী ৭৪৭ জন মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে, সর্বোচ্চ বৃদ্ধির গড় বয়স পেয়েছেন ১২·৫ বৎসর, আর ৭১১ জন ছেলেকে পরীক্ষা করে গড় বয়স পেয়েছেন, ১৪·৮ বৎসর।

এ কথা আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে, এ সমস্ত বয়সই হচ্ছে গড় বয়স, এবং যদিও অধিকাংশেরই যৌবনাগম অবস্থাটা এই গড় বয়সের কাছাকাছি ঘটে, তবুও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। দেশ, কাল, জলবায়ু অনেক কারণই এর পেছনে থাকে। তবে মোটামুটিভাবে বলতে পারি যে, বয়ঃসন্ধিকাল বলতে আমরা এগার কি বার হতে কুড়ি কি একুশ বছরের ছেলে-মেয়েদের বয়সটাকে সাধারণতঃ বোঝাই। এ বয়সে শারীরিক পরিবর্তন যথেষ্টই

১৭ Dearborn & Rothney Predicting the child's development.

ঘটে এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও। কিন্তু তবুও শারীরিক ও মানসিক দিক হতে বড়দের মতো স্থিতাবস্থা তখনো আসে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনাগম আগে হয় এবং দেহ-মনের পরিণতির শেষ সীমায় মেয়েরা আগে পৌছায়। আবার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (tropical climate) যৌবনাগম আগে হয়।

যৌবনাগম বা (puberty) কথাটির তাৎপর্য একটু আলোচনা করা দরকার। সাধারণতঃ, যে সব শারীরিক পরিবর্তন ঘটলে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মে, তাকে বলা হয় যৌবনাগম। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌবনাগমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে প্রথম ঋতু হওয়া। ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে না, যার থেকে সঠিকভাবে বলা যায় যে যৌবনাগম হয়েছে। সাধারণতঃ গলার স্বরের পরিবর্তন, গোঁফ-দাড়ীর রেখা ও লিঙ্গমূলে রোমোদ্গম থেকে ধরে যায়, যে যৌবনাগম হয়েছে। যৌবনাগম বা প্যুবার্টি কথার তাৎপর্য শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ। বয়ঃসন্ধি বা এ্যাডোলেসেন্স্ (Adolescence) কথার অর্থ আরো ব্যাপকতর-এর একটা সামাজিক ও মানসিক দিক রয়ে গেছে।

সাধারণতঃ প্যুবার্টির সময় থেকে সুরু করে, পূর্ণাঙ্গ যুবক বা যুবতী হওয়া পর্যন্ত বয়ঃকালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধি কাল বা এ্যাডোলেসেন্স। আমরা প্রাক্-যৌবনাগম কালকে প্রস্তুতি হিসাবে বয়ঃসন্ধিকালেরই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেখছি এখানে। বয়ঃসন্ধিকাল কখন শেষ হয়ে পূর্ণ যৌবন আসে, তারও শেষ সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এত ধীরে কমে আসে যে, কখন থেমেছে ধরা যায় না। বৃদ্ধির শেষ কখন হয় তা দিয়ে যদি বিচার করি, হয়ত বলা যায় যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বন্ধ হয় ১৯।২০ বৎসর বয়সে, এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২০।২১ বৎসর বয়সে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, এবং বহু-ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন—

(১) বয়ঃসন্ধিকালে সর্বাঙ্গের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্ল্যাণ্ড, মাংসপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও সুগঠিত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেক অঙ্গের বৃদ্ধি নিজস্ব গতিতে চলে।

যৌবনাগমের কিছুকাল পূর্বে, শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। দৈর্ঘ্যের গতি বিশেষ করে দ্রুত হয়। ক্র্যাম্পটন্ (Crampton), সার্টল্ওয়ার্থ

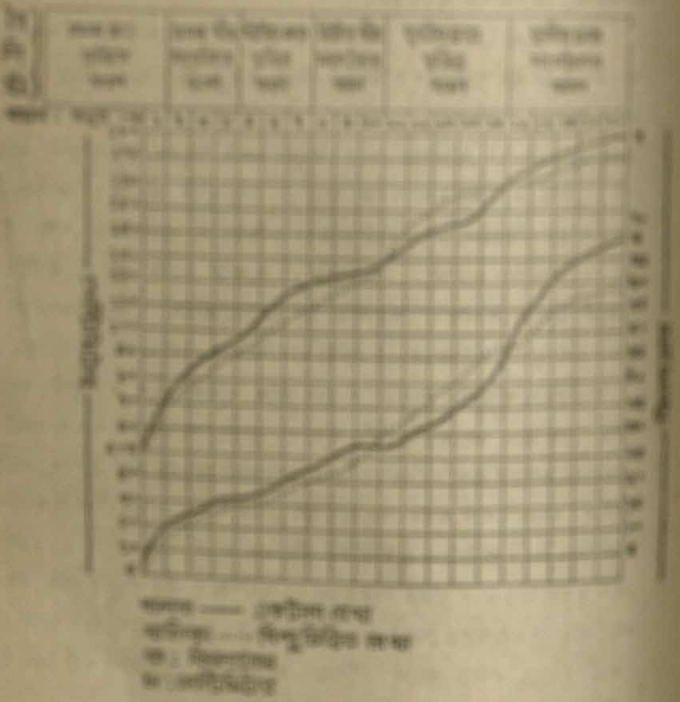

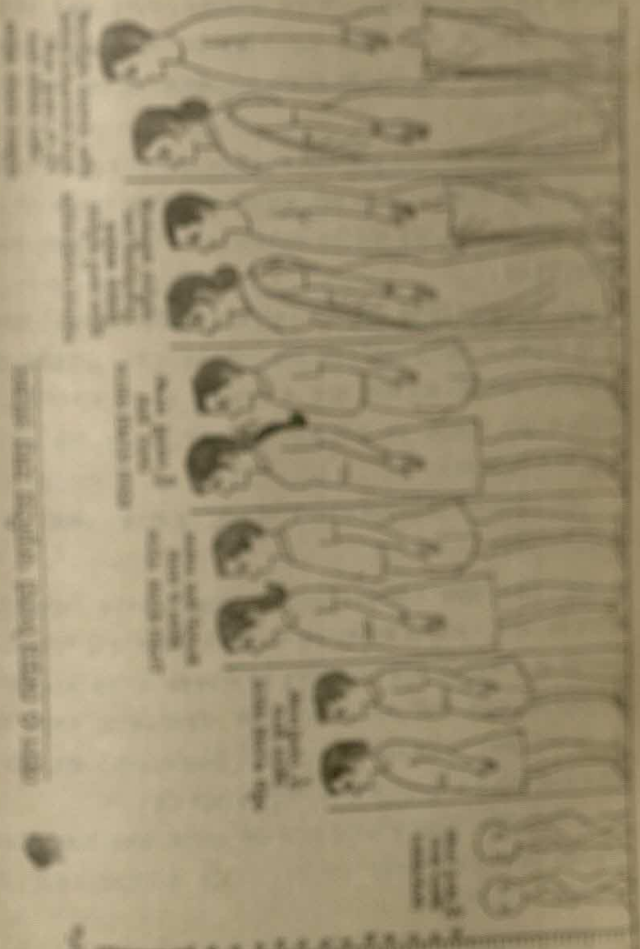

দিকে ছেলেদের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। কিন্তু বছর দুয়েক পরেই, হঠাৎ যেন ছেলেরা লম্বা হয়ে যায়। যাদের পরিবর্তন শীঘ্র হয়, তারা সময় পায় নিজেদের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে, আবার অসুবিধাও তাদের প্রচুর থাকে। অনেক সময়ই তাদের একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হয়, এবং যতদিন তাদের সমবয়সী বন্ধুরা তাদের মত বিকশিত না হয়ে ওঠে, ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আবার, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি একই হারে নাও হতে পারে। যে মেয়েটি অল্প বয়সে খুব লম্বা হয়ে গেছে, সে হয়ত অন্যান্যদিকে অপরিপূর্ণ থাকতে পারে। এই সামঞ্জস্যের অভাবে, তার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(২) মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠিক সমানভাবে বিকশিত হয় না। মুখের বিভিন্ন অংশের যে অনুপাত পূর্বে ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের মুখ কোমলতর ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে, পুরন্ত ও গোলগাল হয়। ছেলেদের মুখে কাঠিন্যের ছাপ আসতে সুরু করে, চোয়ালের হাড় যেন উঁচু হয়ে বেরিয়ে পড়ে, মাংস দৃঢ়তর হয়।

(৩) যৌবনাগমে রোমোদ্গম হয়—বিশেষ করে, ছেলেদের বেলায়, গোঁফ দাড়ী দেখা দেয়।

(৪) গলায় স্বরের পরিবর্তন—মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না। ছেলেদের ল্যারিংনক্স্ বা কণ্ঠমণি বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং স্বরনালী লম্বায় অনেকটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধিত হতে প্রায় এক বছর কি তারো বেশী সময় লাগে। সেই পরিবর্তনকালে, গলার স্বর অনেক সময়, কর্কশ, ভাঙ্গা (harsh) ও বেসুরা (discordant) হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক পর্দা থেকে অপর পর্দায় স্বর নেমে যায়।

এ সব দৈহিক পরিবর্তন অর্থাৎ যৌন-অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন গৌণ যৌন পরিবর্তন বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিভিন্ন ধরণের।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক শক্তি বাড়ে, পেশী ইত্যাদির উপর শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকের ধারণা যে কিশোর কিশোরীরা শারীরিক শক্তির কাজে নৈপুণ্য দেখাতে পারে না। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের গঠন চলন

কেমন যেন বেখাপ্পা ও বেমানান। মার্গারেট্ মীড্ সামোয়া দ্বীপের মেয়ের কথা বলছেন—"সামোয়ার মেয়েদের বেখাপ চলন। সাধারণতঃ, এর কারণ হাত ও পা অন্য অঙ্গের তুলনায় এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে, ছেলেমেয়েরা তাদের পরিচালনা করতে, একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে।" মীড্ এর এ ধারণা খুব সত্য নয়। বরং এ বয়সে ছেলেমেয়েদের অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাদের ব্যবহার ও চলায় মাঝে মাঝে যে জড়তা দেখা যায়, তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে আত্মসচেতনতা ও অস্বস্তি বোধ। সাধারণতঃ তাদের আকৃতিগত পরিবর্তন এত বেশী চোখে পড়ে যে, লোকেরা অনেক সময়ই নানা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। ফলে কিছু পরিমাণে আত্মসচেতন তারা হয়ে ওঠে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুসমঞ্জস সঞ্চালনের প্রধান শত্রু হচ্ছে, আত্মসচেতনতা। লোক-চক্ষুর আড়ালে গেলেই অনেক সময়, জড়সড়, লজ্জিত, পরিণত কিশোরটি অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য দেখাতে পারে, এবং খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে সুন্দর ও নিপুণ দৈহিক কর্মেরও পরিচয় দেয়।

(৩) রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন—রসক্ষরা গ্রন্থির অনেক পরিবর্তন হয়। উপযুক্ত গ্রন্থিগুলি থেকে সেক্স্‌হর্মোন্‌স্‌ নিঃসৃত হয়, এবং যৌন অঙ্গের ও সমগ্র দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে আসে যৌন-চেতনা। তবে এই যৌন-চেতনা হঠাৎ যৌবনাগম সময়ে নতুন করে দেখা দেয় না। শৈশবে ও বাল্যে এই চেতনা ছিল, তবে সে চেতনা অনেক পরিমাণে সুপ্ত ছিল, বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ করে জাগ্রত হয়। উইলোবি বলেন যৌবনাগমে যৌন ব্যবহার আরম্ভ হয় না, উগ্রতর হয় মাত্র। প্রথম ঋতুর পরেই মেয়েরা সন্তান ধারণক্ষম হয় না।

যৌন চেতনার বিকাশের কয়েকটি ধাপ আছে। সে কথা আলোচনা পরে করব, কিশোরের অনুভূতির জীবনের বিকাশের আলোচনা সূত্রে।

এ সব পরিবর্তন ছাড়াও রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক যন্ত্রগুলিও পরিবর্তিত হয় এবং তাদের ক্রিয়ার গতিরও পরিবর্তন হয়। এর ফলে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বেড়ে যায়। কখনও কখনও তাদের মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, বুকধরফর করা, মূর্ছা ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দেয়। অনেক সময় এ অবস্থাগুলি নিতান্তই সাময়িক, এবং বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেলে, অল্প সময়েই সেরে যায়। তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলে, বুঝতে হবে, বাড়ন্ত ছেলে বা মেয়ে দেহ ও মনের দ্রুত পরিবর্তনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারছে না,—

হয়তো বা তার নিজের অন্তর্জগতে বা সামাজিক জীবনে কোন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, যার সমাধান সে করতে পারছে না।

বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধির বিকাশের শেষ সীমারেখা কখন টানা যায়? দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বিকাশের প্রকৃতি ও গতি কি প্রকার? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের সমস্যা নিহিত আছে। আমাদের জানতে হবে, বুদ্ধির গতি একই হারে চলে কিনা, এবং বিভিন্ন কিশোরের বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি?

(১) বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সব চেয়ে বেশী হয়, এবং এসময়েই তার ঊর্ধ্বগতির সমাপ্তি। এই সমাপ্তি যে কখন হয়, তা বলা শক্ত। কারণ বিকাশের গতি অতি ধীরে কমে যায়। আগে মনস্তাত্ত্বিকেরা সাধারণ বুদ্ধি বুদ্ধির বিকাশের শেষ সীমা নির্ধারণ করেছিলেন ১৪ বছর হতে ১৮ বছর বয়স অবধি। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে টারম্যান্ বলেন যে, ১৬ বছরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষাদির ফলে শেষ সীমাকে আরো উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে। থর্নডাইক্ তার টেষ্ট-রিটেষ্ট উপায়ের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ১৯ বছর বয়স অবধি বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। বর্তমানে ফ্রীম্যান্ ও ফ্লোরি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। তাঁরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ শত ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষা করেন, অনেক বছর ধরে। তাঁরা দেখেছেন যে ১৮ বছরের পরেও মানসিক উন্নতি চলতে থাকে, এবং বুদ্ধির বিকাশ পরিমাপক স্কেলে রেখার ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া সাধারণ প্রচলিত ধারণা যে বোকা ছেলেদের শিক্ষার কাল হ্রাস করা উচিত, তারা এর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[১৮] বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের পরিণতির কাল দীর্ঘতম, কাজেই এটা ধরে নেওয়াই সঙ্গত যে এ সব ছেলেমেয়েদের জন্য দীর্ঘতর কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার যারা তেমন বুদ্ধিমান নয়, অথবা যাদের বুদ্ধির পরিপক্কতা অন্যদের তুলনায় মন্থর গতিতে হয়, সে সব ছেলেদের এমন সব সহজতর শিক্ষায় ভর্তি করা উচিত, যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল হ্রস্বতর হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে সব ছেলেমেয়ের

১৮ 43rd Year Book of National Society for the Study of Education.

পরিণতবয়স্ক হয় দুর্বলতর, তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল দীর্ঘতর করলে তারা বুদ্ধিমান ছেলেদের মতই অথবা তার চেয়ে বেশীই বড় উন্নত হয়।

ডিয়ারবর্ণ ও রথ্‌নী তাদের 'প্রেডিক্টিং দি চাইল্ডস্ ডিভেলাপমেন্ট' পুস্তকে লিখেছেন, "পক্ষান্তরে আমাদের পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায় যে মোটামুটি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মানসিক পরিণতি চলতে থাকে; সাধারণতঃ গড় বুদ্ধির বিকাশের শতকরা দুই অংশ একুশ বা বাইশ বছরের পরে ঘটে।"[১৯]

মানসিক বিকাশের হারের নিয়মিততা—সাধারণভাবে বলতে গেলে, যৌবনাগমের পূর্বাহ্নে মানসিক বিকাশের গতি দ্রুততর হয়, তার পরে বুদ্ধির হার অনেকটাই কমে যায় ও বয়ঃসন্ধির শেষ পর্যন্ত প্রায় একই হারে চলতে থাকে ও ধীরে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

"বুদ্ধিবিকাশের গতিরেখা বা গড় বেশ স্থির বলে থর্নডাইক্ ও তাঁর সহকর্মী বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষার (CAVD) ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। (১) যৌবনাগমের ঠিক আগেই এর গতি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। (২) যৌবনাগমের পরে এ গতি সামান্য হ্রাস হয় (৩) এবং আর হ্রাস না হয়ে, মোটামুটি একই ভাবে যৌবনাগমের শেষ সীমা পর্যন্ত বিকাশ চলতে থাকে। যদিও বুদ্ধিবিকাশের গতিরেখা বা গড় রেখাটির সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবিকাশের গতির রেখার সঙ্গে মিলতে নাও পারে, তবুও সাধারণ (average) বুদ্ধির বিকাশের গতির বক্ররেখার মধ্য দিয়েই মোটামুটি বুদ্ধি বিকাশের ধারা প্রকাশিত হয়। সাধারণ নিয়ম এই যে এই দুইটি রেখা সমান্তরালভাবে চলে, তবে কখনো কখনো এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।"[২০]

কাজেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ছাড়াও, একই ব্যক্তির বিকাশের হারও সর্বদা একই রকম থাকে না। কাজেই যে ১১ বছর বয়সে বুদ্ধিপরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পাবে, ১৬ বছর বয়সেও সেই ছেলেই অন্যান্যদের তুলনায় বেশী এগিয়ে থাকবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। কারো কারো বিকাশের গতি প্রথম দিকে মন্থর হলেও, শেষে দ্রুত হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

বয়ঃসন্ধিকালেই এই ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কারণ এই সময় সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা উভয়রূপ বুদ্ধিরই বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

১৯ Dearborn & Rothney—*Predicting the Child's Development*

২০ 42nd Year Book of the N. S. S. E.

(৩) বুদ্ধিবিকাশের গতি ও প্রকৃতি ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে একই প্রকার ও ছেলে-মেয়েতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অনুভূত হয় না। বরং বিভিন্ন ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য তার চেয়ে বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ যুবক পুরুষদের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য, যুবতী মেয়েদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্যের তুলনায় বেশী।

(৪) মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বৃদ্ধির কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। অনেক সময় উল্টো সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন দুর্বল, অপুষ্ট-দেহী ছেলে অত্যন্ত প্রতিভাশালী হ'বার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ ছেলেমেয়েদের দৈহিক পরিণতি সাধারণের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়।

বয়ঃসন্ধিকালে অনুভূতি ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ—

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন যথেষ্ট ঘটে, তার সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতার চরম বিকাশ এ সময় দেখা দেয়। কিন্তু বুদ্ধি ও দেহের পরিবর্তন অপেক্ষাও প্রবলতর ভাবে দেখা দেয়, তার আবেগ ও ভাবরাজ্যে আলোড়ন।

মণীন্দ্রলাল বসু 'জীবনায়নে' এ বয়সের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তরুণ যুবকের অন্তরলোক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্যামল ছায়া-ঘন অরণ্য। এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে কোথাও পর্বত ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয়, কোথায়ও সমুদ্র হইতে পর্বতশৃঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত তপ্ত বাষ্পের আলোড়নে কত অচিন্তনীয় তাণ্ডব-নৃত্য।'[২১]

রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন ও যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে একটা মানসিক চঞ্চলতা বা মানসিক স্থৈর্যের অভাব দেখা দেয়। সকল প্রকার প্রধান আবেগ তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়। খুব বড় কিছু করবার আকাঙ্ক্ষা, দুর্গমকে জয় করবার দুর্নিবার আবেগ এ বয়সে খুব স্বাভাবিক। এ বয়স সম্পর্কে হলিংওয়ার্থ বলছেন, এই বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতূহল, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার বেগ অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব দেখায়, এবং গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি মৃদু অবজ্ঞা বোধ করে।[২২]

---

২১ মণীন্দ্রলাল বসু—জীবনায়ন।

২২ L. S. Hollingworth. Psychology of the Adolescent

মুজাফর শেরিফ্ তাঁর 'দি আউট্‌ লাইনস্ অব্ সোস্যাল সাইকোলজী' পুস্তকে এ প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে বলেছেন এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির সামাজিক তাৎপর্য্য বাদ দিলেও এ সব দৈহিক পরিবর্তনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, অনুভূতির ক্ষেত্রে। তরুণের অনুভূতি ও আগ্রহের বস্তু শৈশবের থেকে পৃথক হয়।'[২০]

বিশেষ করে যৌন-চেতনা ও স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা উগ্রভাবে দেখা দেয়। যৌন-চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে ছুটি মূল ধারণার প্রচলন আছে। একটি মত হচ্ছে যে, যৌবনাগমেই যৌন-চেতনা প্রথম জাগে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রএড্-পন্থীদের মতে শৈশবকাল হতেই এই চেতনা বিদ্যমান থাকে। শৈশবে এই চেতনার প্রকাশ পায় ছেলের মার প্রতি আকর্ষণে ও মেয়ের পিতার প্রতি আকর্ষণে। প্রথম মত অপেক্ষা ফ্রএডীয় মত অধিকতর সত্য, কিন্তু শৈশবে ঠিক যৌন-চেতনা দেখা যায় না, শৈশবে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। তা সচেতন যৌন চেতনা থেকে গুণগত ভাবে পৃথক্।

দৈহিক দিক হতে দেখলে, পরিবর্তন সুরু হয় কৈশোরের পূর্ব হতেই, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌন-চেতনা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং দেহের পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে।

শৈশবে ভালবাসার অভাব হ'লে সেই অভাব বোধ বিশেষভাবে কিশোর মনে পরবর্তীকালে আবার জাগরিত হয় এবং বিদ্যালয়ে ও বাইরে সে বন্ধুদের জন্য লালায়িত হয়ে উঠে। এ বয়সে স্নেহ ও ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার বিকাশের কয়েকটি বিশেষ পর্য্যায় লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ একই লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। ছেলেরা ছেলে বন্ধু পছন্দ করে, ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু। বিশেষ কোন একজনকেই বন্ধু তারা করে না, তারা সকলকেই বেশী ভালবাসে এবং একসঙ্গে মিলে কাজ করতে চায়। এভাবেই ঘটে গৃহে পিতামাতার স্নেহ-শাসনের হাত হ'তে মুক্তি, ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিতি ও অন্তরঙ্গতা।

কৈশোরের বন্ধুত্ব অনেক সময় অতি গভীর ও চিরস্থায়ী হতে দেখা যায়। এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, কারণ বন্ধুর কাছে মনের কথা বলার মধ্যে আছে নিজের মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি ও সংঘাতের হাত হ'তে অব্যাহতি। কেউ

২০ Muzafer Sherif—The Outlines of Social Psychology p 332

কেউ এই স্তর আর অতিক্রম করতে পারে না (Fixation); সেটা অস্বাভাবিক।

সম্প্রতি ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসের Illustrated Weekly নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে এরূপ একটি অস্বাভাবিক ভালবাসা ও অপরাধের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। জুলিয়েট্ হিউম্ ও পলিন্ পার্কার নামে নিউজিল্যাণ্ডের দু'টি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ষোল বছরের মেয়ে একত্র হ'য়ে পলিনের মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। জুলিয়েটের বাবা অধ্যাপক হিউম্ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট পদ বর্তমানে অধিকার করেন, ও এ্যাটম্ বোমা সম্বন্ধে বৃটিশ গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম্ পেরীর সহকর্মী। অধ্যাপক হিউম্ যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ গ্রহণ করেন ও সপরিবারে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন কন্যা জুলিয়েট তার বান্ধবী পলিনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পলিনের মাতা তাতে বাধা দেন। উভয়ের আসক্তি এত অস্বাভাবিক ও গভীর ছিল যে তারা ষড়যন্ত্র করে পলিনের মাতাকে ইঁট দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলে। তারা দুজনেই এখন ভিন্ন ভিন্ন জেলে আছে ও পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্কাদি রাখতে দেওয়া হয় না।

জুলিয়েটের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক হতে অনেক উচ্চস্তরের। মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, যখন সে তার কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হবে, তখন অপরাধের গুরুত্ব বুঝে যদি সে অভিভূত হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে, তাহলে হয়ত বা পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্না নারীর সমকক্ষ সে হতে পারবে। বর্তমানে তার মাতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষের ফলে আপন অপরাধ সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। সে তার মাতাকে (বর্তমানে মিসেস পেরী) মিঃ পেরীর (তখন পিতৃবন্ধু) সঙ্গে এক শয্যায় দেখতে পায়, তার ডায়েরীর এই কথার সত্যতা তার মাতা আদালতে অস্বীকার করেন। জুলিয়েট নিজেকে সত্যবাদী বলে। তার সঙ্গীরা এখন সব নীচ শ্রেণীর খুনী আসামীর দল। সে সময় কাটায় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে। চিকিৎসকরা মনে করেন, এই রচনার মারফতই হয়ত জগত তার মনের পরিচয় পাবে।

শৈশব হতে মা ও বাবার ভালবাসা বা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্বন্ধ হতে বঞ্চিত জীবন সভ্য সমাজে কত বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, উপরোক্ত ঘটনা তারই একটি উদাহরণ মাত্র।

বয়ঃসন্ধিকাল সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ নয়। শৈশবেও যে চাহিদাগুলি প্রধান ছিল এখনও তাই আছে, রূপগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু বস্তুর। এখনও চাই পরিবারের, একান্ত আপন জনের ভালবাসায় আপন মূল্যবোধ, অপরকে ভালবাসা ও বন্ধুদলের বা জগতের চক্ষে নিজেকে মূল্যবান প্রমাণিত করা, ও সর্বশেষে কোনও আদর্শ-ধর্ম বা দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা।

ধীরে অপর শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নয়, বিপরীত-লিঙ্গের প্রতিই ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ দেখা যায়। মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেরা, ও ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হ'য়ে ওঠে ও আলোচনা করে।

এর পরেই আসে বিপরীত লিঙ্গের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আকর্ষণ। প্রথম পর্য্যায়ে এই আকর্ষণ থাকে বিদ্রোহী, আদর্শবাদী ও কল্পনা-বিলাসী। দ্বিতীয় পর্যায়ে যৌবনের প্রাক্কালে তা প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এ আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবেই দেহধর্মী ও যৌনকেন্দ্রিক।

অধিকাংশ আমেরিকান্ মনোবিজ্ঞানী যৌবনাগমে যৌন-চেতনার প্রাবল্য ও বিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁরা একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তার কারণ তাঁরা আমেরিকার তরুণ তরুণীদেরই বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনগ্রসর বা গ্রামকেন্দ্রিক ও পরিশ্রমী বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের অভিমত যে আমেরিকান তরুণীদের যৌন চেতনা বিলাসী, কৃত্রিম ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার ফল (Kinsey Report দ্রষ্টব্য)। "যেখানে শিশুরা সহজ গ্রামীন্ পরিবেশে বর্ধিত হয়, যেখানে জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামে অল্প বয়স থেকেই তরুণদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং যেখানে বড়দের মধ্যে স্বাভাবিক যৌনতথ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত গোপনতার প্রয়াস নেই, সেখানে এ বোধ তেমন উগ্র হয়ে ওঠে না। যৌন-আবেদন-মূলক সিনেমা, বিজ্ঞান, পত্রিকা ইত্যাদির দায়িত্ব এ সম্বন্ধে সামান্য নয়। রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় এ সমস্যা তরুণদের মধ্যে এখন অত্যুগ্র হয়ে উঠেনি একথা অনেক নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন।"[২৪]

কিশোরে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে দেখতে হবে যৌন-জীবন সম্পর্কে শিক্ষা যাতে যৌনচেতনা সম্বন্ধে একটা সুস্থ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, অবৈধ কৌতূহলের

২৪ K. Davis Adolescence & Social Structure, p. 15

কোন অবকাশ না জন্মে। যৌন-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম বা অনুরাগের বিকাশ একই তালে বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যৌন-জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অস্বাভাবিক কৌতূহল দুইই মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর। এ বিষয়ে সুশিক্ষার প্রয়োজন যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে পিংকেভিচ্ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কাজেই যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন—যৌনজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমেই দিতে হবে। এ বিষয়ে শিশু বা তরুণদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সামাজিক জীবন আলোচনা কালে প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের এ বিষয়ের আলোচনাতে নিয়ে যাবেন।"[২৫]

যৌনজীবন সম্পর্কে শিক্ষায় যৌনক্রিয়া ও আবেগ যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির তৃপ্তির উপায় নয়—এর দায়িত্ব ও মহৎ তাৎপর্য্যের কথা তরুণ-তরুণীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। "ঢাক্ ঢাক্ গুরগুর" গোপনতার নীতি নয়—স্পষ্ট স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক আলোচনারই প্রয়োজন। তাদের স্বাভাবিক শুচিতাবোধ, সংযম, 'ইজ্জত'এর কাছেই আবেদন করতে হবে। এর বিপদ সম্পর্কেও তাদের সচেতন করতে হবে কিন্তু মিথ্যার সাহায্যে ও ভয় দিয়ে নয়।

আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও বশ্যতা স্বীকার—এ সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আনুগত্য বা বশ্যতা-স্বীকাররূপ দুই বিপরীত সহজাত সংস্কার বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বীপরিত আবেগ—অহং-বোধ ও হীনমন্যতাও যুক্ত থাকে। কিশোরের ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক সময়ই সে বিদ্রোহী হয়, কারো বশ্যতা সে মানতে চায় না। এবং প্রায়ই বড়দের সঙ্গে মতের বিরোধ হয় এবং সংঘাত বাধে। এই সংগ্রামী ও বিদ্রোহী মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয় না।

বড়দের সঙ্গে তরুণদের সংঘাতের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মুজাফর সেরিফ্ বলেছেন যৌবনাগমে একদিকে তরুণের মনে নানা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং নিজেকে বয়স্কের পর্যায়ে স্থাপন করবার জন্যে তার সাধ যায়, কিন্তু অন্য দিকে সে গুরুজনদের কাছে পায় নানা বাধা-নিষেধ—এসব বাধা নিষেধও অনেক সময় বিপরীত ও স্বতঃবিরোধী। কখনও তাঁরা তাকে নিতান্ত বালক বলে জ্ঞান করেন, এবং 'জ্যাঠামীর' জন্য তিরস্কার করেন, আবার কখনো বা বয়স্কোচিত আচরণ তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। এর

২৫ Pinkevitch Education in Soviet Russia, p. 334

ফলে তার নিজস্ব স্থানটি কি, সে সম্বন্ধে তার মনে অনিশ্চয়তা জন্মে। সে বোধ করতে থাকে তার চারপাশের জগৎ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, "পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না—এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না",—সে পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ।" তার মনে সমস্ত জিনিষের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে—এবং কোন কোন চরম ক্ষেত্রে সে নিজ জীবনটাই নিরর্থক মনে করে। সে তার দুঃখ ও বেদনার জন্য গুরুজনদের দায়ী করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। তাদের কাছ থেকে নিবিড় আদরের গোপন লোভ তার মনে থাকে, তা তৃপ্ত না হওয়াতে তার মন ক্ষুব্ধ হয়।"[২৬]

তার এই অহংবোধের পেছনে থাকে আত্মসচেতনতা; তার নিজের মধ্যে পরিবর্তনগুলি বিশেষ ভাবেই সে অনুভব করে। সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকে লজ্জা, অপ্রতিভ ভাব ও একপ্রকার হীনমন্যতা। বাস্তবিক পক্ষে কোন সহৃদয় সমব্যথী, যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্ব অনুকরণ করতে তার ভাল লাগে কিন্তু মুখে সে তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

দুই আপাত-বিরোধী শক্তির কার্যের ফলে কিশোরকে মনে হয়, সে স্বতঃবিরোধিতার সমষ্টি। কোন সময় লোকসমক্ষে সে লজ্জিত, অপ্রতিভ ও বিব্রত, কোন সময় সে বিদ্রোহী, রাগী ও অহংকারী।

এ সম্বন্ধে বাউলি বলছেন, "যৌবনাগমে তরুণদের সঙ্গে বাস শক্ত ব্যাপার। তারা খিটখিটে, চিন্তাশীল সেন্টিমেন্টাল্। তারা অন্যের দোষ ধরতে ব্যগ্র, বহ্বাড়ম্বরে পটু, আত্মসচেতন এবং চলন ধরণে অসচ্ছন্দ। তাদের বিরক্ত-ব্যবহারের কারণ অনেক সময়ই হচ্ছে, তাদের অনুভূতির বিকাশের গর্ভযন্ত্রণা। তারা নিজেদের মত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করে, তার কারণ, তারা মনে মনে জানে তারা নিতান্ত অজ্ঞ; তারা বহ্বাড়ম্বরে পটু কারণ, নিজেদের গুণের অভাব সম্বন্ধে তারা সচেতন; তারা নিজেদের দাবী ও অধিকার অন্যেরা স্বীকার করে নিক্, এ জন্যই ব্যস্ত—কিন্তু কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথ এ বয়সের ছেলেদের সম্বন্ধে বলেছেন :—

"তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেই লাগে না! স্নেহও উদ্রেক করে না। তাহার

২৬ Muzafer Sherif An Outline of Social Psychology p. 224.

২৭ A Bowley The Natural Development of the Child p 143.

সম্বস্থও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, আর কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশবের ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্যবোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না। এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে—চারিদিকের স্নেহ-শূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারী-জাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠস্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।" ২৮

আত্মসচেতনতা ও আদর্শবাদ—আত্মসচেতনতার ফলে কিশোর নিজের কঠোর সমালোচনা করে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সে সন্ধিহান হয় ও বাইরের মানের দিকে লক্ষ্য থাকে। তার অন্তরের অপূর্ণতা-বোধ অনেক সময়ই আদর্শবাদে ও যৌন-কামনায় পরিণত হয়। নানাপ্রকার আদর্শবাদ ও জীবন-দর্শনও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। শিল্পকলা, ধর্ম, নীতিজ্ঞান—নিজেকে ভাল করা ও অপরকে উন্নত করা,—সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনে আদর্শবাদ—পৃথিবীর কাঠামো বদলে দেবার ইচ্ছা,—ইত্যাদি ভাবে সে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, এবং অপরের প্রদর্শিত পথে আত্মবিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ বয়সে তাই কোন কোন ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। দেখা গেছে, নাৎসী ও কম্যুনিষ্ট জীবনদর্শন কিশোর ও কিশোরীরা বিশেষ গভীর ভাবে অন্তরের সহিত গ্রহণ করেছে। তার কারণ অনেকটা এই যে, এই বয়সে ধর্ম-জিজ্ঞাসা

২৮ রবীন্দ্রনাথ—ছুটি, গল্পগুচ্ছ

অনেক সময় বিশেষ প্রবল হয় ও যে জীবন-দর্শন বা ধর্ম সহজ ও সুস্পষ্টভাবে জীবনের পথ নির্দেশ করে, যার প্রতি আনুগত্য সহজ,—যাকে আঁকড়িয়ে ধরা যায়, তার প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যে ধর্ম অত্যন্ত abstract, সাধারণ জীবনের সহিত সম্পর্কহীন সে ধর্মে তাদের আঁকড়িয়ে ধরবার চাহিদা পূর্ণ হয় না, এবং তাদের নিরাপত্তা-বোধ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও চঞ্চলতা দেখা যায়, তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ, বর্তমান জগতের আঙ্গিকে থাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন ব্যবহারিক ধর্ম ও জীবনদর্শনের অভাব। যে মূল্যবোধ, যে ধর্ম-বোধ, যে পাপপুণ্যবোধ আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, গত দুই যুদ্ধের আঘাতে, দেশবিভাগের ফলে, ও আর্থিক কারণে তার ভিত্তি অনেকটাই শিথিল হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যুবক যুবতীদের কাছে ভবিষ্যৎ জীবিকার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেহে মনে বিষম অস্থিরতা দেখা দেয়।

বয়স্ক তরুণদের সুস্থ বিকাশের জন্য সুন্দর নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্মের প্রতি, বা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কোন দার্শনিক মতবাদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের মনে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বীরত্বের প্রতি আকর্ষণ, সমাজসেবা, দেশভ্রমণ, যুবসমিতি গঠন রূপ রচনাত্মক কাজে লাগাবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ স্পৃহা যাতে উদ্দেশ্যমূলক হয় ও অস্থিরমতিত্বে পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

"যৌবনাগমের প্রত্যূষে নিজ দেশ ত্যাগ করে দূরদেশ ভ্রমণের স্পৃহা হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হয়। জীবন যেন মধুঋতুর আগমনে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে ("এ কী আকুলতা ভুবনে, এ কী চঞ্চলতা পবনে")। গৃহ যেন বড় সংকীর্ণ একঘেয়ে, অসহণীয় মনে হয় এবং বিচিত্র জন মুখর পথ যেন দূরদিগন্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে।...এ প্রবৃত্তি যদি সুস্থভাবে বিকশিত না হতে পারে, এবং উপযুক্ত শাসনের দ্বারা যদি একে সীমায়িত করা না যায় তা হলে বয়স্ক জীবনে এর থেকেই সৃষ্টি হবে, অধিক ভ্রমণকারী, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী, ভবঘুরে, ইত্যাদি মানুষ, অথবা এমন সব মানসিক ধৈর্যহীন মানুষ, যারা কেবলই তাদের জীবিকার পরিবর্তন করে—যারা সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে

আবার সহরে, বাড়ী ঘর থেকে হোটেলে কেবলই ছুটাছুটি করে বেড়ায়; এরা হয় তেমন ঘুরে-বেড়ানোর দল যাদের ঘোরা ছাড়া আর কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই।"[২৯]

কিশোরের দৈহিক, মানসিক ও আনুভূতিক দিক বিবেচনা করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার হলে ভাল হয় ও পিতামাতা ও শিক্ষক তার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করলে, সে সর্বতোভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সে আলোচনা সংক্ষেপে করছি।

বয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কি হওয়া উচিত—(১) গৃহ—কিশোরের পক্ষে প্রয়োজন, ঘরের অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত যত্ন এ দুই থেকেই মুক্তি। এগার বার বছর বয়স হ'তে চলে, এই বন্ধন-মুক্তির পালা, যাতে কুড়ি একুশ বছরে সে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সুতরাং—শিশুর পক্ষে যে পদে পদে শাসনের প্রয়োজন ছিল, কিশোরের বেলায় সেই শাসন নিজেকে করতে শেখে ও সংযম অভ্যাস করে (self-discipline and self-control)।

তাকে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, এবং তার নতুন ব্যক্তিত্ব বোধকে দমিয়ে দেওয়া অন্যায়। কারণ, তার ফলে সে বিদ্রোহ করবে, অথবা ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। চাণক্য বলেছেন—'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে—পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ'। তাকে বন্ধুনির্বাচনেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া ভাল।

(২) কিশোরের পক্ষে প্রয়োজন প্রচুর ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য, পরিশ্রম ও খেলাধূলার সুযোগ এবং গৃহে স্নেহ, যত্ন, নিরাপত্তা বোধ। যখন তার মনে নানা ভাবের আলোড়ন বা ঝড় চলে, তখন শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ গৃহের অত্যন্ত প্রয়োজন, তার বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার জন্য। তার পিতামাতা যদি জীবনে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, সে ব্যর্থতার ক্ষোভজনিত মানসিক বিকার নিশ্চয়ই তিনি তার সন্তানদের জীবনে সংক্রামিত করবেন না। এ বয়সের অনুভূতি বড় তীক্ষ্ণ, তাই কিশোরেরা সহজেই পিতামাতার জীবনের প্রশান্তি বা মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তাই এ উপদেশ খুবই সঙ্গত, যে পিতামাতা যদি আধুনিক সামাজিক জীবন বা আদর্শের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে থাকেন, তবে সে চেতনা ও ক্ষোভ তাঁর সন্তানদের মধ্যে কিছুতেই ছড়িয়ে

২৯ Stanley Hall, Adolescence

দেবেন না। ভবিষ্যত পরিবর্তনশীল পৃথিবী বর্তমান কালের কিশোরদের বাস করতে হবে এবং নিজের চেষ্টায়ই তার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে নিতে হবে।

(৩) নিজ গৃহ সম্বন্ধে কিশোর মনে গর্ব থাকা প্রয়োজন। নিজ গৃহ পরিজন সম্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ থাকলে, জীবনে গুরুতর অসঙ্গতি বা বিকার ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

যে সব কিশোর আপনাকে গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, হয় তারা গড়ে ওঠে অত্যন্ত নির্ভরশীল, স্বাধীন-চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি হিসাবে; তারা সর্বদাই খোঁজে মায়ের আঁচল, সর্বদাই খোঁজে কোন বরণী প্রাণীর আশ্রয়-ছায়া। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীতটিই ঘটে, অর্থাৎ তারা খুব ঘটা করে দেখাতে চায় যে তারা কিছু গ্রাহ্য করে না,—কোন নীতির শাসন তারা মানে না। একটি অশিষ্ট ছেলে এ ভাবটি প্রকাশ করেছে এ ভাষায় "আমি নীতির শাসন মানিনি কারণ আমি এক-চোখা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি, আমি আসল মরদ।[৩০]

বিদ্যালয়—কিশোরের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। সেই উদ্দেশ্য সফল হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা (a varied curriculum), কিশোরের আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী। দ্বিতীয় প্রয়োজন ছাত্রদের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী যথেষ্ট কাজের তাগিদ।

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শিক্ষা আইন (১৯৪৪), একথা মেনে নিয়েছে- যে কৈশোরে বুদ্ধি ও বিশেষ যোগ্যতার স্ফুরণ হয়। তারই উপর নির্ভর করে, এগার বছর বয়সে, আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাগুলিও মোটামুটি একথা স্বীকার করে নিয়েছে।

এ বিষয়ে একটু সতর্কতাসূচক কথা বলা যেতে পারে। যদিও এ কথা সত্য যে, সাধারণ যোগ্যতা বা জেনারেল ইনটেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা দেয়, কিন্তু বিশেষ যোগ্যতা বা স্পেশাল এবিলিটিজ্ অনেকটা পরে প্রকাশ পায়। এবং সব কিশোরের বিকাশের হার সমান নয়। সে হিসাবে কৈশোরের গোড়াতেই সবাইকে একই সময়ে

৩০ Cyril Burt—B. J. E. P.—1943

পরীক্ষা করে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণের পরিকল্পনা মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে গডফ্রে টমসন্ তাই বলেছেন, যৌবনাগমের শেষে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিশিষ্ট (স্পেশালাইজড্) করার পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং এটা নিন্দনীয় নয়, তবে দেখতে হবে যাতে বিশিষ্ট বিষয়টি শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সমগ্র বিষয়টি বোধের সহায়ক হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ের বিশিষ্ট বিভাগ করণের (স্পেশালাইজেশন্) প্রকৃত বিপদ এই নয় যে ছাত্রেরা বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করছে, বিপদ হচ্ছে শিক্ষকেরা সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিষয় বস্তুকে দেখেন, তার ফলে ছাত্রের মনে তার নির্বাচিত বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি একটা উপেক্ষার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়।"[৩১]

এখানে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক কিশোরের ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশের প্রথম থেকে একটি হিসাব রাখা, ও প্রত্যেক কিশোরের প্রতিভার স্ফুরণ কোন দিকে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শুধু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই নয়, সে শিক্ষাদান পদ্ধতিও এমন হতে হবে, যে কিশোর যেন শিক্ষার মূল্য বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তার আগ্রহ ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে। একঘেয়ে কাজ তাদের ভাল লাগে না, কিন্তু অভ্যাস ও অনুশীলনের মূল্য আছে, এ কথা যখন তারা বুঝতে পারবে, আর বিষয় বস্তুগুলির সাধারণ সূত্রগুলি যখন আয়ত্ত ক'রে বিষয় বস্তুতে রস পাবে, তখন তাঁদের মনোযোগ সহজে আসবে। তাদের কাজ করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। এবং স্বাধীন চিন্তা, ও নূতন পরীক্ষার দিকে তাদের উৎসাহিত করা খুব দরকার।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগ কি করে করা যায়, এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা হয়েছে। সমজাতীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে, তাদের যোগ্যতা, শিক্ষা, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের মাপকাঠি অনুযায়ীই তা করা উচিত। তবে, যারা এ্যাভারেজ বা সাধারণ ছেলে, তাদের পক্ষে সমজাতীয় শ্রেণীবিভাগই সবচেয়ে ভাল। যারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী বা নিতান্ত নির্বোধ, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

---

৩১ Godfrey Thomson—A Modern Philosophy of Education p. 222

এ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে, ইস্কুল শুধুই একটা লেখা-পড়া শেখবার জায়গা যেন না হয়। ইস্কুলের সমাজ জীবন ছেলেমেয়েদের দেহ মনের সহজ স্বাভাবিক বিকাশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। খেলা-ধুলা, বন্ধুত্ব, মারামারি, বিতর্ক সভা, নাটক অভিনয়, দল বেঁধে পিক্‌নিক্ (চড়ুইভাতি) ভ্রমণ, এ সবের মধ্য দিয়েই দেহ মনের জড়তা কাটে, আত্মপ্রকাশের আনন্দলাভ হয়, দশজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা বাড়ে, আত্মপ্রত্যয় আসে, বক্তৃতা ও নেতৃত্ব শিক্ষা হয়, দায়িত্ববোধ বাড়ে, সংগঠনের কৌশল আয়ত্ত হয়। সকলের থেকে বড় কথা, এ সব আনন্দময় উৎসাহপূর্ণ উদ্যমের মধ্য দিয়ে অনুভূতির জীবনের জটিলতা ও সংঘাতের স্বচ্ছন্দ মুক্তি ঘটে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও ক্লাশঘরের কাজের অতিরিক্ত এ জাতীয় বিচিত্র উদ্যমের (co-curricular activities) ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষকের কর্তব্য দেখা যাতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে, এ সব স্বাভাবিক উদ্যমের মধ্য দিয়ে তার রুচি ও নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ পায়, এবং যাতে সে আত্মপ্রত্যয়, আত্মসংযম, সমাজ-সচেতনতা এ সব সদ্‌গুণ আয়ত্ব করতে পারে ও আনন্দময় চিত্তে প্রশান্তি লাভ ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশলাভ করতে পারে।

বিদ্যালয়ে কিশোরদের উপর শৃঙ্খলা-বিধি আরোপ করা ও শাস্তি দান একটি সমস্যা। যতদূর সম্ভব শাস্তি, বিশেষ করে দৈহিক শাস্তি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং শাস্তি দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তার কৃতকর্মের ফল হিসাবে ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সে শাস্তি দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার, যে শাস্তি যেন ভয়-বিহ্বল না করে। ভয় ও নিরাপত্তা বোধের অভাব সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। বারট্রাণ্ড রাসেল এ কথাটির উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন। তার মতে বর্তমান জগতের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে অহেতুক ভয়। ভয় মানুষকে পঙ্গু করে, বিকৃত করে, নষ্ট করে। শিশুকে ভয়-জয়ের মন্ত্রই শেখাতে হবে। শিশুকে ভয় দিয়ে বশ করার মত কাপুরুষতা ও মূঢ়তা আর কিছু নেই। এই ভয় অনেক সময়, নানা শারীরিক বিকার ও মূত্রাদোষের কারণ। বাউলি বলছেন, ভয় এবং তার সঙ্গী দুর্ভাবনা এ দুটি আবেগই অনেক সময় কিশোরদের তোৎলামীর কারণ, কাজেই ছাত্রদের দায়িত্ব যে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত, তাদের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন যাতে ছাত্রদের এ আবেগ-গুলি অতি তীব্রভাবে বা খুব ঘন ঘন অনুভব করতে না হয়।[৩২]

৩২ Bowley—The Natural Development of the child p. 136

আর একটা জিনিষও দেখা দরকার। শাস্তির ফলে, কিশোর যেন এ কথা মনে না করে, যে সে "একেবারে বাজে", শিক্ষকের কাছে বা তার বন্ধুদের কাছে তার আর কোন দাম নেই। এ মূল্যহীনতা বোধ (the sense of rejection) এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের মনে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এর ফল অনেক সময় উল্টোই হয়। তাই শাস্তি নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে, প্রকাশ্যভাবে না দেওয়াই উচিত। আর সকলের থেকে বড় কথা, শাস্তি যাকে দেওয়া হ'ল সে যেন এটা বোধ করতে পারে যে, শিক্ষক বা পিতামাতা যদিও শাস্তি দিচ্ছেন তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাস সে হারাচ্ছে না। শাস্তি যেন তার আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে। এ সম্বন্ধে ফ্লেমিং বলছেন, "যৌবনাগমে তরুণদের প্রয়োজন প্রশংসমান একটি দলে অন্তর্ভুক্তি—পিতামাতা বা শিক্ষক কোন কিশোরকে কোন কারণে নিন্দা বা তিরস্কার করলে তখন যেন সে বুঝতে পারে তার পিতামাতার বা শিক্ষকের আন্তরিক স্নেহ সে হারায়নি। ভর্ৎসনা কালেও পিতামাতা বা শিক্ষক তাকে যেন বলেন, 'তুমি যত অন্যায়ই করো তবু তোমাকে আমরা স্নেহ করি; কিন্তু তোমার ব্যবহারটি আপত্তিজনক হয়েছে। এ ব্যবহার আমরা অনুমোদন করি না।" মিথ্যা ভয় ও তাড়না কিশোরের সুস্থ বিকাশের জন্য যে নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন তা, নষ্ট করে।[৩৩]

সংঘাত ও সঙ্গতির অভাবে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। অন্ততঃ যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কিশোরদের মনে অসুবিধা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে, তা নিয়ে আলোচনা করা ভাল। এর ফলে সে জানবে যে তার মত ভুক্তভোগী আরো অনেক আছে এবং প্রত্যেককেই এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদি সে জানে যে গুরুতর ভাব বিপর্যয়, যেমন বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা, এমন কি, আত্মহত্যা করার কল্পনা, তার একার জীবনেই শুধু ঘটে না, তাহ'লে তার মনে খানিকটা ভরসা আসতে পারে। বিশেষ ক'রে, তার দৈহিক পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে, পূর্ব হতে কিছু জ্ঞান থাকলে পরিবর্তনগুলিকে সে শান্ত ভাবেই গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে শরীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এ সবের সাহায্যে মানব-দেহ ও যৌন-জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞানলাভ, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আনতে সহায়তা করে।

৩৩ C. M. Fleming—The Social Psychology of Education p. 87

কিশোরদের মধ্যে অনেক সময়েই নানা রকম 'হবি' ও নানাবিষয়ে উৎসাহ যেমন, কাঠ, টিন দিয়ে নানা খেলনা তৈরী করা, মাটির মূর্তি গড়া, ফটোগ্রাফি, ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ ও উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী নাও হ'তে পারে। বাড়ীতে, ক্লাবে বা বিদ্যালয়ে, সর্বত্রই এই অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ভ্যালেনটিন্ বলেন, যে এই অস্থিরতা ও অনবরত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই, সে তার নিজস্ব রুচির সন্ধান পাবে, ও স্থায়ী আনন্দ ও উৎসাহের কেন্দ্র কোন ক্রিয়া বা বস্তু সে আবিষ্কার করবে।

কৈশোরের একটি বড় সমস্যা—অপরাধপ্রবণতা বা ডিলিংকোয়েন্সী। এগার, বার, তের বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বেশী দেখা যায়। সিরিল বার্ট তাঁর 'দি ইয়ং ডিলিংকোয়েন্ট' নামক পুস্তকে বলেছেন যে কিশোর অপরাধীদের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশ, শৈশবকাল হতেই কোন না কোন কারণে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না, এবং তাদের ব্যবহার সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না।

কু-সংসর্গ ও চৌর্য ইত্যাদি অপরাধের হাত হতে কিশোরদের রক্ষা করতে হলে, প্রয়োজন—শান্তিপূর্ণ, সদাচারী ও আনন্দময় গৃহের পরিবেশ, ভাল বন্ধুর সঙ্গ এবং বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা। কিশোরের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় যাতে না হয়, যাতে তা পূর্ণভাবে কাজে লাগান যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে পিংকেভিচ বলেছেন, "কাজেই এটা খুবই প্রয়োজন যে এই শক্তির উৎসকে শিক্ষার জন্য যে ক্রিয়া সব চেয়ে মূল্যবান্ বা গুরুত্বপূর্ণ সে ক্রিয়াগুলির সহায়ক হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। এ প্রাণ-শক্তিকে প্রচুর শারীরিক শ্রম যাতে প্রয়োজন হয় এমন ব্যায়াম, খেলা ধুলা, ক্ষেত চাষ, গাছকাটা ইত্যাদি কাজে ও বুদ্ধির চর্চা, যুব সংগঠন ইত্যাদি শুভকার্যে নিয়োজিত করতে হবে। **যদি কিশোরের শক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে এ রকম ভাবে বৃহৎক্ষেত্রে মুক্তি-দানের সুব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এ মৌলিক জৈব শক্তি তীব্র যৌন-আকাঙ্ক্ষার অপচয়কর পথে ধাবিত হবে না।**"[৩৪]

অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশ থেকে যে কিশোরেরা আসে, তাদের পক্ষে বিশেষ

৩৪ Pinkevitch, Education in Soviet Russia P. 94

প্রয়োজন, নানাপ্রকার যুব-সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া ও বিদ্যালয়ে স্নেহশীল কিন্তু কঠোর শিক্ষকের অধীনে নিজেকে পরিচালিত করা।

পরিশেষে শিক্ষক অভিভাবক ও ছাত্র-নেতাকে অতি সন্তর্পণে ও ধৈর্যের সঙ্গে কিশোরের সমস্যা সমাধানে রত হতে হবে। কিশোরের কোমল মন স্বাধীনতা প্রয়াসী, কিন্তু বাস্তবের রূঢ়তাকে সে ভয় পায়। তাই তার প্রয়োজন, বাস্তবিক দরদী বন্ধু ও পথ প্রদর্শকের, যে তাকে জীবনের মূল্য বুঝতে ও তার ক্ষমতা অনুযায়ী পথ নির্বাচন করতে সহায়তা করবে। অপরাধীদের সম্বন্ধে সমাজ, পিতামাতা ও শিক্ষকের সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর ঘৃণার ভাব, তাদের সুস্থ হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। কৃতাপরাধদের মনে যদি ঐ ধারণা জন্মে দেওয়া হয় যে, সে "গোল্লায় গেছে", "ওর কিছু হবে না" তা হ'লে তার নীচুতে নেমে যাবার পথ আরো সুগম করে দেওয়া হয়। শিক্ষকের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে অপরাধীও মানুষ, অপরাধী বা ক্রিমিন্যাল্ বলে আলাদা একটা ঘৃণ্য জাত নেই এবং সকলেরই সংস্কারের আশা আছে। রাশিয়ার শিক্ষাবিদ্ তাই বলেন, "কোন কোন মানুষের অপরাধপ্রবণতা মজ্জাগত, এটা নিতান্ত মিথ্যা কথা। রাশিয়াতে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, অপরাধকারী ব্যক্তিরা বুদ্ধি বা মানসিক বৃত্তিতে মূলতঃ স্বাভাবিক এবং তাদের ব্যবহারের বিকার চিকিৎসাযোগ্য ও সংশোধিতব্য।"[৩৫]

ভারতবর্ষ চিরদিন বিশ্বাস করেছে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বে, তাই শিক্ষকের মূলমন্ত্র হবে, "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।"

রাশিয়াতে এ কথাটির উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে যে, অপরাধপ্রবণতার মূল কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Socio-economic)। যে দুষ্ট ও অসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থায় অপরাধ জন্মগ্রহণ করে, মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেরই উচিত, সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে সুস্থ ও সুখী মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত অর্থসাম্যের ভিত্তিতে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবার।

উত্তর কৈশোরের আর একটি বড় সমস্যা কর্ম-সংস্থান বা জীবিকার পথনির্দেশ (vocational guidance)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর অধিকাংশ তরুণ ও তরুণীর প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় কর্ম-সংস্থান। সুরক্ষিত জীবন যাপনের পর হঠাৎ সমস্যা-সংকুল বিরাট জগতের মধ্যে তাদের দিশাহারা

৩৫ Pinkevitch—Education in Soviet Russia. p. 103

হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। অদম্য উৎসাহ-ভরা কিশোরচিত্ত নৈরাশ্যের বেদনায় ভেঙ্গে পড়বে, যদি সে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না করে, ও নিজ ক্ষমতা, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মের সন্ধান না পায়। এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে।

গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবিকার পথ নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে উপলব্ধি করা হয়েছে ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই পথনির্দেশের মনস্তত্ত্বসম্মত কয়েকটি বিশেষ সুচিন্তিত ধাপ রয়েছে যেমন, সাধারণ বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাপ নির্ধারণ, ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কে অধিক সাফল্য লাভ করবে তার মাপ, স্কুল কলেজে সে কতটা শিক্ষালাভ করেছে, (general intelligence, specialability and aptitude, scholastic level) স্বাস্থ্য ও চেহারা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। তারপর বিভিন্ন কর্মের সংবাদ-প্রদান ও তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান ও সর্বশেষ কর্মের সংস্থান—কিশোরদের পক্ষে অপরিহার্য।

সর্বশেষে এই বয়সেই ছাত্রদের মনে একটি সুস্থ সুসঙ্গত জীবন দর্শনের (philosophy of life) দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে যা তাদের নানা দুঃখ বেদনা সংগ্রাম ও নিরাশার মধ্যেও স্থির থাকতে সাহায্য করবে।

অপরাধ প্রবণতা

অপরাধ-প্রবণতার হেতু—Causes of delinquency—অপরাধ-প্রবণতার মূল হেতু কি, এ সমস্যা নিয়ে এত বিস্তর আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে যে তার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও শক্ত। সিরিল্ বার্ট অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে যে যে অবস্থা প্রায়ই যুক্ত আছে বলে দেখা যায়, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণদের অনুভূতির জীবনে একটা সমতা বা সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায় (innate emotional instability)। উড্ওয়ার্থ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Psycho-neuorotic Question-naire method) দিয়ে মানসিক স্থৈর্য পরীক্ষা করে দেখেছেন, অপরাধপ্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত।[৩৬] শৈশবকাল থেকে

৩৬ R. S. Woodworth, Personal Data sheet p. 94

তারা কোন না কোন কারণে অসুস্থ—স্বাভাবিক ব্যবহার তাদের নয় (behaviour difficulties)। কখনো কখনো এর কারণ কোন দৈহিক ত্রুটি হতে পারে (কালা, খোঁড়া, বোবা)। সমাজের ব্যবহারে তাদের অনুভূতির জীবন অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কখনো কখনো দেখা যায় এই অপরাধপ্রবণ ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি অপরিণত। গডার্ড বুদ্ধিপরিমাপক পরীক্ষা নিয়ে দেখেছেন যে এ জাতীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৯০ জনই ক্ষীণবুদ্ধি।[৩৭]

হীলিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন, এসব অপরাধীদের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি বা নৈতিক বিচারের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় না—অভাব দেখা যায় মানসিক ক্ষমতার—এরা ক্ষীণবুদ্ধি।[৩৮]

ট্রেড্‌গোল্ড-এর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মতে অধিকাংশ অপরাধপ্রবণ ছেলে মেয়ের বুদ্ধি সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ কখনো তারা সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু তাদের নীতিজ্ঞান অত্যন্ত অপরিণত বা বিকৃত।[৩৯]

অন্যান্য যে অবস্থাগুলি কখনো কখনো অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে দেখা যায়, তা হচ্ছে অবসর সময়ে নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার অভাব (undesirable recreational facilities), এবং বাড়ীতে ঠাসাঠাসি ভিড় (congested condition of one's place of residenc)। সাংসারিক অসচ্ছলতা কখনো কখনো অপরাধ-প্রবণতার সহগামী অবস্থা। কিন্তু দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু "দারিদ্র্যদোষগুণরাশিনাশী", কাজেই দারিদ্র্যের সঙ্গে অনেক সময় এমন সব অবস্থা আসে, যা অপরাধ-প্রবণতার অনুকূল। বার্ট দেখেছেন অপরাধ-প্রবণ ছেলেমেয়েদের শতকরা ১০ জন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ৫৭ জন মোটামুটি দুঃস্থ পরিবার থেকে আসে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, যে সব ছেলেমেয়ে অপরাধ-প্রবণ নয়, তাদের মধ্যে শতকরা ৮ জন অতি দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ২২ জন মধ্যবিত্ত পরিবারের। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে বহু মহাপুরুষ

---

৩৭ H. H. Goddard Feebe-mindedness. p 46

৩৮ W. Healy—The Individual Delinquent, p. 783

৩৯ A. F. Tredgold—Mental Deficiency, p. 26

জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় চেষ্টায় তাঁরা যশস্বী হয়েছেন এমন বহু উদাহরণ, স্বদেশ ও বিদেশ থেকে দেওয়া যাবে। কাজেই সিরিল বার্ট কেবল মাত্র দারিদ্র্যকে অপরাধ প্রবণতার কারণ বলে মনে করেন না।

অপরাধ-প্রবণতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী হচ্ছে, কুসঙ্গ ও সুশাসনের অভাব। সাধারণতঃ দেখা যায় বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে অপরাধ করে। কিন্তু এদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও নেতার নির্দেশ মেনে চলবার অভ্যাসরূপ সদ্‌গুণ প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার ইলিনয় সহরে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যত অপরাধ করে তার শতকরা নব্বইটিই দলবদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা গেছে। এই গোষ্ঠীচেতনাকে সুকৌশলে মোড় ফিরিয়ে সৎকাজে প্রবৃত্ত করানো শিক্ষক, ছাত্রনেতা, সমাজসংস্কারকের একটি প্রধান কর্তব্য।

শৈশবে পিতামাতা পরিজনের অতিশয় প্রশ্রয়, অথবা অতি নির্মম শাসন দুই-ই মানসিক বিকার সৃষ্টির জন্যে দায়ী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই আমরা এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারি।

কিন্তু অপরাধপ্রবণতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী অবস্থা, যা প্রায় সর্বদাই অপরাধপ্রবণতার ক্ষেত্রে দেখা যায়,—তা হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল, কদর্য, অপরিচ্ছন্ন ও অশান্তিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ (unsatisfactory home environment)। যেখানে পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, যেখানে তাঁদের জীবন কলুষপূর্ণ, তাঁরা কলহ-পরায়ণ, সংকীর্ণচেতা, পরনিন্দা-তৎপর, মিথ্যাচারী নিষ্ঠুর ও প্রবঞ্চক, সেখানে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকার না ঘটলেই তা আশ্চর্যের কথা। যেখানে গৃহ বিপর্যস্ত (broken homes) হয়েছে, পিতা বা মাতার অকাল মৃত্যুতে, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা অন্য কোন অসামাজিক কারণে, সেখানে এ বিপর্যয় সকলের থেকে বেশী প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে সন্তানদের উপর। বার্ট দেখিয়েছেন অপরাধীদের শতকরা ৫০ থেকে ৫৮ জন আসে "বিপর্যস্তগৃহ" থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই এদের গৃহে যৌন-নীতিহীনতা, অতিরিক্ত মদ্যপান, এবং কলহ অশান্তি দেখা যায়—সাধারণের তুলনায় এসব পরিবারে পানাসক্তি ৩ গুণ বেশী, যৌন-নীতিহীনতা ৪ গুণ বেশী, অতিরিক্ত কলহপরায়ণতা ৬ গুণ বেশী। [৪০]

৪০ Cyril Burt—The Young Delinquent, P, 65.

হিলি ও ব্রনার, অপরাধপ্রবণতার বাহ্য কারণ থেকে, মানসিক ও অনুভূতিমূলক কারণের উপর বেশী গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে, যেখানে ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত বোধ করে, সেখানেই অপরাধপ্রবণতার সূত্রপাত হয়। অপরাধ-প্রবণতার কারণ, কোন না কোন আকর্ষণীয় বস্তু (স্নেহ, প্রীতি) থেকে বঞ্চিত হওয়া (**some form of deprivation**)। এমন ছেলেমেয়েদের মনে নিরানন্দতা এবং অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, অথবা কোন গভীর ভয় বা ঘৃণাব্যঞ্জক অনুভূতি দ্বারা তারা মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। এর পরিণাম, (১) পলায়নের প্রবৃত্তি—দুঃখময় পরিবেশ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা, (২) নিজের যোগ্যতা বা নৈতিকতা প্রমাণ করবার জন্যে একটু বেশী বাহাদুরী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, (৩) পরিবার-পরিজন, বিশেষ করে পিতামাতার প্রতি হিংসার প্রবৃত্তি, (৪) অস্বাভাবিক পাপবোধ ও আত্মপীড়নের চেষ্টা।[৪১] বহু মনঃস্তাত্ত্বিকই অপরাধীর মানসিক অসুস্থতার প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করেছেন। উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রণালীসম্মত সুচিকিৎসায় বহু কৃতাপরাধ কিশোর কিশোরী অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে সুস্থ হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনুভূতির জগতে অতৃপ্তি ও সামঞ্জস্যের অভাবই অপরাধপ্রবণতার প্রধান কারণ—এ মত বাউলিও সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন শিশুমনের মৌলিক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি যেখানে সহজ পরিতৃপ্তির পথ পায় না, সেখানে অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত (যা এ বয়সে ছেলেমেয়ের গল্পের বই, সিনেমা, বা কুসঙ্গীদের কাছ থেকে পেতে পারে) তাকে সহজেই এই অবাঞ্ছিত পথে পদক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ করে। যে শিশু স্নেহবঞ্চিত, যে শিশুর মনে এ বোধ জন্মেছে যে সে তার প্রাপ্য স্নেহ পাচ্ছে না ; সে অনাদৃত, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, যার মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব—অধিকাংশ জারজ সন্তান—তাদের মনে গোপন ক্ষোভ সঞ্চিত হয়, তারা প্রথমতঃ পিতামাতার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং পরে সমগ্র সমাজের প্রতিই বিরূপ হয়। যে শিশু নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে, সে অসন্তুষ্ট, সে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশের পথ খোঁজে। যদি বন্ধুবান্ধব, সিনেমা, গল্পের বই-এ তার আবেগ প্রকাশের

৪১ Healy & Bronner—A New light on Delinquency. p. 41

অসামাজিক ও অপরাধপ্রবণ কর্মের উৎসাহ বা ইঙ্গিত পায় তা হলে তার মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান সে অপরাধের মধ্যেই খোঁজে।[৪২]

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ তরুণদের অপরাধপ্রবণতার প্রশ্নকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে না দেখে, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখেছেন। তাঁদের মতে, এই সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। তারই ফল, দারিদ্র্য পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অশান্তি, তারই ফল অসুখী ও অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ। যেখানে সমাজ ব্যবস্থার মূলে আছে সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা সেখানে কোন তরুণই নিজেকে বঞ্চিত বা অবাঞ্ছিত মনে করবে না, তাই তার মানসিক স্থৈর্যও বিপর্যস্ত হবে না। সুস্থ পরিবেশই ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

হাডফিল্ড্ সত্যই বলেছেন যে অপরাধপরায়ণতা শৈশব কৈশোরের বহুপ্রকার অসামাজিক ব্যবহারের (Antisocial behaviour) সাধারণ নাম। এই ব্যবহারগুলি সবই সমান গুরুতর নয়—তাদের কারণও একপ্রকার নয়। তাই অপরাধপ্রবণতা সংশোধন করতে হলে, অপরাধগুলির শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। কোন্ অপরাধ কোন্ কারণ থেকে ঘটেছে, তা জানতে পারলে তবেই তার সংশোধন সম্ভব। বিভিন্ন কারণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়টি শ্রেণীতে অপরাধগুলির শ্রেণীবিভাগ তিনি করেছেন :

1. **Benign delinquency**-এগুলি মোটেই গুরুতর নয় এবং এজাতীয় ব্যবহার ব্যক্তিত্বের কোন স্থায়ী বিকৃতি সূচনা করে না। যেমন, নিতান্ত কৌতুহল বশতঃ অথবা অন্যছেলেকে চটাবার উদ্দেশ্যে অথবা বাহাদুরী নেবার জন্যে যদি কোন কিশোর অন্য একটি কিশোরের ঝর্ণা কলমটা লুকিয়ে রাখে, তা হ'লে সে অন্যায় করছে ঠিকই, কিন্তু এ অন্যায়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। নির্দোষ অর্বুদ (benign tumour)-এর মত, এজাতীয় অপরাধ অনেকটা নির্দোষ (benign)।

2. **Temperamental delinquency**—অনেক অন্যায় আচরণের পিছনে থাকে কোন দৈহিক অস্বস্তি, উত্তেজনা বা পীড়িত অবস্থা। নিতান্ত বুদ্ধিহীন ছেলে (mentally deficient) হয়তো অন্যের ছবির বই না বলেই

৪২ A. Bowley—The Natural Development of the Child, p. 120

নিয়ে গেল। এমন ছেলের মস্তিষ্ক অপরিপুষ্ট সুতরাং তার বুদ্ধিও অপরিণত—সে ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদই জানে না। রক্তে শর্করার (blood sugar) পরিমাণ কমে গেলে, কোন কোন ব্যক্তির মনে খুন জখম ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের প্রবণতা জাগে। ঋতু কালে কোন কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা যায় এবং এ অবস্থায় তারা ভীষণ বদমেজাজ দেখায়। এ অবস্থায় কেউ কেউ গৃহত্যাগ করে পালিয়ে যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে সংশোধনের উপায় দেহের অস্বাভাবিক অবস্থার সুচিকিৎসা।

3. Simple delinquency—এ জাতীয় অপরাধের মূল হল অশিক্ষা বা কুশিক্ষা। যে সব পিতামাতার নৈতিক আচরণ অসন্তোষজনক এবং যেখানে তাঁরা সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন না, সেখানে ছেলে মেয়েরা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বা বিকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে। এ সব পরিবারের ছেলে-মেয়ে চুরি করে পিতামাতার তিরস্কার লাভ তো করেই না, বরঞ্চ তারা প্রশ্রয়ই পেয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে সংশোধনের উপায় পিতামাতা ও সন্তানদের সুশিক্ষা দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্রের পরিবর্তন।

4. Reaction delinquency—এ জাতীয় এবং পরবর্তী শ্রেণীর অপরাধের পশ্চাতে ক্রিয়া করে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, এবং এ জাতীয় অপরাধের সংশোধন কষ্টসাধ্য। শিশু বা কিশোর স্বভাবতঃই স্নেহ ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু কোন কারণে যদি সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে তার মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত। তার সমস্ত ব্যবহারে ও রুক্ষ আচরণে এ কথা সে স্পষ্ট করে জানাতে চায় যে কারো ভালবাসা সে চায় না—সে দুনিয়াকে পরোয়া করে না। তার স্নেহবঞ্চিত (সেটা কাল্পনিকও হতে পারে) হৃদয়ের ক্ষোভ ধ্বংসাত্মক, অসামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ খোঁজে। এখানে তার বাস্তবিক প্রয়োজন, স্নেহ ও সহানুভূতির—কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিপরীত—সে সমস্ত স্নেহ ভালবাসা রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিশোধ নিতে চাইলো। যে সব ছেলে বড় বেশী বড়াই করে, অতিরিক্ত সাহসিকতা দেখাতে চায়—আসলে সে হয়তো ভীরু—সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে না। শাস্তি দিয়ে এসব ক্ষেত্রে বিপরীত ফলই হয়। প্রয়োজন এখানে, ব্যক্তির সামাজিক-মানসিক সমগ্র অবস্থার বিশ্লেষণ করে তার ক্ষোভের কারণটি অনুসন্ধান এবং তার অপসারণ।

5. **Psycho-neurotic delinquency**—যেখানে কিশোর মনের তীব্র অনুভূতির স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশের পথ রুদ্ধ (ভয়ে বা লজ্জায়), সেখানে সে তার অনুভূতির আলোড়নকে অবদমিত করে এবং তার নির্জ্ঞান মনে তা অপসারিত হয়। কিন্তু এই অনুভূতির সংঘাত নির্মূল হয় না। অবচেতন মনে নির্ব্বাসিত হয়েও তা ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেই তার চেতন ব্যবহারকে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় তাকে সমাজবিরোধী আচরণে প্রবৃত্ত করায়। কথনো কথনো দেখা যায় স্বচ্ছল অবস্থার ঘরের ছেলে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষ চুরি করে (Kleptomania) ধরা পড়লে সে নিজ অপরাধ অস্বীকার করে না এবং নিজ কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে। কিন্তু নিজেও সে জানেনা, কেন সে চুরি করেছে। মনঃসমীক্ষণ দ্বারাই কেবলমাত্র তার অবচেতন মনে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি ও আদর্শের অমীমাংসিত সাংঘাতটির স্বরূপ জানতে পারা যায় এবং এপথেই কেবল তার সংশোধন হতে পারে।

Hadfield—Chilhood and Adolescence p. 248-252

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শিশুর দৈহিক বিকাশের ধারা

শিশুর মাথাটা দেহের তুলনায় বেশী বড়, দেহের অন্য অংশের তুলনায় তার মাথার ওজনটাও বেশী। তার কারণ তার দেহের অন্যান্য অংশের স্নায়ুকোষের সংখ্যা জন্মকালে যা থাকে, যৌবনকালে তার বিশগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের সংখ্যা জন্মকালেই নির্দিষ্ট; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা বাড়ে না। তাই কোন শিশুর বুদ্ধি কতটা হবে, তার সর্বোচ্চ সীমা জন্মকালেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, শত চেষ্টায়ও সে সীমা অতিক্রম করা যায় না এবং সব শিশু যে সমান বুদ্ধিমান্ কেন হয় না, তাও বোঝা যায়। সব শিশুর মস্তিষ্কে স্নায়ু পদার্থ সমান নয়। জন্মকালে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সংখ্যা যা থাকে, ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাদের পুষ্টি ও পরিণতি ঘটে এবং বিভিন্ন কোষের পরস্পরের মধ্যে এবং স্নায়ুকেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। এই জন্যেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধির বৃদ্ধি কতটা হবে তার সর্বোচ্চ সীমা জন্মকালেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এইখানে বংশগতবাদীদের জয়।

বাড়ন্ত শিশুর দেহের বৃদ্ধির একটা ছন্দ আছে। দ্রুত বৃদ্ধির (period of rapid growth) পর আসে একটা স্তব্ধতার কাল, তখন যে বৃদ্ধিটা হয়েছে, তা যেন পাকাপোক্ত হয় (a period of consolidation)। আবার একটা দ্রুতবৃদ্ধির কাল আসে। তারপর আবার আসে স্তব্ধতার কাল। মনোবিজ্ঞানীরা ও দেহবিজ্ঞানীরা বহুশিশুকে (লম্বায় বেড়ে উঠা এবং দেহের ওজন বৃদ্ধি) লক্ষ্য করে, বিভিন্ন বয়সের বৃদ্ধি ও স্তব্ধতার ছন্দটি একটি লেখ (graph)-এর আকারে প্রকাশ করেছেন। (পূর্বের অধ্যায় দেখ)

এ লেখ থেকে দেখা যাবে প্রথম বছরে শিশুর বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত; দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির হার মন্থরতর। এ সময়টায় পূর্বের কালের বৃদ্ধিটা পাকাপোক্ত হচ্ছে। আবার পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত দ্রুতবৃদ্ধির একটা চাড় দেখা যায়। তারপর আট থেকে দশ বৎসর অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে পূর্বের

বৃদ্ধিটা পাকাপোক্ত হয়। তৃতীয় একটা দ্রুত বৃদ্ধির সময় হচ্ছে, এগার থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ; তারপরে ষোল থেকে কুড়ি ধীরগতিতে পূর্বের বৃদ্ধি পাকাপোক্ত হয়। যৌবনে উপনীত হলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চাশের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহ শীর্ণ হতে থাকে। দ্রুত বৃদ্ধিকালে শিশু দৈর্ঘ্যে যতটা বাড়ে প্রস্থে ততটা বাড়ে না। আর ধীর বৃদ্ধির সময় শরীরটা বেশ পুরে উঠতে থাকে।

পাঁচ থেকে সাত বৎসর এই তিন বছরে বালক বালিকারা অনেকটা লম্বা হয়। এই বাড়তির সময়টাতে শৈশবের মোটাসোটা ভাবটা থাকে না। এ সময় তাদের একটু রোগাটে দেখা যায়, মুখটা আর গোলগোল পুরন্ত থাকে না—লম্বাটে ধরণের হয়—দুধের দাঁত পড়তে সুরু হয় এবং সেখানে স্থায়ী দাঁত ওঠে। মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থ দ্রুত পূর্ণতা লাভ করতে থাকে এবং সাত বছরের মধ্যেই ওজনে যতটা বাড়বার তা বাড়ে। এই হঠাৎ শরীরটা উপরের দিকে বেড়ে ওঠার সময়টা একটা অস্থিরতার সময়। এ সময় দেহের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যায় এবং হুপিং কাশি, হাম ও জলবসন্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। টন্‌সিলের অসুখও অনেকের হয়। এ সময় দেহের আপেক্ষিক শীর্ণতা স্বাভাবিক। এ নিয়ে চিন্তিত হবার খুব কারণ নেই।

ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি বা পরিণতির ছন্দ মোটামুটি এক হলেও এই বৃদ্ধির ছন্দের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ আছে। পূর্ণ যৌবনে পুরুষেরা সমবয়স্কা মেয়েদের চেয়ে লম্বায় কিছুটা বেশী উঁচু হয়, ওজনেও কিছু ভারী হয়। কিন্তু বুদ্ধি ও আবেগের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় কিছুটা কম বয়সেই পেকে ওঠে। ১৪।১৫ বছরের মেয়ে সংসারের অনেক কিছু বোঝে, কিন্তু সেই বয়সের ছেলেরা সংসার ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনেকটা অনভিজ্ঞ থাকে। ছেলে ও মেয়ের বৃদ্ধির হারের ছন্দে যে প্রভেদ (বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত) তা আগের অধ্যায়ে ছবি থেকে বেশ বোঝা যায়।

ছবি থেকে দেখা যাবে, জন্মকালে মেয়ের তুলনায় ছেলে ১/৬ ইঞ্চি বেশী লম্বা। পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলে বেশী লম্বা থাকছে—তফাৎটা বরং বেড়ে হয়েছে ১/২ ইঞ্চি। এগারো বছরে মেয়ে অনেক দ্রুততর হারে বেড়ে, মাথায় ছেলের সমান উঁচু হয়েছে। আর দুবছর পরে, অর্থাৎ তেরো বৎসর বয়সেও মেয়ের বৃদ্ধির হার দ্রুততর—সে উচ্চতায় ছেলের চেয়ে ৩/৪ ইঞ্চি বেশী হয়েছে। কিন্তু পনেরো বৎসর

হবে। দুবছরের শিশুকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়ে কোন লাভ নেই। এই সহজ কথাটা অধৈর্য পিতা মাতা ও শিক্ষক অনেক সময় ভুলে যান।

মানসিক বিকাশের ধারার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ—

শিশু যতই বড় হয়ে উঠতে থাকে ততই তার জগতের পরিধি বেড়ে যায়। একেবারে বাল্যকালে শিশুর জগৎ তার দেহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তার ইন্দ্রিয়গুলি পরিণতি লাভ করেনি—কাজেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টজ্ঞান লাভ করতে সে সমর্থ নয়। যতই সে বড় হতে থাকে, সে চলতে ফিরতে শেখে এবং চোখ ও কান দিয়ে সে দূরের জিনিষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে সক্ষম হয়। বোধের বিকাশের ক্ষেত্রে কানের চেয়েও চোখের গুরুত্ব অনেক বেশী। একেবারে ছোট শিশুর চোখের দৃষ্টি স্থির হয় না। কিন্তু দু তিন মাস বয়স হলেই তার দৃষ্টি থেকেই বোঝা যায় সে মাকে চিনতে শিখেছে—বাইরের জগৎটাকে অল্পে অল্পে বুঝতে পারছে।

শিশু মাকে লক্ষ্য করছে তার দৃষ্টি স্থির হয়েছে।

শিশুর জগতের বিস্তার যেমন **দেশে** ঘটে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, তেমনি **কালে** এ বিস্তার ঘটে স্মৃতির সাহায্যে। একেবারে ছোট শিশুর কাল সম্বন্ধে

যে বোধ, তা নিতান্ত অস্পষ্ট ; বিশেষ করে, কালের ক্রম—অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ—এর বোধ কিছুটা বড় না হলে শিশু করতে পারে না। তিন চার বৎসর পর্যন্তও বর্তমানই শিশুর কাছে একমাত্র সত্য। এই বর্তমানকেও সে বিমূর্ত ভাবে জানে না ; স্মৃতি, তুলনা, বিশ্লেষণ ও বিচার ছাড়া এ জ্ঞান সম্ভব নয়—বর্তমানকেও সে জানে, তার প্রত্যক্ষ ভাল লাগা-মন্দলাগার সঙ্গে যুক্ত করে। স্মৃতি ও কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে, বর্তমান প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার প্রভেদ বোধ যখন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তখনই কেবলমাত্র অতীত বা ভবিষ্যতের জ্ঞান শিশুর মনে জন্মে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করছি।[১]

কথা বলতে শেখা—ভাষা শেখা—শিশুর বুদ্ধি বিকাশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে ভাষা শেখা।

স্বাভাবিক দৈহিক পরিণতির ফলে শিশু গলা ও জিহ্বার সাহায্যে শব্দ করতে শেখে কিন্তু কথা বলতে শেখাটা সম্পূর্ণই ট্রেনিং ও অনুকরণ-নির্ভর। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কোন্ শব্দটি শিশু বলতে শিখবে—কোন্ ভাষায় সে কথা বলবে, তা নির্ভর করবে তার চারপাশের মানুষগুলির উপর। বাঙালীর ছেলে মেয়ে বাংলায় কথা বলতে শেখে। দক্ষিণী রাজ্যের ছেলেমেয়েরা তামিল বা তেলেগু, কন্নাদ বা মালয়ালম্ ভাষায় কথা বলতে শেখে, ইংরেজের বাচ্চা ইংরেজী বলে, ফরাসী বাপ মায়ের ছেলে ফরাসী বলে—এই শেখাটা নিতান্তই নিজের থেকে হয় না। শিশুদের ভাষা শেখাতে হয়। জন্মের থেকে কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথ আফ্রিকান্ ছেলেকে বেলজিয়ামে নিয়ে গিয়ে সেখানে কন্ভেন্টে মানুষ করলে সে বেলজিয়ান্ ভাষায়ই কথা বলতে শিখবে। তাই হবে তার 'মাতৃভাষা'। সে যদি তার আফ্রিকার কোন মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসে, তবে আপনা থেকেই আফ্রিকান্ ভাষা তার কণ্ঠে ও জিহ্বায় স্ফুরিত হবে না।

শিশুর অন্য সব ক্রিয়ার মত, কথা বলতে শেখারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। জন্মগ্রহণ করার প্রথম কয় সপ্তাহ শিশুর স্বরযন্ত্রের ক্রিয়ার একমাত্র প্রকাশ হচ্ছে কান্নায়। দু মাস বয়স হ'লে গলা থেকে "অঃ—আ-উ"—এরকম অস্পষ্ট কয়েকটা অস্ফুট শব্দ নিঃসৃত হয়। আর একটু বড় হলে, 'তা-তা, ম-মা' এরকম স্পষ্টতর আরো কয়েকটি শব্দ সে করতে পারে। ছয়মাস বয়সে শিশুর

১ Sully.—The Human Mind, Vol I pp. 320-21

অন্যের সঙ্গে প্রথম আলাপের সূত্রপাত হয়—অন্যে তার সঙ্গে কথা বললে সে খুশী হয় এবং যেন নিজেও কিছু প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করে। নয় মাস বয়সে ভাব প্রকাশক কিছু কিছু শব্দ যেন সে উচ্চারণ করতে পারে। প্রায় দেড় মাস বয়সে শিশু তার আশে পাশের মানুষদের অনুকরণে প্রথম বোধগম্য 'কথা' (বস্তুর নাম, ব্যক্তির নাম, সহজ ক্রিয়াপদ) বলতে সুরু করে। দ্বিতীয় বৎসরে তার শেখা কথার সংখ্যা প্রথম ধীরে ধীরে এবং পরে বেশ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তিন বৎসর বয়স থেকে অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি (Phrases) এবং পূর্ণ বাক্য (Sentences) সে উচ্চারণ করতে শেখে। এখানেও দেখা যায় সব শিশু সমান দ্রুত শিখে না এবং স্বাভাবিক পরিণতি এবং শিক্ষাদান দুইই শিশুর শিক্ষার পশ্চাতে ক্রিয়া করে।[২]

শিশু চার পাঁচ বছর থেকে ভাষার ব্যবহারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়। প্রথম প্রথম কয়েকটা বস্তুবাচক নাম সে শেখে। বিশেষ করে যে বস্তুগুলি তার কাছে লোভনীয় বা বিশেষ ভয়ের সে বস্তুগুলির নাম সে আয়ত্ত করে। দু-তিন বছরেই বুদ্ধির এ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—যদিও তখনও শিশু স্পষ্ট করে নাম হয়তো উচ্চারণ করতে পারে না—বলকে সে বলে 'ব-অ-অ', বিস্কুটকে সে বলে 'বি-কু' ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সহজ ক্রিয়াপদের নামও সে শিখে ফেলে। বিকেল হলেই 'বেরু' যাবার জন্যে সে বায়না ধরে। ক্রমে বিশেষণগুলি সে বুঝতে শেখে—সে তখন বলতে শেখে 'দুদ্—গ-অম্' 'ব-অ-ফ্ থান্-দা' (দুধ গরম, বরফ ঠাণ্ডা)। কি করে শিশু ভাষা শেখে—কি করে তার অর্থবোধ হয়, তার চমৎকার একটি বিবরণ আছে হেলেন্ কেলারের আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন মিস্ সুলিভ্যান্ (তাঁর শিক্ষিকা ও নিত্যসহচরী), তার কাছে বারে বারে কতগুলি জিনিষের নাম উচ্চারণ কচ্ছেন আর কেলারের হাতের উপর সে নামগুলি আঙুল দিয়ে বারে বারে লিখছেন। (বলা প্রয়োজন হেলেন্ কেলার্ খুব অল্প বয়সেই কঠিন অসুখে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি দুইই হারান।) কিন্তু কিছুতেই কেলার শিখতে পাচ্ছেন না ; Water ও Mug এ দুইয়ের প্রভেদ কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছেন না। সুলিভ্যান্ তখন আর চেষ্টা করলেন না। বিকেলে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি কেলারকে নিয়ে কুঁয়োর কাছে গেলেন। সেখানে একটি লোক জল তুলছিল। সে জল কলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে বাগানের নালার মধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছিল। মিস্

২ Shirley M. M. The first two years 2 vols. 1931, 1933.

সুলিভ্যান্ কেলারের হাত সেই জলের ধারার নীচে ধরলেন। চমৎকার ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ কেলারের খুব ভাল লাগছিল। সুলিভ্যান্ কেলারকে লক্ষ্য কচ্ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন—ওয়টর্—ওয়টর্—আর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীর হাতের তালুতে আঙ্গুল দিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত বেগে লিখলেন W-a-t-e-r। হঠাৎ কেলারের মনে হল ওই শীতল স্পর্শ যার থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তারই নাম ওয়টর্। অকস্মাৎ একটা কালো আবরণ যেন মনের উপর থেকে সরে গেল। **হেলেন কেলার্ বুঝলেন সব জিনিষের নাম আছে। নামগুলি, লেখাগুলি নিরর্থক নয়, তারা কিছুকে বোঝায়।** বোধির ক্রিয়ায় একটি বদ্ধ দরজা যেন খুলে গেল। আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি একদিনে অনেকগুলি জিনিষের নাম শিখে ফেললেন।[৩]

এই ভাষা শিক্ষা শিশুর বুদ্ধির বিকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ভাষা বা চিহ্নের দ্বারা দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, বিশেষণ, সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় এ বোধ যখন আসে, তখন শিশুর মন প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুর তৎক্ষণাৎ—সান্নিধ্য ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হয়। এই চিহ্নগুলি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত (Reduced-cues) যার সাহায্যে বৃহত্তর এবং অ-শৃংখলিত অবাধ চিন্তার (Free-thinking). পথ খুলে যায়। এই ভাষা বা চিহ্নের সাহায্যে অতীত স্মৃতিকে ধরে রাখা যায়, ভবিষ্যতের প্ল্যান বা কল্পনাকে আয়ত্ত করা সহজ হয়। ক্রমে শিশু আরো যত বড় হয় ততই এই 'চিহ্ন' (Symbols)-এর সাহায্যে নির্বস্তুক চিন্তায় অভ্যস্ত হয়। সে চিহ্নগুলিকেই বস্তু বা বাস্তব ঘটনার পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে। ভবিষ্যতে কোন দেশ যাত্রার সূচী সে তখন ম্যাপ্ এবং টাইম-টেব্‌ল-এর সাহায্যে পায়ে না হেঁটেই, ছকে ফেলে ব্যবস্থা করে নিতে পারে।[৪]

দূর ও ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে চিন্তা করবার ক্ষমতা এবং পূর্বেই তার সম্পর্কে প্ল্যান্

---

৩ Helen Kaller, The Story of my life pp 23–24

কেলার লিখেছেন, I knew then that "W-a-t-e-r" meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free !...Everything had a name, and each name gave birth to a new thought.

৪ Gates, Jersild, etc. Educational Psychology p 174

করবার ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তেমনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোযোগ দেবার শক্তিও বাড়ে। ছোট শিশু যা তার সামনে আছে, তাতেই তৎক্ষণাৎ মন দিতে পারে। কিন্তু দশ বারো বৎসর বয়স হলে দীর্ঘতর সময় মনোযোগ দিতে সে সক্ষম হয় এবং যা অতীত বা ভবিষ্যতে ছিল বা ঘটবে, তাতেও সে মন দিতে পারে।

চিহ্ন বা সংক্ষিপ্ত সংকেত (reduced cues) দ্বারা সমগ্র একটি অবস্থা বোঝা এবং বাস্তব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিহ্নের ব্যবহার অবশ্যই বুদ্ধির পরিণতি নির্দেশ করে। কিন্তু দশ বার বৎসর বয়স থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শক্তি বিকশিত হলেও অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেও তার বুদ্ধির অনুরূপ বিকাশ নাও দেখা যেতে পারে। বিমূর্তীকরণ ও অর্থগ্রহণ দশ বারো বৎসরের বালকের পক্ষে সহজ নয়। যে বাস্তব অবস্থায় কোন বিশেষ গুণটি সংলগ্ন থাকতে সে দেখেছে, তার থেকে পৃথক করে সাধারণ ভাবে সে গুণটি বিমূর্তভাবে বুঝতে পারে না। সে জন্যে বহু বিমূর্ত-ধারণাই (abstract concepts) ছাত্রদের কাছে অস্পষ্ট ও অপূর্ণ থেকে যায়। বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার মধ্যে গুণটি ছাত্রের কাছে বারে বারে উপস্থাপিত হলে, তবেই বিমূর্তভাবের পূর্ণ অর্থগ্রহণ সম্ভবপর হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এটা একটা মস্ত ত্রুটি যে আমরা বই পুস্তকে ছাত্রদের কাছে অনেক বেশী বিমূর্ত-ধারণা ধরে দেই,—শিক্ষার বেলায়ও অনেক বিমূর্ত-ধারণার ব্যবহার করি, কিন্তু ছাত্রেরা বহু অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সেই গুণগুলি দেখবার সুযোগ পায় না—তাই তাদের অনেক ধারণাই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং কখনো কখনো হাস্যকর ভাবে বিকৃত থেকে যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌ বার বছরের কয়েকটি ছেলেকে 'সুবিচার' (Justice) কি, তাহা বুঝিয়ে বলতে বলা হ'ল। একজন বল্ল, দাঁড়িপাল্লা, আর একজন বল্ল 'আদালত', আর একজন বলল 'জজ সাহেব' আর এক জন বলল 'শাস্তি দেওয়া'—আর একজন বলল 'উপকার করা'। আবার উপকার করা কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে কেউ বল্ল 'গরীব লোককে ভিক্ষা দেওয়া'। কেউ বল্ল 'অসুখের সময় ডাক্তার ডেকে দেওয়া', কেউ বল্ল, 'ক্লাশে কোন বন্ধু পেন্সিল না আনলে পেন্সিল ধার দেওয়া'। সবগুলি উত্তরই বিমূর্ত ধারণাটিকে বিশেষ একটি অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা।[৫] শিক্ষা-

৫ K. L. Smoke. An objective study of Concept formation—Psychological Monography, 1932, 42, No 4.

দিকে এ কথা ভাল করে বুঝতে হবে যে বুদ্ধির পরিণতি হয় বস্তুর ধারণা থেকে নির্বস্তুকে,—বিশেষ থেকে সামান্যে। নির্বস্তুক ও সামান্যভাবের অর্থবোধ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ এবং বুদ্ধির পরিণতি সাপেক্ষ। একটু বয়স বেশী হ'লে তবেই বালক-বালিকারা বিশেষ একটি অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থা থেকে বিমূর্তগুণটি সাধারণ গুণ হিসাবে বুঝতে শেখে।[৬]

শিশুর বুদ্ধি, মনোযোগ, কৌতুহল ইত্যাদি সমস্ত মানসিক বৃত্তিই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে; সবদিকেই যে সমান উন্নতি দেখা যায় তা নয়— এবং উন্নতিটা যে মসৃণ ও একটানা ভাবে হয়, তাও নয়—তবে মোটামুটিভাবে স্পষ্টতার দিকে, বহুত্বের দিকে ও সুসম্বদ্ধতার দিকে ক্রমাগত গতি চলতে থাকে, একথা বলা যায়। উন্নতির স্তরগুলি স্পষ্ট বিভক্ত নয় এবং অকস্মাৎ একস্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নয়ন ঘটে না। তবে সাধারণ ভাবে, কোন বিশেষ বয়সে, কোন বিশেষ বিষয়ে কৌতুহল, মনোযোগ বা ক্রিয়ার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। এক থেকে দুই বৎসর অবধি শিশু তার ইন্দ্রিয়ের সুব্যবহার এবং পেশীর সুসম্বদ্ধ ক্রিয়ার দিকেই তার প্রায় সবটা মনোযোগ নিয়োগ করে। এ সময়ে শিশু সব জিনিষ হাত দিয়ে ধরতে চায়, মুখে পুরতে চায়, নাড়ে চাড়ে, ঘুরিয়ে দেখে, ফেলে দেয়, গড়িয়ে দেয়—এ সব ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাহ্য জগতের বস্তুগুলি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সে আহরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার দ্বারা জটিল ও সুসম্বদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালনের সাহায্যে নিজ শক্তির পরিচয় দেয় এবং তাতে তৃপ্তিলাভ করে। এ সব ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ববোধের গোড়াপত্তন হয়। এক বছর বয়স থেকেই শিশু গলা দিয়ে নানারকম দুর্বোধ্য শব্দ করতে থাকে—এতে তার ভাষা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। দু'বছরের কাছাকাছি সে 'প্রথম কথা' উচ্চারণ করে পিতা-মাতাকে চমৎকৃত করে দেয়। পিতামাতার পক্ষে সে এক স্মরণীয় আনন্দকর দিন।[৭]

---

৬ Gates, Jersild, etc. Educational Psychology p 433-34

৭ অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্ হাস্য কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচার শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

তিন বৎসরের পর থেকে শিশুর কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়—তার খেলার মধ্য দিয়ে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুতুলটা তার 'খুকু'। তাকে সে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, শাসন করে—বাঁশের কঞ্চি হয় ঘোড়া, সিগারেটের বাক্স হয় বাড়ী, ওষুধের কৌটাগুলো জড়ো করে হয়, রেল গাড়ী—এমনি, কত কি তার 'যেন-যেন' (make-believe) খেলা। সাত আট বৎসর পর্যন্ত এর ঝোঁকটা যথেষ্ট প্রবল থাকে।[৮] ক্রমে সে পৃথিবীটাকে অনেকটা বাস্তব চোখে দেখতে শেখে। তার আগে থেকে চার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় সব বিষয় জানবার কৌতূহল—সব বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি (the questioning age)—কেন? কোথায়? কেমন? ইত্যাদি।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে 'মা' পিসিকে 'পিচি' এবং রাইচরণকে 'চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গল্পগুচ্ছ—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন।

৮ আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্খী নদীর মোড়ে,
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকা চড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে;
রৌদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত ঝড়ে মুক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় বসে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দূরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।
একদিন সেই নাগকুমারী বলে উঠল, 'কেও'।
জবাব পেলে, 'দয়া করে আমার বাড়ি যেয়ো।
রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,
মণ্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা।
ঘোড়সওয়ারী সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে,
রক্তবরণ ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোড়ার রথে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গল্পসল্প' পৃঃ ৫৫-৫৬

পূর্বেই বলা হয়েছে ভাষাশিক্ষা শুধু যে চিন্তার দিক দিয়েই একটা মস্ত উন্নতি সূচনা করে তাই নয়—অনুভূতি এবং সামাজিক চেতনা বিকাশেও এটা একটা প্রকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সাড়ে তিন বৎসর বয়সেই শিশুরা ছোট ছোট যুক্তি বিচার করবার শক্তি ক্রমে ক্রমে অর্জন করে—চার বৎসর বয়স হ'লে কিছুটা গুছিয়ে যুক্তি প্রকাশ করতে পারে। সাড়ে তিন বছর বয়সে বাপ্পি জানতো টেবিলের উপর ঘড়িটা তার ধরতে নেই। আমি একদিন সে ঘড়িটা ধরতেই, সে চোখ বড় বড় করে বললো,—'ধোলোনা—মা মার্‌বে' (ধোরনা মা মারবে)। চার বছর বয়সের টুবাইকে বললাম "টুবাই তোমার লাল জুতো আমায় দাও।" টুবাই বল্লে—"তুমি তো বড়ো-লোক ওটা তোমার ছোট হবে।" **দশ বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু ও বালকদের যুক্তি কোন বাস্তব-সমস্যা সমাধানের (problem solving) সঙ্গে যুক্ত থাকে।** বস্তু-নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তার ক্ষমতা স্কুলে মাঝারি ক্লাশে যখন পড়ে (দশ বার বৎসর বয়স) তখন থেকে সুরু হয়। ক্রমে জটিল যুক্তি শৃংখল (chain of reasoning) ব্যবহারের ক্ষমতা সে আয়ত্ত করে। যৌবনাগমে (পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সে) নির্বস্তুক জটিল ও দীর্ঘ যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রায় পূর্ণ বিকশিত হয় এবং তখন তরুণেরা বর্তমানের বাস্তব সমস্যা সমাধানেই শুধু যুক্তি ব্যবহার করে না—প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত দূর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভে তখন যুক্তি ব্যবহারে তখন তারা অভ্যস্ত হয়। এই ক্ষমতাই বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি উচ্চতম জ্ঞানলাভের উপায়। যতই বয়সের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বাস্তবের সঙ্গে ও বিশেষ ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ততই অর্থবোধ স্পষ্ট হয় এবং বিমূর্ত ধারণা ব্যবহারের শক্তি বৃদ্ধি পায়।[১] সাত আট বৎসর বয়স থেকে নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বালক স্বল্পকালের জন্য লক্ষ্য করতে পারে এবং আত্মবোধ বা ব্যক্তিত্ববোধের সূচনা হয়।

---

১ The younger the child, the more do his everyday thoughts tend to be concerned with events related to his own immediate experience and well being ; as he grows older, he becomes increasingly able to occupy himself with more remote issues and to deal with abstractions as distinguished from concrete experiences.

Gates, Jersild etc. Educational Psychology p. 203

জীবনের প্রথম এক বৎসরেই শিশুর মনে প্রত্যক্ষের দাগ কতটা থেকে যায় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মনের এই ধরে রাখবার ক্ষমতা না থাকলে শিশু তো শিখতেই পারতো না। কিন্তু মনের ধরে রাখার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপুল অভিজ্ঞতার মস্ত একটা অংশ হারিয়ে যায়, এটাও লক্ষ্যণীয়। বাস্তবিক পক্ষে মনের এই অতীত অভিজ্ঞতা মুছে ফেলবার ক্ষমতা যদি না থাকতো, তা হ'লে মন নূতন অভিজ্ঞতা বুঝি অর্জন করতেই পারতো না।

দেখা যায় যে অধিকাংশ মানুষই তিন বৎসর বয়সের পূর্বের কোন কথা স্মরণ করতে পারে না। আর অতীত জীবনের সেই ঘটনাগুলিই আমরা মনে রাখি, যেগুলি আমাদের কোন গভীর অনুভূতি উদ্রেক করেছিল। এও দেখা যায় **দুঃখের স্মৃতির চেয়ে সুখের স্মৃতিই মনে গভীরতর দাগ কাটে।** মন যেন বেদনার ক্ষতগুলি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে চায়—কৃপণের মত আনন্দের উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলিকে ধরে রাখতে চায়। এর দ্বারা জীবনটা অধিকতর সহনীয় হয়। কিন্তু বিফলতা ও বেদনার অভিজ্ঞতাগুলি স্মরণ রাখলে ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ সুগম হয়।[১০]

শিশুর বুদ্ধি ও নৈতিক বিচারের বিকাশ তার সমাজপরিবেশ ও অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভাষা শিক্ষা ব্যাপারটা অনেকটাই সমাজ-পরিবেশ-নির্ভর —তা আমরা দেখেছি। শিশু যদি এমন পরিবারে বা বিদ্যালয়ে বড় হয়ে ওঠে যেখানে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার আবহাওয়া আছে,—যে বাড়ীতে নানাজাতীয় কৌতুহল উদ্রেককারী পুস্তক-পত্রিকা আছে, সেখানে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হয় এবং তা এক সুস্থতর আগ্রহপুষ্ট হয়ে তার চিন্তার অনুকূল পরিণতি লাভ করে। আর যে শিশু অশিক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠে, অথবা এমন পরিবারে মানুষ (?) হয় যেখানে সিনেমা খেলা ইত্যাদি হাল্কা কথা নিয়েই বাড়ীর বড়রা মত্ত থাকে, সেখানে শিশুদের মন ও চিন্তা ছোটই থেকে যায়। শিশুদের রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও বহুল পরিমাণে সমাজ-পরিবেশের প্রভাব নির্ভর। শিশু, বালক ও কিশোরদের উপর অভিভাবনের প্রভাব অসামান্য। সেই জন্যেই অনেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ বিশেষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আদর্শ ও মতামত অল্প বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেষ্টা করে।

১০ Gates, Jersild etc. Educational Psychology p 205

যে সব ছেলেমেয়েরা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা করবার সুযোগ পায় না, তারা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় ভাষা ব্যবহারে কুশলতার দিক থেকে পেছিয়ে থাকে। একেবারে বাল্যকালে শিশু নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করবে, এটাই স্বাভাবিকাতার পরিবার ও আশেপাশের সকলের মুখে যে ভাষা নিরন্তর শোনে তাই সে সহজে শেখে। বাল্যকালে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাও একসঙ্গে শিশুকে শেখানোর চেষ্টাতে (যা ইংরাজী-মাধ্যম শিশু বিদ্যালয়ে করা হয়) শিশুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, এবং তার শিক্ষার উন্নতি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।[১১] কিন্তু শিশু একটু বড় হয়ে উঠলে দুটি ভাষা একসঙ্গে শেখা শিশুর পক্ষে খুব কঠিন হয় না। কারণ, তিন চার বছর বয়সের পর থেকে দশ বার বছর পর্যন্ত শিশু খুব দ্রুত ভাষা শিখতে পারে। কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে এক সঙ্গে দুটি ভাষা শেখা বুদ্ধির পরিণতির সহায়কই হতে পারে।[১২] কিন্তু শিশু যদি ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক হয়, আর বিদ্যালয়ে তাকে তার ভাষার জন্যে 'বিদেশী' (alien) বলে যদি উপহাস সহ্য করতে হয়, তা হ'লে তার ভাষা শিক্ষায় উন্নতি ব্যাহত হওয়াই সম্ভব।

সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রেই প্রফুল্ল, আনন্দময় পরিবেশ আত্ম-উন্মোচনের সহায়ক। ভাষা শিক্ষা, অর্থ গ্রহণ, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন, সর্বত্রই চার পাশের মানুষদের প্রীতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ শিশুকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে শিক্ষকের প্রতি শিশুর মন বিরূপ, সে শিক্ষক যে বিষয় শিক্ষা দেন, তাতেও শিশু আনন্দবোধ করবে না এবং তার শিক্ষা সে বিষয়ে যথোচিত অগ্রসর হবে না। শিক্ষার উন্নতিতে অনুভূতির প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ শিক্ষক একথা ভাল করেই জানেন, তাই তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাসম্ভব আনন্দময় করে পরিবেশন করতে চান। খেলা ধুলা, গান, ছবিকে তাই শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করবার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। খেলার মধ্যেই শিশু তার সমস্ত অন্তরকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঢেলে

১১ S Arsenian. Bilingualism and Mental Development. Teacher's College Bureau of Publications. 1937. No 712

১২ Gates, Jersild etc. Educational psychology. p, 182

দেয়। কাজেই খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষাই সব চেয়ে সার্থক শিক্ষা।[১৩] খেলার আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু সমাজ জীবনে নিজেকে মিশিয়ে দিতে শেখে। যে ছেলেমেয়েরা খেলা ভালবাসে না, বুঝতে হবে, তাদের সমাজ জীবনে সঙ্গতি-সাধন অসম্পূর্ণ রয়েছে অথবা বিঘ্নিত হয়েছে।[১৪]

চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিশুর কল্পনা সজীব হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করতে ভালবাসে 'আমি এরোপ্লেন চালাচ্ছি', 'তুই যেন চোর'—ইত্যাদি। অল্প বয়সের কল্পনাটা ছবির মত রং-চংয়ে (picturesque)। সাধারণতঃ শিশুরা শক্তি-মত্তার উপাসক, তাই বাঘ, সিংহ, রাক্ষস, এঞ্জিন, পুলিশ, এ সব তারা হতে চায়। দশ বার বৎসরের 'যেন যেন' কল্পনা (make-believe) অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ হলেও তখন শক্তিপূজার ঝোঁক (hero-worship) প্রবল হয়। যৌবনাগমে কল্পনায় মধুর রসের রং (romantic imagination) লাগে। সংসারে প্রবেশ করলে যেন-যেন কল্পনার ঝোঁকটা বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অনেকটা কেটে যায়। কিন্তু শিশুর সুস্থ বিকাশ ও সুঠাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কল্পনার মূল্যকে ছোট করে দেখলে ভুল হবে। মনোবিদ্যা-বিশারদ সুশিক্ষক জানেন কি করে শিশুর এই যেন-যেন কল্পনাকে উদ্দেশ্যাভিমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ তোলা যায়।[১৫]

আগেই বলা হয়েছে যে চার পাঁচ বছরের শিশুর মধ্যেই সরল যুক্তি বিন্যাসের ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। দুই একটি ঘটনায় তাদের এ বিস্ময়কর শক্তির বিকাশ

---

১৩ Whatever you want a child to do heartily must be contrived and conducted as play. H. Coldwell Cook, the playway p. 4.
also :

True work is the highest form of play. The play motive is the deepest and most serious. It is deeper than hunger ; the artist starves himself for art. Lee. Play in Education. p. 52

১৪ Games are communal exercises they enable the child to satisfy and fulfil his social feeling. Children who evade games & play are always open to the suspicion that they have made a bad adjustment to life.

Adler : Understanding Human Nature. p. 92

১৫ Ryburn Introduction to Educational Psychology. p. 288

দেখলেও, একথা ভাবা ভুল হবে যে, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাদের অনুরূপ যুক্তিমত্তা দেখা যাবে। এমন কি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের জীবন তাদের জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে অতি উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিমত্তা ও জটিল ও দীর্ঘ যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'লেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা শিশু-সুলভ নির্বুদ্ধিতা এবং অশিক্ষিত মানুষের মত কুসংস্কারেরও পরিচয় দেন। শোনা যায় বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ আইনষ্টাইন্ লণ্ডন বাসে উঠে ভাড়ার হিসাব নিয়ে বোকার মত ভুল করেন। তখন সেই বাস্ কণ্ডাক্টর (তাঁকে অবশ্যই চিনতো না) ঠাট্টা করে বলেছিল 'নিশ্চয়ই মহাশয়ের অঙ্কের জ্ঞানটা খুব পোক্ত নয়'— "I am afraid sir, that mathematics is not your strong point !"[১৬]

নির্বস্তুক চিন্তার একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান। চার পাঁচ বছর থেকেই শিশুরা কোন কোন বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধে আছে এটা মোটামুটি বুঝতে পারে, যেমন সুইচ্‌টা টিপে দিলাম আর বাতি জ্বলে উঠল এখানে সুইচ্‌টেপা যে বাতি জ্বলার কারণ, একটা এ বয়সের শিশু বেশ বুঝতে পারে এবং তা প্রকাশ করে বলতে পারে। রসগোল্লা খেলে ওটা পেটের মধ্যে চলে যায় এটা তারা বোঝে। এমন কি, একটা জ্বলন্ত মোমবাতি কাঁচের বৈয়ম (Jar) দিয়ে ঢেকে দিলে, নিবে যায় এ পরীক্ষা তাদের দেখালে, তারা মনে করে না যে, এটা কোন ভৌতিক কাণ্ড। তারা এটাকে প্রাকৃতিক কারণ-সৃষ্ট বলেই জানে, যদিও অবশ্য কেন এটা ঘটে, তা তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। আর বস্তু নিরপেক্ষ কার্য কারণ সম্বন্ধ নীতি হিসাবে (principle of causation) তারা অবশ্যই বুঝতে পারে না। এমন কি, তার চেয়েও ছোট দুই তিন বছরের শিশুকে ফাঁকি দিয়ে যখন বলা হয় "হুস্, পাখী বল নিয়ে গেছে," আর বলটা বাঁ হাতে লুকিয়ে পেছনে নেওয়া হয় তখন শিশু 'পাখী নিয়ে গেছে' এ কথাটা তৎক্ষণাৎই মেনে নেয় না ; সেও ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছে বাঁ হাতটাকে দেখতে চেষ্টা করে। অবশ্যই সাত আট বৎসর পর্যন্তও শিশুর মনের মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার ভেদ রেখাটা খুব স্পষ্ট নয় এবং কার্য কারণ ব্যাখ্যায় কল্পনায় ও বাস্তবে মিশিয়ে সে অনেক সময় হাস্যকর রকমের ভুল করে। কিন্তু এটা যে শুধু

---

১৬ Abel—Unsynthetic modes of thinking among adults: A discussion of Piaget's concepts.

American Journal of Psychology, 1932 44, p. 123-32

শিশুদেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়; এমন কি আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরাও অপরিচিত বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের মত কল্পনা-ভিত্তিক হাস্যকর বা অস্পষ্ট ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই।[১৭] এ বিষয়ে পিয়াজেঁর (Piaget) শিশুর চিন্তা জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ মত আছে। পিয়াজেঁ বলেন শিশুদের চিন্তার ধারা পূর্ণ-বয়স্কদের চিন্তার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শিশুদের চিন্তার জগৎ কল্পনার মোহময় রাজ্য। সেখানে অসম্ভব বা অসঙ্গতি বলে কোন কথা নাই; তা বিজ্ঞানের কার্য কারণের নিয়ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। শিশুর কাছে বাঁশের লাঠিটাই ঘোড়া সেটাই পর মুহূর্তে বাঘ হয়ে যেতেও কোন বাধা নেই আবার তার কিছু পরেই সেই লাঠিই আবার কামান হয়ে শত্রুনিপাত করবে অথবা এরোপ্লেন হয়ে হুস্ করে আকাশে উড়বে।[১৮] শিশুর খেলার সময় এ জাতীয় নির্বাধ চিন্তা অবশ্যই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের বাল্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে এ রকম বহু উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর 'শিশু' বা 'গল্পসল্পে'-ও বহু কল্পনা (না, শিশু ভোলানো কল্পনা?) র কাহিনী আছে। পিয়াজেঁর এ মত চমকপ্রদ এবং শিশুর খেলা ঘরে এ জাতীয় অনেক অদ্ভুত 'সত্য' ঘটনা ঘটে, তা সত্য। কিন্তু শিশুর সমগ্র মনটাই এমন স্বপ্ন ও পরীর রাজ্যের ওড়না দিয়ে ঢাকা, এটা মনে করা ভুল। বাস্তব জগতকেও শিশু চিনতে সুরু করে শিশু বয়স থেকেই। কাজেই বাস্তব সূত্র দিয়েই সে ঘটনাবলীর কার্য কারণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়। সে কথা কিছুক্ষণ আগেই বলেছি। ডেনিস্ ও এ্যাবেল্ বহু শিশুকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে পিয়াজেঁ শিশুর বুদ্ধিজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা মনোরম হলেও বাস্তবানুগ নয়। হয়তো দু তিন বছরের শিশুর মানস জীবনে অবাধ কল্পনার প্রভাব বাস্তবানুগ চিন্তার চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু শিশুর মনের গড়ন ও তার রীতি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।[১৯] এ কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর শিশুর চিন্তার পরিণতি নির্ভর করে—যেমন সেটা নির্ভর করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে

---

১৭ Dennis—Piaget's Questions applied to a child of known environment. Jour of Genet. Psychology, 1942. 60. pp 307—320

১৮ Piaget —Judgement and Reasoning in the Child; also The child's conception of Physical Causality.

১৯ Gates Jersild etc. Educational Psychology. p 183

বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিপক্কতার উপর। যে সব ছেলে মেয়েরা যান্ত্রিক সভ্যতায় অগ্রসর দেশে বেড়ে ওঠে, স্বভাবতঃই তারা কার্য কারণ সূত্রে স্বাভাবিক যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় অনেক সহজে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু হিমালয়ের জনমানবহীন তুষারাবৃত গিরি প্রদেশের অথবা আফ্রিকার অভ্যন্তরস্থ গভীর অরণ্য-প্রদেশের ছেলে-মেয়েরা এরোপ্লেন কি করে ওড়ে, তা সহজে বুঝতে পারবে না। সব শিশুদের বেলায়ই একথা সত্য যে অল্প বয়সে, যা পরিচিত ও নিকটের তার কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যাই তারা বুঝতে পারে, কিন্তু যা নিতান্ত অপরিচিত বা যার সঙ্গে তাদের জীবনের কোন যোগ নেই তাকে তারা বুঝতে পারে না এবং নিছক নির্বস্তুক কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণা তাদের বোধের বাইরে। সাহারা মরুভূমির ছেলে মেয়েরা কি বুঝতে পারবে উত্তর মেরুতে মানুষেরা কি করে বরফের ঘর তৈরী করে তাতে বাস করে ?

শিশুর জীবনে দিবা স্বপ্ন ও স্বপ্ন—আগেই বলা হয়েছে তিন চার বৎসর বয়স থেকে শিশুর কল্পনা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একেবারে বাল্যকালে কল্পনা ও সত্যের মধ্যে প্রভেদটা খুব তীক্ষ্ণ নয়। ছয় সাত বৎসর পর্যন্ত শিশুর চিন্তা ও কর্ম কল্পনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ক্রমেই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাস্তব জগৎ ও জীবনের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয় এবং তার জীবন থেকে কল্পনার রং অনেকটা মুছে যায়। কিন্তু চার পাঁচ বৎসরের শিশুর (হয়তো আরো দু'এক বৎসর বড়োদেরও) খেলা ধূলায়, কল্পনার প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সে কখনও পুলিশ, কখনও চোর, কখনও এঞ্জিন চালক, কখনো পাইলট বলে' নিজকে কল্পনা করে ; অন্য শিশুরাও এমন কি প্রাণহীন বস্তুরাও তার কাছে কল্পনার বাঘ, ডাকাত, ছাত্র এ সব হয়। একেই বলা হয় দিবা স্বপ্ন (day dreams)। এ সব কল্পনার মধ্যে তার প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবন বা পরিবেশের ছাপ সহজেই লক্ষ্যণীয়, যেমন আমাদের টুবাই মা সেজে তার 'খুকু' পুতুলকে দুধ খাওয়ায় আর তার দাদা বাপ্পি বাবার টুপী মাথায় দিয়ে, পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে নিয়ে 'অফিসে' যায়। উত্তেজনা-কর বা নূতন অভিজ্ঞতা অবশ্যই এই কল্পনার খেলার উপাদান জোগায়। প্রথম দিন সার্কাস বা সিনেমা বা যাত্রাগান দেখে এলে, তার পর কতদিন পর্যন্ত চলে তার জের শিশুদের খেলা ও চিন্তার মধ্যে। এ সব কল্পনার খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা অনেক সময়ই তাদের অপূর্ণ ইচ্ছার তৃপ্তি খোঁজে। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে মা

'ডভো'কে আধখানার বেশী 'লাল রসকলা' (লাল রসগোল্লা অর্থাৎ লেডিকিনি) খেতে দেন নি। তাই পরদিন খেলার সময় দেখা গেল, সে রান্না রান্না খেলায় হাঁড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা তৈরী কচ্ছে। অনেক সময়, এই কল্পনার মধ্যে তার শিশু জীবনের অজানা ভয়, দুঃখ, রাগ, অভিমান এবং অমীমাংসিত অবচেতন দ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট বোনটিকে টুবাই মনে মনে হিংসা করে, তাই সে হয়তো কল্পনা করবে ছোট বোনটার যেন খুব জ্বর হয়েছে। আর ওর মা ওকে একা বাড়ীতে ফেলে, টুবাইকে নিয়ে সি এল্ টি-র 'অবনপটুয়া' দেখতে গেছে।[২০] এই কল্পনার খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সমাজ জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয় এবং খেলা খেলার মাধ্যমে সামাজিক সঙ্গতি লাভ করে। সে হিসাবে এর দাম আছে। বাস্তবিক পক্ষে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্ শিশুর এই কল্পনাকে শিক্ষার কাজে লাগান। নানা গঠনাত্মক কাজে (projects) শিশুর কল্পনাকে সফলভাবে কাজে লাগানো যায়।[২১]

মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা মনে করেন এই কল্পনার খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর অবচেতন মনের অনেক দ্বন্দ্বে ও বিশৃংখলার অবসান হতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষেও দিবা-স্বপ্ন জীবনের বহু যন্ত্রণা থেকে পলায়ণের (escape) একটি সহজ উপায়। কিন্তু তা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে কোন কাজে আসে না। এবং পূর্ণ বয়স্কের বেলায় দিবা-স্বপ্ন অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্র ভিন্ন, মানসিক ভীরুতা ও আলস্যের সূচক বলে নিন্দিত। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই দিবাস্বপ্ন তার ছোট জীবনের আশু অভিজ্ঞতা ও সমাধানের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, তার বড় ও বীর হওয়ার আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত হয়। আট দশ বছর বয়স হলে তখন সে নিজকে রামচন্দ্র, সুভাষ বসু, গান্ধী বলে কল্পনা করতে ভালবাসে।[২২] এই বীরত্বের আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই উৎসাহ দেওয়া উচিত

---

২০ Green. The Daydream (Univ of London Press 1923) also. Griffiths. Imagination in early childhood. Kegan Paul. 1943

২১ White "Interpretation of imaginative productions" in Personality and the Behaviour Disorders. Ed. J. Mcv Hunt. Vol I. ch, 6 p 214 251

২২ As the child's imagining becomes more private it also tends to deal less with everyday events and it includes more adventurous or

সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে বাস্তবানুগ এবং শুভ উদ্দেশ্য মুখী-করার মত দায়িত্ব পিতা-মাতা ও শিক্ষকের।

একেবারে কচিশিশুও স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নে খুশী হয়ে হাসে, ভয় পেয়ে কাঁদে। যতই সে বড় হয়, তার অভিজ্ঞতা বাড়ে, ততই তার স্বপ্নের উপাদান বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত হয়। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত স্বপ্নই ইচ্ছাপূরণ এবং সমস্ত ইচ্ছাই মুলতঃ যোনি কেন্দ্রিক। এ মতামত সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা কঠিন হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শিশুদের স্বপ্নেও তাদের অনুভূতি জীবনের ভয়, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব আকাঙ্ক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ চার পাঁচ মাস বয়সে শিশু যত ভয়ের স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে তত দেখে না।[২০] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে রোগ, দুশ্চিন্তা অতিরিক্ত ক্লান্তি ও অত্যাধিক উত্তেজনা বড় ছোট সকলের পক্ষেই দুঃস্বপ্ন দেখার সহায়ক। শিশুর পক্ষে সব দিকই শান্ত, শুচি, স্নিগ্ধ ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ তার সুস্থ বিকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

dramatic themes in which the child plays a heroic part. Gates Jersild etc. Educational Psychology p 194

২০ Foster & Anderson "Unpleasant dreams in childhood"—Childhood Development 7 77-84

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শিশুর অনুভূতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ

অনুভূতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ—[illegible] **[illegible]** [illegible]—its behaviour seems to be more in the nature of a "general excitement"

[illegible] **[illegible]** [illegible]

from the crude physical to the refined & symbolic,—from the concrete to the abstract.

শিশুর প্রক্ষোভ ভয়, রাগ ইত্যাদি অনুভূতির দিক দিয়ে তীব্র। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী, তা মনের মধ্যে কোন দাগ রেখে যায় না। অনুভূতির অস্পষ্ট বাষ্প (emotional mood) মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয় না। শিশু সহজেই ভুলে যায়। রাগ পুষে রাখে না। তিন চার বছরের ছেলের মেজাজ-মর্জি (temper tantrums) গুলি এদিক থেকেই বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। ছোট ছেলেদের মেজাজ মর্জিতে বড়োরা অনেক সময় বিরক্ত হই, বিব্রত হই। কিন্তু এই মেজাজ—মর্জি ব্যাপারটা কি? শিশু কোন প্রক্ষোভ, কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা অস্বস্তি খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না; তার ভাষার উপর দখল নেই, তাই তার অন্তরের অশান্তি ওই বিশৃংখল, বিরক্তিকর, ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, দুরন্ত রাগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে সেই অশান্তির যন্ত্রণাকে বার করে দিয়ে মুক্ত হতে চায়। *

একেবারে ছোট শিশুর ভয়ের বিষয়, অল্প কয়েকটি মাত্র। হঠাৎ আচমকা, তীব্র আলো বা কর্কশ শব্দে শিশু ভয় পায়; হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিলে (loss of support) অথবা ভাল করে চাপা না দিয়ে রেখে গেলে সে ভয় পায়। কিন্তু অন্ধকারের ভয়, লোমওয়ালা জন্তু জানোয়ারের ভয়, চোর, ডাকাত, পুলিসের ভয় ছোট শিশুর মনে স্বভাবতঃ জাগে না। এগুলি, আর একটু বয়স হলে, আমরা বড়রাই ওদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দি।

প্রক্ষোভ প্রকাশে সংযম—শিশু যতই বড় হয় ততই সে প্রক্ষোভের প্রকাশ সংযত করতে শেখে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সর্বদেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ব্যবহারই ক্রমশঃ অধিকতর সুশৃংখল হয়ে আসে। তা ছাড়া, ভাষা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সে অসংযত দৈহিক প্রকাশের পরিবর্তে কথার মধ্য দিয়ে প্রক্ষোভ অনেকটা পূর্ণতর ও ভদ্রভাবে প্রকাশ করতে শেখে। সামাজিক শিক্ষাও মস্ত কারণ। একেবারে শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের সমস্ত প্রকাশই, ক্ষমার চক্ষে, এমন কি কৌতুকের চক্ষে দেখা হয়। কিন্তু যতই বড় হতে থাকে, ততই শিশুর রাগ, ভয় বা আনন্দের অসংযত প্রকাশকে বড়রা

* Goodenough—Anger in young children. 1931

অপছন্দ করতে থাকেন, এবং শিশু নিজ রাগ, ভয় বা আনন্দ অসম্বৃত ভাবে প্রকাশ করতে গেলেই বড়দের কাছে ধমক খায়, অথবা তাদের কাছে উপহাস প্রাপ্ত হয়। বিষম রেগে চীৎকার করলে হয়তো বাবা খুব বকেন—ভয় প্রকাশ করলে ঠাট্টা করে বলা হয়, 'ছিঃ কী ভীরু ছেলে, মেয়েরও অধম'! ইত্যাদি, আর ভালবেসে মার কোলে বসতে গেলে, মা হয়তো বিরক্ত হয়ে বলেন 'বুড়ো ছেলের এ গা-চাটা অভ্যাস গেল না!'

প্রক্ষোভের এই প্রকাশ সংযমনের ভাল-মন্দ দুইই আছে। বয়স্ক ও সভ্য জীবনের পক্ষে এই সংযমন নিতান্ত প্রয়োজন এবং বাল্যকালেই এই শিক্ষার গোড়াপত্তন বাঞ্ছনীয়। এই সংযমন শিক্ষা ভিন্ন সভ্য সমাজজীবন সম্ভব হয় না। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে, শৈশব কাল থেকেই প্রক্ষোভগুলির স্বাভাবিক প্রকাশের পথ বন্ধ হ'লে, অবচেতন মনে নানা জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নানা মানসিক বিকৃতি ও অশান্তি দেখা দিতে পারে।[৪] ফ্রয়েডপন্থী বহু মনোবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক পাশ্চাত্যের অতিসভ্য জীবনযাত্রার পিছনে রয়েছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির অতিমাত্রায় অবদমন এবং এটা পাশ্চাত্য জগতে ক্রমবর্ধমান গুরুতর মানসিক বিকৃতি ও অশান্তির জন্য অনেকখানি দায়ী।[৫] অবদমন ও মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অন্য অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

মৌলিক প্রক্ষোভ ও তাদের ক্রমবিকাশ :—

গাছের জন্ম হয় বীজ থেকে, ক্রমে গাছ বেড়ে ওঠে, তার কাণ্ড, ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল ক্রমে দেখা দেয়। এই ক্রমবিকাশ সমস্ত জীবনবেগেরই ধর্ম তা

---

৪ Freud—the Problem of Anxiety. 1936
also
English & Pearson—Common Neuroses of Children & Adults. 1937.

৫ Pressures against a show of feeling are especially unwholesome when they become part of a process which leads people to have a false out look upon themselves. Statistics suggest that perhaps the pressures that bear upon children & adults in many cases go beyond the limits of human endurance.

Gates, Jersild etc. Educational Psychology p 88-89

বলা হয়েছে। এটা শুধু দেহের দিক থেকেই সত্য নয়, মনের দিক থেকেও সত্য। শিশুর বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের বেলায়ও আমরা দেখি, প্রথম দিকে সরল অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে জটিলতা ও বিশেষত্ব (complexity and particularisation)। এবং ক্রমজটিলতা ও ক্রমবিশেষীকরণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিত্বের ঐক্য।

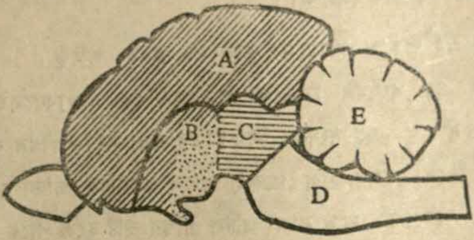

Centre of emotion in the brain, A-cerebral hemisphees B, dien cephalon, or between-brain (including thalamus); C, the mesencephalon, or mid-brain; D, the medulla oblongata, E, the carebellum. The light dotted part of B is the centre for the emotions. If this part is cut into all emotional disturbances seem to disappear. Modified from P. Barb.

মৌল প্রক্ষোভ ক'টি আর কি ভাবেই বা তাদের ক্রমবিকাশ ঘটে এ নিয়ে অধুনাই মনোবিদ্যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা কচ্ছেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ক্রমবিকাশের ধারণাটার সঙ্গে সামান্যই পরিচিত ছিলেন—তাই তাঁরা মানস জীবন আলোচনা কালে বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগের উপরই নির্ভর করতেন। তাই মূল প্রক্ষোভ ক'টি, এর উত্তর দিতে গিয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বকল্পিত কতগুলি ধারণার উপর নির্ভর করে তাঁরা বলতেন—ভয়, রাগ, ভালবাসা, যৌন-কামনা, বিস্ময়, দুঃখ ও আনন্দ এই কটি হচ্ছে মানুষের আদিম আবেগ।

আধুনিক কালে ফ্রয়েড্ তাঁর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলেছেন জীবনের মৌল প্রক্ষোভ বা অনুভূতি একটিই; তা হচ্ছে আদিম কাম-ইদ্ (Id) তারই থেকে এসেছে অহংবুদ্ধি (ego) ও সমাজ চেতনা (super-ego)। ব্যক্তির সমগ্র মানসজীবন এই তিনেরই ক্রিয়া থেকে সঞ্জাত। ওয়াট্সন ভূয়ো-

দর্শন ও পরীক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিশুর মৌল প্রক্ষোভ তিনটি—(১) ভয় (২) রাগ (৩) ভালবাসা। ভয়কে বলা যায় সব চেয়ে আদিম। এর উদ্ভব, হঠাৎ কর্কশ ও উচ্চ শব্দ থেকে, অথবা হঠাৎ যখন সে অনুভব করে সে পড়ে যাচ্ছে (loss of support)। শিশুর রাগ বা বিরক্তি আর একটু বড় হলে দেখা দেয়। তার স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালনে বাধা দিলে (এবং আরো বড় হ'লে) বা তার হাত থেকে বা অধিকার থেকে কিছু কেড়ে নিলে শিশু রেগে যায়। ভালবাসা শিশু বোঝে। তাকে ভালো করে জড়িয়ে আদর করে চেপে ধরলে সে খুশী হয়।

শিশুর জীবনে মৌল-প্রক্ষোভগুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্প্রতি যাঁরা বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে গুডেনাফ, সুজান্ আইজ্যাক্স, গেসেল্, শারম্যান, ক্যানন্ ও ব্রিজেসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ আধুনিক শিশু-মনোবিদের মত যে জন্মের প্রথম দু'এক মাস কাল শিশুর সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভ অথবা তার প্রকাশ দেখা যায় না। প্রথম দিকে শিশুর মধ্যে দেখা যায় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট সাধারণ এক উত্তেজনা। এটাই মৌলপ্রক্ষোভ। শারম্যান্ ও ব্রিজেস্ দুজনেই তাই ওয়াট্‌সনের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, ভয়, রাগ, ভালবাসা ইত্যাদি স্পষ্ট বিক্ষোভের বিভাগ শিশুর জীবনের প্রথম দিকে দেখা যায় না।[৬] লীপার্ বলেছেন, যে প্রক্ষোভগুলি মূলতঃ দৈহিক শক্তি এবং এরা প্রাণীর সকল উদ্বর্তনের সহায়ক (sublimation)।[৭] গুডেনাফ্ অবশ্য বলেন যে ভয়, রাগ, ভালবাসা ইত্যাদি প্রধান প্রক্ষোভগুলির প্রকাশের দৈহিক প্যাটার্ণ বাল্যকাল থেকেই অনেকটা সুনির্দিষ্ট।

ক্যাথারিন্ ব্রীজেস্ প্রসূতিভবন এবং শিশুসদনের বহু শিশুর প্রক্ষোভ প্রকাশক ব্যবহার লক্ষ্য করে তাদের অনেক ছবি তোলেন। একেবারে সদ্যোজাত শিশু থেকে, তিনি দুবৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন বয়সের প্রক্ষোভমূলক ছবিগুলি তুলনা করে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রথম মাস পর্যন্ত শিশুর প্রক্ষোভের কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকে না—তখন থাকে একটা অনির্দেশ্য

[৬] Murphy. A Briefer General Psychology pp. 88-9.

[৭] Leeper. A Motivational theory of Emotion to replace emotion as disorganization response. Psychological Review, 1948 55. p 19

সাধারণ জৈব উত্তেজনা (excitement) মাত্র। কিন্তু ছ'মাস থেকে তিন মাসের মধ্যে আনন্দ এবং অস্বস্তি এই দুইটি বিপরীত প্রাক্ষোভিক প্রকাশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। চার মাস বয়স হ'লে অস্বস্তির প্রকাশ প্রথম পরিণতি লাভ করে রাগে, পাঁচ মাসে শিশু বিরক্তি প্রকাশ করতে শেখে ; ছয় মাস বয়স থেকে ভয়ের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আরো অনেকটা পরে প্রায় দেড় বছরের কাছাকাছি শিশুর মধ্যে অন্য শিশু সম্পর্কে ঈর্ষা বা হিংসা দেখা দেয়। অন্য দিকে

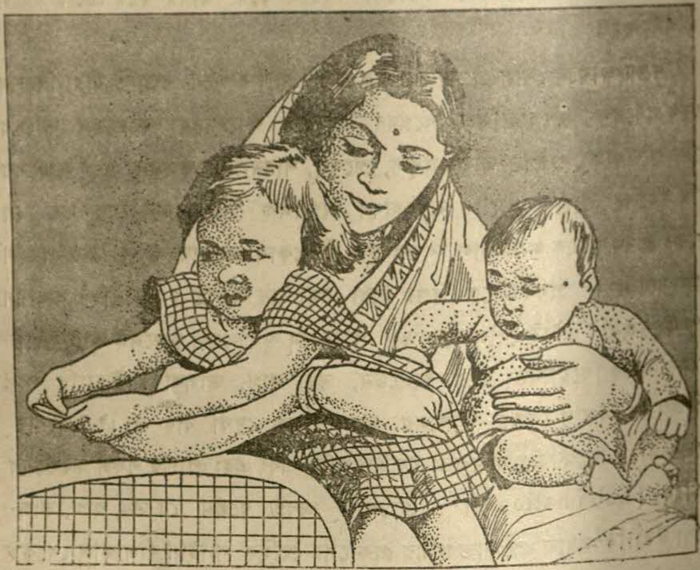

ছোট শিশুর ঈর্ষার প্রকাশ

আনন্দরূপ প্রক্ষোভের সাধারণ ধারারও ক্রম পরিণতি ঘটে। ছয় মাসের কাছাকাছি শিশুর খুশীর প্রগলভ প্রকাশ (elation) লক্ষ্য করা যায় ; নয় দশ মাস বয়সে শিশু বড়দের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে শেখে ; কিন্তু আরো অনেকটা বড় হয়ে প্রায় দেড় বছরের কাছাকাছি (পনোরো মাস) শিশু অন্য শিশুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তার প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করতে থাকে। চব্বিশ মাস বয়সে স্পষ্ট আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ বয়স থেকে শিশু অন্য শিশুকে হিংসা করতেও শেখে।

শিশু অন্য মানুষকে দেখে মৃদুহাস্য (smile) করতে শেখে দু'মাস বয়স হ'লে। আরো কিছু বড় হলে তখন শিশু সরবে হাসতে (laughter) শেখে।[৮]

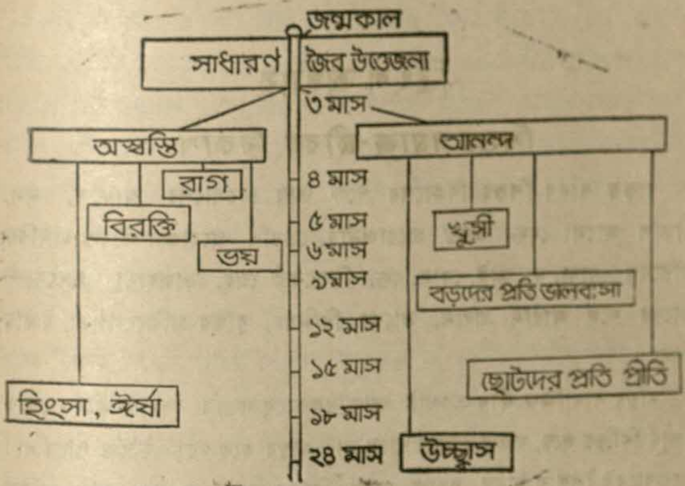

প্রক্ষোভের ক্রম-বিকাশ—ব্রীজেস্-এর অনুসরণে

কৌতুকবোধের ফলে যে হাসি তা অবশ্যই পরিপক্কতা ও সমাজজীবনের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের স্থান এবং ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশে এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

৮ Washburn. A study of smiling & laughing of Infants in the first year of life. Genetic Psychology Monog 19269 pp 24:-309

ত্রিংশ অধ্যায়

শিশুর সমাজ-জীবন বিকাশ

বাড়ন্ত মানব শিশুর বিকাশের পক্ষে তার চারপাশের আকাশ, জল, বাতাস আলো যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজন জীবন্ত মানবিক পরিবেশ—বাবা, মা, ভাই, বোন, বন্ধু, শিক্ষকের স্নেহ, ভালবাসা, প্রশংসা—তাদের সঙ্গে আদান প্রদান, ভাবের বিনিময়, বুদ্ধির প্রতিযোগিতা, ইচ্ছার সংঘর্ষ।

মানুষ সামাজিক জীব একথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য। সমাজ জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, মানুষ বাঁচতে পারে না—মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। একেবারেই শৈশবে মানব সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে বন্য পশু কর্তৃক লালিত পালিত হয়েছে, এমন কয়েকটি সত্য ঘটনা (feral cases) জানা গেছে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত লখ্‌নৌ সহরের কাছে বলরামপুর হাসপাতালে এ রকম একটি ছেলেকে আজ দশ বছর ধরে 'মানুষ' করে তুলবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সে চেষ্টা কিছুটা সফল হলেও, রামু নামে এই ছেলেটি একেবারে শৈশবে মানবসঙ্গ বঞ্চিত হয়ে পশুদের মধ্যে বর্ধিত হওয়াতে—তার পশুস্বভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করে স্বাভাবিক মানুষ কোন দিনই সে হয়তো হতে পারবে না। প্রথম যখন রামুকে রেল লাইনের ধারে এক নির্জন স্থানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তখন সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকত, তার বাঁ হাতের নখগুলি বড় ও বাঁকানো ছিল, সে কাঁচা মাংস ছাড়া আর কোন খাদ্য গ্রহণ করত না, গ্লাস থেকে জল খেতে পারত না—পশুর মত (সসার থেকে) জিব দিয়ে চেটে চেটে জল খেত—কোন কথা বলতে পারত না, আলো এবং মানুষের সান্নিধ্য অত্যন্ত অপছন্দ করত। তার মধ্যে বরং চিড়িয়াখানায় নেকড়ে বাঘ এবং বড় আলসেসিয়ান্ কুকুরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যেত। পাদ্রী রেভাঃ সিং এরকম দুটি মেয়েকে বাস্তবিক পক্ষে নেকড়ে বাঘের বিবর থেকে উদ্ধার করে, মেদিনীপুর অনাথাশ্রমে পালনের জন্য দিয়েছিলেন। তাঁরাও নয় বৎসর চেষ্টা করে, তাদের সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে পারেন

নি।[১] একেবারে শৈশবেও সমাজ জীবন মানুষ শিশুর পক্ষে কতকটা প্রয়োজনীয়, উপরের উদাহরণগুলি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

মানব শিশুর মত এত দীর্ঘ শৈশব আর কোন জন্তুর নয় এবং মানব-শিশুর মত অসহায়ও আর কোন জীব নয়। তার প্রত্যেকটি প্রয়োজন—তার খাদ্য, পরিচর্যা, লালন পালন, ও রক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র মানব-শিশু তার মায়ের উপর বহুদিন নির্ভর করে। পশু শাবকেরা অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট শক্তি অর্জন ক'রে—মাতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপনে সমর্থ হয়। পশু শাবকদের পিতা অথবা ভাই-বোনদের সঙ্গে সম্বন্ধ অত্যন্তই ক্ষীণ। পশুদের মধ্যেও কিছুটা সমাজ-বন্ধন আছে, এবং পশু-শাবকও অন্যের অনুকরণে কিছুটা শেখে, কিন্তু পশু পক্ষীর সমাজ-জীবন মানুষের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। মানব-শিশুর শিক্ষার অনেক খানিই সে পায়, তার চার পাশের অন্যান্য মানুষদের কাছ থেকে। বাঙালীর ছেলে মেয়ে বাংলা কথা বলতে শেখে, কারণ শিশুকাল থেকেই সে তার চারপাশের মানুষদের বাংলা ভাষায়ই কথা বলতে শুনেছে। তেমনি শিশুর-আচার, আচরণ, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস তার সমাজ জীবন, অর্থাৎ শিক্ষা ও অনুকরণের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। সমাজ পরিবেশের এই বিপুল প্রভাবের কথা পিতামাতা শিক্ষকের বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শিশুর যেমন দেহের ক্রমবিকাশ আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদির সক্রিয়তার ক্রমবিকাশ আছে, মানসিক শক্তি ও বৃত্তির ক্রমবিকাশ আছে, তেমনি তার সমাজ-বোধ বা সামাজিক ব্যবহারেরও ক্রমপরিণতি আছে। এই সমস্ত বিকাশের ধারা পরস্পর-নির্ভর এবং সমান্তরাল রেখায় চলে। **সামাজিক ব্যবহারের বিকাশ, একদিকে স্বাভাবিক পরিণতি অন্যদিকে শিক্ষা, অনুকরণ ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে।** এবং এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে শিশু সমাজ-জীবনে যেমন ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠছে, সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার ব্যবহার যুক্ত হচ্ছে—তেমনি একই সঙ্গে তার বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্বও গঠিত হয়ে উঠছে। আপাত দৃষ্টিতে সমাজ-জীবন-ভুক্তি (socialization) ও ব্যক্তিত্ব অর্জন (individualization) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি প্রক্রিয়া মনে হলেও, বাস্তবিক পক্ষে

১ The Sunday Statesman. Dec 20, 1964

এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর-পরিপূরক। সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ব্যক্তিত্ববিকাশ অসম্ভব, আবার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করে একাকার সমাজ জীবনও অর্থহীন। আমরা দেখতে পাই আঠারো মাস বয়স থেকে চার বছর পর্যন্ত, শিশুর ব্যবহারে তার চারপাশে অন্য মানুষদের সম্পর্কে ক্রমেই অধিকপরিমাণে আগ্রহ প্রকাশ পায়—আবার ঠিক এই সময় থেকেই তার নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা, অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতনতাও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন তার অঙ্গ সঞ্চালনে কেউ জোর করে বাধা দিলে সে বিষম ক্রুদ্ধ হয়, হয়ত হাতের মোয়া কেড়ে নিতে গেলে সে প্রাণপণে বাধা দেয়। পরিণতবয়সেও দেখা যায়, যাদের সামাজিক চেতনা প্রবল, তাদের ব্যক্তিত্বও সুস্থ ও সুগঠিত।[২]

সমাজ চেতনার কয়েকটি সাধারণ ধারা—সমাজ চেতনাও বিকাশ সাপেক্ষ, তবে তার নির্দিষ্ট স্তর বিভাগ নাই। তবে সাধারণ কতকগুলি লক্ষণ থেকে সমাজ চেতনার বিকাশ অনুমান করা যায়। প্রথম দু মাস পর্যন্ত শিশু তার চারপাশের বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখায় না। তার ইন্দ্রিয়-গুলি (চক্ষু, কান ইত্যাদি) তখনও একেবারেই অপরিপুষ্ট, মস্তিকে স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাদের সংযোগ তখনও সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দু মাসের পর থেকে, প্রথম সে মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে শেখে। তখন তার দৃষ্টি থেকে মনে হয় সে যেন মানুষ চিনতে সুরু করেছে।

এর পরে আর একটু বড় হ'লে মানুষ কাছে এলে শিশু একটু মৃদু হাসে। আর একটু বড় হ'লে আদর করলে খুশী হয়। তারপর দেখা যায় চেনা মানুষ সরে গেলে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে, শব্দ করলে সে দিকে তাকায়। চার পাঁচ মাস বয়স হলে, সে শব্দ অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এবং নিজের দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পায়। তার জীবনের প্রথম কয়েকমাস সে বড় মানুষদের সম্পর্কেই আগ্রহ দেখায়। মানুষ কাছে এলে সে মৃদু হাসে, মুখে খুশীর ভাব দেখা যায়; কিন্তু অচেতন বস্তুর সান্নিধ্যে এই ব্যবহার দেখা যায় না। এই বয়সের কচি শিশুরাও আদর অনাদর খুব বোঝে সকলের কোলে গিয়ে তারা সমান খুশী হয় না। এটা শুধু শারীরিক স্বস্তি

২ Gates, Jersild, etc Educational Psychology p. 125.

অপবৃত্তির জন্যে নয়।[৩] চার মাস বয়সে তার সমাজ চেতনা ও সামাজিক ব্যবহার কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, তাই সে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের নয়নানন্দকর হৃদয়ের ধন। বাপ মা সবাইকে ডেকে বলেন, "আমাদের খোকন-সোনা আমাদের দেখলে হাসে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে চায় না, তাকে সোজা কোলে করে বেড়ালে খুশী হয়, কথা বললে এখনই যেন কথা বলতে চায়" ইত্যাদি আরো কত তার কীর্তি, সে এখনই যেন পরিবারের একজন হয়েছে।[৪]

সমবয়স্কদের সম্পর্কে আগ্রহ, সামাজিক ব্যবহারে ক্রমজটিলতা—

ছয় মাস বয়সের পর থেকে শিশুরা অন্য শিশুদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে সুরু করে। সে তখন বসতে শিখেছে, তখন কাছাকাছি সমবয়স্ক শিশু দেখলে তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুই বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, শিশু প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক, অল্প সময়ের জন্যে সে অন্য শিশুর দিকে মন দেয়। দু বছরের পর থেকে অন্য শিশুর সঙ্গে খেলা এবং ঝগড়ার আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এ বয়সেও শিশু নিজেকে নিয়েই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। অন্য শিশুদের সে লক্ষ্য করে, অল্পক্ষণের জন্য অন্য শিশুর সঙ্গে খেলে, কিন্তু দল বেঁধে খেলা বা কাজের (team activity) প্রবৃত্তি আর একটু বড় বয়সে দেখা দেয়। পাঁচ ছয় বৎসরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত, তার সামাজিক আচরণ ক্রমশঃ স্পষ্টতর রূপ ধারণ করে। ক্রমেই তার সঙ্গীর দল বড় হয় এবং অন্যের সঙ্গে মেলা-মেশায় সে অধিকতর আনন্দ বোধ করে। স্কুলে ভর্তি হয়ে তার সামাজিক আচরণ ক্রমশঃ জটিলতর হ'তে থাকে। সামাজিক ব্যবহারের মস্ত বড় সেতু ভাষার ব্যবহার, দু বছরের পর থেকে, তাতে সে অভ্যস্ত হতে থাকে। স্কুলে গিয়ে সে

---

৩ Buhler, The Social Behaviour of Children—A hand book of Child Psychology. ch IX. pp 314-416.

৪ The 16 week old infant seems already quite mature, at least in terms of what has gone before. Not only have his motor & verbal abilities increased tremendously, but he has, to some extent, become a social being. From the parents' point of view, he is becoming socially responsive He coos, he chuckles, he laughs aloud. He can even smile back when you smile at him, He is well on the way to becoming a responsive member of the family group.

Gessell Institute's—Child Behaviour, pp 25-27

নিজের একটি ছোট দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, সব ছেলের সঙ্গে সমান ভাব তার হয় না। সমস্ত ক্লাশটাকেই আপন বলে বোধ করতে সে প্রথমে শেখে না। সেটা ক্রমে ক্রমে আসে। কিন্তু এ বয়স থেকেই (৫।৬ বৎসর) শিশু একটি গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত হতে (accepted by a group) চেষ্টা করে এবং না হ'লে, সে অস্বস্তি বোধ করে। অবশ্য সব ছেলে সমান 'সামাজিক' হয় না। কেউ বেশ সহজে মিশতে পারে, আবার কেউ কিছুটা 'একাচোরা' বা 'কুনো' প্রকৃতির। এই বয়স থেকেই লক্ষ্য করা যায়, কিছু ছেলে নেতৃত্ব করতে ভালবাসে, আবার কিছু ছেলে তারা 'নেতা'র কথামত চলতেই অভ্যস্ত। এই বয়স থেকেই শিশুরা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহার করতে হয়, বয়স্কদের সমাজ-জীবনের এই রীতি অনুসরণ করতে শেখে। এই বয়স থেকেই বাড়ী ও স্কুলে গুরুজনদের শাসন উপদেশের ফলে এবং তাদের অনুকরণ করে আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভাল মন্দ কিছুটা বুঝতে শেখে। অবশ্যই পরিপক্ক বিচার বুদ্ধিদ্বারা তারা নৈতিকগুণের প্রভেদ করতে পারে না। কিন্তু এটা তারা বোঝে, কতগুলি কাজ করলে বড়রা প্রশংসা করে, তারা খুসী হয়, এবং সেই কাজগুলি 'ভাল'—আর সেই কাজগুলি করতে তারা উৎসাহিত হয়। আর যে কাজগুলি করলে বড়রা বিরক্ত হন, তিরস্কার করেন, সে কাজগুলি 'মন্দ'—সেগুলি 'করতে হবে না' এটুকুও তারা বোঝে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে, সামাজিক আচার নিয়ন্ত্রণে নিন্দা-প্রশংসার মূল্য অনেকখানি। বুঝতেই পারা যায় নিন্দা-প্রশংসা তখনই বেশী কার্যকরী হয়, যখন শিশুর ভাষাজ্ঞান অনেকটা পরিপক্ক হয়েছে।

ছয় সাত বছর বয়সে শিশু কিছুটা আত্মসচেতন হয়। সে আর একেবারে 'কচিখোকা' নেই, ছোট বোনটার চেয়ে সে অ-নে-ক বড় এ ভাবটা তার মনে জাগে। মায়ের উপর নির্ভরতা অনেকটা তার কমেছে, বাইরের আকর্ষণ অনেকটা বেড়েছে, তবুও সন্ধ্যাবেলা আঁধার ঘরে ভয় ভয় তার করে, আর তখন মার কাছে ঘেঁষে বসতে তার ভালই লাগে। বাবার সঙ্গে সম্বন্ধটায় কিছুটা বন্ধুত্বের ছোঁওয়া লাগে।

এ বয়সে মনোযোগ ও দায়িত্ববোধ বাড়ে, কাজেই স্কুলের কাজ ও পড়া কতকটা নিজের গরজেই তৈরী করে। বাপ মার তাড়া ও শাসন এ বয়সে দরকার হয়ই, কিন্তু অভিমানও এ বয়স থেকে দেখা যায়। তবে বেশীক্ষণ অভিমান

পুষে রাখে না। বড়দের সম্পর্কে এ বয়সে মস্ত বড় মোহ থাকে। এ বয়সের শিশু বিশ্বাস করে তার বাবার মত 'বড়' আর কেউ নেই। 'বাবা সব পারে' '—আর' মার মত সুন্দরী কেউ নেই, 'মার মত গান করতে কেউ পারে না'—'মা কখনও মিছে কথা বলেনা'—ইত্যাদি; এই বয়স থেকে নিজ পরিবার সম্পর্কে গর্ববোধ শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়। এ বয়সে শিশুর বিচার-বুদ্ধি অপরিণত, কিন্তু কৌতূহল অপরিসীম আর তার কল্পনা অত্যন্ত জীবন্ত ও সতেজ। বাস্তব ও অবাস্তবের প্রভেদ সে কিছু বুঝতে শিখেছে। এ বয়সই হচ্ছে শিশুর মনে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, সমাজকল্যাণকর কর্মের বীজ রোপনের সময়।[৫] এ বয়স থেকেই শিশুকে উচ্চ আদর্শ-উদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি, সুন্দর ভাবপূর্ণ ছোট ছোট নাটক অভিনয়, বাগানের কাজ, ঘর সাজানোর কাজ, সহজ ও হালকা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কায়দা—এসব শেখানোর বয়স। এ বয়সে শিশুর দায়িত্ব-বোধ কিছু জন্মে, আর দায়িত্ব দিলে সে খুশীই হয়।

আট থেকে বার বছর বয়সে—শিশু সব দিকেই অনেকটা বেড়েছে। তার দেহ ও পেশীগুলি অনেকটা সবল হয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীর ক্রিয়া অনেকটা সুসম্বদ্ধ হয়েছে, মস্তিষ্কে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছে, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নায়ুসূত্রের সংযোগও প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, দেহের অস্থিগুলি অনেক দৃঢ় হয়েছে—এ বয়সে শিশু যেন জীবন্ত শক্তির ডাইনামো—দেহের অতিদ্রুত বৃদ্ধির পর এসেছে একটা সংস্থিতির স্তর (period of oonsol da ion)। ভাষা আয়ত্তীকরণ ও বুদ্ধির দিক থেকে শিশু অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এ সমস্তই তার সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক ব্যবহারের দিক হ'তে এটা হচ্ছে বিশেষ করে দলগত আনুগত্যের বয়স। এর আগ পর্যন্ত শিশু মূলতঃ আত্মকেন্দ্রিক—সে অন্য শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা করলেও, পাঁচ ছয় বছরের শিশুর, দলের সঙ্গে একাত্ম-বোধ জন্মে না। কিন্তু দশ বারো বয়সের ছেলে খুব গর্ব করে' নিজের 'দলের' কথা বলে। নিজের ক্লাবের হয়ে যখন খেলে, তখন সে নিজস্ব 'বাহাদুরী'র চেয়ে বেশী ভাবে ক্লাবের গৌরবের কথা।[৬]

---

৫ Issacs, The children we teach. pp 18-25

৬ At ten years, a boy who earlier ln a baseball game, seemed to be

শিশুর এই দল বাঁধবার প্রবৃত্তির সঙ্গে তার বাড়ন্ত উপচীয়মান শক্তির (surplus energy) সম্বন্ধ আছে। এই বয়সের শিশুর 'বাড়তি শক্তি' দল বেঁধে খেলা ধুলা কাজ, আনন্দ, আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে গঠনাত্মক পথে মুক্তি খোঁজে। গঠনাত্মক ও উদ্দেশ্য-মূলক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে প্রবাহিত করতে না পারলে, তা ধ্বংসাত্মক দিকেই ধাবিত হবে। তাই এই বয়সটা পিতা মাতা শিক্ষকের পথে ভয় ও দুশ্চিন্তার সময়। সুস্থ দলগত সহযোগী ও গঠনাত্মক ক্রিয়া শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তির গঠনের পক্ষে সহায়ক, কিন্তু তাদের সমবেত শক্তির প্রকাশের স্বাভাবিক সুস্থ পথ না থাকলে, তা নানাপ্রকার উৎপাত, অসামাজিক আচরণ ও অবাধ্যতার (delinquency) মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। উপযুক্ত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে, এই বয়সের বহু ছেলে "দলে পড়ে" সিগারেট খেতে, চুরি করতে, নানা রকম উৎপাত করতে শেখে। অর্থাৎ এই সময় থেকেই পিতা মাতা শিক্ষকের দৃষ্টি ও শাসন না থাকলে, উচ্ছৃংখল দলের প্রভাবে শিশুর 'গোল্লায় যাওয়া'র পথ প্রশস্ত হয়। সুখের বিষয় এ বয়সে শিশু সহানুভূতিশীল নেতার আনুগত্য স্বীকারে স্বভাবতঃই আগ্রহী। পিতা, মাতা, শিক্ষক উপদেশ দিয়ে, সহৃদয় আলোচনা দিয়ে, অভিভাবনের সাহায্যে (through suggestions) এবং সর্বোপরি নিজেদের আচরণের সদ্দৃষ্টান্তের সাহায্যে এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেও তাদের একজন হয়ে, তাদের এই সংকটপূর্ণ সময়ে সুস্থ সমাজ জীবনের শিক্ষা দিতে পারেন।[৭]

---

primarily interested in making a hit and being a star, without much regard for the score made by his "side'; they now "rather' play right field on the winning team than 'star' for the loser's Furfey. The Growing Boy. p 15.

৭ The abundance of energy clamouring for expression at this stage provides us with a physical & mental problem and an opportunity. The development of the child demands that we supply him with plenty of ways of using this energy. The opportunity comes because children are usually much more ready to accept our suggestions and more easily guided than they are at a later stage. It is not difficult to interest the boy or girl of this age. They are not so self-conscious as they become later

এই সময়ে শিশুদের ঔৎসুক্য, কৌতূহল ও মনের গ্রহণের ক্ষমতা সর্বাধিক। কাজেই লেখাপড়ার ব্যাপারেও যেমন, খেলাধূলার ব্যাপারেও তেমন, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা দুইয়ের ভিত্তিতেই তাদের গড়ে তোলা সহজ।[৮] এ বয়সেও কল্পনা শক্তি প্রবল কিন্তু এখন থেকে কাজের দোষ ত্রুটি তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। নিজের কাজও সে আগের মত হেলাফেলা করে শেষ করে না। সে নিজের কাজেরও বস্তুগত বিচার করতে শেখে।[৯]

পিতা, মাতা ও শিক্ষকের মস্ত বড় কাজ হচ্ছে এ বয়সের শিশুর বাড়ন্ত শক্তি, প্রায় অফুরন্ত উৎসাহ, অসীম কৌতূহল, এবং অদম্য গঠনেচ্ছাকে কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করা। বিলাতে আমেরিকাতে এই বয়সের ছেলে মেয়েদের উলফ্ ক্লাব, ব্লু বার্ড, বয়স্কাউট, গার্লগাইড এবং রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের 'কম্‌সোমোল্'-এ সংঘবদ্ধ করে শিশুদের 'বাড়তি শক্তি' কে রচনাত্মক কর্মের অভিমুখে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও ব্রতচারী, এন সি সি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আনন্দময় সামাজিক চেতনা বিকাশের সুযোগ পায়। কিন্তু সে সব ছেলে মেয়েদের সংখ্যা নিতান্তই কম। **সুযোগের অভাবে, সংগঠনের অভাবে উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে আমাদের দেশের বিরাট কিশোর বাহিনীর শক্তি এরকম গঠনাত্মক কাজে ও কল্যাণকর্মে নিয়োজিত না হতে পেরে নষ্ট**

---

and although there is a growing feeling of independence, they still are not desirous of repudiating all authority.

Ryburn—Introduction to Educational Psychology p. 69

৮ This period is strongly marked by intellectual curiosity......At no other time can the school rely so largely on the child's willingness to learn even by rote. A skilful teacher can get better results in this age than in any other, especially when incorporating a game competitive element into the learning situation. Buhler, From birth to maturity, p. 152.

৯ The 8-12 years old is a realist. He wants to find out what things really are, and how they function...As the stage progresses uncritical satisfaction with performance tends to diminish and self-criticism to increase. Children no longer tend is expect a good school report rrespective of the quality of their work.

Ryburn—Introduction to Educational Psychology. p. 69

হচ্ছে—এ একটা নিদারুণ জাতীয় সম্পদের অপচয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এ বয়স থেকেই সব ছেলে মেয়েকে হাতেকলমে সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখানো হয়—নানা রকম যোজনাত্মক ক্রিয়ার (project) মধ্যে দিয়ে তারা বাস্তব জীবনের অনেক সমস্যা সংগঠন ও সহযোগিতার সূত্রে সমাধান করতে শেখে। আবৃত্তি, অভিনয়, নানা প্রকারের সংগ্রহ (যেমন ডাকটিকেট সংগ্রহ, পাথরের টুকরো সংগ্রহ ইত্যাদি)। এই সমস্ত ক্রিয়া, একদিকে যেমন সমাজ চেতানায় শিশুদের উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ব্যক্তিস্বগঠনেও সহায়ক হয়।

আমরা বলেছি দলগঠন ও দলের সঙ্গে একাত্মবোধ এই বয়সের সমাজ চেতনার একটা প্রধান লক্ষণ। এই বয়সে দলের কাছ থেকেই নৈতিক আদর্শের শিক্ষা শিশুরা গ্রহণ করে। এর চেয়ে ছোট বয়সে ভাল মন্দের অস্পষ্ট বোধ শিশুদের জন্মে মাতা পিতার কাছ থেকে। "কিন্তু এ বয়সের কিশোর দলের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই নিজ নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করে। যা দল বা দলপতির দ্বারা গৃহীত, তাই ন্যায়—যা দলপতির দ্বারা নিন্দিত বা দল দ্বারা গৃহীত নয়—তা অন্যায়। দার্শনিক বিচারের বয়স এটা নয়। অনুকরণ ও অভিভাবনের দ্বারাই কিশোরের নৈতিক মান গঠিত। সে দলের জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত।"[১০] কিশোর বয়সে সকলের চেয়ে বড় অসম্মান হচ্ছে—দল থেকে বিতাড়িত হওয়া (to be rejected by the group)। এ বয়সে দলের আকর্ষণ অনেক সময় পিতা মাতার প্রভাবের চেয়েও বড়। এ জন্যেই পিতা, মাতা, শিক্ষকের এ বয়সের কিশোরদের সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন হতে হবে। পিতা,

---

১০। It is this extreme gregariousness that gives us the clue to the understanding of the moral sanctions that govern the conduct of the young boy. His behaviour is determined largely by anticipation of social praise or blame,—the chief authority being the gang. Here we have the essence of all "morality" which to begin with, at least, is nothing more than the mores, or customs.

Ross. Educational Psychology, p. 145

মাতা, শিক্ষক সতর্ক, সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমান্ হলে কিশোরদের নেতৃত্ব তাদের হস্তচ্যুত হয় না। তাদের সন্তান যে দলের, সেই দলের দৃষ্টিভঙ্গীকে তাঁরা পরিণত বুদ্ধি দিয়ে, নিজ নিজ সদাচরণ দিয়ে এবং মহৎ আদর্শ দ্বারাই প্রভাবিত করতে পারেন। **এটা কিশোরদের সপক্ষে অবশ্যই বলা চলে যে, স্বভাবত তাহা সুবিচার ও নিরপেক্ষতাকে (justice & fair play) বড় দাম দেয় এবং তাহাদের আনুগত্য নির্ভরযোগ্য।** এ কথাও সত্য যে, এ বয়সের কিশোরদের মনের মধ্যে জটিলতা নেই—তারা তাদের মতামত সরল ভাবেই জানায়। সুবিচার ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই কিশোরের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার দায়িত্ব গুরুজনদের। তারা সরল ও স্বভাবতঃ আদর্শানুরাগী বলে **তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রভাবিত করা সহজ।**[১১]

যৌবনাগম ও সামাজিক চেতনা—বার থেকে আঠারো বৎসর—এই বয়সটাকে যৌবনাগম বা adolesence বলা হয়। ব্যক্তির বিকাশের দিক দিয়ে, এটি হচ্ছে সব চেয়ে অশান্ত (turbulant) ও সংকটপূর্ণ (difficult age)। এ সম্বন্ধে 'জীবন পরিক্রমা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এ বয়সের ছেলেদের সুস্থ বিকাশের জন্য প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক কর্ম, আনন্দদায়ক খেলাধূলা এবং নানা হিতকর গঠনাত্মক উদ্যম-আয়োজন নিতান্ত প্রয়োজন। মেয়েদের পক্ষেও এ কথা সত্য। আমাদের দেশে এ বয়সের মেয়েদের খেলা, ধূলা, ব্যায়াম বা সুষম শরীর চর্চার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নাচ মেয়েদের পক্ষে খুব উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ শারীর-ক্রিয়া, কিন্তু

---

১১ A great d al will depend on those who are accepted as leade s. Therefore, teachers and others interested in young p ople will do their best, by means of healthy personal relationship with such leaders to influence through them the standards of conduct accepted by the group. Such friendly relationship will be far more effective than moral teaching. The gang will quite often have a strong sense of loyalty, of fair play and justice. These can form the foundation of a good ethical code. Thus a beginning is made in the deplopment of e conscience which grow more and more sensitive. But stimulus and encouragement are called for from parents and teachers.

Mcmunn. The Child's Path to Freedom. p. 153

এর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে বিরূপতা প্রবল। পূর্বেই বলা হয়েছে এ বয়সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও কল্পনা-রঞ্জিত মোহ আত্মপ্রকাশ করে। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং অতিরিক্ত নিষেধ ও শাসনের পরিবর্তে সহজভাবে সমান বয়সের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লেখাপড়া, খেলাধূলা, অভিনয় ও গঠনাত্মক ক্রিয়ায় সহযোগিতার সুযোগ থাকলে ভাল হয়; তাতে পরস্পরের কাছে অতিরিক্ত আড়ষ্টতা ও অপ্রতিভতার ভাবটা কেটে যায়। কল্পনার মোহ বাস্তব পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অনেকটা যুক্তিনিষ্ঠ স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা বিপজ্জনক বয়স। কিছুটা সহৃদয় শাসন-নিষেধ ও গুরুজনদের সস্নেহ পরিচালনা তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অতিমাত্রায় অভিমানী, তাই তাদের সম্বন্ধে ব্যবহার খুব সহজ নয়। তাদের আত্মসম্মানবোধ অতিমাত্রায় প্রখর এবং নিজেদের শক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতনতা প্রবল, যদিও সত্যিকার নিজের বিপদ বুঝে চলবার পরিণত বিচার বুদ্ধি, ও নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য এখনও তাদের হয়নি। তারা নিজ মনেও একথা জানে, কিন্তু এটা কিছুতেই তারা স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা নিজের মনে সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করেনা বলেই, তাদের ব্যবহারে অতিরিক্ত দম্ভ, বেশী বেশী বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা, হাততালি পাওয়ার অতিরিক্ত হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখা যায়। পিতামাতা সন্তানদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই যদি বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ বিশ্বাসের সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তবেই মঙ্গল। এ বয়সের ছেলেমেয়ে যদি জানে যে, তাদের পিতামাতা তাদের অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেন, তা হলে তারা সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে সচেষ্ট হয় এবং অনেক বিপদ থেকে রক্ষিত হবে।

ষোল থেকে আঠারো বছরের মধ্যে সাধারণতঃ 'প্রেম পড়ার' প্রথম হাতে-খড়ি হয়। উত্তর-কিশোর-কিশোরীর এই প্রেমে কল্পনার মোহের রঙীন মেঘ আছে প্রচুর, কিন্তু তা সংসার-বুদ্ধির হিসাব বর্জিত এবং পরস্পরকে গভীর ও শান্তভাবে জানার ভিত্তিতে এ প্রেম গড়ে ওঠে না। তাই এই 'বাছুরে প্রেম' (calf love) বিবাহের নিরাপদ ভিত্তি নয়। এ ভালবাসায় অনুভূতির প্রবলতা আছে, তা ছেলে ও মেয়েকে নূতন মদের স্বাদে মাতাল করে তোলে —কিন্তু এ আকর্ষণ অন্ধ এবং এর মধ্যে এক অস্বস্তিকর অপরাধ-বোধ আছে। ছেলে মেয়েদের মনে এই চেতনা থাকে যে, তারা পিতামাতার নির্ভরযোগ্য

ভালবাসা ও আস্থার প্রতি কিছুটা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে, পিতামাতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রতি তারা যেন মিথ্যাচরণ করছে। তাই তাদের মধ্যে এই প্রথম পিতামাতার কাছ থেকে নিজের জীবনের একটা গোপন অধ্যায়কে লুকোবার কিছুটা নিষ্ফল প্রয়াস দেখা যায়। এর থেকে কখনো কখনো পিতা-মাতার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তার ফল অনেক সময় শুভ হয় না। সেই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে। দুই প্রবল অনুরাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছেলেমেয়েদের মানসিক স্থৈর্যের পথেও হানিকর। সুখের বিষয়, এ অশান্তিকর অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিশেষতঃ, পিতামাতা যদি বুদ্ধিমান (understanding) ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল হন এবং নরনারীর মধ্যে ভালবাসার পিছনে যে মস্ত দায়িত্ববোধ থাকা উচিত এবং দায়িত্ব-বোধশূন্য অন্ধ মোহের বিপদ সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করবার মত সংস্কার-মুক্ত মন যদি তাঁদের থাকে, তা হ'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিপদ শেষ পর্যন্ত কেটে যায়। আমাদের সমাজে 'প্রেম করে' বিবাহ করবার বিরুদ্ধে যে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে তা সর্বাংশে অযৌক্তিক নয়। এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের অনিয়ন্ত্রিত অবাধ মেলা-মেশা এবং মিথ্যা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রেম চর্চাকে উৎসাহদানের বিপদ সম্বন্ধে বিচারক লিণ্ড্সে আধুনিক আমেরিকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কঠিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য তিনি যৌনজীবন বিষয়ে ছোটদের সঙ্গে আলোচনা সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের 'ঢাক-ঢাক গুড়্ গুড়্' (hush-hush policy) নীতিকেও সমুচিত নিন্দা করেছেন।[১২] এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অবুঝ নয় এবং তাদের একেবারে ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা না করে বন্ধুভাবে খোলা-খুলি আলাপ করলে, ফল অনেক ভাল হয়, বর্তমান সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই মত সবলে প্রকাশ করেছেন।[১৩]

যৌন জীবন সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীত লিঙ্গ সম্বন্ধে আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক তেমনি যৌন জীবন সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক। এই কালে দেহে যৌনযন্ত্র সম্পর্কিত কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে, যা ছেলেমেয়েদের যেমন

১২। Judge Lindsay. The Revolt of Youth.

১৩। Bertrand Russell. Marriage and Morals.

আকর্ষণ করে, তেমনই কতকটা শঙ্কিত করে তোলে। এ সময়টাতে পিতা মাতা সাবধানী এবং বুদ্ধিমান না হলে, তাদের যৌন জীবন বিষয়ে কৌতূহল ও বিভ্রান্তি অন্য বিকৃত-রুচি বেশী বয়সের ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আপত্তিকর ও উত্তেজনাকর 'নিষিদ্ধ-জ্ঞান' লাভে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং অনেক সময়ে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে অনাবশ্যক এবং হানিকর অপরাধ-বোধ (guilt consciousness) তাদের মানসিক পীড়িত করে তুলতে পারে। এটা যেমনি অবাঞ্ছিত তেমনি অনাবশ্যক। এই বয়সের অস্থিরমতি ছেলে মেয়েদের পক্ষে অকাল যৌনউত্তেজনা নিতান্তই হানিকর' সেই জন্যই স্থূল আদিরসাত্মক গল্প উপন্যাস বা সিনেমার ছবি থেকে তাদের রক্ষা করা কর্তব্য। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী, আধুনিক সিনেমার নেশা। কিন্তু পিতামাতাকে শুধুমাত্র নিষেধাত্মক ও নেতি-বাচক সতর্কতা অবলম্বন করলেই চলবে না; সঙ্গে সঙ্গে গঠনাত্মক কিছু গুরুতর কর্তব্য পালনের জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে দেহের পরিবর্তন নিতান্তই স্বাভাবিক এবং দেহের বিকাশের ফলেই নারীর মাসিক ঋতুনিঃসরণ ও পুরুষের শুক্রসঞ্চার। এর মধ্যে পাপ বা ঘৃণ্য কিছু নাই, এ সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপনতার প্রয়াস না করে, এবং বিব্রত বা বিরক্ত বোধ না করে, পিতামাতা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সরলভাবে আলোচনা করলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তা হলে তারা গোপনে অবাঞ্ছিত সূত্রে এবং বিকৃতভাবে এবং অতিরিক্ত কৌতূহল নিয়ে, এ সব তথ্য আহরণ করবে না। সুস্থ জীবনের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের পক্ষে ব্রহ্মচর্য ও যৌনশুচিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্তানদের তাঁরা স্বাভাবিকভাবে উপদেশ দেবেন এবং অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা এবং এ বিষয়ে অতিমাত্রায় কৌতূহলের বিপদ সম্পর্কে সন্তানদের তাঁরা অবশ্যই সাবধান করবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যৌনজীবনের উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথে এর ভূমিকা এবং এর মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা সন্তানদের সঙ্গে সরল ও সঙ্কোচশূন্যভাবে আলোচনা করবেন।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যৌন জীবন নিয়ে আলোচনা, আমাদের প্রবল ও প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী। কিন্তু এ প্রশ্নটিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে হবে। যৌন জীবনের সমস্ত গোপন তথ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তা নয়, তবে যৌন

জীবনের মূল কথাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। শুধু তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে এটা প্রয়োজন তা নয়, তাদের ভবিষ্যতে যৌন জীবন সম্বন্ধে একটি নির্মল ও পাপ-বোধ-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করাও এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের বয়স্ক (grown-up) বলেই চিন্তা করতে ভালবাসে, এবং পিতামাতা, তাদের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য এবং নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি হিসাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করুন, এটা তারা ইচ্ছা করে। তাদের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করলে, তারা তার মর্যাদা রাখতে সচেষ্ট হয়।[১৪]

বয়ঃসন্ধিকালের সমাজ জীবন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা—

ইতিপূর্বে কৈশোর স্তরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, দলের প্রতি আকর্ষণ ও দলপতির প্রতি আনুগত্য একথা বলেছি। এই বয়সটা হোল বীরপূজার (hero-worship) কাল। জীবনকে তখন কল্পনায় রাঙিয়ে আদর্শায়িত করে দেখাবার প্রবণতা থাকে। এ বয়সে দলের প্রতি আকর্ষণ, আদর্শনিষ্ঠা ও বীরপূজার যে প্রবণতা থাকে তা অনেকটা যুক্তি-নিষ্ঠ। এবং বীরপূজার চেয়ে বীর হওয়ার দিকেই ঝোঁক দেখা যায়। এই কালে বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতি পূর্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করেছে এবং অন্ধ অনুরাগের স্থানে এ বয়সে পূর্ণতর যুক্তিভিত্তিক বন্ধুত্বের চেষ্টা দেখা যায়। এ বন্ধুত্বের মূল দৃঢ়।[১৫]

ফ্রয়েড্ এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে যৌন চেতনার পিছনে যে শক্তি ক্রিয়া করে, তা-ই সমস্ত প্রকার সৃষ্টির মূল। সন্তান সৃষ্টির যে প্রেরণা

---

১৪ The Gesell Institute's—child Behaviour by Frances Ilg and Louise Ames. p. 209.

১৫ The period which sees the rise of sex-interest is also characterized by the making of firm friendships, a tendency to hero-worships an intense loyalty to the school or college or other group with which the individual is associated and a sympathy with those who are less fortunate in human society, in short by the appearance of new or intensified social emotions other than those of sex. Wheeler. Youth : Adolescent Education. p. 41.

তারই আর এক অন্য রূপ হচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ব্যায়াম ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অথবা রণক্ষেত্রে বীর্যপ্রকাশ বা দার্শনিকচিন্তা সবই মূল কামশক্তির প্রকাশ। বয়ঃসন্ধিকালে এ শক্তি স্থূল যৌনক্রিয়ায় অপচয়ে নিঃশেষ না করে, তাকে ঊর্দ্ধগতি দানকরা শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীনেরা একে বলেছেন ব্রহ্মচর্য, আর ফ্রয়েড্ একে বলেছেন উদ্গতি (sublimation)।

ব্যক্তির মূল সৃজনীশক্তিকে সাহিত্যসৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, সমাজসেবার দিকে প্রবাহিত করার মধ্যেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ মঙ্গল এবং কৈশোরোত্তর ছেলে মেয়েদের সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত আছে। ম্যাকডুগ্যাল্ বলেছেন এবয়সের ছেলে মেয়েদের যৌনচেতনাকে সংযত করাই সবচেয়ে বড় কথা নয়,—সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে, এই শক্তিকে উচ্চতর সংস্কৃতি ও গঠনের কাজে নিয়োজিত করা।[১৬]

এবয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে ওঠে অথচ সমাজ তাদের অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের গুরুজন ব্যক্তিরা কখনো তাদের সঙ্গে কতকটা উপেক্ষাজনক ব্যবহার করেন, বলেন "ওরা এখনও ছেলেমানুষ", আবার কখনো তিরস্কার করে বলেন, "এত বয়স হোল অথচ এদের ছেলেমানুষী গেল না!" স্বভাবতঃই বড়দের এই অসঙ্গতি এদের বিভ্রান্ত করে এবং এদের অভিমানে আঘাত লাগে। এরা 'বড়' বলে স্বীকৃত হতে চায় এবং 'বড়'র উপযুক্ত দায়িত্ব দিলে ওরা খুশী হয়। এ দায়িত্ব অনেকখানি (যদিও সবটা নয়) ওরা বহন করতে সমর্থ এবং এই দায়িত্ব ওদের ওপর ছেড়ে দিলে ওদের স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা হয়।[১৭]

---

১৬ Hocking. Human Nature and its remarking. p 345.

১৭ An adolescent is no longer a child and yet not a man. He has no status in society, nor does society seem to understand him. By some he is judged in terms of standards accepted for childhood years ; by others he is expected to conform to society's standards for adults. Neither set of standards fits him because he is no longer a child, nor yet an adult. Being in a period of transition, he has problems peculiar to transition—the problems of heaving lost an estab-

এ বয়স তীব্র অভিমানের বয়স। এটা একদিকে যেমন বিপদের কথা, তেমনি মস্ত আশারও কথা। যথাসময়ে উপযুক্ত প্রশংসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে শিক্ষক এদের আত্মপ্রত্যয় এবং ভালো করবার, আরো ভালো করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মস্ত কাজে লাগাতে পারেন। এটা হচ্ছে শিভ্যালরীর বয়স তাই প্রিয়জনের চোখে বীর বলে নিজেকে প্রমাণ করবার আকাঙ্ক্ষায় এ বয়সের ছেলে মেয়েরা অসাধ্যসাধনে প্রস্তুত হয়। আবার অন্যদিকে অন্যের নিন্দা বা অপ্রশংসা এ বয়সের ছেলেমেয়েদের তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। শিক্ষক বা পিতামাতা অযথা নিন্দা করলে, এরা অতিমাত্রায় আহত হয় এবং হতাশ হয়ে পড়ে। পরীক্ষায় ফেল করে বা ব্যর্থপ্রেমে আত্মহত্যা এ বয়সেই সব চেয়ে বেশী। এটা 'দেবদাস' হ'বার বয়স।

এ বয়সে, পুস্তকের মধ্য দিয়ে, সমাজ ব্যক্তির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ বয়সে বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি ও কল্পনা, সতেজ ও উচ্চ। সার্বসামগ্রিক বিচারশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশলাভ না করলেও, বিতর্কচিন্তায় তারা অভ্যস্ত হয়েছে এবং এতে তারা আনন্দ পায়। শিক্ষক ও পিতামাতার মস্ত দায়িত্ব হবে এ বয়সে ছেলেমেয়েদের সামনে উপযুক্ত চিন্তা-উদ্রেককারী পুস্তক পত্রিকা ধরে দেওয়া, তাদের পাঠস্পৃহা উৎসাহিত করা। এ বয়সে তারুণ্যের তেজে এরা সমস্ত বিষয়েই চূড়ান্ত মতামত প্রকাশের স্পর্ধা দেখাতে পারে, হয়তো প্রচলিত আচার ও বিশ্বাসের বিরোধী ধ্বংসাত্মক বৈপ্লবিক চিন্তায়ও তারা সোচ্চার হতে পারে; তার জন্যে অতিরিক্ত চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। কৈশোরে বিভিন্ন বিপরীত মতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক ও অবাস্তব আদর্শমূলক মতবাদ (utopia) প্রচারের মধ্য দিয়েই সে নিজস্ব একটি জীবনদর্শন ও একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলছে। এটাই মস্ত কথা। যাতে তার এ জীবনদর্শন সত্য ও কল্যাণধর্মী হয়—তা তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রত্যয়পুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ

---

lished and accustomed status and of not yet having acquired the new status towards which the factors impelling developmental changes are driving him, the transitional difficulties of insecurity, disorientation and anxiety.

Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene for Nurses in India. p. 346.

করে, সে জন্যেই শিক্ষক, পিতামাতা, রাজনৈতিক নেতাদের সাবধান হতে হবে। গুরুজনদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের মনের উপযুক্ত খোরাক তারা এ বয়সে পায়। বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প, দেশভ্রমণ, উপন্যাস, কবিতা, নীতি, দর্শন, ধর্ম নানা বিষয়ের প্রচুর বই পুস্তক পড়বার, আলোচনা করবার, নিজের মতামত, স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ যাতে তারা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যারা বয়স্ক, যারা গুণী, যারা শিক্ষক তাঁরা আরও দেখবেন তাদের চিন্তা যেন স্বচ্ছ হয়, তাদের প্রকাশ যেন সাবলীল হয়, গঠনাত্মক ও কল্যাণকর হয়।

প্রাক্-যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ তরুণীর পক্ষে মানসিক উদ্যম ও সুস্থ জীবনাদর্শ গঠন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন, আদর্শ ও বিশ্বাসকে কর্মে রূপায়ণের চেষ্টার। এ জন্যে তাদের স্বাধীন উদ্যম প্রকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। যথেষ্ট কাজের মধ্য দিয়েই তরুণ তরুণীদের সতেজ জীবনপ্রাচুর্য আত্ম-উন্মোচনে সক্ষম হয়। কিন্তু সে কাজের মধ্যে যেন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ থাকে। শুধু কাজ নয়। যথেষ্ট অবসর, বিশ্রাম এবং অবসর বিনোদনের নানা প্রীতিপ্রদ 'হবি' এ বয়সের ছেলে মেয়েদের গঠনাত্মক উদ্যম প্রকাশের অবলম্বন হলেই তাদের দেহ মন ফুলের মতন বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এসব তরুণ তরুণীদের এই বয়সের স্বাভাবিক দৈহিক চাঞ্চল্য ও মানসিক উত্তেজনার কুফল হতে রক্ষা করবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাদের জীবন এ ভাবে পরিপূর্ণ করে রাখা।[১৮]

নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক ব্যবহার —

সমাজ জীবনের প্রথম কথা, এক হওয়া, মেলামেশা। তা না হলে তো

---

১৮ It is noticeable that the children who appear to suffer from the strain of adolesence are those who have some keen intellectual or practical enthusiasm·· the teacher and the parent can co-operate in giving every possible encouragement to the pursuit of hobbies and enthusiasms whatever they may be. If enthusiasm is a permanent one, so much the better; but if it changes monthly or weekly, encourage it just the same. This is probably the biggest factor of all in relieving the tension. Advances in understanding the Adolescent, p. 95. (Home & School Council of Great Britain).

গোষ্ঠী সৃষ্টিই হতে পারে না। তাই সমাজ জীবনের প্রতিস্তরেই আমরা কোন না কোন রূপে দেখি, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, সংগঠন। কিন্তু মানুষ যেখানে একত্রে মেলে, সেখানেও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে যায় না, কাজেই মানুষের পরস্পর ব্যবহার সব সময় ইতিবাচক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে না, তার মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকবে।

আমরা দেখেছি, একেবারে শৈশবে তো বটেই, এমন কি তিন চার বৎসর পর্যন্ত শিশু আত্মকেন্দ্রিক; সে অন্য শিশুর সম্বন্ধে খুব স্পষ্টভাবে আগ্রহান্বিত নয়। স্কুলে ভর্তি হ'লে, তখন সে অন্য শিশুর সঙ্গে স্বাভাবিক আগ্রহে মিশতে চায়। যতই বড় হতে থাকে, ততই সচেতন ভাবে মেলামেশার ইচ্ছা বাড়তে থাকে, খেলা, ধুলা, আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যত বড় হয়, ততই তার ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বও প্রবল হয় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা মাতা, শিক্ষক, সঙ্গীর কোন জোর করবার চেষ্টাকে সে সাধ্যমত বাধা দেয়। এটা সমাজ জীবনের স্বাভাবিক একটা দিক এবং ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে এর কিছুটা প্রয়োজন আছে। যে ছেলে আগে সব কথাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত, সে যদি মাঝে মাঝে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখায়, তা হলে সব সময়ে তা নিন্দনীয় নয়। এটা দ্বারা তার বিকাশমান স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বোঝা যায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণতর বোঝাপড়ায় সমর্থ হচ্ছে। কিন্তু যদি কোন শিশুর বা কিশোরের মধ্যে এ প্রকার নেতিবাচক ব্যবহার (negativism) (সব ব্যাপারেই কেবল না, না) অথবা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সরে থাকার (withdrawal) প্রবৃত্তি, অথবা ঝগড়াঝাটি করার ঝোঁক অপরিমিত মাত্রায় দেখা যায়, যদি এটা তার 'স্বভাব' হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে গুরুতর কোন বাধা উপস্থিত হয়েছে—এবং পিতামাতা শিক্ষককে কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করতে চেষ্টা করতে হবে।[১৯]

শিশুদের অবাধ্যতা গুরুজনদের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে, কারণ এটা তাদের কাছে বিরক্তিজনক। এটা যেন তাঁদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ। তাই তাঁরা জোর করেই শিশুদের অবাধ্যতা দমনে প্রবৃত্ত হন। এটা নিতান্ত ভুল পথ। বিশেষতঃ ছেলে মেয়েরা প্রাক্-যৌবন তারুণ্যে যখন উপনীত হয়, তখন অধিকার

১৯ Dr. Wall The Adolescent Child.

বোধ প্রবল হয় এবং তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। এ সময়, তাদের জোর করে পিতামাতার উচ্চতর কর্তৃত্বের অধিকারের দাবীতে 'দমন' করবার প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক হলেও তার ফল বিষতুল্য হতে পারে। এতে করে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সহজ স্নেহ শ্রদ্ধা ও মধুর প্রীতির সম্বন্ধ গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, এ সব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে জোর করা সর্বদাই ভুল ; তাতে গুরুজনদের মর্যাদাহানির আশঙ্কা থাকে, এবং সন্তানদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত শাসনের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বগঠন। অবাধ্যতা কর্তৃপক্ষের কাছে সাময়িকভাবে অপ্রীতিকর হতে পারে কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সমাজের প্রকৃত উন্নতি অতি-বাধ্য-বিনীত ছেলেদের দিয়ে হয় না। তাঁরাই সমাজকে নূতন নেতৃত্ব দিতে পারেন যাঁরা দুঃসাহসী, যাদের প্রচলিত নিয়মকানুন ভাঙতে ভয় নেই, যাঁরা নূতন পথে চলে দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত। সমাজের শ্রেষ্ঠ হিতৈষী তাঁরাই, যাঁরা প্রচলিত অবিচার ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মত সাহস রাখেন।[২০]

অবাধ্যতা আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করলেও এটা মনে করা ভুল যে শিশুদের ব্যবহারে অবাধ্যতা ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিই প্রধান। বরঞ্চ লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশু, কিশোর ও তরুণীদের ব্যবহারে বন্ধুতা, সমবেদনা, সহযোগিতামূলক ব্যবহারই সংখ্যায় অধিক। মানুষ মানুষের সাথে মিলতে চায়—

---

২০ I do not mean to be understood as an advocate of rebellion. Rebellion in itself is no better than acquiescence in itself. Whether rebellion is to be praised or deprecated depends upon that against which a person rebels. but there should be the possibility of rebellion on occasions, and not only a blind acquiescence produced by rigid education in comformity. And what is perhaps more important than either rebellion or acquiescence, there should be the capacity to strike out a wholly new line.

Russell—Education & the Social order: The individual vs the citizen.

এটাই স্বাভাবিক, সংঘর্ষ ও বিরোধিতা বরং ব্যতিক্রম। সহযোগিতায়ই জীবনের সংঘর্ষে জীবনের ক্ষয়।[২১]

সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতা—

যারা বয়সে তরুণ তাদের বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি স্বাভাবিক। এই বয়সে প্রতিযোগিতা ও সকলের চেয়ে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুস্থ বিকাশের লক্ষণ। বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিযোগিতাই ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার মূল। শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাই সংগ্রামশীল প্রতিস্পর্ধা জাগিয়ে তোলারই চেষ্টা হয় নানাপ্রকার প্রশংসা, পুরস্কার, সম্মান ও পদবী দিয়ে। পড়াশোনা, খেলা ধুলা, সংস্কৃতিমূলক সামাজিক ক্রিয়ায় (cultural & social activities) যারা কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাদেরই বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রশংসা ও পুরস্কার স্বভাবতঃই প্রীতিকর। বিশেষতঃ তরুণদের কাছে এর নেশা সামান্য নয়। এর ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। একদিকে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামই পৌরুষকে জাগ্রত করে, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আত্ম-উন্মোচনের সহায়ক হয়—লজ্জা, অলসতা ও ভীরুতার বাধা চূর্ণ করে ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে, উপরে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তীব্র প্রতিযোগিতা স্নায়ুর পক্ষে চাঞ্চল্যকারক এবং প্রশংসা ও পুরস্কারের নেশায় পাগল হয়ে ব্যক্তি নিজ সাধ্যের অতিরিক্ত প্রয়াস করে বিপন্ন হতে পারে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য প্রীতিকর, কিন্তু অসাফল্যও তো অনেক সময় আসবে এবং পুরস্কারকে অতিরিক্ত মূল্য দিলে, অসাফল্যে তীক্ষ্ণ ব্যর্থতাবোধ, আত্মধিক্কার ও হীনমন্যতার দুঃখই তীব্রভাবে বাজবে। যে সব ছেলে মেয়েরা অতিমাত্রায় অভিমানী ও আত্মসচেতন তাদের কাছে এর ফল শুভ নয়। অসাফল্য তাদের নিরাশ করে তুলতে পারে এবং তাতে তারা উদ্যম প্রকাশের দিক থেকে পেছিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিযোগিতার মধ্যে নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও চরম আত্মকেন্দ্রিকতার বিষ আছে। তাই সমাজতন্ত্রী সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দলগত সহযোগিতা এবং দলগত প্রতিযোগিতাকেই উৎসাহিত করা হয়। সম্মান শুধু ব্যক্তির একা প্রাপ্য নয়—প্রাপ্য তার দলগত প্রচেষ্টার। ওলিম্পিক্ খেলা ধূলার কঠিন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুস্থ মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করবার মন্ত্র দিয়ে

২১ Valentine—The Normal Child and some of his abnormalities. p. 7

ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ব্যারণ ডি কুবারটিন্—'সব চেয়ে বড় কথা জেতা নয়, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা—মূল কথা জয়ী হওয়া নয়, সাধ্যমত বীরের মত সংগ্রাম করা' The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing is not compairing but fighting well.

পিতা-মাতা-শিক্ষক অনেক সময় তাঁদের সন্তানেরা যাতে প্রতিযোগিতায় সফল হয়, সেজন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে, সন্তানদের সাধ্যের অতিরিক্ত উদ্যমে প্ররোচিত করেন এবং তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ না হ'লে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন। এর ফলে তাদের সন্তানদের দেহ-মনের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে—এর পরিণতি শুভ নয়। দলগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, কিশোর বা তরুণ যখন নিজের প্রিয় দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, কাজ বা খেলা করে, অথবা এমন কোন সমবেত ক্রিয়ায় রত হয় যাতে তার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, তখন তার নৈপুণ্য বেশী প্রকাশ পায়।

নেতৃত্বগুণের প্রয়োজনীয়তা—

দলের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ সুলভ নয়। সব ছেলে মেয়ের এ গুণ থাকে না, অথবা সমপরিমাণে থাকে না। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির জন্যে এ গুণ খুবই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য নেতৃত্বের গুণ কার মধ্যে কতটা আছে, তা কতকটা অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। অনুকূল পরিবেশে, নিতান্ত যে সাধারণ, তাতেও এ গুণ প্রকাশিত হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, যে নেতা তার অন্যান্যদের চেয়ে কোন না কোন বিষয়ে উৎকর্ষ থাকতে হবে এবং এগিয়ে যাবার সাহস তার থাকতে হবে। কিন্তু শুধু গুণে শ্রেষ্ঠতা থাকলেই নেতা হওয়া যায় না—দলের কাছে প্রিয় হওয়ার রহস্যও তার জানা চাই। দলের স্বার্থকে যে নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখতে পারে না, সে কখনও যোগ্য নেতা হতে পারে না। বাধ্যতা, শৃংখলা বোধ ও ঐকান্তিকতা নেতৃত্বের অনুসঙ্গী গুণ। ভাল নেতা যে হবে, তাকে আগে ভাল সেবক হতে হবে। সমাজ জীবনের আধারে ভিন্ন এই গুণগুলির বিকাশ হয় না।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ, তার দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। কোন এক সমাজ-পরিবেশে কোন বিশেষ কয়েকটি গুণকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়—অন্য পরিবেশে হয়তো সেই গুণ-

গুলির বেশী আদর নেই—হয়তো বিপরীতগুণগুলিই সেই সমাজে মান্যতা পায়। আর যে যে সমাজ পরিবেশে বর্ধিত, সে সাধারণতঃ সেই পরিবেশের মতই প্রতিফলিত করে। মার্কস্‌পন্থীরা মনে করেন যে শ্রেণী-সংগ্রামই হচ্ছে সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক এমন কি নৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় মতামত ও তাদের বিকাশের ভিত্তি।

সমস্ত সমাজ চেতনা ও সামাজিক ক্রিয়ার মূলেই আছে এই চিন্তা যে 'আমি দলের একজন'। প্রত্যেকেই চায় কোন এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত হ'তে। চোরেরও তাই সমাজ আছে। প্রত্যেক সমাজেরই লিখিত অলিখিত কিছু বিধি, নিয়ম, বিশ্বাস আছে। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সভ্যই সেই বিধি, নিয়ম, বিশ্বাস মেনে চলে। কারণ সমাজ বা গোষ্ঠী অবাধ্য বা 'বিদ্রোহী'কে সহজে ক্ষমা করে না। এই শাসন দ্বারা সমাজের ঐক্য ও শৃঙ্খলা যেমন রক্ষিত হয় তেমনি এ অনেক অন্ধতা ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নেরও হেতু।[২২] একথা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে এবং শিশুর মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল করে দিতে হবে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ভালবাসা, সংহার নয়।

---

২২ Society is co-operation, crossed by conflict. Mc. Iver. also.

It seems that there must always be an element of conflict in our relations with others, as well as one of mutual aid; the whole plan of life calls for it; our very physiognomy reflects it, and love and strife sit side by side upon the brow of man, Cooley. Social Process. p. 56

একত্রিংশ অধ্যায়

ব্যতিক্রমের বিপদ—দৈহিক

এই পৃথিবীটা হচ্ছে সাধারণদের। যাদের আমরা বলি 'দশজন' তারা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কাজেই এই পৃথিবীর আইন-কানুন, ব্যবহার,—সবই হচ্ছে সাধারণ মানুষের মাপে, তাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী। সেই জন্যে যারা অ-সাধারণ—অর্থাৎ যারা সাধারণের ব্যতিক্রম, তাদের এই সাধারণের সমাজে নিজেদের মানিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়। বর্তমান জগৎ সাধারণের জগৎ হলেও, সাধারণদের এটুকু বুদ্ধি বা ঔদার্য্য আছে যে 'ব্যতিক্রম'দেরও এ পৃথিবীতে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে—একথা সে স্বীকার করে। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা পাবার অধিকার আছে। প্রত্যেক মানুষেরই দাম আছে। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করলে প্রত্যেক মানুষই সমাজকল্যাণে কিছু না কিছু দান করতে পারে। তাই, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যতিক্রমদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের অসুবিধা-গুলি বুঝতে চেষ্টা করেন এবং কি করে এবং কতদূর সে অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করেন।

সাধারণের সংজ্ঞা

'সাধারণ' কে? তার লক্ষণ কি—আর ব্যতিক্রমই বা কাকে বলব? যদিও এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ, এমন কি অবান্তর মনে হতে পারে,—তথাপি এর উত্তর সোজা নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে উত্তরই দেওয়া যাক না কেন, তাহার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই: 'যে অসাধারণ নয়, সে সাধারণ; আর যে সাধারণ নয়, সে ব্যতিক্রম।' বাস্তবিক পক্ষে 'সাধারণ' কথার একটা মনগড়া সংজ্ঞাই কেবল দেওয়া যায়। জানি, আমাদের এ সংজ্ঞা বৃত্ত-সংজ্ঞা (circular definition) দোষযুক্ত। তথাপি আলোচনা আরম্ভ করবার মত একটা মোটামুটি ধারণা নেওয়া যাক্। 'সাধারণ' তাকেই বলি যার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিদ্যমান, সক্রিয় ও মোটামুটি অবিকৃত, যার বুদ্ধি ও অন্যান্য মানস এবং

সামাজিক গুণ ও বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয়, নিকৃষ্টও নয়,—যে তার যোগ্যতা, শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম নিয়ে অন্য দশজনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মানিয়ে চলতে পারে, বা চলে থাকে। যাদের কোন ইন্দ্রিয় বিকল, যাদের কোন অঙ্গহানি ঘটেছে, যারা বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্যান্য মানসিক ও সামাজিক গুণে ন্যূন অথবা বিশেষ উৎকর্ষসম্পন্ন, তাদেরই বলব অ-সাধারণ বা ব্যতিক্রম।

বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' বা 'সাধারণ' বলে কেউ নেই। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের রোগে কখনও বা কখনও ভোগে, কোন না কোন দোষে সে ন্যূন বা উৎকৃষ্ট। কাজেই 'সাধারণ' মানুষ একটি কাল্পনিক আদর্শ। আগেই বলেছি এ একটি মন-গড়া ও কাজ-চলা গোছের ধারণা।

যারা ব্যতিক্রম, তাদের সকলের সমস্যা এক নয়। যে বিষয়ে তারা ব্যতিক্রম, সেখানেই তাদের অসুবিধা ও সমস্যা। তাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি কি, দশজনের সঙ্গে একত্র চলতে কেন তারা অসুবিধা বোধ করে, এটা না জানলে প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাদের অক্ষমতা বা অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যের কাছে উপহাস বা ঈর্ষার কারণ হয়, এবং সমাজের এই প্রতিকূল ভাব তাদেরও বিষিষ্ট করে তোলে। তাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাদের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্বন্ধে তারা সচেতন, এবং অনেক সময়েই তাই তারা অন্যদের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। তাদের শিক্ষার প্রধান কাজই হল তাদের 'সহজ' করে তোলা,—তাদের মনে যাতে তারা নিজ ব্যতিক্রম শান্তভাবে গ্রহণ করে নিজশক্তি অনুযায়ী কর্ম বা জীবিকা বেছে নিতে পারে এবং সমাজে নিজের স্থানটি করে নিয়ে সুখী ও সন্তুষ্ট হতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করা।

ব্যতিক্রম বহু প্রকারের হতে পারে। সেগুলিকে দৈহিক ও মানসিক এই দুটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়। সমস্ত বৈকল্য বা ব্যতিক্রম আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ দৈহিক ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

দৈহিকত্রুটি জনিত সমস্যা—Problems of the Physically handicapped.

যারা কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ হারিয়েছে তারা দুর্ভাগা। স্বভাবতঃই তাদের কর্ম ও উপভোগের পরিধি সঙ্কুচিত, তাদের জ্ঞান আহরণের পথও সুগম নয়।

এ দৈহিক ত্রুটি নানা প্রকারের এবং বৈকল্যের পরিমাণগত প্রভেদও আছে। এটি অত্যন্ত গুরুতর হ'তে সুরু করে যৎসামান্ত হতে পারে। এ ত্রুটি জন্মগত ও চিকিৎসার অযোগ্য হতে পারে। কোন গুরুতর ব্যাধি বা ছোঁয়াচ (infection) বা দুর্ঘটনা এর কারণ হতে পারে। আবার এ ত্রুটি সাময়িক ও চিকিৎসাযোগ্যও হতে পারে।

বর্তমান কালে চিকিৎসাশাস্ত্র শুধু রোগনির্ণয় ও রোগনিরাময় করেই ক্ষান্ত থাকে না। যাতে রোগ হতে না পারে, অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়হানি না ঘটে, সে বিষয়েও এ বিজ্ঞান উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে আমাদিগকে সতর্ক করে। এ বিষয়ে ব্যক্তি, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হয়েছেন। যেমন অন্ধতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিমত,—চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কতগুলি অভ্যাস অনুসরণ (যথা সকালে বিকালে নির্মল জলে চক্ষু প্রক্ষালন, ময়লা কাপড় বা রুমাল চক্ষু মুছবার জন্য ব্যবহার না করা, বিনা প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার না করা) এবং কতগুলি সতর্কতা অবলম্বন দ্বারা (যথা খুব কম আলোতে বই না পড়া, অতিরিক্ত আলো বা উত্তাপ চোখে না লাগান, চোখ ব্যথা হওয়া মাত্র চোখের বিশ্রাম ইত্যাদি) কিছুটা পরিমাণে চক্ষুর ত্রুটি নিবারিত হতে পারে। অগ্রসর রাষ্ট্রসমূহে বিদ্যালয়ের ক্লাশঘরগুলি যাতে উপযুক্ত আলোকিত হয় এবং ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা যাতে সমস্ত ছেলে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়; উন্নত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাস্তা, ঘাট, দোকান, ষ্টেশন, সু-আলোকিত হয়, ফ্যাক্টরীগুলিতে কর্মীদের চোখের উপর যাতে অতিরিক্ত চাপ (eye-strain) না পড়ে, যন্ত্রাদি চালনা কালে যাতে অন্ধকারের জন্য শ্রমিকরা আহত হতে না পারে, তেমনি আইন প্রণীত হয়।

যাদের অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়-হানির জন্য দৈহিক ত্রুটী ঘটেছে তারা অন্য সব বিষয়ে সাধারণ সুস্থ মানুষের মত, এ কথাটি মনে রাখা দরকার। অন্ধ বা বধির কোন ছাত্রের অন্যান্য ছাত্রদের মতই কতগুলি সাধারণ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও রুচি আছে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তারা যাতে সহজে মিশতে, খেলাধূলা, পড়াশুনা করতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য তাদের দৈহিক ত্রুটির জন্য দৌড় ঝাঁপ বা অন্যান্য যে সব কষ্টসাধ্য কর্মে তাদের ক্ষতি হতে পারে, তা থেকে তাদের বিরত করতে হবে। এ জন্য তাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাদের অভাব

তারা অন্য কোন বিকল্প ক্রিয়াধারা কিছুটা পূর্ণ করতে পারে কিনা, তা জেনে রেখে, তেমন কাজের বা খেলার ব্যবস্থা তাদের জন্য করা প্রয়োজন। তাদের দৈহিক ত্রুটির জন্য গালমন্দ করা বা উপহাস করা নির্বুদ্ধিতাই শুধু নয়, চরম নিষ্ঠুরতাও বটে। তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং তাদের ত্রুটির জন্য যে সব বিশেষ সাহায্য দরকার তার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু তাদের অতিরিক্ত আদর দিয়ে পরমুখাপেক্ষী করে তুললে ভবিষ্যতে তাকে দুঃখ বাড়ানোই হয়। প্রত্যেক ত্রুটি বা বিকৃতির আনুষঙ্গিক মানসিক প্রতিক্রিয়া বা আহত অনুভূতি থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ত্রুটির বেলায় এ অনুভূতি বা আবেগ বিভিন্ন হতে পারে। যাই হোক, যারা অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়হীন তারা অনুভূতি ও আবেগের ক্ষেত্রে যাতে সঙ্গতি (adjustment) লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা পিতামাতা ও শিক্ষকের এদের সম্বন্ধে একটি প্রধান কর্তব্য। অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন হলে এরা নিজেদের ও অন্যের দুঃখ শুধু বাড়িয়েই তোলে। কিন্তু যারা নিজের ত্রুটি শান্তভাবে মেনে নিয়ে এবং নিজ শক্তি অনুযায়ী কাজ বেছে নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারে, তারা খুব বেশী অসুখী হয় না।

বধির ও প্রায়-বধিরদের সমস্যা—Problems of the deaf or the near-deaf—বধিরতা জন্মগত হতে পারে। নাক ও গলার রোগ থেকে এটা হতে পারে; হাম, ডিপথেরিয়া, মাম্পস্ ইত্যাদি রোগ থেকেও বধিরতা জন্মাতে পারে। কানে খৈল বেশী জমে বা কানপাকা থেকেও বধিরতা দেখা দেয়। জন্মগত কারণে সম্পূর্ণ যারা বধির, চিকিৎসা দ্বারা তাদের আরোগ্য করা কঠিন। কিন্তু সম্পূর্ণ বধির না হলে এবং আকস্মিক কারণে হলে এ ত্রুটির চিকিৎসা ও উপশম সম্ভবপর। যারা কানে খাটো, তারা অনেক সময় নিজেদের ত্রুটিটা স্বীকার করতে চায় না। বয়স্ক লোকে তাদের কিঞ্চিৎ নির্বোধ ভাবুক তাও ভাল। বাস্তবিক পক্ষে যারা কানে ভালো শোনে না, তাদের মুখে কখনো কখনো নির্বোধ অসহায়ত্বের ভাব ফুটে ওঠে। কাউকে বিরক্ত বা বিষণ্ণও দেখায়। যখন কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা তার অঙ্গভঙ্গী, বিশেষ করে মুখের ভাব ও ওষ্ঠাধর সঙ্কোচন-প্রসারণ লক্ষ্য করে। এ উপায়ে, যে কথা তারা শুনতে পায় না, তাও অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।

পূর্বে যারা কানে খুবই কম শুনত, তারা রবারের নলের দুই মাথায় কলকের

মত ছুটি ধাতব মুখ লাগিয়ে কথাবার্তা চালাত। বধির লোক একটি কলকের মত মাথা নিজ কানে লাগিয়ে নিত, অন্য মাথা মুখের কাছে এনে বক্তা কথা বলত। এই যন্ত্রটি খুব সহজ হলেও এ নিয়ে চলাফেরা অসুবিধাজনক ছিল। বর্তমানে খুব ছোট ইলেকট্রিক ব্যাটারী-সংযুক্ত কানে আটকাবার যন্ত্র বের হয়েছে। তবে এর খরচ যথেষ্ট। সেদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম ব্যাটারীহীন, একটি গাবের বীজের মত ক্ষুদ্র যন্ত্র নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা কানে লাগিয়ে সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়—যন্ত্রটি প্রায় চোখেই পড়ে না।

যারা একেবারেই কানে শোনে না, তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। এদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ হাতের অঙ্গুলি সংকেতে বর্ণমালা (manual alphabet) শিক্ষা দেন, এবং ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ্য করে কথা বুঝতে (lip reading) শেখান। যে সব ছেলেমেয়েরা কিছু কম শোনে তারা অন্যান্য সুস্থ শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়েই পাঠাভ্যাস করে। এটা এক হিসাবে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশের দিক থেকে ভাল হলেও, এতে সন্দেহ নেই যে তাদের ইন্দ্রিয়ের ত্রুটির জন্য পাঠ গ্রহণে মনের উপর বেশী চাপ (strain) পড়ে, এবং তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। পূর্বেই বলেছি কখনও কখনও শিশুরা নিজেদের এই শারীরিক ত্রুটি অন্যের নিকট গোপন রাখতে চায়। তাই শিক্ষকের সতর্ক থাকা উচিত। যে ছেলেটি কানে খাটো, তাকে ক্লাশের সামনের বেঞ্চে,—যেখান থেকে শিক্ষকের কথা সব চেয়ে জোরে শোনা যায়, এবং শিক্ষকের মুখ দেখা যায়,—সেখানে বসবার ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যান্য ছাত্ররাও যাতে তাকে যথোচিত সাহায্য করে সে বিষয়ে দেখতে হবে। কিন্তু ছাত্রটিকে নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন করা উচিত নয়। উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া, শাস্তি দেওয়া তো খুবই অনুচিত। তবে অতিরিক্ত দয়া করে পরনির্ভর করাও মোটেই ঠিক নয়।

একেবারে বধির না হলে জীবিকা অর্জনে এ জাতীয় ব্যক্তিদের খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। যারা বেশী কম শোনে, তাদের পক্ষে গবেষণা বা হিসাব পরীক্ষার কাজ উপযুক্ত। বধিরের পক্ষে কোলাহলশূন্য পরিবেশে কাজই ভাল। কখনো কখনো বধিরেরা বোবাও হয়; যারা জন্ম হতে একেবারেই বধির তাদের মধ্যেই এ দুর্ভাগ্য দেখা যায়। যারা জন্ম থেকে বধির তারা কথা বলতেও শিখে না, যদিও তাদের কণ্ঠনালী সব সময় অসুস্থ নয়। এ সমস্ত শিশুদের জন্য

Deaf and Dumb School (মূক বধির বিদ্যালয়) গুলির প্রতিষ্ঠা। এদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের মত কর্মক্ষম হওয়া এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই এদের সমস্যা যে কঠিনতর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অন্ধ বা প্রায়ান্ধদের সমস্যা—Problems of the blind or the near-blind—অনেক ক্ষেত্রেই টাইফয়েড্, বসন্ত, হাম, স্কারলেট্ ফিভার ইত্যাদি ব্যাধি অন্ধত্বের কারণ; সিফিলিস্ থেকেও অন্ধত্ব ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার সিফিলিস্ রোগ হেতু সন্তান অন্ধ হয়ে জন্মায়। বৃদ্ধ-বয়সে চোখে ছানি পড়ে দৃষ্টিশক্তির হীনতা জন্মে। উপযুক্ত সময়ে ছানি কাটিয়ে ফেললে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। কিন্তু মস্তিষ্কে অর্বুদের (brain tumour) বা চক্ষু-শিরার (eye-nerves) শুষ্কতা বা রোগের জন্য অন্ধতা দুশ্চিকিৎস্য। আঘাত ও দুর্ঘটনার ফলেও চোখ নষ্ট হতে পারে। অতিরিক্ত কড়া আলো অথবা দেখতে কষ্ট হয় এমন অল্প আলোতে দীর্ঘকাল কাজও অন্ধতার কারণ হতে পারে। তীব্র অনুভূতির সংঘাত ও অবদমনের ফলে ও সাময়িক অন্ধতা দেখা যেতে পারে।[১]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল কারণ নিবারণ-যোগ্য। যে সব কারণ অন্ধতার জন্য দায়ী সেগুলির দূরীকরণেই প্রথম চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পিতামাতাদের উচিত শিশুদের চোখ কিছুদিন পর পর ভাল ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো। বিদ্যালয়, ফ্যাক্টরী এবং শ্রমিকরা যেখানে কাজ করে, বিশেষতঃ রাত্রে, সেখানে আলোর ব্যবস্থা যাতে উপযুক্ত হয়, যাতে চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, কর্তৃপক্ষের সে ব্যবস্থা অবশ্যই করণীয়।

যারা অন্ধ, তারা নিজ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। যারা সম্পূর্ণ অন্ধ নয়, তারা নিজের অবস্থা অন্যের নিকট হ'তে গোপন করে রাখতে সচেষ্ট হয়। যে সব শিশু দৃষ্টিশক্তি একেবারে হারায় নি, তারা চোখ পিট্ পিট্ করে (blinking) ভ্রূকুটি করে (frowning), ঘন ঘন চোখ মোছে, মাথা বাঁকা করে অস্বাভাবিক ভাবে তাকায়। কখনো কখনো তারা হঠাৎ রেগে ওঠে।

১। এ বিষয়ে বিভুরঞ্জন গুহ—মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার দ্রষ্টব্য।

কোন ছাত্রের মধ্যে এ রকম লক্ষণ দেখলে শিক্ষকের উচিত এই ছেলেকে ভাল ডাক্তার দেখানো এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ, তাদের সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। চক্ষু হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রেল্-এর আবিষ্কারের ফলে অন্ধদের বই পড়া শিক্ষাসাপেক্ষ হলেও, সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সাধারণতঃ নীচু ক্লাশের বইই ব্রেলে ছাপা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব বই প্রয়োজন, তাদের মধ্যে অতি সামান্যই ব্রেলে ছাপানো পাওয়া যায়। একেবারে অন্ধদের জন্যে বিশেষ বিদ্যালয় আছে। সম্পূর্ণ অন্ধদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হলে চক্ষুষ্মান্ একজন সঙ্গী নিতান্ত দরকার। এক স্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতে হলে অন্ধদের অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। সেদিন Reader's Digest পত্রিকায় দেখলাম, অন্ধ মানুষের যানবাহন-মুখর নগরের পথঘাট প্রদর্শক বিশেষ শিক্ষিত কুকুর সঙ্গী পাওয়া যায়।

অন্ধ মানুষদের কাছে বই পড়ে অন্য কাকেও শুনাতে হয়। অন্ধ ব্যক্তিদের স্পর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় কখনো কখনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। এতে তারা এক ইন্দ্রিয়ের অভাব অন্যভাবে কতকটা পূর্ণ করে নেয়। অন্ধ ব্যক্তিদের জীবিকার্জনের পথও বধিরদের মত একই কারণে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কলকারখানার কাজের পক্ষে এরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হাতের কাজে এরা অনেক সময় পটু হয় এবং তা দ্বারা তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবি, সাধারণের চেয়ে যাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর, তারা শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারেন না। ডিক্টাফোন্ যন্ত্রে কাজ এদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং অন্ধদের শিক্ষার কাজে এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হন। অন্ধদের বিশেষ অসুবিধাগুলি কি, তা এঁরা জানেন এবং চক্ষুষ্মান্দের অপেক্ষা এঁরা অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর উপযোগী।

উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকলে অন্ধ ব্যক্তিরাও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। বহু বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রশিল্পী এই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাব সত্ত্বেও নিজ সাধনায় মগ্ন আছেন। বিখ্যাত কবি মিল্টন্ দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা লেখেন। আমাদের দেশে ভক্ত কবি সুরদাস

দুর্বার কামপ্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যৌবনেই নিজ দৃষ্টি-শক্তি নিজহাতে নষ্ট করেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মিল্‌টনের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ছিল কিন্তু সুরদাসের মনে ছিল পরম প্রশান্তি। নিজ দুর্ভাগ্যকে যাঁরা শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন তাঁরা নিজেরাও দুঃখ কম পান অন্যকে দুঃখ কম দেন। কিন্তু ধৈর্য, উদ্যম এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালনা যারা ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য-জনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত হয়েছেন হেলেন্ কেলার। তিনি অতি শৈশব থেকেই অন্ধ, বধির ও মূক। কিন্তু কি করে নিজ ধৈর্য ও চেষ্টায় এবং তাঁর শিক্ষিকা ও সহচারী মিস্ সুলিভ্যানের সুপরিচালনায় তিনি লেখাপড়া শিখলেন তার মনোজ্ঞ কাহিনী তিনি আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয় বৈকল্য জনিত দুঃখে যাঁরা দুঃখী, তাঁরা এ জীবন কাহিনী পাঠে মনে বল পাবেন।

খঞ্জ, বিকলাঙ্গদের সমস্যা—Problems of the lame and the physically handicapped. যারা ব্যাধি বা দুর্ঘটনার ফলে কোন অঙ্গ হারিয়েছে, অথবা যারা কোন বিকৃত বা বিকল অঙ্গ নিয়ে জন্মেছে তাদের শিক্ষা ও জীবিকার্জনের পথে নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়। অসাবধানতার ফলে এ বিকৃতি বা বিকলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজনও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যারা এমন বিকলাঙ্গ তাদের দৈহিক বৈকল্য সত্ত্বেও মানসিক ক্ষমতায় বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দিক থেকে অন্যান্য সুস্থ মানুষের তুলনায় তারা হীন নয়। কখনো কখনো তারা অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন। পড়াশুনার ব্যাপারে তাহারা অন্য দশটি সুস্থ সাধারণ ছেলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে। তবে দৈহিক কোন অঙ্গের বৈকল্য মানসিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হতে পারে। আমাদের শিক্ষা ব্যাপারটা শুধু মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। একটি সুস্থ সাধারণ ছেলে মেয়ে চলাফেরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন ইত্যাদি দেহের নানা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সহজে শিক্ষালাভ করে। যার পা খোঁড়া সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না, তাই

তার পৃথিবীটা কতকটা সীমাবদ্ধ। তেমনি যার হাত বিকল তার চোখের সামনের জিনিষ নাড়াচাড়া করা, লেখা, হাতের কাজ করা ইত্যাদি অনেকখানি শক্ত। বিশেষ করে ডান হাতটি বিকল হলে এ অসুবিধাগুলি অনেক বাড়ে। অবশ্য দেহের আত্মরক্ষার তাগিদেই এ সব মানুষ বাঁ হাত দিয়ে এসব কাজ অনেকটা করতে শেখে। তবে তাতে সুস্থ মানুষের মত সব বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করা নিশ্চয়ই শক্ত। বিকল অঙ্গে ব্যথা যন্ত্রণা থাকলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা হয়ই। সুতরাং এ জাতীয় বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়বে, এটা স্বাভাবিক।

যারা বিকলাঙ্গ তাদের মনের উপরও দৈহিক বৈকল্যজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাদের বিকল অঙ্গ অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের দিকে মানুষ করুণা বা উপহাস বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়—তাদের সম্বন্ধে কথা বলে। এতে তারা নিজ বৈকল্যের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে, এবং অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো সহপাঠীরা তাদের ঠাট্টা করে, এবং যেখানে করুণা বা উপহাস না করে, সেখানেও তারা অন্যের বিরূপতা কল্পনা করে ব্যথিত হয়। তাছাড়া শারীরিক বৈকল্যের জন্যে নানা প্রকার খেলাধূলা বা কাজের সহজ আনন্দ থেকে তারা কতকাংশে বঞ্চিত, তাই তাদের মনে মিথ্যা আত্মধিক্কার অথবা অপরের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মিতে পারে। তারা তাই অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না।

তাদের পিতামাতার মনেও সন্তানের অক্ষমতার জন্য দুঃখ ও লজ্জাবোধ থাকে। সন্তানের অক্ষমতার জন্য তাঁরা হয়তো বৃথাই নিজেদের অপরাধী মনে করেন। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবও তাঁদের হতে পারে; তাঁরা অক্ষম সন্তানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হতে পারেন। পিতামাতার মনে যদি অপরাধ-বোধ জাগে, তবে তাঁরা হয়তো অক্ষম সন্তানটিকে অতিরিক্ত মমতা ও আদর দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করতে পারেন। এবং সন্তানের প্রতি তাঁদের অচেতন মনে বিদ্বেষ জাগলে তাঁরা সন্তানটিকে বোঝা বলে মনে করে, তাকে অবহেলা করতে পারেন। এ দুই প্রকার মনোভাবই বিকলাঙ্গ মানুষটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় পেলে সে আবদারে ও জেদী হয়ে উঠতে পারে এবং

তার মনে এ ধারণা জন্মিতে পারে যে, যেহেতু সে পঙ্গু বা অক্ষম, সুতরাং সকলের উপর তার বিশেষ দাবী ও অধিকার আছে। এই মিথ্যা ধারণা তার ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে, এবং পিতামাতার অবর্তমানে তার সহজ জীবন-ধারণ অসম্ভব হতে পারে।

এ সব অক্ষমদের অন্যান্য সুস্থ ভাই বোনদের সঙ্গে সম্বন্ধও সুস্থ ও সহজ হয় না। তারা এ অক্ষমটিকে আপনাদের ভাই বা বোন বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করতে পারে। এ অক্ষমটির জন্যে তাদের খেলাধূলা আনন্দের ব্যাঘাত হলে তার উপর বিরক্ত হতে পারে। তাদের পিতামাতা এ অক্ষমটির প্রতি অতিরিক্ত মমতাশীল হলে, তাদের মনে ঈর্ষা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। এ জন্য অক্ষম ও বিকলাঙ্গ যারা, তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ বড়ই কঠিন। প্রায়ই এরা অতিরিক্ত অভিমানী, নিষ্ঠুর বা জেদী, সন্দিগ্ধচিত্ত ও অস্থির হয়।

এদের পালন, শিক্ষা এবং জীবিকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যাপূর্ণ। এরা যাতে নিজ অক্ষমতার প্রকৃতিটি বুঝতে পারে এবং তা মেনে নিয়ে সহজ ও শান্ত হতে পারে, সে চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। অন্য দশটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যা পারে, তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এটা তাদের বুঝতে হবে। অনেক সময় একথা না বুঝে অথবা মেনে না নিয়ে যা তাদের দৈহিক সাধ্যের অতীত, অতিরিক্ত প্রয়াসের দ্বারা সে প্রকার কাজ করতে গিয়ে তারা বিপন্ন হতে পারে। যতটুকু তাদের ক্ষমতার সীমার মধ্যে তা সুষ্ঠভাবে করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাদের মনের মধ্যে হীনতাবোধ বা নিরাশা যাতে না আসে, সে চেষ্টা সকলের পক্ষেই করা উচিত। তারা যেন বুঝতে পারে দৈহিক অক্ষমতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাদের জীবনেরও মূল্য আছে, তাদেরও মোটামুটি সুখী হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

এদের শিক্ষার জন্যে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে। এদের শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী এদের শিক্ষা-ব্যবস্থাও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা থেকে কিছুটা পৃথক হওয়া প্রয়োজন। তবে যতটা সম্ভব অন্য দশটি ছেলের মত এরা যাতে চলতে পারে, সে চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গ থেকে এদের সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে রাখলে, তারা নিজেদের

অপাংক্তেয় ও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অকর্মণ্য মনে করতে পারে। সহকর্মীদের উপহাস, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে তাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং এ দুঃখময় আঘাতের দ্বারা হয়তো সে কিছুটা শক্ত, ও নিজের প্রতি নির্মম হতে পারবে। এর প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষক ও পিতামাতার অবশ্যই কর্তব্য হবে তাকে অযথা নিষ্ঠুর আঘাত থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করা। তাদের এই ছেলে বা মেয়েটির সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার করা উচিত। তার প্রতি সতর্ক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকবে সত্য, কিন্তু অতিরিক্ত করুণা দেখালে বা অন্যায় প্রশ্রয় দিলে, অক্ষম শিশুটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পথে বাধাই দেওয়া হয়। ভগবান যে আঘাত দেন, মানুষ তার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান কখনই করতে পারে না, এমন কি পিতামাতাও না। তাই তা যথাসম্ভব শান্তভাবে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

এদের জীবিকার ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত। যেখানে দৈহিক বল, ও দ্রুত অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন সে সব কাজ এই পঙ্গু বা বিকলাঙ্গের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সব কাজে দৌড় ঝাঁপ করবার প্রয়োজন নেই,—যে সব কাজ মোটামুটি ঘরে বসে করা যায়, তাতে এসব মানুষ সাফল্য অর্জন করতে পারে। পড়াশুনার কাজে এদের বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় (যে সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন হয় না) অথবা সাহিত্য চর্চায় বিকলাঙ্গ মানুষের যশঃ ও কৃতিত্ব অর্জন সম্পূর্ণ অজানিত নয়। সকলের থেকে বড় কথা, এদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন, অসাধারণ সাহস ও দৃঢ় মনোবল। বিকলাঙ্গদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা এবং জীবিকা উপার্জন ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তার ব্যবস্থা অগ্রসর দেশ সমূহে আছে। আমাদের দেশে এ সব ব্যবস্থা খুব বেশী নাই। এখানে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে নিজের বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায়ই নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। এমন হৃদয়হীন অমানুষও আমাদের দেশে আছে, যারা হতভাগ্যদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়েতার ভাগ নিয়ে থাকে।

দিল্লীতে বিকল ও অবসাদ্গদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে চিকিৎসার (Occupational therapy) ব্যবস্থা আছে। এতে বহু পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও অকর্মণ্য ব্যক্তি জীবনে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। সর্বত্রই এ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বাক্য উচ্চারণ ব্যাপারে ত্রুটি—Problems of those who have speech defects—তোৎলামী, অস্পষ্ট উচ্চারণ, স্বরভঙ্গ, শিশুর মত আধো আধো কথা ইত্যাদি দোষগুলি খুব গুরুতর না হলেও ব্যক্তির সাফল্য ও তার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্ট করে। স্বরযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন না কোন অংশের ত্রুটিপূর্ণ গঠন অথবা কোন রোগ, এসবের জন্য দায়ী হতে পারে। কোন কোন ত্রুটি জন্মগত ও বংশগত হতে পারে, আকস্মিকও হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির জন্মাবধি উপরের ঠোঁট কাটা (harelipped) তালু বিভক্ত (cleft palate) জিহ্বা ভারী, কণ্ঠনালী রুগ্ণ হতে পারে এবং এ সব যে কোং কারণের জন্যেই তোৎলামি বা উচ্চারণে অস্পষ্টতা আসতে পারে। সামনের দাঁতের ফাঁক বেশী হলে, অথবা দাঁতের দোষও এজন্যে দায়ী হতে পারে। এর মধ্যে কোন কোন ত্রুটি শিশুকালেই অস্ত্রোপচার বা অন্য চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। অনেক সময় মনে করা হয় জিহ্বা বেশী ভারী হলে তার জন্য তোৎলামী দেখা দেয়। কিংবদন্তী আছে, গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ডেমস্থিনিস্ বাল্যকালে অত্যন্ত তোৎলা ছিলেন। এজন্য তিনি জিহ্বার উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে নদীর পারে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতেন। তোৎলা শিশুদের শতকরা নব্বুই জন বা আরো বেশী, বিনা চিকিৎসায়ই আপনা থেকেই সেরে যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে তোৎলামী বেশী দেখা যায়। বাক্য উচ্চারণের সমস্ত ত্রুটিই চিকিৎসার দ্বারা সংশোধনযোগ্য নয়। মস্তিষ্কে বাক্য উচ্চারণ কেন্দ্রে কোন আঘাত বা রোগের জন্যে উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে তার চিকিৎসা দুঃসাধ্য।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন এসব ত্রুটির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন না কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণও বর্তমান থাকে। শিশু ভাষা শিক্ষা করে, বড়দের অনুকরণ করে। যদি পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয় গুরুজনদের উচ্চারণ খারাপ হয়, তবে তাদের দেখাদেখি শিশুদেরও খারাপ উচ্চারণের অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। শিশুদের আধো আধো উচ্চারণ শুনতে খুব আমোদ লাগে। সেজন্যে শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণকে আমরা প্রশ্রয় দিই এবং অনেক সময় তাতে উৎসাহই দিই। শিশুর আধো আধো উচ্চারণ অবশ্যই

তার বাগযন্ত্রের অপরিণত বিকাশের ফল। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই এ অস্পষ্ট উচ্চারণের ত্রুটি সেরে যায়। কিন্তু শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে, বড় হয়েও হয়তো তাদের ন্যাকা-ন্যাকা উচ্চারণের অভ্যাস দূর হয় না। শুনতে পাই উঁচু-ঘরের মেয়েদের মধ্যে এই আধো আধো শিশুসুলভ উচ্চারণ (Baby-talk) নাকি কখনো কখনো ফ্যাসান্ বলেই গণ্য হয়।

শিশু আট দশ বৎসর হলেই তার স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস জন্মায়। তাই তোৎলামি বা উচ্চারণের ত্রুটি অন্যের বিরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তাতে তারা নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে, ফলে তাদের তোৎলামি বা উচ্চারণের বিশেষ ত্রুটিটি বরং বেড়েই যায়। শিক্ষক এ জন্য বেশী, ধমকধামক করলে সে নিজেকে বিষম অসহায় বোধ করে এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এতে সে লেখা-পড়ায় পিছিয়ে যেতে পারে এবং অন্যবিষয়েও তার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বন্ধু বান্ধব বা সঙ্গী সাথীরা তাকে বেশী ক্ষ্যাপালে তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তার ফলে সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে 'কুণো' হয়ে যেতে পারে অথবা সংযম হারিয়ে মারধর করতে (aggression) উদ্যত হতে পারে, বদ মেজাজী ও খিট্‌খিটে হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর অনুভূতির জীবন শান্ত, স্নিগ্ধ, উৎসাহ ও সহানুভূতিপূর্ণ হলে এ ত্রুটিগুলি কমই দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শিশু নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করে, সেখানে তার ক্ষুদ্র শক্তি তার অনুভূতির তীব্রতাকে বশে রাখতে পারে না। তখন তোৎলামি বা উচ্চারণের ত্রুটির মধ্য দিয়ে তার অস্থির মানসিক সংঘাত আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এটা দেখা যায়, যে ছেলেরা ভীরু, অভিমানী, আত্ম-সচেতন, তাদের মধ্যেই তোৎলার সংখ্যা বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে ঘাবড়িয়ে গেলে, তোৎলামী বাড়ে। ডাঃ স্পক্ (Dr. B. Spock)-এর মতে ছোট অল্প বয়স্ক শিশু যখন কিছু কিছু কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয়, তখন তার যে আকুলি বিকুলি তা অনেক সময় তোৎলামির কারণ। তার প্রাপ্য ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন অশান্তি বা ঈর্ষাও শিশুর তোৎলামি রূপে দেখা দিতে পারে। যেদিন তার মা হাসপাতাল

থেকে আর একটি ছোট নূতন বোনকে নিয়ে বাড়ী আসলেন, সেদিনই একটি শিশুর তোৎলামি সুরু হল। আর একটি শিশুর বেলায় দেখা গেল, বাবা বাড়ীতে ভয়ানক রেগে খুব ধমক-ধামক করেছেন, তাতে ভীষণ ভয় পেয়ে তার তোৎলামি দেখা দিল। মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখাবার জন্যে একদল অতিথির সামনে সদ্য শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন, আর তখনই সুরু হল খুকুর তোৎলামি। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেমেয়েদের জোর করে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোৎলামি দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ন্যাটা হওয়ারই একটা কারণ, শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয়, তথাপি শিশুর তোৎলামির লক্ষণ দেখা দিলে পিতামাতা ও শিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত। শারীরিক ও চিকিৎসা-যোগ্য কারণে এ সব ত্রুটি হয়ে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর অনুভূতির জীবনে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাই-বোন বন্ধুদের কাছে স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসা পেলে এসব ত্রুটি সহজেই সেরে যেতে পারে। কিন্তু বাপ-মা এর অত্য অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করলে তারও প্রতিক্রিয়া শিশুর মনের উপর ভাল হয় না। শিশুর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করাই দরকার। তার ত্রুটির জন্যে অতিরিক্ত দয়া দেখালেও শিশুর মনে মনে বিরক্ত হয় বা ভয় পেয়ে যায়। শিশুর দেহ-মনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতা-মাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল, যে স্বচ্ছ,-মার্জিত ও সহজ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসাই শিশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং রুগ্‌ণ শিশুদের লালনের জন্যে অত্যাবশ্যক।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ব্যতিক্রমের বিপদ—মানসিক

মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, ন্যূনতা বা বিকৃতিজনিত সমস্যা

ইতিপূর্ব্বে আমরা ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্ষমতার দিক দিয়ে যারা ব্যতিক্রম—শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনা করব—মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে যারা ব্যতিক্রম, তাদের সম্পর্কে।

সমস্ত প্রকার মানসিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও জ্ঞান আহরণ—এ দুইয়ের জন্য প্রয়োজন যে মানসিক ক্ষমতা,—যাকে আমরা বলি বুদ্ধি,—তার তারতম্য বিচারের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণীত হয়েছে। বুদ্ধি যাদের অতিরিক্ত বা বুদ্ধি খুব কম, অথবা যাদের মানসিক শক্তির বৈকল্য ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়।

বুদ্ধি অতিরিক্ত বা ন্যূন বা বিকৃত—তা কি করে বুঝা যায়? এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বা গভীর আলোচনার মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি তাহার বয়সের তুলনায় সমমাত্রায় অগ্রসর হয়েছে, তাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধরা হয়। এ থেকে বুঝা যাবে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা তার কাছাকাছি, তাদের সাধারণ বা মাঝারী (Average) বুদ্ধি বলে ধরা হয়। মাঝারী বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা অর্দ্ধেকের বেশী। এবং ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে আমরা পৌঁছাই প্রতিভাসম্পন্নদের কোঠায়,—যাদের বুদ্ধি ১৪০ বা তারও বেশী; আবার অনুরূপভাবে বুদ্ধির পরিমাণ ক্রমশঃ কমে কমে আমরা ক্ষীণবুদ্ধি (যাহাদের IQ. ৫০ বা আরো কম) অথবা জড়বুদ্ধি বা একেবারে 'হাবাদের দলে পৌঁছাই (যাদের IQ. ২৫ এর কম)। (বুদ্ধির মাপ অধ্যায় দেখ)

বুদ্ধির ন্যূনতা জনিত সমস্যা—বুদ্ধিতে যারা খাটো, লেখাপড়া বিষয়ে বা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা খুব সফল হবে, এমন আশা কম। বর্তমান জগতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং যারা বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী, তারাই সাধারণতঃ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই সাধারণের দলে (Average) এবং তারা মোটামুটি ভাবে স্বচ্ছন্দ জীবিকা অর্জন করে থাকে এবং সমাজে অন্য দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে সুখেই জীবন যাপন করে। তাই যাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে খুব নীচু স্তরের নয় (I,Q. ৮০ থেকে ৭০র মধ্যে) তারা খুব উচুদরের সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় না। যে সব যন্ত্রের কাজ খুব বেশী জটিল বা সূক্ষ্ম নয়, এমন কাজ (unskil'ed workmen), ছোটখাটো ব্যবসা (small traders), নীচু স্তরের কেরানীর কাজ ইত্যাদিতে এরা অসফল হয় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে অবশ্যই এরা খুব সাফল্য অর্জন করতে পারে না। যাদের I.Q. ৬০ এর কোঠায়, তারা আরও ক্ষীণবুদ্ধি, যদিও একেবারেই নির্বোধ নয়। এরা মাঝে মাঝে ফেল করে; স্কুলের গণ্ডী সব সময় পার হতে পারে না। এ সমস্ত ছাত্রদের পক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ডশ্রম মাত্র। অবশ্য, এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এ নয় যে, যারা স্কুলে বারে বারে ফেল করে, তারা সকলেই বুদ্ধির দিক দিয়ে খাটো। অনেক সময় এ পিছিয়ে পড়ার কারণ অ-স্বাস্থ্য, কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের বিশেষ রুগ্নতা, প্রতিকূল সাংসারিক পরিবেশ, শিক্ষক ও সতীর্থদের প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব ইত্যাদি।

যারা বুদ্ধির দিক দিয়ে কিছু খাটো, তারা অন্যদের তুলনায় নিজেদের হীন বিবেচনা করে কিছুটা লজ্জা বোধ করতে (a feeling of inferiority) পারে এবং এজন্য সকলের সঙ্গে এরা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে পারে না এবং কিছুটা অসামাজিক প্রকৃতির (unsocial) হয়। কিন্তু এই হীনতাবোধ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিজেদের হীনতা ঢাকবার জন্যে এরা অনেক সময় অতিমাত্রায় বাহাদুরী দেখাতে যায়; নানা বিষয়ে মিথ্যা বড়াই করে, তারা যে কারও চেয়ে ছোট নয়—একথা সর্বদা প্রমাণ করতে চায়। এদের বোকামি সহজেই মানুষের কাছে ধরা পড়ে। বুদ্ধির উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনার অভাব থাকাতে এদের অনুভূতির জীবন সুসম নয়।

বুদ্ধি বিবেচনার অভাবে এরা সহজেই প্রবল ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়। কাজেই ধর্ম্মঘট, হরতাল ইত্যাদি উত্তেজক ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যে এরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই সকল ধ্বংসাত্মক কার্য্যের মধ্য দিয়ে এরা নিজেদের 'শক্তি' জাহির করবার সুযোগ পায়। এতে তাদের মনেও বেশ একটা তৃপ্তি ও ধারণা জন্মে যে 'আমরা সামান্য নই।' এবং অনেক সময় রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক নেতারা এদের দ্বারা কার্য্য উদ্ধারের জন্যে সাময়িকভাবে এদের পিট চাপড়িয়ে উৎসাহিত করেন। এই মিথ্যা বাহাদুরীর পথেই এরা অনেক সময় অসামাজিক অপরাধে (যেমন, ট্রাম পোড়ানো, ঢিল ছোঁড়া, জুয়া খেলা, গুণ্ডামী, চুরি করা, মেয়েদের প্রতি ইতর ইঙ্গিত করা, রকে বা চায়ের দোকানে বসে অসংযত ভাষায় দেশের নেতাদের গালাগালি করা ইত্যাদি) গভীরভাবে লিপ্ত হয় (delinquency)। বিপদের কথা এই যে, বুদ্ধির অল্পতার জন্যে এরা নিজেদের ব্যবহার বা কার্য্য যে অন্যায়, তা বিচার করে দেখতে পারে না, কাজেই এ সব অন্যায় কার্য্যের জন্যে তাদের নিজের মনের মধ্যেও কোন অপরাধ-বোধ নেই, কোন অনুশোচনাও নেই। বুদ্ধির অভাবেই এদের ভাবাবেগ অসংযত; তাই ঝোঁকের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এরা কাজ করে বসে এবং এজন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন—পুলিশ বা বিচারক বা হেডমাষ্টার) তাদের শাস্তি দিলে, তারা কিছুতেই তা শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে না, বরং ভবিষ্যতে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মনকে আরো বিদ্বিষ্ট করে রাখে। সেই জন্যে এ জাতীয় অল্পবুদ্ধি মানুষেরা সমাজের পক্ষে বিপদ। কিন্তু, মূলতঃ এ মানুষগুলি হিংস্র অপরাধী নয়। এদের অনেকের মধ্যেই একটা শিশুসুলভ সরলতা, দৃঢ় মহত্ত্ব, বন্ধুপ্রীতি, আদর্শনিষ্ঠা ইত্যাদি মহৎগুণের বীজ লুকায়িত আছে। এদের মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে খুব জটিলতা নেই। তাই যাকে তারা নেতা বলে মানে তার কথায় এরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরা যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে যায়, এরা সর্বত্র মুক্তি-আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর লাঠি ও গুলি মাথা পেতে, বুক পেতে নেয়, এরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়-গান গেয়ে হাসিমুখে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় হয়। এদের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায় দস্যু রত্নাকর, পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই, ভিন্দ:মারেণার

দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল। আবার বিনোবা ভাবেজীর মত উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে এরাই ঋষি, ভক্ত ও সমাজরক্ষকে পরিণত হতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মী, দেশপ্রেমিক নির্ভীক মানুষই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি।

কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে যারা কিছু খাটো তাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের জন্য আলাদা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। তার ফলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে এরা অগ্রসর হতে পারে না। এতে তাদের লেখা-পড়ার বিষয়গুলি অনুরাগের বিষয় হয়ে ওঠে না। ক্রমেই তারা আরো পিছিয়ে পড়ে। এর উপর শিক্ষক বা সহকর্মীরা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার জন্যে তাদের উপর বিরক্ত হলে অথবা উপহাস বা অবহেলা করলে, তারা লেখাপড়া ও ইস্কুল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে হয়তো এরা ইস্কুল পালিয়ে 'দলে' মেশে এবং সস্তা উত্তেজনার পথে অন্তরের অশান্তি দূর করতে প্রয়াসী হয়। এতে তাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। কোন ক্লাশে এ রকম স্বল্পবুদ্ধি ছেলের সংখ্যা বেশী হলে, সম্পূর্ণ ক্লাশটিরই লেখাপড়ার অগ্রগতি শ্লথ হয়। এ সব ছেলেরা ক্লাশের কাজে রস পায় না বলেই অমনোযোগী হয়, ক্লাশে গোলমাল করে এবং এ অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কাজেই এ সব ছেলেদের বুদ্ধির স্বল্পতা তাদের নিজেদেরও ক্ষতির কারণ, অন্যের পক্ষেও তাই। এতে শিক্ষকের উদ্যম ও বিদ্যাবত্তারও বৃথা অপচয় ঘটে।

এ সব কথা বিবেচনা করলে যারা বুদ্ধির দিক দিয়ে কিছু খাটো, তাদের নিয়ে আলাদা ইস্কুল বা ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। তাদের পাঠ্যতালিকাও সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় সহজ করা দরকার। এবং এদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে তারা উচ্চতর শিক্ষার পথে না গিয়েও জীবিকা উপার্জন করতে পারে। কাজেই এ জাতীয় ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার উপর ঝোঁক দেওয়াই উচিত। এদের জন্যে দেশে যথেষ্ট Technical ও Industrial School স্থাপন করা প্রয়োজন। এরা মগজে খাটো হলেও হাতের কাজের নিপুণতায়

অনেক সময়ই ন্যূন নয়। বরং এ রকম কাজ যদি সফলভাবে তারা করতে পারে তবে তাতে তারা আনন্দই পায় এবং নিজেদের সম্বন্ধে গর্ববোধ সার্থকভাবেই পোষকতা লাভ করে।

সমস্ত ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান, স্নেহশীল, মহচ্চরিত্র শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশেষ করে স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরো বেশী সত্য। পূর্বেই বলেছি এ সমস্ত ছাত্রের মন অনেকটা নির্বোধ শিশুর মত সরল। এরা অক্ষম বলেই স্নেহের কাঙ্গাল। যে শিক্ষক মায়ের মত ক্ষমাশীল এবং ধরিত্রীর মত ধৈর্যশীল, তিনি তাঁর মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে কল্যাণের পথে এদের অসংযত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করে এদের নূতন মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন। **কঠোর ও নির্মম শাস্তি বা অবজ্ঞা এদের অবজ্ঞেয় করে তুলবার পথই প্রশস্ত করে।** বলা বাহুল্য, এ সব সন্তানদের সম্বন্ধে পিতা মাতার দায়িত্বও বুদ্ধিমান্ সন্তানদের তুলনায় গুরুতর।

ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধির সম্বন্ধে সমস্যা

যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ থেকে ৫০ এর মধ্যে, তারা নিশ্চিতই ক্ষীণবুদ্ধি। এদের চেহারায় ও কথাবার্তায় বুদ্ধিহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। এদের হাঁটা-চলাও পরিচ্ছন্ন নয় (clumsy gait)। এদের ইংরাজীতে morons বলা হয়। এরা কাজকর্ম গুছিয়ে করতে পারে না। নিজে বুদ্ধি খরচ করে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এই ক্ষীণবুদ্ধির কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, এদের মস্তিষ্ক সুগঠিত নয়—স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে নি। অনেক সময়ই রসক্ষরা গ্রন্থি বা হর্মোণের ত্রুটিপূর্ণ কার্য এদের মধ্যে দেখা যায়। একথা স্বীকৃত যে মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতির উপর থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থির প্রভাব অসামান্য। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন—"সমস্ত দেহের উপর এর নিয়ামক ক্রিয়া (regulator) বর্তমান। এই থাইরয়েড্ এর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর সমস্ত দেহের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে, কাজেই মানব ব্যবহারের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।" উড্ওয়ার্থের মতে এই হর্মোণের ক্ষরণে ন্যূনতা ঘটলে ব্যক্তির দেহের চামড়া শিথিল, চক্ষু

নিষ্প্রভ ও আকার ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এ সব ব্যক্তি উৎসাহহীন, অলস ও নির্বোধ হয়। এই ন্যূনতার জন্য যে সব রোগ হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাইক্সেডিমা (myxoedima) ও ক্রেটিনিজম্ (cretinism)। আবার এর ক্ষরণ অতিরিক্ত হলে শারীরিক বৃদ্ধি হয় অস্বাভাবিক, এবং দেহের বৃদ্ধিটাও হয় অতি দ্রুত। এ রকম ব্যক্তি চঞ্চল, অসন্তুষ্ট, অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকে। এদের বুদ্ধিটা কিন্তু বাড়ে না। সাম্প্রতিক কালে পল্ ডি ক্রুইফ্ (Paul de Cruif) এই হর্মোণদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করছেন। মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী শিক্ষক সকলের নিকটই এ সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হচ্ছে। পূর্বে এ সব শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি চিকিৎসার অযোগ্য মনে করা হত। কিন্তু এখন জানা গেছে হর্মোণের অভাবের ক্ষেত্রে মেষের থাইরয়েড খেতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই হর্মোণ এখন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে। এবং থাইরয়েড ঘটিত নানা ইন্জেক্সন এবং খাওয়ার ঔষধও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

এদের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। এদের ধৃতিশক্তি (power of comprehension) যেমন দুর্বল, স্মৃতিশক্তিও তেমনি অপ্রখর। জটিল ও বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) এদের সাধ্যের বাহিরে। এদের বুদ্ধি কখনও ৬।৭ বৎসরের চেয়ে বেশী পরিণতি লাভ করে না। বিশেষ (particular) ও মূর্ত (concrete) বিষয় এরা বুঝতে পারে, বারে বারে মুখস্থ দ্বারা এরা সহজ পাঠ মনে রাখতে পারে। হাতের কাজ ও সহজ যান্ত্রিক কাজ (Simple mechanical and repetitive) গুলি এরা মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে। সহজ হাতের কাজের মধ্য দিয়েই এদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কাজেই বাঁশের বা বেতের কাজ, সহজ সহজ চমড়ার কাজ, বিড়ি পাকানো, শিশিতে লেবেল লাগানো—এ সমস্ত কাজে এদের লাগানো যেতে পারে। মণ্টেসারী প্রথমে এই জাতীয় অল্পবুদ্ধি ও ক্ষীণবুদ্ধি বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার নিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখলেন শিশুদের শিক্ষা দিবার সহজ উপায় হচ্ছে খেলাধুলা ও হাতের কাজ। এরা বুদ্ধি করে অনভ্যস্ত নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তবে গাড়ীঘোড়া সামাল রাস্তাঘাট চলতে পারে, কাপড় চোপড় নিজেরা

পরতে পারে, জীবনের মৌল স্থূল কাজগুলি মোটামুটি চালাতে পারে। কাজেই সর্বদা এদের নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না এবং কারও তত্ত্বাবধানেই এরা কাজ করতে পারে।

এদের ইন্দ্রিয় ও পেশী অপরিণত এবং এদের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি সীমাবদ্ধ। এরা অব্যবস্থিতচিত্ত এবং এদের মনোযোগ বেশীক্ষণ এক বিষয়ে থাকে না। এদের অনুভূতির জীবনও বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত। আদিম দক্ষসংস্কার (instincts) দ্বারা এরা চালিত। শুভাশুভ বুদ্ধি, বা কার্যের ফলাফল বিবেচনা করে দেখতে এরা অক্ষম। সদুপদেশ দ্বারা এদের সংশোধন হওয়া কঠিন। অনেক সময় শাসনের দ্বারা এদের সংযমে রাখতে হয়। তবে এরাও সহজে স্নেহ ও মমতার দ্বারা বশীভূত হয়। এদের মনের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব। এরা সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিষ্ঠুর হতে পারে। তবে যাঁরা ধৈর্য ও ভালবাসা দিয়ে এদের হৃদয় জয় করতে পারেন, তাঁদের এরা সম্পূর্ণ বশ হয়। সাধারণ মানুষকে যে মান দিয়ে বিচার করা হয়, এদের ক্ষেত্রে সে মান ব্যবহার করলে ভুল হবে। এরা ভেবে অন্যায় করে না, অন্যায়বোধই এদের অপরিণত। সমাজের জটিল সম্বন্ধ ও নীতিবুদ্ধি এদের আয়ত্তের বাইরে এবং পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে এরা শিশুর মতই অক্ষম।

অনেক সময়ই এরা নিজেরা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়। দায়িত্বশীল কারও তত্ত্বাবধানে এদের দিয়ে বাগানের কাজ, কুটির শিল্পের নানাপ্রকার কাজ করানো যেতে পারে। কলকারখানার কাজ বা যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে এ রকম যন্ত্রাদির কাজে এদের কদাচ দেওয়া উচিত নয়।

জড়বুদ্ধি ও একেবারে নির্বোধদের সমস্যা

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ এর নীচে ২৫ পর্যন্ত, তারা জড়বুদ্ধি (imbecile)। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫ এরও নীচে তারা একেবারে নির্বোধ (Idiots)। এ দুর্ভাগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, পিতামাতার অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি বা ধাতুরোগ সন্তানের দুরবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। পোলিও (polio),

মেনিঞ্জাইটিস্ (meningitis) ইত্যাদি রোগের ফলেও মস্তিষ্কের বোধ ও কর্মকেন্দ্র বা তাদের সংযোগ রোগগ্রস্ত হয়ে বুদ্ধির বিষম হ্রাস ঘটতে পারে। টন্‌সিলের প্রদাহ, হাঁপানী ইত্যাদি শ্বাসযন্ত্র ঘটিত রোগ কখনো কখনো বুদ্ধি হ্রাসের জন্ত দায়ী। রসক্ষরাগ্রন্থির ক্ষরণের ব্যতিক্রমের সঙ্গে বুদ্ধির বিপর্যয়ের সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পলিও ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চলছে। একেবারে প্রথম অবস্থায় ভিন্ন চিকিৎসার দ্বারা খুব সন্তোষজনক ফল এখনও পাওয়া যায় নি। এমন সন্তান যতদিন বেঁচে থাকে পিতামাতার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ। তবে এরা প্রায়ই স্বল্পায়ু হয়ে থাকে।

জড়-বুদ্ধি বা নির্বোধেরা বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যেতর জন্তু বা ছোট শিশুর মত অপরিণত। এদের জিব দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, চোখের কোণে পিচুটি লেগে থাকে। দেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিও এরা নিজ চেষ্টায় মেটাতে পারে না। অনেক সময় অবশেই মাথা নাড়ে, চক্ষু ঘুরায়। হা হা করে অর্থহীন ভাবে হাসে, সঙ্গত কারণ ব্যতীতই কাঁদে। এরা সহজ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটা চলাও করতে পারে না। এদের কারও মস্তিষ্কের আকার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ। এরা একান্তই পরনির্ভর এবং বিপদ সম্পর্কে এরা সচেতন নয়। তাই পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনদের এদের সম্বন্ধে সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হয়। জল, আগুন, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি বিপদ থেকে এদের সতর্কে রক্ষা করতে হয়। এদের লেখাপড়া শেখানো বা জীবিকার জন্তে কাজ শেখানো প্রায় অসম্ভব। মৃত্যু পর্যন্ত এই হতভাগ্য ব্যতিক্রমদের দায় পিতামাতা বা সমাজকে বহন করতে হয়। উপযুক্ত যত্ন, চিকিৎসা ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে স্নেহশীল ব্যবহার দ্বারা এদের কিছু পরিমাণে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারাই যথেষ্ট। এরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা

মানুষ প্রকৃতির সন্তান—কিন্তু সে অশান্ত, অবাধ্য সন্তান। মনুষ্যেতর প্রাণীদের জীবন প্রকৃতি দ্বারাই পরিচালিত। ইন্দ্রিয়ের বোধ, পেশীর কর্মক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত অন্ধ আবেগ ও সংস্কার (instincts) দ্বারা ব্যবহার করে তারা তাদের জীবনযাত্রা অনেকটা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করে। তারা

প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি, প্রকৃতিক শক্তিগুলির স্বরূপ কি, তা জানে না এবং সেই শক্তিগুলিকে নিজস্ব উদ্দেশ্যে সচেতন ভাবে ব্যবহার করে নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পশুদের নাই। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে উন্নততর জীব, কারণ সে প্রকৃতির দাস নয়। শক্তির স্বরূপ কি তা জেনে, নিজের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতে মানুষ সর্বদাই চেষ্টিত। মানুষের এই সদাজাগ্রত ঔৎসুক্য, উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুদ্ধির জয়যাত্রার ইতিহাস।

কাজেই মানুষ বুদ্ধিকে দাম দেয়। যার বুদ্ধি আছে সে জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, নূতন আবিষ্কার করতে পারে, জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বস্তুক চিন্তা করতে পারে—উন্নতির নূতন পথ সূচনা করতে পারে। তাই মানুষের সমাজে যাদের বুদ্ধি আছে তাদের সম্মান আছে। আমরা বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে চাই, বুদ্ধিমান দেশনেতা চাই, বুদ্ধিমান জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌জীনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও কারিগর চাই (চাই না শুধু অতিবুদ্ধিমতী স্ত্রী বা অতিবুদ্ধিমান চাকর!) একথা আমরা বিশ্বাস করি, এই তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ জগতে বুদ্ধিই সাফল্যের মূল। মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য।

আমরা পূর্বে বলেছি একেবারে ঠিক ঠিক সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q) হচ্ছে ১০০। বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের ১১০ থেকে ৯০ পর্যন্ত, তাদেরই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ধরা হয়। যাঁদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০এর কোঠায়, তাঁরা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাদের ১৪০ বা তারও বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক, তাঁরা প্রতিভাবান্ বলে বিবেচিত হন। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সেনাপতি, শিল্পী যাঁরা পৃথিবীর নেতৃস্থান অধিকার করেছেন, যাঁরা মানুষের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি বিস্তৃততর করেছেন, তাঁদের অনেকেরই বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তা সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র অনেকটা উপরে। সমস্ত সভ্যদেশেই এই অসাধারণদের আবিষ্কার করবার ও পুরস্কৃত করবার চেষ্টা হয়। সেজন্যই নোবেল প্রাইজ, পুলিৎজার প্রাইজ, ষ্টালিন্ প্রাইজ, মেরিট্ স্কলারশিপ্, পদ্মশ্রী ইত্যাদি ভূষণের ব্যবস্থা। এ রকম অসাধারণ ব্যক্তি যে সমাজে যত বেশী জন্মগ্রহণ করেন ততই কল্যাণ। এঁরা দেশ ও সমাজের অমূল্য সম্পদ।

যাঁরা প্রতিভাবান্ তাঁদের পিতামাতাও প্রতিভাবান্ না হতে পারেন। তবে প্রতিভার মূল বহুলাংশে জন্মগত এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে। সাধারণতঃ প্রতিভাবানদের পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল। মনীষী জনগনের সংজ্ঞা মতে, প্রতিভা পরিশ্রম করবার অসীম ক্ষমতা—Genius is the capacity for taking infinite pains। এটা সত্য যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারেন। এর কারণ কিছুটা পরিমাণ শারীরিক হতে পারে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে এদের স্বাস্থ্য ও ইন্দ্রিয়াদির তীক্ষ্ণতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটা বেশী। তাঁদের মানসিক শক্তির পুঁজি অন্য মানুষের চেয়ে অনেক ভারী। কিন্তু সাধারণের চেয়ে তাঁদের প্রভেদ শুধু মাত্র শক্তির প্রাচুর্যে নয়,—এটা শুধুমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ নয়, এটা মূলতঃ গুণগত। যাঁরা প্রতিভাবান্ তাঁরা বাইরের কোলাহল ও প্রতিকূলতাকে অনেক সহজে উপেক্ষা ও অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা অনেক বেশী আত্মস্থ—চিন্তা ও কর্মের বস্তুতে তাঁরা সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে তদ্গতচিত্ত হতে পারেন। তাঁদের মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষের জন্যই সাধারণে যা দেখতে পায়, তার চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী দূর দেখতে পারেন। একেই প্রাচীন ভারতে ঋষিদৃষ্টি বলা হত। প্রতিভাবানদের আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি অনেক বেশী সুসংযত, তাই দুঃখের দিনে এরা অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও এরা প্রমত্ত হন না। দৃঢ় মনোবলের জন্য এরা চতুর্দিকের বিপদ, বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে একাগ্র হয়ে নিজ সাধনায় স্থির থাকতে পারেন। কিন্তু প্রতিভার উৎকর্ষের জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়। প্রতিভাবানদের জীবন সহজ আরামের জীবন নয়। তাঁদের সম্পর্কেও তাই 'সমস্যা'র কথা আসে।

এই সাধারণের পৃথিবীতে প্রতিভাবানেরা নিতান্তই সংখ্যালঘু, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই যেখানে সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, সেখানে মুষ্টিমের প্রতিভাবান্দের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, মতামতের উপযুক্ত মূল্য নাও দেওয়া হতে পারে। তাই প্রতিভাবান্রা সব সময় এ পৃথিবীতে খুব সুখী হন না। অনেক সময় তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের 'জনতা'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে পারেন না। যাঁদের বুদ্ধি কম, তাঁরা অতি-বুদ্ধিমানদের সব সময় খুব সুনজরে দেখেন না। তাঁরা অনেকের ঈর্ষার পাত্র। তাঁদের নিজের মনেও কমবুদ্ধি

সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে কিছুটা অবজ্ঞা ও অবহেলা থাকতে পারে এবং সে জন্যে মানুষের সঙ্গে সহজভাবে তাঁরা মিশতে পারেন না। সাধারণ মানুষেরাও তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। গ্রীস্ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সক্রেটিস্‌কে তাই জনতার বিচারে ধর্মদ্রোহী ও সমাজের শত্রু বলে চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মত সাংসারিক বুদ্ধি থাকলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, অথবা কারাগার রক্ষীদের ঘুষ দিয়ে পলাতে পরিতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও আদর্শনিষ্ঠাই তাঁর কাল হল। স্বেচ্ছায় হেম্‌লক্ বিষপানে তিনি নিজ জীবন বলি দিলেন।

যে সব শিশু বাল্যকালেই প্রথম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তাদের পিতা-মাতাদের তাদের সম্পর্কে গর্ব থাকা স্বাভাবিক। সকলের কাছে নিজ সন্তানের বুদ্ধি প্রমাণ করবার জন্য পিতামাতা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হতে পারেন। এতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির ধারা ব্যাহত হতে পারে। এর ফল একেবারেই শুভ নয়। শিশু তাতে অল্প বয়সেই গর্বিত এবং নিজ বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে এবং তার মনে এই বিপজ্জনক ধারণা জন্মাতে পারে যে, তার পরিশ্রম করে লেখাপড়া শিখবার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময়ে যারা সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে অথবা যে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই নাচে, গানে, আবৃত্তিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখায়, খবরের কাগজে তাদের ছবি ও পরিচয় সাড়ম্বরে প্রচারিত হয় এবং প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে এদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাফল্যের জন্যে কিছুটা প্রশংসা ও পুরস্কার ভালই, কিন্তু অপরিণত মনের পক্ষে এত প্রশংসার ফল অনেক সময়ই শুভ হয় না। এতে পুরস্কার-প্রাপ্তরা নিজেদের 'কেউ কেটা' বলে ভাবতে শেখে এবং কম বুদ্ধিমানদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাশীল হয়। যে ছেলেটি সংসারের মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমান, পিতামাতা তাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সংসারেও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সে 'ভালো ছেলে' বলেই হয়তো পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের যে সব প্রয়োজনীয় ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয় তা থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। তাতে এ ছেলের অন্যান্য ভাইবোনেরা ভাবতে শেখে, "ওর তো সাতখুন মাপ—ও তো বাবা মার আদুরে ছেলে!" এতে তারা এই অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ভাইটির প্রতি বিদ্বিষ্ট না হয়ে পারে না। তার উপর যদি বাব'মা অন্যান্য সন্তানদের ওই ভালো ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করে পদে

পদে খোঁটা দেন, তবে তাদের বিদ্বেষ তীব্র ঘৃণায় পরিণত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

অথবা বিপরীতও হতে পারে। পিতামাতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছেলেকে 'বেশী পাকা' 'সবজান্তা' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে তার সুস্থ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধাই সৃষ্টি করতে পারেন[১]। তা ছাড়া এসব ভাল এবং উজ্জ্বল বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পিতার অতিরিক্ত প্রত্যাশা থাকতে পারে। তার ফলে এসব ছেলেমেয়েদের মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে পারে।

অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালটা বিশেষ সংকটের কাল। এরা বুদ্ধির দিক থেকে সমবয়স্ক অন্য ছেলেদের তুলনায় বেশী পরিণত। এরা তাই নিজেদের চেয়ে বেশী বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মিশতে ভালবাসে। কিন্তু এরা অনুভূতি বা দৈহিকশক্তির দিক থেকে এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে সব বড় ছেলেদের সঙ্গে এরা মেশে, তাদের তুলনায় অপরিপক্ক। তাই বড়দের সঙ্গে মিশে এরা 'ইঁচড়ে পেকে যেতে' পারে। প্রত্যেক বয়সেরই কতগুলি সঙ্গত ব্যবহার ও আচরণ আছে। কিন্তু এরা বাস্তবিক পক্ষে বড় না হলেও, বড়দের অধিকার ও স্বাধীনতা দাবী করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। এরা সাধারণতঃ নিজ অধিকার সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন এবং প্রচণ্ড অভিমানী হয় এবং সে জন্যই পিতামাতা শিক্ষকের শাসন-নিয়ন্ত্রণ এরা সহজে মেনে নিতে ইচ্ছুক থাকে না। ফলে নানা সংঘর্ষ উপস্থিত হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে সংসারে নানা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এদের সম্পর্কে তাই পিতা মাতার অতিরিক্ত সাবধান হতে হয়।

বিদ্যালয়েও এদের নিয়ে নানা সমস্যার উদয় হয়। সেখানে ভাল মন্দ মাঝারী সব ছেলের জন্যেই একই পড়া ও কাজের ব্যবস্থা। কিন্তু তীক্ষ্ণধী

১ If the family resents his superiority he will try not to show it, to withdraw within himself and stifle his self.expression and natural development. He may attempt to compensate for the feeling of insecurity and frustration by directing his energies in merely intellectual channels, If again, he is over-indulged, he may become self-opinionated, aggressive and emotionally uncontrolled

Crow and Crow. Mental Hygiene.

ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা অতিমাত্রায় সহজ। এতে তাদের বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হয় না—The course of study offers no challenge to their intelligence. এরা বুঝতে পারে সহজে, এদের স্মৃতিশক্তি প্রখরতর, কাজেই ক্লাশের পড়া ও কাজ এরা আধাঘণ্টায়ই তৈরী করে ফেলে। বাকী সময়টায় এদের বুদ্ধি অলস হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এতে বুদ্ধির ধার মরে যায়। আবার এদের কৌতুহল বেশী এবং এদের বাড়তি শক্তি (surplus energy) ক্লাশের পড়ার বাইরে অন্য নানা বিষয়ে মুক্তি খোঁজে। বুদ্ধিমান্ শিক্ষক ও পিতামাতা এদের পাঠ্য বহির্ভূত নানা পড়ায় (গল্পের বই, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, দেশভ্রমণ, ইতিহাস ইত্যাদি) ও বিভিন্ন হবিতে (hobby, কাঠের কাজ, ছবি আঁকা, বাগান করা ইত্যাদি) এদের বাড়তি শক্তিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যেখানে এটা করা হয় না সেখানে হয়তো চালাক ছেলে নানা দুষ্টামীর মধ্যে মন দেয় (যেমন পণ্ডিত মশাইর টিকিটা কাটা, পাশের ছেলের পকেটে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ পুরে দেওয়া, ইত্যাদি)। ক্লাশের পড়ায় এরা যথেষ্ট রস পায় না—ফলে ক্লাশের পড়ায় এরা অমনোযোগী হতে পারে এবং পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প করে' বা দুষ্টুমীর ফন্দি এঁটে, শিক্ষক মশাইর কাজে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে এবং মাঝারী অধিকাংশ ছেলেদের বিরক্তি ও ক্ষতির কারণ হতে পারে। এদের দৃষ্টান্ত অন্য ছেলেদেরও নষ্ট করে।

সাধারণতঃ শিক্ষকেরা বুদ্ধিমান ছাত্রদের পছন্দ করেন। তারা আলোচনার বিষয় সহজে বোঝে, কঠিন বিষয়েও রস পায়, সুতরাং এদের শিক্ষার মধ্যে শিক্ষকের স্বাভাবিক আনন্দ ও গর্ব থাকে। কিন্তু অনেক সময় ভাল ছাত্রদের সম্পর্কে শিক্ষক মশাইয়ের পক্ষপাতিত্ব থাকে এবং এতে অন্যান্য ছাত্রেরা ক্ষুব্ধ হয়। ভাল ছেলেদের অন্যান্য ছেলেরা অনেক সময়ই ঈর্ষার চোখে দেখে। তাতে এদের সামাজিক জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভাল ছেলেদের নিজেদের মনেও যদি হামবড়া ভাব থাকে তবে তো কথাই নেই—তাহলে তারা অন্য ছাত্রদের উপহাসের ও হিংসার পাত্র হবে। এবং তাকে অপদস্থ করবার জন্যে অন্য ছাত্রেরা গোপনে হয়তো ষড়যন্ত্র করবে। কিন্তু কোন ছেলেই (এমন কি ভাল ছেলেও) বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের সঙ্গ ও ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে থাকতে চায় না। তাই কথনো কথনো সহপাঠীদের প্রীতি ও সঙ্গের আশায় তারা নিজেদের "ভালোছেলে" নাম ঘুচাবার জন্যে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ

করে এবং একই কারণে অন্যাদের দলে মিশে ক্লাসে গোলমাল করা, সিগারেট খাওয়া, অশ্লীল কথা বলা, বেয়াদপি করা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত আচরণে লিপ্ত হয়। এর ফল তার নিজের পক্ষে এবং ক্লাসের শাসনশৃংখলার পক্ষে হানিকর তা বলার প্রয়োজন নেই।

আবার শিক্ষক মশাই খুব বুদ্ধিমান্ ছেলেকে প্রীতির চোখে না দেখতে পারেন। শিক্ষক মশাইর প্রধান চিন্তা হ'ল যাতে বেশী সংখ্যায় তাঁর ছাত্রেরা পাস করে। তাঁর তাড়া থাকে নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় শেষ করার দিকে। স্বভাবতঃই তার শিক্ষণের মান সাধারণ ছাত্রদের বুদ্ধির উপযোগী। তিনি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বা অপারগ। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ছেলে যারা, তাদের মন এতে ভরে না; তাদের মনে অনেক প্রশ্ন ও সংশয় থেকে যায়। তাদের উৎসুক মন তথ্যের পিছনে তত্ত্বের খোঁজ করে, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞানের বাইরে রসের সন্ধান করে। তাই তারা হয়তো ক্লাসে শিক্ষক মশাইকে প্রশ্ন করে, তর্ক করে; এতে অনেক শিক্ষকের ধৈর্য্যচুতি ঘটে। তিনি মনে করেন ছাত্র তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ কচ্ছে। তাই এ সব ছাত্রদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাকে 'ডেঁপোমী' ও 'জ্যাঠামি' বলে মনে করে বিরক্ত হন। এতে এসব ছাত্রের মৌলিক চিন্তার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবানেরা এই সব প্রতিকূলতার জন্যেই সাধারণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হন। তাদের সমৃদ্ধ এবং সদা কৌতূহলী জাগ্রত মনের উপযুক্ত খোরাক সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা যোগাতে পারে না।

কোন কোন বিদ্যালয়ে বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের 'ডবল প্রমোশন' দিয়ে দুই ক্লাস উপরে উঠবার সুযোগ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, দুই ক্লাস উপরের কঠিনতর পড়া তাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপযুক্ত স্ফুরণে সহায়ক হবে। তা হয়তো কিছুটা ঠিক, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনা করে বর্তমানে অনেক শিক্ষাবিদ্ এই রীতি খুব সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন এতে ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় চাপ পড়তে পারে। বয়সের অনুপাতে স্বাভাবিক ভাবে বুদ্ধির পরিপক্কতা আসে, কিন্তু মনের উপযুক্ত পরিণতি আসবার আগেই ছাত্রকে অতিরিক্ত তাড়া লাগিয়ে বেশী শেখাবার চেষ্টা করলে, ফল ভাল হয় না। তা ছাড়া, যে ছেলে দুই ক্লাশ একেবারে ডিঙ্গিয়ে উঁচু ক্লাসে উঠল, সে তাঁর চেয়ে অনেকটা বেশী বয়সের ছেলেদের মধ্যে গিয়ে নিজেকে সম্ভবতঃ সহজে

মানিয়ে নিতে পারবে না। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিকে সে সমপাঠীদের তুলনায় কাঁচা এবং শারীরিক শক্তিতেও হীন হওয়াতে সে হয়তো তাদের সঙ্গে খেলাধুলা ও অন্যান্য বিষয়ে পেরে উঠবে না। এর ফলে হয়তো সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে এবং তার বুদ্ধির স্বাভাবিক দ্যুতি ম্লান হয়ে যাবে।

বাছাই করে সমবয়স্ক তীক্ষ্ণধী ছেলেদের নিয়ে আলাদা আলাদা ক্লাস করতে পারলে ভাল হয়। এদের মধ্যে তা'হলে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব থাকবে। এদের জন্যে সমৃদ্ধতর ও কঠিনতর পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা থাকবে এবং পাঠ্য ও অনুসন্ধান বিষয়ে এদের কিছুটা স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে, যাতে এ সব ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ বিভিন্নমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে পারে। এদের উৎসাহ ও পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ শিক্ষক-এরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতিভার মধ্যে একাকীত্ব আছে। প্রতিভাবান্দের বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণতর এবং সে জন্যেই এদের উপযুক্ত বিকাশের জন্যে স্বাধীনতার প্রয়োজনও বেশী। কিন্তু এদের সম্পূর্ণ পৃথক করে শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গত নয়। সাধারণ বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে একত্র মিশবার এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এবং ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। না হ'লে এক নতুন জাতিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। প্রতিভা সুলভ নয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিভাই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই প্রতিভা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার এবং উপযুক্ত উৎসাহ দানের দ্বারা প্রতিভার সম্যক বিকাশ এবং সমাজকল্যাণে এদের উপযুক্ত প্রয়োগ যাতে হয়, সে দিকে দৃষ্টিদান করা রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব, তেমনি সমাজের মঙ্গলকামী প্রত্যেক পিতামাতা, শিক্ষক ও সমাজকর্মীরও কর্তব্য। এদের মধ্যে থেকেই দেশের অগ্রগতির সর্বক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান নেতার আবির্ভাব ঘটবে।

যারা প্রতিভাসম্পন্ন তারা যে শুধু বুদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ এমন নয়, সাধারণতঃ এরা দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণেও শ্রেষ্ঠতর। এদের মন অনেক বেশী বিশ্লেষণ-ধর্মী ও সমালোচনশীল, এবং অনেক বেশী বিষয়ে এদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। এরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা, সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এরা জীবনের পরিপূর্ণ ও সুষম আত্মউন্মোচনের পথ খোঁজে। এদের সুশিক্ষার ব্যবস্থাও তাই সহজ নয়।

টারম্যান্ এক হাজার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করে তাদের যৌবনকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী (১৯২১-৪৬) অনুসন্ধান করে, কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান—(১) এসব তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সাধারণের তুলনায় উৎকৃষ্টতর। তাদের বুদ্ধির বিকাশের হারও দ্রুততর। (২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তারা অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পিছনে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশই উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দেয় এবং সেখানেও এদের মানসিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। (৩) সামাজিক গুণের বিকাশের দিক দিয়েও এরা শ্রেষ্ঠতর। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এদের আগ্রহ আছে, এবং অনেক জায়গায়ই এরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। এ সব ছেলেরা সাধারণতঃ বেশী বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মিলে আনন্দ পায়। চরিত্রের দিক দিয়েও এদের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষনীয়। ধৈর্য, শ্রমশীলতা, সততা, বিশ্বস্ততা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি নৈতিক গুণ এদের মধ্যে দেখা যায়। (৫) সাধারণতঃ এদের পারিবারিক পটভূমিকা অনুকূল। যদিও এসব ছেলে-মেয়ের পিতামাতা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান নাও হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণের চেয়ে বুদ্ধিতে ন্যূন নন। তা ছাড়া এদের দুজনেরই, অন্ততঃ তাদের একজনের বুদ্ধি, সংকল্প, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, স্থৈর্য, ঈশ্বরানুরাগ ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণ সাধারণের চেয়ে বেশীই থাকে। বহু মনীষী ব্যক্তিই তাঁদের নিজেদের মহত্ত্বের জন্য মাতা বা পিতার কাছে ঋণ স্বীকার করেন। (৬) উত্তরকালে জীবনে এরা সকলেই যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন তা নয়, তথাপি মোটের উপর জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে এরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (৭) মোটের উপর এদের মানসিক স্থিরতা সাধারণের চেয়ে বেশী কিন্তু এদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক বিকৃতির হার অন্যান্য সাধারণ মানুষদেরই প্রায় সমান।[২]

হলিংওয়ার্থ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা তারও বেশী, এমন ৩.টি মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, এরা শিশুকালে অনেক আগে কথা বলতে শেখে। বাক্য ও শব্দের উপর এদের দখল সাধারণ ছেলেদের তুলনায় বেশী। এরা সাধারণ ছেলেদের তুলনায় অনেক আগে এবং অনেক বেশী

২ Terman—Genetic studies of Genius ; Mental and physical traits of a thousand gifted children.

পরিমাণে বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) ও শুদ্ধ প্রতীক ব্যবহারে (abstract symbols) পারদর্শী হয়। জ্ঞান বিস্তার ক্ষেত্রে এদের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়। কিন্তু তিনি এদের সামাজিক গুণ সম্বন্ধে টারম্যানের বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন এঁরা জন সাধারণের বুদ্ধি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীল, কঠিন সমালোচক এবং ভাল মিশুক নয়। ফলে এরা তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের ভাল করে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। পারিবারিক জীবনও এদের খুব শান্তিময় নয়। হলিংওয়ার্থ এর মতে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫র মধ্যে, তাদেরই সুস্থ, সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে।[৩] কিন্তু যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক এর চেয়েও বেশী, যারা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, তাদের সংসারে ও সমাজে সুখী হওয়া খুব কঠিন। তথাপি এ সমস্ত ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-শক্তি ও উচ্চতর শক্তির জন্যেই জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং সমাজের মতামতকে অনেকটা উপেক্ষা করে নিজের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। এদের প্রতিভার উপযুক্ত ব্যবহার করতে জানেনা বলে সমাজই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪] যারা তীক্ষ্ণধী তাদের জীবনে বুদ্ধিই প্রধান। এর ভাল ও মন্দ দুইই আছে। যারা বুদ্ধিমান্ তারা সহজে হুজুগে মাতে না। তাদের তীক্ষ্ণ বিচারে ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে জীবনে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। জীবনে সুখী হতে গেলে, মানুষকে সুখী করতে হ'লে, হৃদয়াবেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে চলে না। যারা বুদ্ধি-সর্বস্ব মানুষ তারা সাধারণতঃ হৃদয়াবেগের দিক থেকে বঞ্চিত, এবং কাজের মানুষও এরা নন। বুদ্ধির সূক্ষ্ম চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ এরা করতে পারেন, কিন্তু কোন সাংসারিক সমস্যার সামনে এরা প্রায় শিশুর মত অসহায়। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধি

---

৩ Hollingworth—Children above 180. I. Q.

৪ Above this level (I. Q 150), adult success is largely determined by social adjustment, emotional stability, and the drive to accomplish. This does not mean,......that the potentiality for development is the same for individuals with an I.Q of 150 as for persons with higher I. Q'. S. Rather.........the more probable interpretation is that we have not learned how to bring the highest gifts to fruition and how best to guide the pesonality development of those who are extremely bright

Jersild. Child Psychology. p. 558.

অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে অনেক সময়ই আছে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ। তাদের মধ্যে একটি অতিমাত্রায় প্রবল হলে অন্য দুটির বেলায় কিছু টান পড়ে।

তাই প্রতিভাবানেরা সংসারের মাপ কাঠিতে 'নির্মম' ও অকেজো। তাঁরা নিজের চিন্তার জগতে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। সেই বুদ্ধির জগতে তাঁরা নিঃসঙ্গ, একাকী আত্মকেন্দ্রিক। কবি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ অশ্রুর লবণাম্বুবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপ। মনীষীদের সম্বন্ধে একথা আরো অনেক বেশী সত্য। তাই নির্বান্ধব এ মানুষগুলিকে অন্যে সহজেই ভুল বোঝে, নিন্দা করে।

কিন্তু এমন নির্মম, একাকী না হতে পারলে বুঝি প্রতিভা তার অনন্য-সাধারণ দান পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারে না। প্রতিভা-সম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা অনন্যমনা হয়ে নিজের ধ্যানে মগ্ন থাকতে যদি না পারতেন, তবে মহৎ সৃষ্টির গৌরবও তাঁরা অর্জন করতে পারতেন না। সাংসারিক সুখ ও আরামের মূল্যেই প্রতিভার অমূল্য সম্পদ ক্রয় করতে হয়। নিশ্চয়ই সৃষ্টির আনন্দেই তাঁদের জীবনের সার্থকতা, তাতেই তাদের অন্তরের তৃপ্তি। তাদের অন্তরে এই তৃপ্তি যদি না থাকতো, তবে তো তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ শক্তির সার্থক প্রয়োগ করতে পারতেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ সব মানুষকে প্রেরণা জোগান স্নেহ, করুণা ও মমতাময়ী কোন নারী।

কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও সুঠাম মহৎ ব্যক্তিত্ব অভিন্ন নয়। অত্যন্ত ঘৃণ্য দস্যু, নৃশংস নরঘাতক, কুৎসিত নারী ব্যবসায়ীরও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে যারা মানুষকে বঞ্চনা করে, খাদ্যে ঔষধে ভেজাল দিয়ে, কালোবাজারী ও চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করে, তারা অধিকাংশই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু তারা তো শ্রদ্ধেয় কেউই নন। কাজেই সর্বশাস্ত্রেই এ কথা বলে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নয়। সাফল্যই মনুষ্যত্বের মাপ-কাঠি নয়। জীবনের সকল পরিপূর্ণতার মূল হ'ল সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উদ্যমের সুষম সমন্বয়। যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, বুদ্ধি অনাচ্ছন্ন, যাঁর অনুভূতি নিবিড় ও বহুব্যাপী, যাঁর কর্ম অনাত্মকেন্দ্রিক, কল্যাণাভিমুখী, যিনি তার শাণিত বুদ্ধি, জীবন্ত অনুভূতি ও বিপুল কর্মোদ্যমকে বহুজনহিতায় বহুজন সুখায় মানব সেবার ও ভগবৎসেবার অধ্যাত্ম আদর্শে ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক প্রতিভাধর, তিনিই বাস্তবিক পরিপূর্ণ মানুষ—তাঁর জীবনই ধন্য।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান :—

গ্রীস্ দেশে আদর্শ মানুষ বলতে এমন মানুষই তাঁরা বুঝতেন যাঁর সুস্থ মন সুস্থ দেহে বাস করে—Mens sana in corpore sano—a healthy mind in a healthy body. বাস্তবিক পক্ষে, এমন আদর্শ মানুষ সৃষ্টিই সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য। **সাধারণতঃ সুস্থ মন সুস্থ দেহের অনুসঙ্গী। কিন্তু এ দুটি অভিন্ন নয়** চমৎকার দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী সবল মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন নাও হতে পারেন। এমন বলশালী দৈহিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ নৃশংস, স্বার্থপর, দরিদ্র-পীড়ক দস্যু হতে পারে। আবার মানসিক দিক থেকে যিনি শান্ত ও সুস্থিত, তিনি দৈহিক দিক থেকে খুব সুস্থ নাও হতে পারেন। আদর্শ মানুষ বলে যাঁকে আমরা কল্পনা করি, তাঁর মধ্যে ঘটে দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক সুস্থতার আশ্চর্য সমন্বয়। সমস্ত 'আদর্শ' বস্তুর মত আদর্শ মানুষও ক্বচিৎ কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়—তবুও এই আদর্শেই শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাসী।

সুস্থতা ও সুসঙ্গতি :—

সুস্থতা তা সে দৈহিকই হোক্ বা মানসিকই হোক্ তার লক্ষণ হচ্ছে সুসঙ্গতি, (proper adjustment)। **যে মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ সহজে সম্পন্ন করে এবং তদুপরি এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিরোধহীন সহযোগিতা দ্বারা সমগ্র দেহের মঙ্গল বিধান করে** এবং সতেজ প্রাণক্রিয়ার সহায়ক হয়—**সে মানুষ দৈহিক দিক থেকে সুস্থ ও নীরোগ**। এখানে মূল কথা হচ্ছে সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার সুসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য (co-ordination and adjustment)। ঠিক তেমনি, **সে মানুষকেই বলি মানসিক সুস্থিত, যার চিন্তা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও উদ্যম ইত্যাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াই সহজ ও সতেজ এবং যিনি অন্তরে বা বাহিরে বিরোধ সংঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হন না।** অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও উদ্যম ইত্যাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াই সহজ ও সতেজ এবং যিনি অন্তরে বা বাহিরে বিরোধ সংঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হন না। যার অন্তরের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ; মূল কয়েকটি কল্যাণ উদ্দেশ্য

যাঁর সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করে, এবং যার ব্যক্তিগত জীবন সমাজজীবনের সঙ্গে সজীব ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত তিনিই সুস্থিত। এমন ব্যক্তির মানসিক শক্তির কোন অপচয় ঘটে না—তিনি সুখী, শান্ত এবং কর্মকুশলী। এখানেও মূল কথা হচ্ছে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য **ব্যক্তির নিজ অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন বেগ, ইচ্ছা, অনুভূতি ও উদ্যমের সামঞ্জস্য এবং বাহিরের পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য।**

মানসিক-স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য :—

দেহের স্বাস্থ্য বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা আছে, তেমনি মনের স্বাস্থ্য বিষয়েও বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আছে। এপ্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার শাস্ত্রকেই বলা হয় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা মেণ্টাল্ হাইজীন্ (Mental Hygiene)। এ বিজ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর গুরুত্ব লাভ কচ্ছে, তার কারণ আমরা আজ বুঝতে শিখেছি যে **ব্যক্তির নিজস্ব সুখ এবং সমাজের কল্যাণের জন্যে দেহের স্বাস্থ্য যতখানি প্রয়োজনীয়—মনের স্বাস্থ্য হয়তো বা তার চেয়ে আরো বেশী প্রয়োজনীয়।** দেহের রোগ দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের যে ক্ষতি হয়, যে অশান্তি ঘটে, মনের রোগের দ্বারা অশান্তি ও ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশী হয়।

মানসিক-স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের চারটি প্রধান উদ্দেশ্য—

(১) সুস্থ সতেজ মনের স্বাভাবিক বিকাশের কারণ বিশ্লেষণ :— সুস্থ মানসিক বিকাশের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান দ্বারা আহৃত জ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তির ও সমাজের মানসিক বিকার নিরোধ। এবং এ বিষয়ে উপদেশ দান।

(২) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত নির্দেশ দান।

(৩) মানসিক রোগ নিরাময় কল্পে উৎকৃষ্টতর ঔষধ বা প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় তাদের প্রয়োগ।

(৪) এ বিষয়ে পূর্ণতর এবং সফলতার জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা।

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কাজ হবে, মনের সুস্থতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ, সুস্থতার অনুকূল অবস্থাগুলি কি সে সম্বন্ধে বিচার করা এবং মানবিক রুগ্নতা বা

বিকৃতি ঘটলে, কি করে তার উপশম বা নিরাময় হতে পারে, তার উপায় নির্দেশ করা। এ কথাটাও মানুষ আজ বুঝেছে যে **চিকিৎসা দ্বারা রোগ উপশমের চেয়ে রোগ নিবারণ অনেক বেশী লাভজনক এবং আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এই দিকটির উপরই বেশী জোর দিচ্ছে**।[১] অর্থাৎ কি করে মানসিক শান্তি রক্ষিত হতে পারে, কি কি অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী ও সংযমন ক্রিয়া দ্বারা অনাবশ্যক অবাঞ্ছনীয় সংঘাত দূর করা যেতে পারে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মনের সমতাবিধান করা যায়, কি ভাবে আত্মবিরোধ ও সমাজের সঙ্গে অসামঞ্জস্য দূর করে মানসিক শান্তি ও সুখ অর্জন করতে হয়—এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান থাকে আমরা লাভ করতে পারি। রোজানফ্ বলেছেন—**মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা বলতে মনের সজীবতা শান্তি ও সক্রিয়তা (efficiency) রক্ষার বিদ্যা ও প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয় তাই বোঝায়**। এর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য—(১) সুপ্রজনন এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত ব্যক্তি যাতে উপযুক্ত বুদ্ধি, অনুভূতি ও অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে তা শিক্ষা দেওয়া, (২) মানুষের স্বভাব ও জন্মগত বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির যথোচিত ব্যবহার দ্বারা যাতে, দেহে, শিক্ষায়, বিবাহিত জীবনে, সমাজজীবনে মানুষ সুসঙ্গত সম্বন্ধস্থাপনে সমর্থ হয়, সে পথ নির্দেশ করা এবং (৩) মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধি নিবারণ।[২]

দৈহিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধির উৎকর্ষ, নৈতিক আদর্শ, সুনাগরিকত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য :—

মানুষ সচেতন বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব তাই সে নিজের সামনে সুস্থতা ও উৎকর্ষের কিছু আদর্শ রেখে সেগুলিকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়। এই আদর্শের মধ্যে কয়েকটি এবং তাদের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভেদ ও যোগ সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি দেহের সুস্থতা ও মনের শান্তি অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত হলেও এ দুই অভিন্ন নয়।

আর একটি আদর্শ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। আধুনিক মনোবিদের বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা অনুযায়ী যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা তার কাছাকাছি তারা স্বাভাবিক। এর

১। Crow and Crow. Mental Hygience (2nd. ed), p. 2

২। Rasanoff- Manual of Psychiatry. p. 3

চেয়ে যারা অনেকটা নীচে (যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০র নীচে) তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে এবং মানসিক শক্তিতে হীন। বার্ট, টারম্যান্ ইত্যাদি মনোবিদের মতে বুদ্ধিহীনতা অপরাধ প্রবণতার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু বুদ্ধি ও মানসিক সুস্থতা এক নয়। অনেক ভয়ঙ্কর অপরাধী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন (বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০-র উপরে) আবার অনেক বুদ্ধিতে হীন মানুষ, শান্ত সদানন্দ সদাচারী ও সুস্থিত।

নৈতিক আদর্শকে মানুষ উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে। নীতি হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং নৈতিক আদর্শ হচ্ছে যা সমাজ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত—সমাজ দ্বারা প্রশংসিত। অবশ্য শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ কি এবং তার মাপকাঠিই বা কি, তা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে, তবে এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে যারা নৈতিক আচরণে অভ্যস্ত, তারা মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, তারা শান্ত ও সুস্থিত। কিন্তু তা হলেও নৈতিক বিচারের আদর্শ ও মানসিক সুস্থতার আদর্শ ঠিক এক নয়—তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মাপকাঠিও এক নয়। নৈতিক বিচারে ব্যক্তির কর্ম ও তার বাহ্য ফলাফলকে অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অপরাধবোধ ও অনুশোচনা নীতিশাস্ত্রে প্রশংসনীয় বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ব্যক্তির মানসিক অনুদ্বিগ্নতা, স্থৈর্য ও প্রশান্তিই প্রধান মাপকাঠি এবং অতিরিক্ত অপরাধ বোধ ও অনুশোচনা মানসিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। তীক্ষ্ণ নীতিবান্ মানুষ হয়তো বহু স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিকে জোর করে অবদমন করে মানুষের কাছে প্রশংসা পেতে পারেন কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানের দিক থেকে এমন মানুষ গুরুতর পীড়িত বলে বিবেচিত হতে পারেন।

আর একটি আদর্শকে বর্তমানের অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ অতিশয় উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন, এবং এই আদর্শ হচ্ছে সুনাগরিকত্বের আদর্শ। এ আদর্শের মূল দাবী হচ্ছে ব্যক্তির ক্রিয়া ও বিশ্বাস সমাজ ও রাষ্ট্রের গৃহীত আদর্শ অনুযায়ী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি ও কল্যাণের পোষক হ'তে হবে। এ আদর্শ বহু ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ ও মানসিক সুস্থতার আদর্শের সহগামী হ'লেও এ আদর্শগুলির মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হতে পারে। হিট্‌লারের বিশ্বস্ত অনুগামী গোয়েবেলস্ অবশ্যই আদর্শ নাগরিক ছিলেন, কিন্তু নৈতিক বিচারে তিনি জঘন্য অপরাধী এবং তাঁকে মানসিক সুস্থ মানুষ বলেও বিবেচনা করা যায় না।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে সহজে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মানসিক সুস্থতার একটা দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সুস্থতার আর একটা দিক হচ্ছে, ব্যক্তির

নিজের মধ্যেও বিরোধ সংঘাতের ক্ষয়কারক দৌর্বল্য থাকবে না। এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতা কথনো কথনো ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ বিরোধী হতে পারে এবং সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাতে সে অসুখী, উদ্বিগ্ন এবং মানসিক দিক থেকে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে। ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে নিজেকে কতটা মিলিয়ে নিতে পারছে তার মাপ সমাজই করে থাকে এবং তীক্ষ্ণ ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কথনো কথনো সমাজের নির্বুদ্ধিতা হৃদয়হীনতা এবং ভণ্ডামীকে গ্রহণ করে নিতে না পেরে নিন্দিত ও নিগৃহীত হন। এঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে কু-নাগরিক হলেও এঁরা মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সতেজ।

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সূচনা

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানসিক রোগ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল এবং কিছুটা ভয় আছে। পূর্বে মনে করা হ'ত ভূত প্রেত ইত্যাদি অশুভ অপ্রাকৃত শক্তি এ সমস্ত রোগের জন্য দায়ী। কিন্তু আধুনিক মানুষ অপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা নিয়মিত ভাবে চলতে থাকে এবং ফ্রএডের পর থেকে মনোবিদ ও মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে মানসিক রোগীরা পৃথক একটা জাত নয়। অবাঞ্ছিত অশান্তিময় পরিবেশ এবং প্রতিকূল মানসিক কারণে সুস্থ মানুষেও মানসিক বিকারের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ফ্রএড্ বহু অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত করলেন যে বাল্য ও কৈশোরের বহু স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সামাজিক নিন্দার চাপে অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব ও জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রেই এই অবচেতন মানসিক সংঘাত উত্তর জীবনে মানসিক রোগের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রএড্-এর পর থেকে মানসিক রোগের চিকিৎসায় স্বপ্ন বিশ্লেষণ, মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী দ্বারা মনোবিকলন (psycho-analysis through free association of ideas) ইত্যাদি মানসিক প্রণালী সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে। আমেরিকা এই ব্যাপারে অগ্রণী এবং সেখানে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য কিছু পৃথক চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়। কিন্তু এ সব হাসপাতালে অনেক সময় রোগীদের প্রতি সদয় মানবোচিত ব্যবহার করা হ'ত না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স নামে ইয়েল

বিশ্ববিত্মালয়ের চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক বাড়ীর পাঁচতলার জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে, আত্মহত্যার নিস্ফল চেষ্টা করে। বিচারকালে তাঁর মানসিক রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখে বিচারক তাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠান। এই চিকিৎসালয়ে তিনি তিন বৎসর ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর রোগের লক্ষণ, কি প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের জন্য তাঁর মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয়েছিল, হাসপাতালে রোগীদের প্রতি যে নির্মম হৃদয়হীন ব্যবহার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিভাবে নিজ চেষ্টায় তিনি নিরাময় হলেন এবং নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানসিক রোগের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে নিজ মতামত ব্যক্ত করে তিনি একখানা পুস্তক রচনা করেন—A Mind that foand itself. বইখানা শীঘ্রই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পরেই আমেরিকায় বীয়ার্স ও প্রসিদ্ধ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (psychiatrist) এ্যাডলফ মেয়ারের নেতৃত্বে মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী সহৃদয় চিকিৎসা বিষয়ে নূতন ও ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য এক শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়। মেয়ার প্রস্তাব করেন যে মানসিক সুস্থতা বিষয়ে সুশৃংখল অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য একটি নূতন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ করেন মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা মেণ্টাল্ হাইজীন্। এই 'মেন্টাল্ হাইজীন্' আন্দোলন আমেরিকা ছাড়িয়ে ইয়োরোপেও বিস্তৃত হয় এবং এই বিজ্ঞান চর্চার জন্যে নানা স্থানে আয়োজন চলতে থাকে। আমেরিকা ও ইয়োরোপের কোন কোন দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞানসম্মত হাসপাতাল এবং এই বিত্মা আলোচনার জন্যে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। আমাদের দেশেও এ আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছেচে এবং এ নতুন বিত্মাচর্চার কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। আমেরিকা ও অন্যান্য অগ্রসর দেশে শীঘ্রই এ বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে দেহের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যেমন অবশ্য-পাঠ্য বিষয়, মানসিক স্বাস্থ্য-বিত্মাও তেমনি অবশ্য-পাঠ্য বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল, অব্যবস্থিত শিশুদের চিকিৎসা ও বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য অনেক জায়গায়ই 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক্' স্থাপন।

Normal, sub-normal, super-normal, abnormal

যারা সাধারণ—যারা মাথাগুণতিতে সংখ্যায় বেশী, তাদেরই অনেক সময় স্বভাবী বা normal বলা হয়। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিমাপ দিয়ে যদি কোন একটা গুণের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ জনসংখ্যার অধিকাংশের (শতকরা পঞ্চাশের চেয়ে বেশী) মধ্যে দেখা যায়, তবে সেই গুণের সেই পরিমাণটিকে, সেই জনসংখ্যার একটা normal গুণ বলা হবে। যেমন দশ বছরের অধিকাংশ ছেলের দেহের একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বা ওজন আছে। তা হলে দশ বছরের কোন একটি ছেলের মোটামুটি সেই দৈর্ঘ্য বা ওজন থাকলে, সেই গুণ সম্পর্কে সে ছেলেটি normal, একথা বলা চলবে। তেমনি বিনে-টারম্যান্ বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ.) ১০০-র কাছাকাছি (৯০-১১০), তাদের আমরা বলি normal। যাদের IQ ৯০ এর নীচে, তারা অনুস্বভাবী-subnormal। অর্থাৎ যে ছেলেদের বুদ্ধির মাপের অঙ্ক হচ্ছে ৭০ বা ৬৫, বুঝতে হবে তারা বুদ্ধির মাপে সাধারণের চেয়ে অনেকটা হীন। আবার যে সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাপের অঙ্ক হবে ১৪০ বা তারও বেশী, তারা অ-সাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ধরতে হবে। এদের আমরা বলতে পারি অতি-স্বভাবী (super-normal)। তাহ'লে normal কথাটা এখানে একটা আংকিক হিসাবে মোটামুটি মধ্যবিন্দু অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অর্থে Average বা Mean কথাটাও ব্যবহৃত হয়।[১]

অনুস্বভাবী ও অতিস্বভাবী বলতে তাহলে যারা অধিকাংশের চেয়ে কোন গুণে কম বা বেশী, তাদের বোঝায়। এরা অঙ্কের হিসাবে সংখ্যালঘু।

---

১ The word 'norm' means a rule, standard, or average. In reference to measurable things, like the height or weight of, say, 10 year-old children, or even of their performance on some test of intelligence, the standard of normality is not difficult to determine. We have only to measure a large and, representative sample of children of a given age, in height or in any ability and we can calculate the average and regard the mass of children round that as normal. Here normality is a statistical concept : it is a question of frequency and average. Valentine : The normal child and some of his abnormalities, pp 13-14

কিন্তু অ-স্বভাবী বা অপস্বভাবী (abnormal) কথাটি অঙ্কের হিসাব বোঝায় না। এতে বোঝায় এমন কোন গুণ (না দোষ ?) যেটা সামাজিক বিচারে, কোন না কোন হিসাবে অবাঞ্ছনীয় বা নিন্দনীয়। কোন ব্যক্তির আচরণ অথবা সমগ্র ব্যক্তিত্বটি স্বাভাবিক কিনা, তা কোন নির্দিষ্ট মাপ দিয়ে ওজন করা যায় না। তবে যখন কোন আচরণ অথবা ব্যক্তিত্বের কোন গুণ (দোষ ?) এমন যে তা প্রচলিত সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু বা অদ্ভুত, তখন তাকে আমরা বলি অস্বাভাবিক (abnormal)। সাধারণতঃ, এপ্রকারের কোন অস্বাভাবিক আচরণ বা গুণ অধিকাংশের চেয়ে ব্যতিক্রম সত্য, কিন্তু হাজারো রকমের অস্বাভাবিক আচরণের হাজারো রকমফের আছে এবং অধিকাংশ মানুষেরই কোন না কোন মানসিক 'বাতিক', 'ছিট্' বা ঢিলা স্ক্রু' আছে। কাজেই একথা বলা যায় যে অধিকাংশ মানুষই কমবেশী অস্বাভাবিক। তা ছাড়া, এটাও মনে রাখতে হবে, যে কোন ব্যবহার এক বয়সে অস্বাভাবিক হলেও অন্য বয়সে তা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আমাদের বক্তব্যটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলা যাক। যৌন আকর্ষণ যৌবনাগমে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ধর্ম। যদি দশ বারো বৎসর ছেলের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের যৌন-আচরণ দেখা যায়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় —তা অস্বাভাবিক বা অপস্বভাবী। প্রাপ্তবয়স্কদের কারো মধ্যে এ আচরণ অতিরিক্ত পরিমাণে বা অতি কম মাত্রায় থাকলেও আমরা সে ব্যক্তিকে অতিরিক্ত যৌন-প্রবৃত্তি সম্পন্ন বা highly sexed, বা যৌনশক্তিতে হীন বা undersexed বলি। কিন্তু এ ব্যক্তিরা 'অস্বাভাবিক' নয়। এরা super-normal বা subnormal। কিন্তু যৌন আকর্ষণের স্বাভাবিক আধার হচ্ছে বিপরীত-লিঙ্গের কোন ব্যক্তি; আর যৌন আকর্ষণের স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রীকে আদর সোহাগ ইত্যাদি কোমল আচরণে আপ্যায়ন করা। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সমলিঙ্গ অন্য ব্যক্তির প্রতি যৌন আচরণে প্রবৃত্ত, অথবা দেখা যায় প্রেম-পাত্রীকে সে বল দ্বারা ধর্ষণ কচ্ছে, নৃশংস পীড়ন কচ্ছে, তবে তার ব্যবহার সমাজে নিন্দিত। এমন ব্যবহারকে বলা হবে অ-স্বভাবী, অপস্বভাবী বা abnormal. অপস্বভাব বলতে কোন গুণের, অতিরিক্ততা বা অতি-হ্রাস বোঝায় না,—এতে বোঝায় কোন গুণের বিকৃতি।[২]

২ Valentine : The Normal child some of his abnormalities pp 14-15

আগেই বলেছি মানসিক বিকৃতি (neurosis) বা অস্বাভাবিকতার একটা বৈজ্ঞানিক সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব এবং সব মানুষেরই হয়তো বা কোন না কোন ছিট্ আছে। কাজেই আন্তরিক অর্থে অস্বাভাবিক বা abnormal-রাই নিশ্চয়ই সংখ্যাগুরু—কাজেই আংকিক হিসাবে abnormality টাই normal !*

* Page—A bnormal Psychology-p 2

চতুঃত্রিংশ অধ্যায়

মানসিক সুস্থতা

মানসিক সুস্থতার লক্ষণ কি? দেহের স্বাস্থ্যের বেলায় আমরা বলি, যে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ও সুগঠিত, যার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সুসঙ্গত সম্বন্ধ আছে, যার দৈহিক ক্রিয়াগুলি নিয়মিত, স্বাভাবিক এবং সতেজ আনন্দপূর্ণ, সে হ'ল প্রকৃত সুস্থ। যদিও দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ একার্থ-বাচক নয়—তথাপি এ কথা নিশ্চিতই বলা চলে যে, দেহকে মন থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক করে বোঝা যায় না এবং যার মনের সমতা ও সুসঙ্গতির অভাব আছে সে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুসমঞ্জস হলেও, সে দৈহিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়! মন যেখানে অসুস্থ, দেহ সেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে না। মনের স্বাস্থ্য একটা **অস্তিবাচক অবস্থা**—কিন্তু এ অবস্থা **আপেক্ষিক**। যে সাধারণ মানুষ তার শক্তি ও সম্ভাবনার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জীবনের মৌলিক দাবী স্বচ্ছন্দে মেটাতে পারে এবং যার ব্যক্তিগত জীবন সমাজ-জীবনের সঙ্গে সুসঙ্গত, সেই মানুষকেই, আমরা বলি মানসিক দিক থেকে সুস্থ। সে আপেক্ষিকভাবে নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ-বিমুক্ত এবং প্রফুল্লচিত্ত। 'আপেক্ষিক-ভাবে' বলার তাৎপর্য হচ্ছে, সুস্থ ব্যক্তির নিজের মধ্যে অথবা পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই কোন বিরোধ থাকবে না, এটা অসম্ভব এবং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও প্রফুল্লতার অবস্থানুযায়ী এর ব্যতিক্রম ঘটে। **এই সংজ্ঞার মধ্যে জোরটা বিরোধশূন্যতারূপ নেতিবাচক অবস্থার উপর নয়—অস্তিবাচক সুসমতা ও প্রফুল্লতার উপরে।** এই কথাটা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এ দুয়ের বেলায়ই সত্য।

মনের স্বাস্থ্যের একটা দিক হচ্ছে, ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের মিল এবং আর একটা দিক হচ্ছে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিল। ব্যক্তির নিজের দিক থেকে, যে মানুষ মনের স্বাস্থ্যের অধিকারী, সে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা দ্বারা ভীত ও অভিভূত নয়, সে আত্মপ্রত্যয়শীল এবং স্বচ্ছন্দ ও শান্ত। বিভিন্ন বিরোধী অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা তার শক্তি ও কুশলতাকে ক্ষয় করে না এবং হীনতাবোধ বা পাপবোধ দ্বারা সে অযথা ভারাক্রান্ত নয়। অন্যদিকে নিজ

পরিবার, কর্মস্থল ও সামাজিক অন্য ক্ষেত্রে সে সহজে প্রীতিগ্রহণ ও প্রীতিদান করতে পারে। সমাজ জীবনে সফলভাবে বাঁচতে গেলে, বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিকে বিবিধ সম্বন্ধে যুক্ত হতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা, ভাব, অনুভূতি ও উদ্যোগের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজে নিজের স্থানটি স্বচ্ছন্দে খুঁজে নিতে পারে। সমাজ জীবন নিত্যই প্রবহমান—তার শক্তিগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল। যে মানুষ মানসিক সুস্থ, সে এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে, নিজের এবং অপরের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিবিধানে সমর্থ। অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব পালন, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিবোধ এবং নিজ সাধ্য অনুযায়ী কুশলভাবে উদ্দেশ্য সাধন, এ সবই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি মনের দিক থেকে সুস্থ সে অপরের ত্রুটি ও বিচ্যুতিকে অনেকটা ধৈর্য ও ক্ষমার সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ।

মানসিক সুস্থ যে ব্যক্তি, তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) এমন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি ও বিষয় সম্পর্কে সচেতন ; নিজ সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও সে অন্ধ নয়। সে নিজ চরিত্র ও ব্যবহারের বস্তুগত, নিরপেক্ষ বিচারে সক্ষম, এবং নিজ ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে' সে কাজে প্রবৃত্ত হয়।

(২) কিন্তু নিজ মূল্য ও স্থান সম্পর্কেও সে সচেতন। অযথা হীনমন্যতার ভারে সে পীড়িত নয়। সে আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন এবং পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে সে নিশ্চিন্ত।

(৩) যার এই প্রত্যয় আছে যে পরিবার বা বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীতে সে অনেকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, সে নিজেকে অবাঞ্ছিত বোধ করে না।

(৪) তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস আছে। সে যেমন অতিরিক্ত উচ্চাশা তাড়িত হয়ে অসম্ভব সাধনের জন্যে অস্থির হয় না, তেমনি দৈনিক সমস্যাগুলির সামনে সে নিজেকে অসহায়ও বোধ করে না। নিজের উপরে এ আস্থা তার আছে যে, নিজ জীবনের সমস্যাগুলি নিজ চেষ্টা দ্বারাই সে সমাধান করতে পারবে।

(৫) অন্য মানুষের অভিসন্ধি বিষয়ে সে অযথা সন্দেহ পোষণ করে না।

সে সুস্থ ও বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীকে দেখে এবং সে পৃথিবী ও জীবনের কাছে অতিরিক্ত আশা পোষণ করে না। সে জানে তার পরিবেশ ও প্রতিবেশীর মধ্যে অনেক অপূর্ণতা আছে। তা অনেকটা ক্ষমার সঙ্গে তা গ্রহণ করতে পারে; সে সর্বদাই অন্যের ত্রুটিতে ক্ষুব্ধ ও তিক্ত হয়ে থাকে না। অপরকে সে স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে এবং অপরের সঙ্গে প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে সে সক্ষম। দলের মধ্যে সে দিশাহারা হয় না, বরঞ্চ অন্যের সঙ্গ তার কাছে প্রীতিপ্রদ।

(৬) বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা সে নিজের বাহ্য পরিবেশকে বিচার করতে পারে এবং তার পরিবেশের প্রকৃতি তার কাছে জ্ঞাত বলেই সে তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হয় এবং নিজ ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি শান্তভাবে স্থির করতে পারে।

(৭) মানসিক যে মানুষ সুস্থ, তার একটি গঠনাত্মক ও অস্তিবাচক জীবন দর্শন আছে। সে এই জগৎকে অস্বীকার করে না। এ জগৎ ও জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করে', কাপুরুষের মত সে পালিয়ে বাঁচতে চায় না। চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে সে উপভোগ করে।

(৮) এমন ব্যক্তি কল্পনা দিয়ে বাস্তব জগতের সমস্যাকে রাঙিয়ে দেখতে চায় না। সে বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়ে, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে, বাস্তব গঠনাত্মক উদ্যম দিয়ে, সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়। কাল্পনিক বৃথা ভয়ের দ্বারা সে নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না এবং নিজ শক্তিকে অবসন্ন করে না। ক্ষমাহীন তিক্ততা দ্বারাও নিজেকে পীড়িত করে না।

(৯) মানসিক যে সুস্থ সে জানে যে, এ জগতে দুঃখ, বিফলতা, নিরাশা, অপূর্ণতা, কপটতা, মিথ্যাচার আছেই। এসবকে মেনে নিয়েও সে আশাবাদী। সে মানুষের শক্তি ও তার নৈতিক সততায় বিশ্বাসী।

(১০) তার অনুভূতি ও প্রক্ষোভের উপর শাসন ও সংযম আছে। রাগ, ভয়, ভালবাসা, ঈর্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রক্ষোভের সঙ্গে সে পরিচিত, কিন্তু কোন অনুভূতিই তাকে অভিভূত করে না। প্রক্ষোভের প্রকাশে সে সামাজিক ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা রক্ষা করে। সাধারণতঃ কোন অবস্থায়ই সে সংযম হারিয়ে দিশাহারা হয় না।

(১১) নিজ দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সে মনোযোগী; নিয়মিত খাদ্য, বিশ্রাম ব্যায়াম দ্বারা সে দেহকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সচেষ্ট। সে এই

দেহকে পাপ বলে (পাপোঽহং পাপসম্ভবম্) ঘৃণা করে না এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৈথুন ইত্যাদি দেহের স্বাভাবিক দাবী স্বাস্থ্যবিধি এবং সমাজসম্মত সীমার মধ্যে সে অসংকোচে মিটিয়ে থাকে।

(১২) সে স্বাধীন যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তায় অভ্যস্ত এবং কঠিন ও জটিল সমস্যা বিষয়েও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে দ্বিধা করে না।

(১৩) নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ও আনন্দ আছে এবং কাজ ও খেলাধূলার মধ্যে সে একটি সুসঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ।

(১৪) জীবন ও জগত সম্পর্কে জীবন্ত আগ্রহ ও অনুরাগ সত্ত্বেও তার মধ্যে দার্শনিক-সুলভ কিছুটা নিরাসক্ততা আছে। মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী হয়েও সে জানে, এক অমোঘ অলৌকিক শক্তি বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ কচ্ছে। সে বীর কর্মী, কিন্তু সে বিনম্র ভক্তও। প্রকৃত যে সুস্থ মানুষ, সে কর্মের মধ্যেও শান্ত—সে বীর হয়েও প্রসন্ন। বীরত্ব ও মাধুর্য তার চরিত্রে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে।

অবশ্যই এই লক্ষণগুলি পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষেরই লক্ষণ। এই মানুষই গীতার কর্মযোগী ও স্থিতধী।

মানসিক সুস্থ অবস্থার ভিত্তি :

মানসিক সুস্থতার মূল ভিত্তি চারটি :

(১) বংশগতি (২) দৈহিক অবস্থা (৩) গৃহ, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, ত্যাদি সামাজিক সংস্থা (৪) বাড়ন্ত বাল্য ও কৈশোরে জীবনের মৌল-প্রয়োজন ও তাড়নাগুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা।

(১) **বংশগতি**—ব্যক্তির দৈহিক-মানসিক বিকাশের সীমা ও সম্ভাবনা বংশগতি দ্বারা নির্দিষ্ট। বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, চেহারা ইত্যাদি শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের গতি, দিক বা ধারা, কতটা তারা বিকশিত হবে, এবং কোন দিকে বিকশিত হবে, তা অবশ্য অনেকটা নির্ধারিত হয় পরিবেশ দ্বারা। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে ব্যক্তির সম্ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং সুষম ব্যবহারের সুযোগের উপরে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে, কোন কোন ব্যক্তির জন্মগত মানসিক গঠনই এমন যে, অল্প প্রতিকূল অবস্থার চাপে তার বিশেষ ধরণের মানসিক বিকৃতি দেখা দেয়। ঠিক একই অবস্থায় আর একজন ব্যক্তি শান্ত সুস্থ থাকে ; তার মনে কোন বিকার দেখা দেয় না। **গভীর ও কঠিন**

মানসিক রোগীর বংশগতি অনুসন্ধান করে জানা গেছে তাদের অনেকরই মূলে আছে জন্মগত স্নায়বিক অসাম্য (hereditary nervous imbalance) ।

(২) **দৈহিক সুস্থতা**—দেহ ও মন অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধে যুক্ত। তাই এটা সর্বদাই আমরা দেখি, দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকলে, মনও শান্ত এবং প্রফুল্ল থাকে। দেহ যখন অসুস্থ, তখন নূতন বা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান কঠিন হয়।

দেহে খাদ্যপ্রাণ, ক্ষার (vitamins, calcium), লৌহ ও অন্যান্য ধাতব-লবণের (iron and mineral salts) অভাব মানসিক বিষন্নতা, দৌর্বল্য এবং অন্যান্য লক্ষণ উদ্রেক করে। রসক্ষরাগ্রন্থির (ductless glands) যথোপযুক্ত ক্ষরণ ব্যতিরেকে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। আরো দেখতে পাওয়া যায়, যারা চক্ষুহীন, বধির বা কোন অঙ্গহীন, তারা অনেক সময় মনের মধ্যে হীনতা বোধ ও হিংসা পোষণ করে। ইতিবাচক ভাবে বলা যায়, **যে মানুষ নিয়মিত খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত জীবনযাপন করে, সে মনের দিক থেকেও শান্ত ও প্রসন্ন থাকে।**

(৩) **সুষ্ঠু সমাজ জীবন**—সমাজের নিকট হ'তেই শিশু তার দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি, আদর্শ, আচার ব্যবহার ইত্যাদি গ্রহণ করে। কাজেই এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যেখানে সমাজ-জীবন নির্মল ও উদ্যমশীল সেখানে ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গতিসাধনের কাজ সহজ ও প্রীতিপ্রদ হয়।

সমাজ জীবনের প্রধান কয়টি সংগঠন হচ্ছে পরিবার, বিদ্যালয় ও প্রতিবেশী। পরিবারের মধ্যে পিতামাতার প্রভাব শিশুর উপর সর্বাধিক। **যে পরিবারে মাতা সুস্থ, শান্ত, স্নেহশীলা, বুদ্ধিমতী, সদাচারপরায়ণা, সেখানে শিশুও মানসিক সুস্থ থাকে।** শিশুর অবাধ্যতা ও অপরাধপ্রবণতার (অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার), একটি প্রধান কারণ দুষ্ট পারিবারিক প্রভাব। **যেখানে পিতামাতার মধ্যে সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, যেখানে গৃহ বিধ্বস্ত, সেই সব পরিবারের সন্তানদের মধ্যেই মানসিক সঙ্গতি বিধানের সমস্যা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়।**

বিদ্যালয়ে শিশু একদিকে যেমন বাধ্যতা, সৌহার্দ্য নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রম ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জন করে, তেমনি সহপাঠী ও শিক্ষকের সাহচর্যে নিজ

জীবনের বিস্তার এবং বিকাশের সুযোগ লাভ করে। ব্যক্তির বুদ্ধি, নিপুণতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি গুণ মানসিক বিকৃতি হ'তে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং ইতিবাচক ভাবে সুস্থ মানসিক জীবন গঠনে সহায়ক হয়।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। সুস্থ ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে এ প্রকার সহযোগিতার ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক নিতান্ত আবশ্যক। সুস্থ প্রতিবেশী-কেন্দ্রিত সমাজ-জীবন সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের বিশেষ সহায়ক। এই সুস্থ জীবনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হাসপাতাল, লাইব্রেরী, খেলাধূলা এবং সামাজিক উৎসবের ব্যবস্থা।

(৪) বাল্যকালে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলির তৃপ্তি

দেহের মৌলিক প্রয়োজনগুলি (খাদ্য, পানীয়, ঘুম ইত্যাদি) যথাসময়ে তৃপ্ত না হ'লে, শুধু শারীরিক ক্লেশের কারণই হয়না—মানসিক অশান্তিও সৃষ্টি করে। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্য সমগ্র দেহ-যন্ত্রের এ স্বাভাবিক দাবীগুলি যথাসময়ে মেটাতেই হবে। বাল্যকালের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে সত্য।

দেহের যেমন কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন মেটানো দরকার, তেমনি শিশুর মানস জীবনেরও কয়েকটি অপরিহার্য দাবী আছে, তার মধ্যে দুটি হচ্ছে প্রধান, —**নিরাপত্তাবোধ ও স্বাধীনতা।** পিতামাতার প্রচুর স্নেহের অভাব ঘটলে শিশু নিজেকে অসহায় (insecure) পরিত্যক্ত (rejected) ও মূল্যহীন (worthless) বলে মনে করে। এই বুক-জুড়ানো উদার স্নেহ ভালবাসায় মাতৃস্তন্যের মতই শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মগত দাবী রয়েছে। যেখানে এর অভাব ঘটে, সেখানেই ভবিষ্যৎ মানসিক বিকারের আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে অতিরিক্ত স্নেহ ও সাবধানতা দিয়ে শিশুকে ঘিরে রাখলেও, শিশুর স্বাভাবিক ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ব্যাহত হয়। যে পরিবারে শিশুর এই মৌল প্রয়োজন ও স্বাভাবিক দাবী মেটাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে মানবশিশু স্বচ্ছন্দে ও সতেজে বেড়ে ওঠে। বিদ্যালয়েও শিশুর এই দুটি বিপরীত দাবী,—স্নেহের আকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তাবোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আত্ম-উন্মোচনের আগ্রহ মেটাবার সুব্যবস্থা থাকলে, শিশুর মানস জীবনের সুস্থতা ভবিষ্যৎ জীবনেও অব্যাহত থাকে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মানসিক অসুস্থতা ও অব্যবস্থিততা

মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা

সকল মানুষই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে চায়। এই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে নিজের সঙ্গে এবং অপরের সঙ্গে সুসঙ্গতির উপরে। যে মানুষ তার পরিবারের বা গোষ্ঠীর অন্য সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারে না, যে কেবলই অন্যের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা, কলহ, কোন্দল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে অব্যবস্থিত, সে অসুখী। আবার যে মিথ্যা হীনতাবোধ, তীক্ষ্ণ অভিমান, অন্যকে অতিরিক্ত সন্দেহ বা ভয়ের জন্য সহজে দশজনের সঙ্গে মিশতে পারলো না, মিলতে পারলো না, এমন কুনো, ভীতু, আত্ম-প্রত্যয়হীন মানুষও অব্যবস্থিত—সেও অসুখী। এখানে বাইরের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে চলার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু অসঙ্গতি বা বিরোধটা নিজের সঙ্গেও হতে পারে। যে মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, ক্রোধ, অসংযত, যে মানুষ শান্ত বিচার দ্বারা স্থির মূল্যবোধ বা আদর্শ দ্বারা নিজ বিপরীতমুখী কামনা বাসনার বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে না, তার জীবন ঝড়ের মুখে পালছেঁড়া, হালভাঙা নৌকার মত। সেও অব্যবস্থিত, সেও অসুখী ও অস্থির।

এই সঙ্গতি স্থাপনের কাজ চেষ্টা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। সমাজের নিন্দা ও শাসনও মানুষকে এ বিষয়ে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ সুসঙ্গত, সুব্যবস্থিত, সুস্থির মানুষ কেউ-ই নেই পৃথিবীতে। সব মানুষই কখনো না কখনো ধৈর্য হারায়, লোভে অভিভূত হয়, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া কলহে প্রবৃত্ত হয়, বিপদের মুখে দিশেহারা হয়, নিরাশার কালো অমাবস্যায় জীবনে বীতস্পৃহ হয়। কিন্তু তাই বলে এদের আমরা অব্যবস্থিত (mal-adjusted) বা অপস্বভাবী (abnormal) বলবো না। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের এই অশান্তি ও অস্থিরতার অবস্থা সাময়িক। এগুলি তাদের চরিত্রগত স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। এ প্রকার ঝড়, ঝঞ্ঝা, অশান্তি অস্থিরতার মধ্য দিয়েও তারা কোন না কোন প্রকারে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন, এবং এই সব উত্তেজক, উদ্বেগকর, বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যেও এদের

ব্যক্তিত্বের ঐক্যটি ধ্বংস (disintegration of personality) হয়ে যায় না। সংসারের অধিকাংশ মানুষকেই তাই তাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সাময়িক অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও, সুস্থ ও স্বভাবী (normal)-ই বলবো।[১]

ফ্রএডের মতে সমস্ত মানসিক রুগ্নতার কারণ রয়েছে বাল্যকালে স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসার সহজ প্রকাশের পথ অবদমিত (repressed) হয়ে যাওয়ায়। তিনি মনে করেন সমস্ত স্নেহভালবাসার আকর্ষণ মূলতঃ যৌনিজ (sexual).

তাঁর মতে পুরুষ-শিশুর পক্ষে মায়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ (পিতার প্রতি ঈর্ষা-মিশ্রিত ভয়) এবং স্ত্রী-শিশুর পক্ষে পিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ (মাতা এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী) আদিম কামের (libido) স্বাভাবিক বিকাশ। কিন্তু শিশু কিছুটা বড় হলেই এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে সমাজ নিন্দার চোখে দেখে এবং শিশু তার কামাকাঙ্ক্ষার বাহ্যপ্রকাশকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। এর থেকেই ফ্রএডের মতে **ইদিপাস্ কমপ্লেক্স্ ও ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স্**—নির্জ্ঞান মনে এ দুটি জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়। আর একটি গ্রন্থির কথাও ফ্রয়েড উল্লেখ করেন, তার নাম **লিঙ্গচ্ছেদ গ্রন্থি (castration complex).** ফ্রএড বলেন **বাল্যকালের স্বাভাবিক ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবল প্রক্ষোভ জোর করে অবদমন করলে নির্জ্ঞান মনে নানা অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং এগুলিই ভবিষ্যৎ জীবনে সমস্ত অব্যবস্থিততা ও মানসিক ব্যাধির মূল।**

ফ্রএডের এ সিদ্ধান্ত সমস্ত মনোবিকলনবাদীরাও গ্রহণ করেন নি। তাঁরা এটা স্বীকার করেন না যে আদিম যৌনিজ কামাকাঙ্ক্ষাই জীবনের মূল শক্তি এবং বাল্যকালের স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা বা অনান্য প্রবল প্রক্ষোভের অবদমনই

১ Apart from sporadic outbursts of an innocuous nature, they manage to control their emotions. Although they had their share of frustrations, conflicts and hardships, their lives were not greatly disrupted by their misfortunes. During moments of stress, they proved to be fairly resilient and adaptable. Their inner mental life was more often than not, one of tranquility. These commonplace men and women who exhibited at best ordinary competence in self-management and got along reasonably well with themselves and their associates constitute the normal or average group. The great majority of the general population are normal people. Page—Abnormal Psychology, p. 6

সমস্ত অব্যবস্থিততার মূল। পরিণত জীবনের পরিবেশগত নানা সংঘর্ষ ও চাপকে ফ্রএড্ যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি।

এ্যাড্লার বলেন মানুষের জীবনের পশ্চাতে মূল শক্তি হচ্ছে হীনমন্যতা (inferiority complex) এবং সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হচ্ছে এই হীনতার প্রকৃত কারণগুলি দূর করবার জন্যে যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা ও আগ্রহ। যেই ব্যক্তিরা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, তারা নানা মিথ্যা অজুহাতে এবং নানা কৌশলে নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা ঢেকে নিজের হীনতা বোধকে পোষণ করেই চলে; এমন কি, তারা নানা দৈহিক রোগ বা লক্ষণ সৃষ্টি করে এক একটা বিশেষ জীবনের ধারায় (style of life) অভ্যস্ত হয় এবং অন্যকে, এমন কি নিজেকেও এমন ভাবে ভোলাতে চায় যে তার 'দৈহিক রুগ্নতা'ই তার অসাফল্যের প্রকৃত কারণ। এমন ব্যক্তিদেরই মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা বলেন নিউরোটিক (neurotic)।

য়ুঙ্ ফ্রএড্-পন্থী হ'লেও ফ্রএডের সমস্ত মত গ্রহণ করেন নি—যেমন গ্রহণ করেন নি এ্যাড্লার। তিনিও মনে করেন কামই জীবনের একমাত্র মৌলশক্তি, ফ্রএডের এই মত সত্য নয়। তিনি একথাও সত্য বলে মনে করেন না যে, পরিণত বয়সের সমস্ত অসঙ্গতি ও মানসিক বিকারের কারণ শৈশবের অশান্তিকর অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষার অবদমন। তিনি মনে করেন যে মানসিক বিকৃতির প্রকৃতি এবং গুরুত্ব অনেক সময়ই বর্তমান বিপত্তিকর প্রতিকূল পরিবেশের উপরই নির্ভর করে। ব্যক্তি তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনে অসমর্থ হয় বলেই, মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। অবশ্য বংশগত ও জন্মগত কারণও অনেক সময় বর্তমান থাকে।

এটা মনে রাখতে হবে যে সাময়িকভাবে প্রত্যেক মানুষই প্রতিকূল অবস্থায় দিশাহারা হতে পারে, ভয়ে, ক্রোধে, লোভে বা কামের বশে গর্হিত, লজ্জাকর সমাজবিরুদ্ধ কাজ করে বসতে পারে, অন্যের সঙ্গে গুরুতর কলহবিবাদে রত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে' এই মানুষকে অব্যবস্থিত বা মানসিক বিকারগ্রস্ত বলা যাবে না। এবং কোন এক বিষয়ে যে ব্যক্তি অব্যবস্থিত সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও সুস্থ হ'তে পারে। যখন এই অব্যবস্থিততা মাত্রা অতিক্রম করে এবং যখন তা সাময়িক ব্যতিক্রম না হয়ে, স্থায়ী অবস্থায়

দাঁড়াচ্ছে এমন আশঙ্কা থাকে, তখনই ব্যক্তিকে মানসিক দিক থেকে রুগ্ন বলা হবে।[২] মানসিক রোগের মূল লক্ষণ বিষঙ্গ (diss.ciation) সমস্ত অব্যবস্থিতা বা মানসিক বিকৃতি সমান গুরুতর নয়। সুস্থ মানুষের মধ্যে নানা বিপরীত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বা বিরুদ্ধ শক্তির চাপ সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক ঐক্য অটুট থাকে। **যে পরিমাণে ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য বিঘ্নিত বা বিধ্বস্ত, সেই অনুপাতেই ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে রুগ্ন।** সাধারণ সুস্থ মানুষের প্রতিকূল অবস্থার চাপ সহ্য করেও ভেঙে না পড়বার স্বাভাবিক অনেকটা বাড়তি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে (a wide margin of tolerance)। কিন্তু যেখানে প্রতিরোধ ক্ষমতা আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যেখানে তার অস্থিরতা এমন স্তরে পৌঁছায় যে, বাস্তব জগতের দাবী সে মোটামুটি ভাবেও মেটাতে পাচ্ছেনা—তার ব্যক্তিত্বের ঐক্যে ফাটল ধরেছে, আর কতগুলি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ, সন্দেহ যুক্তির শাসন না মেনে নিজেরা আলাদা একটা কেন্দ্রে যুক্ত হয়ে এক মিথ্যা কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে ব্যক্তিত্বের ঐক্যের বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বা এমন বিষঙ্গের (dissociation) আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখনই আমরা বলি ব্যক্তি মানসিক বিকারের লক্ষণাক্রান্ত। আর্নেষ্ট জোন্স্ বিষঙ্গকেই মানসিক রুগ্নতা বা বিকারের প্রধান লক্ষণ বলেছেন।[৩]

ফ্রএ:ডর পূর্বে ফরাসী চিকিৎসক ঝানে (Janet) এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সুস্থ মানুষের চেতনা বা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে নানা বিচিত্র বিপরীত মানসিক ক্রিয়াকে একটি মোটামুটি ঐক্যের বন্ধনে ধরে রাখার ক্ষমতা। **মানসিক রুগ্নতা হচ্ছে এই ধরে রাখবার শক্তি হ্রাস, ফলে মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা ইচ্ছার বিচ্ছিন্ন কতগুলি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।**[৪]

মানসিক রোগের শ্রেণী বিভাগ—মানসিক রোগ বা বিকৃতিগুলিকে নানা দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কোন রোগ বা বিকৃতির একটি মাত্রই নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে তা নয়, এবং এই শ্রেণীবিভাগগুলি অনেকটাই

২ Crow & Crow. Mental Hygiene.
৩ Hart. Psychology of Insanity.
৪ McDougall—Psychology. p 196-97.

শিথিল ভাবে বা মোটামুটি ভাবেই করা হয়। তাই বিশেষ একটি রোগীকে কি কোন দলে ঠিক কোন দলে ফেলা হবে তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। তবে অনেকগুলি লক্ষণ সাধারণতঃ পরস্পর যুক্ত থাকে (syndromes) এবং সে অনুযায়ী রোগের নামকরণ হয় এবং তার শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

কেউ কেউ মানসিক রোগগুলিকে ষ্ট্রাক্‌চারাল্ ও ফাংশ্যনাল্ এই দুই দলে প্রধানতঃ ভাগ করেছেন। যেখানে মানসিক রোগের সঙ্গে স্নায়বিক ও দৈহিক কতগুলি বিপর্যয় সুস্পষ্ট ভাবে যুক্ত থাকে, সেগুলি হচ্ছে ষ্ট্রাকচারাল বা অর্গানিক। আর যেখানে কতকগুলি মানসিক ক্রিয়ার বৈকল্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সেগুলি হচ্ছে ফাংশ্যনাল্।[৫]

মানসিক রোগ—অর্গানিক (Organic)— অর্গানিক ব্যাধিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট এবং প্রধান কয়েকটি হচ্ছে (১) প্যারেসিস্ (dementia paralytica) এ ব্যধিতে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সিফিলিস্ বা অন্যান্য কোন বীজাণুর আক্রমণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অপরিচ্ছন্নতা, মাথার যন্ত্রনা, হাত পা মাথা কাঁপা, বিষম দুর্বলতা, স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদি বিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রোগী সম্পূর্ণ অথর্ব, বুদ্ধিহীন, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। (২) বৃদ্ধ বয়সের 'ভীমরতি' (senile dementia)—এখানেও মস্তিষ্কের স্নায়ু পদার্থ ক্রমশঃ স্বাভাবিক কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তি শিশুর মত অসহায় ও অবুঝ হয়ে পড়ে।

(৩) **মৃগীরোগ** (epilepsy) কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে স্নায়ুপদার্থের প্রতিকূল পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু **অনেক সময়ই এর কারণ মানসিক।**

(৪) **মস্তিষ্কে অর্বুদ** (tumour) অথবা ক্ষত বা আঘাতের পর স্নায়ুপদার্থের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে এবং এ সব ক্ষেত্রে নানা মানসিক বিকারের লক্ষণও দেখা যায়। এ রুগ্নাবস্থাও অবশ্যই অর্গানিক।

স্নায়বিক পদার্থের ক্ষয়, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি কারণে যে সব মানসিক বিকার দেখা দেয় তারা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর, দুশ্চিকিৎস্য এবং এই সব রোগের বৃদ্ধির একটা ইতিহাস থাকে। **এ সব ক্ষেত্রে মানসিক**

৫ David Stafford Clark.—Psychiatry today. p 83.

চিকিৎসার কোন স্থান নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্‌-থেরাপী বা অস্ত্রোপচারই একমাত্র চিকিৎসার পথ।

কিন্তু ফাংশ্যনাল্‌ যে মানসিক রুগ্নতা, তার কারণ হিসাবে স্নায়বিক পদার্থের ক্ষয় বা অন্য কোন নির্দিষ্ট দৈহিক বৈকল্য আবিষ্কার করা যায় না। অবস্থার পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশ দ্বারা অনেক সময়ই এ সব রোগীর উপকার হয়। অনেক সময়ই এই রোগ সাময়িক এবং উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসা দ্বারা রোগের উপশম ঘটে বা আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়।[৬]

মানসিক রোগ-ফাংশ্যনাল (Functional)—এ সব রোগ প্রধানত মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থার প্রতিকূলতা-নির্ভর। কিন্তু **মানসিক রোগ বলেই এগুলি মিথ্যা নয়।** কোন কোন হিষ্টিরিয়ার রোগী বলে, তারা অন্ধ হয়ে গেছে। অথচ চোখের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগীর চক্ষুর গঠনে কোন রুগ্নতা আবিষ্কার করতে পারেন না। কিন্তু দৈহিক বৈকল্য কিছু লক্ষ্য করা না গেলেও, রোগীর (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগিণী) সাময়িক ভাবে বাস্তবিকই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।[৭]

স্নায়ুদৌর্বল্য (Neurasthenia)—ইহা খুব গুরুতর রোগ নয় এবং সাধারণ সুস্থ মানুষের চেয়ে স্নায়বিক দৌর্বল্যগ্রস্ত রোগীর খুব বেশী প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না।

এ সব রোগীর অল্প কয়েকটি মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থায়ই মাত্র বৈকল্য লক্ষ্য করা যায়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সে অন্য সুস্থ মানুষের মতই ব্যবহার করে এবং একে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নেই। এই রোগীর প্রধান উপসর্গ হচ্ছে বিষম দুর্বলতা। ঘুম বা বিশ্রামদ্বারা এই ক্লান্তিবোধ দূর হয় না। এর সঙ্গে মাথাধরা, ঝাপ্‌সা দেখা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অনির্দিষ্ট ব্যথা বেদনা, অস্থিরতা, হজমের গোলযোগ, বিষন্নতা, খিটখিটে মেজাজ, মনোযোগের অভাব ইত্যাদি উপসর্গও দেখা যায়। রোগী অনেক সময়, বিনা কারণে, আলো দেখে, শব্দ শোনে। বৃথা ভয়, সন্দেহ, ও উদ্বেগ অনেক সময় দেখা দেয়। রোগ গুরুতর হলে, এক **স্থায়ী বিষণ্ণতার**

---

[৬] Griffith. An Introduction to Applied Psychology pp 297-98

[৭] Dorcus & Shaffer. Text book of Abnormal Psychology—Ch X.

অবস্থা দেখা দেয় (hypochondria)। অনেক ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম থাকে—কিন্তু তারও কারণ সম্ভবতঃ রোগী পারিবারিক জীবনের অসন্তোষ বা দুঃখ, হতাশ, লজ্জা বা হীনতাবোধ ভুলে থাকতে চায়। অর্থাৎ তীব্র প্রক্ষোভের সন্তোষজনক প্রকাশ যেখানে দীর্ঘকাল বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই সুস্থ মানুষেরও এই স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

মনোদৌর্বল্য (Psychasthenia)—এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে মানসিক শক্তির হ্রাস। এখানেও এটা ধরে নেওয়া হয় যে সুস্থ মনের শক্তি হচ্ছে বিচিত্র ও বিপরীত ইচ্ছা-ক্রিয়া-প্রবণতাকে সমন্বয় করে ব্যক্তিত্বের ঐক্যকে পুষ্ট করা, বিকশিত করা। স্নায়বিক দুর্বলতা ও মনোদৌর্বল্যের শারীরিক লক্ষণগুলি বহুলাংশে এক, কিন্তু মনোদৌর্বল্যের রোগীদের মানসিক অস্থিরতা ও বিকারের লক্ষণ অনেক বেশী সুস্পষ্ট ও গুরুতর। এ সব রোগীর আত্মসংযম ও আত্মশাসনের ক্ষমতা কমে যায়। বাস্তব জগতের সঙ্গে যুক্তিগত যোগ তারা হারিয়ে ফেলে, এবং বিষাদের পথে তারা অধিকতর অগ্রসর হয়। এসব রোগের লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি প্রধান :

(১) **অকারণ প্রবল ভয় (phobias)**। সাধারণতঃ এই ভয়গুলি দেখা যায় বদ্ধস্থানের ভয় (claustrophobia), খোলা জায়গার ভয় (agoraphobia), উঁচু জায়গার ভয় (acrophobia), নিঃসঙ্গতার ভয় (monophobia), ভীড়ের ভয় (ochlophobia) এবং রক্তপাতের ভয় (hematophobia)[৮]

(২) **অবসেশন্ ও কম্‌পালশন্** এ—সব রোগী নিজের উপর সংযম ও শাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কোন একটা চিন্তা বা ধারণা মাথায় ঢুকলে তা সরিয়ে ফেলতে পারে না (obsession)। অযৌক্তিক বৃথা সন্দেহে এরা পীড়িত। তেমনি, এক একটা ক্রিয়া তারা না করে পারে না—তারা বোধ করে কোন শক্তি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের সেই কাজ করতে বাধ্য করে (compulsion)। অতিরিক্ত 'শুচিবাই', এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ জীবনেও কখনো কখনো এরকম ঘটে, তবে তা সাময়িক এবং তার তীব্রতাও অনেক কম।[৯]

৮। Bagby. The etiology of phobias. J. Abnorm. Psychol, 1922, 17, 16-18.

৯। Morgan. The Psychology of Abnormal people pp 132 ff.

কখনো কখনো এই অনিচ্ছাকৃত কর্মসম্পাদনের জন্য বাধ্যতাবোধ, অন্যায় অসামাজিক, গর্হিত কাজ করবার বিষম প্রবণতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। রোগের এই অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রকাশগুলিকে ম্যানিয়া (mania) বলা হয়। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে, ছোট খাটো জিনিষ চুরি করার প্রবৃত্তি (kleptomania), ঘরে আগুন দেওয়ার প্রবৃত্তি (pyromania)

(৩) দেহের কোন অঙ্গের বিশৃংখল **অনিয়ন্ত্রিত কম্পন** (tics).

(৪) সামান্য ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা ও অযৌক্তিক ইতস্ততের ভাব। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে প্রায় সর্বত্রই বাল্যকালের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতির অবদমনের ইতিহাস আবিষ্কার করা যায়। কখনো কখনো অবদমিত পাপবোধ অথবা হীনতাবোধ লুকিয়ে কাজ করতে থাকে। ব্যক্তির অপরিপূরিত তীব্র আকাঙ্ক্ষাও এর কারণ হতে পারে। ফ্রএডের মতে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি সর্বত্রই যোনি-কেন্দ্রিক।[১০] কিন্তু এ মত সকলে গ্রহণ করেন না। সম্ভবতঃ এ ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত যে, কোন দুর্বলতার অবস্থায় ব্যক্তি নিজ-মানসিক শারীরিক ক্রিয়া প্রবণতা ইত্যাদি সমন্বয় করবার এবং নিজেকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।[১১] এ সমস্ত ব্যক্তির বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হয়ে যায় এবং এরা পরিচিত বস্তু ও অবস্থার মধ্যেও কেমন দিশাহারা বোধ করে। বাস্তব জগৎ ও নিজ মনোজগৎ দুইয়ের উপরই রোগী শাসন-সংযমের শক্তি হারিয়ে ফেলে। এটাই বিযুক্তির (dissociation) প্রধান লক্ষণ।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria)—হিষ্টিরিয়া মনোদৌর্বল্যের চেয়েও গুরুতর অবস্থা। এখানে বিযুক্তি এবং ব্যক্তিত্বের ঐক্য ধ্বংসের আশঙ্কা অধিকতর প্রবল। এ সব রোগীর চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম আরো বেশী বিশৃংখল। বাস্তব জগতের

১০। Freud New introductory Lectures on Psycho-analysis.

১১। If a person has a profound desire which cannot come to expression because of his training, or because of his social mores, a compulsion or obsession will serve the purpose of diverting him from his desire. It may be argued that these unsatisfied desires are mostly sexual in character. Griffith. An introduction to Applied Psychology. pp. 307-8

থেকে তারা আরো বেশী বিচ্ছিন্ন, নিজের চিন্তা, বা ক্রিয়ার সংযমন ও শাসনের শক্তি এদের আরো কম। সে জন্য এদের প্রক্ষোভের প্রকাশ অনেক সময় অপরিমিত হাসি, রাগ ও চীৎকারে। তা এরা থামাতে পারে না। এরা অত্যন্ত অভিভাবনপ্রবণ (suggessible) যদি কেউ বলে, 'তোমার শরীরটা যেন খারাপ দেখাচ্ছে', অমনি তারা অসুস্থ বোধ করতে থাকে। এরা নিজের কাল্পনিক রোগের উপযুক্ত দৈহিক প্রকাশ বাস্তবিক সৃষ্টি করে নেয় (conversion hysteria)। এই রোগের প্রকাশ এত ব্যাপক ও বিচিত্র যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা এই রোগ সম্পর্কে বহুদিন থেকেই বহু আলোচনা করেছেন। ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সাময়িক অসারতা (paralysis) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অথচ তার বাস্তব দৈহিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

কয়েকটি উদাহরণ :—অনেক হিষ্টিরিয়া রোগী বলে যে, তাদের হাতের চামড়ার যে অংশ দস্তানা দিয়ে ঢাকা থাকে সে অংশের ত্বকের স্পর্শ-বোধ লোপ পেয়েছে (glove anaesthesia); অথবা বলে, চোখে একটা দিকে তারা দেখতে পাচ্ছে না, বা কোন কোন রং তারা দেখতে পাচ্ছে না; আবার কখনো বলে, ডান চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কখনো বলে বাঁ চোখে দেখতে পাচ্ছে না। কখনো দেহের কোন অঙ্গ, অথবা কোন একটা দিক অথবা সমস্ত দেহে বোধের ক্ষমতা রোগী হারিয়ে ফেলে (monoplegia, hemiplegia paralegia, diplegia)। কিন্তু বৈদ্যুৎ উদ্দীপক দিয়ে এসব ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করা যায়। এর থেকে বোঝা যায়, এগুলি বাস্তবিক পক্ষাঘাত paralysis) নয়। এর মূল কারণ মানসিক সংঘাত ও অস্থিরতা।[১২]

হিষ্টিরিয়া রোগীদের আরও কয়েকটি লক্ষণীয় উপসর্গ হচ্ছে অস্থিরতা অমনোযোগ ও স্মৃতিবিভ্রম। অনেক সময় এই রোগীরা নিজেদের নাম ও পরিচয় ভুলে যায় এবং বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে যায় (fugues)। তারপর হঠাৎ তাদের স্মৃতি ফিরে এলে তারা বিষম দিশাহারা হয়ে পড়ে। কখনো হয়তো মা ছোট শিশুকে প্যারামবুলেটরে পার্কে ফেলে চলে যায়। ঘণ্টা দুই পরে তাঁর স্বামী সন্তানের খোঁজ করলে মার তখন মনে পড়ে।

নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলির উপর এদের শাসন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেমন

১২। Head. Studies in Neurology. pp 120 ff.

কমে যায়, দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধেও তাই সে জন্য নানাপ্রকার অদ্ভুত বিশৃ[illegible] অঙ্গ-কম্পন বা অঙ্গ সঞ্চালন (tics) দেখা যায়।[১৩]

গুরুতর হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ঐক্য ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন [illegible] ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে (dissociation of personality)। সা[illegible] ক্ষেত্রে ষ্টিভেন্সনের 'ডাঃ জিকেল্ ও মিঃ হাইড্' এবং মনোবিকলন বিশা[illegible] মর্টন প্রিন্সের মিস্ বোসাম্পের বাস্তব উদাহরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।[১৪]

এর কারণ সম্বন্ধে নানা মত আছে। ঝানের মতে মনের সমন্বয়শ[illegible] হ্রাসই হিষ্টিরিয়া এবং অন্য সমস্ত মানসিক রোগের হেতু। এর জন্যেই [illegible] রোগীরা অতিমাত্রায় অভিভাবনপ্রবণ। বহুক্ষেত্রেই প্রতিকূল বংশগ[illegible] ইতিহাস পাওয়া যায়। ফ্রএড্-এর মতে হিষ্টিরিয়া বিকল্পের সাহায্যে অব[illegible] আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের এক অসন্তোষজনক বিশৃংখল ব্যবস্থা। এ বি[illegible] আরো বিশদ আলোচনার জন্য গুহ—মনের স্বাস্থ্য ও মনের বি[illegible] দ্রষ্টব্য।[১৫]

নিউরোসিস্ ও সাইকোসিস্—রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী অধিকা[illegible] মনোবিদই নিউরোসিস্ (অথবা সাইকো-নিউরোসিস্) ও সাইকোসিস্ [illegible] দুইটি প্রধান বিভাগ স্বীকার করেন। **সাইকো-নিউরোসিস্ অপেক্ষা[illegible] কম গুরুতর রোগ এবং এতে ব্যক্তিত্বের ঐক্য বিধ্বস্ত হয়ে যায় না**[illegible] এ জাতীয় রুগ্নতা সাধারণতঃ সাময়িক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগী[illegible] হাসপাতালে আটকে রেখে চিকিৎসা করতে হয় না। ইতিপূর্বে যে রোগগু[illegible] উল্লেখ করা গেল (যেমন সাইকেস্থেনিয়া, নিউর্যাসথেনিয়া, ইত্যা[illegible] সেগুলি সাইকো-নিউরোসিস্ বলে স্বীকৃত। কারু কারু মতে হিষ্টিরিয়া[illegible] পৃথক একদল বলে স্বীকার করা উচিত। **সাইকোসিস্ মানসিক রোগে[illegible] গুরুতর অবস্থা।** এখানে ব্যক্তি অনেকটা স্থায়ীভাবেই বাস্তবের স[illegible]

১৩। Sidis. Symptomology, Psychognosis and Diagnosis of Psycho-pathic Diseases, pp 329-36.

১৪। Prince. Miss Beauchamp : the theory and psychogenesis of multiple personality. J. Abrorm. Psychol. 1920, 15, 82 ff.

১৫। (a) Janet. The major symptoms of Hysteria.

(b) Babinsky. My conception of hysteria & hypnotism.

(c) Freud. Selected papers on hysteria and other psychoneuroses

। হারিয়ে ফেলে, এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়া, চিন্তা, ইচ্ছার মধ্যে সঙ্গতি নের শক্তি থাকেনা। উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা (insanity) এই হার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রকাশ। এসব ক্ষেত্রে রোগীর নিজের দিক ক চিকিৎসা বিষয়ে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং বিশেষ শেষ মানসিক রোগের চিকিৎসালয় ব্যতীত, এসব রোগীর চিকিৎসা সম্ভব না। এরা নিজের সৃষ্ট ভ্রান্তির জগতে বাস করে।[১৬] নিজের ভার নিজেরা নিতে পারে না, নিজ কর্ম্মের ফলাফল সম্পর্কে এদের জ্ঞান থাকে এবং এরা নিজের ও অপরের বিষম বিপদ ঘটাতে পারে। কারো রা মতে এদের মধ্যে প্রভেদ গুণগত নয়—পরিমাণগত।[১৭] প্রতিকূল গত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান থাকলেও, সাধারণতঃ সুস্থ ভাবিক মানুষের মধ্যে যখন গুরুতর মানসিক বিশৃংখলা ও প্রক্ষোভ বিষয়ে র্ষ্য এমন স্তরে পৌঁছে, যখন সে নিজেকে পরিচালনার ভার গ্রহণে অক্ষম, সমাজজীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তখন তাকে আমরা উন্মাদ (insane)।[১৮]

গুরুতর মানসিক রোগগ্রস্ত ৫০০ আ-বাছাইকরা রোগীদের ব্যবহার ক্ষণ ক'রে, এদের মধ্যে কতগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়, যদিও এদের স্পরের মধ্যে প্রচুর প্রভেদও রয়েছে।

গুরুতর মানসিক রোগের প্রকারভেদ—

গুরুতর মানসিক রোগকে (psychoses) সাধারণত ফ্যাংশনাল্ ও গানিক এই দুই দলে ভাগ করা হয়।

১৬। The psychotic lives, in so far as he is a psychotic, in a world of tasy; the neurotic lives in the real world, its difficulties are greater by for him, than they are for normal people, but they are the same culties which all of us have The difficulties of the psychotic arise m the fact that he is living in quite another world, one which not subject to ordinary physical law Ross. The common neuroses,

১৭। David Stafford Clark. Psychiatry Today.

১৮। Insanity is a legal term denoting that the individual is so nfused and deranged as a result of profound mental and emotional uptions that he is incapable of adequate self-management and ustment to society. Page. Abnormal Psychology. p 209

ফাংশনাল্ সাইকোসিস্গুলিতে মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ায় গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা গেলেও এবং এর পশ্চাতে অসন্তোষজনক বংশগতির ইতিহাস লক্ষ্য করা গেলেও, রোগীর স্নায়বিক বা দৈহিক গঠনে গুরুতর কোন ত্রুটি দেখা যায় না। এই দলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে **সিজোফ্রেনিয়া** (schizophrenia) **ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্** (manic-depressive psychosis), **প্যারানোয়িয়া** (paranoia) (কারো কারো মতে ইহা সিজোফ্রেনিয়ার অন্তর্ভূক্ত) এবং **ইনভল্যুশনাল্ মেলন্‌কোলিয়া** (involutional melancholia) ।

(ক) **সাধারণ সিজোফ্রেনিয়া** (simple schizophrenia)—এসব রোগীরা সমস্ত বিষয়ে উৎসাহশূন্য, দৈহিক ও মানসিক ব্যবহারে অসাবধান, অপরিচ্ছন্ন এবং এদের মনোযোগ নিতান্ত অস্থির। এরা মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না এবং এদের কোন উচ্চাশা থাকে না। তবে এদের মধ্যে অমূল-প্রত্যক্ষ ও ভ্রান্তি (hallucinations and delusions) দেখা যায় না।

(খ) **হেবিফ্রেনিক্ সিজোফ্রেনিয়া** (hebephrenic schizophrenia)। এদের আচরণ কথাবার্তা অঙ্গভঙ্গী সবই অদ্ভুত, অসংলগ্ন, হাস্যকর। এরা হিহি করে বোকার মত হাসে, কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে।

(গ) **ক্যাটাটোনিক্ সিজোফ্রেনিয়া** (catatonic schizophrenia) এদের পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা যায়। এদের দেহ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মোম দিয়ে তৈরী (waxy flexibility)। একভাবে বসে আছে তো বসেই আছে। হাতখানা বাঁকিয়ে দিলে সে ভাবেই থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো কথাই বলে না বৎসর ধরে। এদের কোন প্রশ্ন করলে তারা তার জবাব দেয়না। প্রশ্ন করলে বা আদেশ দিলে সর্বদাই বলে, 'না' (negativism)। নিজের মনেই হয়তো বিড়্ বিড়্ করে বা একটু হাসে। বাইরের জগৎ এদের কাছে বিলুপ্ত। এরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে (shut-in, encapsulated, insulated)।[১৯]

(ঘ) **প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়া** (paranoid schizophrenia)— এ সব রোগীর মনে ভিত্তিহীন ও অসংলগ্ন ভ্রান্তি (delusions) থাকে যে, তাদের কেউ নিন্দা কচ্ছে, ক্ষতি কচ্ছে, প্রাণনাশের চেষ্টা কচ্ছে (delusions of

১৯ Munn, Psychology p. 190.

persecution) ইত্যাদি। অথবা এমন ভ্রান্তিও কারো কারো মধ্যে দেখা যায় যে তারা খুব বড় লোক, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, মস্ত শক্তিশালী সম্রাট (delusions of grandeur) ইত্যাদি। এরা কথনো কথনো নানা রকম দৃশ্য দেখে বা শব্দ শোনে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই (hallucinations)

প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়া ও প্যারানোয়িয়ার মধ্যে প্রভেদ করা হয়ে থাকে। প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়াতে ভ্রান্তিগুলি অসংলগ্ন এবং ব্যক্তির প্রক্ষোভের প্রকাশ বা ভাষায় প্রকাশও যুক্তিসঙ্গতিহীন এবং অনেকটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কিন্তু প্রকৃত প্যারানোয়িয়ার রোগীদের ব্যবহার বা তাদের কথাবার্তা ও প্রক্ষোভের প্রকাশ যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ এবং এরা যথেষ্ট বুদ্ধি ও চাতুর্যের পরিচয় দেয়। যে বিষয়ে এদের ভ্রান্তি (এখানেও নিন্দাত্মক ভ্রান্তি এবং নিজেকে বড় বলে কল্পনার ভ্রান্তি) তাকে কেন্দ্র করে তাদের কথাবার্তা। প্রক্ষোভ ও আচরণ এমন চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ, যে বাইরে থেকে বুঝবার কোন উপায় থাকেনা যে এরা বাতুল বা উন্মাদ! এদের কল্পিত ভ্রান্তির সমর্থনেই তাদের সমস্ত চিন্তা, ক্রিয়া, আচরণ। কাজেই এসব ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। এ সমস্ত রোগীরাই সবচেয়ে বেশী মনোবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[২০]

ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্ বা ডিমেন্সিয়াপ্রেকক্স (Manic-depressive psychoses or Dementia praecox) পূর্বে এই গুরুতর রোগের অবস্থাকে যৌবনের উন্মত্ততা (dementia praecox) বলা হত, কারণ সাধারণতঃ যৌবন বয়সেই এ অবস্থা দেখা যায়। বর্তমানে এদের ম্যানিক্ ও ডিপ্রেসিভ্ এই দুই দলে ভাগ করা হয়। আবার কোন কোন রোগীতে ম্যানিক্ অবস্থার পরই ডিপ্রেসিভ্ অবস্থা দেখা দেয়। ম্যানিক্ অবস্থায় ব্যক্তি অতিমাত্রায় উৎফুল্ল, চেঁচামেচি হৈ হল্লোড় করতে ভালবাসে। এ সব রোগীদের

২০ Patients of Paranoia present well-systematized constellations of persecutory ideas, logically elaborated on the false interpretation of some actual occurence. Emotions are consistent with the ideas expressed. The patient is suspicious and may attack his alleged persecutors. Intelligence is generally high and well retained. Regardles of the duration of the psychosis, personality deterioration is negligible.

Page. Abnormal Psychology. pp 212.-13

আনন্দ প্রকাশ ইত্যাদি অতিরিক্ত। প্রায়ই এদের প্রক্ষোভের অত্যধিক প্রকাশের সঙ্গে বিভ্রম (hallucination) ও ভ্রান্তি (delusion) যুক্ত থাকে। ম্যানিক অবস্থার রোগী বিষম চীৎকার করে। অনবরত নাচে, গান করে, কুৎসিৎ গালা-গালি করে। আর ডিপ্রেসিভ্ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষন্ন, অনুতপ্ত,—কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না, কথা বলতে চায় না; কখনো বা আত্মহত্যা করতে চায়। এখানেও প্রক্ষোভের প্রকাশ অতিরিক্ত।

মানসিক রোগের চিকিৎসার বাহ্য পদ্ধতি

মানসিক রোগগুলির সঙ্গে সাধারণতঃ সর্বক্ষেত্রেই অকারণ অত্যধিক দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, ক্লান্তিবোধ, বিষন্নতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। তা ছাড়া, দৈহিক কিছু না কিছু গ্লানি—যেমন, মাথাঘোরা, মাথায় যন্ত্রণা, দুর্বলতা, নানাস্থানে ব্যথা বেদনা, অনিদ্রা, শীর্ণতা, ইত্যাদি কষ্টের কথা প্রায় সমস্ত রোগীই বলে। চিকিৎসকেরা স্বভাবতঃই এ সব উপসর্গের জন্য প্রচলিত কতগুলি ঔষধ ব্যবহার করেন যেমন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স্, গ্লিসারো ফস্ফেটস্, ভিটামিন্ এ, সি, ডি ও বি টুয়েলভ্, হর্মোণঘটিত ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। অস্থিরতা উপশমের জন্য এবং মানসিক প্রেষ (tension) দূর করার জন্য ল্যারগ্যাক্টিল্, ইকোয়ানিল, মেপ্রেবিল, নেত্রোভিটামিন ইত্যাদি বহু ধরণের ট্রান্কুইলাইজারস্ (tranqui-lisers) এবং সোনেরিল্, সোনারগ্যান্ ইত্যাদি ঘুমের সহায়ক ভেষজ (sedative) ব্যবহৃত হয়। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে বৈদ্যুৎতরঙ্গ মস্তিষ্কে চালনা দ্বারা হঠাৎ স্নায়ু পদার্থে তীব্র আঘাত দ্বারা সংজ্ঞালোপ অথবা অনুরূপ ভাবে ইনস্যুলিন, মেট্রাজোল্ দ্বারা মস্তিষ্কের পদার্থে অকস্মাৎ তীব্র আঘাত দ্বারা সাময়িক সংজ্ঞা লোপ করা হয়। এ চিকিৎসাকে শক্ থেরাপী (shock therapy) বলা হয়। **সিজোফ্রেনিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্স্যুলিন শক্ থেরাপীতে তৎক্ষণাৎ বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, কিন্তু এ ফল অনেক সময় খুব স্থায়ী নয়। সিজোফ্রেনিক্দের চিকিৎসায় ইলেক্ট্রিক শক বা মেট্রাজোল্ শক্ দ্বারাচিকিৎসার ফল অনুকূল নয়।** গুরুতর নিউরোসিসের ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র শক্ থেরাপী সঙ্গত নয়। বর্তমানে কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক শক্ থেরাপী আদৌ ব্যবহার করা কর্তব্য, কিনা এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মানসিক চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—সমস্ত মানসিক রোগীর চিকিৎসার বেলায়ই এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানসিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার কারণ দূরীকরণ এবং যাতে রোগী প্রফুল্ল থাকে সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অতিরিক্ত সর্বপ্রকার পরিশ্রমই পরিত্যাজ্য, কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে রোগী কেবল নিজের রোগের কথাই চিন্তা করবে বা বলবে, এমন ব্যবস্থা যেন না হয়। রোগীকে প্রীতিপ্রদ, উৎসাহপ্রদ অথচ অনুত্তেজক নানা কাজ বা খেলার মধ্যে ব্যাপৃত রাখা কর্তব্য (occupational therapy, play therapy)। রোগীর খাদ্য স্নিগ্ধ লঘুপাক এবং পুষ্টিকর হাওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ যাতে উদ্বেগকর, বিরক্তিকর অথবা দুঃখ বা শোকের স্মৃতি দ্বারা বিমর্ষ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মানসিক চিকিৎসার (**psychotherapy**) মস্ত ক্ষেত্র রয়েছে সমস্ত মানসিক ব্যধির নিরাময়ে বা উপশমে। মানসিক প্রণালীতে রোগীর চিকিৎসা সহজ নয়। রোগের মূল নির্ধারণ করতে হ'লে রোগীর মনের জট কোথায়, কোন্ অবদমিত অমীমাংসিত সংঘাত তার অচেতন মনে জটিল গ্রন্থি (compl xes) সৃষ্টি করেছে, তার অনুসন্ধান যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার বংশ-পরিচয় বিশেষতঃ তার প্রত্যক্ষ ও নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কোন মানসিক রোগের ইতিহাস আছে কিনা, রোগীর স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি, রোগীর প্রকৃতি, মনের গড়ন বা ধাত, আগ্রহ অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী, বাতিক ইত্যাদি তার বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা তার পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত পরিবেশ; জীবিকা, বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন। তার জীবনের নানা তথ্য এবং তার ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে রোগীর নিজ মুখ থেকে নানা বিবরণ থেকেই যথাসাধ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।[২১]

---

২১ Some of the main areas usually covered in a case history are—

(1) Name, age, marital status, and other identifying data.

(2) Description of current symptoms, their development and possible origin.

(3) History of any previous mental disturbances.

(4) Personality make-up of the patient: habitual emotional reactions, attitude toward self and others, feelings of insecurity, level of intelligence, eccentricities, temperament, interest, etc.

মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাজ—যে রোগী চিকিৎসকের কাছে পরামর্শের জন্য এসেছে সে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন, নিজের উপর সে আস্থা হারিয়েছে, সে অসুখী ও বিপন্ন। অধিকাংশ মানসিক রোগীই নিজেদের রোগ ঝেড়ে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু অস্থিরতা, ভীরুতা, নিজেদের রোগের কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং শক্তি-ক্ষয়কর অযৌক্তিক কু-অভ্যাসের জন্যে তারা দিশাহারা হ'য়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। মানসিক রোগের চিকিৎসককে সহৃদয়, বিচক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ হবে রোগীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা (establishing rapport) তার সমস্যা, তার অসুবিধা, ইত্যাদি খোলাখুলি ভাবে এবং আবেগ-মুক্ত, যুক্তিপূর্ণ মন নিয়ে আলোচনা করা এবং রোগীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। বাস্তবিক পক্ষে মানসিক রোগের সকল চিকিৎসার জন্যেই রুগ্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস, মিথ্যা ভয় ইত্যাদি দূর করে তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ বাইরের থেকে হ'তে পারে না। ব্যক্তির নিজের সংকল্প ও চেষ্টা দ্বারাই তা সম্ভবপর। চিকিৎসকের কাজ হবে ব্যক্তির সহযোগিতায় তাকে তার রোগের প্রকৃত রূপটি বিশ্লেষণ করে

---

(5) Social adjustment : many or few friends, social and recreational activities, popularity, attitude toward associates, "lone wolf" or gregarious, etc.

(6) Early home background : emotional atmosphere of the home, outstanding childhood experiences, relationship of patient to other members of the immediate family, personality and stability of parents and siblings etc.

(7) Psycho-sexual development : early sexual experiences, attitude toward sex and members of the opposite sex, marital adjustments etc

(8) School history : amount of education, quality of work, attitude toward school, relations with teachers and other students, etc.

(9) Work history : Occupation, attitude toward job and co-workers, capacity for work, periods of unemployment, how long jobs held etc.

(10) Physical health : physical symptoms, energy level, injuries and disease of alchohol and drugs etc.

(11) Family history : personality and mental health of parents, siblings and other close relations ; unfavourable hereditary influences etc.

page Abnormal Psychology, p. 154

সমস্যা সমাধানের যুক্তিগত পথটি দেখিয়ে দেওয়া এবং তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে উৎসাহ দেওয়া। মানসিক রোগের চিকিৎসার বেলায় এ কথা বিশেষ-ভাবে সত্য যে রোগী নিজেই নিজকে আরোগ্য করে তোলে। সে তার অযৌক্তিক ভয়, সন্দেহ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিভীষিকার কাল্পনিক নিজস্যষ্ট জালের বন্ধন ছেদ করে আলোকিত বুদ্ধির দৃষ্টিতে যখন নিজ সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে পারবে, এবং সাহস করে তার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে, নিতে পারবে, তখনই তার রোগমুক্তি ঘটবে।[২২]

রোগীকে তাহার নিজ-সৃষ্ট, অযৌক্তিক ভাবাবেগের বাষ্পাচ্ছন্ন, বিভীষিকা-পূর্ণ, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সংকীর্ণ জগৎ থেকে উদ্ধার করে বহমান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-মুখী চেতনা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াই সমস্ত মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রণালীগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সংবেশন-hypnosis—মানসিক রোগের প্রথম সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-নির্ভর মানসিক প্রণালী ব্যবহার করেন শারকো (Charcot)। তিনি বহু হিষ্টিরিয়া রোগীকে সংবেশন, সম্মোহন অথবা কৃত্রিম উপায়ে অচৈতন্ত করে (hypnosis) তার অবচেতন মনের জট ছাড়াবার চেষ্টায় সফলতা অর্জন করে-ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই ফ্রএড্ এ পদ্ধতি শিক্ষা করেন। এমন অচৈতন্ত অবস্থায় রোগীর মগ্ন-চৈতন্তে বিলুপ্ত অপ্রিয় ঘটনার বিস্মৃত স্মৃতি উদ্ধার করে এবং মোহাবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে (hypnotic suggestion) বহু রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু কেন এমন ভাবে আরোগ্য ঘটে, শারকো

---

২২ An immediate aim of therapy is to free the individual of his symptoms, so that he will be happier and make better use of his energies A more fundamental aim of psycho-therapy, however, is to help the patient to regain his self confidence and to strengthen his personality so that he can definitely settle old issues and face future problems with confidence.

The function of the therapist is to help the patient to help himself. He can do this by first establishing a favourable emotional relationship or rapport with the patient. His main function is to encourage the patient to persist in his search for greater self-understanding and to help him regain his shattered self-confidence, so that the patient may have the courage to face and solve his difficulties through his own efforts and to move forward to better health.

তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন নি, যদিও কথা-প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলেছিলেন যে সমস্ত হিষ্টিরিয়া রোগের পেছনেই অবদমিত প্রবল কামেচ্ছা বর্তমান থাকে। ফ্রএডের মনে শারকোর এই কথাটি গভীর রেখাপাত করে এবং ফ্রএডের আদিমকাম ও নির্জ্ঞান তত্ত্বের মূল শারকোর প্রসঙ্গতঃ উচ্চারিত এই কথা; এবং ফ্রএডের মনোবিকলন পদ্ধতির (psycho-analyt cal method) মূলও শারকোর ব্যবহৃত সংবেশন পদ্ধতি।

সংবেশন পদ্ধতি দ্বারা মানসিক রোগীর সাময়িক স্মৃতি লোপ (amnesia), সাময়িক পক্ষাঘাত বা অঙ্গের অবশতা (temporary anaesthesia), বাস্তব কারণবিহীন অসত্য ব্যথা বেদনা অনেক সময় আশ্চর্যভাবে সেরে গেছে, এমন দেখা যায়।

কিন্তু এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল এবং এই পদ্ধতি দ্বারা যে আরোগ্য সাধন হয়, তা অনেক সময় স্থায়ী হয় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংবেশনের নানা কুফল দেখা যায়। এ জন্যে এ পদ্ধতির ব্যবহার এখন উঠে গেছে। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে এ কথাও বলা যায় যে এ দ্বারা মানসিক রোগের মূলে পৌছানো যায় না, এবং রোগীর মনে এমন অযৌক্তিক বিশ্বাস জন্মে দেওয়া হয় যে, তার রোগ কোন অপ্রাকৃত রহস্যময় কারণ-সঞ্জাত। রোগী এখানে নিজ রোগের বাস্তব কারণের পিছনে নিজস্ব যে দুর্বলতা তার মুখোমুখি হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে নিজের সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত হয় না। তথাপি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ মূল্যহীন এমন কথা চলে না।[২৩]

অভিভাবন—suggestion—প্রায় সমস্ত মানসিক রোগীরই ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয় এবং নিজের শক্তির উপর আস্থা কমে যায়। তাই এরা সাধারণত অতি সহজেই অভিভাবন দ্বারা প্রভাবিত (prone to suggestion) হয়। চিকিৎসক রোগীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রোগীর মনে অনুকূল অভিভাবন দ্বারা সাহস সঞ্চার করেন এবং তার মানসিক কু-অভ্যাস ও অযৌক্তিক আবেগ-মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গী দূর করে, আরোগ্য সম্বন্ধে রোগীকে আশাবাদী করে তোলেন। এতে অনেক সময়ই উপকার হয়। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন চিকিৎসকের উপর রোগীর অবিচলিত আস্থা এবং রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের হিতৈষী বন্ধুজনোচিত ব্যবহার ও সহানুভূতি (rapport)। কু’-এ (Coue')

২৩ Page: Abnormal Psychology-pp 160-193

কিছুদিন আগে রোগী নিজের মনেই দিনের মধ্যে কুড়িবার আস্থা ও আশাবাদিতার সঙ্গে বলবে, "আমি দিনে দিনে, সব দিক দিয়েই ভাল হয়ে উঠছি," এই আত্ম-অভিভাবন (auto-suggestion)-দ্বারা আরোগ্যের পদ্ধতিকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

এটা অবশ্যই সত্য যে, মানসিক রোগের মানসিক চিকিৎসার সব রকম প্রণালীতেই অভিভাবনের স্থান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য রোগীর মনে আস্থা ও আশাবাদিতা ফিরিয়ে আনা। অনেক বুজরুক এর সুযোগ নিয়ে নানারকম দামী যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈদ্যুৎ চিকিৎসা, এবং অন্যান্য রহস্যময় চিকিৎসার ভান করে রোগীকে প্রতারিত করে। অর্থবান রোগীরা এ জাতীয় 'অ-সাধারণ' ও 'দামী' চিকিৎসায় মনে মনে খুশী হয় এবং তাদের 'ক্ষুন্ন অহং' এতে তৃপ্তিলাভ করে। আর যারা অজ্ঞ এবং দরিদ্র, তারা মাদুলী, তাবিজ, জলপড়া, দৈবী চিকিৎসা ও "নাগা সন্ন্যাসী কর্তৃক আদিষ্ট গুপ্ত তান্ত্রিক অভিচার" ইত্যাদির ভান করে রোগীদের কাছ থেকে অর্থদোহন করে থাকেন। অবশ্য কোন সময়ই এতে উপকার হয় না তা নয়—কারণ মানসিক রোগীর আস্থা ও আশাবাদ ফিরিয়ে আনতে পারলেই রোগীর কিছুটা উপকার হয়।[২৪] কিন্তু এ চিকিৎসা অবৈজ্ঞানিক ও স্বভাবতঃই এর দ্বারা রোগী তার রোগের মূল কারণ যে তার নিজের মনের মধ্যেই আত্মসৃষ্ট বিশৃংখল অসুস্থ আবেগপুষ্ট জট, তার মুখোমুখি হয় না এবং এ উপায় দ্বারা বুদ্ধিমান্ রোগীদের পক্ষে রোগের মূলোচ্ছেদে সহায়তা করা হয় না।[২৫]

কখনো কখনো চিকিৎসক সংবেশন কালে কতগুলি অনুকূল অথবা সংশোধক ইঙ্গিত করেন এবং রোগীর মোহাবস্থা কেটে যাওয়ার অনেক পরে সে অভিভাবন অনুযায়ী ব্যক্তি কাজ করে (post-hypnotic suggestions) এবং অনেক সময় উপকৃত হয়। এসব পদ্ধতির বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ করা চলে যে, এ দ্বারা ব্যক্তিকে নিজের রোগের মূল কোথায় তা আবিষ্কার করতে অথবা নিজের চেষ্টায় নিজেকে সংশোধনে প্রবৃত্ত হতে সাহায্য করে না।[২৬]

মনঃ-সমীক্ষণ বা সাইকো-এ্যানালিসিস্—আধুনিক মানসিক

২৪ Griffith-An Introduction to Applied Psychology, p 245
২৫ Eysenck. Uses and Abuses of Psychology pp 215—217
২৬ David Stafford Clark. Psychiatry Today pp. 169-72

চিকিৎসার মূল পদ্ধতি হচ্ছে সাইকো-এ্যানালিসিস্। ফ্রএডের নামের সঙ্গে এই পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'সাইকো-এ্যানালিসিস্' কথাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) মনোবিদ্যায় এটি একটি বিশিষ্ট মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্রয়েড্ই এই মতবাদের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং নানা অভীক্ষা ও পরীক্ষার ফলে মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন। ফ্রএড্-পন্থীদের মতে মন একটি সক্রিয় জীবন্তশক্তি এবং বাল্যকালের সুস্থ বা অসুস্থ বিকাশের উপর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও পরিণতি নির্ভর করে।

(২) মনঃ-সমীক্ষণ অবচেতন মনের স্বরূপ নির্ধারণ এবং তার সঙ্গে সমগ্র ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি অভিনব উপায়।

(৩) মনঃ-সমীক্ষণ মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়, তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এবং তার চিকিৎসার একটি নূতন পদ্ধতি।

মনঃসমীক্ষণের এই তিনটি দিকই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রএডের মতে বাল্যকালের স্বাভাবিক আদিম কামাকাঙ্ক্ষা অথবা তার সঙ্গে যুক্ত কোন প্রবল প্রক্ষোভ, লোকলজ্জা বা বিষম ভয়ের জন্য অবদমিত হ'লে, অন্ধকার অবচেতন মনে গিয়ে বাসা নেয়। এই অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির সচেতন মনে মুক্তি পাওয়ার পথে নানা বাধা পায়। তার ফলে, তার অবচেতনায় অস্থির দ্বন্দ্ব (unresolved conflict) ও প্রেষ (tension) সৃষ্টি হয়। আদিম কামাকাঙ্ক্ষার একটা দিক যেমন নানা কোমলবৃত্তি, তেমনি তার বিপরীত দিকও আছে তা, হচ্ছে ঘৃণা, কলহ, ধ্বংস ও ক্ষতিকরণের প্রবৃত্তি। এই দুইই একই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে (ambivalence)। এ অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষার শক্তি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির চেতন মানসে স্বচ্ছন্দ মুক্তি না পেলে, তা অবচেতনায় জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করতে পারে এবং তা ব্যক্তির চেতনায় নানা প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। এই অবচেতনার অন্ধকারে আবদ্ধ বিশৃঙ্খল মানসশক্তি, নানাপ্রকার ভুল ভ্রান্তি (slips of the tongue and the pen) বিস্মৃতি, অকারণ বিদ্বেষ এবং স্বপ্নের মধ্যে মুক্তি খোঁজে। এসব অবস্থা স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষেও দেখা যায়। অবদমিত কামের বিশৃঙ্খল বেগ একটা ভদ্রমাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তখন তা মানসিক রোগ বলে গণ্য হয়। যতদিন

অবদমিত এই কামশক্তি চেতনমানসে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ মুক্তিলাভ না করে, ততদিন মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থার মুলোচ্ছেদ হয় না। [২৭]

সুতরাং মানসিক রোগের সুচিকিৎসা করতে হ'লে রোগের অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিক সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অশান্তি যা অচেতনার অন্ধকার গুহায় শৃঙ্খলিত হয়ে আছে, তাদের চেতনমানসে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রএড্ শারকোর সংবেশন পদ্ধতি দ্বারা হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখেছিলেন, যেখানে রোগীর বিস্মৃত অভিজ্ঞতা সংবেশন দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেখানে রোগের উপশম হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রোগের পুনরাক্রমণ দেখা যায়। ফ্রএড্ তাই বুঝেছিলেন যে সংবেশন দ্বারা রোগের মুলে পৌঁছানো যাচ্ছে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে মানসিক রোগীর বিস্মৃতির কারণ হচ্ছে অবচেতন মনে কোন বিরুদ্ধশক্তির বাধা (resistance)। কি এই বাধার স্বরূপ, কি ভাবে একে অতিক্রম করে রোগের মুলে পৌছা যায়, এ নিয়েই ফ্রএড্ গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করলেন যে সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল হচ্ছে আদিম কাম (Id)। এই আদিমকামের ধর্ম হচ্ছে অন্ধ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য অসঙ্কোচ দাবী। কিন্তু বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতাপুষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ 'অহং' (Ego) এবং কঠোর সামাজিক নীতিবোধের শাসনে (superego) অনেক আকাঙ্ক্ষাই চেতন মনে আত্মপ্রকাশে বাধাপায়।

স্বপ্নে কতগুলি আপাত নির্দোষ প্রতীকের সাহায্যে (Symbolism) একং সংক্ষেপীকরণ (Condensation), স্থানচ্যুতি (displacement) ইত্যাদি কৌশলের সহায়তায় গোপন ও অতৃপ্ত কামাকজ্ঞাগুলি ছদ্মবেশের আবরণে সামাজিক বিবেক-বুদ্ধির (Censor) প্রহরা এড়িয়ে চেতন মনে আত্মপরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। ফ্রএড্ তাই মানস রোগ চিকিৎসায় স্বপ্ন বিশ্লেষণকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মনঃ-সমীক্ষক স্বপ্নের প্রতীক এবং স্বপ্নে প্রকাশিত উপাদান ও তাদের অলংকরণ বিশ্লেষণ করে, রোগীর কামাকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি ও বিষয় এবং তার প্রকাশের পথে যে বাধা, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। তাতে রোগী তার রোগের মূল কোথায়, তা সহজেই বুঝতে পেরে, তার মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়।

২৭ Jastrow. Freud : his dream and sex theories, pp 65-67

অনেক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেতনার মসৃণ প্রবাহ ও ব্যক্তিত্বের ঐক্যের জীবন্ত গতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (dissociation)। রোগী কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের কেন্দ্রে মিথ্যা আবেগ-মিশ্র বিশৃংখলা ও বিভীষিকার জালে আবদ্ধ হয়ে (Fixation) নিজের সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে দিশাহারা হয়ে মাথা ঠুকে মরে। সমস্ত মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে চেতনার এই অবরুদ্ধতা থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তার ব্যক্তিত্বের ঐক্যকে স্রোতাপন্ন করা। এ করতে হ'লে ব্যক্তির কোন্ আবেগ-পুষ্ট কামাকাঙ্ক্ষা অবদমিত ও শৃংখলিত হয়ে আছে, তা জানা দরকার। সংবেশন দ্বারা এ কাজটি যেখানে সফল ভাবে সম্পাদিত হয়, সেখানে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু সংবেশন এ কাজটি আংশিক ভাবেই করতে সমর্থ হয় এবং তাও তার প্রকৃত কারণ ও ব্যাখ্যা না জেনে, কতকটা যান্ত্রিকভাবেই করে। ফ্রএড্ তাই তাঁর নূতন মুক্ত-অনুসঙ্গ পদ্ধতি (Free association method) দ্বারা বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই কঠিন কাজটি অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবার এক পথ দেখালেন। এই পদ্ধতিতে রোগীকে সম্মোহিত করার প্রয়োজন নেই। রোগীকে আরামে ইজি-চেয়ারে শুইয়ে, মন শান্ত ক'রে তার যে কোন কথা মনে আসে (তা সে যতই অসংলগ্ন, বা কুৎসিৎ হোক্) তা অনর্গল বলে যেতে উৎসাহ দেওয়া হয়; এক কথার সঙ্গে আর এক কথার মালা গেঁথে রোগী কোন চিন্তাভাবনা না করে, মনে কোন দ্বিধা না রেখে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় রোগী থেমে যাচ্ছে, বা কোন একটা কথা বা চিন্তার সামনে এসে যেন হোঁচট খাচ্ছে—যেন সে আর অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, কিছু যেন সে গোপন করতে চায়। সে বলে "আর কিছু মনে পড়ছে না।" এ রকম কয়েকদিন ধরে ব্যক্তির কথাগুলি (টেপ্ রেকর্ড করাতে পারলে ভাল হয়) বিশ্লেষণ করলে এ পদ্ধতিতে কুশলী মনোবিদ্ লক্ষ্য করতে পারেন, কতগুলি শব্দ বা চিন্তায় রোগী বারে বারেই ঠেকে যাচ্ছে। মনঃ-সমীক্ষক এর থেকে বুঝতে পারেন যে রোগীর মানসিক বিশৃংখলা বা বিকার কোন না কোন প্রকারে সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত আছে। রোগীর সহযোগিতায় মনঃসমীক্ষক সেই বিস্মৃত অভিজ্ঞতাকে রোগীর চেতন মানসে এনে মুক্তি দেন। রোগী তখন তার সম্মুখীন হয়ে নিজ দুর্বলতার

প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয় এবং তার সঙ্গে যুক্তিগত আবেগমুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করে সুস্থ হয়ে ওঠে। একে **মুক্ত অনুষঙ্গ** পদ্ধতি (Free association method) বলে। কারণ এখানে কথার পিঠে কথার মুক্ত অনুষঙ্গের টানে ব্যক্তির অবচেতনায় বিশৃংখলার মূলটির সন্ধান পাওয়া যায়।

এর কিছু কিছু রকমফের আছে। কখনও কখনও রোগীর রোগের ইতিহাস ও বিবরণ রোগীর কাছ থেকে শুনে এবং কিছুদিন রোগীর সঙ্গে আলাপ করে তার আস্থা অর্জন করে, মনঃসমীক্ষক রোগীর জীবনের অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক একটি শব্দের তালিকা তৈরী করে, একটি একটি শব্দ রোগীর কাছে উচ্চারণ করে, কি কথা তার মনে জাগে, তা জিজ্ঞাসা করেন; এবং রোগীকে সে বিষয়ে যা খুসী বলতে স্বাধীনতা দেন। এখানেও দেখা যায়, কতগুলি কথা সম্বন্ধে রোগীর প্রতিক্রিয়া দ্বিধাগ্রস্ত, বিশৃংখল ও আবেগ-মিশ্রিত। এখানেও কুশলী সমীক্ষক রোগীর মনের জট কোথায় তার সন্ধান পান এবং তদনুযায়ী রোগীকে নির্দেশ দেন। আধুনিক অনেক মনোবিদের মত এই যে, মানসিক রোগীদের যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ কোন অভিভাবন (Suggestion) বা নির্দেশ না দেওয়া উচিত। কারণ এ জাতীয় রোগীরা অভিভাবন দ্বারা সহজে প্রভাবিত এবং একবার একটা ধারণা এদের মাথায় ঢুকলে তা দূর করা খুব কঠিন। তাঁরা বলেন রোগীর মুখ থেকেই তার রোগের বিবরণ সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব জানতে চেষ্টা করা উচিত এবং তার চিকিৎসা ব্যাপারেও রোগীর নিজস্ব যুক্তি বিচার, বিবেচনা উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। এ পদ্ধতিকে নির্দেশবিহীন পরামর্শ (**non-directive counselling** বলা হয়[২৮]। কিন্তু আবার কোন কোন সমীক্ষক মনে করেন যে রোগীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার ধারা ও নির্দেশ দান মনঃসমীক্ষকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, না হলে বৃথা বহু সময় অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ পদ্ধতিরই আর এক রূপ হচ্ছে রোগীকে নিজের রোগের সঙ্গে জড়িত সমস্ত নিরাশা, ভয়, লজ্জা, অনুশোচনা এবং তার আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি অসঙ্কোচে

---

২৮ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য গুহ—মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার পৃঃ ৪৭০—৭২, এবং Rogers, Counselling Psychotherapy. pp 272—73 দ্রষ্টব্য।

Page. Abnormal Psychology p. 168. ও দেখতে পার।

প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া। চিকিৎসক এখানে দরদী শ্রোতা। তিনি রোগীকে নিন্দা করেন না, বা উপহাস দ্বারা তাকে লজ্জা দেন না। এ রকম করতে দিলেই তার মনের ভারটা হালকা হয়ে যায়। বন্ধু ও হিতৈষী স্থানীয় চিকিৎসকের সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে তার নিজের মনের আস্থা ফিরে আসবার সম্ভাবনা থাকে। এ পদ্ধতিকে মানসিক রেচক (mental catharsis) বলা হয় এবং রোগের প্রথম অবস্থায় এই পদ্ধতির ব্যবহারে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।[২৯] রোগী নিজের চিন্তা, ক্রিয়া বা ইচ্ছা যে অসঙ্গত, হাস্যকর বা ভিত্তিহীন তা নিজের থেকে বুঝতে শিখলে এবং নিজের সংশোধনে ইচ্ছুক হলে স্বভাবতই সুফল আশা করা যায়।[৩০]

কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা—যারা মানসিক রোগগ্রস্ত তারা অনেক সময় বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা নিজেদের কাল্পনিক রোগ ও দুর্ভাগ্য নিয়ে বিমর্ষ ও উদ্যমহীন হয়ে থাকে। তারা অপরের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক হয়, মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলে। কখনও কখনও বা তারা সত্য বা কাল্পনিক পাপ কার্যের জন্যে অতিরিক্ত পরিমাণে অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়। ফ্রএড্ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুস্থ মানুষের লক্ষণ হচ্ছে তারা কাজ করতে ও অপরকে ভালবেসে আনন্দ পেতে ভালবাসে। মেলানী ক্লীন্ এবং আরো বহু মনঃসমীক্ষক দেখেছেন যে মানসিক অসুস্থ ছেলে মেয়েরা খেলা করতে ভালবাসে না। যদিই বা খেলায় তারা যোগ দেয়, তারা একা খেলা করে অথবা ভাঙাচুরা, ধ্বংস করা, আঘাত করা ইত্যাদি মনোভাব খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। কাজেই খেলা মানসিক রোগের প্রকৃতি নিরূপণের সহায়ক (helps diagnosis)। এবং এটাও দেখা গেছে যে, কুশলী মনঃসমীক্ষকের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে খেলার মধ্য দিয়ে রোগীর অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও প্রেষ উপশম

২৯। Page, Abnormal Psychology. p 167

৩০। Once the patient has learnt to look at the disagreeable, its power to make him uncomfortable will be lessened. It is better if we have done shameful things to think of them as such, rather than pretend that we have not done them at all. A skeleton in the cupboard is a gruesome and fearful thing, but if we look at it often enough, it will become only a bag of old bones.

Ross, An enquiry into the prognosis in neuroses, p. 131

হয়; তাদের অন্তরের গুপ্ত ক্ষয়কারক বিক্ষোভগুলি আনন্দময় খেলার মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় এবং তারা ক্রমশঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাদের বিশৃংখল অনুভূতি-যুক্ত অনমনীয় স্ট্রেস ও উদ্বেগের (states of emotional tension and rigid inaction) অবস্থা কেটে যায়। খেলা হচ্ছে একটা রেচক (cotharsis) যা ভেতরের নিরুদ্ধ বিষ বাষ্পের চাপ কমিয়ে দেয়। এ ইচ্ছা পূরণের এক নির্দোষ বিকল্প উপায়। অনেক খেলা আছে 'মনে করো যেন' (as if)। খেলায় আমরা রাজা-উজীর মারি, যে অভাব জীবনে পূরণ হয় নি, খেলার মধ্য দিয়ে তা পরিপূরণের চেষ্টা করি। যে শিশু বাস্তব জীবনে তার ইচ্ছানুযায়ী যথেষ্ট কেক্ খেতে পেলো না, সে তার খেলার মধ্য দিয়ে অজস্র মন গড়া কেক্ বিতরণ করার আনন্দ ভোগ করে।[৩১] বিদ্যালয়ের অনভ্যস্ত পরিবেশ শিশুর কাছে প্রথম প্রথম সাংঘাতিক উদ্বেগকর। সেখানে শিক্ষক সহপাঠী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তা ছাড়া শিক্ষকের শাসন, তাড়না, ভর্ৎসনা, বিফলতার ভয়, পিতামাতা শিক্ষকের অতিরিক্ত প্রত্যাশা অনেক সময় ছাত্রদের মনে নানা উদ্বেগ, ভয়, অশান্তি, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অথচ এ সব প্রবল অনুভূতি প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ। ফলে মানসিক রুগ্নতা সৃষ্টি সহজেই হ'তে পারে। খেলা এ সমস্ত উদ্বেগ অশান্তিকর স্ট্রেস (stress) দূরীকরণের একটি আনন্দময় এবং নিশ্চিত সুফলপ্রসূ উপায়।[৩২]

প্রাপ্ত বয়স্কদের বেলায়ও খেলা স্ট্রেস উপশমের একটি বহুপরীক্ষিত সফল উপায়। আমাদের সকলের মধ্যেই হিংস্র, বন্য, অসভ্য ধ্বংসাত্মক সংস্কার চেতনা ভদ্র মনের নীচেই লুকিয়ে আছে। সভ্য সমাজজীবনে তাদের প্রকাশের

৩১। Gates, Jersild etc, Educational Psychology, p. 206.

৩২। When school difficulties are linked to pervasive conflict or deepseated anxieties, Psychotherapeutic approaches are needed. Play therapy for younger children may relieve anxiety and hence by reducing the drives for defense or escape, make them again free to learn. In a pair of supplementary experiments, R. E. Bills should that a group of retarded readers with personality problems improved through the use of group and individual play therapy without any remedial reading techniques.

Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment p. 556.

কোন উপায় নেই, কাজেই আমরা বিকল্পভাবে সে বন্য ইচ্ছাগুলি স্বাভাবিক উপায়ে তৃপ্ত করি, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ও আঘাত ও রক্তপাতের সম্ভাবনা-যুক্ত নানা প্রকার আসুরিক (vigorous) খেলার মধ্য দিয়ে। তাই মুষ্টিযুদ্ধ, তলোয়ার খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, হকি, ফুটবল ইত্যাদি খেলা এত জনপ্রিয়।৩৩ নানা প্রকার প্রীতিপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে চিকিৎসার মূল তত্ত্বও একই। **এজন্য দেশ ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রাও অনেক ক্ষেত্রে উপকারী। এতে পরিবেশ পরিবর্তন এবং ধর্মের সান্ত্বনা দ্বারা মনে শান্তি আসতে পারে।** অনেক মানুষের কাছেই কর্ম বা জীবিকার ক্ষেত্র, উপরওয়ালা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষেরও ক্ষেত্র। সেখানে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে সহজ হয়ে মিলতে পারছে না, নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ও কুশলতা প্রকাশ করতেও পারছে না। এমন অমীমাংসিত সংঘাত ব্যক্তির অবচেতন মনে বিশৃংখলা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে' তাকে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে। কখনো কখনো ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে নিজ অক্ষমতা-জনিত বিফলতা নিজসৃষ্ট দৈহিক অসুস্থতায় আত্মপ্রকাশ করে (psychosomatic diseases) আধুনিক মনোবিদ্‌দের মতে পেপটিক্ আল্‌সার, চর্মরোগ, আংশিক পক্ষাঘাত বা অসারতার পশ্চাতে অনেক সময়ই অবচেতন মানসিক কারণ থাকে। এসব নিউরোটিক্ বা হিষ্টিরিয়া রোগীদের, প্রীতিপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের সম্ভাবনাশূন্য ছন্দোময় কাজের মধ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলা যায়—একে occupational therapy বলা হয়। রোগীকে এমন কাজ দিতে হবে, যেখানে তার কুশলতা ও সৃজন শক্তির (creativeness) পরিচয় সে দিতে পারে এবং তার নিজের মনের হীনতাবোধ, যা তাকে পীড়া দিচ্ছিল, তা অপসারিত হতে পারে। অর্থাৎ রোগী যখন বুঝতে পারে সে সত্যি মূল্যবান্ (worth while) কিছু নিজ চেষ্টার দ্বারা করে উঠতে পারে,—যখন সে নিজের মনে জানতে পারে যে সে মূল্যহীন নয়, তখনই তার আত্মমর্যাদাবোধ ও নিজের উপর আস্থা ফিরে আসে এবং সে সুস্থ হয়ে ওঠে।

সম্মিলিত চিকিৎসা—খেলা ও কাজের মাধ্যমে—মানসিক রোগের চিকিৎসায় এ এক নূতন পরীক্ষা। এতে একজাতীয় কয়েকজন মানসিক রোগীকে

৩৩। "relatively few people would go to a prize fight for the purpose of seeing the scientific skill of the boxers, but large numbers attend these fights to see the " fighting" rather than the boxing.

Sherman Basic problems of behaviour p. 176.

একত্র নিয়ে চিকিৎসক গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে তাদের প্রত্যেকের উপসর্গ, চিকিৎসা, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সহৃদয়ভাবে খোলাখুলি আলাপ করেন। প্রত্যেক রোগীই এ আলোচনায় অন্যের রোগ ও আরোগ্যের উপায় ও চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও পরামর্শ দিতে পারে (group therapy)। এ রকম সম্মিলিত আলোচনায় অনেক সময় বেশ উপকার হয়। রোগীরা বোঝে দুর্ভাগ্যটা তার একার নয়; আরো অনেকে আছে যারা তার মতই রুগ্ণ এবং তাদের আলোচনা ও পরামর্শ দ্বারা চিকিৎসকও কখনো কখনো উপকৃত হন। রোগীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র এবং সহানুভূতির বন্ধন ফিরে পায়। এতে তারা নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জগতের সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরে, সুস্থতার পথে অগ্রসর হয়। কখনও কখনো এমন রোগী দেখা যায় যারা নিজ রোগের কথা গোপন করে রাখতেই চায়—তারা অন্যের কাছে নিজের রোগের কথা স্বীকার করতেই চায় না।

সম্মিলিতভাবে কাজ ও খেলারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এতে কয়েকজনে একত্র মিলে মিশে কোন কাজ সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করে, অথবা অ-প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আনন্দের সঙ্গে একত্র হয়।

এরই একটা রকমফের ব্যবস্থা হচ্ছে **সাইকো-ড্রামা (psychodrama)**। এমন একটি নাটক বাছা হয়, বা লেখা হয় যার মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জীবনের দ্বন্দ্ব ও অশান্তির প্রতিফলন দেখতে পায়। এখানে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এবং দশজনের সানন্দ সহযোগিতায় তাদের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব মুক্তি পেতে পারে এবং এ ভাবে মনের ভার লাঘব করে, তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।[৩৪]

ছবি আঁকা, ছবি দেখার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা—পূর্বে আমরা বুদ্ধির মাপক হিসাবে মানুষের ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে অভীক্ষার (**Goodenough's man-drawing test**) কথা উল্লেখ করেছি। এটা শুধু বুদ্ধির পরীক্ষাই নয়—মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতা পরিমাপেরও উপায়। শিশুদের বেলায় এ পরীক্ষা বিশেষ উপযোগী। কোন কোন বয়স্ক শিশু মানুষের ছবি আঁকতে দিলে, কেবলই কতগুলি অসমান বৃত্তাকারে জীবনের জটের হিজিবিজি কাটে। এতে তারা নিজেদের অন্তরের আবদ্ধ অসহায় অবস্থাই প্রকাশ করে।

৩৪। Foulkes & Anthony. Group Psychotherapy. p. 26-27.

তাদের অবরুদ্ধ ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভয় এবং লোভও অনেক সময় ছবির মধ্য দিয়েই মুক্তি পায়, কাজেই এ উপায়ে মানসিক চিকিৎসার পথও পাওয়া যায়।

গেষ্টল্ট মনোবিদ্‌দের মতে সুস্থ সাধারণ মানুষ তাদের সংবেদ বা কল্পগুলিকে টুকরো টুকরো করে বোধ করে না, তাদের একটি সমগ্রতার ঐক্যে (gestalt or pattern) বিধৃত করেই বোঝে (প্রত্যক্ষণ অধ্যায় দেখ)। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে যারা বুদ্ধির দিক থেকে হীন, অথবা যারা মানসিক দিক থেকে রুগ্‌ণ, তারা অর্থপূর্ণ ঐক্যের বন্ধনে একই কালের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে বাঁধতে পারে না। বেণ্ডার-গেষ্টল্ট্‌ টেষ্ট মানসিক রোগনির্ণয়ের একটি উপায় এবং এ দ্বারা রুগ্‌ণ শিশুদের বিচ্ছিন্ন সংবেদ ও স্মৃতি সংশ্লেষণ করতে শিক্ষা দিয়ে তাদের সুস্থ করেও তোলা যায়।[৩৫] কোহ্‌স্‌ ব্লক্‌ ডিজাইন্‌ টেষ্টের সংশোধিত সংস্করণ—যেমন, গ্রাসি ব্লক্‌ সবষ্টিট্যুসন্‌ টেষ্ট এবং হ্যাউফ্‌ম্যান্‌ ক্যাসানিন্‌ কন্‌সেপট্‌-ফরমেশন্‌ টেষ্টও অনুরূপভাবে বুদ্ধির হীনতা এবং মানসিক বিকার নির্ণয়ের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্যে দুটি অভীক্ষা আছে। **থেমাটিক্‌ এপারসেপ্‌শন্‌ টেষ্ট (T. A. T.) এবং ররশা টেষ্ট (Rorshach Tests)।** প্রথমটিতে, বিভিন্ন ভাবে অর্থ করা যেতে পারে, এমন কতগুলি ছবি দেখিয়ে, ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। তার থেকে ব্যক্তির মনের গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ররশা টেষ্টে বড় বড় কালির ফোঁটা কাগজের উপর ফেলে, কাগজটি দুভাঁজ করে চেপে দিলে, যে আঁকা-বাঁকা ছবি ওঠে, তা দেখে ব্যক্তির কি মনে হয় তা জানতে চাওয়া হয়। এর থেকেও ব্যক্তির চরিত্র ও মনের গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় (ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অধ্যায় দেখ)। এই অভীক্ষা দুটিও মানসিক রোগ নির্ণয় এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।[৩৬]

মনঃসমীক্ষণের মূল্যায়ন—যদিও স্বপ্নবিশ্লেষণ, মুক্ত অনুষঙ্গপ্রণালী এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসায় অনেক সময় আশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়, তথাপি এ পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা পোষণ করা সঙ্গত নয়। **মানসিক চিকিৎসা সাইকো-নিউরোসিস্‌ ও হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু গুরুতর**

৩৫। Anna Anastasi. Psychological Testing p. 327
৩৬। Freeman. Theory & practice of Mental testing p. 193

বাতুলতা (psychoses) চিকিৎসায় খুব উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, এমন দাবী করা চলে না। এ জাতীয় চিকিৎসা বহু সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্যও বটে। কখনো কখনো বিশ্রাম ও যত্নে মানসিক রোগ আপনা থেকেই সারে। শিশুদের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি খুব সফল হয়েছে এখন পর্যন্ত এমন দাবী করা যায় না। ফ্রএড্ মানসিক রোগের কারণ ব্যক্তির শৈশবের কোন অপ্রীতিকর বা বিহ্বল-কারক অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজেছেন এবং তাঁর মতে সমস্ত মানসিক রোগের মূল কারণ আদিম কামাকাঙ্ক্ষার অবদমন। ফ্রএডের এই সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী অনেক মনোবিদ্ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। য়ুঙ্, অ্যাড্লর্ এবং আধুনিক অনেক মনোবিদ্ মনঃসমীক্ষণের মূলতত্ত্ব গ্রহণ করলেও, কামই সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূলশক্তি এবং কামের অবদমনেই সমস্ত মানসিক বিকার ঘটে, এ কথা স্বীকার করেন নি। ক্যারেন্ হরণি (Horney) এবং আরো অনেক আধুনিক মনঃসমীক্ষক মানসিক রোগের পশ্চাতে ব্যক্তির বর্তমান প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবের উপর ফ্রএডের চেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ হরণির মত কিছুটা উদ্ধৃত করছি। হরণি বলেন অস্বস্তিকর উদ্বেগ অশান্তি দূর করতে সব মানুষই চেষ্টা করে। তবে এ বিষয়ে মানসিক সুস্থ ও মানসিক অসুস্থ মানুষদের মনের গঠন ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে। অশান্তি-উদ্বেগ নিরসনের জন্যে ব্যক্তির কাছে তিনটি পথ খোলা আছে (১) সমাজের ইচ্ছার কাছে বাধ্যতা ও নতি স্বীকার (২) বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা দ্বারা সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম এবং (৩) সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন। সাধারণ সুস্থ মানুষ অবস্থা অনুযায়ী এই তিনটির এক একটি পথ গ্রহণ করে। তার মনের গঠনে ও প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা নমনীয়তা থাকে। কিন্তু যারা মানসিক অসুস্থ, তারা একটিমাত্র অনড় অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেয়। হয় তারা সর্বদা নির্বিচারে বিনা প্রতিবাদে বাধ্য, অথবা তারা সর্বদাই অবাধ্য ও বিদ্রোহভাবাপন্ন ; অথবা তারা সমাজ সম্পর্কে উদাসীন—সমাজজীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে' নিজেদের খোলসের মধ্যে তারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। হরণির মতে এই তিন জাতের মানসিক বিকৃতি লক্ষ্যণীয়।[৩৭]

৩৭। Karen Horney, Our Inner Conflicts (1945)

হরণির মতে মানসিক রোগীর শৈশবের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার সুস্থ হয়ে ওঠার পথে তার বর্তমান সমাজজীবনের প্রভাব সামান্য নয় এবং ব্যক্তির আন্তঃ-সামাজিক সম্বন্ধের উন্নতি দ্বারাই তার রোগমুক্তি ত্বরান্বিত হয়।[৩৮]

ফ্রএড্ মনে করেন যে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা রোগীর অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্তির সচেতন মনে টেনে এনে তার মুখোমুখী মোকাবেলা করিয়ে দিতে পারলে তার বন্ধনমুক্তি ঘটে এবং রোগী তার নিজ সৃষ্ট কারাগার থেকে বাস্তব যুক্তিচালিত জগতের সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করে, সুস্থ হয়ে ওঠে। তত্ত্বের দিক থেকে এ কথা ঠিক যে রোগী যখন নিজ অশান্তির প্রকৃতি আবেগমুক্ত সাদা চোখে দেখে তাকে বিচার করতে শেখে, তখন তার মনের মিথ্যা ভয়, দুশ্চিন্তা, পাপবোধ ইত্যাদি কেটে যায় এবং তার আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মসম্মান বোধ ফিরে আসে। কিন্তু তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয়, তবে সুস্থ হয়ে উঠেও সে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে না পেরে, আবার অশান্ত ও অসুখী হয়। সুতরাং প্রতিকূল পরিবেশ পরিবর্তনের দিকেও মন দিতে হবে, তা না হলে রোগের মূলোচ্ছেদ কখনো হবে না। রাশিয়া এই কথাটির উপরই বেশী জোর দিচ্ছে—ফ্রএডীয় মনঃসমীক্ষণ প্রণালীর উপর তারা সামান্যই আস্থা স্থাপন করে। আমেরিকার কার্ল রোজার্স এবং হীলি মানসিক রোগের চিকিৎসায় রোগীর মানসিক পুনর্বাসনের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুদের মানসিক রুগ্ণতা চিকিৎসায় সে জন্য গান, নাচ খেলা এবং কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মনের ভয়, উদ্বেগ, লজ্জা দূর করার দ্বারাই বেশী সুফল আশা করা যেতে পারে।[৩৯]

৩৮। Though she has retained the concepts of repression and unconscious dynamic forces she yet rejects the theory of the libidos and Freud's biologically oriented point of view that the basic conflict in psychoneuroses is between man's inherent sexual and aggressive drives and the repressing forces of the super-ego and society. According to Horney psychoneuroses are brought about by cultural factors and are generated by disturbances in human relationships. Although acknowledging the prime significance of early childhood experiences in moulding the neurotic personality, she also recognizes the importance of conflicts in later life. Page. Abnormal Psychology. p. 195.

৩৯। C. Rogers. The clinical treatment of the problem child p 338

ক্যাসেল্ ও হাইম্যান্ ঠিকই বলেছেন যে, রোগীর অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যখন সে সচেতন ভাবে জানবে, তখনই সে আরোগ্য হয়ে যাবে, এ কথা সত্য নয়। তার নিজ অনুভূতিজীবনে যে বিশৃঙ্খলা আছে, স্ব-শাসন ও স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যেমন তাকে নিজ অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে তেমনি তার সমাজ পরিবেশের সঙ্গেও সচেতনভাবে সঙ্গতি স্থাপন করতে হবে। এই পুনর্বাসনের কাজে (rehabilitation) ব্যক্তির যুক্তি বুদ্ধি সম্ভরই যথেষ্ট নয়। সমাজেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। ব্যক্তির অনুভূতি-জীবনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াও আরো অনেক দিক আছে যা তার মানসিক রোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যথা, অশান্তিময় পারিবারিক সম্বন্ধ, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক দুশ্চিন্তা, শিক্ষা ও জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত সুযোগের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলির সমাধান না হলে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসা দ্বারা সুফল আশা করা যায় না।[৪০]

ডাঃ হীলির মতও অনুরূপ। তিনি বলেন, "কেউ হয়তো বলবেন যে একজন পুরাতন পাপীকে অন্তর্দ্বন্দ্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া খুবই পুণ্য কর্ম। কিন্তু এরকম একজন ব্যক্তির পক্ষে শান্ত সুস্থ অবস্থা লাভ করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনই (re-adjustment) সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। মনঃ সমীক্ষণের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা রোগীর রোগ নির্ণয় নির্ভুলভাবে হতে পারে, কিন্তু তার পরও ব্যক্তিকে যদি প্রতিকূল সমাজপরিবেশের মধ্যেই বাধ্য হয়ে বাস করতে হয়, তবে কিছুতেই ভালো ফল আশা করা যেতে পারে না। আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যদি আমরা উন্নততর সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারি, তবে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় সামান্য সুফলই আমরা আশা করতে পারি"।[৪১]

কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও, সমগ্র ভাবে দেখতে গেলে, শুধু মাত্র মানসিক চিকিৎসা প্রণালী দিয়ে গুরুতর মানসিক রোগের নিরাময়ের হার খুব সন্তোষ জনক নয়।

৪০। 32. মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার পৃঃ ৫০২

৪১। W. Healy. Psycho-analysis of older offendes. Am J of Ortho-Psychiatry vol. v, p 94

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়

শিশুর অব্যবস্থিততা

শিশুর অব্যবস্থিততা ও মানসিক রোগ—বর্তমানের জটিল ও যন্ত্রবহুল জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের পক্ষেও সঙ্গতিস্থাপনের কাজটা সহজ নয়। এবং এই কারণেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সত্ত্বেও (এবং সেই কারণেই) মানসিক রোগ সভ্যদেশে বেড়েই চলেছে। এটা বিধাতারই কল্যাণ আশীর্ব্বাদ যে শিশুদের মধ্যে মানসিক রোগ বা বিকৃতি প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অনেক কম। এর প্রধান কারণ এদের জীবন সরলতর। মানসিক দিক দিয়ে এরা অপরিণত। প্রতিকূল উত্তেজক অবস্থার প্রচণ্ডতা বোধ করবার শক্তি এদের মধ্যে কম, এবং পরিবার ও সমাজ স্বাভাবিক ভাবে প্রতিকূল পরিবেশের অশুভ প্রভাব থেকে শিশুদের আবরণ করে রাখে। সর্বোপরি প্রতিকূল বিভ্রান্তিকর অবস্থায় মধ্যেও সুস্থ ও অবিচলিত থাকবার প্রচুর স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকৃতিই শিশুদের দিকে থাকে। তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু শিশু অব্যবস্থিত ও মানসিক দিক থেকে রুগ্ণ হয়ে থাকে।

ব্যবস্থিততা বা সঙ্গতিস্থাপন (adjustment) ব্যাপারটাই সহজ নয়। চেষ্টা করে, ভুল করে, ঠেকে ঠেকে আঘাত খেয়ে, এর কৌশল শিখতে হয়। এক দিক থেকে দেখতে গেলে, শিশুর পক্ষে সঙ্গতি স্থাপনটা বড়দের তুলনায় কঠিন। তার কারণ পৃথিবীটা বড়দের—বড়রাই নিজেদের মতন করে এর বিধি নিষেধ, নিয়ম, রীতি, অনুষ্ঠান রচনা করে থাকেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিশেষ মতবাদ, বিভিন্ন সমাজের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ, এমন কি পরিবারের একই মধ্যেও ন্যায় অন্যায়ও ভদ্রতার নিয়ম শিশুর সরল ও অপরিণত মনের কাছে যথেষ্টই দুর্বোধ্য এবং এ সবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিশুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তা ছাড়া, বাবা এবং মা, বাড়ীর অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অনেক সময় বিপরীত আদেশ ও উপদেশ তাকে দেন, বিভিন্ন ব্যবহার তার সঙ্গে করেন, বিভিন্ন ব্যবহার তার কাছে প্রত্যাশা করেন। বাড়ীতে যে ছেলে সর্বেশ্বর, সকলের

মাথার মণি, খেলার মাঠে সেই শিশুই দেখে তাকে কেউই গ্রাহ্য করেনা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম দেয় না। এমন কি, বাবা বা মাও সকালে তাকে বল্লেন "ছোট ছেলে, তোমাদের বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই", আবার দুপুরেই মা ধমক দিয়ে বল্লেন "এত বড় ধাড়ী ছেলে, এখনও নিজ হাতে খেতে পারো না!" সুতরাং শিশু তার শিশুমন দিয়ে বড়দের জগৎটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।[১]

মানসিক সুস্থতার পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে সুস্থ বংশগতি ও জন্মগত স্ব-ভাব। অন্যদিকে যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত, যারা সংসারে ও সমাজ জীবনে অব্যবস্থিত—যারা কিছুতেই নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না—অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার মূলে আছে প্রতিকূল, রুগ্‌ণ বংশগতি। তারা জন্ম থেকেই, হীনমন্যতা, কলহপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, অস্থিরতা ও অশান্তি ও অসামাজিক আচরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য পরিবেশেরও এ ব্যাপারে অনেকখানি প্রভাব আছে তা মানতেই হবে। হিংসা, কলহ, মিথ্যাচার ও কুশ্রীতা-পূর্ণ পরিবেশে সুস্থ পরিবারের স্ব-ভাবী শিশুরাও অনুকরণ দ্বারা এবং দূষিত শিক্ষাদ্বারা গর্হিত আচরণে আকৃষ্ট হতে পারে, অভ্যস্ত হতে পারে। তবে একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে যাদের বংশগতি অসন্তোষজনক, যাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহু মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি আছে, তারা প্রতিকূল পরিবেশ দ্বারা যত সহজে মানসিক স্থৈর্য্য ও সুসঙ্গতি হারায় সুস্থ পরিবারের স্বাভাবিক ছেলেরা তত সহজে মানসিক সুস্থতা ও সুসঙ্গতি হারায় না। প্রতিকূল পরিবেশ রুগ্‌ণ বংশগতির মধ্যে যে অশুভ সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে, তাকে সহজেই স্পষ্ট ও প্রকট করে তোলে।

এ কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সুস্থ সাধারণ মানুষকেও চেষ্টা করেই সমাজের সাথে এবং নিজেদের সাথে সঙ্গতিবিধান করতে হয়।

ফ্রএড্ অব্যবস্থিততা ও মানসিক বিকৃতির মূল হিসাবে অবচেতন মনে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব (unresolved unconscious conflicts) ও জটিলগ্রন্থি (complexes)কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুকালের তীব্র অথচ স্বাভাবিক বহু আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা কৃত্রিম সমাজের শাসনে ও নিন্দায়

১। Jersild—Child psychology—p. 593.

অবদমিত হয়। তাঁর মতে এই আদিম আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছাগুলি মূলতঃ যৌনি-কেন্দ্রিক। এরা জীবনের মূল শক্তি এবং বলপূর্বক এদের সচেতন মন থেকে নির্বাসন দেওয়ার ফলে এরা মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারে গিয়ে আত্মগোপন করে। এবং এই শৃংখলিত কামাকাঙ্ক্ষাগুলি নানা ভাবে ব্যক্তির সচেতন চিন্তা, ও ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এবং এদের উপযুক্ত প্রকাশের সুযোগ না দিলে এরা সুস্থ মানসজীবনের ভিত্তিকে গোপন আঘাত দ্বারা জীর্ণ করতে থাকে। এরই ভয়ঙ্কর পরিণাম নানা মানসিক রোগ ও বিকৃতি।

শিশুর জীবনের মূল দুটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অকুণ্ঠ ভালবাসা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ। অধিকাংশ শিশুর এই দুটি মূল চাহিদা মোটামুটি মিটে থাকে বলেই, অধিকাংশ শিশু প্রতিকূল অবস্থার চাপেও মানসিক স্থিরতা ও শান্তি সম্পূর্ণ হারায় না। কিন্তু যেখানে এই দুটি মূল প্রয়োজন মেটার পথে বারে বারে কঠিন বাধা আসে, সেখানেই শিশুর অব্যবস্থিততার ও মানসিক বিকারের আশঙ্কা থাকে।

শিশুর জীবনে যে নানা সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন দিক থেকে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পরিবারের বিভিন্ন মানুষ, বিশেষতঃ পিতা মাতা ভাই বোনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সংঘাতপূর্ণ ও প্রীতিহীন হলে, আমরা সন্দেহ করতে পারি যে, ছেলেটির অব্যবস্থিত (mal-adjusted) হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। তখন তার পারিবারিক পটভূমিকায় তার 'সমস্যা'গুলিকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ পরিবারের বাইরে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে একটি ছেলে অব্যবস্থিত হতে পারে, এবং তখন তার সমস্যা বহিঃপারিবারিক পটভূমিকায় বিচার করে বুঝতে হবে।

তৃতীয়তঃ ছেলেটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সহকর্মী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অসমর্থ হতে পারে এবং তার থেকে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যখন 'সমস্যার' কথা বলি, তখন শিশুর দিক থেকেই 'সমস্যা'টি বুঝতে হবে। কাজেই সমস্যা গুলিকে শিশুর প্রয়োজন, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করতে হবে। একটা অবস্থা শিশুর অনুভূতির জীবনে কতটা নাড়া দিল এবং তার প্রবল

ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির পথে কতটা তীব্র বাধা সৃষ্টি করল, তা দিয়েই তার সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে হবে। একটা অপ্রীতিকর ঘটনা, যেমন, পরীক্ষায় ফেল করা, একটি ছেলের জীবনে গভীর বিপর্যয় এনে দিতে পারে এর ফলে সে আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। আবার আর একটি ছেলে এতে মনে দুঃখ পেলেও এর ফলে ভেঙে না পড়তে পারে।[২]

শিশুর সমস্যাকে পিতা-মাতা, শিক্ষক বা মানসিক রোগের চিকিৎসক ঠিক একই চোখে দেখেন না। পিতামাতার কাছে, অবাধ্যতা, ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া কলহ, মেজাজ মর্জি গুরুতর সমস্যা হতে পারে। প্রতিবেশীর কাছে কোন ছেলের চুরি করার অভ্যাস বা কুৎসিৎ গালাগালির অভ্যাস অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। আবার শিক্ষকের কাছে সেই ছেলেই বিষম 'সমস্যা', যে বিদ্যালয়ের নিয়ম মানেনা, যে স্কুলের আসবাবপত্র ভেঙে চুরে লোকসান করে। কিন্তু শিশু মনোবিদ্ বলবেন যে ছেলে অন্যদের সঙ্গে মিশেনা, অতিমাত্রায় অভিমানী, এবং নিজের কাল্পনিক জগতে নিজেকে গুটিয়ে রাখে, যে ছেলে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত, অকারণে বিষম ভীত, সে ছেলে, যারা অন্যছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি করে, স্কুলের জিনিষপত্রে লোকসান করে, তাদের তুলনায় গুরুতর ভাবে অব্যবস্থিত এবং তার চিকিৎসার প্রয়োজন অনেক বেশী।[৩]

বাস্তবিক পক্ষে অব্যবস্থিততার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠনের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। য়ুঙ্গ বলেন যে সব ছেলে জন্মগত ভাবে অন্তর্মুখী ও অভিমানী প্রকৃতির (introvert) তাদের মধ্যে সাইকোনিউরোসিসের সম্ভাবনা বেশী। আবার যাদের প্রকৃতির মধ্যে যুদ্ধপরতা (aggressiveness) প্রকট তারা অল্পকারণেই অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং শিক্ষক বা প্রতিবেশীর কাছে সমস্যা সৃষ্টি করে। .

য়ুঙ্গ যেমন ব্যক্তিত্বের দুটি টাইপ্-ইনট্রোভার্ট এবং এক্স্ট্রোভার্ট স্বীকার করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই বিভাগের সঙ্গে মানুষের মানসজীবনে

২। Jersild—Child Psychology, p. 592

৩। The clinicians tended to rate various forms of transgression against authority as less serious, and and poor evidences of insecurity, suspiciousness, unhappiness and fear as more serious. Wickman, Childrens' behaviour and Teacher attitude pp 124-26.

ব্যবস্থিততা-অব্যবস্থিতার সম্বন্ধ আছে, তেমনি রোজানফ্ ও মানসিক বিকারের প্রবণতার দিক থেকে মানুষদের নর্মাল (normal), হিষ্টেরয়েড (hysteriod) সাইক্লয়েড্ (cycloid) সিজয়েড্ (schizoid) আর এপিলেপটয়েড্ (epileptoid) এই কয়দলে ভাগ করেছেন ; এই টাইপগুলির নাম থেকেই বোঝা যায়, এর মধ্যে তাদের কোন জাতীয় রোগের দিকে ঝোঁক থাকে।

বর্তমান কালে শেলডন্ (Sheldon) শারীরিক-স্নায়বিক গঠনের বিভিন্নতার সঙ্গে যুক্ত করে চার রকম ব্যক্তিত্বের টাইপ নিরূপণ করেছেন। এই টাইপগুলি হচ্ছে এণ্ডোমর্ফি, মেজোমর্ফি, এক্টোমর্ফি ও নর্মাল—Endomorphy, Mesomorphy, Ectomorphy and Average or Normal. প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও স্নায়বিক গঠনেই প্রথম তিনটি উপাদান কম বা বেশী পরিমাণে থাকে। এণ্ডোমর্ফদের বলা যাবে উদর-প্রধান, মেজোমর্ফ-রা হল পেশী-প্রধান, আর এক্টোমর্ফ-রা হল চর্ম ও মস্তিক-প্রধান। এই প্রত্যেকটি উপাদান কম বেশী অনুযায়ী, ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যারা নর্মাল তাদের মধ্যে এণ্ডোমর্ফি, মেজোমর্ফি ও এক্টোমর্ফির উপাদান অনুযায়ী অনুপাত হচ্ছে ৪-৪-৪, অর্থাৎ তিনটি উপাদানই

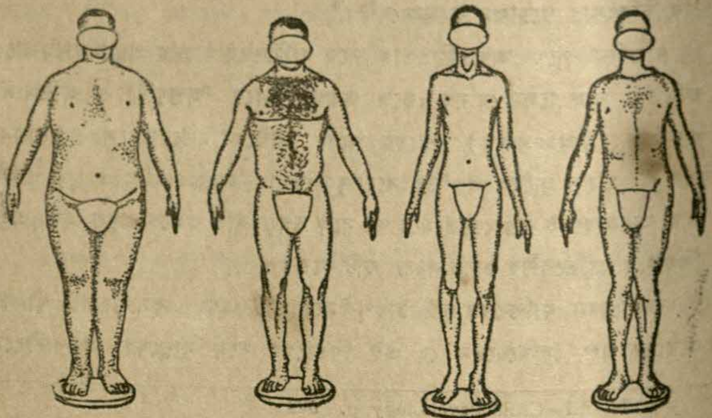

১ ২ ৩ ৪

এদের মধ্যে মাঝামাঝি এবং তিনটির পরিমাণই সমান। যারা বিশেষ ভাবেই উদর-প্রধান (endomorphs) তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত

হচ্ছে ৭-৩-১। যারা পেশী-প্রধান (mesomorphs) তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত হচ্ছে ১২-৭-১। আর চর্ম ও মস্তিষ্ক-প্রধানদের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত হচ্ছে ১-১-৭। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে (১) হচ্ছে উদর-প্রধান (endomorph), (২) হচ্ছে পেশী-প্রধান (mesomorph), (৩) হচ্ছে চর্ম ও মস্তিষ্ক-প্রধান (ectomorph) আর (৪) হচ্ছে সাধারণ বা সুস্থ মানুষ Average বা নর্মাল।

এদের মানসিক গঠনের দিক থেকে ভিসারোটনিক্ (Viscerotonic), সোমাটোটনিক্ (Somatotonic) ও সেরিব্রোটনিক্ (Cerebrotonic) ও নর্মাল (Normal) এ চার দলে ভাগ করা যায়। ভিসারোটনিক্-রা পেট মোটা, নাদুস নুদুস্ গড়ন, কিছুটা বোকা ও অলস এবং স্ফূর্তিবাজ; সোমাটোটনিক-রা মল্লবীর, খেলাধুলায় উৎসাহী, পরিশ্রমী, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান নয়। অন্যের সুখদুঃখে এরা অনেকটা উদাসীন। সেরিব্রোটনিক্-রা রোগা লম্বাটে গড়ন, বুদ্ধিপ্রধান, অভিমানী, অন্যের সঙ্গে খুব ভাল মিশুক নয়। নর্মাল-রা হোল সাধারণ মানুষ—তাদের দোষ-গুণ কোনটাই মাত্রাধিক নয়। সেল্ডনের এই টাইপ বিভাগ অনুযায়ী এক্টোমর্ফ সেরিব্রোটনিকদের ও অব্যবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

আরো এ রকম টাইপ ভাগ করা হয়েছে; আইজেনক্ এই টাইপ-ভাগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন ব্যক্তিত্বের তিনটি প্রধান তল (dimensions) আছে। তাদের বিভিন্ন সমবায়েই প্রত্যেক মানুষ বিশিষ্ট। কাজেই তাঁর মতে যাদের আমরা মানসিক বিকারগ্রস্ত বলি, তারা অন্য মানুষের থেকে আলাদা জাত এ কথা মোটেই ঠিক নয়। সব মানুষই অবস্থার বিপাকে মানসিক সুস্থতা হারাতে পারে। কেউ সহজে সামলে নিতে পারে, আবার কেউ তা পারে না। যারা পারেনা তাদেরই আমরা বলি অব্যবস্থিত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

যে সব শিশুদের নিয়ে মহা সমস্যা

(Problem Children)

শিশুর শিক্ষা ও লালন পালন কখনোই খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক শিশুই এক একটি পৃথক ব্যক্তি-কোরক। একেবারে ধরাবাঁধা নিয়ম দিয়ে শিশুদের মানুষ করে তুলতে পারা যায় না। তবুও সাধারণতঃ বাপ মা এবং শিক্ষক আনন্দের মধ্যেই তাদের গড়ে তুলেন। কিন্তু অনেক শিশু আছে যারা নানা কারণে পিতামাতা শিক্ষকদের পক্ষে মহা দুশ্চিন্তার কারণ! এ দুশ্চিন্তার কারণ বিভিন্ন। কোন কোন ছেলে আছে যারা শারীরিক রুগ্নতা, অঙ্গহীনতা, ইন্দ্রিয়ের বিকার, বুদ্ধির হীনতা ইত্যাদি কারণে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে, খেলায়, ধূলায়, কাজে অন্য দশটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আবার অন্য কিছু ছেলে আছে যারা বুদ্ধিহীন বা অঙ্গহীন নয়, অথচ যারা অবাধ্য, একগুঁয়ে, সর্বদা ঝগড়া ঝাটি করে, বা বিদ্যালয়ে কোন নিয়ম মেনে চলতে রাজী নয়, চীৎকার করে', মারামারি করে' অন্যের অশান্তির কারণ হয়। আবার কোন কোন ছেলে বেপরোয়া মিছে কথা বলে, চুরি করে, নোংরা গালাগালি করে, স্কুল থেকে পালায়, ঘরে আগুন দেয়, কখনো কখনো বা জঘন্য যৌন অপরাধে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত শিশু,—যারা অব্যবস্থিত, হিংসুটে, অবাধ্য, ক্ষীণবুদ্ধি বা অপরাধপরায়ণ, তারা পিতা-মাতা-শিক্ষক-প্রতিবেশী-সহপাঠীর কাছে 'সমস্যা' স্বরূপ। তাদেরই সাধারণ নাম হচ্ছে—Problem Children. এর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এ জাতীয় শিশুরা একটা আলাদা জাত নয়।

এ শিশুরা 'সমস্যা'র পাপ নিয়েই জন্মে নি। জন্মগত, বংশগত বা পরিবেশগত নানা কারণে এরা অব্যবস্থিত, বেমানান, অবাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক শক্তির অভাব বা বিকারের জন্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কুদৃষ্টান্ত, কুশাসন, অথবা স্নেহ-প্রীতি সহানুভূতির অভাবে তারা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা নিজের সঙ্গে বা দশের সঙ্গে সমান তালে চলতে পাচ্ছে না, এদের কাছে

জীবনটা সহজ নয়। এরা যে সকলের কাছে মহা যন্ত্রণার কারণ, সে জন্যে দোষটা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নয়। সুজান্ আইজ্যাক্স্ তাই চমৎকার করে বলেছেন, There is no problem-child, only there is a child with problems. এই শিশুর প্রাপ্য, শাসন ও শাস্তি নয়—সহানুভূতি, সুপরিচালন ও শিক্ষা। এদের জীবনের সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন, এবং তাদের কারণও নানা প্রকারের। সেই অনুযায়ী এই দুর্ভাগা শিশুদের কয়েকটি দলে সুজান্ আইজ্যাক্স্ ভাগ করেছেন :

(১) মানসিক শক্তির দিক থেকে যারা ন্যূন অথবা বিকারগ্রস্ত।

(২) বুদ্ধির ন্যূনতা ব্যতীত অন্য কারণে যারা লেখা পড়ায় পিছিয়ে পড়েছে।

(৩) যারা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অস্থির-চিত্ত (nervous, anxious), যারা নিজের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রাখে (withdrawn).

(৪) যারা অবাধ্য, বাড়ী বা স্কুল থেকে পালিয়ে যায়, অমনোযোগী, একগুঁয়ে, মিথ্যাবাদী, নানা প্রকার অপরাধ মূলক ব্যবহারে যাদের ঝোঁক।

(৫) যারা প্রায় স্থায়ীভাবেই রুগ্ন, বিশেষতঃ প্রক্ষোভ জীবনে অব্যবস্থিততাই যাদের রুগ্নতার কারণ। একটু লক্ষ্য করে এই তালিকা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, এই দলগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, এবং আরো অন্য ভাবে এদের শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে।

এবার সংক্ষেপে এ সব দলের ছেলেদের সমস্যাগুলি কি, এবং অন্যের কাছেই বা তারা কি ভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে, তা বুঝতে চেষ্টা করা যাক এবং কি ভাবে এদের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভবপর, তা আলোচনা করা যাক্।

মানসিক শক্তির দিক থেকে যারা ন্যূন বা বিকারগ্রস্ত—বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষা অনুযায়ী যে ছেলেমেয়েদের মানসিক পরিণতি বা বয়স (Mental Age.—সংক্ষেপে M. A.), তার বাস্তবিক বয়সের (Chronological Age, সংক্ষেপে C. A.) সমান সমান হবে, তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হবে। এই মাপ অনুযায়ী যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক $\left(I.\ Q. = \frac{M.A.}{C.A.} \times 100 \right)$ ১০০, তারা স্বাভাবিক। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-৯০ থেকে কম, তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে ন্যূন। আরো যারা নীচে তারা হ'ল—**ক্ষীণবুদ্ধি জড়বুদ্ধি ও নির্বোধ**—এদের সমস্যা নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রতিকার—এসব ছেলেমেয়েদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন সহানুভূতি, উৎসাহ ও সুপরিচালনা। বুদ্ধির দুর্বলতার জন্যে এদের তাড়না বা বিদ্রূপ করলে ফল বিপরীত হওয়ারই আশঙ্কা। বুদ্ধির দুর্বলতা যেখানে অল্পমাত্র, সেখানে শিশুর শক্তিসামর্থ্যের অতিরিক্ত তার কাছে প্রত্যাশা করে' পিতামাতা তাদের উদ্বেগ ও হীনতাবোধ বাড়িয়েই তোলেন। তাদের বুদ্ধির দুর্বলতা কিছুটা প্রতিপূরণ সম্ভব হতে পারে, সুপরিচালিত নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা। এখানে পিতামাতা শিক্ষকের দায়িত্ব। ছেলের শক্তি সামর্থ্য কতটা, তার রুচি ও প্রবণতা কোন দিকে, তা বুঝেই তাদের কাজ দিতে হবে এবং কাজে উৎসাহ দিতে হবে। যে কাজ তার শক্তি অনুযায়ী, সে কাজে সে সফল হলে, তাকে প্রশংসা করতে হবে। যেখানে সে বুঝতে পারছে না, এগুতে পারছে না, সেখানে ধৈর্যের সঙ্গে তার অসুবিধা বুঝে তাকে সাহায্য করতে হবে—তবেই তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।

যারা **ক্ষীণবুদ্ধি** (morons) তাদের পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয়ে কাজ করার সম্ভাবনা কম। তারা নিজেদের জীবনধারণোপযোগী স্থূল প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ক'রে কোন নূতন কাজ করতে এরা পারে না। এরা পথ ঘাটে চলাফেরা করতে পারে, মোটামুটি নিজেদের ঘর নিজেরা নিতে পারে, সহজ যান্ত্রিক, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ (simple, mechanical, repetitive acts) উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে এদের দিয়ে করানো যায়। এবং সেই পথেই এদের জীবিকার উপায় হতে পারে। ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, রাজমজুরের কাজ, সহজ সেলাইয়ের কাজ, ঝুড়ি বোনা, মাদুর তৈরী, গামছা বোনা, ঝাকড়া, ঝাঁটি, পাতা বা কাঠ দিয়ে পুতুল ইত্যাদির কাজ, এদের শেখানো যায়। এরা সাধারণতঃ সরল ও স্নেহের কাঙাল। ভালবেসে এদের সহজে বশ করা যায়। তবে সহজে এদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এদের বুদ্ধি কম বলে এরা নৈতিক বিচারের সূক্ষ্মতা ভাল বুঝতে পারেনা। তাই এদের অপরাধের পথে (চুরি, পকেট মারা, ট্রাম-পোড়ানো, মারামারি) সহজেই টেনে নেওয়া যায়। পিতামাতা ও শিক্ষকের সুপরিচালনায় এরা যদি বাল্যকাল থেকেই কতগুলি সু-অভ্যাস আয়ত্ত করে, তবে এরা পরিবার বা সমাজের পক্ষে বিপদ বা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এরা সমাজ ও পরিবারের উপযোগী নানা কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করতে পারে।

এর চেয়েও যাদের বুদ্ধি কম, তারা **জড়বুদ্ধি** (imbecils)। তাদের বয়স

থাকলেও, বুদ্ধি এক বৎসরের শিশুর চেয়ে বাড়ে না। এরা আত্মরক্ষা করতে কম জীবনের দুর্লভ প্রয়োজনগুলিই শুধু মেটাতে পারে, কিন্তু নিজে নিজে প্রাকৃতিক-সহজ ব্যাপারেও প্রয়োগ করতে পারে না। এদের সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। এদের বুদ্ধি বিচার বা দৈহিক বিশেষত্ব বিকাশই অপরিণত, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি অবিকশিত, তাই আচরণের কোন নিয়ম অস্পষ্ট। এর ফলে, এরা নিজেও যেমন সহজেই বিপদে পড়তে পারে, তেমনি নিজ বিচার আক্রমণে যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। ইংল্যান্ডের আইনে এদের মানসিক দীনতা সম্পন্ন (Mentally Deficient) বলে স্বীকার ক'রে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। (এদের বিষয়ে ১৯১৩ সালে Mental Deficiency Act পাশ করা হয়। এবং ১৯২৭ সালে আবার সে আইনের সংশোধন হয়।) এদের সাধারণই লেখাপড়া বা কার্যকরী শিক্ষা দেওয়ানো যায়। তবে এদের প্রেম ও সহানুভূতি দিয়ে এবং মন্টেসরীর মত বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে' খোটাখুটি জিনিসের কাজ দিয়ে শেখানো যেতে পারে। **অল্পবুদ্ধি** এবং নির্বোধ (imbeciles and idiots) এরা সবাই মানসিক দীনতাসম্পন্ন এই দলে পড়ে। এদের সম্পর্কে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "আঠারো বৎসরের বয়সের পূর্বে যাদের মানসিক পরিণতি অজ্ঞাত কারণে অথবা ব্যাধি বা দুর্ঘটনার ফলে স্তব্ধ হয়েছে অথবা যাদের মানসিক উন্নতি অসম্পূর্ণ"[1] অথবা 'যাদের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের অক্ষমতা তাদের অন্তর্নিহিত কোন কারণের জন্য',— অর্থাৎ যার কারণ অজ্ঞাত ও বংশগত। এ প্রকার মানসিক দীনতাকে 'মুখ্য' (primary) এবং যে মানসিক দীনতা, ব্যাধি বা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ইত্যাদি বাহ্যকারণজাত, তাকে গৌণ (secondary mental defect) বলা হয়ে থাকে।

ট্রেডগোল্ডের মতে মুখ্য মানসিক দীনতার বীজ হচ্ছে পিতামাতার শুক্র ও ডিম্বাণুর সংযোগে যে প্রথম প্রাণকোষ সৃষ্টি হয়, তার জীবকোষের অন্তর্গত ক্রোমোসোমের মধ্যে। শুক্র ও ডিম্বাণু এই দুয়ের মধ্যেই জীন-যুক্ত ক্রোমো-

১। Arrested or incomplete development of the mind existing before the age of eighteen years, whether arising from inherent causes or induced by disease or injury—'an inherent incapacity for full mental development.'

জোম্ থাকলে সন্তান অবশ্যই স্বল্পবুদ্ধি হবে। এ দুয়ের মধ্যে একটিতে ত্রুটি থাকলে মেণ্ডেলের সূত্র অনুসরণ ক'রে কিছু সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে, কিন্তু সন্তানদের এক চতুর্থাংশ সম্ভবতঃ ক্ষীণবুদ্ধি হবে। কোন চিকিৎসা দ্বারা এ ত্রুটি সংশোধনযোগ্য নয়[২]।

গৌণ কারণে যারা ক্ষীণবুদ্ধি, তাদের অনেকের বেলায় মাতার রক্তে তাদের জন্মের পূর্বে সিফিলস্ বীজাণু অথবা অত্যধিক মদ্যপান জনিত বিষ সঞ্চিত হয় এবং জাতকের মস্তিকে তা সঞ্চারিত হ'য়ে অপরিপুষ্ট স্নায়ুকোষগুলি ধ্বংস করে। কখনো কখনো গর্ভপাতের চেষ্টায় সীসক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ সেবনেও অনুরূপ কুফল দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে সংশোধনের আশা খুব সামান্য। সন্তান গর্ভে থাকা কালে মা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম না করলে, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা অথবা উত্তেজনাপূর্ণ অসংযত জীবন যাপন করলেও, সন্তানের দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ পরিণতি বিঘ্নিত হতে পারে এবং সন্তান ক্ষীণবুদ্ধি হতে পারে। প্রসব কালে ধাত্রীর অসাবধানতা বা অন্য কারণে জাতকের মস্তিষ্কে আঘাত লাগলেও অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। বাল্যকালে মস্তিষ্ক প্রদাহ (meningitis), পোলিওমাইলাইটিস্ ইত্যাদি রোগের ফলেও জন্মকালে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর স্থায়ী ভাবে বুদ্ধি হ্রাস ঘটতে পারে। এসব রোগ সংক্রামক এবং এদের নিবারণই বুদ্ধিমানের কাজ। রোগাক্রমণের পর মস্তিষ্কের স্নায়ু-পদার্থের বিকৃতি ঘটলে, তখন আর সংশোধনের পথ থাকে না।

অনেক সময় বুদ্ধির হীনতার কারণ রসক্ষরা গ্রন্থি (endocrene glands), বিশেষ করে থাইরয়েড ও পিটুইটারী গ্রন্থির ক্ষরণে ত্রুটী। এ সব ত্রুটী কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসাযোগ্য।

২। The matter follows 'Mendel's Law', which may be understood in this case to signify that, when both parents are feeble-minded, all their children, having received the factor for feeblemindedness from both parents, will be mentally deficient ; while if one parent, is normal and the other feebleminded, one quarter of the children will follow each parent and be normal & feebleminded respectively and the remaining half of the children will carry the factor for feeble-mindedness without showing any signs of its presence. But when these carriers marry and reproduce, the factor will again emerge and some of their children will be feebleminded. Bennet. Welfare of the Infant and Child. p. 240

এসব শিশুদের হাতের কাজ, গান, খেলার মধ্য দিয়েই জীবন ধারণের উপযোগী কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

যারা একেবারেই নির্বোধ (idiots) তারা নিজেদের প্রধান প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারে না—আগুন, জল, পতন ইত্যাদি বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করবারও বুদ্ধি এদের নেই! কাজেই চব্বিশ ঘণ্টাই এদের চোখে চোখে রাখতে হয়। অন্যের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন এরা সহজ কাজগুলিও নিজেরা করতে পারে না। অবশ্যই এদের সমস্যা কঠিন। এদের মনোযোগ চঞ্চল, ধৃতিশক্তি অত্যন্ত নীচু স্তরের এবং স্মৃতিও নিতান্ত দুর্বল। কাজেই এদের লেখাপড়া খুব সামান্যই অগ্রসর হ'তে পারে। এরা জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কোন কাজও শিখতে পারে না। কাজেই এই দুর্ভাগ্যদের দায়িত্ব পিতামাতা বা সমাজকেই আজীবন বহন করা ভিন্ন উপায় নেই। এদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ থাকে না, লজ্জাসরম ভয়ও কম। তবে এরা স্নেহের কাঙাল, এবং সহজেই এদের ভালবাসা দিয়ে বশ করা যায়। বহু ধৈর্য্য এবং নিবিড় সহানুভূতি দিয়ে বিশেষ উপায়ে, এদের নিজেদের জীবনযাত্রা র উপযোগী নিতান্ত সহজ কাজগুলি শেখানো যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে', এদের বাগানের কাজ, সহজ বোনা বা সেলাইর কাজ কিছু কিছু করানো যেতে পারে। সুখের বিষয় এরা দীর্ঘজীবি হয় না।

পশ্চাৎপদ শিশু—Retarded children

পিতামাতা শিক্ষক সবাই এটা চান যে তাদের সন্তানটি পড়াশোনায়, কাজে কর্মে বেশ ভাল হোক, কৃতী হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সব সময় সফল হয় না। কোন কোন ছেলে গোড়াতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে গেলেও, কিছু দিন পরে অন্য দশটি ছেলের সঙ্গে সমান তালে চলতে না পেরে পেছিয়ে যায়। এতে পিতামাতা শিক্ষকের মনস্তাপ নিতান্তই স্বাভাবিক। যে ছেলে পিছিয়ে পড়তে সুরু করল সেও ক্রমে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে, এবং নিজের উপর আস্থা হারিয়ে আরো পিছিয়েই যাবে। এ সত্যই বেদনাদায়ক ও কঠিন সমস্যা।

কিন্তু সমস্যা যতই কঠিন হোক্, তার সমাধানের চেষ্টা করতে হ'লে আগে বুঝতে হবে, এই পিছিয়ে পড়ার কারণ কি কি। কি কি বলা হোল, যেহেতু এখনই আমরা দেখব যে, কারণ একটি মাত্র নয়, বহু। কিন্তু তারও আগে জানা দরকার, পিছিয়ে-পড়া বলতে কি বোঝায়। কোন ছেলের লেখাপড়া বা কাজ বেশ কিছু

দিন ধরেই যদি অসন্তোষজনক বিবেচিত হয়, যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বা পরীক্ষায় সে বারে বারেই অসফল হচ্ছে, ফেল কচ্ছে বা নিতান্ত কম নম্বর পাচ্ছে, তা হলেই বুঝতে হবে সে ক্লাশের অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পাচ্ছে না—সে পিছিয়ে পড়ছে।

কোন ছেলে যদি গোড়ার থেকেই পিছিয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে সম্ভবতঃ সে সেই শ্রেণীর উপযুক্ত নয়। এর কারণ হতে পারে যে তার বুদ্ধি বা অন্যান্য ক্ষমতার যথোচিত পরিপুষ্টি ঘটেনি। তা হ'লে তাকে সেই ক্লাশ থেকে ছাড়িয়ে তার উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করানো উচিত। যদি বারে বারে পরিবর্তন করেও দেখা যায় সে সর্বত্রই পিছিয়ে পড়ে, তবে আশঙ্কা করা অসঙ্গত নয় যে, জন্মগত বুদ্ধির হীনতা নিয়েই সে এসেছে এবং জন্মগত হীনতা বা ত্রুটির জন্যেই সে সমবয়স্ক সতীর্থদের থেকে পিছিয়ে পড়বে। নানা অভীক্ষার মাধ্যমে এ সব ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q) এবং ব্যক্তিত্ব নির্দেশক অন্যান্য গুণের (personality traits) পরীক্ষা করানো নিতান্ত প্রয়োজন। তার বুদ্ধি ও শক্তির মাপ অনুযায়ী এবং তার রুচি ও প্রবণতা অনুসারেই তাকে তার উপযুক্ত কাজে দিতে হবে; এমন-জায়গায় দিতে হবে, যেখানে সে তার কৃতিত্ব প্রকাশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে, যাতে তার আত্মসম্মান বারে বারে ক্ষুণ্ণ না হয়।

এটাই সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় (এবং এ বিশ্বাস অহেতুক নয়) যে বুদ্ধির হীনতা বা ন্যূনতার জন্যেই ছেলেটি বা মেয়েটি পিছিয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বুদ্ধি বিষয়ে ন্যূনতা বা হীনতা কি দিয়ে বোঝা যায়? তারাই বুদ্ধিতে হীন, যারা (১) সহজে তাদের সামনে উপস্থিত উদ্দীপকের তাৎপর্য বুঝতে পারে না, যাদের বুঝতে সময় লাগে।

(২) দ্রব্য বা ঘটনার মধ্যে প্রভেদ বা মিলগুলি সহজে ধরতে পারে না।

(৩) বিশেষ থেকে সামান্যে যেতে এবং নির্বস্তুক চিন্তায় কষ্ট বোধ করে।

(৪) সহজে ভুলে যায়, বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারে না।

(৫) পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থায় কাজে লাগাতে পারে না,—নূতন অবস্থায় সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

(৬) শিক্ষিতব্য বিষয়ে রস পায় না এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুক্তিগত সম্বন্ধ খুঁজে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে না।

(৭) শিক্ষিতব্য বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না।

(৮) যাদের উৎসাহ আগ্রহের নিতান্ত অভাব।

এ সব ছেলেদের সমস্যার সমাধান করতে হ'লে, তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী, সহজ করে, বিষয় বস্তু তাদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। ধৈর্য, ক্ষমা, ও সহানুভূতির সঙ্গে এদের ত্রুটি বা অসুবিধাগুলি বুঝে, বারে বারে তাদের বোধগম্য ভাবে বিষয় বস্তুতে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু অতিরিক্ত আদর প্রশ্রয় দিলে, অথবা হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না। আসল কাজ হোল, আগ্রহ সৃষ্টি দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ। এরা মস্তিষ্কের শক্তিতে কিছুটা হীন, সেই জন্যেই এদের সাহায্য ও পরিচালনার প্রয়োজন অন্যের তুলনায় বেশী। কিন্তু এদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি ক'রে পরিশ্রমে উৎসাহ দিতে পারলে, এরা ধারে না কাটলেও, ভারে কাটতে পারে। এদের সম্পর্কে এই কথাটিই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মিত শ্রমের সু-অভ্যাস গঠন ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা পাথরও ক্ষয়ে যায়। ঠিক নিয়ম করে এদের পড়তে শেখাতে হবে এবং বারে বারে অনুশীলন করাতে হ'বে। কিন্তু এ বিষয়েও সাবধান হ'তে হবে যাতে এরা না বুঝে, তোতা পাখীর মত মুখস্থ না করে।

কিন্তু কোন ছেলে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়লেই, তা জন্মগত বুদ্ধির হীনতার জন্যে, এ সিদ্ধান্ত করা চলে না। অনেক সময় এই পিছিয়ে পড়ার কারণ শারীরিক। যে ছেলে ভাল চোখে দেখে না, বা ভাল কানে শোনে না, সে হয়তো ক্লাশে বোর্ডে লেখা দেখতে পায় না, অথবা শিক্ষকের কথা স্পষ্ট শুনতে পায় না। এ রকম অবস্থায় ছেলেটি যদি পিছিয়ে পড়ে, তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণে বিপর্যয় বুদ্ধির অসম্পূর্ণ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যে দুটি গ্রন্থি এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে দায়ী, তা হচ্ছে থাইরয়েড্ ও পিটুইট্যারী। থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্ষরণ স্বল্প হ'লে শিশু দৈহিক দিক দিয়ে যেমন অপুষ্ট হয়, মানসিক দিক থেকেও তার বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। থাইরয়েড্ গ্রন্থি দেহের কোষ, খাদ্য ও পানীয়স্থ আয়োডিনকে থাইরক্সিন্ নামে একটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করে। এই পদার্থটি দেহের কোষগুলির সংগঠন ও ধ্বংসক্রিয়ার মধ্যে সমতা বিধান ক'রে, দেহ-মনের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণ স্বল্প হলে শিশুর দেহের আর পুষ্টি হয় না, এবং এই খর্বাকৃতি মানুষদের cretins বলা হয়। বুদ্ধির দিক দিয়েও বিকাশ রুদ্ধ হয় এবং দশ বার বৎসর

বয়স হ'লেও, এদের বুদ্ধি চার পাঁচ বৎসরের ছেলের চেয়ে বেশী কখনও হয় না। এ জাতীয় ছেলে মেয়েরা স্বভাবতঃই লেখাপড়া ও কাজে অনগ্রসর হয় এবং সাধারণতঃ এরা বেশী দিন বাঁচে না। মেষের থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড খাইয়ে দেখে, এদের অনেক সময় আশ্চর্য উপকার হয়, কিন্তু তা সাময়িক মাত্র।

পিটুইট্যারী সমস্ত গ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এজন্যে একে the Master gland বলা হয়। বিশেষ করে, থাইরয়েডের সঙ্গে এর সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির দৈহিক সুস্থতা ও মানসিক বিকাশের কাজে এই গ্রন্থির প্রভাব রয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থির ক্রিয়ায় বিপর্যয় ঘটলে, শিশু স্থায়ী ভাবে বুদ্ধির দিক দিয়ে পেছিয়ে পড়বে এমন আশঙ্কা থাকে। দূষিত টন্‌সিল্‌ ও এ্যাডেনয়েড্‌স্‌ অনেক শিশুর পুনঃ পুনঃ রুগ্নতার একটি প্রধান কারণ। এর ফলে এ সব ছেলে-মেয়েরা শরীরের পুষ্টি ও মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। অনেক সময় পিতামাতার ধারণা, যে সব ছেলেমেয়েরা সর্দি কাশিতে বারে বারে ভোগে, যাদের এ্যালার্জির ধাত, তাদের টন্‌সিল্‌ ও এ্যাডেনয়েড্‌ অস্ত্রোপচার করে ফেলে দেওয়া উচিত। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। টন্‌সিল ও এ্যাডেনয়েড্‌স্‌ প্রাণীর দেহে প্রকৃতি দিয়েছে, নানা প্রকার জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। কিন্তু শহরের দূষিত জল, বাতাস ও খাদ্যের সংস্পর্শে এই উপকারী যন্ত্রগুলি নিজেরাই দূষিত হয় এবং তখন তারাই নানা রোগের কারণ হয়। বিশেষ দূষিত হ'লে, অবশ্যই এদের অস্ত্রোপচার করে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়, টন্‌সিল ফুললে বা ব্যথা হলেই অস্ত্রোপচার উচিত নয়। বহু বিবেচনা করে' ফেলে দেওয়া দরকার। ফেলে দিলেও, এরা আবার নূতন করে গজায় এবং মুখ, গলা, নাক, কান নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না রাখলে, আবারও তারা দূষিত হবে এমন আশঙ্কা থাকে। এ দুটি যন্ত্র নিয়ে যন্ত্রণা সাধারণতঃ সাত আট বৎসর অবধি থাকে। স্থায়ী ভাবে না হ'লেও এই কারণে ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়তে পারে।

পোলিও, মেনিন্‌জাইটিস্‌, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগ মস্তিষ্কের স্নায়ু পদার্থের হানি করতে পারে এবং এর ফলে শিশু পিছিয়ে পড়তে পারে।

কাজেই সমস্ত অগ্রসর দেশেই, বিশেষতঃ রাশিয়ায়, কোন ছেলে বা মেয়ে পিছিয়ে পড়তে থাকলেই, তাকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়, তার ইন্দ্রিয়গুলিতে কোন দোষ আছে কি না, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশী ও আন্তর যন্ত্রগুলি এবং

হৃদপিণ্ড, গ্রন্থি ও টন্‌সিল সব এ্যাডেনয়েড, প্রভৃতিগুলি সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে কি না। এমনও হ'তে পারে, ছেলেটি ঘাড়ে ঘাড়ে রোগে ভোগে, স্কুল নিয়মিত আসতে পারে না এবং দুর্বল শরীরের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারে না, বা লেখাপড়ার ব্যাপারে যতটা মন দেওয়া দরকার তা দিতে পারে না। এর সংশোধন না হ'লে ছেলে তো পিছিয়ে পড়বেই।

শিশুর পিছিয়ে পড়ার জন্যে পিতামাতা শিক্ষকও দায়ী হতে পারেন—

যদিও এটা মনে করা যেতে পারে যে পিতামাতা শিক্ষক তাদের সন্তান যাতে যথারীতি এগিয়ে যায় সে জন্যে সর্বাবস্থাই যথাসাধ্য করবেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সন্তানের পিছিয়ে পড়ার জন্যে তাঁরাই দায়ী হ'তে পারেন। কখনো কখনো দেখা যায় যে, পিতামাতা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েই তাঁদের সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁরা খোঁজ নেন না, ছেলের পড়া শোনা কেমন এগোচ্ছে, পড়া বুঝতে পারছে কিনা। শিক্ষকও অনেক সময় সমস্ত ছেলের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না, কোন্ ছেলের কোথায় অসুবিধা আছে, তা খোঁজ নেন না। কাজেই উৎসাহের অভাবে যে সব ছেলে একবার পিছিয়ে পড়লো, তারা ক্রমেই আরো হয়তো পিছিয়ে পড়তে থাকবে। ছোটদের পক্ষে পিতামাতা শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া উৎসাহ ও প্রশংসার মূল্য অপরিসীম। পিতামাতা শিক্ষক যদি তাদের অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে খোঁজখবর করেন, তাদের সামনে উৎসাহ দিলে, তারা এগিয়ে যেতে ভরসা পায়। কখনো কখনো আবার দেখা যায়, তারা পড়া তৈরী করতে না পারলে বা পরীক্ষায় ভাল ফল না করতে পারলে, পিতামাতা শিক্ষক অসন্তুষ্ট হন, অধৈর্য হ'য়ে শাসন পীড়ন করেন। তার ফলে শিশু ভয় পেয়ে যায়, তার মনের মধ্যে হীনতাবোধ প্রবেশ করে, তার উদ্যমকে বরং আরো দুর্বল করে।

আবার এমনও কখনো কখনো হয় যে, পিতা, মাতা, শিক্ষক সন্তান ও ছাত্রের কাছে অতিরিক্ত বেশী প্রত্যাশা করেন, তার শক্তি সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে, তাকে বিষম তাড়া দিতে থাকেন। তাতে শিশুদের মনে অকারণ উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং এই উদ্বেগে বিচলিত হয়ে, সে যা করতে পারতো, তাও সে করতে পারে না। তা ছাড়া তারা অনেক সময় অযথা আত্মধিক্কারে পীড়িত হয়। এমন মানসিক অবস্থা সকল সামর্থ্য উদ্যমের পক্ষে

মস্ত বাধা। পিতামাতা শিক্ষককে জানতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুর দৈহিক-মানসিক পরিণতির হার সমান নয় এবং দেহ মনে উপযুক্ত পরিণতি যখন এসেছে, তখনই শিশু কোন বিষয় উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করতে উৎসুক হবে। তার পূর্বে জোর করে তাকে দিগ্‌গজ করে তুলতে চেষ্টা করলে, ফল বিপরীতই হবে। ছোটদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতা শিক্ষককে স্নেহশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন, ও উদ্বেগশূন্য হতে হবে। শিশুর মনের পরিণতি ও পরিবর্তন এবং বিদ্যাদানের অনুকূল মুহূর্তগুলি সাবধানে লক্ষ্য করে, শিশুর শক্তি, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং এ আশা করা শিক্ষকের ভুল হবে, যে চেষ্টা করলেই সব ছেলেকে প্রতিভাবান্ করে তোলা যাবে। প্রত্যেকটি ছেলেই কিছু ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে না। প্রত্যেকটি ছেলে তার সাধ্যমত অগ্রসর হ'তে পারছে কিনা, সে দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে তাকে যথোচিত সাহায্য করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে, তার সমস্ত কঠিন পড়া মুখস্থ করিয়ে দিয়ে, তার কঠিন অঙ্কগুলি কষে দিয়ে, তার সমস্ত অসুবিধার দায় কাঁধে তুলে নিলে, শিশুর সব চেয়ে বেশী অপকারই বরং করা হবে, তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করা হবে।

আর এক বিষয়েও সাবধান হওয়া দরকার। অনেক সময় পিতামাতা কোন একটি ছেলেমেয়েকে বেশী ভালবাসেন কিন্তু অন্যটিকে তত ভালবাসেন না এবং তাকে সর্বদাই বলেন "দ্যাখতো ও কেমন ভাল, কেমন ওর বুদ্ধি, আর তুই ... ?" অথবা শিক্ষকের কাছে কয়েকটি ছাত্র বিশেষ প্রিয়পাত্র, কিন্তু অন্যদের প্রতি তিনি উদাসীন বা অপ্রসন্ন। এতে শিশুদের অনুভূতির জীবনে অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শিশুরা ভালবাসা খুব বোঝে এবং অবহেলা বা অবিচারের কল্পনা তাদের তীক্ষ্ণভাবে পীড়িত করে। শিশুর মনে এই অবিচারের কল্পনা-জনিত অভিমান ও তিক্ততা, তাকে অশান্ত করে তোলে এবং তার মনের মধ্যে নেতিবাচক ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করে। এমন অশান্ত বিরূপ মনোভাব থাকলে, তাদের পড়াশুনা কাজ সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিতামাতা শিক্ষকের অকৃত্রিম স্নেহ ও উৎসাহ এবং অপক্ষপাত আদর্শনিষ্ঠ আচরণ নিতান্ত বুদ্ধিহীন শিশুকেও অনেকখানি এগিয়ে দেয়। কিন্তু যে শিক্ষক বা পিতামাতার প্রতি সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়েছে, তাদের উপদেশ সে গ্রহণ করবে না, তখন

শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান, তার প্রতি তার হৃদয়ের টান কখনই থাকবে না, এবং সেই বিষয়ে সে পিছিয়ে পড়বেই।

অনেক সময় পিতামাতা বা শিক্ষক বুদ্ধিমান্ ছাত্রের সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু প্রত্যাশা রাখেন, যা ছাত্রটির শক্তির বাইরে। ফলে সে অযথা উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হয় এবং তাতে তার স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

সর্বশেষ গৃহ-পরিবেশ শুচি ও শান্ত হতে হবে। যেখানে পিতামাতার মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, সেখানে শিশুর মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তার নিরাপত্তা-বোধ বিঘ্নিত হয়। সে অযথা উদ্বেগে পীড়িত হয় এবং লেখাপড়া কাজে সে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তা ছাড়া পরিবারের আর্থিক অবস্থা যদি খারাপ হয়, জীবনের মৌলিক অভাবগুলি দূর করার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে শিশু দেহের দিক দিয়েই শুধু অপুষ্ট হবে না, বুদ্ধির দিক দিয়েও সে হীন হয়ে পড়বে।

দুরন্ত ছেলে—The aggressive child

ছেলেমানুষদের দুরন্তপনা পিতামাতা প্রতিবেশী কিছুটা ক্ষমার চোখে দেখেন। এই ক্ষমার্হ দুরন্তপনার মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। কিন্তু কোন কোন ছেলে আছে যাদের দুরন্তপনা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়; এমন সব ছেলে আছে, যাদের দুরন্তপনা নিছক অতিরিক্ত প্রাণশক্তির নির্দোষ প্রকাশ মাত্র নয়। এদের দুরন্তপনার সঙ্গে থাকে ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ও অন্য ছেলেমেয়েদের প্রতি আক্রমণাত্মক অথবা নিষ্ঠুরতা-সূচক আচরণ। এ সব ছেলেরা বাড়ীতে জিনিষপত্র ভেঙে চুরমার করে, নষ্ট করে, প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফল চুরি করে, ঢিল মেরে রাস্তার আলো ধ্বংস করে, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করে অশান্তি সৃষ্টি করে। স্কুলেও এই ছেলে শান্ত হয়ে বসে থাকেনা, সহপাঠিদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, তাদের খাতা পেন্সিল কেড়ে নেয়, মারামারি করে, বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। কোন কোন ছেলে আবার গালাগালিতে ওস্তাদ। স্বভাবতঃই এই জাতীয় ছেলেরা পিতামাতা শিক্ষকের পক্ষে দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপের কারণ। এরা বাস্তবিকই 'সমস্যা'।

প্রথমে বলেছি **বাড়ন্ত শিশুদের পক্ষে কিছুটা দুরন্তপনা স্বাভাবিক।** শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে কিছুটা অসংযম ও বিশৃঙ্খলা থাকবেই। তাদের দেহের প্রাণশক্তিকে তখনও তারা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ করতে

শেখেনি ; সামাজিক আচরণ ও 'ভদ্রতার' পাঠ এখনও তাদের আয়ত্ত হয়নি। কাজেই এই উদ্দামতা কিছুটা মেনে নিতেই হবে। বরং যেখানে দেখা যাবে, কোন ছেলে বড়ই শান্ত, বড়ই ঠাণ্ডা, বড়ই বাধ্য, সেখানেই বরং কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ আছে। **সুস্থ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কিছুটা অবাধ্যতা, সবলে বাধা দূর করা ও নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা থাকে।** এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে, শান্তশিষ্ট নিতান্ত বাধ্য ভাল ছেলে তৈরী করা নয়।

গেসেল্ ইন্‌ষ্টিট্যুটের ডাঃ ইলজ্ ও ডাঃ এমস্-এর পরিচালনায় মনোবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা বহু সমাজ-কর্মী, সহস্র সহস্র বিভিন্ন বয়সের শিশুদের বেড়ে ওঠবার কালের শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনগুলি সযত্নে লক্ষ্য করে' লিপিবদ্ধ করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী এই সব বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দেহের বৃদ্ধির গতিটা একটানা স্বচ্ছন্দভাবে হয় না। এক একটা বয়সে শরীর হঠাৎ বেড়ে ওঠে, তার পর আবার একটা আপেক্ষিক স্থিরতার অবস্থা আসে। আবার একটা বৃদ্ধির চাড় (spurt) দেখা যায় ; তার পরে পুনরায় একটা ধীর মন্থর গতি লক্ষ্য করা যায়। যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধির এই জোয়ার-ভাঁটা চলে। যে যে বয়সটা 'হঠাৎ বেড়ে যাবার', সেই সেই বয়সটায় শিশুর মনটা যেন তার দেহের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। এই স্তরগুলিতে শিশু অশান্ত, দুরন্ত, মেজাজ মর্জি সম্পন্ন হয়। আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে, সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে, নয় বছরের, এগার বছরের ও পনেরো বছরের কাছাকাছি শিশুদের এই অশান্ত, দুরন্ত অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি স্থায়ী অবস্থা নয় এবং যথা সময়েই শিশুর ব্যবহার শান্ত, ভদ্র ও সুশৃঙ্খল হয়ে আসে।[৩]

আগেকার দিনে বাপ মা ছেলেদের এ রকম ব্যবহার দেখলে বলতেন, ছেলে বজ্জাত হয়ে গেছে এবং তাকে বিষম মার লাগিয়ে সায়েস্তা করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বর্তমানকালের মনোবিজ্ঞানী বলেন, এটা ছেলেকে শোধরাবার ভুল পথ। বুঝতে হবে ছেলের এরকম ব্যবহার কেন? এর মধ্য দিয়ে তার মনের কোন আকাঙ্ক্ষা সে মেটাতে চাচ্ছে? কেন সে এমন ব্যবহার করে?

৩। Dr. Frances Ilg & Dr, Louise Ames—The Gesell Institute's Child Behaviour, pp, 22-23

এর পশ্চাতে যে মনের গড়ন ক্রিয়া করছে, তা কি জন্ম ও বংশগত স্থায়ী কোন কারণে, অথবা শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে তার এ আচরণ?' এর কারণটি দূর করতে পারলে, তবেই ছেলের সংশোধন হবে, শুধু শাস্তি ও তাড়নায় এর প্রতিকার হবে না।

শিশুর অন্তর, **অবাঞ্ছিত আচরণের পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ** অনেক সময় ক্রিয়া করে, সেটা হচ্ছে যে, **শিশু এই 'অসভ্য' আচরণ দ্বারা পিতা মাতা শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়।** সম্ভবতঃ তার মনে এ অতৃপ্তি ও অভিমান তার নিজের মনের অজানিতেই জমে উঠেছে যে, সে তার প্রাপ্য আদর, প্রাপ্য মূল্য ও মর্যাদা বড়দের কাছ থেকে পাচ্ছে না। তার কুৎসিৎ আচরণ হচ্ছে এই অবিচারের বিরুদ্ধে শিশুসুলভ প্রতিবাদ। সে এই আচরণ দিয়ে নিজের ক্ষমতাটা প্রমাণ করতে চায়। সে বোঝাতে চায় সে অবহেলার পাত্র নয়! এটা তার নিজ ব্যক্তিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অক্ষম উপায়। এতে সন্দেহ নেই যে তার আচরণের দ্বারা বড়দের সে চমকে দিতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই এই ব্যবহার দ্বারা তার অন্তরের কোন জরুরী প্রয়োজন সে মেটাতে পেরেছে। অনেক সময়ই **শিশুর এই আক্রমণাত্মক ধ্বংসাত্মক ব্যবহার তার নিরাপত্তাবোধের অভাব সূচনা করে।** সম্ভবতঃ এমন ছেলের গৃহপরিবেশ অশান্তিপূর্ণ, সেখানে সে স্বস্তিবোধ করে না। হয়তো মাতাপিতার সঙ্গে তার সহজ স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক নেই। এমনও হতে পারে তার পিতামাতার মধ্যে সম্পর্কটি অসন্তোষজনক, কাজেই ঘরে সে শান্তি পায় না। এমনও হওয়া অসম্ভব নয়, যে বাবা বা মা অথবা তাদের দুজনের প্রতিই একটা অবচেতন বিদ্বেষের সম্পর্ক তার নির্জ্ঞান মনে গড়ে উঠেছে। ধ্বংসাত্মক আচরণের মধ্য দিয়ে বিকল্পভাবে তাদেরই আঘাত করতে সে চাচ্ছে। ঘরে আর একটি নূতন ভাই বা বোনের আবির্ভাব অনেকদিন পরে হ'লে, সে বোধ করতে পারে যে তার আদর কমে গেছে এবং তার আচরণ সেই নূতন অবাঞ্ছিত আগন্তুকের (অথবা তার জন্যে দায়ী পিতামাতার) বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এ জাতীয় আচরণের পশ্চাতে এরকম কোন মন-স্তাত্ত্বিক কারণ থাকা খুবই সম্ভবপর, এবং তা অনুসন্ধান করে' বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অবশ্য জন্মগত কারণও থাকতে পারে। সবাই একরকম 'ধাত' নিয়ে জন্মায় না। দেহের গড়নে যেমন, মনের গড়নেও তেমন, মানুষে মানুষে প্রভেদ

থাকেই। কেউবা শান্ত কেউ বা চঞ্চল, কেউ হাসিখুশী, কেউ গোমরা-মুখো, কেউ গম্ভীর, কেউ বেশ ঠাণ্ডা, শিষ্ট আর কেউ বা শিশুকালেই রাগী, ধৈর্যহীন। কাজেই যে সব ছেলে বিষম দুরন্তপনা করে, তাদের জন্মগত দেহ-মনের গঠনেও তার কারণ থাকতে পারে। স্নায়বিক অস্থির গঠনও বহুক্ষেত্রে অসঙ্গত আচরণের জন্যে দায়ী। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সুশাসন ও সুপরিচালন দ্বারা কিছুটা সংশোধন হ'লেও, ব্যক্তিত্বের মৌল গঠনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন কখনো সম্ভবপর হয় না।

সুশাসনের অভাব এবং অতিরিক্ত শাসন দুইই ছোটদের নেতি-বাচক, ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারের কারণ হতে পারে। যে ছেলে কেবলই প্রশ্রয় পায়,—যে কোন জিনিষ চাওয়া মাত্রই পায়, সে বেশী স্বার্থপর হয়ে বেড়ে ওঠে এবং জিনিষের মূল্যও সে বোঝে না; কোন জিনিষ পেতে গেলে যোগ্যতা দ্বারা তা অর্জন করতে হবে, মানুষের শ্রমদ্বারা যা সৃষ্ট হয়েছে তাকে উপযুক্ত যত্ন দ্বারা রক্ষা করতে হয়, এই ধারণা শিক্ষাসাপেক্ষ। এ বিষয়ে পিতামাতার, বিশেষ দায়িত্ব আছে।

আবার বিপরীত ভাবে, যেখানে ছেলেমেয়েদের কোন সখই মেটানো হয় না, তাদের আদর করে কেউ খেলনা, বল, বাঁশী, লজেন্স কিনে দেয় না, সেখানে তারা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করে। শিশুর পক্ষে লোভ খুবই স্বাভাবিক। তাই বঞ্চিত লুব্ধ শিশু অন্য ছেলেমেয়ের জিনিষ কেড়ে নিতে চাইবে; আর একটু বড় হ'লে চুরি করবার সুযোগ খুঁজবে। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করবে, তাদের জিনিষ ভাঙতে, নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। এসব ক্ষেত্রেও সুশাসন ও সু-অভ্যাস গঠন দ্বারাই সংশোধন সম্ভব। এর জন্যে সময়ে যেমন তাদের দাবী মেটাতে হবে, তাদের মিষ্টিমুখে বোঝাতেও হবে; আবার অতিরিক্ত অন্যায় আবদার করলে, শাসনও করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের অপরাধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। বড়দের নৈতিক মান দিয়ে তাদের বিচার করা ভুল। শিশুদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ অপরিণত, তাদের সদাচরণ শিক্ষা সবে সুরু হয়েছে, জিনিষের মূল্য তারা বোঝে না, অন্যের ব্যথা, অসুবিধা তারা চিন্তা করে না। তাদের কল্পনা অতি-মাত্রায় সজীব ও চঞ্চল। বড় হবার, বাহাদুরী দেখাবার ইচ্ছা প্রবল, কাজেই তারা এতটুকু অনুতপ্ত না হয়েই মিথ্যা কথা বলে, গালাগালি দেয়, চুরি করে;

অন্য ছেলেমেয়েকে মারধোর করে, জিনিষপত্র ভেঙে চুরে লোকসান করে। ধৈর্য ও স্নেহ দিয়ে তাদের সমাজ জীবনের রীতিনীতি শেখাতে হবে, সংযত করতে হবে, সাবধান করতে হবে ; অতিরিক্ত অবাধ্যতা বা বজ্জাতি করলে শাস্তি দিতে হবে। সব শিশুকে একই অপরিবর্তনীয় নিয়ম দিয়ে গঠন করা যায় না। প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি, তার পরিণতির স্তর, তার প্রয়োজন, শক্তি, রুচি ও প্রবণতা দিয়েই স্থির করতে হবে তার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার সঙ্গত। যিনি শাসন করছেন, তার প্রতি শিশুর শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকলে তবেই শিশু শাসন মানে।

ছোটদের শাসনের বেলায় নেতিবাচক 'ওটা কোর না' হুকুমটা যথাসম্ভব কম করতে হবে। কিন্তু যেখানে নিষেধ অপরিহার্য, সেখানে তা জোরের সঙ্গে, দ্বিধাহীন ভাবেই করতে হবে। যতটা সম্ভব গঠনাত্মক, ইতিবাচক উৎসাহাত্মক উপদেশই ভাল, যেমন, 'চল এবার আমরা সামনের বাগানটার আগাছা পরিষ্কার করবো।' ছোটদের বজ্জাতি থেকে দূরে রাখতে হ'লে তাদের উপযুক্ত গঠনাত্মক কাজের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে। বাবা মা দাদা শিক্ষক ওদের খেলায় ও কাজে অংশীদার হ'লে ওরা খুসী হয়, উৎসাহিত হয়, সংযত হয়। কিন্তু কিছু কিছু দায়িত্বও ওদের দিতে হবে ; তাতে ওদের ধ্বংসাত্মক বাড়তি জীবনীশক্তিকে গঠনাত্মক ব্যক্তিত্ববিকাশক কাজের দিকে মোড় ফেরানো যাবে।

পীড়নাত্মক বহিরঙ্গ শাসনের ভয় শিশুকে অন্যায় থেকে দূ'রে রাখতে পারে। কিন্তু তার ফল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যেখানে শিশু আন্তরিক শুভবুদ্ধির প্রেরণায় অন্যায় কাজে বিরত হয় সেখানেই স্থায়ী উপকার হয়। সমস্ত শিক্ষারই উদ্দেশ্য স্ব-শাসনের অভ্যাস গঠন করা। মনোবিদরা দেখেছেন শাস্তি দিয়ে যে ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক সুফল পাওয়া যায় প্রশংসা দিয়ে।

যে সব ছেলেরা অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, মারধোর করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, এমন ছেলেকে 'আড়ি' করে দেওয়া, তাকে নিজ আচরণ সংশোধন না করা অবধি খেলতে না দেওয়া। যে সব ছেলে ছুরি, কাঁচি দিয়ে জিনিষপত্র কেটে নষ্ট করে, তাদের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য ধারালো এসব অস্ত্র সরিয়ে রাখতে হবে। যে ছেলে অন্যের পুতুল ভেঙেছে, তার পুতুল কেড়ে নিয়ে অন্যের ক্ষতিপূরণ করতে শেখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভোঁতা ছুরি কাঁচি দিয়ে, কাগজের ঘুড়ি, নৌকা, বা পুতুলের জামাকাপড় তৈরী করতে শেখাতে হবে; যারা কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে তাদের কাদাকাটি দিয়ে

ঘর বাড়ী পুতুল তৈরী করতেও উৎসাহ দিতে হবে। তাদের ছোট একটি দলের নেতা করে কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে অনেক সময় ফল ভাল হয়। এই কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুর জীবনের দুটি প্রধান প্রয়োজন স্নেহ ও স্বাধীনতা। এই দুটি মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করলে, তবেই তারা সুস্থ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে। দৌরাত্ম্য নিবারণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় শিশুর প্রাণশক্তিকে সম্যক্ বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া,—তাকে শাসন পীড়ন দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া নয়। শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী তাকে গঠনাত্মক আত্মবিকাশের সুযোগ দিতে হবে। আবার সে যখন তার ব্যবহারের দ্বারা অন্যের ক্ষতি করবে বা নিজেরও অনিষ্টসাধন করবে এমন আশঙ্কা থাকে, সেখানে তাকে বাধা দিতে হবে, শাসন করতে হবে, তার প্রাণশক্তিকে অন্য পথে চালনা করতে হবে। শিশুকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে চাইলে কেবলই নিষেধ ও শাসন দ্বারা তা করা যায় না, আবার সব ব্যাপারে তাকে প্রশ্রয় দিলেও চলে না। এবিষয়ে সাফল্যের মূলমন্ত্র হল বুদ্ধি-মার্জিত স্নেহ ও সু-উদ্দেশ্যানুগ দৃঢ় অথচ সহানুভূতিপূর্ণ পরিচালন।

শাসন বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত। এক হচ্ছে গোড়া প্রাচীনপন্থী মত, তাতে শাসন মানেই হচ্ছে নিষেধ—সব ব্যাপারেই শিশুকে কঠোর ভাবে বলা 'না'; দ্বিতীয় মত হচ্ছে' শিক্ষককে কোন বিষয়েই বাধা দিতে নেই—শুধুই বলতে হবে—হাঁ। আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মত হচ্ছে, শিশুর পরিণতির স্তর, প্রয়োজন, ও অবস্থা অনুযায়ী কখনো দৃঢ়ভাবে 'না' করতে হবে, কখনও শান্ত ভাবে 'হাঁ' করতে হবে এবং সব সময়েই তাকে এটা বুঝাতে হবে যে তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তার নিজের পক্ষে এবং গোষ্ঠীর পক্ষে মঙ্গলজনক। যখন শিশুর বুদ্ধির পরিণতি আগুন ব্যবহারের উপযোগী হয় নি, তখন তার মঙ্গলের জন্যই নিষেধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে জোর করেই নিবারণ করতে হবে। কিন্তু যখন সে উপযুক্ত পরিণতি লাভ করেছে এবং তার আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে তখন তাকে শেখাতে হবে। শিশুকে ধ্বংসাত্মক ভাবে আগুন ব্যবহারের পরিবর্তে গঠানাত্মক ব্যবহার শেখাতে হবে। শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে অসুন্দর অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখাতে হবে। শাসন সম্পর্কে এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্যাণধর্মী মতই শ্রেষ্ঠ।[৪]

৪। Nina Rfdeneau—When your child is destructive,

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অনুবর্তনের মূলসূত্র

Principles of Guidance

গাঁয়ের ছেলে কেলো গ্রামের খাল বিলে নিজে নিজেই সাঁতার শিখেছে। জলে সাঁতার দেওয়া তার কাছে 'জলভাত'।

আর শহরে ছেলে অমিতাভ সাঁতার শিখেছে ঢাকুরিয়া সুইমিংপুলে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের কাছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। শহরে ছেলের কাছে জল খুব ঘরের জিনিষ নয়।

সাঁতারের প্রতিযোগিতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাঁতারের কৌশল-শেখা শহরে ছেলেই কিন্তু জিতে গেলো।

তেমনি কৃষ্ণা বাড়ীতে বছরখানেক একটি একটি করে খুঁজে জোরে জোরে আঙুলের চাপে চাবি টিপে টিপে (hunt & peck system) আলাদা আলাদা অক্ষর টাইপ করে, নিজে নিজেই বাড়ীর টাইপ-রাইটারে টাইপ করতে শিখেছে।

আর অনিমা এক টাইপের স্কুলে অভিজ্ঞ পারদর্শী শিক্ষকের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিন মাস শিখেছে। সে হাল্‌কা হাতে (feather touch system) চট্‌পট টাইপ করে। তার টাইপ অনেক দ্রুতগতি, অনেক পরিচ্ছন্ন।

এতে বোঝা যায় উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিচালনা শিক্ষার কাজকে এগিয়ে দেয়।

আধুনিক জীবনে যন্ত্রের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গেছে। সময়ের দাম আজকাল যথেষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন দ্রুত কাজের আজকাল আদর। এসব ব্যাপারে "অশিক্ষিত পটুত্ব" চলে না। কি করে যন্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা অল্প সময়ে সুন্দর ও বেশী কাজ পাওয়া যায়, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ্‌, প্রয়োগশিল্পী অহঃরহ নানা পরীক্ষা ও গবেষণায় রত আছেন। এমনি করেই যন্ত্রচালনা শুধু নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' ব্যবহারের চাহিদা বেড়ে গেছে।

জীবনযাপন করতে গেলেই নানা কাজ করতে হয়। কিন্তু কি করে কাজ সুন্দরভাবে করতে হয়, তা অনেক সময়ই আমরা জানি না। দেহমনের,

ইন্দ্রিয়ের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন ও আগ্রহের তাগিদে অনেক কাজই আমরা নিজেরা শিখে নি। কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে যেগুলি প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত পরিচালকের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিখলে কাজ অনেক ভালো হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শেখাটা গোড়ার দিকে, 'স্বাভাবিক পদ্ধতি'র চেয়ে কিছু কঠিন হ'তে পারে, এবং প্রথম দিকে অগ্রগতিও কম হ'তে পারে, কিন্তু আখেরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই বেশী লাভজনক। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সাঁতার শেখা হ'ল এলোপাথারী হাত পা ছুঁড়ে। কোন প্রকারে জলে ভেসে থাকা আর জল কেটে কিছু এগিয়ে যাওয়া! এতে গোড়ার দিকে অনেক তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'ক্রল্' (crawl) করে সাঁতারের পদ্ধতিতে সাঁতার শিখতে কিছু দেরী হয়,—প্রথম দিকে তা কিছু কষ্টসাধ্যও বটে, কিন্তু তাতে বাস্তবিক পক্ষে অনেক কম পরিশ্রমে, অনেক দ্রুত, অনেক বেশী দূর সাঁতার কাটা যায়। তেমনি, গোড়ার দিকে যেমন তেমন করে কলম ধরে, হিজিবিজি কেটে লিখতে অনেকেই আমরা শিখি। তাতে হাতের লেখা তেমন সুন্দর হয় না, তেমন দ্রুত লেখাও যায় না, হাতের পেশীগুলি বেশী ক্লান্ত হয়। কিন্তু গোড়াতেই শিশুকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলম কি করে ধরতে হয়, অল্প চাপ দিয়ে কি করে লিখতে হয়, কি ভাবে সামান্য ঝুঁকে, সোজা করে কাগজে অল্প হাতের চাপ রেখে, সুগঠিত অক্ষরে লিখতে হয়, তা শেখালে, ভবিষ্যতে তার হাতের লেখা সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং দ্রুত হয়। এসব উদাহরণ থেকে এটা বোঝা যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে গোড়াতেই বৈজ্ঞানিক সুপরিচালনার (guidance) প্রয়োজন যথেষ্ট। শিক্ষককে শুধুমাত্র কি বিষয় শিশুকে শেখাবেন, তা জানলেই চলবে না। তাঁকে আরো জানতে হবে, কি ভাবে শেখালে, সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে।[১] একই বয়সের সমান বুদ্ধিমান্ ছেলেদের দুটো সমান দল করা হ'ল। একদলকে বিচক্ষণ প্রশিক্ষক ধনুর্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি এবং ধনুক ধরা, তীরযোজনা করা ও তীর নিক্ষেপ হাতে কলমে দুমাস শেখালেন। আর একদলও সমান সময়ই শিক্ষালাভ করল, কিন্তু তাদের প্রশিক্ষক কোনপ্রকার 'পরিচালনা' করলেন না। দুমাস পরে তাদের দুটি দলের পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেল, প্রথম দলের পারদর্শিতা দ্বিতীয় দলের তুলনায় অনেক বেশী। শিক্ষার প্রতি স্তরেই তাদের উৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেল। এই পরীক্ষার

১। Gates, Jersild etc. Educational Psychology. p 341.

থেকে এই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে, সফল পরিচালক নিম্নলিখিত ভাবে শিক্ষাকার্যের সহায়ক—

(১) তিনি অনেক বেশী কার্যকারী ও সফল কায়দা বা কৌশলের দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(১) এ দ্বারা গোড়াতে যে ভুল পদ্ধতি শিক্ষার্থী আয়ত্ত করেছে সে অভ্যাসগুলি ভেঙে ফেলতে তিনি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন।

(৩) শিক্ষক শুধু যে নূতন 'কায়দা' যান্ত্রিক ভাবে শেখাবেন, তা নয়। তিনি সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে, তার বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ ও সমগ্র ভাবে সমস্যাটি বুঝতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। তখনই শিক্ষার্থী বুঝতে পারে শিক্ষক যে নূতন পদ্ধতি ব্যবহার কচ্ছেন, তা উন্নততর কেন।

(৪) শিক্ষকের সাহচর্যে এবং তাঁর কাজের উন্নততর ফল দেখে, শিক্ষার্থীরাও উৎসাহ বোধ করবে। তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়বে এবং তারা পুরাতন ভুল পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে যে দ্বিধা তা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

পরিচালককে সকল কর্মের প্রকৃতিটি জানতে হবে

অনেক ক্ষেত্রেই সুপরিচালনা দ্বারা শিক্ষার্থীকে অনেক খানি সাহায্য করা যায়। বিশেষ করে, সুপরিচালনার উদ্দেশ্য হবে, গোড়ার দিকেই ছাত্রকে ঠিক ঠিক কৌশলটি ধরিয়ে দেওয়া। এর জন্য পরিচালককেও অবশ্য স্পষ্ট করে সকল কর্মের প্রকৃতি জানতে হবে। ভাল করে বই পড়তে শেখানো বিষয়ে আজকাল আর শুধু স্বভাবের উপর নির্ভর করা হয় না। ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে এই বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলে তিনটি মূল সূত্র আবিষ্কৃত হয় এবং এই সূত্রগুলি কি করে ভাল করে পড়তে হয়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। পরিচালকের পক্ষে এই সূত্রগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন। এই সূত্রের প্রথমটি হচ্ছে যে, পড়ার সময়, চোখ ক্রমাগতই পঠিত বিষয়ের লাইনের বরাবর, না থেমে এগিয়ে যায় না। পড়তে সুরু ক'রে চোখ, প্রথম ডানদিকে কিছুটা স'রে, তার পর অল্প কিছুক্ষণের জন্য থামে, আবার ডানদিকে কিছুটা সরে, আবার অল্পক্ষণের জন্য থামে। এ ভাবেই পড়া এগোয়। দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে চোখ যখন থামে, তখন যে দূরত্বে রেখে বই পড়া হয়, সে দূরত্বে এক দৃষ্টিতে প্রায় দেড় ইঞ্চি ছাপা পড়তে পারে। তৃতীয় সূত্রটিই হচ্ছে সব চেয়ে মূল্যবান্—পড়ার সময় প্রত্যেকটি অক্ষর (letter) আলাদা আলাদা করে, এমন কি প্রত্যেক শব্দ (word) আলাদা করে

পড়া হয় না, মন অর্থবোধের দ্বারা কতকগুলি শব্দকে একত্র করে' পড়ে। পড়াটা শুধু চোখের যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, মনের বোধের ব্যাপারও। যতই অর্থবোধের দ্বারা অনেকগুলি শব্দ, এমন কি, বচনকে একত্র মনের মধ্যে সুসম্বদ্ধ করা যাবে, যতই পড়া দ্রুত গতিতে (চলে' এবং থেমে, চলে' এবং থেমে) স্বচ্ছন্দতাবে অগ্রসর হয়ে চলবে এবং তা মনের মধ্যে গভীর ভাবে গেঁথে যাবে।[২] প্রধান কথা হচ্ছে—অর্থবোধ, এবং এই বোধই চোখের যান্ত্রিক কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

যিনি সুপরিচালক, তাঁকে এই সূত্রগুলি এবং তাদের প্রয়োগ পরিষ্কার ভাবেই জানতে হবে। তাকে একথাটিই ছাত্রদের শেখাতে হবে যে, অর্থ না বুঝে, টুকরো টুকরো করে', শব্দ বানান করে' করে' শেখা—পড়তে শেখার নিতান্ত ভুল পদ্ধতি।[৩]

সফল কর্মের একটি বাস্তব আদর্শ চোখের সামনে ধরতে হবে

পরিচালনা ছাড়া নিজে নিজে অনেক কাজই শিশু সুন্দর ভাবে শিখে উঠতে পারে না। তাই পরিচালকের প্রথম কাজ হ'বে, সফল কর্মের একটি বাস্তব আদর্শ ছাত্রের সামনে তুলে ধরা। পড়তে শেখাতে হ'লে, নির্ভুল উচ্চারণে যতি বিরাম, ছন্দ অনুসরণ করে' কি করে পড়তে হয়, তা তিনি নিজে পড়ে' ছাত্রদের দেখাবেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'আবৃত্তি সর্ব শাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।' সুন্দর করে' পড়তে যে পারে, সে ঠিক ঠিক বুঝেছে, এটাও বোঝা যায়। তাই শিশুর সামনে শিক্ষক প্রথম সুন্দর আবৃত্তি করে' শোনাবেন। তাতে তার বোধ বিকশিত হবে এবং সুন্দর করে পড়ার কৌশল সে শিক্ষকের কাছ থেকে অনুসরণ করে শিখে নেবে। সুতা কাটতে শিখতে হলে কি করে চরকার কাছে বসতে হবে, কি করে' চাকা ঘোরাতে হবে, পাঁজ ধরতে হবে, সুতা টেনে বের করতে হবে, সুতোতে পাক দিতে হ'বে, মাকুতে সুতো জড়াতে হবে—এ সবই পরিচালক ছাত্রদের সামনে সুতো সুন্দর করে কেটে দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু

২। Gates, Jersild etc. Educational Psychology—pp 342-43

৩। Recent interpretations of the nature of reading refer to eye movements as "peripheral measures" of reading efficiency, the most important phase of which is comprehension—a "central ability or function". Thus, the thought process of reading tends to determine the motor phases of the activity.—Witty & Kopal. Reading & the Educative process, p, 209.

অনেক কাজই যথেষ্ট জটিল—এবং সুসম্বদ্ধ অনেকগুলি পৃথক কর্মের তাতে একত্র সমাবেশ। শিক্ষার্থী তাই কেবল মাত্র চোখের সামনে কাজটি করতে দেখেই তা করতে শেখে না। যেমন, সাইকেল চালানো, বাঁশী বাজানো, গয়লেখা এ কাজগুলি কেবলমাত্র চোখের সামনে করতে দেখেই শেখা যায় না। অশিক্ষিত শিশু এই সমগ্র কাজের পৃথক পৃথক অঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে না, তাদের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক। এবং অংশগুলির পরস্পর সম্পর্কের সজীব সংযোগ দ্বারা কি ক'রে সমগ্র কাজটি সম্পাদিত হয়, তাও সে বুঝতে পারে না। তাই সুপরিচালককে অনেক সময় বিলম্বিত ভাবে, ধীরে ধীরে কাজটি করে', তার অংশগুলিকে পৃথক পৃথক করে, কখনো সমগ্র কর্মের একটি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বড় করে', বারে বারে, ধীরে ধীরে করে', দেখিয়ে দিতে হয়। গান শেখাতে গেলে, কোন একটা সুর গলায় তুলতে হ'লে, কি করে তা করতে হয় তা শেখাতে গিয়ে, শিক্ষক সেই অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করে' হয়তো পুনঃ পুনঃ বিলম্বিত তালে গেয়ে শোনান। এ সব কাজের জন্যেই চার্ট, সজীব ডায়াগ্রাম, স্লো-মোশান, ক্যামেরা, অ্যামপ্লিফায়ার, অডিও-ভিস্যুয়াল্ এড্‌স্ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। যে আদর্শকে সামনে তুলে ধরা হবে, তা এমন হওয়া চাই, যেন কাজের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে তাতে বোঝা যায়, যাতে অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধটি পরিষ্কার বোধের সহায়ক হয় এবং ভুল ও সফল কর্মের প্রভেদও যেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়।*

কখনো কখনো প্রথম অবস্থায় হাতে ধরেই শেখাতে হয়

শিশুর পক্ষে কোন জটিল কর্মের মানসিক বিশ্লেষণ যেমন সম্ভব হয় না তেমন অনেক সময় হাতে ধরে না করিয়ে দিলে উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও পেশীসঞ্চালন দ্বারা কর্মটির সফল সমাধানও সে করতে পারে না। প্রথম দিকে কোন কাজ শেখাবার জন্যে কখনো কখনো যান্ত্রিক উপায়ও কিছু গ্রহণ করা হয়। যেমন হাতের লেখা শেখাবার জন্যে শিরিষ কাগজ কেটে বড় বড় অক্ষর তৈরী করে' তার উপর শিশুকে আঙুল বুলাতে শেখানো হয়। তাকে প্রথমে হাত ধরে' কোথায় আরম্ভ করতে হবে, কিভাবে অগ্রসর হ'তে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতে হয়। তারপর শিশু দাগা বুলাতে থাকে। কখনো বা কাঠে খাঁজ করা অক্ষর বালি দিয়ে ভর্তি করে একটা ভোতা কাঠের কলম দিয়ে সেই খাঁজের মধ্যে দাগা বুলাতে শেখানো হয়। এরকম

* Gates, Jersild etc Educational Psychology p. 345.

প্রাথমিক যান্ত্রিক পরিচালনার লক্ষ্য হচ্ছে কাজটিকে সহজ করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা। কি তার খণ্ড-কর্মগুলির শেষ উদ্দেশ্য, এটা শিক্ষার্থী এতে সহজে বুঝতে পারে এবং কি অঙ্গ বা পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে কাজটা করতে হবে, অনুশীলনের দ্বারা তার অভ্যাসটি আয়ত্ত করে। যে সব কাজ যথেষ্ট জটিল সে সব কাজের বেলায়, এ প্রকার সহজ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখালে সুবিধা হয়—যেমন, এরোপ্লেন চালানো; প্রথমে জমির উপর কতগুলি সহজ যন্ত্রের চালনার সাহায্যেই শেখাতে হয়। নৌকা চালনা (rowing) ও তেমনি প্রথমে ঘাটে বাঁধা (dummy) নৌকায় বসে দাঁড় টানা, পায়ের সঞ্চালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিখতে হয়। কিন্তু হাতের লেখা, সাঁতার শেখা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজ কাজগুলি সোজাসুজি ভাবে বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে শিখলেই শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি শেখে। মনে হতে পারে যে, জটিল সকল কর্ম শেখার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, তার খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অংশগুলি আলাদা আলাদা ভাবে সহজ করে শিখে নিয়ে, তার পর সমগ্র অংশগুলিকে পরে যুক্ত করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা সত্য নয়। সমগ্র কর্মটিকে এ রকম টুক্‌রো টুক্‌রো করে, আলাদা করে শিখলে সমগ্র কর্মটির মধ্যে যে ঐক্য থাকে, তা হারিয়ে যায়। যেমন চিন্তার বেলায়, তেমন কর্মের বেলায়ও পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর সামনে সমগ্রটিকেই স্পষ্ট করে উপস্থিত করা। গোড়ার থেকেই শিক্ষার্থী তার কর্মের সমগ্র উদ্দেশ্যটি যেন বুঝতে পারে। লেখা শেখানো ব্যাপারে, এ রকম যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার (যেমন ছাপা লেখার উপর ট্রেসিং কাগজ পেতে তার উপর দাগা বোলানো, অক্ষর গঠনের প্রাথমিক সহজ রূপগুলি প্রথমে আলাদা আলাদা শেখানো, যেমন খাড়া টান, বাঁকা টান, গোল, বক্র রেখা বা ডিম্বাকার আঁকা) ইত্যাদি দ্বারা শিশুরা বেশী সহজে বা তাড়াতাড়ি শেখে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সরাসরি পূর্ণ অক্ষরগুলিই গোড়ার থেকে লিখতে শেখানো দ্বারা বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়।[৫] যেখানে কোন কাজ অত্যন্ত জটিল, সেখানে তার অংশগুলি আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে কোন কোন

৫। Hertzberg. A comparative study of different methods used in teaching beginners to write. Teacher's College, Bureau of Publications, 1926. No. 214.

অংশ আলাদা শেখানো দরকার হ'তে পারে। কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীর সামনে সমগ্র ক্রিয়াটির ধারণাই উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। যেখানে শিক্ষার্থী কোন একটা অংশের কাজটা ভাল করে বুঝতে পাচ্ছে না, অথবা যেখানে সে বারে বারেই কোন একটা জায়গায় ভুল কচ্ছে, সেখানে অবশ্য সে খণ্ড অংশটুকু আলাদা করে শেখানো প্রয়োজন, যাতে তার সংশোধন হ'তে পারে এবং সমগ্রের ধারণাটা তার কাছে সুস্পষ্ট হয়।[৬]

যে কৌশল শেখানো হ'ল তা নমনীয় ও পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন:

পরিচালক ছাত্রদের যখন কোন কৌশল বা কায়দা শেখান, তখন তার মধ্যে কিছুটা নমনীয়তা (flexibility) থাকা প্রয়োজন। ঠিক একই অবস্থায় এবং একই ভাবে কোন কাজ করতে হবে তা নয়। অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং যে কৌশল শেখা হয়েছে তারও অবস্থাবিশেষে পরিবর্তন করতে হবে। সুপরিচালক শিক্ষার্থীকে তার কর্মের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে বুঝতে শেখান এবং তার মনকে এমন করে' তৈরী করেন, যেন উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় সে স্থির করতে পারে—প্রয়োজন হ'লে কৌশলের উপযুক্ত সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারে।

শিক্ষার্থী যেন নিজের ভুল নিজেই ধরতে পারে:

সুপরিচালক শিক্ষার্থীকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে কোন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখান না—তাকে সমগ্রভাবে সমস্যাটি দেখতে অভ্যাস করান। এতে ছাত্র কেবল যে একটি নির্ভুল কৌশলই আয়ত্ত করে তা নয়, ভুল করলে তা নিজে বুঝতেও পারে, যদিও সব সময় নিজে সে ভুল সংশোধন করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ভুলগুলি যত গোড়ার দিকে শুধরে দেওয়া যায়, ততই ভাল। একবার ভুল পদ্ধতি অভ্যাস হয়ে গেলে, পরে তা সংশোধন করা কঠিন হয়। যিনি সুপরিচালক তিনি ছাত্রকে একটি নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী ও কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করেন। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য কতগুলি অপরিবর্তনীয়

৬। We should not begin with elaborate formal exercise of the elements or make them a large part of the course of training but should utilize them as strictly preventive measures where a particular defect or deficiency is apparent. When thus singled out for specific treatment a particular aspect of a total performance has a significance and character it could not have as an isolated segment practised without respect to its membership relations, Gates, Jersild etc, Educational Psychology, p. 347.

মনোভাব বা কায়দা শিখিয়ে দেওয়া নয়—শিক্ষার্থীর মনের জানলাগুলি খুলে দেওয়া—নূতন ভাব, নূতন পথ আবিষ্কারে উৎসাহিত করা।[৭]

শেখাটা যতই অগ্রসর হয়, ততই শিক্ষার্থী নিষ্প্রয়োজনীয় ও ভুল কর্মগুলি বাদ দিতে পারে—তার পেশীর ও বোধের আড়ষ্টতা কমে আসে, তার কাজ দ্রুততর হয়। তার সমগ্র কাজটি উদ্দেশ্য-অনুযায়ী ও নির্ভুল হয়।[৮]

যে কোন জটিল কাজ শেখাতে গেলে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পুনঃপুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন হয়। পরিচালককে শিক্ষার এই মূলসূত্রগুলি জানতে হবে। 'পড়া-শেখা, কাজ শেখা' অধ্যায়ে শিক্ষা কি করে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে—তার প্রধান সূত্রগুলি কি, তা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। যিনি সুপরিচালক তাঁকে এই সূত্রগুলির প্রয়োগ ভাল করেই জানতে হবে।

পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষাদানের মূল্য :

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নিঃসন্দেহ যে মৌখিক শিক্ষাদান সুপরিচালনার পক্ষে অনুকূল। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মূল্য সামান্য নয়। এ সম্পর্কে দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা কয়েকটি মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে :

মৌখিক শিক্ষায় গোড়ার দিকে যতটা যত সুফল পাওয়া যায়, পরে ততটা পাওয়া যায় না।

(২) গোড়ার দিকে সুপরিচালনা দ্বারা ভুল নিবারণ করা সহজ হয়। পরে ভুল সংশোধন অনেক কঠিন হয়।

(৩) পরিচালনার ব্যাপারে ইতিবাচক গঠনাত্মক উপদেশই বেশী উপকারী—নিষেধাত্মক নির্দেশ ও ভ্রমসংশোধনের দ্বারা তত ভাল ফল পাওয়া যায় না।

(৪) অতিরিক্ত পরিচালন ও উপদেশ দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাধীন উদ্যম ও সবল ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়।[৯]

৭। Meek. A Study of Learning & Retention in young children. Teacher's College, Bureau of Publications. 1925. No. 164

৮। With awareness of progress greater self-confidence may be aroused. Greater insight into the task usually emerges, which leads to identify true sources of improvement. . Precision is thus a relatively late development in the acquisition of skill. It takes the form of greater smoothness, economy, stability, rhythm, speed and exactness.

Gates, Jersild etc. Educational Psychology p. 351

৯। Gates. Jersild etc. Educational Psychology. p. 352-'53.

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অনুবর্তন

Guidance in the Choice of School subjects

আধুনিক যুগের শিক্ষা কয়েকটি মূলসূত্র স্বীকার করে নেয় :

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্য আছে। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

(২) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) ব্যক্তির সামর্থ্য, পরিণতির স্তর, প্রয়োজন, প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে বিষয়-কেন্দ্রিক। শিক্ষক কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবেন—জাতির প্রাচীন সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞান, আদর্শ ও কৌশল। নির্দিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষাদানই শিক্ষকের প্রধান কাজ। প্রাচীন শিক্ষায় তাই বিষয়-বৈচিত্র্য নেই—সকলের জন্যে একই শিক্ষার ব্যবস্থা। এ শিক্ষা একমুখী। নির্দিষ্ট কয়টি বিষয় একই ভাবে সমস্ত ছাত্রকেই শিখতে হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। তার সামর্থ্য, তার প্রয়োজন, তার রুচি অনুযায়ী শিক্ষায় বহু বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক সমাজের প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জটিল এবং অনেক বেশী বিচিত্র, তাই শিক্ষা বহুমুখী করা প্রয়োজন। রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রই যাতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করে, প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ ধী ও কর্মশক্তিকে সমাজের পূর্ণতম সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই আধুনিক শিক্ষানীতি।

যে যে কাজের উপযুক্ত নয়, তার উপর সেই কাজ চাপিয়ে দিলে, কাজও নষ্ট হয় এবং ব্যক্তিরও তাতে কোন তৃপ্তি বা আনন্দ থাকে না। এতে ব্যক্তি ও সমাজ দুই-এর শক্তিরই অযথা অপচয় ঘটে। তা ছাড়া অযোগ্যকে শিক্ষাদানের

বৃথা চেষ্টা করে, শিক্ষকের সময় ও শক্তিরও অপব্যয় হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রে 'অধিকারী' ভিন্ন অন্যকে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। যে সত্ত্বগুণ-প্রধান, ধীশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তারই ছিল শাস্ত্রপাঠের অধিকার। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলছে কাকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান, কি ভাবে করলে সব চেয়ে সুফল পাওয়া যাবে, প্রথমে তা স্থির করে', তারপর, বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার বিষয়ে বৈচিত্রীকরণ (diversification of course) সমস্ত দেশেই আধুনিক শিক্ষার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

মুদালিয়র কমিশন এবং কোঠারী কমিশন ঠিকই বলেছেন যে আধুনিক শিক্ষার এই বৈচিত্রীকরণের ফলে, শিক্ষকের দায়িত্ব আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ছাত্রেরা তাদের প্রত্যেকের পক্ষে কোন বিষয় উপযোগী হবে, তা নির্বাচন করতে পারে না। এ বিষয়ে তাদের সাহায্য ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। অনেক সময় অভিভাবকেরা কেবলমাত্র অর্থকরী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে' (কোন লাইনে দিলে, ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে সবচেয়ে ভাল রোজগার করবে), সন্তানদের কোন এক বিশেষ শিক্ষার ধারা (stream) নির্বাচন করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু তাঁরা অনেক সময় চিন্তা করে দেখেন না, তাঁর ছেলের এন্জীনীয়ার বা ডাক্তার হবার মত বুদ্ধি, স্বাস্থ্য বা রুচি আছে কিনা। তাই ভুল পথ নির্বাচনের ফলে বহু মনস্তাপ ও বিফলতা ঘটে। এজন্যেই বর্তমানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনে (এবং ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনে) সহায়তার জন্যে নিরপেক্ষ, অভিজ্ঞ ও পরিচালন বিষয়ে বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন। তাঁকে গাইডেন্স্ অফিসার বা কেরিয়ার মাষ্টার বলা হয়। অবশ্য এই কঠিন ও দায়িত্ব-পূর্ণ কাজটি কয়েক জন বিশেষজ্ঞের একক দায়িত্ব এমন মনে করা ভুল হবে। গাইডেন্স্ মাষ্টার যাদুকর নন, এবং পরিচালন বিষয়ে পরামর্শ অঙ্কের নির্ভুল কোন ফর্মুলা দিয়ে বা কোন যন্ত্রে ফেলে স্থির করা যায় না। এ করতে হলে, প্রত্যেক ছেলের বুদ্ধির পরিণতি, প্রবণতা, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তার অনুরাগ ও পারদর্শিতা, তার স্বাস্থ্য, মেজাজ, রুচি ও ব্যক্তিত্বসূচক প্রধান গুণ ইত্যাদি সাবধানে বিবেচনা করতে হয় সুতরাং প্রধান শিক্ষকের উপরই, ছাত্রকে কোন শাখায় ভর্তি করবেন সে বিষয়ে শেষ দায়িত্ব থাকলেও, তাঁকে কেরিয়ার মাষ্টারের বিশেষ সুপারিশ, সমস্ত শিক্ষকদের মতামত এবং অভিভাবকের পরামর্শ ও

সামর্থ্য বিবেচনা করতে হয়।[১] অবশ্য ব্যাপক অর্থে অনুবর্তন (Guidance) অর্থ স্কুলের বিষয় নির্বাচন বা জীবিকা নির্বাচনে সহায়তাই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কি করে সাফল্য লাভ করা যায় সে বিষয়ে সুপরামর্শ।

গাইডেন্স্ বা কেরিয়ার মাষ্টারের যোগ্যতা :

ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য প্রবণতা এবং ব্যক্তিত্বসূচক গুণ সাবধানে বিবেচনা করে গাইডেন্স্ মাষ্টার পরামর্শ দেন, কোন্ ছেলের পক্ষে কোন্ বিষয় নির্বাচন ভাল হবে। এ কাজটি মোটেই সহজ নয়। তাঁর উপদেশ ছাত্রদের পক্ষে তখনই যথার্থভাবে উপকারী হবে, যখন তিনি স্থির-বুদ্ধি, নিরপেক্ষ, সহানুভূতি-সম্পন্ন ও এবিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন। এমন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিম্নলিখিত গুণ ও যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে—

(১) ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

(২) তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ও আন্তরিক স্নেহ থাকতে হবে, ছাত্রদের সমস্যাগুলি ধৈর্য ও ক্ষমার চক্ষে দেখবার এবং ছাত্রদের চোখ দিয়ে তাদের সমস্যা ও তাদের অসুবিধাগুলি বুঝবার মত উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর থাকতে হবে।

(৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ও শিশুদের জীবনের নানা অব্যবস্থিততার স্বরূপ ও তাদের সংশোধনের উপায় তাঁকে জানতে হবে। তাঁকে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা বিচারের পরিচয় (assessment of school records) দ্বারা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা সুপরামর্শ দান বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে।

(৪) বিভিন্ন শিক্ষা ও জীবিকার কি কি সুযোগ কোথায় আছে, কোন্টির জন্য কি বিশেষ যোগ্যতা, কোন্ শিক্ষার কত ব্যয়, এ সব বিষয়ে নির্ভুল তথ্য তাঁকে জানতে হবে।

কি ভাবে শিক্ষার বিষয়-নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচন করা হবে :

পড়াশোনাই হোক, আর কাজ শেখাই হোক, সব ছেলেমেয়ে সব বিষয়ের বা সব কাজের উপযোগী নয়। সব বয়সের জন্য একই পড়ার যেমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ও ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্যও একই পড়া বা

১। Mudaliar Commission Report.

একই কাজ উপযুক্ত হতে পারে না। সবাই যেমন বৈমানিক হতে পারে না, তেমনি সবাই আবার শিক্ষকও হতে পারে না। তাই কাজ অনুযায়ী লোক বাছাই ও লোক অনুযায়ী কাজ বাছাই (fitting the man to the job, and fitting the job to the man) এ দুটোই দরকার। এখানে এ কথা বলে রাখা দরকার যে, স্কুলে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন, বা পাঠ্যধারা নির্বাচন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের জীবিকা নির্বাচন এই দুই ব্যাপারেই পরামর্শ-দান বা অনুবর্তনের (guidance) মূলনীতি এক। দুই ক্ষেত্রেই ব্যক্তির বুদ্ধি, সাধ্য, যোগ্যতা এবং কাজের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী যে যে কাজের উপযোগী, তাকে সেই কাজে বা সেই বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করাই হচ্ছে উপদেশ বা অনুবর্তনের উদ্দেশ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে বা জীবিকার ক্ষেত্রে অপচয় ও মনস্তাপ নিবারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি বা অসঙ্গতির সংশোধন বিষয়ে (correction of mal-adjustment) কেরিয়ার মাষ্টারের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এর একটি প্রধান উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুবর্তন (scientific guidance). যদিও একথা বলা ঠিক হবে না যে, জীবিকার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, তথাপি এ কথাও মানতে হবে যে বর্তমান কালে 'শিক্ষার জন্যেই শিক্ষা' এই উচ্চ আদর্শ অচল এবং শিক্ষায় ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্যে ছাত্রদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে, বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকেরা এই দাবী করে থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের জন্যে নির্বাচন এবং জীবিকার জন্যে নির্বাচন, এই দুইয়ের মধ্যে বিষম পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিকপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় বা পাঠ্যধারা নির্বাচন, যোগ্যতানুযায়ী ও বৈজ্ঞানিকভাবে করা হলে, ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনের কাজটিও সহজ হয়।[২]

যাঁরা প্রার্থীদের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করেন এবং যে নিদেশক

২। At the Secondary stage of education there should not only be developed a system of scientific educational guidance, so that curriculum & vocation may be adjusted to the needs and aptitudes of individuals, but this should lead progressively to an adequate system of vocational guidance. The translation from school to work should not be a paralysing shock to the adolescent, but should be effected smoothly.

—Mudaliar Commission Report.

বা পরিচালক জীবিকা বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দেন, এই দু দলেরই কাজ একই ধরণের। দু দলই ব্যক্তির যোগ্যতা এবং কর্মের প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধনে চেষ্টিত, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ আছে। কর্মে নিয়োগ-কর্তা তাঁর কাজের উপযুক্ত, সবচেয়ে যোগ্য লোক বেছে নেওয়ার দিকে মন দেন।

আধুনিক অনুবর্তন ও উপদেশের ভিত্তি হচ্ছে কতগুলি বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (tests) এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা। এর মধ্যে একটি প্রধান হচ্ছে বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা (Intelligence tests)। লেখাপড়াই হোক্, আর হাতের কাজই হোক্, তাতে ভাল করতে হলে, বুদ্ধি কিছু চাই-ই। এটাও ঠিক যে, সব কাজে সমান বুদ্ধি ও একই জাতীয় বুদ্ধি প্রয়োজন হয় না। বিনে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তন করেছেন। তারই নানা সংস্কার, সংশোধন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তার দ্বারা নানা ভাবে, নানা দিক থেকে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব পরীক্ষা দ্বারা ব্যক্তির বুদ্ধি কোন ওজনের তার মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় এবং তা দিয়ে কোন জাতীয় কাজের পক্ষে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত, তার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। ক্যাটেল্ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অনুযায়ী মানুষদের পাঁচটি শ্রেণী বিভক্ত করে, সে অনুযায়ী এক এক দলের জন্য এক এক প্রকার কাজ নির্দেশনের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মতে, যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০·এর উপরে, তাঁরা হলেন বুদ্ধির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁদের মধ্য থেকেই পাওয়া যাবে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি বৃহৎ বাণিজ্য পরিচালক ইত্যাদি। আবার যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ১০০র মধ্যে, তাদের জন্যে উপযুক্ত কাজ হচ্ছে ছোট দোকানদার, সাধারণ শ্রমিক ক্ষেতের মজুর ইত্যাদি। ইয়ার্কিস্ (Yerkes) এর পরীক্ষার ফলও অনুরূপ।[৩] যদিও বিভিন্ন কাজ যারা করেন, তাদের সকলের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য যথেষ্ট আছে, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ডাক্তারী, এন্জীনীয়ারীং অধ্যাপনা, দেশ শাসন, বৃহৎ শিল্প পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য যাঁরা অর্জন করেন, তাঁদের বুদ্ধির মাপ সফল রিক্সাচালক, বা মুদীর চেয়ে উপরে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় অ্যামেরিকায় নানা কাজের জন্যে বহু লক্ষ লোক নেওয়া

৩। Yerkes—The Army Mental Tests,

হয়। সে সময় কে কোন কাজের উপযুক্ত তা বাছাই করবার জন্যে খুব ব্যাপক ভাবে বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৮৩,৬১৮টি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে ইয়োকাম্ পেশা বা কাজ অনুযায়ী বুদ্ধির অনুপাতের সম্বন্ধ (correlation) সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে যে ফল পান তা পূর্ববর্তী পরীক্ষারই অনুরূপ। এতেও দেখা যায় ডাক্তার, এন্জীনীয়ার, অধ্যাপকদের গড় বুদ্ধির হার সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক উঁচু।

বুদ্ধির তারতম্য এবং লেখাপড়ায় সফলতা :

এই ধারণা বহু-প্রচলিত, যে বুঁদ্ধি যাদের তীক্ষ্ণ, তারা লেখাপড়ায়ও ভাল ফল করে। এ বিশ্বাস বহু সমীক্ষার ভিত্তিতেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭৫ এর নীচে, তারা সাধারণতঃ স্কুলে লেখাপড়ায় ভাল করে না। তারা বোঝে দেরীতে, কঠিন বিষয়ে তারা মন দিতে পারে না—তারা ভাল মনেও রাখতে পারে না। কাজেই ক্লাশের পড়ায় বা কাজে তারা পেছিয়ে পড়ে ফেল করে, শেষে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যে সব 'বোকা', 'গাধা' ছেলেরা শিক্ষকদের পক্ষে মহা যন্ত্রণার কারণ, তাদের বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা যায় তাদের অধিকাংশের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ থেকে ৮৫র মধ্যে। বার্ট লণ্ডনের বহু স্কুলের ছেলেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫থেকে ৯৫-এর মধ্যে, তারা খাটলে পিটলে মোটামুটি ক্লাশের কাজ চালাতে পারে, কিন্তু তারা উচ্চতর বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের তুলনায় ফল সর্ব্বদাই প্রায় খারাপ করে।[৪] প্রকৃটরও দেখেছেন যে সব ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯৫ বা তার নীচে, তাদের মধ্যে শত করা ৭০ জন স্কুলের উঁচু ক্লাশের পরীক্ষায় অর্ধেকের বেশী বিষয়ে ফেল করে। প্রকৃটর ও টারম্যান্ প্যালো অল্টো হাইস্কুলে ছাত্রদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক এবং তারা পরীক্ষায় যে নম্বর পায়, তার মধ্যে একটি নিশ্চিত ইতিবাচক সম্বন্ধ (positive correlation) লক্ষ্য করেছেন। নীচের তালিকা থেকে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে।

১	২	৩
পরীক্ষার নম্বর	**গড় বুদ্ধ্যঙ্ক**	**ছাত্রদের সংখ্যা**
৫০-৫৯	৮৪	২
৬০-৬৯	১০০	১৬
৭০-৭৯	১০৭	৫৬
৮০-৮৯	১১০	২৪
৯০-৯৯	১২৩	৪

৪ Burt. Mental & Scholastic Tests.

স্কুল পরিত্যাগ করে যারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভাল করে, তাদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০। এ সব থেকে সহজেই বোঝা যায় উপদেষ্টা নির্দেশ দানের কালে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি রাখেন। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ এর নীচে সে সব ছেলেকে কলেজ বা উচ্চতর শিক্ষার জন্যে যেতে তিনি পরামর্শ দেন না।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সাফল্যের জন্যও বিভিন্ন পরিমাণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় কিনা, এ নিয়েও অনেক পরীক্ষা হয়েছে। বাট্ একই শ্রেণীর ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা এবং তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে কতকটা ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ (correlation) আছে, তা নিয়ে সমীক্ষার দ্বারা যে ফল পান তা নীচে দেওয়া হল।

বুদ্ধি ও বিষয়ের পরস্পর ইতিবাচক সম্বন্ধ

বুদ্ধি ও রচনা (essay)	'৬৩
বুদ্ধি ও বাক্য গঠন (composition)	'৫৬
বুদ্ধি ও গণিত (প্রশ্ন)	'৫৫
বুদ্ধি ও বানান	'৫২
বুদ্ধি ও হস্তাক্ষর	'২১
বুদ্ধি ও হাতের কাজ	'১৮
বুদ্ধি ও অঙ্কন	'১৫

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় ভাষা এবং বিমূর্ত বিষয়গুলিতে (abstract subject) পারদর্শিতায় বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ (co-efficient of correlation) যথেষ্ট উঁচু, কিন্তু হাতের কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধ্যঙ্কের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।[4] সহজ কথায় এর মানে হচ্ছে রচনা, বাক্যবিন্যাস ও গণিতের সমাধানে যতটা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, হস্তাক্ষর বা হাতের কাজ বা অঙ্কনে ততটা বুদ্ধি প্রয়োজন হয় না। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে এমডেন্ বণ্ড অনুরূপ পরীক্ষা করে যে ফল পেয়েছেন তা এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট[5]—

৫। E. Bond Tenth Grade Abilities & Achievements. Teacher's College, Bureau of Publications. 1940· No. 813. p. 29.

পরস্পর ইতিবাচক সম্বন্ধ

বুদ্ধি ও পঠিত শব্দ সংখ্যার ব্যবহারে দক্ষতা	·৭৯
বুদ্ধি ও পঠিত বিষয়ের অর্থবোধ	·৭৩
বুদ্ধি ও সাহিত্যের পরিচয়	·৬০
বুদ্ধি ও ইংরেজী বাগ্‌বিধি বিষয়ে পরিচয়	·৫৯
বুদ্ধি ও ইতিহাস	·৫৯
বুদ্ধি ও প্রাণবিজ্ঞান	·৫৪
বুদ্ধি ও জ্যামিতি	·৪৮
বুদ্ধি ও বানান	·৪৬

এসব মাপ থেকে গাইডেন্স্ মাষ্টার বুঝতে পারেন কোন ছেলের কোন বিষয়ে ভাল করবার সম্ভাবনা বেশী এবং কোন বিষয়ে সে অনুপযুক্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

জীবিকা বিষয়ে নির্দেশনা বা অনুবর্তন

Guidance in the choice of occupations

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সম্যক্ ও সুসঙ্গত বিকাশ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হলেও, সমস্ত শিক্ষার একটি নাতিদূর উদ্দেশ্য বা proximate aim থাকে, সেটা হচ্ছে, তাকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এটা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাপ। এখানে আর একটা কথাও আছে। বিদ্যালয়ে বিষয় নির্বাচনে যেমন, বৃত্তি নির্বাচন বা সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে গেলেও এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, সব পড়ার বিষয় বা সব কাজে সাধারণ একটা বুদ্ধি যেমন থাকা চাই-ই, তেমনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার জন্যে চাই বিশেষ বিশেষ ধরনের বুদ্ধি। স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির এই দুই প্রকার উপাদান ('g' and 's' factors in intelligence নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধির দুই উপাদান 'g' ও 's'—স্পায়ারম্যান্—স্পীয়ারম্যান্ বলেন সমস্ত কাজের মধ্যেই বুদ্ধির দুইটি উপাদান একসঙ্গে ক্রিয়া করে। একটি হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধি বা 'g' আর একটি হচ্ছে 's' বা special intelligence। 'g' বা general intelligence সমস্ত বুদ্ধির কাজেই কম বেশী প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বা কাজের জন্যে পৃথক পৃথক বুদ্ধির আর একটি উপাদান থাকে। সেটি হচ্ছে special intelligence। জ্যামিতির একস্ট্রা কষতে যে বিশেষ জাতীয় বুদ্ধির প্রয়োজন, কূপ খনন করতে সেই জাতীয় বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এই দুই কাজের মধ্যেই একটি সাধারণ উপাদান 'g' থাকে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকে s_1 s_2 ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধিরও উপাদান। সাহিত্যিক উৎকর্ষ, বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা, ভাষার উপর অধিকার ইত্যাদিতে 'g' এর প্রাধান্য বেশী। সেই জন্যেই বহুসংখ্যক শব্দের ব্যবহারে পটুতার সঙ্গে, বিনের পরিমাপ অনুযায়ী বুদ্ধ্যঙ্কের ইতিবাচক সম্বন্ধ যথেষ্ট উঁচু। সুতরাং শব্দের উপযুক্ত অর্থবোধ ও সংজ্ঞা

দিবার ক্ষমতা (Ability) যদি ফর্মূলায় প্রকাশ করতে হয়, তবে আমরা বলব। $g+s_1$ = Ability for word vocabulary and definition.

এখানে 'g'-এরই প্রাধান্য। কিন্তু ক্রিকেট খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি ক্ষমতায় g-এর কাজ গৌণ। সেখানে 's'-এরই কর্তৃত্ব—কাজেই তাদের ফর্মূলা হবে $g+s_1$=Ability for cricket, $g+s_2$=Ability for painting, স্পীয়ারম্যানের কথা যদি সত্য হয় তবে যাদের বুদ্ধিতে 'g' উপাদান প্রধান, উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে তারা ভাল করবে, আবার যাদের 's' এর উপাদান প্রধান, তাদের জন্যে হাতের কাজ ইত্যাদিতে পারদর্শিতা প্রদর্শনের সম্ভাবনা বেশী। তা ছাড়া এটাও দেখা যায় বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ উপাদান যেন দল বেঁধে থাকে এবং সে জন্যেই কতগুলি বিষয়ের মধ্যে ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর; আবার কোন কোন বিষয়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্বন্ধ নগণ্য। কাজেই নির্দেশককে এই তথ্যগুলি ভাল করেই জানতে হবে।[১]

বর্তমানে কোন ছেলেমেয়ের কোন্ বিশেষ দিকে রুচি বা ঝোঁক আছে, তা পরিমাপের নানা প্রকার অভীক্ষা আছে। নির্দেশক-এর পক্ষে এটা জানা বিশেষ দরকার। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। কারণ, নির্দেশনার কাজই হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রকে তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সম্যক বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা। কোন্ বিষয় নির্বাচন করলে বা কোন জীবিকা গ্রহণ করলে তার সাফল্যের সম্ভাবনা সমধিক, এসব সমীক্ষায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা ছাড়া গোড়াতেই কোন ছাত্র ছাত্রীর কোন বিশেষ শক্তিতে ত্রুটি, দুর্বলতা বা বিকার আছে তা জানলে, তা সংশোধন বা নিবারণের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। এ সব ত্রুটি বা বিকার সংশোধিত না হ'লে ছাত্রটি সমপাঠীদের উপহাস ও শিক্ষকের তিরস্কারের পাত্র হতে পারে এবং এতে তার আত্মপ্রত্যয় ক্ষুণ্ণ হয় এবং সে সমাজ জীবনে অব্যবস্থিত হ'য়ে পড়তে পারে।[২]

১। Murphy—A Briefer General Psychology-p 385

২। The fact that a certain child will never be brilliant in school is important, but oftentimes less important than the detection of his life work, or some hobby which may serve as the basis of life. In the

তা ছাড়া বর্তমানে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে কোন বিশেষ শিল্পে বা বৃত্তিতে লোক নেওয়ার পূর্বে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করে তাঁরা লোক বাছাই করেন। সে সব দেশে বিদ্যালয়গুলিও শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিক্ষাদান করে থাকেন এবং বিদ্যালয়ের নির্দেশক বা অনুবর্তনকারী শিক্ষকের (Guidance Master) উপর ভার থাকে, মাধ্যমিক স্তরেই ছাত্রদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বাছাই করে যার যেদিকে রুচি ও যোগ্যতা আছে সে ছাত্রকে সে বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার। ষ্ট্রং-এর ভোকেশ্যনাল্ ইন্টারেষ্ট্ ব্ল্যাংক্'-এর সাহায্যে এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এ্যাচীভমেন্ট-টেস্ট এর নমুনা—বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি বিভিন্ন ধরণের কর্মকুশলতাও প্রয়োজন হয়। কোন কাজে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির ও অত্যন্ত মনোযোগের প্রয়োজন হয় (যেমন ঘড়ির কাজ, সূক্ষ্ম যন্ত্রের অংশ নির্মাণ, মেরামত বা তাদের সমাবেশ)। আবার কোন কাজে প্রয়োজন হয় ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (যেমন শল্য চিকিৎসকদের)। কখনও বা দরকার হয় হাতের আঙ্গুলের সূক্ষ্ম ও নিপুণ ব্যবহার (যেমন ভাল সেলাই, এমব্রয়ডারী ইত্যাদির কাজ) ; কখনও প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি (যেমন টি টেষ্টার্-এর কাজ, তারের সঙ্গীতের কাজ)। এসব বিশেষ বিশেষ ধরণের পারদর্শিতার জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের পরীক্ষা আছে। যেমন কার হাত কত স্থির্ ও সূক্ষ্ম কাজে কে কতটা উপযোগী, তা পরীক্ষার জন্যে সহজ একটি উপায় আছে। একটি আঁকা বাঁকা ধাঁধাঁ একটা কাঠের বোর্ডের মধ্যে আঁকা আছে। ধাঁধার সরু পথের দুধারে আছে নীচু তারের বেড়া। পরীক্ষার্থীকে একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগ লোহার কলম (styles) দিয়ে, ধাঁধার ভিতরে সরুপথের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। হাত কেঁপে গিয়ে পাশের তারের বেড়াতে কলম লাগলেই আলো জ্বলে উঠবে। সবটা ধাঁধার পথ ঘুরে আসতে ক'বার আলো জ্বলে

---

same. way, the discovery of special disabilities. may be made quite early, and corrective work undertaken. This is important because clumsiness and appar[illegible] upidity may lead to feelings of inferiority or to social maladjustments.

Murphy, A Briefer general Psychology. p. 387

ওঠে, তা দিয়ে বোঝা যায় পরীক্ষার্থীর হাত কতটা স্থির। আবার এক সার সরু সরু লোহা বিভিন্ন ভাবে একটা কাঠের বোর্ডে ঠেকে আছে, তাড়াতাড়ি একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে লোহাগুলিকে সোজা করে পুঁতে দিতে হবে। এতে হাতের পেশীর সূক্ষ্ম কাজের ক্ষমতা মাপা যায়। কব্জীর শক্তি এবং পেশীর বলের পরীক্ষা হয় ডাইনামোমিটার যন্ত্রে। এ রকম নানা ধরণের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোড়াতেই জেনে নেওয়া যেতে পারে, কোন ছেলে বা মেয়ের কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। কার কোন দিকে দুর্বলতা আছে তাও এ সব পরীক্ষায় ধরা পড়ে। রোগীর দেহযন্ত্রের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ডাক্তার রোগনির্ণয় করেন। এর নাম ডায়াগ্‌নোসিস্। তেমনি স্কুলের ছেলে মেয়েদের কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক, কোন বিশেষ বিষয়ে যোগ্যতা অযোগ্যতা আছে তা দিয়ে কোন বৃত্তি বিষয়ে তার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা আছে তা বুঝতে পারা যায়।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা

(Aptitude and interest tests)

এ পরীক্ষাগুলি কতগুলি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েও করা যেতে পারে এবং কাজের মধ্য দিয়েও করা যেতে পারে। কতগুলি প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য কয়েকটি উত্তর, ছাত্রদের কাছে ছাপানো প্রশ্নপত্র আকারে দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে যেটি তাদের পছন্দ সেটি তারা চিহ্নিত করবে। নীচে উদাহরণ দেওয়া হল।

১। প্রশ্ন : ছুটির দিনে কি করতে তোমার ভালো লাগে ?

সম্ভাব্য উত্তর—ক) ঘুমুতে খ) পাহাড়ে চড়তে গ) ফুটবল খেলতে ঘ) বাগানের কাজ করতে ঙ) ছবি আঁকতে চ) গান করতে ছ) সিনেমায় যেতে জ) সাইকেলটা ঝেড়ে মুছে তেল দিয়ে রাখতে

২। প্রশ্ন : জন্মদিনে কি উপহার পেলে তুমি সব চেয়ে খুসী হও ?

সম্ভাব্য উত্তর—ক) সাইকেল খ) পেইন্টিং বক্স গ) চকোলেট ঘ) ব্যাট-বল ঙ) মেকানো সেট ছ) বেহালা

৩। প্রশ্ন : কাদের তুমি সব চেয়ে বেশী পছন্দ কর ?

১) সিনেমা ষ্টার ২) এরোপ্লেনের পাইলট ৩) ডাক্তার ৪) এন্-

জীনীয়ার ৫) রাজনৈতিক নেতা ৬) চৌকশ খেলোয়াড়। এসব প্রশ্নগুলির উত্তর ছাত্রেরা যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী দিতে পারে তেমন ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে তার মধ্য থেকে ছাত্রছাত্রীদের কার কোন দিকে রুচি, তা কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু এমন প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে যে অভীক্ষা, তা অনেকটা নির্বস্তুক। কাজেই বাস্তব অবস্থার মধ্যেই তাদের রুচি ও সামর্থ্যের পরিচয় আরো ভালভাবে পাওয়া যায়। যদি কোন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হবি সেণ্টার থাকে (এটা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন) তা হলে দেখা যাবে, কোন ছেলে কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে বেশী ভালোবাসে, আবার কোন মেয়ের ঝোঁক দেখা যায় নাচের দিকে, কারো বা ছবি আঁকায়। আবার কোন ছেলে হয়তো রসায়নঘটিত সহজ সব পরীক্ষায় বেশী আনন্দ পায়। আবার একদল ছেলেকে একই ধরণের কাজ বা খেলা দিলে দেখা যায় যে, সব ছেলে বা মেয়ে সমান যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে না। নির্দেশক এই ব্যক্তি-পার্থক্যগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতে তার জীবিকা সম্পর্কে নির্দ্দেশনার বর্ণনা করেন।

ডায়াগ্‌নোষ্টিক্‌ টেষ্ট—

ছাত্রের কোন বিষয়ে কতটা যোগ্যতা আছে তা উপরোক্ত বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে বুঝতে পারা যায়। বর্তমানে এসব সমীক্ষার আরো অনেকটা উন্নতি হয়েছে। তাতে ছাত্রের কোন কোন বিষয়ে কতটা যোগ্যতা আছে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিকে বা তার যোগ্যতা ও সম্ভাবনাই বা কতটা, তাও পরিমাণ করা প্রয়োজন বিবেচিত হয়। একে ডায়াগ্‌নোষ্টিক টেষ্ট বলা হয়।

জেনারেল্‌ এ্যাচীভমেণ্ট ব্যাটারী অব্‌ টেস্ট্‌স্‌—

ছাত্রের সমগ্র মানসিক শক্তির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, তার বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা, তার বয়স তার শ্রেণী, বিভিন্ন বিষয়ে তার পারদর্শিতা (বা বিপরীত) সব একসঙ্গে করে 'লেখ' (graph) তৈরী করা হয়। এতে ছেলেটি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তার ক্লাসের সহপাঠীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট, তা এক দৃষ্টিতে সহজেই বোঝা যায়। এটা করতে হলে অনেকগুলি পরীক্ষা ও তাদের ফলের একত্র সমাহার প্রয়োজন। তাই এর নাম জেনারেল্‌ অ্যাচীভ্‌মেণ্ট্‌ ব্যাটারী অব্‌ টেষ্ট্‌স।

নির্দেশকের সহায়ক সমীক্ষা সমূহ—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সফল নির্দেশনায় কাজের জন্যে উপরোক্ত তথ্যগুলি নিতান্ত প্রয়োজন। ছাত্রের সাধারণ বুদ্ধি স্তর এবং বুদ্ধ্যঙ্ক, তার বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা (achievement) তার যোগ্যতা (aptitude) লেখাপড়া বিষয়ে শ্রেণীতে তার স্থান, (general scholastic level) তার রুচি ও আগ্রহ (interest), ভবিষ্যতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা (prognosis) এগুলি নির্ধারণের জন্য যে নানা প্রকারের সমীক্ষা আছে তার প্রয়োগ-কৌশলও নির্দেশকের জানা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রের সমস্ত বিষয়ে সামগ্রিক পরিচয়
(Cumulative Record card)

বর্তমানের অগ্রসর বিদ্যালয়ে নির্দেশনার কর্তব্যটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ জন্যে প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক, বয়স, স্বাস্থ্য, প্রতিটি বিষয়ে, সমস্ত বৎসর ব্যাপী তার উন্নতি অবনতি, তার বিশেষ কোন্ কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা, তার ক্লাসে আচরণ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে তার সম্বন্ধ ও ব্যবহার, খেলাধুলা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি, এ সমস্ত তথ্য দিনের পর দিন (তা সম্ভব না হলে, অন্ততঃ প্রতিমাস) লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। বৎসরান্তে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নির্দেশক বা উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অভিভাবকের কাছে তাঁর নিজ মন্তব্য সহ রিপোর্ট পাঠান। একে কিউম্যুলেটিভ্ রেকর্ড-কার্ড বলা হয়।

জীবিকা সম্পর্কে নির্দেশ বা পরামর্শের উপযোগী পরীক্ষা—

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় বা পাঠ্যধারা নির্বাচন বিষয়ে নির্দেশ এবং জীবিকা বিষয়ে নির্দেশের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তবে বিভিন্ন জীবিকার জন্যে কিছুটা বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও পেশী ব্যবহারে বিভিন্ন প্রকারের কুশলতা প্রয়োজন। বর্তমানে এ সব ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (tests) ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তি কোন কাজের জন্য কতটা উপযোগী তা নিরূপণ করা হয়। এর ফলে দুই মহাযুদ্ধের সময় লোক ও কর্মনির্বাচনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকারের বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার ভিত্তিতে অ্যামেরিকাতে বিশেষ ভাবে, প্রায় সমস্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নানা কাজে লোক বাছাই করবার জন্যে এই অভীক্ষাগুলি নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন্ ব্যক্তি কোন্ শিল্প, ব্যবসায়, বা

জীবিকার কোন্ বিশেষ বিভাগের জন্য কতটা যোগ্য, সে বিষয়ে উপদেশ (counselling) বা নির্দেশের (guidance) ব্যবস্থা হয়েছে।

বুদ্ধি, প্রবণতা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ বিষয়ে কুশলতা, যোগ্যতা ভিন্ন আরো অনেক গুণও শিল্প, কারখানা, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদিতে প্রয়োজন, যেগুলি যান্ত্রিক উপায়ে পরিমাপ করা যায় না—যেমন সততা, দায়িত্বজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রসজ্ঞান, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। সাধারণ সাক্ষাৎকার (interview) এবং দায়িত্বপূর্ণ-পদে অধিষ্ঠিত ভদ্রব্যক্তিদের প্রশংসা পত্র (recommendations) দ্বারা এ সব বিষয়ে বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতার বিচার হয়ে থাকে। এ বিচার বহুলাংশেই ব্যক্তির অভিরুচি-ভিত্তিক (subjective)।

বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্যবসায়ে লোক বাছাই করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী বিভিন্ন বিভিন্ন অভীক্ষা (trace tests) আছে।

কলকারখানা, শিল্প ইত্যাদিতে লোক নিযুক্ত করার কালে প্রার্থীদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, পেশী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনে তৎপরতা, কলকব্জার বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ ও তাদের কাজ, প্রার্থী কতটা বোঝে এবং বিভিন্ন কল চালাবার মত যোগ্যতা ও বুদ্ধি তার আছে কিনা, তা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা (tests of motor skill) আছে।

কোন্ ব্যক্তি কোন্ জাতীয় যন্ত্রচালনায় কতটা যোগ্য হবে এবং মোটামুটি ভাবে যন্ত্রবিষয়ে সাধারণ বুদ্ধি এবং তাদের চালনা বিষয়ে যোগ্যতা কার কতটা আছে, সে বিষয়েও নানা অভীক্ষা (general mechanical ability and special mechanical aptitudes) আছে। এর মধ্যে সীশোর (Seashore)-এর কতগুলি অভীক্ষা, বহু প্রয়োগ দ্বারা অনেকটা নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক মানে উন্নীত হয়েছে (scientifically standardised।[৩]

৩। Seashore—(a) The Stanford motor skills unit. Psychol Monog 1928 39. pp 51-65
(b) Individual differences in motor skills. J. Gen. Psychol, 1930, 3, pp 38-66

ও

Perrin—An experimental study of motor ablitity J. Exper, Psychol. 1921, 4. pp 24-56

ছোটছেলেদের দেশসম্পর্কিত (spatial) আকার ও প্যাটার্ণ-এর ধারণা-এবং সম্পর্কিত নানা-পরীক্ষা আছে যেমন, (Form-bord tests, Matching tests, Bellevue Tests, Pintner Patterson tests) এগুলি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।

ফর্ম-বোর্ড টেষ্টগুলি খুব সোজা থেকে সুরু করে, বেশ জটিল ও কঠিন, এ ভাবে ক্রমশঃ স্তর বিভক্ত আছে। ছোটদের ফর্মবোর্ড টেষ্ট্ অনেকটা এ রকম : একটি পাৎলা কাঠের তক্তায় অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের ছোট বড় ফুটো করা আছে। তক্তাটির সামনেই একটা বাক্সে সেই ফুটোগুলিতে ঠিক ঠিক এঁটে বসে এমন, ঠিক ততগুলিই কাঠের টুকরো আছে তক্তাটিতে যতটি ফুটো আছে। সেই টুকরোগুলি একত্র মিশিয়ে দেওয়া আছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টুকরোগুলি ফুটোতে ঠিক ঠিক জায়গা মত বসাতে হবে। এর চেয়ে কঠিন হল—একটা লম্বা মোটা কার্ডবোর্ডে পর পর কতগুলি ছবি আঁকা আছে। ছবিগুলি কতকটা একই ধরণের। এই কার্ড বোর্ডের ছবিগুলির নীচে কাগজে আঁকা অনুরূপ ছবির অংশগুলি, অসমান বিভিন্ন আকারে কেটে টুকরো করে মিশিয়ে দেওয়া আছে। এখানেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাগজের টুকরো-গুলো ঠিক ঠিক জোড়া দিয়ে ছবিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে।

ম্যাচিং টেষ্টগুলোও কতকটা একই ধরণের। হয়তো কোন যন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ছবি, ছোট ছোট করে আঁকা আছে। নীচে যন্ত্রের সেই বিভিন্ন অংশ গুলি ছড়ানো আছে। এখানে পরীক্ষক একটি একটি করে ছবির দিকে নির্দেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীকে সেই সেই যন্ত্রাংশটি খুঁজে বের করতে হবে।

কোন কোন পরীক্ষায় রং-এর সূক্ষ্ম প্রভেদ শিক্ষার্থী কতটা বোঝে, তার পরীক্ষা করা হয়। একটা নানা রংয়ের আঁকা ছবি সামনে টাঙানো আছে। পরীক্ষার্থীর সামনে বিভিন্ন রং-এর এবং বিভিন্ন শেড্ (shade)-এর অনেকগুলি রঙীন কাগজ কাটা আছে। পরীক্ষক ছবির মধ্যে নম্বর দেওয়া বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করে পরীক্ষার্থীকে দ্রুত ঠিক সেই রং ও ঠিক সেই শেডের কাগজটি খুঁজে বার করতে বলবেন। সুর সম্পর্কেও অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার্থীর চোখ বেঁধে একটি সুর কয়েক বার শোনানো হয়, তারপর বড় অর্গানে ঠিক সেই সুরটি বাজাতে বলা হয়।

ওয়েক্স্লার বেলেভ্যু টেষ্টগুলি প্রথমতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য পরীক্ষায়

জন্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। পরে ছোটদের জন্যও অনুরূপ অভীক্ষা রচিত হয়েছে। এর একটা নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। একটা গল্প পর পর কতগুলি ছবি এঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু ছবিগুলি উল্‌টে পাল্‌টে দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবিগুলি ঠিক ঠিক করে সাজিয়ে গল্পটি বলতে বলা হয়। কখনো কখনো কয়েকটি ছবিতে দিক বা দেশ (direction or space relation) সম্পর্কে সামান্য কিছু কিছু ভুল থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছবি থাকে যাতে কোন ভুল নেই। ভুলগুলি পরীক্ষার্থীর চোখে পড়ে কিনা তার পরীক্ষা করা হয়।

যন্ত্রচালনা ও যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞান ও যন্ত্রবিষয়ে উপস্থিতবুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নানা অভীক্ষার মধ্যে Minnesota mechanical ability tests প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।[৪] এসব পরীক্ষায় শুধু যান্ত্রিক জ্ঞানই পরীক্ষিত হয় না। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মনোযোগের ক্ষমতা ও অখণ্ডতা, তৎপরতা (alertness), অচঞ্চলতা (steadiness) সূক্ষ্মপার্থক্য-বোধের ক্ষমতা, নির্ভুলতা, ধৈর্য, সতেজ স্মৃতিশক্তিরও পরিমাপ হয়।[৫]

বিভিন্ন কাজের অঙ্গ বিশ্লেষণ—জব্‌ অ্যানালিসিস্

আধুনিক যুগে সমস্ত শিল্প, কলকারখানায় কাজের মূল মন্ত্র হচ্ছে—'এফিসিয়েন্সী'—সুষ্ঠু কর্মকুশলতা। এই কর্মকুশলতা আন্দাজের ব্যাপার নয়। একদিকে যেমন ব্যক্তির বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ সামর্থ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে' সে বিশেষভাবে কোন্ কাজ বা বৃত্তির যোগ্য, সে বিষয়ে তাকে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা হয়, তেমনি প্রত্যেকটি যন্ত্রচালনার কাজে যে যে অঙ্গসঞ্চালন ও পেশী ব্যবহার প্রয়োজন হয় এবং কি ভাবে এগুলি করলে, সব চেয়ে কম পরিশ্রমে, নির্ভুলভাবে, সব চেয়ে বেশী পরিমাণ কাজ হ'তে পারে, তারও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজ বহু শারীর-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী রত আছেন। আমেরিকা এই বিষয়ে অগ্রণী। এই বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি কর্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, কাজ করতে গেলেই অনেকগুলি সুসংবদ্ধ অঙ্গ বা পেশী ব্যবহার করতে হয়। গিলব্রেথ দম্পতি প্রথম বিভিন্ন

৪। Patterson. Minnesota mechanical ability test. Minneapolis. Univ. of Minnesota. Press. 1930

৫। Griffith-An Introduction to Apl. Psy. p 567

কাজে অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালন ক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে চাইলেন (১) যন্ত্রচালনার কাজে সাধারণ অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের ক্রিয়াগুলি কি (২) প্রত্যেক কাজে বিভিন্ন বিশেষ পেশী সঞ্চালন বা দেহের ভঙ্গী কি কি প্রয়োজন (৩) কি ভাবে অনাবশ্যক পেশী বা অঙ্গের ক্রিয়া বর্জন করা যায় (৪) কি ভাবে বিভিন্ন পেশী ক্রিয়াগুলির অধিকতর সামঞ্জস্য স্থাপন দ্বারা পরিশ্রম লাঘব করা যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় (৫) কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে কি কি মানসিক ও অন্যগুণ প্রয়োজন। তাঁরা এ নিয়ে বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে' দেখতে পেলেন যে, কোন কাজে যারা অকুশলী বা প্রথম ভর্তি হয়েছে তারা অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ বা পেশী সঞ্চালন করে, অথবা, ভুল দেহের ভঙ্গীতে কাজে অগ্রসর হয়। এই রকমে বৈজ্ঞানিক 'পদ্ধতিতে কাজের অঙ্গ বিশ্লেষণ (Job analysis)* করে' অনেক সময়, পরিশ্রমও অর্থের সাশ্রয় হয়। কখনো কখনো এই প্রকার গবেষণার ফলে শিল্পের প্রচলিত উপাদানের পরিবর্তন এবং কলকব্জার সংশোধনও করা সম্ভব হয়। একাজের জন্য ধীর গতিতে মুভী ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়, তাতে বিশ্লেষণের কাজ সহজ হয়, ভুল বা বিকৃত অঙ্গভঙ্গী সহজে চোখে ধরা পড়ে। তা ছাড়া, যারা নূতন কাজ শিখছে, তাদের কাছে একজন দক্ষ শিল্পীর কাজের মন্থরীকৃত ছবি পর্দায় দেখানো হয়; তাতে তারা গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক ও সুষ্ঠু কার্য পদ্ধতিটি শিখতে পারে।[৬] টেলর অ্যামেরিকায় এই বৈজ্ঞানিক এবং সুফলপ্রসূ বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। এবং তাঁকে সেজন্যে প্রথম Efficiency expert বা Time studyman বলা হয়। গিলব্রেথ দম্পতি সুশৃংখল ভাবে এ গবেষণা সুরু করেন। এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বহু শিল্প ও কারখানাই লাভবান্ হয়েছে এবং অ্যামেরিকায় এই বিজ্ঞান জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে একথা আজ নিঃসন্দেহেই বলা যায়। অ্যামেরিকা, পশ্চিম জার্মেনী

---

* Job analysis—studying a job in such a way as to discover its components and its psychological and other requisites. Munn-Psychology. Appendix p 472.

৬। Gilbreth-Motion study, 1911.

also see Gilbreth & Gilbreth-Applied Motion study. 1917

এবং পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশের শিল্প সমৃদ্ধির মূলে এই সব বিশেষজ্ঞ প্রয়োগ বিজ্ঞানী (Efficiency experts) দের উপদেশের স্থান সামান্য নয়।

এ বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। গিল্‌ব্রেথ্ লক্ষ্য করে দেখলেন যে রাজমিস্ত্রী যারা ইঁট গাঁথে, তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে ১৮টি পেশী ক্রিয়া বা অঙ্গসঞ্চালন করে। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা এমন এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে মাত্র ৫টি পেশী ক্রিয়া দ্বারাই এ কাজটি অনেক সহজে এবং অনেক দ্রুত করা যেতে পারে। এই নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করলে পূর্বে যেখানে একটি লোক ঘণ্টায় সাধারণতঃ ১২০টি ইঁট গাঁথতে পারতো, সে জায়গায় ৩৫০টি ইঁট গাঁথতে পারে। টেলর এক ইস্পাতের কারখানায় কাজ করতেন। সেখানে তিনি কয়েকজন বুদ্ধিমান্ শ্রমিককে নিজ উদ্ভাবিত নতুন কিছু কাজের পদ্ধতি শেখালেন এবং উৎপাদন বাড়ালে তাদের মজুরী বাড়ানো হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজে লাগালেন। এর ফলে দেখা গেল, পূর্বে যেখানে কারখানার মাল বোঝাইর পরিমাণ ছিল দৈনিক ১৬ টন, তা বেড়ে হল ৫১ টন। নতুন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের বেতন বাড়লো, আর কারখানার খরচ কমলো বৎসরে ৭৫০০০ ডলারের বেশী। অ্যামেরিকায় কারখানায় যারা মোটর চালায়, যারা টাইপরাইটিং শেখে যারা অফিসের হিসাবপত্র রাখবার কাজে নানা কম্প্যুটর যন্ত্রব্যবহার করে, তাদের কাজগুলির বৈজ্ঞানিক বিশেষণ ও কর্মীদের কুশলতা বৃদ্ধি সম্পর্কে যাঁরা সফল গবেষণা করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুন্‌ষ্টারবার্গ, ভিটেল্‌স্‌ থার্স্টোন্ টাট্‌ল, বার্ট, বিল্‌স্ ও কেড্‌স্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭]

বর্তমানে সামরিক এবং অসামরিক বিভাগে বিমান চালনা বিষয়ে বহু মূল্যবান্ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়েছে এবং এসব গবেষণা সফলভাবে প্রযুক্ত হয়ে, একদিকে যেমন এসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজের জন্য

৭। এবিষয়ে কয়েকটি বই হচ্ছে—Munsterberg. Psychology & Industrial Efficiency, Viteles. Research in the selection of motormen; Thurstone-Standardized tests for office clerks, Tuttle. The determination of ability for learning typewriting; Burt. Tests for clerical occupations, Bills; Methods for the selection of comptometer operators and Stenographers; Cades. The textile industry in philadelphia.

লোকসংগ্রহ সহজ হয়েছে, এবং অপচয় নিবারিত হয়েছে, তেমনি বিমানের গঠনেও দিন দিন প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

এসব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শিল্পে, কারখানায় কোন্ কোন্ অঙ্গ বা পেশাক্রিয়াগুলি অত্যাবশ্যকতা জানা গেছে এবং এগুলিতে যাতে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা লাভ করতে পারে, সে জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সঙ্গে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই সাধারণ কতগুলি যান্ত্রিক দক্ষতা ছাড়াও, প্রত্যেক শিল্প, যন্ত্র চালনা বা কারখানার কাজেই বিশেষ বিশেষ কতগুলি দক্ষতা প্রয়োজন এবং যাদের মধ্যে উপদেষ্টা দক্ষতা দেখতে পান, তাদেরই সেই শিল্পে নিয়োগের পরামর্শ দিয়ে এবং নির্বাচন ক'রে অপচয় নিবারণ করেন।[৮] এ সব গবেষণা থেকে এটাও বোঝা যায় যে বুদ্ধির বেলা যেমন সাধারণ বুদ্ধি (g) আর বিশেষ ধরণের বুদ্ধি (s) এর পার্থক্য করতে হয়, তেমনি কর্মকুশলতার বেলায়ও কতগুলি সাধারণ ক্রিয়া কুশলতা ও কতকগুলি বিশেষ কুশলতার প্রয়োজন দেখা যায়। কারো কারো মতে যন্ত্র ব্যবহার, কলচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সাধারণ কুশলতা আছে কিনা সন্দেহ। প্রত্যেক শিল্প বা কলচালনার কুশলতাই বিশেষ এবং বিভিন্ন কুশলতার মধ্যে অস্তিবাচক নিকট সম্বন্ধ সামান্যই আছে।[৯]

৮। Viteles Jaobs Pecification and diagnostic tests of jobs, com petancy.

৯। Griffith, An Introduction to Applied psychology, p. 528

একচত্বারিংশ অধ্যায়

মানসিক রোগ বা বিকৃতি বিষয়ে নির্দেশনা

বর্তমানে শারীরিক ও মানসিক রোগ নিবারণ বা তাদের চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শদান বা নির্দেশনা যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করেছে। বড়দের জন্য এ ব্যবস্থা তো আছেই, এখন ছোটদের দিকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের মানসিক রোগ সম্পর্কে নির্দেশনা বিষয়েই এখানে কিছু আলোচনা করব।

বর্তমানে বহু অগ্রসর দেশেই ভালো স্কুলের সঙ্গে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা যুক্ত থাকেন। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ বিষয়ে সুপরামর্শ দেন। তেমনি আবার রোগ হ'লে চিকিৎসারও সুব্যবস্থা করেন। এ-তো গেল দেহের রোগ সম্বন্ধে। তেমনি মনের স্বাস্থ্য যাতে রক্ষিত হয়, যাতে নানা মানসিক বিকার না ঘটতে পারে, এবং রোগ হ'লে যাতে সুচিকিৎসা হ'তে পারে সে ব্যবস্থাও আছে। এসব মানসিক রোগের চিকিৎসালয়ে শিশু মনস্তত্ত্ব বিশারদ এবং মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও থাকেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন সাধারণ শিশু সমস্যা বিষয়ে উপদেশ দানের কেন্দ্র ও চিকিৎসালয়ও (Child guidance clinics) আছে।

সাধারণতঃ শিশুদের জীবন পিতামাতা পরিজনের স্নেহ ভালবাসার পরিমণ্ডল দ্বারা সুরক্ষিত। বাহ্যজগতের ও জটিল সমাজের তীব্র সংঘাত সাধারণতঃ তাদের স্পর্শ করে না। গুরুতর মানসিক রোগের কারণগুলি শিশুদের জীবনে সৌভাগ্যক্রমে প্রায়শঃই অনুপস্থিত থাকে। স্বার্থের সংঘাত এবং নানা মানসিক দ্বন্দ্ব শিশুর জীবনকে অশান্ত ও উদ্বিগ্ন করে তোলে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগের মূল জন্মগত ও বংশগত। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিকূল উত্তেজক পরিবেশ, কুশিক্ষা বা সুশাসনের অভাব, জন্মগত ত্রুটিকে প্রকট করে তোলে। যে কারণেই মানসিক রোগ দেখা দিক না কেন, সুপরামর্শ ও সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বিপদ নিবারণ করা যায় এবং রোগ নিরাময় করা সহজ হয়।

গুরুতর মানসিক রোগ (psychosis) সৌভাগ্যক্রমে শিশুদের মধ্যে বিরল, কিন্তু বায়ুরোগের (psycho-neurosis) নানা লক্ষণ ও প্রবণতা কিছু

কিছু শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এই বিকার গুলি গৃহসম্পর্কিত ব্যবহারে লক্ষিত হ'তে পারে, আবার বিদ্যালয় সম্পর্কিত ব্যবহারেও দেখা যায়। এসব শিশুদের ব্যবহার নিজেদের পরিবারে অন্য ভাইবোন, বাবা মা বা অন্য পরিজনদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ও সহজ নয়; বিদ্যালয়েও তারা সহপাঠীদের সাথে তাল মিশতে পারে না। অকারণ ভয়, বৃথা দুশ্চিন্তা, অস্থিরচিত্ততা, বিষন্নতা, বিদ্বেষ, কলহপরায়ণতা, মারামারি বা অন্যকে আঘাত করবার আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যা কথা বলা, বাড়ী বা বিদ্যালয় থেকে পলায়ন, জিনিষপত্র ভাঙা চুরা বা নষ্ট করা, অবাধ্যতা, কুৎসিৎ গালাগালি দেওয়া, চুরিকরা, যৌন অপরাধ ইত্যাদি নানা অসামাজিক ও অস্বস্তিকর ব্যবহার থেকে শিশুদের অব্যবস্থিততার পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রএডের মতে সমস্ত মানসিক রোগের মূল থাকে শৈশবের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায়। কি করে' শিশুর জীবন ক্ষতিকর উদ্বেগ ও অশান্তি-শূন্য এবং সুস্থ ও আনন্দময় হ'তে পারে, সে জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ নির্দেশকের সদুপদেশ ও সুপরামর্শ প্রয়োজন হয়।

শিশুর জীবনের দুইটি মূল অত্যাবশ্যক দাবী হচ্ছে, বুকজুড়ানো প্রচুর স্নেহ ও নিরাপত্তাবোধ এবং যথোচিত স্বাধীনতা ও আত্ম উন্মোচনের সুযোগ। এই দুইটি দাবী যেখানে যথোচিত ভাবে মেটানো হয় না, সেখানেই শিশুর মানসিক জীবনে অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। এর ফলে, নানা মানসিক বিকার বা রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফ্রএডের মতে মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মূল হচ্ছে যৌনাকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক তৃপ্তির উপরই মানসজীবনের সুস্থতা নির্ভর করে। শিশুর জীবন সম্পর্কেও এ কথা সত্য। শিশুর জীবনে যৌন জীবনের আধার হচ্ছে মাতা ও পিতা। পুরুষ-সন্তান মাকে আকাঙ্ক্ষা করে, ভালবাসে, তার আদর পেতে এবং তাকে আদর দিতে চায়। আর মেয়েসন্তান তেমনি স্বাভাবিকভাবে বেশী ভালবাসে বাবাকে ফ্রএডের মতে এ ভালবাসা মূলতঃ যোনিকেন্দ্রিক। শিশুর জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে মুখ, পায়ু ও লিঙ্গ ক্রমে ক্রমে যৌনতৃপ্তির কেন্দ্রস্থান অধিকার করে। পুরুষ সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণকে ফ্রএড্ নাম দিয়েছেন 'ইদিপাস্ কমপ্লেক্স্' ও মেয়ে সন্তানের পিতার প্রতি তীব্র আকর্ষণকে তিনি বলেছেন ইলেক্‌ট্রা কমপ্লেক্স্'। শিশু বড় হয়ে উঠলে, তাদের পিতামাতার প্রতি এই তীব্র ভালবাসা সমাজ নিন্দার চোখে দেখে এবং শিশুরা তাদের এই

আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। তাতে তাদের অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হয় এবং তাই শিশুর জীবনে মানসিক অস্থিরতা বা বিকৃতির প্রধান কারণ। অবশ্য শিশুর বিকাশের ধারায় সে স্বভাবতঃই বাল্যের এই তীব্র-তাদাত্ম্যবোধ (ego-identification) অতিক্রম করতে পারে। সমাজের নিন্দাও এ বিষয়ে সহায়ক হয়। যেখানে শিশুর মনের ও অনুভূতি-জীবনের স্বাভাবিক বহমানতা স্তব্ধ হয়, সেখানে শিশু অতি মাত্রায় পিতা মাতার স্নেহ-ভালবাসার উপর নির্ভরশীল (over-dependent) হয়। এতে তাদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। এও মনের বিকার। যেখানে পিতামাতার কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য স্নেহ ভালবাসা থেকে শিশু বঞ্চিত হয়, তা যেমন তার মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী, তেমনি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ও তাদের আত্মনির্ভরতা গুণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শিশুদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই দুই প্রকার ত্রুটি যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে। যাঁরা শিশুর মানসিক রোগ চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেবেন, তাঁদের এ-সব তত্ত্ব এবং তাদের প্রয়োগ জানতে হবে। শিশুদের চিকিৎসার বেলায় মনঃসমীক্ষণ ততটা সফল পদ্ধতি নয়, কিন্তু মানসিক রুগ্ন শিশুর অবরুদ্ধ অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, ভয় ইত্যাদি নানা প্রকার খেলা ধূলা ও হাতের গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে রেচন করে তাকে সুস্থ করা যায়। উপদেষ্টাকে এ সব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জানতে হবে।

গৃহসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশ গুলিতে এ ব্যাপারে জন্মগত ও বংশগত কারণকেই প্রধান মনে করা হয়, কিন্তু রাশিয়াতে তাঁরা শিশুর অব্যবস্থিততা ও অপরাধের মূল খোঁজেন, সমাজ পরিবেশের মধ্যে এবং পরিবেশের সংশোধন ও সংস্কারকেই রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার প্রধান উপায় মনে করেন।

চাইল্ডগাইডেন্স্ ক্লিনিকের সংগঠন ও কাজ

এই বিষয়ে নির্দেশনার কাজ একজন বা অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞেরই মাত্র দায়িত্ব নয়। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য বহু মানুষের নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন।

ক্লিনিকের সঞ্চালকের (director) উপরই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব ন্যস্ত। তিনি শিশু রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ (pediatrician) এবং মানসিক রোগ

চিকিৎসায়ও তাঁর অভিজ্ঞতা থাকে। কখনো কখনো সঞ্চালকই মানসিক রোগ চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (psychiatrist)। তিনিই সমস্ত বিবরণ বিবেচনা করে, প্রত্যেক শিশুর চিকিৎসা ব্যাপারে চূড়ান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্তে থাকেন, সাধারণ শিশুরোগ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও শিশু মনোবিদ্. শিশু মনোবিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান এবং বুদ্ধি, যোগ্যতা, প্রবণতা, ইত্যাদি পরিমাপক নানা অভীক্ষা প্রয়োগে তাঁর পারদর্শিতা থাকা চাই। এ ছাড়া ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কয়েক জন উৎসাহী, কুশল ও বুদ্ধিমান্ সমাজ কর্মী (social worker), সাধারণতঃ স্ত্রীলোক। তাঁরা শিশুর গৃহ পরিদর্শন ক'রে রোগীর গৃহ পরিবেশ এবং বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় তাঁরা অভিভাবক ছাড়াও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করেন, তাঁদের কাছ থেকে ছেলেটি সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করেন। তাঁরা সঞ্চালকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা হচ্ছে কিনা, এবং চিকিৎসার ফল কেমন তার খোঁজ খবর করেন (follow up)।

যে সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিতামাতা বা শিক্ষকদের বিষম সমস্যা (problem children), তাদের সঙ্গে করে অভিভাবক ক্লিনিকে আনেন এবং শিশুটি সম্পর্কে সমস্যা কি, তা তাঁরা সবিস্তারে বলেন। সঞ্চালকের সহকারী চিকিৎসক 'কেস্'-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং 'কেস্'টির প্রধান প্রধান উপসর্গগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এর পর শিশু চিকিৎসক শিশুটিকে নানা প্রকার দৈহিক পরীক্ষা ক'রে তার ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুস্থ কিনা, তার বয়স, উচ্চতা, ওজন, কোন রোগ আছে কিনা ইত্যাদি লক্ষ্য করে তাও লিপিবদ্ধ করেন। এরপর শিশু মনোবিদ্ শিশুটির বুদ্ধি, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) সামর্থ্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণগুলি পরিমাপ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। এই সব রিপোর্ট সঞ্চালকের কাছে পাঠান হয়। সঞ্চালক এগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন এবং ছেলেটির সঙ্গে এবং তার পিতামাতার সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা ক'রে রোগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করেন। এবার তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একজন সমাজ-কর্মী ছেলেটির বাড়ী এবং কখনো কখনো তার বিদ্যালয়ে গিয়ে, তার পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সঞ্চালকের কাছে 'রিপোর্ট' পাঠান। এবার সঞ্চালক তাঁর সহকর্মী শিশু-চিকিৎসক, শিশু মনস্তত্ত্ববিদকে নিয়ে এক সঙ্গে 'কেস্টি' নিয়ে আলোচনা করেন।

রোগ নির্ণয় বিষয়ে তাঁরা সঞ্চালককে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন, কিন্তু রোগ-নির্ণয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব এবং চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। সাধারণতঃ তিন মাস পর্যন্ত, এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর অভিভাবকেরা ছেলেকে নিয়ে আসেন। প্রয়োজন বোধে সঞ্চালক তাদের সঙ্গে আবার দেখা করেন, তাদের প্রশ্ন করেন এবং নূতন করে চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেন। বিদ্যালয়ঘটিত সমস্যা হ'লে, সঞ্চালক প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণীশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁদের পরামর্শ দেন। আইনতঃ সঞ্চালকের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। অভিভাবক বা শিক্ষক তাঁর ন্যায্য উপদেশ অগ্রাহ্য করলে, তাঁদের তিরস্কার ও শাস্তির জন্য তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন এবং একবার সাবধান করার পর অভিভাবক বা বিদ্যালয় ত্রুটি সংশোধন না করলে, তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ছেলেটিকেও অনেক সময় দায়িত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ কোন ভদ্রব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অপরাধ গুরুতর হলে তাদের সংশোধনাগারে পাঠানো হয় এবং যেখানে পিতা মাতা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, অসচ্চরিত্র, স্নেহমমতাহীন এবং শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁদের প্রভাব যেখানে অকল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়, সেখানে ছেলেকে অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে অন্য যোগ্যতর অভিভাবকের কাছে পাঠাবার ক্ষমতাও সরকারের আছে।

এ সব থেকেই ও সব দেশে চাইল্ডগাইডেন্স্ ক্লিনিক্ এবং শিশুদের সম্যক সুস্থ বিকাশের ব্যাপারে সঞ্চালকের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাবে।

রোগ নির্ণয়, পরামর্শ ও চিকিৎসা—

মনোবিকলন (psycho-analysis) পদ্ধতিদ্বারা মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালীর সাহায্যে ব্যক্তির অবরুদ্ধ জটিল গ্রন্থির সন্ধান মিলে এবং এ দ্বারা নিরুদ্ধ বিষাক্ত অবচেতনার রেচনও ঘটে। কাজেই এ প্রণালী রোগনির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসা এই দুই-এর সহায়ক। এ নিয়েও পূর্বে আলোচনা করেছি।[১]

এসব পদ্ধতির উদ্দেশ্য হ'ল রোগী নিজেই নিজের মানসিক বিকারের স্বরূপ জানবে এবং তার মুখোমুখি হয়ে নিজ সমস্যার সমাধান নিজেই করবে-চিকিৎসক সহায়ক মাত্র। এ পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হলে চিকিৎসক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করবেন:[২]

(১) রোগীর প্রতি আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন।
(২) রোগীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনুন—নিজে কথা বলবেন না।
(৩) রোগীর সঙ্গে তর্ক করবেন না, তাকে উপদেশ দেবেন না।
(৪) মন দিয়ে শুনুন, এবং লক্ষ্য করুন—
(ক) রোগী কি বলতে চায়। (খ) সে কি কথা বলতে চায় না।

১। Burbarry, Balint, Yapp—Child Guidance.
২। The non-directive therapist avoids advice, persuation,

(গ) সে কি কথা আপনার সাহায্য ব্যতীত নিজে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে না।

(ঙ) যখন রোগীর কথা মন দিয়ে শুনছেন তখন নিজের মনের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের গড়ন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিন। পরে এই ধারণা সত্য কিনা তা যাচাই করে দেখবেন। কিছু ক্ষণ কথা চলার পরে পরে, রোগী যে কথা বলেছে তার সংক্ষিপ্তসার তার সামনে উপস্থিত করুন এবং তাকে জিজ্ঞেস করুন—এ কথাই সে বলতে চাইছে কিনা, (যেমন, তুমি তো একথাই বলতে চাইছ যে তোমার সামনে সর্বদাই একটা দুর্ভেদ্য বাধা রয়েছে, যা তোমার সব চেষ্টা ও উদ্যমকে বারে বারে ব্যর্থ করে দিচ্ছে?) কিন্তু এ জাতীয় প্রশ্ন করবার সময় বিশেষ সাবধান হবেন, যেন রোগীর বক্তব্যই শুধু বিশ্লেষণ করে বলেন,—তার বক্তব্যে কিছু যোগ করবেন না, অথবা তার বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করবেন না।

(৩) এ কথা স্মরণ রাখুন যে, যে-কথা রোগী আপনার কাছে বিশ্বাস করে বলেছে, তা তার জীবনের বিষম গোপনীয় তথ্য, তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবার অধিকার আপনার নাই।*

এ সব পদ্ধতি ছাড়াও রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের জন্যে খেলা এবং অন্যান্য প্রীতিপদ কাজের ব্যবহার শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক রোগীকেই পৃথক ভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তাই যিনি মানসিক রোগ সম্পর্কে উপদেশ দেবেন বা পরীক্ষার ভার নেবেন, তাঁকে বিভিন্ন পদ্ধতি, তাদের গুণাগুণ ও তাদের প্রয়োগপদ্ধতি জানতে হবে।[8]

সর্বাপেক্ষা এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে উপদেষ্টা সহানুভূতিসম্পন্ন, শিশুদের প্রতি স্বভাবতঃ স্নেহপরায়ণ, হাসিখুশী, শিশুদের সঙ্গে সহজে মিলতে সমর্থ, তাদের বিশ্বাসভাজন এবং তাদের অসুবিধা বুঝতে ইচ্ছুক এবং তাহাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। উপদেষ্টার প্রধান কাজ হবে রোগ নিবারণ, সান্ত্বনা দান এবং শিশুদের মনের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা।

---

suggestion and similar inteventіon techniques, and even limits the use of explanation and encouragement to specific situati ns. Attention is focussed on the individual, rather than on any particular prob'em. The aim of therapy, is not to do something to the patient, or to induce him to do something about himself, but to assist the patient to grow and attain responsible maturity so that he can more effectively cope with present and future difficulties.

Page. Abnormal Psychology-pp-108-69

Also, Roger's—Counselling Psychotherapy pp 272-73

৩। Rogers & Dymod (Ed)—Psychotherapy & personality change

৪। Elton Mayo—The social, problems of an industrial c'vi.izstion